NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PGBG

PAPER IV

প্রাক্কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

6th পুনর্মুদ্রণ ঃ আগস্ট, 2019

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয়ঃ বাংলা | স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পাঠক্রম

PGBG : IV

	রচনা	সম্পাদনা
একক ঃ 1	ড. বীরেন্দ্রকুমার রক্ষিত অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তী	অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী
একক ঃ 2	ড. বীরেন্দ্রকুমার রক্ষিত	অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী
একক ঃ 3	ড. অরূপকুমার দাস	ড. মননকুমার মণ্ডল
একক ঃ 4	অধ্যাপক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী
একক ঃ 5	ড. অলোক চক্রবর্তী	অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী
একক ঃ 6-10	ড. বিপ্লব চক্রবর্তী	অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী
একক ঃ 11	ড. শম্পা ভট্টাচার্য	ড. মননকুমার মণ্ডল
একক ঃ 12	ড. বিপ্লব চক্রবর্তী	অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী
একক ঃ 13	ড. অনামিকা দাস	
একক ঃ 14-15	ড. অলোক চক্রবর্তী	অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী
একক ঃ 16	ড. বীরেন্দ্র মৃধা	ড. মননকুমার মণ্ডল
একক ঃ 17-19	ড. অলোক চক্রবর্তী	অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী
একক ঃ 20	ড. বরেন্দু মণ্ডল	ড. মননকুমার মণ্ডল

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PGBG – IV

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

উপন্যাস —

একক 1	ঃ	রাজসিংহ — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	7-41
একক 2	ঃ	চতুরঙ্গ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	42-48
একক 3	ঃ	পণ্ডিতমশাই — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	49-62
একক 4	ঃ	আরণ্যক — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	63-79
একক 5	ঃ	নাগিনীকন্যার কাহিনী — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	80-85

ছোটগল্প —

একক 6	ঃ	ক্ষুধিত পাষাণ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	86-100
একক 7	ঃ	হালদার গোষ্ঠী — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	101-117
একক 8	ঃ	নয়নচাঁদের ব্যবসা — ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	118-135
একক 9	ঃ	অরূপের রাস — জগদীশ গুপ্ত	136-150
একক 10	ঃ	স্টোভ — প্রেমেন্দ্র মিত্র	151-159
একক 11	ঃ	শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড — পরশুরাম	160-179
একক 12	ঃ	রস — নরেন্দ্রনাথ মিত্র	180-200
একক 13	ঃ	পথের কাঁটা — শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	201-242
একক 14	ঃ	ডোমের চিতা — রমেশচন্দ্র সেন	243-254
একক 15	ঃ	কুষ্ঠরোগীর বউ — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	255-274
একক 16	ঃ	সংকেত — সোমেন চন্দ	275-297
একক 17	ঃ	চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ — সুবোধ ঘোষ	298-308
একক 18	ঃ	রেকর্ড — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	309-323
একক 19	ঃ	শহীদের মা — সমরেশ বসু	324-339
একক 20	ঃ	জাতুধান — মহাশ্বেতা দেবী	340-360

একক ১ ❑ রাজসিংহ— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গঠন

১.১ প্রস্তাবনা
১.২ ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে 'রাজসিংহ'
১.৩ 'রাজসিংহ' উপন্যাসের গঠনে মহাকাব্য ও লোকপুরাণে প্রভাব
১.৪ ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে রাজসিংহের গ্রহণযোগ্যতা
১.৫ রাজসিংহ উপন্যাসের নায়ক বিচার
১.৬ রাজসিংহ উপন্যাসের উপকাহিনি
১.৭ রাজসিংহ উপন্যাসের নায়িকা বিচার
১.৮ রাজসিংহ চরিত্র
১.৯ ঔরঙ্গজেব চরিত্র
১.১০ জেব-উন্নিসা
১.১১ মানিকলাল
১.১২ উর্দিপুরী বেগম
১.১৩ দরিয়া বিবি
১.১৪ যোধপুরী বেগম
১.১৫ রাজসিংহে হাস্যরস
১.১৬ রাজসিংহের ভাষাশৈলী
১.১৭ প্রশ্নাবলী
১.১৮ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ প্রস্তাবনা

একটি দেশের ও ভাষার সাহিত্যের বহু বিভাগ থাকে। যেমন—কাব্য, কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও নাটক। উপন্যাস ও ছোটগল্পকে একত্রে বলা হয় কথাসাহিত্য। 'কথা' অর্থাৎ আখ্যানকে অবলম্বন করে এই সাহিত্য গড়ে ওঠে বলেই এই নাম। যে কোনো ভাষাতেই আদিতে রচিত হয় কাব্য, কবিতা ও গান। কারণ সেগুলি মৌখিকভাবে শ্রুতি-পরম্পরায় প্রচারিত হতে পারে। বাংলা ভাষায় সপ্তদশ শতক পর্যন্ত গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গদ্যের প্রচলন হলেও সাহিত্য রচিত হয়নি সেই গদ্যে। চিঠি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজের কাজই সেই গদ্যে করা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুদ্রণযন্ত্রে বাংলা লেখা সম্ভব হল। প্রথমে উনিশ শতকের একেবারে শুরুতে

প্রচলিত রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল এর অনুবাদ— এগুলিই মুদ্রিত হত। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হল, প্রকাশিত হতে লাগল সাময়িক পত্রিকা। সাময়িকপত্রই আধুনিক কথাসাহিত্যের প্রথম সূচনা সম্ভব করে। পৃথিবীর সব ভাষাতেই তাই ঘটেছে। কথাসাহিত্যের অবলম্বন মানুষের বাস্তব জীবন। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে কথাশিল্পীরা সেই বাস্তবতাকে ভাষাশিল্পে ফুটিয়ে তুলতে শুরু করলেন।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হল 'আলালের ঘরের দুলাল'—লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র। শহর কলকাতার এক ধনীসন্তান কীভাবে কুসঙ্গে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল এবং পরে আবার ফিরে এল সৎপথে—তারই কাহিনি। বাস্তবতাগুণ উপন্যাসটিতে যতটা, শিল্পগুণ ততটা ছিল না। কিন্তু তার পর রেভারেন্ড লালবিহারী দে, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, এবং ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হ্যানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্স-এর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' নামে একটি অনুবাদমূলক উপন্যাসোপম রচনার স্তর পার হয়ে যথার্থ শিল্পগুণ-সমৃদ্ধ বাংলা উপন্যাস রচিত হল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক ও রোমান্সধর্মী উপন্যাসগুলিও বাস্তব এই অর্থে—মানবমনস্তত্ত্বের গহন রূপকে সূক্ষ্মভাবে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। মানুষের অভ্যন্তরমনের চেহারা সর্বযুগেই সমান। দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই বাঙালির মনের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের উদ্‌ভাসন অনুভব করা যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির এই স্বদেশিকতা বোধের উন্মেষ ও উদ্দীপনা ছিল এক গভীর বাস্তব। আর, সামাজিক উপন্যাসগুলিতে বিধবা নারীর সমাজবঞ্চিত জীবনের সমস্যা, বহুবিবাহের সংকট, বিষয়সম্পত্তিজনিত জটিলতার বাস্তবতা ফুটে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে এলেন রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালের দ্বিতীয় পর্বে বাঙালি পাঠকের হৃদয় জয় করে নিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে প্রধানত মানুষের হৃদয়দ্বন্দ্বের চিত্র। তবে 'গোরা', 'ঘরে বাইরে'-র মতো কোনো কোনো উপন্যাসে সেই হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের প্রবাহ বৃহৎ দেশকালের বাস্তবতার সঙ্গে এসে মিশেছে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ, দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তীকালে বাংলার গ্রাম ও শহরের জীবন-চিত্র পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়েছে।

সাহিত্যের ধারা সদাপ্রবহমান। সময়ের সঙ্গে সমান্তরাল তার গতি। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা সাহিত্যে এসেছেন বহু প্রতিভাবান সাহিত্যিক। তাঁদের লেখায় বিম্বিত হয়েছে সমকালীন জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই লেখকদের মধ্যে আছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত প্রমুখ অনেকেই। স্বাধীনতা-উত্তরকালেও বিভিন্ন বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা উপন্যাসের ভাণ্ডার। সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যার্থীরা এই উপন্যাসধারার পরিচয় পাবেন। এখানে বিশিষ্ট পঠনের জন্য কয়েকটি নির্বাচিত উপন্যাস প্রদত্ত হল।

১.২ ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে 'রাজসিংহ'

'রাজসিংহ', বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং তার 'পরিবর্ধিত, পুনর্লিখিত ও পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্ত' চতুর্থ সংস্করণের (১৮৯৩) পাঠই প্রকৃত প্রস্তাবে, লেখকের শেষ বৃহত্তম উপন্যাসরূপে চিহ্নিত। এখানে বিশেষভাবে বলা জরুরি যে 'রাজসিংহের' প্রথম সংস্করণ (১৮৮২) থেকে চতুর্থ সংস্করণ (১৮৯৩) পর্যন্ত,

লেখককৃত পরিবর্ধন ও পুনর্লিখন সংস্কারকর্মটি প্রসঙ্গে, অনেক সমালোচকই তত গুরুত্ব দেননি। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণে আচার্য যদুনাথ সরকার বা বঙ্কিমরচনাবলী ১ম খণ্ডের সাহিত্য সংসদ সংস্করণে, যোগেশচন্দ্র বাগল যেভাবে বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনটি যথাযথ বিশদরূপে আলোচনা করেন, তা নিশ্চয় সেই গুরুত্বেরই সমর্থনে। উক্ত চতুর্থ সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন' এ স্বয়ং লেখক প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে কী বোঝেন, তা যথাসম্ভব বিশদে স্পষ্ট করেই বলেছেন 'রাজসিংহ' পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাসংখ্যা পাঁচগুণ পরিবর্ধিত হয়ে হল ৪৩৪। না-বললেও চলে, বঙ্কিম এই উপন্যাসটি যে প্রায় পুরোটাই নতুন-করে লিখলেন— সেই পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও পুনর্লিখন প্রভৃতি প্রয়াসঘটিত পরিবর্তনেই, 'রাজসিংহ' প্রথম তিন সংস্করণের 'ক্ষুদ্রকথা' কীভাবে চতুর্থ সংস্করণের 'বৃহৎকথায়' উন্নীত হল এবং বঙ্কিম-কথিত, 'এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম', এহেন উক্তিও যে স্পষ্ট হল তা বলাই বাহুল্য।

বস্তুত বঙ্কিমের ইতিহাসচেতনা তথা জাতীয়চেতনা, হিন্দু-মুসলমানের মানবিক দোষগুণের উল্লেখ ও তাদের ধর্মাধর্ম-শাসিত সদস্য জীবনবোধ তাঁর 'প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অনুসন্ধানে স্বভাবতই তার প্রাকরণিক সমগ্রতার সমন্বয়ে লেখকের পূর্বাপর চেষ্টা, যথেষ্টই সচেতন ছিল বোঝা যায়। ইতিহাসের উদ্দেশ্য নির্ধারণে 'হিন্দুজাতির বাহুবল-এর' শৌর্যবীর্য, কীভাবে ঐতিহাসিক তথ্যসন্নিবেশের ফাঁক উপন্যাসেরই প্রার্থিত কল্পনাশক্তিতে পূরণ করার মহতী প্রয়াসে স্বয়ংসম্পূর্ণতা পায়, তা বঙ্কিম লিখেছেন :

> "যখন বাহুবল মাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।"
>
> "মূল ঘটনা, অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনই রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে। ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব-উন্নিসা, উর্দিপুরী, ইঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইঁহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যেসকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।....."
>
> —বঙ্কিমচন্দ্র, 'রাজসিংহ', চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন ১৮৯৩।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'য়, উপরোক্ত বঙ্কিম-কথিত উদ্ধৃতিটির প্রথম বাক্যটিতেই যে-সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তা অত্যন্ত দুঃখজনক। এস্থলে সমালোচকদের 'সন্দেহ' লেখকের 'প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্দেশ্য' সম্পর্কেই। শ্রীকুমারের মতে : 'রাজপুতদের বাহুবল প্রতিপাদন যদি রাজসিংহ-এ বঙ্কিমের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা উপন্যাসের প্রকৃত ভিত্তি হইতে পারে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহের অবসর আছে, কেন-না **এরূপ একটা সংকীর্ণ ও পক্ষপাতমূলক উদ্দেশ্য** ঠিক উচ্চতম আর্টের পক্ষে অনুকূল নহে।'

অত্যন্ত পরিতাপের কথা যে, সমালোচক 'রাজসিংহ' উপন্যাসের আপাতদৃষ্টিতে একটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ (trivial) বিষয়, তথা ঘটনা-উৎসের (দ্র. 'চিত্রে চরণ' রাজসিংহ, প্রথম পরিচ্ছেদ : তসবীরওয়ালী) শেষ পর্যন্ত মহাকাব্যোপম তথা মহত্তম (sublime) পরিণতিকেই— 'একটা সংকীর্ণ ও পক্ষপাতমূলক উদ্দেশ্য' বলে 'উচ্চতম আর্টের' পক্ষে অনুকূল নয় এই মন্তব্য করেন, তাতে এই মনে হয়, বঙ্কিম-কৃত 'রাজসিংহ'-এর চতুর্থ সংস্করণের মূল উদ্দেশ্য ও বক্তব্যেরই পরিপন্থী তিনি। অথচ এযাবৎ বঙ্কিমসাহিত্যের প্রায় সব সমালোচকই তো লেখক-বর্ণিত 'প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিষয়ের 'উদ্দেশ্য' ব্যাপারে সর্ববাদিসম্মত, সে-

সম্পর্কে প্রামাণ্য শীর্ষস্থানীয় দৃষ্টান্ত-নাম রবীন্দ্রনাথ। বলতে গেলে, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্র. 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর') ঠিকই বলেছেন : 'রবীন্দ্রনাথের আলোচনা এক্ষেত্রে পথ বেঁধে দিয়েছে।' বোঝা যায়, শ্রীকুমার সেই বাঁধাপথের পথিক নন। কিন্তু আমাদের বিস্ময় প্রধানত এই কারণে যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের 'রাজসিংহ' নামক প্রবন্ধটি (সাধনা, চৈত্র ১৩০০ পরে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থভুক্ত) এবং 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ('সাহিত্য'-গ্রন্থভুক্ত, আশ্বিন ১৩০৫) নামধেয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক রচনা দুটি সম্পর্কে কীভাবে তাঁর আলোচনায় সম্পূর্ণ নীরবতা পোষণ করলেন। কিন্তু ব্যাপারটি তো এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের উক্ত রচনা দুটি তাঁর চোখেই পড়েনি।

আসলে রবীন্দ্রনাথ যে 'ঐতিহাসিক রস' নামক একটি বিশেষ রসের কথা বলেন, যেখানে ঐতিহাসিক সিদ্ধরসের ব্যত্যয় না ঘটিয়ে, যে-কোনো মহৎ কাব্যে-নাট্যে-কথাসাহিত্যে, অপেক্ষাকৃত অপ্রধান ঘটনা-চরিত্র-পরিবেশ সৃষ্টিতে, কল্পনাশক্তির সঞ্চার দ্বারা সামগ্রিকভাবে ঐতিহাসিক রসেরই উত্তরোত্তর শিল্পোৎকর্ষ সূচিত হওয়ার কথা। এমনকী প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্রচিত্রণেও ইতিহাসের সিদ্ধরস চূর্ণ না করে, ইতিহাসের তথ্যঘটিত ফাঁকপূরণের জন্য কল্পনার আশ্রয়গ্রহণ চলতেই পারে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসে কাহিনির তীব্র গতিসম্পন্ন ঘটনাপ্রবাহে এতটাই অভিভূত বোধ করেছেন যে সেখানে ইতিহাসের সিদ্ধরসের উৎকর্ষসাধনে কল্পনার অবাধ মিশ্রণে স্বভাবতই ইতিহাস ও উপন্যাসের এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

১.৩ 'রাজসিংহ' উপন্যাসের গঠনে মহাকাব্য ও লোকপুরাণের প্রভাব

'রাজসিংহ' উপন্যাসের মহাকাব্যধর্মী গঠন, ঘটনার অনুপুঙ্খতার পরিবর্তে কেন তীব্র গতিসম্পন্ন দ্রুতসঞ্চারী নির্বিশেষ' ঘটনাপ্রবাহ রক্ষাতেই লেখকের সমস্ত শক্তি উজাড় করে দেওয়া হয়েছে, তার তুলনা ও বিচার হয়তো আমাদের আদি মহাকাব্যগুলিই হতে পারে না কি। যেমন, হোমার, বাল্মীকি, বেদব্যাস তাঁদের মহাকাব্যের অঙ্গীরস হিসেবে বীররস-কে একজন আর একজনের থেকে এতটাই স্বতন্ত্রভাবে আবাহন করেছেন যে তাঁদের পারস্পরিক প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যেরই নির্দেশক যেন তাঁদের মহাকাব্যগুলির বিচিত্রতর বিন্যাস ও রসপ্রস্থানসমূহ। কিন্তু তবু, একটি ব্যাপারে এঁদের মিল রয়েছে। আর সে মিলটুকু হল মহাকাব্যোচিত বীররসাশ্রয়ী কাহিনির মূল উৎসক্রম হিসেবে সেই এক একটি আপাতদৃষ্টি ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাবিশেষ, যার মূলেও এক একটি নারীপ্রতিমাই অগ্রাধিকার পায়। যেমন, হোমারে হেলেন, বাল্মীকিতে সীতা এবং বেদব্যাসে দ্রৌপদী। মহাকাব্যের অঙ্গীরস ও তদনুযায়ী তাদের প্রধান যুদ্ধব্যাপারের মূলেই যেন নারী। 'তুচ্ছ' ঘটনার সূত্রে, হয়তো 'মহতের' পূর্ণ বিকাশ ও বিস্ফোরণই এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

অনুরূপ তাৎপর্যেই স্মরণ হয়, আধুনিক ভারতেতিহাসে, অন্তত বঙ্কিমের উনিশ শতকীয় ইতিহাস-জিজ্ঞাসায়, তাঁর 'ভারত কলঙ্ক' নিবন্ধের সূত্রেই তিনি আমাদের নির্বীর্য জাতীয়চিত্তে, ''যখন বাহুবল মাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে'' বলেন। রবীন্দ্রনাথও এই প্রসঙ্গে বলবেন 'ইতিহাসের বিশেষ সত্য এবং সাহিত্যের নিত্য সত্য' সমন্বয়ের পথে যে সম্মিলন কামনা করে, তার কথা। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> 'আমাদের অলংকারে নয়টি মূলরসের নামোল্লেখ আছে কিন্তু অনেকগুলি অনির্বচনীয় মিশ্ররস আছে, অলংকার শাস্ত্রে তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই।

সেই সমস্ত অনির্দিষ্ট রসের মধ্যে একটিকে ঐতিহাসিক রস নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই রস মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ।'

—'ঐতিহাসিক উপন্যাস', সাহিত্য

সেই রসের উদ্দীপন বিভাব, আলোচ্য 'রাজসিংহ' উপন্যাসে রূপনগরের রাজা বিক্রম সোলাঙ্কির কন্যা চঞ্চলকুমারী। এই কন্যাকুমারীই যেন লোকপুরাণমথিত মালাহস্তে প্রতীক্ষ মানা তাঁর দেশনায়ক রাজসিংহের জন্য। রাজকন্যার ব্যক্তিগত প্রেমভালোবাসার আততি এখানে জাতীয় ইতিহাসের গৌরবগাথার উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদিত। কাজেই রাজসিংহ শুধু ঐতিহাসিক অংশেরই অন্যতম নায়ক নন, যেমন বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি তার মহাকাব্যোপম উপন্যাস-অংশেরও অবিংসবাদিত নায়কচরিত্র। এই সিদ্ধান্ত ব্যাপারে আমরা উপস্থিত 'বঙ্কিম সারণী'-খ্যাত সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে একমত। প্রমথনাথ বলেছেন : 'নায়ক বলবো কাকে? যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ছাড়া কাহিনী অচল হয়ে পড়ে, অবশ্যই সে নায়ক।' ঠিকই বলেছেন। আমরা লক্ষ্য করতে ভুলব না, **ইতিহাসের বিশেষ সত্যের সঙ্গে** (যেখানে হিন্দুজাতির বাহুবলমাত্র প্রতিপাদ্য) **সাহিত্যের নিত্য সত্যের মিলনাকাঙ্খাই** (জাতীয় বীর নায়ককে যেখানে পতিরূপে বরণের জন্য চঞ্চলকুমারী প্রতীক্ষমানা) অবশেষে পরিণয়ে প্রতিষ্ঠিত।

বস্তুত জনশ্রুতির ইতিহাস যখন মহাকাব্য, এবং মহাকাব্যই আবার লোকপুরাণ আর লোকশ্রুতির স্তরে নেমে-আসা মানবেতিহাসের শক্তি ও প্রেরণা, তখন, ইতিহাসের কাঠামোয় আর মহাকাব্যের গড়নে, কেমন-একটা উপকথার অন্তরঙ্গ সুর ঘনিয়ে ওঠে। যেমন, 'রাজসিংহ' উপন্যাসের শেষে। বঙ্কিম লিখেছেন :

> 'যুদ্ধান্তে জয়শ্রী বহন করিয়া বিক্রম সোলাঙ্কি রাজসিংহের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। রাজসিংহ তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। বিক্রম সোলাঙ্কি বলিলেন, "একটা কথা বাকি আছে। আমার **সেই কন্যাটা**।.....'
>
> —রাজসিংহ, অষ্টম খণ্ড, ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এখানে যুদ্ধশেষে যেন জয়শ্রীর প্রতীকী স্মরণমনন উপলক্ষেই জয়সিংহকে বিক্রমের মনে-করিয়ে দেওয়ার এই লৌকিক ধরনটি। অর্থাৎ যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে যে অপেক্ষামানা জয়শ্রীপ্রতিমা, বাকি-একটা কথা সেইটিই। অতএব, 'আমার সেই কন্যাটা'— যেন, বাপ তার বিনয়াবনত কন্যাদায়ের কথায়, কিছুটা প্রার্থীর প্রত্যাশা নিবেদন করছেন ভাষার নির্দেশক প্রত্যয় 'টা' যোগ করে। যুদ্ধের কাড়া-নাকাড়ার প্রভৃত শব্দাড়ম্বরের পর, 'সেই কন্যাটা', যেন মহাকাব্যের ভাষাসংরাগ (flair) থেকে কণ্ঠস্বর নেমে এসেছে উপকথার ঘরোয়া শেষকথায়।

১.৪ ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে রাজসিংহের গ্রহণযোগ্যতা

রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস, বঙ্কিম নিজে 'রাজসিংহ'-কে তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমরা বঙ্কিমের এই স্বীকৃতি তথা দাবি কতখানি যুক্তিসঙ্গত সে আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করে নেবার প্রয়াস পাব।

ঐতিহাসিক নাটক সর্বোপরি যেমন নাটক, ঐতিহাসিক উপন্যাসও সর্বোপরি উপন্যাস। তাই বলে ইতিহাস আর উপন্যাস কখনই এক নয়। ঐতিহাসিকের কাজ সত্য প্রতিষ্ঠা। নিরপেক্ষতা নীতি নিয়ে তাঁকে চলতে হয়। কোনপ্রকার পক্ষপাতিত্ব তাঁর সাজে না। ঐতিহাসিক মানুষের বিবর্তনের কথা বলেন। তবে মনে রাখা দরকার যে নিছক অতীতের ঘটনার বিবরণ দানই তাঁর একমাত্র কাজ নয়। এমনকি যা ঘটতে পারত, সম্ভাবনা ছিল, তার কথাও ইতিহাসবিদ বলেন।

অন্যদিকে উপন্যাসিক ইতিহাসের মর্ম উদ্‌ঘাটনে কিছুটা স্বাধীনতা গ্রহণ করেন। 'একটি নির্দিষ্ট কালের সত্যকে আবিষ্কার করেন মানব জীবনের তরঙ্গাক্ষুব্ধ ধারাবাহিকতায়।' ঐতিহাসিক তথ্যের বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁর স্বাধীনতা কম। কিন্তু উপন্যাসিক কখনই তথ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেন না। তথ্যকে স্বীকার করেই তিনি স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দেন। এ হল শিল্পীর স্বাধীনতা। উপন্যাসিক জীবন শিল্পী। সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

'উপন্যাসিকের সত্যবোধ এবং ঐতিহাসিকের সত্যনিষ্ঠা এ দুইয়ের মিলনেই সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম।'

উপন্যাসিক স্বাধীনতা ভোগ করেন, কিন্তু সে স্বাধীনতা অবিমিশ্র বা সীমাহীন নয়। প্রতি মুহূর্তেই তাঁকে গৃহীত আখ্যানের সঙ্গে সম্পৃক্ত চরিত্র বা ঘটনাবলীর তথ্য নিষ্ঠা রক্ষা করে চলতে হয়। তিনি ইচ্ছামত কোনো চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন না যা নাকি ইতিহাস সম্ভূত নয়। একদিকে ইতিহাসের হুবহু অনুবর্তন যেমন চলে না, তবে তো ইতিহাসই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারত, অন্যদিকে অবাধ কল্পনায় ইতিহাসকে পুরোপুরি অস্বীকার করার উপায়ও নেই তাঁর। প্রশ্ন হল উপন্যাসিক কি পর্যন্ত স্বাধীনতা ভোগ করেন; এককথায়, যে পর্যন্ত ইতিহাস বিরুদ্ধ না হয়। ইতিহাসে যে চরিত্র উল্লিখিত হয়নি, কিংবা যে ঘটনার কথা ইতিহাসে অনুল্লিখিত থেকে গেছে, উপন্যাসিক ইতিহাস সম্ভূতভাবে সেই অংশটিকে পূরণ করবেন তাঁর কল্পনা শক্তির সাহায্যে। অতএব ঐতিহাসিক সততা রক্ষা করে ইতিহাসনিষ্ঠভাবে কয়েকটি চরিত্র অঙ্কন করলেই কিংবা ইতিহাসসম্ভূত কয়েকটি ঘটনা পর পর উপস্থাপন করলেই তা ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করে না।

ঐতিহাসিক উপন্যাসেও মানব চরিত্র উপস্থাপিত হয়। এদের পরিচয় তো কেবল ইতিহাসের নিরিখেই নয়, রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে এসব চরিত্রেরও থাকে নিগূঢ় কামনা-বাসনা, সাফল্যে আনন্দ, অসাফল্যে বিষাদ—ঐতিহাসিক কেবল চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক ভূমিকা লক্ষ্য করেন, লক্ষ্য করেন না এদের মানবিক দিকগুলি—'the secrets of the human heart, whose motions are neglected by the historians.' কিন্তু 'The characters of a novel are forced to be more rational than historical characters.'

ফলত ঐতিহাসিকের কাছে ব্যক্তি চরিত্রের যে দিকগুলি গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হয়, উপন্যাসিক সেগুলির গুরুত্বকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন এবং সেইমত চরিত্র রূপায়িত করেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরিত্রগুলি এইভাবেই নানা আবেগ-অনুভূতির আধার রূপে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতীত-আনুগত্যের বিচারে ঐতিহাসিক ও উপন্যাসিকের ভূমিকা তুল্যমূল্য। ঐতিহাসিক যেখানে অতীতের তথ্যাবলীর নিরিখে কতকগুলি সাধারণ সত্যে উপনীত হন, উপন্যাসিক সেক্ষেত্রে সেইসব তথ্যাবলীর প্রতি যত্নবান থেকেও ঐতিহাসিক প্রদত্ত সাধারণ সত্যের রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হন। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস অনুরক্ত ছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই জানিয়েছেন—

'At College Bankim Chandra was a voracious reader of history, and he always longed to be a distinguished historian.'

বঙ্কিম ঐতিহাসিক হতে পারেননি সত্য, কিন্তু তাঁর ইতিহাস প্রীতি ও ইতিহাস পঠন-পাঠনের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন তাঁর রচিত উপন্যাসে ও প্রবন্ধাবলীতে। বস্তুতপক্ষে কাব্যের তুলনায় বঙ্কিমের ইতিহাসে আকর্ষণ ছিল অধিকতর। তিনি ইউরোপের ইতিহাস খুঁটিয়ে পড়েছিলেন। নবজাগরণের ইতিহাসও তাঁর আয়ত্তে ছিল। বাংলার একটি ইতিহাস রচনার জন্য তাঁর সবিশেষ আগ্রহ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস প্রীতি তথা ইতিহাস সচেতনতার পরিচয় মিলবে তাঁর উপন্যাসগুলিতেও। সাহিত্যসম্রাট মোট ১৪টি উপন্যাস রচনা করে বঙ্গ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। উল্লেখ্য এই ১৪টি উপন্যাসের মধ্যে ৮টি উপন্যাসেই ইতিহাস কথার অবতারণা করেছেন। এগুলি হল দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর, মৃণালিনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী, সীতারাম, রাজসিংহ। বঙ্কিমচন্দ্রের

প্রথম উপন্যাস Rajmohan's wife, ইংরেজিতে রচিত। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে Indian Field নামীয় সাপ্তাহিক পত্রিকায়।

প্রথম উপন্যাসের বিষয় ছিল বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক, Rajmohan's wife-এ ঐতিহাসিক রোমান্স ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই প্রথম উপন্যাস রচনায় সন্তুষ্ট হন নি তবে তিনি উপলধি করেছিলেন যে তাঁর সৃষ্টির বাহন গদ্য আর তাঁর প্রতিভার যথার্থ মুক্তি উপন্যাসে।

বঙ্কিমের অতীত সম্পর্কে আগ্রহ ছিল তীব্র। তিনি অতীতের বিস্মৃত অধ্যায়কে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াসী ছিলেন। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখা গেছে ঐতিহাসিক রোমান্স রচয়িতা রূপে। সমালোচকের উক্তিটি স্মরণ করে বলা যায়,

'পৌরাণিক ঋষি যেমন মন্দাকিনী ধারা এক নিমেষে পান করে নিয়ে পরে তাকে ভোগবতী ধারারূপে বইয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রও জহ্নুমুনির মতো ইতিহাস ধারাকে আপনার বশে এনে তাকে উপন্যাসের খাতে প্রবাহিত করেছেন।'[১]

'রাজসিংহ' প্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। প্রকাশকাল ১২৮৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র থেকে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস পর্যন্ত। অবশ্য বঙ্কিম এই সময় উপন্যাসটির রচনা শেষ করেননি, কেননা উপন্যাস চিত্রিত চরিত্রগুলি সমালোচিত হয়েছিল কারো কারো দ্বারা। শেষপর্যন্ত অবশ্য বঙ্কিম উপন্যাসটি শেষ করেন তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের আগ্রহাতিশয্যে। গ্রন্থাকারে আমরা 'রাজসিংহ' উপন্যাসটি পাই ১২৮৮ বঙ্গাব্দে।

বঙ্কিমচন্দ্র খেদ করে বলেছিলেন :

'আমরা গ্রীক ইতিহাস মুখস্থ করিয়া পড়ি—রাজসিংহের ইতিহাসের কিছুই জানি না।'[২] এজন্য অবশ্য তিনি তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাকে দায়ী করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু তার পূর্বে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হয়নি। তাঁর ভাষায় :

'হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণস্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি। মহারাষ্ট্রীয় অপেক্ষাও রাজপুত বাহুবলে বলবান ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।' রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিম রাজপুতদের বাহুবলকেই উপজীব্য করেছেন। তাঁর ভাষায় :

'যখন বাহুবল মাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।'

এইবার রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিম কি পরিমাণে ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন এবং কতখানি তাঁর ইতিহাস বিচ্যুতি ঘটেছে সেই আলোচনায় আমরা প্রয়াস পাব।

উপন্যাসে বর্ণিত রাজসিংহ, ঔরঙ্গজেব ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কিন্তু জেব-উন্নিসা-মবারক-দরিয়া এবং মানিকলাল-নির্মলকুমারীর প্রেমকাহিনি লেখকের স্বকপোলকল্পিত। জেব-উন্নিসা-মবারক দরিয়ার প্রেমকাহিনি কল্পিত হলেও জেব-উন্নিসা চরিত্রটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। রূপনগরের রাজকুমারীকে লেখক 'চঞ্চলকুমারী' বলে অভিহিত করেছেন। 'চঞ্চলকুমারী' নামটি লেখক প্রদত্ত। প্রকৃত নাম 'চারুমতী'। বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষীরূপে চিত্রিত করেছেন যোধপুরী বেগমকে (যোধপুর রাজকন্যা)। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল ঔরঙ্গজেব কোনো যোধপুর রাজকন্যার

[১]বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস : বিজিতকুমার দত্ত, ১৩৮৭ : পৃ: ৫৭।
[২]রাজসিংহ; পঞ্চম খণ্ড; ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পানিগ্রহণ করেননি। ঔরঙ্গজেবের একমাত্র হিন্দু পত্নী ছিলেন 'নবাব-বাঈ'। বঙ্কিমচন্দ্র জেবউন্নিসাকে ইন্দ্রিয় বিলাসিনী রূপে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু এটি অনৈতিহাসিক।

উপন্যাসের ৩য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে চঞ্চলকুমারী বলেছে—

'তুই কি মনে করেছিস্ যে, আমি দিল্লীতে গিয়া মুসলমান বানরের শয্যায় শয়ন করিব? হংসী কী বকের সেবা করে......দিল্লীর পথে বিষ খাইব?' এই বক্তব্যের সূত্রটি রয়ে গেছে টডের বর্ণনায় : 'The family priest (her preceptor) deemed his office honoured by being the messenger of her wishes, and the billet he conveyed is incorporated in the memorial of this reign. Is the swan to be the mate of the stork : a Rajpootni, pure in blood, to be wife to the monkey "faced barbarian!" Concluding with a threat of self destruction if not saved from dishonour.' (Annals & Antiquities of Rajasthan Vol. I, Chap XIII; Page 304-305)। উপন্যাসের ৭ম খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে এবং ৮ম খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে রাজপুত সৈন্য কর্তৃক ঔরঙ্গজেবের অন্তরীণ হওয়া এবং অনাহারের সম্মুখীন হয়ে শেষপর্যন্ত উর্দিপুরী বেগম বন্দিনী হবার পর তাঁর মুক্তিলাভের বিবরণও যথার্থ নয়। অবশ্য অর্মের (Orme) বিবরণে এরূপ ঘটনাই উল্লিখিত হয়েছে।

রন্ধ্রমধ্যে অন্তরীণ ঔরঙ্গজেবের শোচনীয় দুর্গতির চিত্র বঙ্কিম টডের পরিবর্তে অর্মের (Orme) অনুসরণে উপন্যাস মধ্যে উপস্থিত করেছেন। এক্ষেত্রে লেখকের অভিপ্রায় ছিল রাজসিংহের রণনৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন। টডের বর্ণনায় দেখি শাহজাদা আবার রাজপুত সৈন্যদের দ্বারা অন্তরীণ হয়ে সবিশেষ দুর্গতির সম্মুখীন হন :

Prince Akber advanced, "Not a soul interrupted his progress to the city. Palaces, gardens, lakes and isles, met his eye, but no living things all was silence." Akber enx camped......The allodial vassals of the mountains, with the Bhil auxiliaries, outstripped his retreat, and blocked up farther egress in one of those long extended valleys termed Nal, closed by a natural rampart or col, on which they formed abbaits of trees, and manning the crests on each side, hurled destruction on the foe; while the Prince, in like manner, blocked up the entrance and barred retrogression. Death menaced them in every form. For several days they had only the prosper of surrender to save them from famine and a justly increased foe, when an ill-judged humanity on the part of Jey Sing savea them from annihilation.'* (Ibid, Vol. I, Chap XIII; Page 309).

ঔরঙ্গজেব কর্তৃক রূপনগরের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণের অভিপ্রায় এবং দ্বিসহস্র মুঘল সৈন্যকে এই উদ্দেশ্যে রূপনগরে প্রেরণের বিষয়টি টডের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে মুঘলের পাণিগ্রহণে অনিচ্ছুক রূপনগরের রাজকুমারীর কুলপুরোহিতের মাধ্যমে রাজসিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে পত্র প্রেরণের বিষয় এবং তদনুযায়ী মহারাণা কর্তৃক স্বল্প সংখ্যক রাজপুত সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজকন্যার উদ্ধার সাধনের চমকপ্রদ বিবরণ :

The Mogul demanded the band of the Princess of Roopnagurh, a junior branch of

---

*টডের রাজস্থান ও বাঙালা সাহিত্য, বরুণকুমার চক্রবর্তী, পৃঃ ১৫৫

*টডের রাজস্থান ও বাঙালা সাহিত্য, বরুণকুমার চক্রবর্তী, পৃঃ ১৫৫-১৫৬

the Marwar house, and sent with the demand a cottage of two thousand horse to escort the fair to court. But the haughty Rajpootni, either indignant at such precipitation or charmed with the gallantry of the Rana, who had evinced his devotion to the fuir by measuring his sword with the head of her horse, rejected with disdain the proffered alliance, and, justified by brilliant precedents in the romantic history of her notion she entrusted her cause to the arm of the chief of the Rajpoot race, offering herself as the reward of protectia. The family priest deemed his office honoured by being the messenger of her wishes, and the billet he conveyed is incorporated in the memorial of this regin.'......with a chosen band he (রাজসিংহ) rapidly passed the fort of the Aravali and appeared before Roopnagurh, cut up the imperial guards, and bore off the prize to his capital.' (Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol. I, Chap XIII; Pages 304-305).

ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মহারাণা রাজসিংহ কর্তৃক রাজপুত সৈন্য সংস্থাপনের বিবরণ বঙ্কিম টডের বর্ণনানুসরণেই দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এর সত্যতা স্বীকৃত হয়নি। ঐতিহাসিক বক্তব্য হল—

'রূপকুমারীকে ঔরঙ্গজেব বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ আছে;' এমনকি রূপকুমারীর সঙ্গে রাজসিংহের বিবাহের দীর্ঘকাল পরে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে মহারাণার বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল বলে সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। বঙ্কিম রাজসিংহকে সপ্তদশ শতাব্দীর সের রূপে অভিহিত করেছেন। এই উপমা দানের ক্ষেত্রেও তিনি টডের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কারণ টডও রাজসিংহকে 'Xerxes of Hindusthan' বলে অভিহিত করেছেন। উপন্যাসের ৭ম খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে লেখক ঔরঙ্গজেবের সৈন্যোদ্যোগের যে বিবরণ প্রদান করেছেন, তাও টডের বর্ণনানুগত। শাহআলম, আজমশাহ, আকবরশাহ প্রভৃতি পুত্রদের সেনানায়কত্বে ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধযাত্রার বিবরণ দান প্রসঙ্গে টড বলেছেন :

'Akber was recalled from his Province, Bengal, Azim from the distant Cabul; and even Mauzum (the Mogul's heir) from the war in the Dekhan with this farmidable array the emperor entered Mewar.' (Ibid; Page 308).

ঔরঙ্গজেব কর্তৃক দোবারি, দয়েলবারা এবং নয়ন— এই তিনটি গিরিপথের মধ্যে প্রথমটিতে উপস্থিত হয়ে স্বয়ং 'উদয়সাগর' নামে বিখ্যাত সরোবরের তীরে শিবির সংস্থাপন পূর্বক শাহজাদা আকবরকে পঞ্চদশ সহস্র সৈনাসহ মেবারে প্রেরণের বিবরণ টডের গ্রন্থেও মেলে :

'Arungzeb advanced to Dobarri, but instead of entering the valley of which it was the gorge, be halted, and by the advice of Tyber Khan sent on Prince Akber with fifty thousand men to the capital.' (Annals & Antiquities of Rajasthan; Vol. I, Chap XIII; Page 308).

'Towards the plains east, it has three practicable passes; one, the more norther, by Dailwarra; the other (central) by Dabarri, a third, leading to the intricacies of chuppun

---

টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য; পৃঃ ১৫৬-১৫৭

টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য; পৃঃ ১৫৭

টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য; পৃঃ ১৫৭-১৫৮

that of Naen, of these three passes the emperor chose the most practicable, and encamped near the Oody-Sagar lake, on the left of its entrance."[১]

বিক্রম সোলাঙ্কি এবং গোপীনাথ রাঠোর কর্তৃক মুঘল সেনাপতি দিলীর খাঁকে পরাজিত করার যে বিবরণ ৮ম খণ্ডের ১৫শ পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হয়েছে, তার সমর্থনও টডের বর্ণনাতে মেলে—

'Another body of the imperialists under the celebrated Delhire Khan, who entered by the Daisoori Pass from Marwar (Probably with a view of extricating Prince Akber), were allowed to advance unopposed, and when in the long intricate gorge were assailed by Bikram Solanki and Gopinath Rahtore (both nobles of Mewar), and after a desperate conflict entierely destroyed.'[২] (Ibid; Page 310)

৮ম খণ্ডের ১৬শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঔরঙ্গজেব ও আজিমের চিতোরে আশ্রয় গ্রহণ, রাজপুত সেনাপতি সুবল দাসের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য খাঁ রহিলার অধীনে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য রেখে ঔরঙ্গজেবের আজমীরে পলায়ন, কুমার ভীমসিংহের মুঘলের অধিকারভুক্ত গুজরাটে প্রবেশ, রাজমন্ত্রী দয়াল শাহ কর্তৃক কাজিদের মস্তক মুণ্ডন এবং কূপ মধ্যে কোরান নিক্ষেপের বিবরণাদিসমুহ টডের গ্রন্থ থেকেই সংগৃহীত।

টড মহারাণা রাজসিংহ প্রসঙ্গে বলেছেন যে তিনি সমগ্র হিন্দুসমাজের মুখপাত্র স্বরূপ ঔরঙ্গজেব কর্তৃক জিজিয়াকর প্রবর্তনের বিরুধে তীব্র প্রতিবাদ করে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু স্যার যদুনাথ সরকার উপযুক্ত তথ্যসহ প্রমাণ করেছেন যে জিজিয়াকর প্রবর্তনের বিরুধে প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করেছিলেন মারাঠা বীর শিবাজী। যদুনাথ টড কথিত ঔরঙ্গজেবের উদ্দেশে রাজসিংহ লিখিত পত্র সম্ভবধে বলেছেন—

The London M. S. ascribes its authorship to Shivaji the Calcutta M. S. to Sambhaji, and Tod to Maharana Raj Singh. Now as the tax is spoken of as recently imposed and the Emperor's war with the writer as a thing of some duration, we can safely leave out Sambhaji. then, at the end of it the writer defies Aurangzib to levy the tax from "the chief of the Hindus", this person could not have been Rajah Ram Singh of Jaipur, first because the HIndus know of no Prince of nobler birth than the Maharana of Udaipur, descendant of Rana, and secondly because the House of Jaipur has ever been loyal to the paramount power and would not have disobeyed an imperial mandate to pay Jazea on the other hand; Aurangzib in making peace with the Maharana tacitly agreed to exempt his country from Jazia (Orme's Fragments, P. 165). Hence the conclusion of the letter is really a taunt flung at Aurangzib. The writer, therefore, somebody other than Raj Singh, i.e., he must have been Shivaji. The internal evidance, too, is very strong in favour of a dreaded ravager of Mughal territory and a ruler of universel toleration, such as Shivaji undoubtedly.'

অতএব এরপর মহারাণা রাজসিংহ সম্বন্ধে টডের উক্তি—

'his dignified letter of remonstrance to Aurangzib on the promulgation of the capitation elict, places him high in the scale of moral as well as intellectual excellence'—

[১]টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য; পৃঃ ১৫৮

[২]টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য; পৃঃ ১৫৮

অর্থহীন বলে প্রমাণিত হয়। টড ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রাজসিংহের বিরোধের অন্যতম কারণরূপে জিজিয়াকর সম্পর্কিত তাঁর প্রেরিত চিঠিটির উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও 'রাজসিংহ' উপন্যাস রচনায় এই বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন লক্ষ করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস। ফলত কিছু স্বাধীনতা তাঁর থাকবেই। যোগ্যতার সঙ্গেই তিনি তার সদ্ব্যবহার করেছেন। শেষপর্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে ফলশ্রুতি ইতিহাস রস, বঙ্কিম অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গেই সেই ইতিহাস রস পরিবেশন করেছেন। তাই সফল ঐতিহাসিক উপন্যাসের শিরোপা প্রাপ্য 'রাজসিংহ'-এর।

১.৫ রাজসিংহ উপন্যাসের নায়ক বিচার

'রাজসিংহ' উপন্যাসের নায়ক বিচারের পূর্বে নায়ক সম্পর্কে আমরা একটা স্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারি। লেখক তাঁর অন্বিষ্টের সন্ধান লাভ করেন তাঁরই চিত্রিত নায়কের সহায়তায়। নায়ক বলতে আমরা তাকেই বুঝি যে বা যিনি আখ্যানের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। নায়কের মাধ্যমেই আখ্যান সম্পৃক্ত লক্ষ্য ও ভাবনা প্রকাশ পায়। উপন্যাসের মূল চালিকাশক্তি নায়ক। নায়ক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যান্য চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করে তোলে। উপন্যাসিকের জীবন বোধের প্রকাশ ঘটে নায়কের মাধ্যমে, অন্যদিকে উপন্যাসের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয় নায়ক চরিত্রের সক্রিয়তা অথবা নিষ্ক্রিয়তার প্রেক্ষিতে। বলা যায় আখ্যানে নায়ক হল হারের লকেটের মতো—'The Central gem in a necklace'.

এইবার 'রাজসিংহ' উপন্যাসের নায়ক প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশের নায়ক তিনজন বলে জানিয়েছেন, এরা বলেন রাজসিংহ, ঔরঙ্গজেব ও বিধাতাপুরুষ। অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রূপে ঔরঙ্গজেবকে মনে করেছেন। বঙ্কিম-কল্পনায় বিধাতাপুরুষ অনুপস্থিত। তাহলে রবীন্দ্রনাথের বিচার মতো দুটি চরিত্র অবশিষ্ট থাকে একজন রাজসিংহ অন্যজন ঔরঙ্গজেব। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তও প্রধান চরিত্র রূপে ঔরঙ্গজেবের দাবিকে মেনে নিয়েছেন। তাহলে বিতর্ক দুজনেই সীমাবদ্ধ—নায়ক ঔরঙ্গজেব না রাজসিংহ।

উপন্যাসটির নামকরণ করা হয়েছে রাজসিংহ। যেমন বঙ্কিম দেবীচৌধুরানী, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, সীতারাম, ইন্দিরা প্রভৃতি উপন্যাসের নামকরণ প্রধান বা কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামানুসারে করেছেন। অন্ততপক্ষে লেখক যে রাজসিংহকেই নায়ক পদে বসিয়েছেন সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। যদি ঔরঙ্গজেবকেই লেখক গুরুত্ব দেবেন, তবে উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে এই চরিত্রটি অনুপস্থিত ছিল কেন? বঙ্কিমের জীবদ্দশায় উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং এই সংস্করণে দেখা গেল ঔরঙ্গজেব বিশেষ গুরুত্ব সহ রূপায়িত হয়েছেন।

এবারে বঙ্কিমের বক্তব্য উদ্ধার করা যাক, দেখা যাচ্ছে উপন্যাসের প্রতিপাদ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

'অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে, হিন্দু হোক মুসলমান হোক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই, হিন্দু হোক মুসলমান হোক, সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্মশূন্য, তাই তাহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্মিক, এইজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত ও পরাস্ত করিয়াছিলেন।'

উপন্যাসের আর একটি প্রতিপাদ্যের কথা বলেছেন বঙ্কিম—তা হল হিন্দুরাও বাহুবলে বলীয়ান ছিল—'হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণস্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি। মহারাষ্ট্রীয় অপেক্ষাও রাজপুত বাহুবলে বলীয়ান ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।'

তাহলে বঙ্কিম কথিত উপন্যাসের দুটি প্রতিপাদ্যই রাজসিংহকে উপজীব্য করেছে। এইবার উপন্যাসের মধ্যে রাজসিংহের ভূমিকা কতখানি সক্রিয় ছিল এবং কতখানি তার বিস্তার ঘটেছিল সে পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের মূল ঘটনা চঞ্চলকুমারীকে নিয়ে রাজসিংহের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের বিরোধ। এই বিরোধের মূলধন যুগিয়েছিলেন রাজসিংহ। তিনি যদি চঞ্চলকুমারীর আহ্বানে সাড়া না দিতেন, রূপনগরে মাত্র একশত জন রাজপুত সৈন্য নিয়ে হাজির হয়ে দুই সহস্রাধিক মুগল সৈন্যকে পর্যুদস্ত করে চঞ্চলকুমারীকে উদ্ধার না করতেন, তাহলে মুগলদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ সৃষ্টি হত না। শুধু তাই নয়, শেষপর্যন্ত রাজসিংহের কূটকৌশল ও রণবিদ্যায় স্বয়ং ঔরঙ্গজেব-সহ অন্যান্য মুগল সেনানায়ক, নবাবপুত্র এবং মুগল সৈন্যদের যে শোচনীয় বিপর্যয় ঘটেছিল তাও সম্ভব হত না। যে চঞ্চলকুমারীকে নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত, শেষপর্যন্ত তাঁকেই রাণা রাজসিংহ মহিষীরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন।

উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে মানিকলাল। দস্যু মানিকলাল যে শেষপর্যন্ত নির্ভরশীল রাজপুত সৈন্যের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করল, মূলত: তার অবলম্বিত কৌশলেই মুগলদের বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে দেখা দিল, তার জন্য সমস্ত কৃতিত্বও রাজসিংহেরই প্রাপ্য। যদি রাজসিংহ মানিকলালকে ক্ষমা প্রদর্শন না করতেন, তার প্রাণ ভিক্ষার আবেদন রক্ষা না করতেন, তবে মানিকলালের মৃত্যু ঘটত নিশ্চিতভাবে। মানিকলালের অনুপস্থিতিতে রাজপুত সৈন্যের বিজয় অভিযান কতখানি সার্থকতা লাভ করত, সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে সন্দেহ থেকে যেত।

ক্ষুব্ধ ঔরঙ্গজেব যখন জিজিয়াকর প্রবর্তন করলেন এমনকি অন্যায়ভাবে রাজসিংহের অধিকারভুক্ত রাজ্যেও তা কার্যকর করতে মনস্থ করলেন, তখন রাজসিংহ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করেন সম্রাটের কাছে। এই পত্র ঔরঙ্গজেবের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল।

উপন্যাসে ঔরঙ্গজেবের ভূমিকা সীমিত পরিসরে উপস্থাপিত। উর্দিপুরীর আজ্ঞাবহ হয়ে রূপনগরের রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থী হয়েছেন। অকারণে রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন এবং পর্যুদস্ত হয়েছেন। রাজসিংহের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছেন। দূতরূপে আগত মানিকলাল এবং তাঁর জামাতা মবারককের সঙ্গে দ্বিচারিতা করেছেন। ইতিপূর্বে কন্যা জেবউন্নিসার প্ররোচনায় নিজ ভগ্নীর হত্যাসাধন করেছেন এবং মবারকের নিশ্চিত মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছেন। উপন্যাসে ঔরঙ্গজেবের কোনো উজ্জ্বল ভাবমূর্তি পরিস্ফুট হয়নি। বরং তাঁকে দেখেছি অগ্রজের পত্নী উর্দিপুরীকে নিজের বেগমে পরিণত করতে যে ভগিনীর সহায়তায় তিনি সিংহাসন লাভের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেন, তাঁকে মৃত্যু কবলিত করেন। ঔরঙ্গজেবের শাসন ক্রিয়ার পরিচয় উপন্যাসে প্রায় অনুপস্থিত। একমাত্র নির্মলকুমারীর সঙ্গে আচরণে তাঁর রক্তমাংসের মানুষের পরিচয়টুকু প্রকাশিত হয়েছে। অতএব উভয়ের মধ্যে তুলনায় রাজসিংহেরই নায়ক পদে দাবি স্বীকৃত হয়।

১.৬ রাজসিংহ উপন্যাসের উপকাহিনি

'রাজসিংহ' উপন্যাসের উপকাহিনিটি গড়ে উঠেছে মবারক-জেবউন্নিসা-দরিয়া বিবিকে নিয়ে। লেখক ত্রিভুজ প্রেমের আখ্যান তৈরি করেছেন। এর মধ্যে একমাত্র ঐতিহাসিক চরিত্র জেবউন্নিসা, বাকি দুটি অর্থাৎ মবারক এবং দরিয়া বিবি কাল্পনিক। উপকাহিনিটির আলোচনা করার পূর্বে উপন্যাসে উপকাহিনি সংযোজনের গুরুত্ব কি একটু দেখে নেওয়া যাক।

ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Plot, তা হল কাহিনি, আর Sub-plot হল উপকাহিনি। কাহিনি বা প্লটকে সমৃদ্ধ করতে উপকাহিনি কল্পিত ও সংযোজিত হয়। উপন্যাসিককে সতর্ক থাকতে হয় যেন কোনক্রমে কাহিনির তুলনায়

উপকাহিনি অধিকতর গুরুত্ব না পায়, কিংবা অধিকতর গুরুত্বশীল না হয়ে ওঠে। গৃহকর্ত্রীর সহায়তার জন্য নিয়োজিত পরিচারিকা যদি গৃহকর্ত্রীর গুরুত্ব ও ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যায়, তবে তা গৃহকর্ত্রীর পক্ষে যেমন অবমাননাকর, তেমনিই পরিবারের পক্ষেও তা অগৌরবের। তেমনিই উপকাহিনির সার্থকতা কাহিনির সৌন্দর্য ও গৌরব বৃদ্ধিতে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণে। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের মূল আখ্যান চঞ্চলকুমারী-রাজসিংহ-ঔরঙ্গজেবকে কেন্দ্র করে গঠিত। এটি ঐতিহাসিক অংশও বটে। অপরপক্ষে জেবউন্নিসা-মবারক-দরিয়া এদের নিয়েই মানবিক আখ্যানটি রচিত। তাই বলে উপকাহিনিটি মূল আখ্যান বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়।

দরিয়া মবারকের প্রেমে পাগল। কিন্তু মবারকের আকর্ষণ জেবউন্নিসার প্রতি। মবারক প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ করে জেবউন্নিসাকে, তার বিনিময়ে সে অর্থ পায়। আর এই সুবাদে বাদশাহের অন্তঃপুরে তার প্রবেশাধিকার স্বীকৃত। দরিয়া বোঝে মবারক জেবউন্নিসার প্রতি আকৃষ্ট। তাই সে তাকে চোখে চোখে রাখতে চায়। জেবউন্নিসা তার নর্মক্রীড়ার সহচর রূপে মবারককে দেখে। মবারক জেবউন্নিসার রূপৈশ্বর্যে পাগল। সে চায় জেবউন্নিসাকে বিবাহ করতে, নিছক অনৈতিক নর্মক্রীড়ায় তার অনীহা। জেবউন্নিসা কিন্তু উন্নাসিক। সাধারণ একজন মনসবদার মবারক, বাদশাহজাদীর পক্ষে তাকে বিবাহ করা সম্ভব নয়। বরং সে তাকে সাবধান করে দিয়েছে ভবিষ্যতে যেন মবারক এমনতর প্রস্তাব আর না দেয়। মবারক না পারে জেবউন্নিসাকে জীবনসঙ্গিনী রূপে পেতে, না পারে তাকে ত্যাগ করতে। কারণ সেক্ষেত্রে তার প্রাণ সংশয় সুনিশ্চিত।

ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটে যায়। রাজসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়ে মবারকের প্রাণ সংশয় হয়। সে এক কূপমধ্যে পতিত হয়। দরিয়া তার ছায়াসঙ্গিনী রূপে যুদ্ধক্ষেত্রেও হাজির হয়, সেই কূপ থেকে অতিকষ্টে মবারককে উদ্ধার করে। এরপর মবারক ও দরিয়া সুখে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘকাল মবারকের অদর্শনে চঞ্চল হয়ে পড়ে জেবউন্নিসা। সে লোক পাঠায় মবারকের কাছে। তবুও মবারক উপস্থিত হয় না। পিতা ঔরঙ্গজেবের কাছে মবারকের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনি বলে তাকে হত্যার প্ররোচনা দেয় সে। প্রতিহিংসায় তার অন্তর তখন জ্বলছে। ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে সর্প দংশনে মৃত্যু বরণ করে মবারক। তাকে কবর দেওয়া হয়। মবারকের মৃত্যু সংবাদে ব্যথিত হয় জেবউন্নিসা, ব্যবস্থা নেয় মৃতদেহ কবর থেকে তুলে এনে উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে। কিন্তু তার পূর্বেই মানিকলাল মবারকের দেহ বের করে নিয়ে সুচিকিৎসায় তাকে বাঁচিয়ে তোলে। এরপর রাজসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ঔরঙ্গজেব, তাঁর পুত্রাদি, কন্যা ও বেগমাদিসহ অন্তরীণ হয়ে পড়েন। অন্তরীণ অবস্থাতেই জেবউন্নিসার সঙ্গে মবারকের সাক্ষাৎ ঘটে। এমনকি তারা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যুদ্ধে সন্ধি হয়। সন্ধির অন্যতম শর্তানুসারে ঔরঙ্গজেব জেবউন্নিসা ও জামাতা মবারককে ক্ষমা প্রদর্শনে সম্মত হন। দিল্লি প্রত্যাবর্তন করে ঔরঙ্গজেব মবারকের পদোন্নতি ঘটান। কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে যুদ্ধে প্রেরণ করে যেমন করেই হোক তার মৃত্যুকে সুনিশ্চিত করেন। মবারকের মৃত্যু হয় পাগলিনী দরিয়ার হাতে। উপকাহিনিটির সব থেকে বড় আকর্ষণ এটির মানবিক গুণ। বিশেষত জেবউন্নিসা মবারকের আখ্যানটির মানবিক গুণ উচ্চাঙ্গের। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের অনুসরণে বলা যায়

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

মবারক চেয়েছিল অকৃত্রিমভাবে জেবউন্নিসাকে, কিন্তু উন্নাসিক, আকেন্দ্রিক অহংকারে স্ফীত জেবউন্নিসা মবারকের প্রেমের ডাককে উপেক্ষা করেছে। অপরপক্ষে দরিয়াকে সে সহজেই পেয়েছিল, দরিয়া ছিল মবারকগত প্রাণ। মবারকের প্রেমে সে আকণ্ঠ নিমজ্জিতা। কিন্তু বেচারি মবারকের মন পায়নি। জেবউন্নিসা পরে তার ভুল বুঝেছিল। বুঝেছিল ভালবাসার ক্ষেত্রে গরিব আর শাহজাদীর কোনো পার্থক্য নেই। লেখক অনুশোচনার অনলে

দগ্ধ করে জেবউন্নিসার যথার্থ প্রেমোপলব্ধির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু বুঝল যখন সে, তখন বড় দেরি হয়ে গেছে, সর্বোপরি ঔরঙ্গজেবের বিরোধিতায় তার কাঙ্ক্ষিত দাম্পত্য জীবন অধরাই রয়ে গেল। তবু জেবউন্নিসার অকল্পনীয় পরিবর্তন আমাদের চমৎকৃত করে। তেমনিই দুঃখাবহ ঘটনা হতভাগিনী দরিয়ার উন্মাদিনীতে পর্যবসিত হওয়া, তার প্রেমের শোচনীয় ব্যর্থতা তার প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল করে তোলে।

ঐতিহাসিক ঘটনার ঘনঘটায়, বিশেষত যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ মধ্যে এই ত্রিভুজ প্রেমকাহিনিটি বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে, মূল আখ্যানকে সমৃদ্ধ করেছে, সর্বোপরি ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ কিংবা মানিকলালের মতো চরিত্রগুলির পরিস্ফুটনেও সহায়তা করেছে।

১.৭ রাজসিংহ উপন্যাসের নায়িকা বিচার

'রাজসিংহ' উপন্যাসের নায়িকা সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ নেই বললেই চলে। নায়িকার দাবিদার দু'জন হতে পারেন, একজন ঔরঙ্গজেব-দুহিতা জেবউন্নিসা, অপরজন রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী। আমরা ইতিপূর্বেকার আলোচনায় উপন্যাসের নায়করূপে রাজসিংহকে চিহ্নিত করেছি। চঞ্চলকুমারীকে কেন্দ্র করে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রাজসিংহের বিরোধ বেঁধেছে। এই বিরোধে শেষপর্যন্ত মোগলরা পর্যুদস্ত হয়েছে, ঔরঙ্গজেব বাধ্য হয়েছেন রাজসিংহের সঙ্গে সন্ধি করতে, চঞ্চলকুমারীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে, তিনি মোগলদের হাতে পড়েননি, পড়ার পূর্বে তাঁকে আত্মবিসর্জনের পথ অবলম্বন করতে হয়নি। শুধু তাই নয়, উপন্যাসের সূচনাতেই তসবীরওয়ালীর প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে যেটিকে তিনি অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, সেই রাজসিংহ একদিকে যেমন তাঁর রক্ষাকর্তা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তেমনিই চঞ্চলকুমারীর অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর পাণিগ্রহণে সম্মত হয়েছেন। তাই বলে রাজসিংহের মনোনীত মহিষীরূপে তিনি নায়িকা রূপে স্বীকৃতি পেতে পারেন না। বরং সে তুলনায় জেবউন্নিসার এ ব্যাপারে দাবি অনেক বেশি যুক্তিসম্মত ও বলিষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথও জেবউন্নিসাকে উপন্যাস অংশের নায়িকা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। উপন্যাস অংশ বলতে জেবউন্নিসা—মবারক ও দরিয়ার আখ্যান। এ আখ্যানে চঞ্চলকুমারী অনুপস্থিত। শুধু তাই নয় চঞ্চলকুমারী এবং জেবউন্নিসা এই দুই নারী চরিত্রের তুলনা করলেও জেবউন্নিসার দাবিই স্বীকৃত হবে। চারিত্রিক সততা, আত্মমর্যাদাবোধ ইত্যাদির নিরিখে নিঃসন্দেহে চঞ্চলকুমারীর স্থান জেবউন্নিসার উপরে। কিন্তু উপন্যাসে তো চারিত্রিক সততা কিংবা নৈতিকতার নিরিখে নায়ক-নায়িকার ভূমিকা নিরূপিত হয় না, সে ভূমিকা নিরূপিত হয় তাদের সক্রিয়তার নিরিখে, আখ্যানকে পরিচালিত তথা গতিময়তায় তাদের দানের নিরিখে। প্রথমেই স্বীকার করতে হয় যে জেবউন্নিসা চরিত্রটি অত্যন্ত বর্ণাঢ্য, Colourful। পাঠককে সহজেই সে চরিত্রটি আকৃষ্ট করে। ঔরঙ্গজেবের এই কন্যাটি অনূঢ়া, অপরূপা, অসাধারণ বুদ্ধিমতী, কূটকৌশলে অদ্বিতীয়া, এমনকি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপেও তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সর্বোপরি তিনি বিলাসী, মদ্যপায়ী, প্রতিহিংসাপরায়ণা, চতুরা। এতগুলি বিশেষণ যাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, স্বভাবতই তিনি যে বহুমাত্রিক এক চরিত্র, তার আর বলার অপেক্ষা রাখে না। জেবউন্নিসা চরিত্রের বিস্তারিত আলোচনা আমরা অন্যত্র করেছি। এখানে নায়িকা হিসাবে তার দাবির যৌক্তিকতাই নিরূপিত হবে।

মূলত জেবউন্নিসার পরামর্শেই উর্দিপুরী বেগম ঔরঙ্গজেবের কাছে আবদার জানিয়েছেন তাঁর রূপনগরের রাজকন্যাকে চাই, তাঁর তামাক সেজে দেবেন। ঔরঙ্গজেবও উর্দিপুরী বেগমকে সন্তুষ্ট করতেই চঞ্চলকুমারীকে চেয়ে বসেছেন আর সেই উপলক্ষ্যেই রাজসিংহের সঙ্গে মোগলদের বিরোধের সূচনা, পরিণতিতে ঔরঙ্গজেবের পরাজয় এবং রাজসিংহের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন। সমগ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসের মধ্যে যদি কারো চরিত্রের আনুপূর্বিক

বিবর্তন ঘটে থাকে, তবে তা জেবউন্নিসার। যে জেবউন্নিসাকে আমরা দেখেছি চরম উন্নাসিক অহংকারী রূপে, যিনি মনে করেন নৈতিকতা কেবল দরিদ্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যিনি বিশ্বাস করেন শাহজাদীরা একগামী প্রেমে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, যিনি তাঁর প্রেমিক মবারক তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে ঘৃণা ভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন সামান্য একজন মনসবদার বলে, আবার সেই সঙ্গেই নৈতিকতার দোহাই দিয়ে তাঁর সঙ্গে অবৈধ দেহ সম্ভোগে মিলিত হতে অস্বীকৃত হলে প্রাণনাশের হুমকি দেন, বাস্তবেও যিনি ঔরঙ্গজেবের মাধ্যমে মবারকের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন, সেই তাঁকেই দেখা গেছে মবারকের মৃত্যু সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়তে। সর্প দংশনে মৃত মবারককে পুনর্জীবিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। মবারকের বিচ্ছেদ বেদনায় তাঁকে কাতরা দেখা গেছে। যথার্থ প্রেমের স্বাদ পেয়েছেন তিনি। উপলধি করেছেন এতদিন তিনি যে জীবন দর্শনের দ্বারা চালিত হয়েছেন তা ভুল।

জেবউন্নিসার অনুশোচনা এবং তাঁর মানসিক পরিবর্তনের কিছু পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

'জাহান্নাম মানি নাই, বেহেস্তও মানি নাই; খোদাও জানিতাম না, দীনও জানিতাম না। কেবল ভোগবিলাসই জানিতাম। আল্লা রহিম! তুমি কেন ঐশ্বর্য দিয়াছিলে? ঐশ্বর্যেই আমার জীবন বিষময় হইল।'

জেবউন্নিসা বিলাপ করেছেন :

'......অবলীলাক্রমে আমি, যে আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তাহাকে ভুজঙ্গ দংশনে প্রেরণ করিলাম। এমন কেহ নাই কি যে, আমাকে তেমনই বিষধর সাপ আনিয়া দেয়! হয় সাপ, নয় মবারক।'

মবারককে দেখে জেবউন্নিসা তার পায়ে পড়েছেন। স্বীকার করেছেন—

'আমি ঐশ্বর্যের গৌরবে পাগল হইয়াছিলাম। আমি আজ শপথ করিয়া ঐশ্বর্য ত্যাগ করিলাম—তুমি যদি আমায় ক্ষমা কর, আমি আর দিল্লী ফিরিয়া যাইব না।.....আমি তোমার নিকট শপথ করিতেছি যে, আর দিল্লী যাইতে চাহিব না; আলমগীর বাদশাহের রঙমহলে আর প্রবেশ করিব না। আমি শাহজাদা বিবাহ করিতে চাহি না। তোমার সঙ্গে যাইব।'

বঙ্কিম মন্তব্য করেছেন, 'জেবউন্নিসা বুঝিয়াছে যে, বাদশাহজাদীও নারী, বাদশাহজাদীর হৃদয়ও নারীর হৃদয়; স্নেহশূন্য নারী হৃদয়, জনশূন্য নদীমাত্র কোন বালুকাময় অথবা জলশূন্য তাড়াগো মত—কেবল পঙ্কময়।'

জেবউন্নিসার কারণেই দরিয়া-মবারকের সুখী দাম্পত্য জীবন অকালে নিঃশেষিত হয়েছে। যে মবারক বারংবার অপমানিত হয়েছে এমনকি জেবউন্নিসার কারণে মৃত্যুবরণও করতে হয়েছে তাকে, তবু সেই জেবউন্নিসাকে দেখামাত্রই পুনরায় তার প্রেমে সে উদ্বেল হয়েছে। সর্বোপরি, অন্তরাল থেকে ঔরঙ্গজেবকে পরিচালনা করেছেন জেবউন্নিসা, প্রধান Politician, মোগল সাম্রাজ্যের নিয়ামক নক্ষত্র, সর্বোপরি মোগল রঙমহলের সর্বকর্ত্রী। তাই নায়িকার দাবি তাঁরই।

১.৮ রাজসিংহ চরিত্র

বঙ্কিমচন্দ্রের খেদোক্তি—'আমরা গ্রীক ইতিহাস মুখস্থ করিয়া মরি—রাজসিংহের ইতিহাসের কিছুই জানি না।' তিনি আরও বলেছেন, 'হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণস্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।' অতএব উপন্যাসে রাজসিংহের প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে যে তাঁর বাহুবলকেই লেখক বিশেষ গুরুত্ব দেবেন তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু নিছক বাহুবলে বলীয়ান কোনো ব্যক্তি ইতিহাসে স্মরণীয় হতে পারেন? মূলত মোগলদের সঙ্গে রাজসিংহের যুধ উপন্যাসের সিংহভাগ অধিকার করে আছে। আর সেই সূত্রেই রাজসিংহের সাহসিকতা, সমরকুশলতা,

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, মানবিকতা, স্বাজাত্যবোধ প্রভৃতি গুণগুলির প্রকাশ ঘটতে দেখি।

তসবীরওয়ালীর কাছ থেকে রাণা রাজসিংহের ছবিখানি দেখে চঞ্চলকুমারীর মন্তব্য 'বীরপুরুষ'। যোধপুরী বেগমও অভিমত প্রকাশ করেছেন—উদয়পুরের রাণা বীরপুরুষ। শুধু তাই নয় তাঁর অভিমত, 'একদিকে শিবাজী, আর একদিকে রাজসিংহ অস্ত্র ধরেন, তবে দিল্লীর সিংহাসন কয়দিন টিকিবে?' অনন্ত মিশ্রের আক্রমণকারীদের একজন দস্যু খেদ প্রকাশ করে বলেছেন, 'তাঁহার শাসনে বীরপুরুষে আর অন্ন করিয়া খাইতে পারে না।' এখানে 'বীরপুরুষ' বলতে দস্যুদের ইঙ্গিত করা হয়েছে, আর 'তাঁহার' সর্বনামটি প্রযুক্ত হয়েছে রাজসিংহ প্রসঙ্গে। মোদ্দা কথা রাণা রাজসিংহের সুশাসন এখানে স্বীকৃত হয়েছে।

বণিকবেশী দস্যুদের দ্বারা অনন্ত মিশ্র আক্রান্ত হয়েছেন। পর্বত শীর্ষ দেশ থেকে তা লক্ষ করে রাজসিংহ নিষ্ক্রিয় থাকেননি। দ্রুত অনন্ত মিশ্রের কাছে উপস্থিত হয়ে সংক্ষেপে ঘটনারাজি অবগত হয়েছেন এবং তারপর দস্যুদের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। পর্বততলস্থিত গুহা সমীপে উপনীত হয়ে ভিতরে মানুষের কণ্ঠ শুনে প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নিতে চেয়েছেন তারাই দস্যু কিনা, নতুবা তাঁর হাতে নিরপরাধীর হত্যা সাধিত হবে। কথাবার্তা সঙ্গোপনে শুনে যখন নিশ্চিত হয়েছেন গুহাভাণ্ডারের মানুষজন দস্যু, তখন যে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চারজনকে একাকী তিনি মোকাবিলা করেছেন, তাতে বিস্মিত হতে হয়।

'দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়াছিল। প্রবেশ করিয়া রাজপুত দৃঢ় মুষ্টিধৃত তরবারি দলপতির মস্তকে আঘাত করিলেন। তাঁহার হস্তে এত বল যে, এক আঘাতেই মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। সেই মুহূর্তেই দ্বিতীয় একজন দস্যু, যে দলপতির কাছে বসিয়াছিল, তাহার দিকে ফিরিয়া রাজপুত তাহার মস্তকে এরূপ কঠিন পদাঘাত করিলেন যে, সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। রাজপুত অন্য দুইজনের উপর দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, একজন গুহাপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য একখণ্ড প্রস্তর তুলিতেছে। রাজপুত তাহাকে লক্ষ করিয়া পিস্তল উঠাইলেন, সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মানিকলাল, বেগতিক দেখিয়া, গুহাদ্বার পথে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।'

মানিকলাল বনমধ্যে রাজসিংহের লুকিয়ে রাখা বর্শাটি পেয়ে গিয়ে তার দ্বারা আক্রমণের চেষ্টা করলে রাজসিংহ হাতের খালি পিস্তল মানিকলালের ডান হাতের মুঠো লক্ষ্য করে এমন সজোরে নিক্ষেপ করলেন যে তার হাতের বর্শা খসে পড়ল। কি নিপুণ লক্ষ্যভেদ। এরপরই মানিকলালের মাথার চুল ধরে তার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হলেন। মানিকলাল কাতরভাবে জানাল—'আমার জীবনদান করুন—রক্ষা করুন—আমি শরণাগত'।

চঞ্চলকুমারী ইতঃপূর্বে রাজসিংহ সম্পর্কে তার মনোভাব ব্যক্ত করে বলেছিল, 'ইনি অগতির গতি, অনাথের রক্ষক', এক্ষেত্রে রাজসিংহকে দেখি শরণাগতের প্রতি ক্ষমাশীল রূপে। তাই বলে পুরো ক্ষমা তিনি করেননি, তার প্রাণ সংহার তিনি করেননি ঠিকই, কিন্তু ব্রাহ্মণের বহ্মস্ব হরণ করার শাস্তি দানে তাঁর দৃঢ়তার কথা জানিয়েছেন, কেননা তা না হলে তিনি রাজধর্মে পতিত হবেন। মানিকলালের মাতৃহীনা কন্যার কথা জেনে রাজসিংহ তার প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও রাজকর্তব্য পালনে বিচ্যুত হননি। মানিকলাল নিজের আঙুল কেটে নিজস্ব পাপের শাস্তি নিজেই নিয়েছে। রাজসিংহ মানিকলালকে তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত করেছেন। উদয়পুরে গিয়ে তাকে বসবাসের কথা বলেছেন, তাকে ভূমি দেবেন বলেও জানিয়েছেন।

রাজসিংহ অত্যন্ত সাহসী এবং শরণাগতকে রক্ষার জন্য নিবেদিত প্রাণ। চঞ্চলকুমারীর পত্রে রাজসিংহ অবহিত হলেন দুই সহস্র মোগল সৈন্য তাকে দিল্লি নিয়ে যেতে উপস্থিত হচ্ছে, চঞ্চলকুমারী অনুরোধ জানিয়েছিলেন মোগলদের হাত থেকে তাকে যেন তিনি রক্ষা করেন। চঞ্চলকুমারীর অনুরোধ রক্ষার্থে মাত্র একশত রাজপুত সৈন্যসহ রূপনগর অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি মানিকলালকে একটি গুরুতর দায়িত্ব পালন করতে বলেন—মোগল

সৈন্যের ছদ্মবেশে মোগলদের সঙ্গে মিশে গিয়ে চঞ্চলকুমারীর কাছে কাছে যেন থাকে, উদ্দেশ্য তাঁকে রক্ষা করা। কেননা রাজকন্যাকে আগে বাঁচিয়ে তবেই যুধ্ব করা চাই। যুধ্বক্ষেত্রে রাজকন্যা থাকলে তিনি আহত হতে পারেন, তাই তাঁকে প্রথমেই রক্ষা করা চাই। যথার্থ পরিণামদর্শীর সিদ্ধান্ত। রাজসিংহ দুঃসাধ্য এবং বিপদপূর্ণ কার্যে আকৃষ্ট হতেন। চঞ্চলকুমারীর আবেদনে সাড়া দিয়ে দুই সহস্র মোগল সৈন্যের মোকাবিলা করতে মাত্র একশত রাজপুত সৈন্যসহ রূপনগর অভিযান তাঁর সেই দুঃসাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার উপযুক্ত প্রমাণ।

রাজসিংহ ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই প্রজারক্ষক। ছদ্মবেশে তিনি স্বচক্ষে প্রজাদের অবস্থা নিরীক্ষণ করতেন। স্বহস্তে তাদের দুঃখ নিবারণ করতেন আর সেইজন্য 'তাঁহার রাজ্যে প্রজা অত্যন্ত সুখী হইয়া উঠিয়াছিল।' রাজসিংহের রসবোধের পরিচয় পাই যখন মানিকলাল জানায় সে ঠকিয়ে ঘোড়া ও অস্ত্র সংগ্রহ করবে, তখন তার মন্তব্য, 'যুধ্বকালে সকলেই চোর—সকলেই প্রবঞ্চক। আমিও বাদশাহের বেগম চুরি করিতে আসিয়াছি—চোরের মতো লুকাইয়া আছি।'

বঙ্কিম মন্তব্য করেছেন, 'রাজসিংহ রাজনীতিতে ও যুধ্বনীতিতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত।' আরও বলেছেন, 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে যত রণপণ্ডিতের কথা আছে, রাজসিংহ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন। ইউরোপেও এরূপ রণপণ্ডিত অতি অল্পই জন্মিয়াছিল।'—আমরা এইবার রাজসিংহের এই রণপাণ্ডিত্যের পরিচয় নেব। বস্তুতপক্ষে মুষ্টিমেয় রাজপুত সৈন্যের সাহায্যে রাজসিংহ যে বিশাল সংখ্যক মোগলবাহিনির মোকাবিলা করেছিলেন এবং সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তার মূলে ছিল তাঁর এই রণনৈপুণ্য।

রূপনগরে রাজসিংহ অবলম্বিত কৌশলটি ছিল এইরূপ—

'দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পর্বত অতি উচ্চ এবং দুরারোহণীয়—তাতে শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া পথ অন্ধকার করিয়াছে। রাজপুতেরা তাহার প্রদেশান্তরে অনুসন্ধান করিয়া পথ বাহির করিয়া, পঞ্চাশজন তাহার উপর উঠিয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছিল। এক এক জন অপরের চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরে স্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া, আপন আপন সম্মুখে একটি ঢিপি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে পলকে পলকে পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ খণ্ডশিলা নিম্নস্থ অশ্বারোহীদিগের উপর বৃষ্টি করিতেছিল। এক একবারে পঞ্চাশটি অশ্ব বা অশ্বারোহী আহত বা নিহত হইতেছিল।' বলাবাহুল্য এই আহত ও নিহতরা সকলেই মোগল সৈন্যদলভুক্ত।

ক্ষুব্ধ ঔরঙ্গজেব রাজসিংহের রাজ্য ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে উপযুক্ত প্রস্তুতি সহ উপস্থিত হলেন। সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আলম, অন্য পুত্র আজম শাহ, অপর পুত্র আকব্বর শাহ। উদ্দেশ্য, পৃথিবী থেকে উদয়পুরের নাম বিলুপ্ত করা। রাজসিংহের কৌশলে ঔরঙ্গজেব এবং তাবৎ মোগল সৈন্য রন্ধ্রপথে প্রবেশ করে। তাদের অবস্থা হল পিঞ্জরাবন্ধ বৃষিকের মতো। বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনানুসরণে—

'রাজসিংহের কামান ডাকিল। বৃক্ষপ্রাকার লঙ্ঘিত করিয়া রাজসিংহের গোলা ছুটিল—হস্তী, অশ্ব, পত্তি, সেনাপতি সব চূর্ণ হইয়া গেল। মোগল সেনা রন্ধ্রমধ্যে হটিয়া গিয়া ক্রূর সর্প যেমন অগ্নিভয়ে কুণ্ডলী করিয়া বিবরে লুকায়, মোগল সেনা রন্ধ্রবিবরে সেইরূপ লুকাইল। শাহন্‌শাহ বাদশাহ, হীরকমণ্ডিত শ্বেত উষ্ণীবে মস্তক হইতে খুলিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া জানু পাতিয়া, পর্বতের কাঁকর তুলিয়া আপনার মাথায় দিলেন।' শেষপর্যন্ত ঔরঙ্গজেব রাজসিংহের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। সন্ধি করার ব্যাপারেও রাজসিংহের পরিণামদর্শিতা লক্ষ্য করার। তাঁর পরামর্শদাতারা অনেকেই ঔরঙ্গজেবকে উচিত মতো শাস্তিদানের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু রাজসিংহ জানালেন ঔরঙ্গজেব এবং তাঁর উপস্থিত সৈন্যগণ মরলেই মোগল নিঃশেষিত হবে না। ঔরঙ্গজেবের পর বাদশাহ হবেন শাহ আলম। সব মোগল সৈন্য নিঃশেষ করা কখনই সম্ভব হবে না। একদিন অবশ্যই সন্ধি স্থাপন করতে হবে। যদি তাই হয় তবে ঔরঙ্গজেবের প্রাণ যখন কণ্ঠাগত, তখনই সন্ধি করার আদর্শ সময়।

রাজসিংহের দূরদর্শিতার আরও পরিচয় লভ্য। তিনি জানতেন মোগলের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ অনিবার্য। তখন চঞ্চলকুমারীর পিতা বিক্রম সোলাঙ্কির সামরিক সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন হবে। তাই চঞ্চলকুমারীকে বিবাহ করার অনুমতি তিনি বিক্রম সোলাঙ্কির কাছে যাচ্ঞা করার ওপর জোর দিয়েছিলেন। 'তাঁহার অনুমতি লইয়া বিবাহ না করিলে তিনি কখনও আমার সহায় হইবেন না। বরং তাঁর অমতে বিবাহ করিলে তিনি মোগলের সহায় এবং আমার শত্রু হইতে পারেন।'

রাজসিংহের ক্ষেত্র বিশেষে শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় মেলে। রূপবতী ভার্যা শত্রু স্বরূপ, কেননা শাস্ত্রের মতে—

ঋণকারী পিতা শত্রুর্মা চ ব্যাভিচারিণী।

ভার্য্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুঃ পণ্ডিতঃ॥

রাজসিংহ পরিহাস করে বলেছেন রূপবতী ভার্যার প্রতি অত্যধিক আসক্ত হওয়ায় রাজার রাজকার্যের ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা।

রাজসিংহ অত্যন্ত বিবেচক এবং আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। সেই কারণেই চঞ্চলকুমারীকে মোগল সেনাদের হাত থেকে রক্ষা করে তাকে পিতার কাছে প্রেরণ করে রাজধর্ম পালন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। চঞ্চলকুমারী জানিয়েছেন যে সেক্ষেত্রে তাঁকে আত্মঘাতিনী হতে হবে। রাজসিংহের মনে সংশয় ছিল যে, চঞ্চলকুমারী বিপদে পড়ে তাঁকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। বিপন্মুক্তি ঘটার পরও তাঁর পূর্বের ইচ্ছা জাগরিত আছে কিনা সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর মতো বয়সের মানুষকে চঞ্চলকুমারী অন্তরের সঙ্গে পতিপদে বরণ করবেন কিনা, চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে কথাবার্তায় সেই সংশয় দূর হলে তিনি তাকে রাজমহিষীরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হন। অর্থাৎ রূপবতী চঞ্চলকুমারীকে দেখেই রাজসিংহ লোলুপ হয়ে পড়েননি তাঁকে ভোগ করার জন্য। নানা গুণে ভূষিত রাজসিংহ চরিত্রটি বাস্তবিকই পাঠকের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম বোধের উদ্রেক করে।

১.৯ ঔরঙ্গজেব

'রাজসিংহ' উপন্যাসের ১ম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে চঞ্চলকুমারী ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

'বদ্‌জাতের ধাড়ি', আরও বলেছেন, 'অমন পাষণ্ড যে আর পৃথিবীতে জন্মে নাই।' মোগলদের সঙ্গে রাজপুতের বিরোধ সর্বজনপরিচিত। অতএব সেই রাজপুতদের মুখপাত্র স্বরূপ রূপনগরের রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীর ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে এমনতর মন্তব্য স্বাভাবিক। ইতিহাসেও ঔরঙ্গজেবকে আমরা খুব শ্রদ্ধাস্পদ, অশেষ গুণাবলীর আধার রূপে পাই না।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের ঔরঙ্গজেব সম্পর্কিত মূল্যায়ন প্রসঙ্গত স্মরণীয় : 'ঔরঙ্গজীবের কতকগুলি গুণ ছিল বটে, কিন্তু দোষগুলি ততোধিক এবং দেশের পক্ষে, মানবের পক্ষে, স্বজাতির পক্ষে মারাত্মক।' ইতিহাস জানায় ঔরঙ্গজেব পিতার বিরোধিতা করেছেন, তাঁকে অন্তরীণ রেখেছেন, ক্ষমতাচ্যুত করেছেন। নিজের ভ্রাতাদের হত্যা করেছেন। নিজে গোঁড়া সুন্নী ছিলেন তাই একদিকে শিয়া অন্যদিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা করে গেছেন। জিজিয়া কর প্রবর্তন তার অন্যতম প্রমাণ। ঔরঙ্গজেব কাউকেই বিশ্বাস করতেন না। ছিলেন চরম আত্মকেন্দ্রিক। কপটতা ছিল তাঁর মজ্জায় মজ্জায়। নিষ্ঠুরতা ও দাম্ভিকতা তাঁর নানা আচরণেই প্রকাশ পেয়েছে। ধূর্ততা তাঁর ক্ষমতা লাভের ছিল প্রধান হাতিয়ার। তবে উপন্যাসে আমরা ঔরঙ্গজেবের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাই না, আখ্যানের প্রয়োজনে লেখক তাঁকে সীমিত পরিসরে উপস্থাপিত করেছেন। আমরা উপন্যাসে ঔরঙ্গজেবকে

কিরূপে পাই সেই বিষয়েই বিশেষভাবে মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখব।

সম্রাট সাজাহানকে পদচ্যুত ও অবরুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ঔরঙ্গজেবের প্রধান সহায় ছিলেন তাঁর ভগিনী রৌশিন্নারা। ঔরঙ্গজেব স্বভাবতই এই ভগিনীর বড় বাধ্য ছিলেন। বঙ্কিম বর্ণনা করেছেন, 'ঔরঙ্গজেবের বাদশাহীতে রৌশিন্নারা দ্বিতীয় বাদশাহ ছিলেন' মদন মন্দিরে ঔরঙ্গজেব দুহিতা জেবউন্নিসা এবং ভগিনী রৌশিন্নারা অনেক সময়ে প্রতিযোগিনী হয়ে উঠতেন পরস্পরের। ভাইঝি পিতৃসমীপে পিসি সম্পর্কে অনুযোগ করলেন, পরিণামে 'রৌশিন্নারা পৃথিবী হইতে অদৃশ্যা হইলেন'। এর পেছনে জেবউন্নিসার প্ররোচনা থাকলেও ভগিনীকে পৃথিবী থেকে সরানোর ব্যাপারে যে ঔরঙ্গজেবেরই সক্রিয় ভূমিকা ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বঙ্কিম ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : 'বুদ্ধিমান, কর্মদক্ষ, পরিশ্রমী এবং অন্যান্য রাজগুণে গুণবান ছিলেন। এই সকল অসাধারণ গুণ থাকিতেও সেই জগৎপ্রথিতনামা রাজাধিরাজ, আপনার জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্য একপ্রকার ধ্বংস করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন। ইহার একমাত্র কারণ, ঔরঙ্গজেব মহা পাপিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধূর্ত, কপটাচারী, পাপে সঙ্কোচশূন্য, স্বার্থপর, পরপীড়ক, প্রজাপীড়ক দুই একজন মাত্র পাওয়া যায়। এই কপটচারী সম্রাট্ জিতেন্দ্রিয়তার ভাণ করিতেন—কিন্তু অন্তঃপুর অসংখ্য সুন্দরী রাজিতে মধুমক্ষিকা পরিপূর্ণ মধুচক্রের ন্যায় দিবারাত্র আনন্দধ্বনিতে ধ্বনিত হইত। তাঁহার মহিষীও অসংখ্য আর সবার বিধানের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্যা বেতনভোগিনী বিলাসিনীও অসংখ্য।

ঔরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম। কিন্তু ইনি তাঁর প্রেয়সী ছিলেন না। প্রেয়সী মহিষী ছিলেন উর্দিপুরী বেগম। ঔরঙ্গজেবের অগ্রজ দারা একে এক দাস ব্যবসায়ীর কাছে ক্রয় করেছিলেন। দারাকে হত্যা করেন ঔরঙ্গজেব। দারার পত্নী উর্দিপুরীকে তিনি কোরাণের বচন উধৃত করে বিবাহ করেন। জেবউন্নিসার প্ররোচনায় উর্দিপুরী প্রার্থনা জানান রূপনগরের রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীকে তাঁর চাই, তাঁর তামাক সাজার জন্য। অতএব ঔরঙ্গজেব চতুরতার সঙ্গে নির্দেশ জারি করলেন চঞ্চলকুমারীর পাণিগ্রহণ করবেন তিনি, রূপনগরের রাওসাহেবের সৎস্বভাব ও রাজভক্তিকে পুরস্কৃত করার জন্য। সেইসঙ্গে চঞ্চলকুমারীর রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণে যে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন, সেকথা জানাতেও ভুললেন না। প্রেরিত হ'ল দু'হাজার মোগল সৈন্য রূপনগরে, ভাবী বেগম সাহেবকে দিল্লি আনার জন্য। কিন্তু রাজসিংহের কারণে ঔরঙ্গজেবের ইচ্ছাপূরণ হল না। ঔরঙ্গজেব নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হলেন। বঙ্কিম বলেছেন, 'ঔরঙ্গজেব কাহারও উপর রাগ সহ্য করিবার লোক নহেন। হিন্দুদের অনিষ্ট করিতে তাঁহার জন্ম, হিন্দুর অপরাধ বিশেষ অসহ্য।' রাজসিংহের অপরাধে সমস্ত হিন্দুজাতিকে পীড়িত করতে চাইলেন তিনি। নির্দেশ দিলেন রাজপুতানার রাজপুতেরাও জিজিয়া কর দেবে। উল্লেখ্য, রাজপুতানার প্রজারা কিন্তু মোগল সম্রাটের অধীন ছিল না, তবু হিন্দু বলেই তাদের উপর এই দণ্ডাজ্ঞা জারি হল। রাজসিংহ জিজিয়া দিলেন না। তিনি জিজিয়ার বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজেবকে পত্র দিলেন। ঔরঙ্গজেবের ক্রোধ দ্বিগুণিত হল। ঔরঙ্গজেব জিজিয়া প্রত্যাহার তো করলেনই না, উপরন্তু রাজ্যে গো হত্যা করার দাবি জানালেন, জানালেন দেবালয়গুলি ভাঙতে হবে। প্রতিহিংসা পরায়ণতার নির্লজ্জ প্রকাশ দেখা গেল। ঔরঙ্গজেব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলেন।

রাজসিংহের জিজিয়া করের বিরুদ্ধে লিখিতপত্র সম্রাটের কাছে নিয়ে যাওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। কারণ দূত অবধ্য, কিন্তু ঔরঙ্গজেব অনেক দূতকেই বধ করেছিলেন নীতি নিয়মের তোয়াক্কা না করেই।

পত্র অবশেষে মানিকলাল নিয়ে গেল সম্রাট সমীপে। প্রকাশ্যে ঔরঙ্গজেব তার উত্তম বাসস্থানের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু দরবার থেকে উঠে এসেই তাকে বধ করার আজ্ঞা দিলেন।

নির্মলকুমারী যেভাবে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আচরণ করেছে, কথা বলেছে তাতে ঔরঙ্গজেবের আত্মমর্যাদাবোধ ধূলায় লুটিয়েছে। নির্মলকুমারী সম্রাটকে বলেছে, 'এখনই তোমার মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব।'

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য একটি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, ঔরঙ্গজেবের মনে হয়েছে নির্মলকুমারী এক অমূল্য রত্ন, তাকে নষ্ট করা হবে না, তাকে তিনি বশীভূত করবেন। তাকে তিনি হিন্দুবাদীদের পাক করা আহার্য ও পানীয় দেবার নির্দেশ দিলেন। প্রায়ই সম্রাট নির্মলকুমারীর সঙ্গে কথোপকথনে মিলিত হতেন। উদ্দেশ্য রাজসিংহের রাজকীয় অবস্থাঘটিত সংবাদ গ্রহণ, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য তার সহায়তায় জীবিতাবস্থায় চঞ্চলকুমারীকে আনিয়ে নিজ ইচ্ছাপূরণ। ঔরঙ্গজেব জেবউন্নিসাকে নির্দেশ দিলেন নির্মলকুমারীকে আয়ত্ত করতে। নিজেও সম্রাট তার সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করতেন। বস্তুতপক্ষে চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে আচরণ ঔরঙ্গজেবের রক্তমাংসের সত্তাকে প্রতিপাদন করছে, 'এ জন্মে কেবল তোমাকেই ভালবাসিয়াছি।' তাঁর স্নেহশূন্য হৃদয় উন্মোচিত। জেবউন্নিসার প্ররোচনায় সর্প দংশনে মবারকের মৃত্যু যেভাবে ঘটানো হয়েছে, তাতে ঔরঙ্গজেবের নিষ্ঠুরতা প্রমাণিত হয়। তাঁর কন্যা যে দুশ্চরিত্রা, সেজন্য তার কোনও শাস্তি হল না।

রাজসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ঔরঙ্গজেব যেভাবে পর্যুদস্ত হয়েছেন, তাতে তাঁর শৌর্যবীর্য অপ্রকাশিতই থেকে গেছে। উপন্যাসের বর্ণনানুযায়ী—

'দিল্লীর বাদশাহ রাজপুত ভুঁইঞার নিকট সসৈন্যে পিঞ্জরাবদ্ধ মূষিক।' শেষপর্যন্ত রাজসিংহের সঙ্গে তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। এমনকি বিপাকে পড়ে জেবউন্নিসা ও মবারককে ক্ষমা করতেও সম্মত হলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এরা দুজনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল।

পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেবের আসল স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। আমদরবারে বসে তিনি ঘোষণা করেছেন :

আমরা কাঠুরিয়ার ফাঁদে পড়িয়াই সন্ধি স্থাপন করিয়াছি। সে সন্ধি রক্ষণীয় নহে। ক্ষুদ্র একজন ভুঁইঞা রাজার সঙ্গে বাদশাহের আবার সন্ধি কি? আমি সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি।' ঔরঙ্গজেব কথা রক্ষা করবেন না, সন্ধির কোনো মর্যাদা তাঁর কাছে ছিল না।

সবশেষে, জেবউন্নিসা ও মবারকের প্রতি তাঁর আচরণের প্রসঙ্গ। রাজসিংহের সঙ্গে তাঁর সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ঔরঙ্গজেব জেবউন্নিসা ও মবারককে ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি মবারকের মৃত্যুর ব্যবস্থা করেন। দিলীর খাঁকে লেখেন, মবারক খাঁকে দুই হাজার মন্‌সবদার করে প্রেরণ করছেন, সে যেন একদিনও জীবিত না থাকে। যুদ্ধে মরে ভালই, নইলে অন্য প্রকারে যেন তার মৃত্যুর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু মুখে মবারককে তিনি বলেন, 'এক্ষণে তোমার সকল অপরাধ আমি মার্জনা করিলাম। কেন না, তুমি আমার জামাতা। আমার জামাতাকে নীচ পদে নিযুক্ত রাখিতে পারি না। অতএব তোমাকে দুই হাজারের মন্‌সবদার করিলাম। পরওয়ানা আজি বাহির হইবে।' মবারক ঠিক চিনত ঔরঙ্গজেবকে, তাই সে তাঁর আদর যে শুভকর নয় জানত। ঔরঙ্গজেবের কূট অভিনয় ও দ্বিচারিতার এর থেকে ভাল দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে?

১.১০ জেব-উন্নিসা

জেব-উন্নিসা ঔরঙ্গজেবের কন্যা। তিনকন্যার মধ্যে ইনি ছিলেন জ্যেষ্ঠা। অপর দুই ভগ্নির বিবাহ হলেও জেব-উন্নিসা ছিলেন অনূঢ়া। তাঁর সম্পর্কে বঙ্কিমের বিবরণ, '......বসন্তের ভ্রমরের মতো পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।' জেব-উন্নিসা ছিলেন যেমন ইন্দ্রিয়পরবশ তেমনি ভোগবিলাসপরায়ণা। তাছাড়া তাঁর আর একটি পরিচয়, তিনি ছিলেন রাজনীতিবিশারদ। বঙ্কিমের বর্ণনানুযায়ী, 'মোগল সাম্রাজ্যরূপ জাহাজের হাল, একপ্রকার তাঁর হাতে। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের 'নিয়ামক নক্ষত্র' বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন।' রাজনীতির তাগিদেই

জেব-উন্নিসা সারা ভারতবর্ষের কোথায় কি হচ্ছে সব গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতেন। সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য তিনি নিজস্ব কিছু লোককে নিযুক্ত করেছিলেন।

জেব-উন্নিসা ছিলেন রঙমহলের সর্বময়কর্ত্রী। প্রতিহারী, খোজা, বাঁদী, দৌবারিক, বাহক, পাচক সকলেই ছিল তাঁর অধীন। তিনি ইচ্ছামত কাউকে মহলে আসতে দিতেন। মূলত এরা ছিল এর সংবাদদাতা বা সংবাদবিক্রেতা নতুবা তাঁর প্রণয়ভাজন।

জেব-উন্নিসা বয়সে প্রৌঢ়া হলেও সুন্দরী ছিলেন। তিনি ছিলেন মদ্যপায়ী ও উচ্ছৃঙ্খল। মবারক তাঁর অন্যতম এক প্রণয়ভাজন। সময়কালে কিন্তু তিনি বিবাহে সম্মত ছিলেন না। এ ব্যাপারে তাঁর আভিজাত্যবোধ ছিল প্রখর—বাদশাহজাদীরা শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ করে না। অতএব সামান্য দুই শতী মনসবদার মবারক কখনই তাঁর স্বামী হতে পারে না, প্রণয়ভাজন হতে বাধা নেই। জেব-উন্নিসা সচেতনভাবেই ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাসমতো বাদশাহজাদীরা কখনই হিন্দু বামুনের মেয়ে কিংবা রাজপুতের মেয়ের মতো চিরকাল একজন স্বামীর দাসত্ব করতে প্রস্তুত নন। খোদাতালার পাপপুণ্যের ব্যবস্থা কেবল ছোটলোকদের জন্য, কাফেরদের জন্য। বোঝা যায় জেব-উন্নিসা নৈতিকতার ধার ধারতেন না। দেহ সম্ভোগের ক্ষেত্রে কোনো নীতি মানতে প্রস্তুত নন। অতএব মবারক তার ভোগলালসা চরিতার্থতার উপাদান মাত্র, তার বেশি কিছু সে নয়।

জেব-উন্নিসা অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ। যার ওপর তিনি অপ্রসন্ন হতেন এক দণ্ডেই তার জীবনহানি ঘটত। স্পষ্টতই জেবউন্নিসার সংসর্গ ত্যাগ করা মবারকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি ছিলেন মোগল রাজ্যের সর্বেসর্বা। ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত ছিলেন তাঁর আজ্ঞাকারী। অতএব পাপিষ্ঠা বলে জেব-উন্নিসাকে ত্যাগ করলে নিশ্চিত মৃত্যু তার। সঙ্গত কারণেই জেব-উন্নিসার সঙ্গে ব্যাঘ্রীর তুলনা করা হয়েছে। এবং তার অসাধ্য যে কিছু ছিল না তাও ঠিক। জেব-উন্নিসা কতখানি বুদ্ধিমতী ছিলেন তার পরিচয় মেলে দরিয়ার কাছ থেকে রূপনগরের রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীর পা দিয়ে ঔরঙ্গজেবের তসবির ভাঙার ঘটনা শুনে চঞ্চলকুমারীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তি বিধানের জন্য ঔরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগমের সহায়তা গ্রহণে। উর্দিপুরী যখন মদ্যপানে প্রায় বিলুপ্তচেতন, তখন জেবউন্নিসা তাকে বলে গেছেন ঔরঙ্গজেবের কাছে প্রার্থনা জানাতে—রূপনগরের রাজকুমারীকে এনে দিতে হবে তাঁর তামাক সেজে দেবার জন্য। ঔরঙ্গজেবও এই আবদারে সম্মত হলেন। শুরু হল রূপনগরের সঙ্গে মোগলদের বিরোধ। এখন প্রশ্ন কেন জেব-উন্নিসা চঞ্চলকুমারীকে ধরে আনার ব্যাপারে বেশিরকম উদ্যোগী হলেন? নিজেই তিনি তার উত্তর দিয়েছেন, 'উর্দিপুরীর রূপের বড়াই আর সহ্য হয় না। ......রূপনগরওয়ালী আবার খুব সুরৎ। যদি হয়, তবে উর্দিপুরীর বদলে সেই বাদশাহের উপর প্রভুত্ব করিবে। আমি তাহাকে আনিতেছি, ইহা জানিলে, রূপনগরওয়ালী আবার বশীভূত থাকিবে। তা হলেই আমার একাধিপত্যের যে একটু কণ্টক আছে, তাহা দূর হইবে।' অর্থাৎ জেবউন্নিসা এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চেয়েছিলেন—রূপনগরের রাজকন্যাকে এনে উর্দিপুরীর রূপের বড়াইকে খর্ব করা এবং তাঁর নিজের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করা। সেই কারণেই ঔরঙ্গজেব নির্দেশ না দিলেও জেব-উন্নিসা মবারকের কাছে বলেছেন, 'তোমরা যে প্রকারে পার, রূপনগরীকে লইয়া আসিবে।'

জেব-উন্নিসা প্রতিহিংসাপরায়ণতার বীভৎস নিদর্শন হল মবারকের সর্বনাশবিধান। তিনি যে মবারককে তাঁর কামকলা কৌতূহল চরিতার্থতার উপাদানমাত্র মনে করতেন যখন, দেখলেন সেই মবারক দরিয়াকে নিয়ে সুখে ঘরসংসার করছে, তখন মবারকের সর্বনাশ সাধনের জন্য ঔরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হলেন। নির্মলকুমারীর কাছে জেব-উন্নিসা জেনেছিলেন যে চঞ্চলকুমারী রাজপুতদের অকাল বিনাশ আটকাতে স্বেচ্ছায় দিল্লি আসতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু মবারক তাকে নিয়ে আসেনি। শুধু তাই নয়, মবারকই মোগল সৈন্যদের ডেকে এনে চঞ্চলকুমারীর

কাছে পরাভব স্বীকার করে রণজয় ত্যাগ করতে বলেছিল, এসব কথাই তিনি ঔরঙ্গজেবকে জানিয়েছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ মবারককে সর্প দংশনে মৃত্যুবরণ করতে হল। কিন্তু প্রতিক্রিয়া দেখা দিল জেব-উন্নিসার মধ্যে। যে মবারকের জীবিতাবস্থায় জেব-উন্নিসা কোনওদিন তার প্রতি ভালবাসা অনুভব করেননি, নিছক ভোগলালসা চরিতার্থতার জন্য যাকে ব্যবহার করে এসেছেন, তারই মৃত্যু সংবাদে জেব-উন্নিসা কাতর হয়ে পড়লেন। আপনজন বিয়োগ ব্যথায় কাতর হলেন। লেখক জেব-উন্নিসার এই মানসিক পরিবর্তনটি চমৎকার দেখিয়েছেন। বিশ্বাসী খোজা আসিরুদ্দীনকে ডাকিয়ে দুইশত আশরফি দিয়ে একশত আশরফি হাতেম মালকে দিতে বলেছেন, অবশিষ্ট একশ আশরফি তাকে নিতে বলেছেন। নির্দেশ দিয়েছেন মবারকের মৃতদেহ কবর স্থান থেকে বের করে উপযুক্ত চিকিৎসায় তাকে বাঁচিয়ে তুলতে। যদি বাঁচে যেন তাঁর কাছে তাকে সে নিয়ে আসে। যখন আসিরুদ্দীন এসে জানিয়েছে কিছুতেই মবারককে বাঁচানো যায়নি, জেব-উন্নিসা পাথরে লুটিয়ে পড়ে চাষার মেয়ের মতো মাথা কুটতে শুরু করেছেন। ভেবেছেন যদি তিনি চাষার মেয়ে হতেন তাহলেই ছিল ভাল। মবারকের বিচ্ছেদ বেদনায় অহঙ্কারী শাহজাদীর দর্প চূর্ণ হল, কাকতালীয়ভাবে মবারকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেছে। মবারকের পায়ে পড়েছেন জেবউন্নিসা। তার দয়া ভিক্ষা করেছেন। শাহজাদাকে বিবাহ করার পরিবর্তে মবারকের সঙ্গে যেতে চেয়েছেন। মসজিদে মোল্লা ও উকিলের সাহায্যে উভয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। লেখক বর্ণনা করেছেন : 'জেব-উন্নিসা বুঝিয়াছে যে, বাদশাহজাদীও নারী, বাঁদশাহজাদীর হৃদয়ও নারী হৃদয়; স্নেহশূন্য নারী হৃদয়, জলশূন্য নদী মাত্র'—জেব-উন্নিসার চমৎকার পরিণতি তাকে পূর্ণতা দিয়েছে।

১.১১ মানিকলাল

'লোকে আর দস্যু মানিকলালের কাহিনি শুনতে চায় না। দেশের ছেলেমেয়েদের মাথা বিগড়ে যাওয়ার আশঙ্কায়'—মন্তব্যটি বঙ্কিমচন্দ্রের, রাজসিংহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর কেন তা তিনি প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকলেন তারই কৈফিয়ৎ দিয়েছেন এইভাবে। মাথা বিগড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পরে বঙ্কিম পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করেছেন, বিস্ময়বোধক চিহ্নের ব্যবহার করেননি, কিন্তু তা না করুন, মনে মনে তাঁর বিস্ময় এবং ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে, তাই চ্যালেঞ্জ নিয়ে তিনি 'দস্যু মানিকলালের কাহিনী'-কে শ্রুতিগম্য কিংবা পাঠযোগ্য করে তুলতে প্রয়াস পেলেন। এবং স্বীকার করতে হবে সেই অভিলষিত সাফল্যও তিনি অর্জন করেছেন। বস্তুতপক্ষে এমন একটি বহুমাত্রিক চরিত্র উপন্যাস মধ্যে দুর্লভ। ব্যক্তি চরিত্র হিসাবে তো বটেই, এমনকি সমগ্র উপন্যাসের আকর্ষণ বৃদ্ধিতেও মানিকলাল অপরিহার্য।

উপন্যাসে মাণিকলালের প্রথম আত্মপ্রকাশ তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে যেখানে তাকে আমরা দস্যুরূপে, পরস্বাপহারী রূপে পাই। চঞ্চলকুমারীর গুরুদেব অনন্ত মিশ্রকে বেঁধে রেখে তাঁর কাছ থেকে যথাসর্বস্ব অপহরণকারীদের মধ্যে মাণিকলালও ছিল। রাজসিংহ যখন দস্যুদলকে সমুচিত শাস্তি বিধান করলেন, একমাত্র মানিকলাল প্রাণে বেঁচে পলায়ন করতে গিয়েও ধরা পড়ে গেল। সহজে তবু সে আত্মসমর্পণ করেনি। রাজসিংহ তাঁর যে বর্শা বনমধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন, মানিকলাল তার হদিশ পেয়ে রাজসিংহকে জানায় তিনি যদি তাকে শাস্তি দানে ক্ষান্ত না হন তবে বর্শায় বিদ্ধ করবেন। কিন্তু রাজসিংহের অব্যর্থ টিপে, খালি পিস্তলের আঘাতে মানিকলালের বর্শা খসে পড়ে। তখন রাজসিংহ তার চুল ধরে তার মুণ্ডচ্ছেদনে উদ্যত হন। বিপন্ন মানিকলাল প্রার্থনা জানায় তার জীবন রক্ষার, সে তাঁর শরণাগত। পাঠকের মনে হবে মানিকলাল মৃত্যুভীত, তাই তার এরূপ আবেদন, রাজসিংহেরও অনুরূপ ধারণা হয়েছিল, কিন্তু মানিকলাল যে মৃত্যুভীত নয়, তার জীবনরক্ষার আবেদন তার অপত্যস্নেহের কারণে তা সে জানায়। তার একটি সাত বৎসরের কন্যা, কন্যাটি মাতৃহীনা। তার আপন বলতে

কেউ নেই। সকালে তাকে আহার্য দিয়ে মানিকলাল বেরিয়ে এসেছে, সন্ধ্যায় ফিরে গিয়ে তাকে আবার খাওয়াবে। কন্যাটিকে রেখে তাই সে মরতে পারছে না। কেননা তার মৃত্যুর অর্থ অসহায় কন্যাটির মৃত্যু। তাই মানিকলালের প্রস্তাব রাজসিংহের সমীপে—'আমাকে মারিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন।'

মানিকলাল রাজসিংহের পাদস্পর্শ করে অঙ্গীকার করেছে সে আর কখনও দস্যুতা করবে না, চিরকাল রাজসিংহের দাসত্ব করবে! সে আরও বলেছে, 'যদি জীবন থাকে, একদিন না একদিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে।' বস্তুত পরবর্তীকালে মানিকলাল তার এই অঙ্গীকার রক্ষা করেছে।

মানিকলালের অপত্যস্নেহের যে পরিচয় পাই তাতে তার প্রতি আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক হয়। তার কষ্টসহিষ্ণুতা তার চরিত্রের অপর একটি দিক। দস্যুতায় সে অভ্যস্ত নয়, তার ভাষায়, 'এ পাপে আমি নূতন ব্রতী', তাই সে লঘুদণ্ড তার প্রাপ্য দস্যুতার কারণে বলে জানিয়েছে, সেইসঙ্গে সে নিজেই নিজের দণ্ডবিধান করেছে। কটি দেশ থেকে ছুরিকা বের করে অবলীলাক্রমে নিজের তর্জনী অঙুলি ছেদন করেছে। ছুরিতে মাংস কাটল কিন্তু অস্থি কাটল না, তখন সে একটি শিলাখণ্ডের উপর তার হাতটি রেখে, ঐ আঙুলের উপর ছুরিকা বসিয়ে একখণ্ড প্রস্তরের সাহায্যে তাতে আঘাত করেছে। আঙ্গুল কেটে মাটিতে পড়েছে। বিস্মিত রাজসিংহ লক্ষ করেছেন এই নির্মম শাস্তি সে নিজেই নিজেকে দিয়েছে, কিন্তু এতটুকু ভ্রূক্ষেপও করেনি। একবারও তার ক্ষত ও আহত হাতটির দিকে দৃষ্টিপাত করেনি। এমনকি বারেকের জন্য মুখ বিকৃতিও করেনি। রাজসিংহ মানিকলালকে তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত করেছেন। তাকে সকন্যা উদয়পুরে আসতে বলেছেন, এখানেই তার বসবাসের উপযোগী ভূমি পাবে বলে আশ্বস্ত করেছেন তাকে।

মানিকলাল আপাদমস্তক কর্তব্যপরায়ণ। এই কর্তব্য পরায়ণতার পরিচয় কেবল রাজসিংহের কার্যেই সে রাখেনি, যেখানে না রাখলেও চলত, সেখানেও রেখেছে। রাণার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে পুনরায় পর্বতগুহায় প্রত্যাবর্তন করেছে। উদ্দেশ্য পূর্ব বন্ধুদের কেউ বেঁচে আছে কিনা তা দেখা। একেবারে যদি কেউ মৃত্যুমুখে পতিত না হয়ে থাকে, প্রয়োজনে তাকে শুশ্রূষার সাহায্যে বাঁচানো। গুহায় প্রবেশ করে এমন কাউকে সে পায়নি। তখন যে দুজন রাজসিংহের হাতে মৃত্যু বরণ করেছিল, বন থেকে এক রাশ কাঠ সংগ্রহ করে এনে দুটি চিতা প্রস্তুত করে দুটি মৃতদেহের অন্তিম কাজ সে করে তার বন্ধুকৃত্যের পরিচয় দিয়েছে। এমনকি অনন্ত মিশ্রকে যে তারা পীড়ন করেছে, তাকে যেখানে বেঁধে রেখে এসেছিল, তার কি অবস্থা তা দেখতে গেছে। অনন্ত মিশ্রকে সে দেখতে পায়নি। তবে তখনও তাকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দেখলে মানিকলাল যে তাকে মুক্ত করত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উদয়পুরের উদ্দেশে যাত্রা করার পূর্বে মানিকলাল তার নাবালিকা কন্যার দেখাশোনার সুবন্দোবস্ত করতে ভোলেনি। তার সম্পর্কিত এক পিসির কাছে দু'মাসের জন্য কন্যাকে রেখে গেছে এবং একটি আসরফি পিসিকে দিয়ে গেছে ব্যয় নির্বাহের জন্য। স্নেহশীল পিতার উপযুক্ত আচরণের পরিচয় দিয়েছে মানিকলাল এইরূপে।

মানিকলালের চরিত্রে যে কটি বিরল গুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল তার অতুলনীয় কর্তব্য পরায়ণতা, বিরল সাহসিকতা, 'প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং বুদ্ধির প্রাখর্য। বঙ্কিমচন্দ্র মানিকলাল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'মাণিকলাল বুদ্ধিতে, একটি ক্ষুদ্র সেনাপতি।' আবার কখনও বলেছেন তার 'সেনাপতির চক্ষু ছিল'।

মানিকলাল নিজে রাজপুত, তাই সে বুঝেছিল যে রাজসিংহ কখনই উদয়পুরের অভিমুখে যাত্রা করেননি, চঞ্চলকুমারীর পত্র পেয়ে অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে রূপনগর অভিমুখে যাত্রা করে থাকবেন। মানিকলাল স্থির করেছে সেও তার প্রভুর কাছে উপনীত হবে। তার সঙ্গে কোনো ঘোড়া ছিল না, রাজসিংহ ও অন্যান্যরা গেছেন অশ্বারোহণে, মানিকলাল চলেছে পদব্রজে। বঙ্কিমের ভাষায়, 'মানিকলাল পদব্রজে বড় দ্রুতগামী।' রূপনগরে সে

পৌঁছেছে, কিন্তু তার চোখে পড়েছে রূপনগরে দুই সহস্র মোগল অশ্বারোহী শিবির করে আছে। রাজপুত সৈন্যের চিহ্নমাত্র নেই। এদিকে পরদিন প্রভাতেই মোগলেরা চঞ্চলকুমারীকে নিয়ে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবে। পর্বত নিরুদ্ধ সঙ্কীর্ণ পথ দেখে মানিকলাল অনুমান করেছে রাজসিংহ কাছাকাছিই থাকবেন। মোগল সৈন্যরা যখন সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে অগ্রসর হবে, তখনই রাজপুত সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করবে। বাস্তবিক, মানিকলালের এই ভাবনা সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়েছে। রাণা রাজসিংহ যখন মানিকলালের রূপনগরে উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, তখন সে বলেছে :

'প্রভু যেখানে, ভৃত্য সেইখানে যাইবে। বিশেষ যখন আপনি এরূপ বিপজ্জনক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন যদি ভৃত্য কোনও কাযে লাগে এই ভরসায় আসিয়াছে। মোগলেরা দুই সহস্র—মহারাজের সঙ্গে এক শত। আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিব? আপনি আমাকে জীবন দান করিয়াছেন—একদিনেই কি তাহা ভুলিব?'

রাজসিংহ মানিকলালকে একটি গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। মোগল অশ্বারোহীর ছদ্মবেশে মোগল সেনার সঙ্গে চঞ্চলকুমারীর শিবিকার সঙ্গে থাকতে বলেছেন, উদ্দেশ্য রাজকন্যাকে বাঁচিয়ে রাখা, যুদ্ধ তারপর। মানিকলাল সম্মত হয়েছে কিন্তু প্রার্থনা করেছে একটি ঘোড়া এবং অস্ত্র। কিন্তু রাজসিংহ সেই অনুরোধ রক্ষা করতে পারেননি। তখন সে কৌশলে একজন মোগল সৈন্যকে পানওয়ালীর কাছে এনে বন্দী করেছে এবং তার অশ্ব ও অস্ত্র অধিকার করে মোগল সৈন্য হয়ে মোগলদের সঙ্গে মিশে গেছে, তাতে তার অসীম সাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় মেলে।

বৃক্ষছায়ায় উপবিষ্টা অপরিচিতা নির্মলকুমারীকে যে সম্ভ্রমের সঙ্গে মানিকলাল জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এবং বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে, পরে তাকে বিবাহও করেছে, তাতে নারী জাতির প্রতি মানিকলালের সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ মেলে।

মানিকলালের তৎপরতাতেই রাজসিংহ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা লাভ করেছেন। রন্ধ্রপথে রাজসিংহ প্রবেশ করার পর মোগলেরা রন্ধ্রের মুখ বন্ধ করে দেয়। ভূয়োদর্শী মানিকলাল রূপনগরে উপস্থিত হয়ে মোগল সেনাপতি জুনাব হাসান আলি খাঁ বাহাদুরের নাম করে সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করে, আর এদের সাহায্যে মবারকের সৈন্যদের প্রতি আক্রমণ চালিয়ে রাজসিংহের প্রাণ রক্ষা করে। রাজসিংহও মানিকলালের এই মহান ভূমিকায় অভিভূত হয়ে বলেছেন, 'মানিকলাল। তুমি যথার্থ প্রভুভক্ত। তুমি যে কার্য করিয়াছ, যদি কখন উদয়পুর ফিরিয়া যাই, তবে তাহার পুরস্কার করিব।'

রাজসিংহ ঔরঙ্গজেবকে যে তীব্রঘাতী পত্র লিখেছিলেন, তা নিয়ে যাবার দায়িত্ব চেয়ে নিয়েছে মানিকলাল। একাজে প্রাণ সংশয় ছিল। ঔরঙ্গজেবের কাছে দূত অবধ্য ছিল না। বাস্তবিক, মানিকলালের ছদ্মবেশ ধারণের নৈপুণ্য ছিল অবিশ্বাস্য। সে যেভাবে তার কাটা আঙুলের স্থলে নতুন আঙুলের সংস্থান করেছে, তাতে একই সঙ্গে তার বুদ্ধির প্রাখর্য এবং ঘটনার পরিণতির কথা মনে রেখে পূর্ব থেকে তার যোগ্য ব্যবস্থাদি অবলম্বনের বিরল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। মানিকলাল তার কাটা আঙুলের মেরামত কিভাবে সম্পন্ন করেছে তা জানিয়েছে—

'হাতীর দাঁতে। কল-কব্জা বেমালুম লাগাইয়াছি, তাহার উপর ছাগলের পাতলা চামড়া জুড়িয়া আমার গায়ের মতো রঙ করাইয়াছি। ইচ্ছানুসারে খোলা যায়, পরা যায়।' নির্মলকমারীকে সে এইসব করার কারণ জানিয়ে বলেছে—

'দিল্লীতে ছদ্মবেশের দরকার হইতে পারে। আঙুলকাটার ছদ্মবেশ চলে না। কিন্তু দুই রকম হইলে খুব চলে।'

দৌত্যকার্যে সুনিপুণ পায়রা নেওয়ার মধ্যেও তার পরিণামদর্শিতার পরিচয় মেলে।

বাদশাহের রঙমহলে পাথরের দ্রব্য বিক্রয়ের নাম করে মানিকলাল যেভাবে নির্মলকুমারীর সংবাদ নিয়েছে তাতেও তার সাহস ও বুদ্ধিমত্তার চমৎকারিত্বই প্রমাণিত হয়।

সর্প দংশনে মৃত মবারককে মানিকলাল যেভাবে চিকিৎসা করে পুনর্জীবিত করেছে, তাতে বোঝা যায় অন্ততপক্ষে সর্প দংশন নিরাময় চিকিৎসায় তার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। সে নিজের পেটিরা থেকে ঔষধের বড়ি বের করেছে কোন অনুপান দিয়ে মেড়েছে। তারপর ছুরি দিয়ে মৃতদেহের স্থানে স্থানে একটু চিরে ছিদ্রমধ্যে সেই ঔষধ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। মবারকের জিবে ও চোখেও কিছু মাখিয়ে দিয়েছে। এইভাবে তিনবার ঔষধ প্রয়োগে মবারক বেঁচে উঠেছে।

মোগল সওদাগরের ছদ্মবেশে মানিকলাল উদয়পুরে যাবার ভিন্ন পথের সন্ধান দেবার নাম করে সঙ্কীর্ণ এক পার্বত্য রন্ধ্রপথের সন্ধান দিয়েছে আর এইভাবেই মোগলদের পরাজয়কে নিশ্চিত করে তুলতে সহায়তা করেছে।

মানিকলালের কৌতুকপ্রিয়তাও উল্লেখের দাবি রাখে। মোগলবাহিনির অন্তর্ভুক্ত অশ্বারোহিণী অনুচরীবর্গ ধরা পড়লে মানিকলাল রাজসিংহের কাছে তাদের ব্যাপারে জানতে চেয়েছে—'এখন এই মার্জারী সম্প্রদায় লইয়া কি করা যায়? আজ্ঞা হয় তো উদর পুরিয়া দধিদুগ্ধ ভোজনের জন্য ইহাদের উদয়পুরে পাঠাইয়া দিই।'

মানিকলালের মানবিকতা তথা পরিণামদর্শিতার আরও একটি নজিরের উল্লেখ করা যায়। সেইসঙ্গে সে যে কতবড় কূটনীতিজ্ঞ তারও পরিচয় মিলবে। পর্যুদস্ত মোগলদের বাঁচাতে মানিকলাল জানিয়েছে, 'যুদ্ধে লক্ষ জনকে মারিলেও দেখিয়া দুঃখ হয় না। বসিয়া বসিয়া অনাহারে একজন লোকও মরিলে দুঃখ হয়।' এরপরই তার প্রস্তাব, 'আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সন্ধি স্থাপনের এই উত্তম সময়। জঠরাগ্নির দাহের সময়ে মোগল যেমন নরম হইবে, ভরা পেটে তেমন হইবে না।' উপন্যাসের একেবারে অষ্টম পর্যায়েও মাণিকলালের বীর্যবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা তথা রণকৌশলের স্বাক্ষর মিলেছে। সসৈন্যে সে পর্বতাহরণ করে বজ্রের ন্যায় দিলীর খাঁর সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করেছে।

অতএব কৌশলে সাহসে, প্রভু ভক্তিতে কৃতজ্ঞতাবোধের প্রকাশে, মানবিকতায় এবং সর্বোপরি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে মানিকলাল উপন্যাসে অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে, এ সত্য অস্বীকার করার নয়।

১.১২ উর্দিপুরী বেগম

'রাজসিংহ' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রথম উর্দিপুরী বেগমকে আমরা পাই। বঙ্কিম তার পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে—

'যোধপুরী বেগম প্রধানা মহিষী হইলেও প্রেয়সী মহিষী ছিলেন না। যে সর্বাপেক্ষা প্রেয়সী, সে একজন খ্রিষ্টিয়ানী; উদিপুরী নামে ইতিহাসে পরিচিতা। উদয়পুরের সঙ্গে ইঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া ইঁহার নাম উর্দিপুরী নহে। আসিয়া খণ্ডের দূরপশ্চিমপ্রান্তস্থিত যে জর্জিয়া এখন রুশিয়া রাজ্যভুক্ত, তাহাই ইঁহার জন্মভূমি। বাল্যকালে একজন দাসব্যবসায়ী ইঁহাকে বিক্রয়ার্থে ভারতবর্ষে আনে, ঔরঙ্গজেব অগ্রজ দারা ইঁহাকে ক্রয় করেন। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অদ্বিতীয় রূপলাবণ্যবতী হইয়া উঠিল। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া দারা তাহার অত্যন্ত বশীভূত হইলেন।' দারাকে ঔরঙ্গজেব প্রথমে পরাস্ত ও পরে বধ করেন। তারপর তিনি ইসলাম ধর্মানুসারে অগ্রজ পত্নীকে বাধ্য হয়ে বিবাহ করেন। দারার দুই প্রধান মহিষীর একজন রাজপুতকন্যা, অন্যজন এই উর্দিপুরী। রাজপুতকন্যা ঔরঙ্গজেবকে পতিত্বে বরণ করার পরিবর্তে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু উর্দিপুরী এর বিপরীত আচরণ করলেন, 'খ্রিষ্টিয়ানীটা সানন্দে ঔরঙ্গজেবের কণ্ঠলগ্না হইল।' বঙ্কিম তাঁর নৈতিকতার বিচারে স্বভাবতই উর্দিপুরীকে সুনজরে দেখেননি। তিনি

উর্দিপুরীকে 'গণিকা' রূপেই দেখেছেন। আর তাঁর দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন—উদিপুরীর যেমন অতুল্য রূপ, তেমনি অতুল্য মদ্যাসক্তি। এরপরই তাঁর 'অতুল্য মদ্যাসক্তি'র বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে—

'......ভারতেশ্বরের প্রিয়তমা মহিষী মদ্যপানে প্রায় বিলুপ্তচেতনা, বসন ভূষণ কিছু বিপর্যস্ত, বাঁদীরা সজ্জা পুনর্বিন্যস্ত করিল; ......উর্দিপুরীর বাম হাতে সট্‌কা, নয়ন অর্দ্ধনিমীলিত, অধর বান্ধুলীর উপর মাছি উড়িতেছে ঝটিকা বিভিন্ন ভূপতিত বৃষ্টিনিষিক্ত পুষ্পরাশির মত উর্দিপুরী বিছানায় পড়িয়া আছে।' বলাবাহুল্য এই বিবরণ পাঠক মাত্রকেই তার সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তুলবে। নৈতিকতাহীন, মদ্যাসক্ত এক নারী যার গুণের কোনো বালাই নেই, থাকার মধ্যে ছিল কেবল রূপ। উদিপুরী বেগমের চরিত্র চিত্রণে লেখক ইতিহাসের বিশ্বস্ত অনুসরণ করেছেন—

'The contemporary venetian traveller Manucci speaks of her as a Georgian slave girl of Dara Shukoo's harem who, on the down fall of her first master, became the concubine of his victorious rival. She seems to have been a very young woman at the time, as she first became a mother in 1667. When Aurangzeb was verging on fifty, she retained her youth and influenced over the Emperor till his death and was the daring of his old age.'

ইতিহাসকার ব্যক্তির ব্যক্তিগত অনুভূতি উপলব্ধি কিংবা মানসিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামান না, যেমন ঘামাননি উর্দিপুরী বেগম সম্পর্কে। আপাতভাবে তাকে আমাদের যতই খারাপ লাগুক, বিস্মৃত হলে চলবে না এই বেগমের করুণ জীবনেতিহাস। সুদূর জর্জিয়ার মেয়ে, বাল্যকালেই দাস ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রীত। পণ্যের মতো তাকে ক্রয় করেন ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারা। দারার মৃত্যুর পর তাকে অধিকার করেন ঔরঙ্গজেব স্বয়ং। যার জীবনে এতগুলি ঘটনা ঘটে যায়, লক্ষ করার কোনটির জন্যই তাকে দায়ী করা চলে না। কেননা কোনো ঘটনারই নিয়ন্ত্রণ উর্দিপুরীর হাতে ছিল না। তার ব্যক্তিগত দুঃখের, মনঃপীড়ার দিকটি ঐতিহাসিকেরা দেখেননি। কিন্তু ঔপন্যাসিকের সে সুযোগ ছিল। পরিস্থিতি উর্দিপুরীকে মদ্যপ এবং নৈতিকতা বিরোধী ভূমিকা গ্রহণে প্ররোচিত করেছিল।

উর্দিপুরী বেগমের আত্মমর্যাদাবোধ ছিল প্রখর। সেই কারণে চঞ্চলকুমারী তাঁর জন্য তাঁকে তামাক সাজার কথা বললে মর্যাদাহত উর্দিপুরী বেগম কেঁদে ফেলেছেন। দুঃখে নয়, রাগে তার এই ক্রন্দন। বন্দিনী অবস্থাতেও উদিপুরী বেগমের আস্ফালন তাঁর মর্যাদাবোধের পরিচয়বাহী, 'তোমার এত বড় স্পর্ধা যে, আলমগীর বাদশাহের বেগমকে তামাকু সাজিতে বল?' পরিচারিকা তাঁর হাত ধরে তুলতে যখন সচেষ্ট তামাক সাজানো শেখানোর জন্য, প্রচণ্ড অপমানে তিনি মূৰ্চ্ছিতা হয়ে পড়েছেন।

জেব-উন্নিসাকে তাঁর পরামর্শ : 'উপযাচক হইয়া তাহার সঙ্গে (চঞ্চলকুমারী) সাক্ষাৎ করিও না। তুমি বাদশাহের কন্যা।'

উর্দিপুরীর ভ্রান্ত ধারণা ছিল চঞ্চলকুমারীর মতো সামান্য রূপনগরের কন্যার সাধ্য কি তাদের বন্দী করে রাখেন। অর্থের বিনিময়ে নিশ্চিত মুক্তি লাভ ঘটবে। তাই জানতে চেয়েছেন তিনি—কত আশরফি পেলে চঞ্চলকুমারী তাঁদের ছেড়ে দিতে পারেন। চঞ্চলকুমারী অপমানজনক উক্তি করলে ক্রোধে অগ্নিশর্মা উর্দিপুরী মন্তব্য করে বলেছেন—'গাঁওয়ার ভুঁইঞার ঘরে এত স্পর্ধা আশ্চর্য বটে!' স্পর্ধা শুধু নবাব বাদশাহের পক্ষেই শোভা পায়—উর্দিপুরীর মন্তব্যে এই ধারণা হয়।

উর্দিপুরী জেব-উন্নিসার কাছে দুঃখ করে বলেছেন, 'আমি বাঁদী ছিলাম—বাঁদীর ঘরে বিক্রীত হইয়াছিলাম—কেন বাঁদীই রহিলাম না! কেন আমার কপালে ঐশ্বর্য ঘটিয়াছিল!' ঐশ্বর্যই উর্দিপুরীকে পরিবর্তিত করেছিল। অমানুষ

করে তুলেছিল। চঞ্চলকুমারীর জেদের কাছে অবশ্য তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে, তামাক সেজেছেন নিজের হাতে। উর্দিপুরী ঔরঙ্গজেবকে তাঁর অপমানের কথা আদ্যন্ত বলেছেন। কারণ অপমান তিনি বিস্মৃত হননি।

১.১৩ দরিয়া বিবি

দরিয়া বিবির আসল নাম দরীর উন্নিসা বা এইরূপ কিছু, সকলে তাকে দরিয়া বিবি বলেই ডাকত। তার বাপ মা কেউ ছিল না। আপনজন বলতে তার ছিল জ্যেষ্ঠা ভগিনী, এক বুড়ী ফুফু, কি খালা। তাদের বাড়িতে পুরুষমানুষ বাস করত না। দরিয়া বিবির বয়স সতের বছরের বেশি নয়, তাতে আবার কিছুটা খর্বাকার, তাই তাকে দেখাতো পনের বছরের মেয়ে বলে। তবে সে খুব সুন্দরী, একেবারে ফুটন্ত ফুলের মতো। সর্বদাই সে প্রফুল্ল। দরিয়া মবারকের বিবাহিতা স্ত্রী। সে অন্ধের মতো মবারককে ভালবাসে কিন্তু প্রতিদানে কিছু পায় না। তার ভালবাসার জন্য, ভালবাসার জনের জন্য পারে না এমন কিছু ছিল না।

দিল্লির চাঁদনী চকে দরিয়াকে দেখে বিস্মিত মবারক যখন জানতে চেয়েছে সেখানে কেন সে, উত্তরে সে জানিয়েছে সে সকল জায়গাতেই যায়। কেননা মবারকের সে ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। মবারক কিন্তু বেমালুম অস্বীকার করেছে, জানিয়েছে দরিয়া তার কেউ নয়। এরপর মবারক যখন জানতে চেয়েছে দরিয়ার টাকার প্রয়োজন আছে কিনা, দরিয়া কানে আঙুল দিয়ে বলেছে, 'তোবা! তোমার টাকা আমার হারাম! আমরা আতর সুরমা করিতে জানি।'

বোঝা যায় দরিয়া টাকার কাঙাল নয়, সে মবারকের প্রেমের কাঙাল। প্রেমের পরিবর্তে টাকায় তার প্রয়োজন নেই। দরিয়া ধরে পড়েছে মবারকের ভাগ্য গণনার জন্য। তার কৌতূহল, এইভাবে জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ গণনার মধ্য দিয়ে সে নিজেও তার অভিলষিতকে পাবে কিনা জেনে নিতে চায়। তাই মবারক যখন দরিয়াকে তার ভাগ্য গণনার জন্য বলেছে, তাতে সে রাজি হয়নি, বলেছে না গণনা করেও সে তা জেনে গেছে। এক্ষেত্রে তার ব্যর্থ প্রেমেরই ইঙ্গিত দিয়েছে।

জ্যোতিষী মবারককে পরামর্শ দিয়েছেন সে যেন বিবাহ করে। দরিয়া আত্মগোপন করে জানিয়েছে মবারকের বিবাহ ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। জ্যোতিষী যখন কে একথা বলল জানতে চেয়েছেন, তখন মবারক জানিয়েছে একজন পাগলী বলেছে। মবারক যতই দরিয়ার কথা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করুক, তার বক্তব্যে যথেষ্টই ধার ছিল, ভারও ছিল। জ্যোতিষী যখন মবারককে রাজপুত্রী বিবাহের পরামর্শ দিয়ে বলেছেন তাহলে তার পদ বৃদ্ধি ঘটবে, দরিয়া এই অনুষঙ্গে মবারকের মৃত্যুর বিষয়ে জানতে চেয়েছে। শেষপর্যন্ত জ্যোতিষী আর মবারকের হাত দেখতে চাননি। তবে স্বীকার করেছেন দরিয়া পাগলী তো নয়ই, এমনকি মনুষ্যও বুঝিবা নয়। সে আরও অধিক কিছু। অতিমানবিক না হলেও মবারকের সে নিয়তি স্বরূপা। তার হাতেই মবারক মৃত্যুবরণ করেছে।

দরিয়া বুদ্ধিমতী। তার কাজ ছিল ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা জেবউন্নিসার কাছে সংবাদ সরবরাহ করা। তাই মোগলদের অন্তঃপুরে তার ছিল প্রবেশাধিকার। দরিয়া কাজ হাসিলে ওস্তাদ। তার রঙমহলে প্রবেশাধিকার থাকলেও প্রহরিণীরা মাঝে মাঝে বাদ সাধত জেবউন্নিসার সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারে। কিভাবে তাতারী যুবতীকে ঘায়েল করতে হয় তা তার জানা ছিল।

'দরিয়া, ওড়নার ভিতর হইতে এক শিশি সরাব বাহির করিল। প্রহরিণী হাঁ করিল, দরিয়া শিশি ভোর তার মুখে ঢালিয়া দিল—তাতারী শুষ্ক নদীর মতো, এক নিশ্বাসে তাহা শুষিয়া লইল। বলিল, বিস্ মেল্লা! তোফা সরবৎ! আচ্ছা, তুমি খাড়া থাক, আমি এত্তেলা করিতেছি।'

দরিয়া অনবদ্য কণ্ঠশিল্পী, বস্তুত মবারক তার গান শুনেই তাকে বিবাহ করেছিল। তার গান শুনে জেবউন্নিসা পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল—

'শাহজাদী অনেক অপ্সরোনিন্দিত, সঙ্গীতবিদ্যাপটু গায়ক-গায়িকার গান শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এমন গান কখন শুনেন নাই।' দরিয়া সারেঙ্গ বাজিয়ে গান গাইতে পারত, বীণ বাজাতেও পটু ছিল। দরিয়া শাহজাদী জেবউন্নিসাকে জানিয়েছিল মবারকের জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখানোর প্রসঙ্গ। সে বলেছিল জ্যোতিষী জানিয়েছে শাহজাদী বিবাহ করলে মবারকের ভাগ্য খুলবে। একথা জানাবার উদ্দেশ্য যাতে শাহজাদী মবারকের ওপর বিরূপ হয়। তাহলে সে তার প্রিয় মবারককে ফিরে পাবে। পরিহাস রসিকতাতেও দরিয়া মবারকপ্রিয়তাকে ত্যাগ করতে পারেনি। জেবউন্নিসা ফুল দিয়ে একটি কুকুর তৈরি করেছিল। বেগম সাহেবা যখন জানতে চাইল কেমন হয়েছে, জবাবে দরিয়া জানিয়েছে, 'ঠিক মনসবদার মবারক খাঁ সাহেবের মত হইয়াছে।' জেবউন্নিসা যখন জানতে চেয়েছে সে কুকুরটা নিতে ইচ্ছুক কিনা, দরিয়া অকপটে জানিয়েছে, 'আমি মানুষটা নেব।'

মবারকের সঙ্গে তার অজ্ঞাতে রণভূমিতে দরিয়া বাদশাহী সওয়ারের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়েছে। মবারকের কারণেই তার দিল্লি থেকে রূপনগরে আসা। এমনকি সে জখমও হয়েছে। মবারক অশ্বারোহণে সৈন্য সহ যাবার সময় একটি কূপের মধ্যে পড়ে যায়। মৃত্যু ছিল তার অনিবার্য। দরিয়াই তাকে বাঁচিয়েছে। এজন্য দরিয়াকে কম শ্রম করতে হয়নি—

'আমি একটা কাঠে, দুই চারিখানা কাপড় বাঁধিয়া লম্বা দড়ির মত করিয়াছি। পাকাইয়া মজবুত করিয়াছি। তাহা কূয়ার ভিতর ফেলিয়া দিতেছি। দুই হাতে কাঠের দুই দিক ধর—আমি টানিয়া তুলিতেছি। ......এই বলিয়া দরিয়া কাপড়ের কাছিতে বাঁধা কাঠখানা কূপের ভিতর ফেলিয়া দিল। তরবারি দিয়া কূপের মুখের জঙ্গল কাটিয়া সাফ করিয়া দিল। মবারক কাঠের দুই দিক ধরিল। দরিয়া তখন টানিয়া তুলিতে লাগিল। জোরে কুলায় না। কান্না আসিতে লাগিল। তখন দরিয়া একটা বৃক্ষের বিনত শাখার উপর বস্ত্ররজ্জু স্থাপন করিয়া, শুইয়া পড়িয়া টানিতে লাগিল।' শুধু কূপ থেকে উদ্ধার করা নয়, আহত মবারকের জন্য দরিয়া দোলার ব্যবস্থা করেছে, তার শুশ্রূষাও করেছে। বঙ্কিমের ভাষায় : 'দরিয়ার চিকিৎসাতেই মবারক আরোগ্য লাভ করিল।' দরিয়া মবারকের কাছে যখন বলে, 'আমরা দুঃখী, আমায় ভালবাসিও তখন তার এ বক্তব্যকে আর অগ্রাহ্য করা যায় না, মবারকও পারেনি। তবে রণক্ষেত্রে দরিয়ার উপস্থিতি এবং মবারকের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকার বাস্তবতা নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন থেকে যায়।

দরিয়ার পরিণতি বড় করুণ। সে ঘোর উন্মাদ হয়ে যায়। উন্মাদ হবার কারণ 'মবারকের মৃত্যু সংবাদ সে শুনিয়াছিল।'

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে দরিয়া ছিল মবারকের নিয়তির মতো। যে মবারককে জেবউন্নিসা মৃত্যুমুখে ঠেলে দিল, তাকেই পুনরায় মবারক গ্রহণ করেছিল জীবনসঙ্গিনীরূপে। উন্মাদিনী দরিয়া স্বহস্তে বন্দুকের গুলিতে তার প্রাণাধিক প্রিয় মবারককে হত্যা করে। এই ঘটনার পরে আর দরিয়াকে কেউ কখনও দেখেনি।

১,১৪ যোধপুরী বেগম

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে যোধপুরী বেগমের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে—

'তিনি হিন্দুর মেয়ে, মুসলমানের ঘরে পড়িয়া ভারতেশ্বরী হইয়াও তাঁহার সুখ ছিল না। তিনি ঔরঙ্গজেবের পুরীমধ্যেও আপনার হিন্দুয়ানী রাখিতেন। হিন্দু পরিচারিকা দ্বারা তিনি সেবিতা হইতেন; হিন্দুর পাক ভিন্ন ভোজন করিতেন না—এমনকি ঔরঙ্গজেবের পুরীমধ্যে হিন্দু দেবতার মূর্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন।'

এই বর্ণনায় একদিকে যোধপুরী বেগম যে ঔরঙ্গজেবের পত্নী হয়েও মনেপ্রাণে হিন্দু ছিলেন এবং সর্বতোভাবে হিন্দুয়ানি রক্ষা করে চলতেন জানা যায়, সেইসঙ্গে প্রকারান্তরে ঔরঙ্গজেবের ঔদার্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে তাঁরই প্রাসাদমধ্যে হিন্দু দেবতার মূর্তি পূজিত হতেন, অবশ্য এজন্য লেখককে যোগ করতে হয়েছে, 'ঔরঙ্গজেব তাঁহাকেও একটু অনুগ্রহ করিতেন।' অবশ্য ইতিহাস জানায় ঔরঙ্গজেবের একমাত্র হিন্দু পত্নীর নাম 'নবাববাঈ'। তাছাড়া ঐতিহাসিক স্যর যদুনাথ সরকারের বক্তব্য হল, 'আকবরের পর বাদশাহী মহলে কোন হিন্দু মহিষী হিন্দু আচার-ব্যবহার রক্ষা করিতে পারিতেন না......।'

সে যাইহোক আমরা উপন্যাস মধ্যে যোধপুরী বেগমকে যেমনটা পাই তেমনটিই আলোচনা করব।

চঞ্চলকুমারীকে দিল্লি আনার ব্যবস্থা হচ্ছে জেনে মর্মান্তিক দুঃখিত হলেন যোধপুরী বেগম। তিনি প্রথমে ঔরঙ্গজেবকে চঞ্চলকুমারী সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য প্রয়াস করেছেন। বিনীতভাবে জাঁহাপনাকে বলেছেন, 'যাঁহার আজ্ঞায় প্রতিদিন রাজরাজেশ্বরগণ রাজ্যচ্যুত হইতেছে—এক সামান্য বালিকা কি তাঁহার ক্রোধের যোগ্য?' কিন্তু এ আবেদনে কোনো ফল হয়নি। তখন যোধপুর রাজকন্যা ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু কামনা করেছেন :

'হে ভগবান্! আমাকে বিধবা কর! এ রাক্ষস আর অধিক দিন বাঁচিলে হিন্দু নাম লোপ হইবে।'

যোধপুরী বেগম নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকেননি। তিনি তাঁর সাধ্যমতো চঞ্চলকুমারীর ঔরঙ্গজেবের করতলে পতিত হওয়াকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর বিশ্বস্ত পরিচারিকা দেবীকে তাঁর পাঞ্জা সহ রূপনগরে প্রেরণ করেছেন শুধু এই বার্তাটুকু পৌঁছে দিতে যে হিন্দুকন্যা হয়ে তিনি যেন মুসলমানের ঘরে না আসেন। আরও জানাতে বলেছেন যে বাদশাহ চঞ্চলকুমারীর পা দিয়ে ঔরঙ্গজেবের ছবি ভাঙার সংবাদ অবগত হয়েছেন, আর তাই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁকে দিয়ে উর্দিপুরীর তামাকু সাজাতে দিল্লিতে আনতে চাইছেন। চঞ্চলকুমারীর ভাগ্য কি হতে চলেছে তার পূর্বাভাস তিনি এইভাবে দিয়েছেন।

যোধপুরী বেগম সেইসঙ্গে চঞ্চলকুমারীর উদ্দেশে আশ্বাসবাণী প্রেরণ করেছেন ক্ষয়িষ্ণু মোগলশক্তি সম্পর্কে—

'দিল্লীর সিংহাসন টলিতেছে। দক্ষিণে মারহাট্টা মোগলের বাড় ভাঙিয়া দিতেছে। রাজপুতেরা একত্রিত হইতেছে। জেজিয়ার জ্বালায় সমস্ত রাজপুতনা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রাজপুতানায় গো হত্যা হইতেছে।......

কোন্ রাজপুত ইহা সহিবে? সব রাজপুত একত্রিত হইতেছে। উদয়পুরের রাণা বীরপুরুষ। মোগল তাতারের মধ্যে তাঁর মতো কেহ নাই। তিনি যদি রাজপুতগণের অধিনায়ক হইয়া অস্ত্রধারণ করেন—যদি এক দিকে শিবাজী, আর এক দিকে রাজসিংহ অস্ত্র ধরেন, তবে দিল্লীর সিংহাসন কয় দিন টিকিবে?' এই বক্তব্যেই প্রমাণিত হয় যে যোধপুরী বেগম রাজনীতির হাল হকিকৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যে অধিক বিলম্ব নেই তা তিনি তাঁর বাস্তব বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টিতেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যোধপুরী বেগমের মোগল বিরোধিতা কিংবা আরও স্পষ্ট করে বললে ঔরঙ্গজেব বিরোধিতার একটি কারণ যদি হয় ঔরঙ্গজেবের হিন্দু বিদ্বেষ, তবে অন্য কারণটি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত আশার মূলচ্ছেদ। যখন পরিচারিকা দেবী বলেছে, 'দিল্লীর তক্ত তোমার ছেলের জন্য আছে। আপনার ছেলের সিংহাসন ভাঙ্গিবার পরামর্শ আপনি দিতেছে?' তখন প্রত্যুত্তরে যোধপুরী বেগম বলেছেন—'আমি এমন ভরসা করি না যে, আমার ছেলে এ তক্তে বসিবে। যত দিন রাক্ষসী জেবউন্নিসা আর ডাকিনী উদিপুরী বাঁচিবে, তত দিন সে ভরসা করি না। একবার সে ভরসা করিয়া রৌশিন্নারার কাছে বড় মার খাইয়াছিলাম। আজিও মুখে চোখে সে দাগ জখমের চিহ্ন আছে।' এই বলে তিনি কেঁদেছেন—এ কান্না তাঁর আশাহত হবার প্রতিক্রিয়া।

যোধপুরী চঞ্চলকুমারীকে পরামর্শ দিয়েছেন যেন তিনি রাজসিংহের শরণাপন্ন হন। সেইসঙ্গে আশা প্রকাশ করেছেন যেন চঞ্চলকুমারী রাণা রাজসিংহের মহিষী হন। অর্থাৎ উপন্যাসের পরিণতির আভাস যোধপুরী বেগমের প্রয়াসেই প্রতিফলিত হয়েছে।

যোধপুরী বেগম সাহসী, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারিণী, তাঁরই প্রদত্ত পাঞ্জার সাহায্যে নির্মলকুমারী বাদশাহের প্রাসাদে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। এমনকি তাঁরই আশ্রিতা হয়ে প্রাসাদে সে অবস্থান করেছে। যোধপুরী বেগম নির্মলকুমারীর পত্র লেখা না হওয়া পর্যন্ত সওদাগরের আনীত দ্রব্যাদি পছন্দ করার নামে কালক্ষেপণ করেছেন। তারপর নির্মলকুমারীর লেখা পত্র মূল্যবান রত্নাদিখচিত কৌটার মধ্যে রেখে চাবিবন্ধ করেছেন। ইচ্ছাপূর্বক চাবিটি দিতে বিস্মৃত হলেন, যাতে অন্যের হাতে পড়লে চিঠিটি তার হস্তগত হয়। নির্মলের পত্রে মানিকলাল আনুপূর্বিক সব জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বদেশযাত্রা করেছে দিল্লি থেকে।

যোধপুরী বেগম নির্মলকুমারীর হাত দিয়ে পাঠানো চঞ্চলকুমারীর পত্র উর্দিপুরী বেগমকে তামাক সাজার আমন্ত্রণ, যথাস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করেছেন। এই পত্রটি ঔরঙ্গজেবের রাজসিংহের বিরুধে যুধ করার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অপমানিত ঔরঙ্গজেব প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন।

অতএব যোধপুরী বেগম উপন্যাসে গৌণ চরিত্র হয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন নিঃসন্দেহে।

১.১৫ রাজসিংহে হাস্যরস

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সংবাদ প্রভাকর খ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য, অন্যদিকে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের বন্ধু। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাস্যরস সৃষ্টিতে তিনি গুরু কিংবা বন্ধুর প্রভাবাধীন ছিলেন না, বঙ্কিমের হাস্যরস সৃষ্টির অনন্য নজির হয়ে আছে তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর', সঙ্গত কারণেই যা নাকি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন বাংলা সাহিত্যে নির্মল শুভ্র সংযত হাস্যরসের প্রথম সার্থক প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্র। এমনিতেই হাস্যরস সৃষ্টি অতীব দুরূহ কার্য, যথার্থ জীবনরসিক না হলে হাস্যরস সৃষ্টি সকলের দ্বারা সম্ভব নয়। প্রাক্‌বঙ্কিম যুগ পর্যন্ত আমরা যে হাস্যরসের পরিচয় পাই তা স্থূলত্বে ভরা, ক্লেদাক্ত। স্থূলত্বকে বর্জন করেও যে নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি সম্ভব বঙ্কিমই তার অনন্য নজির রাখলেন।

'রাজসিংহ' মূলত যুধ কোলাহলে মুখরিত হলেও ক্ষেত্র বিশেষে বঙ্কিম রঙ্গ রসিকতার প্রলোভন ছাড়তে পারেননি। নির্দিষ্ট কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখে আমরা এখন সেই হাস্যরস সৃষ্টির পরিচয় নেব।

অনন্ত মিশ্র গৃহিণীর কাছে বিদায় নিয়ে চঞ্চলকুমারীর মুখপাত্র রূপে উদয়পুরের উদ্দেশে যাত্রা করতে চলেছেন। তাঁর গৃহিণী খুব পীড়াপীড়ি করে ধরল কেন মিশ্র যাবেন। মিশ্র মিথ্যা করে বললেন রাণার কাছে কিছু বৃত্তি পাবেন। গৃহিণী তাঁর তৎক্ষণাৎ শান্ত হলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এরপর বর্ণনা করেছেন—

বিরহযন্ত্রণা আর তাঁহাকে দাহ করিতে পারিল না, অর্থ লাভের আশাস্বরূপ শীতল বারি প্রবাহে সে প্রচণ্ড বিচ্ছেদবহ্নি বার কত ফোঁস ফোঁস করিয়া নিবিয়া গেল।' মিশ্র পত্নীর বিরহযন্ত্রণার উপশম হল অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনায়।

ছদ্মবেশী বণিকেরা অনন্ত মিশ্রকে আক্রমণ করলে তাঁর সঙ্গী ভৃত্যটি যে প্রভুভক্তি তথা কর্তব্যপরায়ণতার স্বাক্ষর রেখেছিল তা সহজেই আমাদের হাস্যরসের উদ্রেক করে—

'মিশ্র ঠাকুরের ভৃত্যটি তৎক্ষণাৎ কোন্ দিকে পলায়ন করিল, কেহ দেখিতে পাইল না।' কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম, মিশ্র সঙ্গী ভৃত্য এই আপ্তবাক্য সার বুঝেছিল।

রাণার প্রতীক্ষারত অনন্ত মিশ্র লক্ষ করলেন পর্বতারূঢ় কয়েকজন হস্ত প্রসারিত করে তাঁকে দেখিয়ে পরস্পরে কি বলাবলি করছে, ভীত অনন্ত মিশ্র বিপদাপন্ন বোধ করে পলায়নপর হলেন। তাঁর সেই পলায়ন দৃশ্যটি বঙ্কিমের বর্ণনা গুণে অতিশয় উপভোগ্য ও হাস্যরসাত্মক হয়ে উঠেছে।

'অজ্ঞান, মুক্তকচ্ছ, তথাপি 'নারায়ণ নারায়ণ' স্মরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ তীরবৎ বেগে পলাইলেন।'

রাণা রাজসিংহ মানিকলালের কাছে জানতে চাইলেন সে কি রূপে পোশাক, অস্ত্র, অশ্ব সংগ্রহ করবে, মানিকলাল জানাল ঠকিয়ে নেবে। রাণা এই উত্তরে হেসেছেন এবং বলেছেন যুদ্ধকালে সকলেই চোর এবং বঞ্চক। এরপর নিজের দৃষ্টান্তের অবতারণা করে বলেছেন, 'আমিও বাদশাহের বেগম চুরি করিতে আসিয়াছি—চোরের মতো লুকাইয়া আছি।'

রাজসিংহ মোগলদের হাত থেকে চঞ্চলকুমারীকে রক্ষা করতে রূপনগরে উপনীত হয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেব চেয়েছিলেন চঞ্চলকুমারীকে বিবাহ করতে। এই অনুষঙ্গেই রাজসিংহ মন্তব্যটি করেন।

রূপনগরে মানিকলাল তখন অশ্ব ও অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টায় রত, তাই বলে উদরকে বঞ্চনা করা তার অভিপ্রায় ছিল না। সে দোকান থেকে কিছু মিঠাই ক্রয় করেছে এবং তা খেয়েছে বঙ্কিম বর্ণনা করেছেন—

'সের পাঁচ ছয় ভোজন করিয়া মানিক দেড় সের জল খাইল এবং দোকানদারকে উচিত মূল্য দান করিয়া, তাম্বুলান্বেষণে গেল।' আংশিকভাবে হলেও যেন মানিকের ভোজন বর্ণনায় চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ নায়ক কালকেতুর ছায়াপাত ঘটেছে। পানের দোকানের 'পানওয়ালী মিঠে পানের সঙ্গে মিঠে কথা বেচিতে আরম্ভ করিল', বুঝতে বাকি থাকে না পানওয়ালীর বৈষয়িক বুদ্ধি কতখানি। খরিদ্দারদের আকর্ষণের গোপন রহস্যখানিই তার করায়ত্ত।

পানওয়ালীর কাছে অতিথি রূপে জনৈক মোগল সৈন্য উপস্থিত হবার পর পূর্ব কথামতো মানিকলাল দ্বারে ঘা দিল। পানওয়ালী সৈন্যকে জানাল তার স্বামী গৃহে ফিরে এসেছে অতএব সে যেন আত্মগোপন করে, নতুবা ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

'অগত্যা খাঁ সাহেব তক্তাপোশের নীচে গেলেন। মোটা শরীর বড় সহজে প্রবেশ করে না, ছাল চামড়া দুই এক জায়গায় ছিঁড়িয়া গেল—কি করে প্রেমের জন্য অনেক সহিতে হয়।' খাঁ সাহেবের দুরবস্থার বর্ণনায় যত না হাস্যরস থাক, বঙ্কিমের সংযোজন তদপেক্ষা অধিক হাস্যরস সৃষ্টি করে—'প্রেমের জন্য অনেক সহিতে হয়।'

চক্রান্ত করে পানওয়ালী এবং মানিকলাল খাঁ সাহেবকে গৃহবন্দী করে চলে গেলে খাঁ সাহেবের কি অবস্থা হয়েছিল সেই বর্ণনাও হাস্যরসের উদ্রেক করে, 'খাঁ সাহেব তখন তক্তাপোশের নীচে মূষিকদিগের দংশনযন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন।'

মানিকলাল বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দিলে বিপন্ন নির্মলকুমারী অশ্বপৃষ্ঠে মানিকলালের সহগমন করেছে। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমের মন্তব্য—

'বোধহয়, কোর্টশিপটা পাঠকের বড় ভাল লাগিল না। আমি কি করিব? ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই— বহুকাল সঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই, "হে প্রাণ"। "হে প্রাণাধিক!" সে সব কিছুই নাই—ধিক্!'

সম্পর্কিত পিসিমার গৃহে মানিকলাল নির্মলকুমারী সহ উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে নির্মলের বিবাহ দেবার কথা বলেছে। পিসিমা জানিয়েছেন বিবাহে অর্থের প্রয়োজন, মানিকলাল তাঁকে গোটাকতক আশরফি দিয়েছে, এইবার অর্থপ্রাপ্তির প্রতিক্রিয়া বঙ্কিম বর্ণনা করেছেন অনবদ্যভাবে—

'পিসীমা আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়া পেটিরায় তুলিয়া রাখিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে

বাহির হইলেন। বিবাহের উদ্যোগের মধ্যে ফুল, চন্দন ও পুরোহিত সংগ্রহ, সুতরাং আশরফিগুলি পিসিমাকে পেঁটরা হইতে আর বাহির করিতে হইবে না।' এ ছিল তাঁর সার্ভিস চার্জ।

এইভাবে বঙ্কিম 'রাজসিংহ' উপন্যাসে কৌতুকরসের নানা উপাদান পরিবেশন করেছেন অত্যন্ত সফলভাবে।

১.১৬ রাজসিংহের ভাষাশৈলী

আচার্য সুকুমার সেন বঙ্কিম ব্যবহৃত ভাষার নিরিখে তাঁর রচিত উপন্যাসগুলিকে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলি (১৮৬৫-১৮৭০) সংস্কৃত ঘেঁষা; দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসগুলি (১৮৭২-১৮৭৭) প্রাকৃতঘেঁষা এবং তৃতীয় পর্যায়ের উপন্যাসগুলি (১৮৭৪-৭৫-১৮৮৮) বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব ভাষা রীতির নিদর্শন। অর্থাৎ রাজসিংহে (১৮৭৮-৭৯) বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব ভাষা রীতির প্রয়োগ দৃষ্ট হবে। বঙ্কিমের 'নিজস্ব রীতি' বলতে তিনি তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সফল ব্যবহারকে নির্দেশ করেছেন, নিজস্ব রীতিতে সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহারের স্বল্পতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সর্বোপরি এই রীতিতে বঙ্কিমের কথ্য ভাষার অনুযায়ী বাক্যরচনারীতির অনুসরণ লক্ষণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আধুনিককালের পাঠকের একটি বড় অংশই যে পাঠ করতে উৎসাহবোধ করেন না, তার কারণ তাঁর ভাষা। তাঁর ভাষা বড় বেশি সংস্কৃতগন্ধী। সন্ধি সমাসের প্রাচুর্যে পাঠক যেন দিশেহারা হয়ে পড়েন। বঙ্কিম ব্যবহৃত ভাষার আর একটি সীমাবদ্ধতা হল সাধু ও চলিতের বিসদৃশ মিশ্রণ। কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে রাজসিংহে বঙ্কিমকে এইসব ত্রুটি থেকে মুক্ত দেখা গেছে। আমরা এই উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করব।

পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির ভাষার তুলনায় রাজসিংহে ব্যবহৃত ভাষা বেশ সরল তবে তা অমসৃণ এবং অপরিমার্জিত। চরিত্রের মুখের ভাষার প্রয়োগে কথোপকথনের ভাষা ব্যবহারে বঙ্কিম বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আগ্রার বাসিন্দা বলে ছবি বিক্রয়কারিণী মহিলা ও তার পুত্রের সংলাপ হিন্দিতে রচিত, গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই বঙ্কিম এটি করেছিলেন—

মা। শুন্নেকা মাফিক বাত্ নেহিন্, বাপ্জান্!

ছেলে। তব্ রহনে দিজিয়ে।

মা। ঔর কুছ্ নেহিন্, রূপনগরওয়ালী কুমারীন্ কি বাত্।

ছেলে। বহু কুমারীন্ বড়া খুব্ সুরত? য়েহ য়ৈসা পুছিদা বাত্?

মা। সো নেহিন্—বাঁদীকি বড়া দেমাগ। ইয়া আল্লা। মেয়নে কিয়া বোল চুকা।

ছেলে। কাঁহা রূপনগর গড়, কাঁহা ওহাঁকা রাজকুমারীন্ কি দেমাগ—ইয়ে বাত্ আপ্কা বোলনাই কিয়া জবুর্— হামারা শুননাই কিয়া জবুর্?

যেখানে বাংলা সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে ভাষার সারল্য সহজেই দৃষ্টি কাড়ে। সংলাপে বঙ্কিম অত্যন্ত সংযতভাবে সংক্ষিপ্তভাবে ভাষা ব্যবহার করেছেন—

মবারক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে?"

দরিয়া। সেই দরিয়া!

মবা। দুশমন। শয়তান! তুই এখানে কেন?

দরিয়া। জান না, আমি সংবাদ বেচি?

মবারক শিহরিল। দরিয়া বিবি বলেন, "রাজপুত্রীর সঙ্গে বিবাহ কি হইবে।"

মবা। রাজপুত্রী কে?

দরিয়া। শাহজাদী জেব-উন্নিসা বেগম সাহেবা। শাহজাদী কি রাজপুত্রী নহে?

মবা। আমি তোকে এইখানে খুন করিব।

দরিয়া। তবে আমি হাল্লা করি।

মবা। আচ্ছা, না হয়, খুন নাই করিলাম। তুই কার কাছে খবর বেচিতে আসিয়াছিস্ বল্।

দরিয়া। বলিব বলিয়াই দাঁড়াইয়া আছি। হজরৎ জেব-উন্নিসা বেগমের কাছে।

মবা। কি খবর বেচিবি?

প্রকৃত বর্ণনায় বঙ্কিম তাঁর স্বভাবসুলভ অতি গাম্ভীর্যময় শব্দ নিশ্চয় ব্যবহার করেছেন—

'জ্যোৎস্নালোকে, শ্বেত-সৈকত-পুলিন মধ্য-বাহিনী নীল সলিলা যমুনার উপকূলে নগরী, গণপ্রধানা মহানগরী দিল্লী, প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে। সহস্র সহস্র মর্মরাদিপ্রস্তর নির্মিত মিনার গম্বুজ বুরুজ ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া চন্দ্রালোকের রশ্মিরাশি প্রতিফলিত করিতেছে। অতিদূরে কুতুব মিনারের বৃহচ্চূড়া, ধূমময় উচ্চস্তম্ভবৎ দেখা যাইতেছিল, নিকটে জুম্মা মসজিদের চারি মিনার নীলাকাশ ভেদ করিয়া চন্দ্রালোকে উঠিয়াছে। রাজপথে রাজপথে পণ্যবীথিকা; বিপণিতে শত শত দীপমালা, পুষ্পবিক্রেতার পুষ্পরাশির গন্ধ, নাগরিকজন পরিহিত পুষ্পরাজির গন্ধ, আতর গোলাপের সুগন্ধ, গৃহে গৃহে সঙ্গীতধ্বনি, বহুজাতীয় বাদ্যের নিক্কণ, নাগরীগণের কখন উচ্চ, কখন মধুর হাসি, অলঙ্কার শিঞ্জিত—এই সমস্ত একত্রিত হইয়া, নরকে নন্দন কাননের দায়ার ন্যায় অদ্ভুত প্রকার মোহ জন্মাইতেছে।'

এই ধরনের বর্ণনায় বাক্য দীর্ঘাকৃতির, সন্ধিযুক্ত পদের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়।

বঙ্কিম এই উপন্যাসে লেখ্য ও মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদগুলিকে মিশিয়ে ফেলেননি। অন্তত তাঁর পূর্বের লেখার তুলনায় তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তবে শোভিতেছিল, ভ্রমিতেছিলেন, উছলিতেছে প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্ত : ফুল্লকমলতুল্য তাহাদের বদনমণ্ডল সকল শোভিতেছিল। কিংবা তথায় রূপ উছলিতেছে। তৎসম বহুল বাক্যে তত্ত্বব; অনুপযুক্ত স্থানে তৎসম পদ বা সমাসের ব্যবহার রাজসিংহের ভাষার আরও একটি বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রয়োগও যথেচ্ছ, লক্ষ্য করা করা যায়। যেমন 'অতিদূরে কুতুবমিনারের বৃহচ্চূড়া' কিংবা 'প্রবলবেগে প্রবহমান অশ্রুজল চক্ষুমধ্যে ফেরৎ পাঠাইয়া' ইত্যাদি।

সমাসযুক্ত তৎসম শব্দের প্রয়োগ রচনার ভারসাম্যকে অনেক সময়েই বিনষ্ট করেছে—বিবরে প্রবিশ্যমান মহারথের ন্যায়, কিংবা পরিমাণরহিতা অসংখ্যেয়া বিস্ময়করী মোগলবাহিনী।

উপমা প্রয়োগে বঙ্কিম প্রায়শই গুরুগম্ভীর ভাষা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন—

ক. নিদাঘ সন্ধ্যাকাদম্বিনী তুল্য ভীষণ কান্তি লইয়া ঔরঙ্গজেব বাহিরে আসিলেন।

খ. একে তো পূর্বেই মূর্তি শীর্ণা বিবর্ণা, কাদম্বিনীচ্ছায়া প্রচ্ছন্নাবৎ হইয়াছিল—

গ. অর্থলাভের আশাস্বরূপ শীতলবারি প্রবাহে যে প্রচণ্ড বিচ্ছেদবহ্নি বার কত ফোঁস ফোঁস করিয়া নিবিয়া গেল।

ঘ. জেবউন্নিসা বাদশাহ দুহিতা সুখশয্যায় অশ্রুলোচনে বিবশা, কদাচিৎ দাবাগ্নি পরিবেষ্টিত ব্যাঘ্রীর মতো কোপতীব্রা।

বাক্য গঠনে কখনও কখনও ত্রুটি ঘটে গেছে। যেমন—

অতএব বিক্রম সোলাঙ্কির অশ্বারোহীগণের সন্ধান, তাঁহাকে সহজে মিলিল। এখানে সমাসপদ ব্যবহৃত হওয়া কাম্য ছিল, তৎপরিবর্তে কর্মকারকের সহায়তা নিয়ে লেখক 'তাঁহাকে' ব্যবহার করেছেন।

বাচ্যের প্রয়োগেও এইরূপ ত্রুটি লক্ষিত হয়—

তদ্ব্যতীত নিম্নভূমিনিবাসী শত্রু ও দস্যুর পশ্চাধাবিত হইতে পারিতেন না। বক্তব্যের সাবলীলতা অনেক ক্ষেত্রে শব্দ বিশেষের পুনরাবৃত্তিতে সাধিত হয়েছে—

ক. তারপর ইহার যে ফল উপস্থিত হইল, তাহা ভয়ানক। দরিয়ার পক্ষে ভয়ানক; মবারকের পক্ষে ভয়ানক, জেব-উন্নিসার পক্ষে ভয়ানক, ঔরঙ্গজেবের পক্ষে ভয়ানক। 'ভয়ানক' বিশেষণটির বারংবার ব্যবহার লক্ষণীয়।

খ. তথায় গৃহ সকল বিচিত্র; গৃহসজ্জা বিচিত্র; অন্তঃপুরবাসিনী সকল বিচিত্র। 'বিচিত্র' 'বিশেষণ'-টিও একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে গৃহ, গৃহসজ্জা এবং অন্তঃপুর বাসিনীদের বৈচিত্র্যকেই প্রকটিত করেছে।

গ. পাঁচ পাঁচ জন অশ্বারোহী এক এক সারি, সারির পিছু সারি, তারপর আবার সারি, সারি সারি সারি অশ্বারোহীর সারি চলিতেছে.....। 'সারি' শব্দটির বারংবার প্রয়োগ পাঠকের কাছে অশ্বারোহী বাহিনীর সংখ্যাধিক্যের চিত্রটিকেই পরিস্ফুট করেছে।

ক্রিয়াপদের ব্যবহারে বঙ্কিম অনেক সময়েই ধ্বনি মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন—পার্বতীয় বৃক্ষরাজি আলোকময় করিতেছে। তথায় রূপ উছলিতেছে, শব্দ তরঙ্গায়িত হইতেছে, গন্ধ মাতিয়া উঠিতেছে এবং মন প্রকৃতির বশীভূত হইতেছে।

যাহিহোক বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের আখ্যান এবং উপন্যাসটির গতিময়তা, ভাষা অথবা শব্দ প্রয়োগজনিত কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও পাঠককে বেশি পীড়িত করে না। বরং ভাষার বলিষ্ঠতা আখ্যানের উপযোগী হয়ে উঠেছে উপন্যাসের অন্যতম সহায়কশক্তি রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে স্বীকার করতে হয়।

১.১৭ প্রশ্নাবলী

১. বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া যায় কিনা ঐতিহাসিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যের নিরিখে তা আলোচনা কর।

২. 'রাজসিংহ' উপন্যাসের নায়কপদে রাজসিংহের দাবি কতখানি যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করে দেখাও।

৩. রবীন্দ্রনাথ জেব-উন্নিসাকে উপন্যাস অংশের নায়িকা বলে অভিহিত করেছেন—তুমি এই অভিমতটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে কর কি?

৪. 'রাজসিংহ' উপন্যাসের উপকাহিনি রচনায় বঙ্কিমের কৃতিত্বের পরিমাণ নিরূপণ কর।

৫. 'রাজসিংহ' উপন্যাসের অন্যতম আকর্ষণীয় একটি পুরুষ চরিত্র হল মানিকলাল—আলোচনা কর।

৬. দরিয়া বিবির চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।

৭. যোধপুরী বেগম চরিত্রটি উপন্যাসের ক্ষেত্রে কতখানি অপরিহার্য আলোচনা করে দেখাও।

৮. 'রাজসিংহ' উপন্যাসের অন্যতম আকর্ষণ চঞ্চলকুমারী, আলোচনা কর।

১.১৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. আধুনিক সাহিত্য; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol. I

৩. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪র্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ।

৪. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪র্থ সংস্করণ

৫. নায়কের বিবর্তন : বাংলা উপন্যাসে; শ্যামল সেনগুপ্ত

৬. টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য; বরুণকুমার চক্রবর্তী

৭. বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস; (২য় মুদ্রণ) বিজিতকুমার দত্ত

৮. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর - মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৯. বঙ্কিম সরণী - প্রমথনাথ বিশী

১০. বঙ্কিমচন্দ্র - সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

১১. বঙ্কিমচন্দ্র, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

১২. উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম, প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত

একক ২ ❑ চতুরঙ্গ— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য, চরিত্রসৃষ্টি, শিল্পরূপ ও জীবনদর্শন

২.২ উপন্যাসে উনিশ শতকের তৃতীয় পাদের কমিটেড চরিত্র

২.৩ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের বহিরবয়ব

২.৪ সারাংশ

২.১ উদ্দেশ্য, চরিত্রসৃষ্টি, শিল্পরূপ ও জীবনদর্শন

রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ প্রতিভার বহুমুখিতা বৈচিত্র্যময় কিন্তু বিচ্ছিন্নতার দৃষ্টান্তে নয়। তিনি বাংলা ভাষাসাহিত্যের একজন প্রধান ঔপন্যাসিকরূপে গৃহীত ও আলোচিত হবার কালেও, তাঁর 'কবিত্বের' মৌলিক প্রতিভাসূত্রেই, তা অবশ্য উল্লেখ্য। তবে, বিশেষত কোনো ব্যক্তির 'জীবনচরিত' বর্ণনার সঙ্গে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মহান লেখক 'কবিত্ব' শব্দটির সংযোগ ঘটান, তখন সে 'কবিত্ব' নিশ্চয় সে-জীবনচরিতের অলংকারমাত্র নয়, বরং তা-একটি জীবনচরিতেরই সমগ্রতাবোধের সঞ্জীবনী উৎস। অতএব, জীবনের ফাঁকা ও অসার কবিত্ব নয়। সৃষ্টিশীল প্রতিভার পক্ষে জীবনবোধেরই সমগ্রতার কবিত্ব। ঈশ্বর গুপ্ত প্রসঙ্গে, বঙ্কিম-রচিত জীবনচরিতের 'কবিত্ব' যে একদা সেই অর্থেই ব্যঞ্জিত তা বলাই বাহুল্য।

বাংলা উপন্যাসের ধারাবাহিক আলোচনায়, পথিকৃৎতুল্য সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি (১৯১৬) সম্পর্কে, একই সঙ্গে 'সর্বাপেক্ষা আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত (fragmentary) এবং কবিত্বের অতর্কিত বিকাশগুলিই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ' বলে, একটা নেতিধর্মী সিদ্ধান্তে পৌঁছোন।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের সমগ্রতার অনুধাবনে, এখানে প্রথমেই, সেই কবিত্বের যোগটি সর্বাগ্রগণ্য গুরুত্বে স্মরণীয়। স্মরণীয়, কেননা বাংলা উপন্যাসের ধারায় রবীন্দ্র-উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য মূলত সেই সদর্থক কবিত্বের যোগেই। 'কবিত্ব' (poetic turn), অবশ্যই বঙ্কিমেও ছিল তবে তা যত-না-ভাষাশ্রয়ী বহিরঙ্গের বর্ণনাবৈভব, ঠিক ততটাই উপন্যাস [১. 'করুণা', ভারতী, আশ্বিন ১২৮৭-৮৮ ('অসম্পূর্ণ) ২. 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' (১৮৩৩)৩. 'রাজর্ষি' (১৮৮৭)] কমবেশি ঘটনাপ্রধান; এবং বঙ্কিমের ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস-আদর্শে প্রভাবিত হলেও, তার রোমান্স রস তিনি যথাসম্ভব সচেতনভাবেই বর্জন করেছেন। অর্থাৎ, কবির ইতিহাসচর্চা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কল্পনাপ্রতিম স্বকীয়তায়, উপন্যাসের বস্তুনিরীক্ষাঘটিত তুচ্ছ (trivial) ও মহতেরই (sublime) সমন্বয়মূলক অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার সারবত্তায়, জীবনবোধের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও গভীরতা। তা-ই কবিত্ব।

বস্তুত রবীন্দ্র-উপন্যাসের সমগ্র রূপরেখাটি (১৮৮০-১৯৩৪) তাদের রচনাকাল/প্রকাশকালের (গ্রন্থাকারে) ক্রম-অনুসারে যে-সনতারিখের বহিরঙ্গ ছকটি ধরিয়ে দেয়, তাতে মনে-হওয়া স্বাভাবিক, রবীন্দ্রনাথের প্রথম

উপন্যাস 'করুণা' ('অসমাপ্ত') থেকে 'বউ-ঠাকুরানীর হাট', 'রাজর্ষি' এই তিনটিকে নিয়ে যে প্রথম স্তর, তার শেষোক্ত দুটি ইতিহাস-আশ্রয়ী। দেশীয় স্বাধীন রাজা-রাজড়াদের ইতিহাস যেখানে আমাদের চিরচেনা পরিবারকেন্দ্রিক গার্হস্থ্য পটভূমিতেই সৌভ্রাত্র্য-বাৎসল্যভাব ও তার প্রতিস্পর্ধী কেন্দ্রীয় চরিত্রের নিরঙ্কুশ নির্মমতা নিষ্ঠুরতার কাহিনি। অন্যপক্ষে, প্রথানুগত ধর্মীয় অন্ধ সংস্কারের প্রভূত্ব সম্পর্কের সঙ্গে বিশুদ্ধ মানবিক প্রেমের দ্বন্দ্বসংঘাত। যেন পরিচিত ইতিহাস ভূগোলের বেড়ঘেরা চৌহদ্দিতে, আমাদের মনের মানুষ খোঁজার মুক্তিতেই, রোমান্স-বিবিক্ত ইতিহাসের মুক্তিকে একরকম স্বাগত জানানো।

দ্বিতীয় স্তরে, প্রেমজাত সম্পর্কের জটিলতা। তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। 'চোখের বালি'র বিনোদিনীর কেন্দ্রীয় ভূমিকায়, বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের চরিত্রায়নে, অবচেতন মনঃপ্রকৃতির অনুপ্রবেশ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 'বঙ্গসাহিত্যের নবপর্যায় পদ্ধতি'র অবতারণা।

তৃতীয় স্তরে, 'গোরা'-য় 'স্বদেশআত্মার বাণীমূর্তি' সন্ধানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমানুষের মুক্তি নির্বিশেষে বিশ্বমানবিকতায়। আসলে সন তারিখে-বাঁধা সোপান-স্তরই যে চূড়ান্ত নয়, তা বোঝা যায়, আক্ষরিক অর্থেই কালক্রমের মোটাদাগের হিসেব থেকে। পূর্বোক্ত প্রথম স্তরটির পনেরো-ষোলো বছর পর, 'চোখের বালি' দিয়ে যে দ্বিতীয় স্তরের অবতারণা, তা থেকে বাংলা সাহিত্যে 'নবপর্যায় পদ্ধতির' পরিচয় যে একা বিনোদিনী-ই সপ্রমাণ করে, তা অতি নিঃসন্দেহ। তবু তার পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার আপাতত রবীন্দ্র-উপন্যাসে চূড়ান্ত নিদর্শন 'চোখের বালি'-র চেয়ে বোধ করি 'চতুরঙ্গ'ই বিশেষভাবে দাবি করবে। এবং সেদিক থেকে, বিনোদিনীর পর দামিনীর অন্যতর এক অগ্রণী ভূমিকা, সেই 'সবুজপত্র'-এর যুগে, যথার্থই স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কিন্তু আলোচ্য 'চতুরঙ্গ' নিরঙ্কুশভাবে ঠিক দামিনীকেন্দ্রিক নয়। এক্ষেত্রে উপন্যাসের চারটি অঙ্গ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শিরোনামহীন ক্ষুদ্রতম ভূমিকাটি এই :

"এই বইখানির নাম চতুরঙ্গ। 'জ্যাঠামশায়' 'শচীশ' 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস' ইহার চারি অংশ।"

এমন নয় যে লেখকের ভূমিকার 'অংশ'-র উল্লেখ-থেকেই, সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের 'আংশিকতার' লক্ষণটির শনাক্তকরণে আগ্রহী হয়েছেন। তবে উপন্যাসটির মূল ভিত সম্পর্কেই যখন লেখেন 'উপন্যাসটির গঠন-শিথিলতার একটি প্রমাণ শচীশের জ্যেঠামহাশয়ের অনাবশ্যকরূপে পল্লবিত জীবন-বর্ণনায়', তখন স্বভাবতই সন্দেহ জাগে, বাংলার উনিশ শতকের শেষার্ধের কতকগ যুগধর্মের পৃষ্ঠপটেই জগমোহনের চরিত্রায়ন যে মূলত ভাস্কর্যধর্মী আর সমালোচক তার ভিতর 'পল্লবগ্রাহিতা' দেখছেন, তার মানে, যুগধর্মের ডায়লেকটিক্‌স্ লক্ষ না-করে চরিত্রে ঘটনাবিস্তারের অনিবার্যতাকে তিনি অনাবশ্যক ভাবছেন। ভাবছেন, কী জানি, হয়তো সেও এক-একটি 'অংশের'-ই অ-সম বিভাজনবশত।

২.২ উপন্যাসে উনিশ শতকের তৃতীয় পাদের কমিটেড চরিত্র

আসলে 'চতুরঙ্গ'-এর চার-অংশের প্রথম ও প্রধান অংশটিই বা কেন জগমোহন যিনি এ উপন্যাসে উনিশ শতকের তৃতীয় পাদের কমিটেড চরিত্র : নাস্তিক, পজিটিভিস্ট্। তবে সর্বোপরি, হিউমানিস্ট্। তার ব্যক্তিগত নাস্তিকবুদ্ধি যেন ব্যাপকার্থে 'বহুজনহিতায়' মানবসমাজের 'নিষ্কলঙ্ক নির্মল' চরিত্রগঠনের শক্তিতেই উদ্বুদ্ধ ও অঙ্গীকারবদ্ধ। লোকের ভালো-করার নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ যে মনের জোর, সেই জোরে মনে হয়, মানুষ সবচেয়ে বড়ো। জগমোহনের সেই বড়ো-র সাধনাকে তার শর্থান্বেষী, হীনবল অনুজ হরিমোহন কীকরে বুঝবে? তাইতো

সে-তার অগ্রজকে তখনকার মতো লোকপ্রচলিত সন্দেহটি ও প্রশ্নটি, একই সঙ্গে উত্থাপন করে বসে :

'তোমার ঠাকুর।
হাঁ, আমার ঠাকুর।
তুমি কি ব্রাহ্ম হইয়াছ?

ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মান, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি, তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানো শোনা যায়, তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।

তোমার এই চামার মুসলমান দেবতা?
হাঁ, আমার এই চামার মুসলমান দেবতা।'.......

—চতুরঙ্গ'

যুগগত, যুক্তিবুদ্ধিধর্মের 'জাগ্রত দেবতা'-ই বটে। তার লোকায়ত মানবরূপের ব্যতিরেকী দ্বন্দ্বসংঘাতে, শেষে। সমন্বয়ী ভক্তির নিষেক। সেও যুগধর্মই তো, পাথরের বুকে স্নিগ্ধশ্যাম শ্যাওলার ছোপ রেখে, 'পাপিষ্ঠা ননিবালা'-র ট্র্যাজিক আত্মবিসর্জন সত্ত্বেও, সে ননি—প্রকৃতই জগমোহনের জীবনজিজ্ঞাসারও শেষ উত্তর-সংবলিত কাব্যমীমাংসা কিনা, (তু ''এ জীবন লইয়া কি করিব?' 'লইয়া কি করিতে হয়?'.....:সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। .....এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি।'' —'ধর্মতত্ত্ব, বঙ্কিমচন্দ্র) তা ভাবতে হয়। ভাবতে হয়, কেননা, তার বিসর্জনের আগে, ননি-কে তো তিনিই বলেছিলেন :

'মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি বুড়ো বয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে। আমি আশীর্বাদে সিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমার ওই মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।'

—'চতুরঙ্গ'

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের প্রথম ও প্রধান 'অংশ' হিসেবে, এই জগমোহন চরিত্রই যে তার সমগ্রের মূল ভিত্তিপ্রস্তর, এবং তার 'অনাবশ্যক দীর্ঘ, পরিসরের ভিতরেই যে সেই চরিত্রের স্বয়ংসম্পূর্ণতা, তা বলাই বাহুল্য।

শচীশ তার জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর নোঙরহীন নৌকোর মতোই কোথাও ভেসে গেল। সে-অনির্দেশ্যতা, রবীন্দ্রসৃষ্টির চিরচেনা ভাবুকতায়, কবিতা ও কথাসাহিত্যের সার্থক মেলবন্ধনের অনুকূল। উপন্যাসের প্রথানুগত সাধারণ পাঠকের পক্ষে, রবীন্দ্র-প্রদত্ত এই প্রতিমা: 'এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবিলে তার আলো যেমন হঠাৎ চলিয়া যায়' শচীশের আকস্মিক অন্তর্ধানের রহস্য-সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্য, সেটাই একধরনের সতর্কীকরণ।

বস্তুত শচীশ তার জ্যাঠামশাই জগমোহনের হাতেগড়া 'পজিটিভিস্ট্'। এবং শেষ পর্যন্ত, 'হিউমানিস্ট্'। তাতে যুগপ্রভাবেই যদি বা ভক্তিরসের কিছুটা কাঁচারঙের ছোপধরা চিহ্ন থেকে যায়, তবে বুঝতে হবে, তা উপন্যাসটির প্রকৃত কেন্দ্রীয় চরিত্রের সন্ধানে, লেখককৃত যুগধর্ম ও মানুষের স্বভাবধর্মের মিলনান্ত সেই চিহ্ন; যা-নইলে, আমাদের 'মনুষ্যত্ব'ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। ব্যক্তিচরিত্রের সেই সমগ্রের চরিতার্থতা থেকে সমস্ত চিত্তবৃত্তির অনুশীলন, যেন শচীশ-চরিত্রে একটি পূর্বধার্য পরিকল্পনারই পরীক্ষা। চরিত্রটির প্রত্যেকটি পরিবর্তনই তাই এক-একটি স্তরপরম্পরায় সংগঠিত হয়ে তার সূচকবিন্দুর 'যুক্তিতর্ক' আর মধ্যপথের 'ভক্তি'-র সমন্বয়ের; শচীশও এইভাবে তার শেষের পরিণামী স্তরটির ইশারা পেয়েছে যেন। অতএব রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকমাত্রই সে রূপ-অরূপের দ্বন্দ্বজাত সত্যের সম্মুখীন।

২.৩ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের বহিরবয়ব

আসলে এখানে এই কথাটাই প্রধানভাবে বলবার বিষয় যে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের বহিরবয়ব যে-চারটি 'অঙ্গে' গঠিত,তার প্রথমটি, মূলের ভিত্তিপ্রস্তরের আঙ্গিক, তা স্বয়ংসম্পূর্ণ চরিত্র হিসেবে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রকে শুধু প্রভাবিতই করেনি, তাকে তার স্বকীয় বিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বপ্রতিষ্ঠও করেছে। আর এইভাবেই, 'চতুরঙ্গ'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্গ দুটি, যথাক্রমে, শচীশ-দামিনীর চরিত্রায়ন, এক অর্থে, কেন্দ্রীয় চরিত্র শচীশেরই সত্তাসংকট ও অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণনৈপুণ্যে, যথাযথ পরিণামমুখী। শচীশের সাধনা যে শেষ পর্যন্ত অরূপ-অসীমেরই সাধনা, তা পাঠককে বুঝতে হয় শচীশ ও দামিনীর প্রেমজাত পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণেরই দ্বান্দ্বিকতায়। আপাতদৃষ্টে, দামিনী এ উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে প্রহেলিকাস্বরূপ মনে হলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে, তার মধ্যেই আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়পর সংসারজীবনের রূপজাত তাবৎ সীমাবদ্ধতা; ভোগাসক্তিমূলক কামনা-বাসনার শোচনীয়তায়, যা দামিনীতে একটা চূড়ান্ত রূপপ্রাপ্ত।

বস্তুত শচীশকে বুঝতে একজন দামিনীর প্রয়োজন কেন, তা ওদের সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতা ও মিলন-বিরহের স্পৃহা, তথা স্পৃষ্ট-অবচেতনসূত্র-সংসর্গেই বুঝতে হবে। একদা যুক্তিতর্কের অবস্থার ভিতর দিয়েও যে দুর্গত মানুষের সেবায়, ভক্তি-ভালোবাসার প্রচ্ছন্ন প্রেরণাশক্তি, প্রায় দৈবপ্রাপ্তির মতো মনে হবে, জ্যাঠামশায় জগমোহন ননিবালা-তে তা-ই দেখেছিলেন। জ্যাঠামশায়ের প্রধান শিষ্য হিসেবে, শচীশেরও তা মর্মগত হয়েছিল বইকি। শচীশ জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর যে অজ্ঞাতবাসে চলে যায় এবং প্রায় বছর দুয়েকের ব্যবধানে, যখন জানা গেল সে লীলানন্দ স্বামীর রসসাধনায় ডুবেছে, তখন সেটাই তার পক্ষে একটা স্বাভাবিক, সুসংগত ও সমীচীন অবস্থান্তর। যারা জীবনসাধনায় পূর্ণের সমীপে পৌঁছোতে চায়, তাদের সাধন, কী জানি, এই রকমই হয়তো-বা। নইলে, ওই রসের সাধনাও কেন শচীশের কাছে একদিন অরুচিকর হয়ে উঠবে। শচীশ তার ডায়েরিতে লিখেছিল ননিবালার মধ্যে নারীর এক 'বিশ্বরূপের' কথা; যে অন্যের পাপের কলঙ্কভাগী হয়ে মরল এবং মরে 'জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর' করল। অন্যপক্ষে, 'দামিনীর মধ্যে নারীর আর-এক বিশ্বরূপ.....' 'সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক।' অতএব, প্রত্যক্ষত, দামিনীরূপ; এ বিশ্বনিখিলের নিতান্তই এক আকর্ষণীয় সম্বন্ধবিশেষ। 'বিশ্বরূপের' নেতি-ইতির নির্বেদ তত্ত্বে, আমরা যদি না-ও থাকি, তবু দামিনী-সম্পর্কে সত্য তো এই : 'সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক।' তাই অরূপসন্ধানী শচীশের অন্তরে, 'দামিনী যখন স্থির সৌদামিনী', তখন সে তার 'কেবল শোভাই দেখিল, দামিনীকে দেখিল না।' দামিনীর প্রতি শচীশের অবচেতন রূপতৃষ্ণা এবং তা-থেকে সচেতনভাবে কেবলই নিজেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার ধীর সংকল্প, স্বভাবতই রূপ-অরূপের দ্বন্দ্বজাত এক পরিণাম।

কিন্তু 'তোমায়-আমায় মিলন হবে বলে ......' যে-একটি নিত্যসম্বন্ধের কথা ভাবা হয়, দামিনী সে-সম্বন্ধের 'কেবল শোভাই' বটে। আর কিছু নয়। সত্যিই কিছু নয় কি? কেন, তা গুহার অন্ধকারে, আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জান্তব মত্ত একটা ক্ষুধারই সীমাবদ্ধ শরীরী-রূপ নয় কি? এর উত্তরে বলতে হয়, শচীশ দামিনীকে ঠিকই দেখেছিল এবং বুঝেও ছিল যথাযথ। কীভাবে বলছি।

দামিনীর দুঃখ, তার সাংসারিক জীবনের অসহায়তা এবং তাদের কুলগুরুর দ্বারা তার সমগ্র নারীসত্তার গুরুতর এক চিরবন্দিত্বের অবস্থা-সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত হয়েই সে দুর্ভাগিনী দামিনীর প্রেমকে শচীশ নিভৃতে উপলব্ধি করেছিল। সেখানে ব্যক্তি-দামিনী যেন এক-শচীশের নৈর্ব্যক্তিক উপলব্ধিবিশেষ। যার প্রতিমাটি এইরূপ:

'সেদিন দক্ষিণ হাওয়ায় দূর সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ পৃথিবীর বুকের ভিতরকার একটা কান্নার মতো নক্ষত্রলোকের দিকে উঠতে লাগল।'

—'চতুরঙ্গ'

অন্যদিকে দামিনীও, যে দামিনী গুরুজি ও তার প্রধান শচীশের উদ্দেশে ঝেঁঝে-উঠে বলেছিল : 'আমি কি তোমাদের দশ-পঁচিশের ঘুঁটি?' —সেই দামিনীই, আর-একদিন তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল শচীশকে। বলেছিল, 'আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। .....তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্তি নাই। ওই যে মেয়েটা (ননিবালা) মরিল, রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। ......ওই রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি দিয়ো না। আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে তো সে তুমি।'

....

শচীশ বলিল, বলো আমি কী করিতে পারি?

দামিনী বলিল, তুমিই আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিস—যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি। আমার দেবতাকেও তুমি আবার সঙ্গে মজাইয়ো না।

শচীশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'তাই হইবে।'

—'চতুরঙ্গ'

দামিনী বুঝেছিল, জীবনরসের একজন যোগ্য পরিচালক চাই। আর সে কাজে একমাত্র শচীশই তার পরম নির্ভর হতে পারে। কী জানি, একদা শচীশদেরই হতে, লীলানন্দ স্বামীর আখড়ায়, 'কল্পনার খোলা ভাঁটিতে পূর্ব ও পশ্চিমের, অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ত্ব একত্র চোলাইয়া' যে 'অপূর্ব আরক' তৈরি হয়, বলতে গেলে, সে 'আরক' বা 'রসের' 'না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান; তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই।' কিন্তু তার বিষক্রিয়ায় একজন ননিবালার মৃত্যু তো কঠিনতম সত্য। দামিনী শচীশকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ?'

সুতরাং এই প্রেক্ষাপট থেকে, এমন মনে হতে পারে, স্বয়ং 'রূপ'-ই কেবল অরূপসন্ধানীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে 'রসাতল' : ননিবালার ভয়াবহ পরিণাম। তবুও একমাত্র শচীশকেই যে-বিশ্বাসে নির্ভর করে দামিনী বলতে পারে, 'আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে তো সে তুমি।'— সে 'বিশ্বাস' কোত্থেকে আসে? নিশ্চয় তা 'রূপের'-ই বিপরীত কোনো ঊর্ধ্বগ নক্ষত্রলোক থেকে। আমাদের মনে পড়া উচিত, 'অরূপের' সাধনায় শচীশও দামিনীকে একদা সেই 'রূপের' প্রতীক মনে করেই আন্তরিক আহ্বান করেছিল। বলেছিল : 'আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, অমন করিয়া তফাত হইয়া থাকিও না।' দামিনী বলেছিল 'রূপ'-হয়ে : 'তাই যোগ দিব, আমি কোনো অপরাধ করিব না।'

সাধনার চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণে, শচীশ সেই রূপ-অরূপের যোগের বিষয়টিই তার আত্মোপলব্ধির নিভৃত উচ্চারণে, কী গভীর আত্মবিশ্বাসে, শোনায় দামিনীকে। বলে :

'যে মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন আমি যদি সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উলটা মুখে চলিলে তবেই তো মিলন হইবে।......

.....তিনি রূপ ভালোবাসেন, তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছিল। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে; আমরা বন্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে।'

এবং শচীশও শেষ পর্যন্ত এই বলে হাহাকার করে : 'এতদিন আমি তাঁকে আপনার মতো করিয়া বানাহিতে গিয়া কেবল ঠকিলাম।.....'

সচরাচর উপন্যাস একটি শিল্পকর্মরূপে যতটা বিবরণধর্মী হতে পারে, 'চতুরঙ্গ'-এ তার ব্যতিরেকী লক্ষণেই, তা প্রতীকধর্মী উপন্যাস। আর-হয়তো সেইজন্যই, 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের চরিত্রদের সম্পর্কে ব্যবহৃত, ঘটনা-পরম্পরার অন্তর ও আলগা ধরন, আপাতদৃষ্টে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণহীন। অথচ, উপন্যাসের প্রতীকী গঠনশীলতার বিশেষত্বেই প্রতীক ব্যঞ্জনাগর্ভ পরিমিতিত্বের বোধ। প্রতীকী উপন্যাস এই স্বল্পায়তনের পরিমিতিত্বকে বাস্তবধর্মের 'বেশী প্রকাশ'-এর ব্যাপ্তি ও গভীরতায় সম্প্রসারিত করে দেয়। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের 'শচীশ' অংশে তার ডায়েরি অবলম্বনে যে-গুহাচিত্রটি বর্ণিত হয়েছে, সেখানে গুহাহিত 'অন্ধকারটা'র জান্তব মূর্তিগঠন, তার 'ভিজা নিশ্বাস', যেন 'আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু', বা তার চোখ-কানহীন 'মস্ত একটা ক্ষুধা' এবং 'এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস', 'সেই ক্ষুধার পুঞ্জ' ইত্যাকার শব্দ-পদ গঠনের প্রতীকীতায়, বাস্তব নিশ্চয় সম্প্রসারিত হয়। মানবচরিত্রের এহেন প্রতিফলিত অবচেতনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যে উপন্যাসেরই প্রধান চরিত্র শচীশের অন্তর্দ্বন্দ্ব-মথিত, দামিনীর প্রতি প্রেম ও রিরংসারই নয় চিত্র, যার 'ব্যাপ্তি ও গভীরতা উক্ত স্বল্পায়তন ১০ নম্বর পরিচ্ছেদটিকেও 'বেশি প্রকাশের' বৈশিষ্ট্যবহ করতে পেরেছে।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে শ্রীবিলাসের নিয়মিত ডায়েরি-লেখার অভ্যাস। অতএব, উপন্যাসটির বহিরঙ্গ গঠনেও, শ্রীবিলাসের ডায়েরির ছাঁচে, এর পরিচ্ছেদগুলি সংগঠিত। শ্রীবিলাসের ডায়েরিলেখায় শচীশও যে মাঝে মাঝে নিজের ডায়েরি লিখত তার উল্লেখ পাই। 'চতুরঙ্গ'-এর 'শচীশ' নামাঙ্কিত অধ্যায়ের শেষের ১০ নম্বর যে পরিচ্ছেদটি, তা এই উপন্যাসের বহুখ্যাত গুহাচিত্র। এর সমস্তটাই শচীশের ডায়েরি থেকে সংগৃহীত বলে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছেন। উপন্যাসটির গঠনগত এইসব অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যসূত্র থেকে, রচনাটির এক অভূতপূর্ব শিল্পসফলতার তাৎপর্য-গুরুত্ব, অগ্রসর পাঠক, অবশ্যই অনুভব করবেন। তবু নীহাররঞ্জন রায়ের মতো প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্ এবং রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ সমালোচক 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের বিশিষ্টতা স্বীকার করলেও তাকে 'মহৎ উপন্যাস' বলে মনে করেননি। তাঁর মতে, এর 'জীবনদর্শন খণ্ডিত' এবং জীবনকে সময়ের দৃষ্টিতে না দেখার ফলেই তা একপেশে ও খণ্ডিত।

২.৪ সারাংশ

প্রথমত, 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে জীবনকে সমগ্রের দৃষ্টিতে দেখা হয়নি বললে, আলোচ্য রচনাটিকে রবীন্দ্রনাথের একটি সর্বৈব ব্যর্থ সৃষ্টি বলে গণ্য করতে হয়। তখন আর তাকে 'আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত' বলা, বা 'খণ্ডিত জীবনদর্শন'রূপে ধার্য করা প্রায় তাৎপর্যহীন শোনায়। আসলে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে চরিত্রসমূহের অন্তর্মুখী বিশ্লেষণধারায় অবচেতনের উদ্‌ঘাটন এবং তদনুযায়ী তার প্রতীকধর্মী ভাবানুষঙ্গের সংক্ষিপ্ত-সংহত গঠন, অনেকেই ব্যক্তিচরিত্রের বিকাশ-বিবর্তনের পরিপন্থী মনে করায়, প্রতীকের দ্বারা যে প্রকৃতপক্ষে এস্থলে উপন্যাসের বাস্তব সম্প্রসারিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণতাই লাভ করেছে, সে-বিষয়ে কোনো-কোনো সমালোচক সাধারণ পাঠককে নিঃসংশয় হতে দেননি। তার ফলে, উপন্যাস হিসেবে, 'চতুরঙ্গ'-এর যুক্তি-তর্ক-গল্পের অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতার পরিণতিকে, কেউ কেউ স্বভাবতই আকস্মিক ও অতিনাটকীয় এক তত্ত্বগর্ভ উপন্যাসের বৃত্তান্ত বলে ধার্য করেন। কিন্তু সে-ধারণা ভুল। 'চতুরঙ্গ' যথার্থই, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র পর, অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতার অবশ্যই এক উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত।

২.৫ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. 'সবুজপত্র' অগ্রহায়ণ — ফাল্গুন ১৩২১।

২. 'Broken Ties And Other Stories', Macmillan And Co. Limited, London, 1925.

৩. 'শ্রীবিলাসের ডায়ারি', তপোব্রত ঘোষ, ভারবি, ২০০৮।

৪. 'ধর্মতত্ত্ব', বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, বৈশাখ ১৩৭৬।

৫. 'ঊনবিংশ শতকের নবগৌরাঙ্গ আন্দোলন', দেবানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা' ১৮৮৯-১৮৯০, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্থ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯০।

৬. 'সাহিত্যবিচার', "সাহিত্যের পথে', রবীন্দ্র-রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, চতুর্দশ খণ্ড।

৭. 'বসন্ত ও বর্ষা', "বিবিধ প্রসঙ্গ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, চতুর্দশ খণ্ড।

৮. 'রূপ ও অরূপ', "সঞ্চয়", রবীন্দ্র-রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড।

৯. 'আত্মপরিচয়', রবীন্দ্র-রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দশম খণ্ড।

১০. 'মানবসত্য, "মানুষের ধর্ম", রবীন্দ্র-রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড।

১১. 'The Positive Philosophy of Auguste Comte', Freely translated and condensed by Harriet martineau, Vol-1, Kegan Paul, Trench, Triibner & Co. Ltd., Third Edition – 1893.

১২. 'Woman', "Personality", Rabindranath Tagore, Macmillan And Co. Limited, 1943.

১৩. 'Freud : The Mind of the Moralist', Philip Rieff, University Paperbacks, Metheu, London, 1965.

১৪. 'The Badic Writings of Sigmund Freud', Translated and Edited with An introduction by Dr. A. A. Brill, The Modern Library, 1938.

একক ৩ ☐ পণ্ডিতমশাই — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গঠন

৩.১ পণ্ডিতমশাই : প্লট বিশ্লেষণ

৩.২ পণ্ডিতমশাই : উপন্যাসের গোত্র : পারিবারিক - সামাজিক উপন্যাস

৩.৩ পণ্ডিতমশাই : বাংলার গ্রামজীবনের সংকীর্ণতা ও পশ্চাদপদ দুর্দশার চিত্র

৩.৪ পণ্ডিতমশাই : বৃন্দাবন ও কুসুমের সম্পর্কের টানাপোড়েন

৩.৫ পণ্ডিতমশাই : নামকরণের সার্থকতা

৩.৬ পণ্ডিতমশাই : উপন্যাস ভাষার বিশিষ্টতা

৩.৭ পণ্ডিতমশাই : রাঢ় বাংলার জাতবৈষ্ণব বা বোষ্টম সমাজের সংলগ্নতা ও বিযুক্তি

৩.৮ অনুশীলনী

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ পণ্ডিতমশাই : প্লট বিশ্লেষণ

কাহিনির কার্যকারণ সম্মত রূপকেই বলা হয় প্লট। সাধারণ কোনো আখ্যান যখন শিল্পীর কলাকৌশলে নানারূপে বিচিত্র হয়ে ওঠে তখন সেই শিল্পরূপায়িত কাহিনিকে বলে প্লট। শিল্পী বা সাহিত্যিকের কারিগরী দক্ষতাতেই কাহিনি সংগঠন সুবিন্যস্ত হয়। এই শিল্পকৌশলই হল 'প্লট'। উপন্যাসতাত্ত্বিক ই. এম. ফরস্টার তাঁর *'Aspects of the Novel'* গ্রন্থে বলেছেন, "A plot is also a narrative of events, the emphosis falling on casualty. ... a plot demands intelligence and memory also." তবে যেহেতু প্লটের নাটক-সম্পর্কিত ধারণ বহু পুরনো, তাই উপন্যাসের 'প্লট' বিচারের সময় নাটকের প্লটের সঙ্গে এর পার্থক্যটা মনে রাখা উচিত। গ্রীক নাটকের প্লট বিশ্লেষণে দ্বন্দ্ব ও ঘাতপ্রতিঘাত বিষয়টা খুব জরুরি, বিগত তিন শতাব্দীর মধ্যে জন্ম ও বিকশিত হওয়া পঠনীয় সাহিত্য মাধ্যম উপন্যাসে দ্বন্দ্বাভিমুখী সংঘর্ষ প্লট নির্মাণে অত্যাবশ্যক সামগ্রী নয়।

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাষের প্লটের মূল গিট রেখে দেওয়া হয়েছে প্রথম পরিচ্ছেদে কুসুমের কণ্ঠিবদলের বর্ণনায় অস্পষ্টতা রেখে। পরে এটাই আখ্যানের গ্রন্থিমোচনের কাজ করেছে একেবারে শেষে কুঞ্জর বৌ ব্রজেশ্বরীর দ্বারা ননদ কুসুমকে তার অতীত জীবনের সত্য জ্ঞাপনের দ্বারা।

'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসের প্লটের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল লেখকের রাঢ় বাংলার বর্ণহিন্দু শাসিত গ্রাম-কাঠামের মধ্যেই 'বোষ্টম' সমাজ নামে একটা উপ-সমাজ নির্মাণ। বস্তুত এ নির্মাণ নয়, ঔপন্যাসিকের সাহস। তিনি হিন্দু - বাঙালির কাছে তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রাপ্ত জাতবৈষ্ণব সমাজের দুটি পরিবারের সম্পর্ককে উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য করেছেন।

একদিকে এই বোষ্টমদের পৃথক জীবনাচার, অন্যদিকে বর্ণব্রাহ্মণ্য হিন্দুদের সংস্পর্শে থাকায় সেই সমাজের মূল্যভাবনার দ্বারা পরিচালিত উপন্যাসের নায়ক বৃন্দাবন বা নায়িকা কুসুম। মেলামেশা বা সম্বন্ধ তৈরির ক্ষেত্রে এই জাতবৈষ্ণবদের রীতিবিধি হিন্দুদের মতো নয়। এগারো বছর আগে পরিত্যাগ করা বৌকে দ্বিতীয় বৌয়ের সন্তান রেখে মরার পর ঘরে আনার উদ্যোগ হিন্দু সমাজে প্রায় অসম্ভব অলীক, অথচ 'পণ্ডিতমশাই'-এর প্লট এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র বস্তুত এই আখ্যানে বৃন্দাবনদের গার্হস্থ্য প্রয়োজনকে তত্ত্বায়িত করতে চেয়েছেন। এই প্রয়োজনটাকে কার্যকর করতে বৃন্দাবনের মা বেশ সূক্ষ্মতার পরিচয় দেয় হঠাৎ দলবলসহ কুসুমের বাড়িতে এসে সোনার বালা পরিয়ে যাওয়ায়, বাড়ি ফিরেই কুসুমের দাদা ফেরিওয়ালা কুঞ্জর ঝটিতি বিয়ে ঠিক করার দ্বারা।

কিন্তু প্লট বা আখ্যানগ্রন্থি জটিল হয় কুসুম ঐ বালা পরদিন দাদাকে দিয়ে বৃন্দাবনের বাড়িতে ফেরত পাঠানোয়। এই বালা ফেরতে আহত বৃন্দাবনের কথার মধ্যেই যেন উপন্যাসের পরিণতির সূত্র রেখে দেওয়া হয়েছে। "সাধ্য কি মা, যে সে লোক তোমার বালা হাতে রাখতে পারে। আমার বড় ভাগ্য মা, তাই ভগবান আমাদের জিনিস আমাদের ফিরিয়ে দেয়ে সাবধান করে দিলেন..।"

কুসুম - কুঞ্জ সম্পর্কের অবনতি, বিয়ের পর কুঞ্জর ঘন ঘন শাশুড়ী-আলয়ে যাওয়ায় কুসুমের বিপন্নতা, বৃন্দাবনের শিশুপুত্র চরণের কুঞ্জর বিয়ে উপলক্ষে কুসুমদের বাড়িতে কয়েকদিন থেকে যাওয়া ও চরণের প্রতি কুসুমের বিচিত্র - মাতৃত্বের উন্মেষ — ইত্যাদি প্লটের সরলরৈখিক অগ্রগতির মধ্যেও যেন আঁকাবাঁকা পথচলার বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছে।

নারীর অসহায়তার সঙ্গে পৈতৃক ভিটেতে অমর্যাদা ও নিরাপত্তাহীন বিপন্নতা — ইত্যাদি ফুটে উঠেছে প্লট বিন্যাস কুসুমের যাপনচিত্রে। সে যেন এক নিরাশ্রয় যুবতী, বৃন্দাবন আশ্রয় দেবে — তাতে তার জীবন ধন্য হবে, বাড়তি পাবে মরা সতীনের ছেলে চরণকে; এমন একটা সামাজিক প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে আখ্যানে। অষ্টম পরিচ্ছেদে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে তার অনুযোগের মধ্যে 'আমি কত নিরাশ্রয়' - এই বাক্যাংশে তা বোঝা যায়। ইতিমধ্যে কুসুম-কুঞ্জ তিক্ততা ফিকে হয়, কুসুমকে নিয়ে কুঞ্জর শাশুড়ী পশ্চিমে তীর্থ করতে যায়, নিজের মাতাল ভাইপের সঙ্গে কুসুমের বিয়ে দেবার চাল চালে, বৃন্দাবন আবার বিয়ে করতে চলেছে—এই বলে কুসুমের মনকে বিষিয়ে দেয়।

দশম পরিচ্ছেদ থেকে দ্রুত ঘটনা এগিয়েছে, প্লটের অভিমুখও বদলে গেছে। গোটা এগারো পরিচ্ছেদে বাড়লে ওলাউঠা (কলেরা) মহামারীর বিস্তারের বর্ণনা। বারো পরিচ্ছেদে ছেলেকে সংক্রমণ থেকে দূরে রাখতে বৃন্দাবনের কুসুমের কাছে রাখতে এসে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে যাওয়া। তেরো ও চোদ্দো পরিচ্ছেদে কুঞ্জর বৌ ব্রজেশ্বরীর দ্বারা কুসুমের দ্বিতীয় কণ্ঠিবদলের কাহিনির ভ্রান্তি উন্মোচন। একদিকে কুসুমের আত্মভাগ্যের মন্দ-নিয়তির কথা ভেবে আত্মবিলাপ, অন্যদিকে ব্রজেশ্বরীর কুসুমকে স্বামীর ঘরে যাবার জন্য সনাতন বঙ্গজীবনের সামন্ত-সমাজ মূল্যবোধের নানা কথা বলে উৎসাহিত করা ও বাড়লে কলেরা মহামারীর খবর দেওয়ার ফলে কুসুমের অজানা পথে বাড়ল যাত্রায় বেরিয়ে পড়া ও শেষে চরণের মৃত্যুক্ষণে বাড়ল পৌঁছানো, ভিটেমাটি বিক্রি করে গ্রামের কল্যাণে দান করে বৃন্দাবনের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের দ্বারা জাতবৈষ্ণবের মাধুকরী জীবন বেছে নেওয়ার সঙ্কল্প জ্ঞাপনে আখ্যান সমাপ্তি।

সরল, আকস্মিকতাধর্মী বর্ণনার দ্বারা কার্যকারণের ফাঁকপূরণ করা, সনাতনী বর্ণনারীতি (সবজান্তা কথকের বলা কাহিনি), প্রতীকী সত্যের প্রভা তৈরিতে অক্ষম কাহিনিগ্রন্থনা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্লটগ্রন্থনা। তবুও কোথাও যেন কিছু মায়া রেখে যায় এই সরল প্লটের পারিবারিক আখ্যান। এটাই শরৎ উপন্যাসের বৈশিষ্ট, 'পণ্ডিতমশাই' ও অব্যতিক্রমে এই বৈশিষ্ট্য পাঠকের আগ্রহ ধরে রাখে আদ্যন্ত।

৩.২ উপন্যাসের গোত্র : পারিবারিক - সামাজিক উপন্যাস

যে উপন্যাস সমাজের রাষ্ট্রীক, অর্থনৈতিক অথবা ধর্ম সম্পর্কিত কোনো বিষয়কে উপজীব্য করে গড়ে ওঠে তাকে সামাজিক উপন্যাস বলে। অন্যদিকে যে উপন্যাসের কাহিনি পারিবারিক সমস্যা এবং পারিবারিক ঘাতপ্রতিঘাতকে আশ্রয় করে পরিবারবৃত্তের মধ্যেই সীমিত থাকে, তাকে পারিবারিক উপন্যাস বলে।

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসকে এই দুই গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই উপন্যাসে প্রেমের সঙ্গে গ্রামস্থ গরিব মানুষদের সেবা ও কল্যাণচিন্তা মিলে নারী-পুরুষের সম্পর্ক পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল বোষ্টম সমাজের বাড়ল গ্রামের বৃন্দাবনের। কুসুম তার এগারো বছর আগে ছেড়ে দেওয়া বৌ। উপন্যাসের ঘটনা কালে কুসুমের বয়স ষোল, অর্থাৎ তাকে পরিত্যাগ করা হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে। প্রথমে সাড়া দিলেও সোনার বালা ফেরত দেওয়াকে কেন্দ্র করে বৃন্দাবনের মায়ের গোঁয়ার্তুমি গরিব বোষ্টমের মেয়ে কুসুমকে আত্মমর্যাদা সম্পর্কে অতিসচেতন করে তোলে। ফলে তার আর স্বামীর ঘরে ফেরা হয় না। তবুও কাহিনির আকর্ষণ কমে না, তার কারণ বৃন্দাবনের দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান চরণের প্রতি কুসুমের স্নেহাতিরেক। এর মধ্যেও চলে ভুল বোঝাবুঝি ও মান অভিমানের টানাপোড়েন। ওলাউঠা বা কলেরার মহামারী এসে এই তুচ্ছ মানসিক ভাব-সঙ্ঘাতকে গৌণ করে দেয়। যে কুসুম বৃন্দাবনের ওপর অভিমান বশে চরণকে কিছুদিন আশ্রয় দেবার অনুরোধ ফিরিয়ে দিয়েছিল, সেই আকুল উদ্বেগে বাড়ল গ্রামের দিকে রওয়ানা দেয় বৃন্দাবনের পরিবারে কলেরার দুর্যোগের কথা শুনে। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না, কুসুম পৌঁছাবার কিছুক্ষণ আগেই চরণের মৃত্যু হয়। বৃন্দাবন মায়ের শ্রাদ্ধ (তার কয়েকদিন আগেই বৃন্দাবনের মাও কলেরায় মরেছে) সম্পন্ন করে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে তা পাঠশালায় ছাত্রদের উন্নতিকল্পে বন্ধু কেশবকে দান করে দেশত্যাগের সঙ্কল্প জানায়। জাতবৈষ্ণব থেকে বৃন্দাবনের পূর্বপ্রজন্ম উন্নীত হয়েছিল গৃহীবৈষ্ণবে। প্রকৃতির প্রতিকূলতায় কলেরা মহামারীর কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করে বৃন্দাবন মাধুকরী জীবিকায় পুনঃনিক্ষিপ্ত হয়। পরিবারের এক প্রজন্মের বিপর্যয়ের মধ্যেই কাহিনি শেষ হয়। তাই এ কাহিনি মুখ্যত পারিবারিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত।

কিন্তু উপন্যাসটি পারিবারিক বৃত্তে আবদ্ধ হলেও একেবারে সমাজ-সংস্পর্শ বর্জিত নয়। কেননা এতে পরি-বেষ্টনীর হিন্দু সমাজের গরিব অন্ত্যজদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বৃন্দাবনের উদ্যোগ, অন্ত্যজ পরিবারে কলেরার মড়ক লাগলে বৃন্দাবনের আন্তরিক সংস্করমুক্ত সাহায্য প্রয়াস, কলেরা অভিজাত বামুন পাড়াকেও রেহাই না দিলে সংক্রমণ প্রতিরোধার্থে বৃন্দাবনের পুকুরে বামুনদের মৃত ছেলের জামাকাপড় কাঁচতে নিষেধ করা, সেই নিষেধে ক্ষিপ্ত বামুনদের বৃন্দাবনকে গালিগালাজ ও অভিশাপ দিয়ে শাসানো ও সমাজপতি ঘোষালের তিরস্কার প্রভৃতি সামাজিক অন্বয় মূলক ঘটনা ধারাও আছে। সেই হিসাবে উপন্যাসটার সামাজিক আবেদনও অগ্রাহ্য করা যায় না। অতএব 'পণ্ডিত মশাই' সামাজিক উপন্যাসও বটে। মুখ্যবৃত্তে পারিবারিক আখ্যানভিত্তিক সামাজিক উপন্যাস-ই এর যথাযথ গোত্রচিহ্ন।

৩.৩ পণ্ডিতমশাই : বাংলার গ্রামজীবনের সংকীর্ণতা ও পশ্চাদপদ দুর্দশার চিত্র

শরৎচন্দ্রকে পল্লিবাংলার কথক বলা হয়। তাঁর উপন্যাসে যেমনভাবে গ্রামবাংলার রূপচিত্র এসেছে, তেমনভাবে পূর্ববর্তী কোনো লেখকের রচনায় পাওয়া যায়নি। নিরবচ্ছিন্ন শিল্পবিচারের মূল্যে বিচার করলে বলতে হবেই যে,

'শরৎচন্দ্রের গ্রামীণ পটভূমির রচনাগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।' বিষয়বস্তু বা বক্তব্যের প্রকৃতি যা-ই হোক, তিনি একজন অসাধারণ সাহিত্য-শিল্পী। নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন, ''যে-কিছু ভাঙন বা অবক্ষয়ের ছবি তাঁর লেখায় ফুটেছে-গ্রামের একজন বাস্তববাদী শিল্প-রূপকার হিসাবে শরৎচন্দ্র আর কোনো ভাবেই তাকে ফোটাতে পারতেন না। শরৎচন্দ্রে পল্লিচিত্রে হৃদয় ধর্মেরই প্রাধান্য, মননশীলতার বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। ...শরৎচন্দ্র যে সময়ের পটভূমিকায় তাঁর গ্রাম কাহিনিগুলিকে উপস্থিত করেছেন তার পরিধি মোটামুটিভাবে ১৮৯০-১৯১৫ সালের পরিসরে বিস্তৃত। তাঁর জন্ম ১৮৭৬ সালে, কুড়ি বছর বয়সকালের মধ্যেই তিনি পাঁচ-সাতখানা গ্রামভিত্তিক উপন্যাস লিখে শেষ করেন। ...তাঁর লেখনীর উপজীব্য গ্রাম উনিশ শতকের শেষতম দশকের ওপারে কখনই যেতে পারে না। বাস্তবেও ঠিক তা-ই ঘটেছিল। তিনি বাংলার যে গ্রামকে তুলে ধরেছেন তার অবস্থান তাঁর সম-সময়ে প্রসারিত, অর্থাৎ ১৮৯০ থেকে কমবেশি ১৯১৫ সাল পর্যন্ত তার কালিক স্থিতি। সমসাময়িকতা শরৎচন্দ্রের রচনার একটি প্রধান লক্ষণ। তাঁর দেখা গ্রাম আর তাঁর লেখা গ্রাম দুই এক বিন্দুতে এসে মিলে গেছে।''*

এই সমালোচক অন্য এক প্রবন্ধে লিখেছেন, ''বাংলা গ্রামসমাজের সামন্তবাদী শোষণ, অবদমন ও অত্যাচার, কৃত্রিম সামাজিক অনুশাসনের চাপে ব্যক্তিত্বের প্রেষণ ও অবলোপ, গ্রাম্য সমাজ নারীর অসহায় ও পরনির্ভর অবস্থা, তথাকথিত গ্রাম্য সমাজপতিদের জমিদার জোতদার ও সুদখোর মহাজনদের সহায়তায় পরপীড়নের উল্লাস ও ক্রূরতা, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের উৎকট দারিদ্র ও অবলম্বনহীনতা, নীচুজাতের লোকদের প্রতি বর্ণশ্রেষ্ঠত্বাভিমাণী ও বিত্তবান শ্রেণির লোকেদের উদ্ধত ব্যবহার, গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনাচরণে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ও প্রথার দৌরাত্ম্যের দাপট, যৌথ পরিবার প্রথার ভাঙন ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় অবতারণা করে শরৎচন্দ্র পাঠকের দৃষ্টিকে সচেতনভাবেই সমাজের অভিমুখে চালনা করতে চেয়েছেন, নিছক শিল্পোপভোগের সীমায় তাকে বেঁধে রাখতে চাননি।''**

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের আখ্যানে দেখা যায় বৃন্দাবন অধিকারী গৃহীজাতবৈষ্ণব সমাজে প্রতিপালিত সম্পন্ন চাষী হয়েও নিজের ক্ষুদ্র শিক্ষা ও স্বল্প সামর্থ্য নিয়ে স্ব-গ্রামের পরিবেষ্টনীর গরীব মানুষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রাণান্তিক ব্যাধিপীড়িত জীবনের গ্লানি যথাসম্ভব হ্রাস করার সৎও আন্তরিক প্রয়াস করে গ্রামের অজ্ঞানতা আচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী সমাজপ্রভুদের তামসিক ঘৃণামিশ্রিত প্রতিরোধী মানসিকতার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। নৈমিত্তিক কলেরার দুর্বিপাকে বৃন্দাবনের মা ও ছেলে চরণের মৃত্যু তার জীবনাদর্শের ব্যর্থতাকে আরও করুণ করে তোলে। যে গ্রামে স্নান, রোগীর কাপড় কাচা আর খাওয়ার জল একই পুকুর থেকে ব্যবহার করা হয়, সেখানে ব্রাহ্মণ তারিণী মুখুজ্যের ছোটছেলে কলেরায় মরার পর যখন সেই মৃতের কাপড়চোপড় তার পুকুরে কাছছিল বামুন বাড়ির বৌ, বৃন্দাবন তাকে নিষেধ করলে তার প্রতিক্রিয়ায় তারিণী এই নিষেধকে ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্পন্ন বোষ্টমের ঔদ্ধত্য প্রতিপন্ন করে বলে, *"নীচু জাত হয়ে তোর এতবড় মুখ? তুই বলিস মেয়েরা মাঠে যাবে কাপড় ধুতে?''*

এই বর্ণনার মধ্য দিয়েই বাংলার গ্রামসমাজের জীর্ণ সমাজশৃঙ্খলার স্বরূপটা প্রকাশিত হয়ে যায়। এই গ্রামে বস্তুত আবহমান বঙ্গীয় গ্রামচিত্র। উপন্যাসের বর্ণনায় পাই, ''প্রতি বছর এই সময়টায় (দোলের পর) ওলাওঠা হাজির হয়, এ বছর এই প্রথম।'' গরিব মানুষরাই মুখ্যত এর শিকার হলেও সংক্রমণ রোগ স্বাস্থ্যবিধি অগ্রাহ্য করা দম্ভী বর্ণব্রাহ্মণ পরিবারকেও ছাড় দেয় না, তারিণীর ছোট ছেলের মৃত্যু তার প্রমাণ। আর গরিব অন্ত্যজরা নগদ অর্থের অভাবে চিকিৎসাহীন অবিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। বৃন্দাবনে পাঠশালার পড়ুয়া ষষ্ঠীচরণের ভাই কেষ্ট কলেরায় মরে।

* ''শরৎ সাহিত্যে বাংলার পল্লী,'' 'নন্দন' শারদীয় ১৩৮২, পৃ.৩৫০-৩৫১

** ''শরৎচন্দ্র ও তাঁর উত্তরাধিকার,'' 'সাহিত্য ভাবনা/নবপর্যায়ে', 'পপুলার লাইব্রেরী', ১৯৮১, পৃ. ৩৫-৩৬।

তার আগে মরে তাদের বাবা শিবু গয়লা। শিবুর মৃত্যুর সময়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন লেখক তাতে গরিব গ্রাম্য মানুষের অসহায়তার চিত্র পরিপূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয়েছে : *"শিবুর স্ত্রীও অত রাত্রে নগদ টাকা জোগাড় করতে না পেরে, নিরুপায় হয়ে নুন-জল খাইয়ে স্বামীর শেষ চিকিৎসা করে, সারা রাত্রি শিয়রে বসে মা শীতলার কৃপা প্রার্থনা করে।''*

শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিতমশাই' ও এর ক্ষুদ্র পরিসরে বাংলার গ্রামের স্থবির কৃষি-অর্থনীতি; সংস্কারাবদ্ধ সমাজরীতি, জাতগোঁড়ামী, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদির বিশ্বাসযোগ্য চিত্র তুলে ধরেছে। তাঁর উপন্যাসের পল্লীকথা গল্পকথা নয়, তা বাংলার বহিরঙ্গ সমাজ-কাঠামোর অবিকৃত কথারূপ। বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের মতো উচ্চধনী জমিদারের প্রতি পূর্ণআলো প্রক্ষেপে গ্রাম অবলোকন নয়, শরৎচন্দ্র গ্রামজীবন চিত্রণে মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি বা সাফল্য - ব্যর্থতাকে কথারূপ দিয়েছেন। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ ব্যাখ্যায় শেষ করা যায় : ''বৃন্দাবনের গ্রামসমাজ তার একান্ত প্রাত্যহিক অস্তিত্বের অংশ।...ব্যক্তি বৃন্দাবনের স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণের চেষ্টা। কিছুতেই তার চারপাশের 'রিয়্যালিটি' পরিবর্তিত করতে পারে না।...বৃন্দাবনের অভিজ্ঞতা একটা ভালো মানুষের লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতা হয়ে থেকে গেল মাত্র।''*

৩.৪ পণ্ডিতমশাই : বৃন্দাবন ও কুসুমের সম্পর্কের টানাপোড়েন

সমাজে যে-দুই মান-সত্তার সম্পর্ক সবথেকে স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীলতায় সূক্ষ্ম তা হ'ল নারী ও পুরুষের সম্পর্ক। ইউরোপীয় উপন্যাসের সূচনাকাল থেকেই তাতে নারীপুরুষের সম্বন্ধপাতের সমস্যা বেশি বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। ইংরেজি উপন্যাস পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের সাহিত্যে কথাআখ্যান 'নকশা' থেকে 'নভেল'-এর ভদ্রলোকপাঠ্য হয়ে ওঠার বাঁক নিলেও ইউরোপীয়দের মতো বাংলা উপন্যাসে প্রথম থেকেই জীবন-বাস্তবতা, সমাজপটে ব্যক্তিস্বরূপকে ব্যাখ্যা করা সমাজ-সমালোচনা — প্রভৃতি উপেক্ষিতই থাকে। বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রাধান্য পায় হিতবাদী সুখতত্ত্ব ('এ জীবন লইয়া কি করিব ?') ও হিন্দুয়ানির পুরুষতন্ত্র। তাই বিধবা রোহিণী প্রথম থেকেই 'রাক্ষসী', 'পিশাচী', 'পাপিষ্ঠ' প্রভৃতি অভিধায় চিহ্নিত হয়। নারী পুরুষের লেখন মনোভাব নিরপেক্ষ সম্বন্ধ অন্বেষণ বা নারীর আত্মজিজ্ঞাসার সমস্যা সেখানে ক্ষীণভাবে ভেসে উঠলেও লেখকের নৈতিকতার মুগুরের ঘায়ে বিনষ্ট হয়ে যায়।

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে নারী-পুরুষ সম্পর্ক বিবর্তন পল্লবিত হয়েছে বৃন্দাবন ও কুসুমকে আশ্রয় করে। সাধারণ হিন্দুর গ্রাম পরিমণ্ডলে বাস করলেও এরা বোষ্টম বা জাতবৈষ্ণব সমাজভুক্ত হওয়ায় সম্পর্ক বিন্যাসে কিছুটা আপত-অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। বৃন্দাবনের যখন চোদ্দো আর কুসুমের পাঁচ বছর বয়স ছিল, তখন তাদের বিয়ে হয়েছিল। বৃন্দাবনের বাবা গৌরদাস অধিকারীর সঙ্গে কুসুমের মায়ের মনোমালিন্যের ফলে কুসুমকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। গৌরদাস আবার বিয়ে দেয় বৃন্দাবনের। এগারো পর যখন কাহিনি শুরু হচ্ছে, বছর বৃন্দাবন মৃত, মরে গেছে কুসুমের মাও। এমনকি বৃন্দাবনের দ্বিতীয় বৌয়েরও হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে তিন বছরের শিশুপুত্রকে রেখে। তারপর বছর দুয়েক চেষ্টা করে বৃন্দাবন তার মাকে পাঠিয়ে পরিত্যক্ত স্ত্রী কুসুমের সঙ্গে সম্পর্ক জোড়া লাগাবার চেষ্টায় প্রাথমিক সাফল্য পায়। যদিও কুসুমেরও নাকি দ্বিতীয় কণ্ঠি বদল হয়েছিল, কিন্তু তার কোনো সাক্ষী নেই। সেই স্বামী নাকি মৃত।

প্রথম পক্ষের ছেড়ে দেওয়া বৌকে এগারো বছর পর ঘরে আনার চেষ্টা, তাও আবার দ্বিতীয় পক্ষের বউ হঠাৎ মরে যাওয়ায় — হিন্দু-সমাজ পরিমণ্ডলে এমন সূত্র দিয়ে আখ্যান-সূচনাটাই অস্বাভাবিক প্রতিপন্ন হত। কিন্তু বৃন্দাবন

---

* ''বর্ণভেদের চরিত্র নিয়ে বাঙালি ঔপন্যাসিক', 'উত্তর প্রসঙ্গ', 'দে'জ পাবলিশিং', ১৯৮৬, পৃ. ১০১-১০১

ও কুসুম উভয়েই বোষ্টম বা জাতবৈষ্ণব। তাদের সমাজ ও জীবনের রীতিবিধি আলাদা - এই পার্থক্যের ফাঁক ব্যবহার করেই লেখক দুই পুরুষ-নারীর প্রেমের পুনরুজ্জীবনের আখ্যান ফেঁদেছেন। এমনকি বৃন্দাবনের মনে 'প্রেম' শব্দ সূচক ভাবনাও উদ্রিক্ত এবং ব্যক্ত হয়েছে। কুসুমকে সে বলেছে ''আশ্চর্য্য! একবার মনে হ'ল না যে আজ তুমি এই প্রথম কথা কইলে। যেমন কত যুগযুগান্ত আমাকে তুমি এমনই শাসন করে এসেচ - ভগবানের হাতে বাঁধা কি আশ্চর্য্য, বাঁধন কুসুম।" — এই সংলাপের বাক্যার্থ ও অন্তর্লীন ভাবসত্য সম্পর্কে একালের পাঠকের সংশয়ী সন্দেহ থেকেই যায়। যদিও সেই পাঠক-পাঠিকাদের খেয়াল রাখা উচিত যে এই আখ্যানের ঘটনাস্থলের এলাকায় ওই কালেই মূল হিন্দু ব্রাহ্মণ্য বাঙালি সমাজের জীবনের রীতিবিধিও এখনকার মতো ছিল না। ১৮৭১ সালের 'একটি সরকারী প্রতিবেদন' থেকে জানা যায়, 'হুগলী জেলার তেত্রিশ জন কুলীন বিবাহ করেছেন দু-হাজার একশো একান্ন (২,১৫১) জন স্ত্রীলোককে। এইসব কুলীনদের স্ত্রীরা নিজ নিজ পিতৃগৃহেই অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় কালহরণ করতেন। কখনো কখনো বিবাহের পরে একবারও স্বামীর সঙ্গে দেখা হত না। তবে অর্থাভাব হলে স্বামী নিজে বা ভৃত্য পাঠিয়ে [এইসব 'উদ্ধার' করা মেয়েদের বাবার/দাদা-ভাইয়ের থেকে] টাকা সংগ্রহ করতেন।*

বর্ণশ্রেষ্ঠতার অভিমানী শ্রেণির জীবন যেখানে ছিল কৌলিন্য প্রথার ব্যভিচার, অজাচারের ক্লেদে পঙ্কিল — সেখানে প্রায় একই ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বৃন্দাবন কুসুমদের বোষ্টম সমাজের নারীপুরুষের সম্পর্ক বিন্যাস খুব একটা অনুন্নত বা সেকেলে বলে মনে হয় না। স্বভাবতই সোনার বালা পরিয়ে যাবার পরদিন কুসুম তার ফেরিওয়ালা দাদা কুঞ্জকে দিয়ে বালা ফেরত পাঠালে বৃন্দাবনের অহং আহত হয়, সে ভাবে; ''এমন করিয়া সমস্ত নির্ম্মূল করিয়া দিয়া তাহার উপবাসী, শান্ত, সন্ন্যাসিনী মাকে এমন করিয়া আঘাত করিতে পারিল — সে তাহার স্ত্রী, তাহাকেই সে ভালবাসে।"

সত্যিই উনিশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে নারী কতটা পরাশ্রিত, অসহায়, গলগ্রহ হয়ে প্রাণধারণ করত, তা বোঝা যায় কুসুমের আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা তাড়িত ভাবদ্বন্দ্বে: ''অবশেষে সত্যই এই যদি তাঁহার মনের ভাব হইয়া থাকে! সে নিজে আঘাত দিতে তো বাকী রাখে নাই। বারংবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, মাকেও অপমান করিতে ছাড়ে নাই। ... সত্যই তিনি যদি স্বামী নন, হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি আমার, অন্তরের সমস্ত কামনা আমার, তাঁহার উপরে এমন করিয়া একাগ্র হইয়া উঠিয়াছে কি জন্য? শুধু একটি দিনের দুটো তুচ্ছ সাংসারিক কথাবার্তায়, একটি বেলার অতি ক্ষুদ্র একটুখানি সেবায় এত ভালবাসা আসিল কোথা দিয়া? সে জোর করিয়া বারংবার বলিতে লাগিল — কখন সত্য নয়, আমার দুর্নাম কিছুতেই সত্য হইতে পারে না, এ আমি যে কোনো শপথ করিয়া বলিতে পারি।"

প্রথমাবধি কুসুমের আত্মসমর্পণ ইচ্ছাও বৃন্দাবনের ছেলেকে দেখশোনার জন্য একজন 'মা' এর বন্দোবস্ত করার পারস্পরিক চাহিদা মিলনের অনুকূল পরিমণ্ডল রচনা করলেও সামান্য মান-অভিমানের বাধার ফলে বৃন্দাবন-কুসুমের দাম্পত্যের দ্বিতীয়, 'ইনিংস' বা 'টার্ন'-এর সূচনা অধরাই থেকে যায়। উপন্যাসের চৌদ্দো পরিচ্ছেদে কুসুম যখন চরণের অসুস্থতার কথা শুনে বাড়লে পৌঁছায়, ততক্ষণে এই বালকের অন্তিমমুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে কলেরার আক্রমণে। বৃন্দাবন গৃহত্যাগ করে মাধুকরী বৃত্তির সঙ্কল্প ঘোষণা করে, কুসুম 'তাঁর ভায়ের কাছেই যাবেন' — দুর্গাদাস বাবুকে বলা বৃন্দাবনের এই উক্তিই বুঝিয়ে দেয় চরণের মৃত্যুর পর কুসুমকে কেন্দ্র করে তার জীবনে আর কোনো ভাবনা উদ্‌বৃত্ত নেই। অকৃত্রিম প্রেমের মোড়কে কুসুমকে ঘরে আনার উদ্যোগ-প্রয়াসের প্রেরণামূলে ছিল ছেলের পালক মাতা আনা। তাই এই ব্যর্থতার মধ্যে তাদের জীবন বাস্তবতার সত্যরূপটাই বেরিয়ে এসেছে। স্বার্থতাড়িত সন্নিবন্ধনের চেষ্টা

---

* শ্রীধর মুখোপাধ্যায়, 'কলকাতা : উনিশ শতক/ঘটনাক্রম', 'মহাদিগন্ত' ২০০৮, পৃ. ১২৫

নৈমিত্তিক বিপর্যয়ের ঝাপটায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। অমর্যাদকর গলগ্রহ হয়েই বাকি জীবন কাটাতে হবে কুসুমকে। এই অমর্যাদা থেকে রক্ষা পেতে চেয়েই সে চরণকে মাতৃস্নেহে আবদ্ধ করে বৃন্দাবনকে আশ্রয় করতে চেয়েছিল। বঙ্গজীবনের প্রেমহীন গ্লানিময় দাম্পত্য সহাবস্থানের সত্যতাই প্রকটিত এই সম্পর্ক বিণ্যাস।

৩.৫ পণ্ডিতমশাই : নামকরণের সার্থকতা

শিরোনাম হল পাঠককে বিষয়ের গভীরে ও সাহিত্য খণ্ডটির ভাব ও ভাবনালোকে পৌঁছে দেবার চাবিকাঠি। এই জন্যই সাহিত্য ভাবকেন্দ্রিক, চরিত্রকেন্দ্রিক, আঙ্গিকগত, স্থান বা কালবাচক ও ঘটনাকেন্দ্রিক — নানাধরনের নামকরণের প্রকটতা কাজ করে। নামকরণ লেখক ও পাঠক দু-পক্ষের পারস্পরিক সংযোগ ব্যাকরণের ক্ষেত্রেই খুব গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। 'পণ্ডিতমশাই' এ বৃন্দাবন গৃহী বোষ্টম সম্পন্ন চাষী হলেও তার জীবনার্থ সন্ধানের ব্যতিক্রমী জীবনপ্রেরণহি তার পরিচয়ের সূচক হয়ে উঠেছে। তার গ্রামের গরিব মানুষদের আত্মোন্নতিকে বেগবান করাই তার সমাজভাবুক ব্রত। তাই উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে : "এ গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না। বৃন্দাবন ছেলেবেলায় নিজের চেষ্টায় বাঙলা লেখাপড়া শেখে এবং তখন হইতে একটা পাঠশালা খুলিবার সঙ্কল্প করে। ...(বাবা গৌরদাসের) মৃত্যুর পর, সে নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে বিনা বেতনের একটা পাঠশালা খুলিয়া সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করে।"

উপন্যাসের বিভিন্ন পরিচ্ছদে বৃন্দাবনের যে পরিচয় এবং জীবনধারণ প্রণালী বর্ণিত হয়েছে তাতে তার 'পণ্ডিতমশাই' পরিচয়টাই মুখ্য হয়ে উঠেছে :

১. "দুপুরবেলা স্ব-প্রতিষ্ঠিত পাঠশালে কৃষক পুত্রদিগের অধ্যাপনা করিত।"

২. "তখন চণ্ডীমণ্ডপের সুমুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া পোড়োরা নামতা আবৃত্তি করিতেছিল, বৃন্দাবন একধারে দাঁড়াইয়া তাহাই শুনিতেছিল।

৩. "বাড়ল থেকে। পণ্ডিতমশাই চিঠি দিয়েছেন। ... তিনিই তো পণ্ডিতমশাই।"

৪. "পাঠশালা বাটীতে প্রতিষ্ঠিত, বেতন লাগে না। পণ্ডিতমশাই নিজের অর্থে শ্লেটে পেনসিল প্রভৃতি কিনিয়া দেন, যে সকল দরিদ্র ছাত্র দিনের বেলায় অবকাশ পায় না, তাহারা সন্ধ্যার সময় পড়িতে আসে এবং ঠাকুরের আরতি শেষ হইয়া গেলে প্রসাদ লইয়া কলরব করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। দুইজন বয়স্ক ছাত্র পাঠশালে ইংরাজী পড়ে।"

দশম পরিচ্ছেদে বৃন্দাবনের বাল্যকালের স্কুলের সহপাঠি বন্ধু কেশব বৃন্দাবনের পাঠশালায় এসে পারস্পরিক বিস্মরণ মুছে বৃন্দাবনের সঙ্গে নতুন করে আলাপ পুনঃসঞ্জীবিত করে এবং স্তুতিবাক্যে পণ্ডিতবৃত্তির এই মহৎব্রতে আত্মনিয়োগকে নন্দিত করে: "আমার মামা (বৃন্দাবনের গুরুমহাশয় দুর্গাদাসবাবু) মিথ্যে কথা তো দূরের কথা, কখনো বাড়িয়েও বলেন না; গতবারে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, জীবনে অনেক ছাত্রকেই পড়িয়েছেন; কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ যথার্থ মানুষ হয়েছে কিনা তিনি জানেন না।

যথার্থ মানুষ কখনও চোখে দেখিনি ভাই, তাই দেশ ছেড়ে যাবার আগে তোমাকে দেখতে এসেছি।"

পণ্ডিতমশাই হয়ে বৃন্দাবনের আত্মমর্যাদা বোধ কিছুটা হলেও যে বেড়েছে, তা বোঝা যায় কেশবের হুল-ফোটানো কথার জবাব দেওয়ায়। শুধু তাই নয়, সে যে একটা দেশব্রতী মতাদর্শে প্রাণিত হয়েই এই বৃত্তি গ্রহণ করেছে তাও তার কথায় প্রমাণ পাওয়া যায়: "এই দেশজোড়া মূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত নিজে তো করি ভাই, তার পরে দেখা যাবে

গভর্ণমেন্ট তাঁর কর্তব্য করেন কিনা। নিজের কর্তব্য করার আগে পরের কর্তব্য আলোচনা করলে পাপ হয়।" সর্বোপরি এই পাঠশালার ছাত্ররাই সারা বাংলাদেশের নিরক্ষরতা দুর করতে পারবে — এমন স্বপ্নদর্শী প্রত্যয়ী উচ্চারণও তার মুখ দিয়ে শোনা গেছে। পাঠশালায় গরিব ছাত্রদের পরিবারের বিপদে - আপদেও বৃন্দাবনকে পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়। ষষ্ঠীর বাবা শিবু গোয়ালা এবং ছোট ভাই কেষ্টার কলেরা আক্রান্ত হবার কথা শুনে বৃন্দাবন দ্বিতীয় চিন্তা না করে ছুটে যায় এই গরিব পরিবারের পাশে দাঁড়াতে।

সব মিলিয়ে বলা যায় গৃহী বৈষ্ণব চাষা পরিবারে জন্মে ও বড় হয়ে বৃন্দাবন লেখাপড়া শিখে পাঠশালা খুলে যেভাবে সমাজ-হিতব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিল তা সত্যিই মহত্ত্বের পরিচায়ক। পাঠশালার পণ্ডিত হলেও সে মনোভাবে গোঁড়া ছিল না, এমনকি পাঠশালার জন্য নিজের সর্বস্ব দান করতেও দেখা যায় তাকে পুত্র চরণের মৃত্যুর পর দেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে। বাস্তবিকই সে 'পণ্ডিতমশাই' নামে চিহ্নিত হয়ে গিয়ে পাঠদান ও জ্ঞানবিতরণের ব্রতে নিজের বোধ, বুদ্ধি, প্রাণ সবকিছু সমর্পণ করেছিল। অতএব উপন্যাসটির নায়ক তারই বিশেষণে 'পণ্ডিতমশাই' নামে চিহ্নিত হওয়ায় নামকরণ সার্তক ও সুপ্রযুক্ত হয়েছে বলেই সিদ্ধান্ত করা যায়।

৩.৬ পণ্ডিতমশাই : উপন্যাস-ভাষার বিশিষ্টতা

যেখানে যেমন প্রয়োজন ঠিক সেইরকম বর্ণনা ও সংলাপ সংযোজনের ক্ষমতা শরৎচন্দ্রের লেখনি ছিল অনবদ্য। চলতি কথাবার্তা, ঘরোয়া কথাবলার ভঙ্গি থেকেই তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে ব্যবহৃতব্য সংলাপের উপকরণগুলি বেছে নিতেন। যে পরিস্থিতি, সংঘাত, হৃদয়াবেগ মনোদ্বন্দ্ব তুলে ধরতে হবে তা সবচেয়ে সরলভাবে এবং সবচেয়ে স্পষ্টভাবে রসঘন করে তুলতে হলে ঠিক কি ধরনের কথাবার্তা পাত্রপাত্রীর মুখে বসাতে হবে তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন শরৎচন্দ্র। তাই তাঁর রচিত সংলাপ ও পরিস্থিতি ব্যাখ্যার বর্ণনা বাঙালি ও ভারতীয় পাঠকের কাছে এত স্বাদু।

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-ভাষায় প্রাঞ্জলতার সঙ্গে সচেতন রূপকর্ম নির্মাণের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ করা যায়। এখানে একটি গ্রাম্য জীবনের কথা ষোল আনা পরিমার্জিত ও সুশীল নাগরিক ভাষায় তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে বিষয়ের বিশেষত্বে কোনোরকম হানি ঘটেনি। বিষয় ও ভাষার এই সমন্বয় একান্তই তাঁর নিজস্ব। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'শরৎ হচ্ছে কথার যাদুকর'।

বিভিন্নভাবে শরৎচন্দ্রের ভাষা বৈশিষ্ট্যের নিজস্বতা ফুটে উঠেছে 'পণ্ডিত মশাই' এর আখ্যানে। কোথাও গ্রাম্য নারীর রুক্ষ কথায়, কোথাও আপাত-ভদ্র নারীর আবেগ আহত দুর্বাক্য উচ্চারণে, কোথাও বা ভাবকাঠিন্যের পুরুষ সংলাপে, অথবা কোথাও বস্তুনিষ্ঠ সত্যপ্রকাশক্ষম ঋজুতা প্রকাশের ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতায়, কিংবা কোনও সংস্কারান্ধে ও ঔদ্ধত্যপ্রকাশক ঝুটো জাত্যভিমান প্রকাশের ভাষায় তাঁর এই ভাষানৈপুণ্য প্রকট ভাবে লক্ষগোচর। আবার গ্রাম্য মেয়েলি সংলাপের সেকেলে ভঙ্গি তুলে ধরাতেও 'পণ্ডিতমশাই'-এর স্রষ্টা অনবদ্য।

কয়েকটি উদাহরণ :

ক. "বেন্দা বোষ্টমের ছেলে বুঝি? এক ফোঁটা ছোঁড়ার কথা দেখ।"

খ. "কৈ গা, তোমার গলায় মালা নেই, তেলকসেবা করলে না, কি রকম বোষ্টমের মেয়ে তুমি বাছা?"

গ. "নীচু জাত হয়ে তোর এতবড় মুখ? তুই বলিস মেয়েরা মাঠে যাবে কাপড় ধুতে? একলা আমার বাড়িতেই বিপদ ঢোকেনি রে, তোর বাড়িতেও ঢুকবে।"

ঘ. “তোমার ভয় নেই দাদা, তুমি মরবে না। না হলে, আজ পর্যন্ত যত পেছু ডেকেছি, মানুষ হলে মরে যেত।
...কুকুর বেড়ালও নও — তারা তোমার চেয়ে ভাল — এমন নেমকহারাম নয়।”

‘শরৎচন্দ্রের ভাষা-উপাদান ও গদ্যশৈলী’ শীর্ষক প্রবন্ধে গায়ত্রী দাশ লিখেছেন, “শব্দ চয়নে ও বয়নে এবং তাদের অন্বয়ে বাক্যগঠনে, বিশেষণে, অলঙ্কারে সর্বত্রই একটি মসৃণ প্রসন্ন প্রবাহ তাঁর গদ্যরীতিতে অনুভব করা যায়। তিনি সাধুগদ্যে সাধু ক্রিয়াপদের অস্তিত্ব পরিহার করেননি বটে, কিন্তু সাধুক্রিয়াপদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও গদ্যের ছাঁচ হয়ে উঠেছে বেশ চলিত গদ্যের মতন।”*

শরৎচন্দ্র একটি আঞ্চলিক উপভাষাকে (রাঢ়ী উপভাষা) অবলম্বন করলেও এমন একটি উপভাষাকে অবলম্বন করেছেন নানা দিক থেকে যার ভাষাতাত্ত্বিক প্রতিশ্রুতি সুবিপুল। এই উপভাষা অঞ্চলবিশেষে সীমাবদ্ধ হলেও রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রভৃতি নানা কারণে সমগ্র বাংলার সমস্ত উপভাষী সম্প্রদায়ের কাছেই এটি সুপরিচিত ও অনুকরণযোগ্য। তাই সহজবোধ্য সংযোগ-সংবেদ্যতা এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। উপন্যাস হিসাবে ‘পণ্ডিতমশাই’ এর নানান খামতি থাকলেও পাঠ্যযোগ্যতায় এর ভাষাগত প্রসাদগুণ পাঠককে পড়তে শুরু করার পর না ছেড়ে কাহিনিটি এক নি:শ্বাসে শেষ পর্যন্ত পাঠ করতে প্রায় বাধ্য করে। এটাই তাঁর ভাষার যাদু। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত না হলে এমন সম্মোহনী মোহবিস্তার সম্ভব নয়। তাঁর নিজের বিবৃতি থেকেও বোঝা যায় প্রত্যক্ষ জীবন ছেনেই তাঁর সাহিত্য, তাই এর ভাষাও অকৃত্রিম, বাগ্ময় ও হৃদয়গ্রাহী। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, “...শরৎচন্দ্র সংলাপের গদ্যে তো বটেই, বর্ণনার গদ্যেও বাঙালীর সাধারণ বাচনভঙ্গিমাকে রূপান্তরে রক্ষা করেছেন। এই জন্য মনে হয় শরৎচন্দ্র যেন বাঙালীর মুখের ভাষাতেই উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর রচনার বৈদগ্ধ্যের দুর্মর আভিজাত্য বা অলঙ্কারের নিবিড় প্রলেপ নেই। এই কারণেই তিনি সর্বাপেক্ষা পরিচিত, সর্বাপেক্ষা সুখপাঠ্য, সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।”**

৩.৭ পণ্ডিতমশাই : রাঢ় বাংলার জাতবৈষ্ণব বা বোষ্টম সমাজের সংলগ্নতা ও বিযুক্তি ·

‘পণ্ডিতমশাই’ উপন্যাসটিকে খুব সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায়, এতে বাঙালি বর্ণব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ পরিমণ্ডলে বসবাস করা ‘বোষ্টম’ নামক এক বিশিষ্ট সমাজভুক্ত পরিবারের দুই যুবক-যুবতীর সংযোগ-বিচ্ছেদের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই ‘বোষ্টম’ রা জাতবৈষ্ণব নামে পরিচিত। অগ্রজাতি সমাজপ্রভুত্বে দীর্ঘকালস্থিত ব্রাহ্মণরা এদের ‘ছোটজাত’ হিসেবে চিহ্নিত করে। কলেরার মহামারীর সময় তারিণী মুখুজ্যের ছোটছেলের মৃত্যুর পর ঐ রোগীর জামাপাপড় পান ও রান্নার জলের জন্য ব্যবহার্য পুকুরে কাচার সময় বৃন্দাবন স্বাস্থ্যবিধির স্বার্থে নিষেধ করলে তারিণী বৃন্দাবনকে ফুঁসে উঠে বলে, ***“নীচুজাত হয়ে তোর এতবড় মুখ? তুই বলিস মেয়েরা মাঠে যাবে কাপড় ধুতে?”*** তারিণীর এই সংলাপই বাড়ল গ্রামের ‘পণ্ডিতমশাই’ বৃন্দাবনের ব্রাহ্মণদের চোখে সামাজিক অবস্থান চিনিয়ে দেয়। যতই সে শিক্ষিত হোক, সচ্ছল হোক — ব্রাহ্মণরা তাকে মানে না, অবজ্ঞা তো করেই, তাদের ঈর্ষা এবং হিংসার পাত্র বৃন্দাবন। এর একমাত্র কারণ বৃন্দাবন গৃহী বোষ্টম কুলজাত। কুলীন ব্রাহ্মণদের শাসিত ভৌগোলিক ক্ষেত্রে এই শিক্ষিত ‘নীচু জাত’ কুলজাত ‘পণ্ডিত’-এর মূল্য নাস্তি। বৃন্দাবনের পাঠশালায় এসে তার ‘ছেলেবেলার বন্ধু’ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত

* ‘শরৎ-চর্চা’, সম্পাদনা : হরপ্রসাদ মিত্র, ‘অন্তরা’, ১৯৭৭, পৃ. ১৮৬

** নির্মল দাশ, “বাংলা উপন্যাসের ভাষা / শরৎচন্দ্র ও উত্তরকাল”, ১৯৮২, পৃ. ১৮৭

দুর্গাদাসবাবুর ভাষ্যে কেশবও তাই প্রথমে তাকে খোঁচা দিয়েই কথা বলে, সে খোঁচার মর্মার্থ 'নীচুজাত' রা শুধু শিক্ষিতই হচ্ছে না, তারা শিক্ষাদানের ব্রাহ্মণ্য একচ্ছত্রাধিকারেও ভাগ বসাচ্ছে। তাই বৃন্দাবনকে সে বলে, "আমরা আজকাল সবাই টের পেয়েচি, যদি দেশের কোনো কাজ থাকে তো গরীব নীচু জাতের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা না দিয়ে আর যাই করি না কেন, নিছক অ-কাজ করা। অন্তত আমার তো এই মত যে, লেখাপড়া শিখিয়ে দাও, তখন আপনার ভাবনা তারা আপনি ভাববে।"

যে 'বোষ্টম' সমাজে বৃন্দাবনের জন্ম, তার ইতিহাস অগৌরবের নয়। শ্রীচৈতন্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার বৈষম্যবাদী বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অহিংস সমাজদ্রোহ থেকে এর বিস্তার। "শ্রী চৈতন্যের নাম নিয়ে এরা পতিতোদ্ধারে ব্রতী হয়েছিল। বৈষ্ণবতায় আশ্রিত আরও অনেক দলই এ পথে নেমেছিল। কিন্তু আর কেউ এমন সুংসহত সমাজ গড়ে তুলতে পারেনি। কয়েক শতাব্দী ধরে এই সমাজ টিকে আছে এবং পুষ্টিলাভ করেছে। এই সমাজের দুটি ভাগ। একটি গৃহী জাতবৈষ্ণব-সমাজ, অন্যটি আখড়া কেন্দ্রিক — বাবাজী বৈষ্ণব অধুষিত।"* অষ্টাদশ শতকে দক্ষিণভারত থেকে নবদ্বীপে আগত গোঁড়া বৈষ্ণব উপাসক তোতারাম (জাতে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ) তৎকালের বাংলায় বৈষ্ণবদের মধ্যে নানান উপসম্প্রদায় দৃষ্টে কটাক্ষ করে বলেছিলেন—

"আউল বাউল কর্তাভজা নেতা দরবেশ সাঁই।
সহজিয়া সখী ভাবকী স্মাত জাত গোঁসাই।।
অতিবড়ী চূড়াধারী গৌরাঙ্গ নাগরী।
তোতা কহে এই তেরোর সঙ্গ না করি।।"

কিন্তু তোতারামের এই নিষেধশ্লোক বৈষ্ণব উপসম্প্রদায়ের সংখ্যাও অনুগামী স্রোতে কোনো বাধা হতে পারেনি। তোতারামের পরবর্তীকালের খেদোক্তিতেই তার প্রমাণ রয়ে গেছে —

"পূর্ব কালে তেরো ছিল অপসম্প্রদায়।
তিন তেরো বাড়ল এবে ধর্ম রাখা দায়।।"

বৈষ্ণব উপসম্প্রদায়ের প্রবহমানতার ইতিহাস সন্ধানী গবেষক অজিত দাস লিখেছেন, "তোতারামের উল্লেখিত তেরোটা অচ্ছুৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতর জাত গোঁসাই সম্প্রদায় একটি। এটাই জাত বৈষ্ণব সম্প্রদায়।"*

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের বৃন্দাবন এবং কুসুম দুজনেই এই 'জাতবৈষ্ণব' সমাজের গৃহী অনুগামী পরিবারে প্রতিপালিত। উপন্যাসের সূচনা অনুচ্ছেদেই আখ্যানের এই সমাজপট পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এই বর্ণনায়:

> "কুঞ্জ বোষ্টমের ছোট বোন কুসুমের বাল্য ইতিহাসটা এতই বিশ্রী যে, যখন সে-সব কথা মনে পড়লেও, সে লজ্জায়, দুঃখে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে থাকে।"

উপন্যাসের ঘটনাগতির প্রবাহের ভেতরে পরবর্তী অংশগুলোতে জাতবৈষ্ণব সমাজের আর যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা ফুটে ওঠে সেগুলো হ'ল, ১. কুসুমের 'নিত্যপুজো' করা, ২. বৃন্দাবনের মায়ের 'নাকে তিলক, গলায় মালা', ৩. বৃন্দাবনের প্রয়াত পিতামহ, গৌরদাস অধিকারীর দ্বারা বাড়িতে 'গৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা', ৪. বৃন্দাবনের মারে

---

* 'জাতবৈষ্ণব কথা', অজিত দাস

রোজ অনেক রাত পর্যন্ত 'মালাজপ' করার অভ্যাস, ৫. বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরে 'স্বজাতি ভিন্ন' অন্য সাধারণ দাসীর ঢোকার অনধিকার, ৬. কুঞ্জর শাশুড়ীর 'স্নানের পর তিলকসেবা' করা ইত্যাদি।

কলেরার মহামারীতে বৃন্দাবনের মা মরে যাবার পর কয়েকদিনের ব্যবধানে ছেলে চরণও কলেরা-আক্রান্ত হলে ব্রাহ্মণ কুলীনদের সমাজ-শাসনের স্বরূপ ফুটে বেরোয়। তারিণীর ভাগ্নে হাতুড়ে ডাক্তার গোপাল চরণকে দেখতে যেতে অস্বীকার করে জাতগঞ্জনা দেয় বৃন্দাবনকে। বলে, "মনে ছিল না যে, তারণী মুখুজ্যে এই ডাক্তার বাবুরই মামা? নীচু জাত হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে অপমান!" তারিণীর পায়ে ধরতে যায় বৃন্দাবন, লাথি মেরে পা ছাড়িয়ে দেয় তারণী। পাশের বাড়ি থেকে খড়ম পায়ে খটমট করে বেরিয়ে এসে সবশুনে খুশি মনে ঘোষাল বলে, "শাস্ত্রে আছে কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে। নীচু জাতকে শাসন না করলে সমাজ উচ্ছন্ন যায়।"

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র নিপুণ তুলিচালনায় গ্রামবাংলার আপাত-বিবর্ণ সমাজপটের মধ্যে জাতবৈষ্ণব সমাজের অভ্যন্তরীণ গার্হস্থ্য ও সমাজবন্ধন এবং বিচ্ছেদের চিত্রের সঙ্গে আবেষ্টনীর বর্ণব্রাহ্মণ্য কুলীন সমাজরে সঙ্গে এদের সংলগ্নতা ও বিযুক্তির সংশ্লেষের সারসত্যকে তুলে ধরেছেন। তাতে হিন্দু কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্গে এই জাতবৈষ্ণদের কয়েকপ্রজন্ম বাহিত সামাজিক ভেদ-বিভেদের সম্প্রসারিত উত্তাপের ছোঁয়া পাওয়া যায়। এই তীব্র বিদ্বিষ্ট সমাজ প্রভুদের সঙ্গে গ্রামজীবনে সহাবস্থান করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে হয়েছে বোষ্টমদের।

"পৈতৃক ভদ্রাসন, চাষজমি, পুকুর, চণ্ডীমণ্ডপও নিজস্ব পাঠশালার মতো সম্পন্নতা নিয়েও রাঢ় বাংলার ব্রাহ্মণ্য সমাজ কাঠামোর গ্রামসমাজে শিক্ষিত মানুষ বৃন্দাবনের নূন্যতম মানুষের মর্যাদাও বারে বারে লাঞ্ছিত হয়েছে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ সমাজপ্রভুদের দ্বারা, এর একমাত্র কারণ বৃন্দাবন জাতিপরিচয়ে 'বোষ্টম' বা জাতবৈষ্ণব। এই বাস্তবতার মাত্রান্তর ঘটলেও শতবর্ষ পার করেও এই সমাজব্যাধির স্থিতির মূল যে শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লবে পূর্ণ সজীব - তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মা ও ছেলের মৃত্যুর পর জীবনযুদ্ধে পরাজিত ও নিঃস্ব বৃন্দাবন 'ভিক্ষের ঝুলি' নিয়ে অনির্দেশ্য জীবনে পথে পা বাড়িয়েছে সহজাত জাতবৈষ্ণব জীবনদর্শনের প্রেরণায়।"*

৩.৮ অনুশীলনী

অনুশীলনী - ১

১. 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসটির আখ্যানবয়ন কৌশল বা প্লট বিশ্লেষণ করো।

২. 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসটিকে কোন শ্রেণির উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত করা যায় তা যুক্তিসহ পর্যালোচনা করো।

৩. 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে কিভাবে ব্রাহ্মণ্য শাসিত বাংলার গ্রামজীবনের সংকীর্ণতা ও পশ্চাদপদ দুর্দশার চিত্রকে ধারণ করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো।

৪. 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের প্রধান দুই পুরুষ ও নারী বৃন্দাবন এবং কুসুমের সম্পর্কের টানাপোড়েন আখ্যানের পূর্বাপর ব্যাখ্যা করে আলোচনা করো।

* 'জাত বৈষ্ণব কথা', চতুরঙ্গ, ৪.৮.১৯৯২, পৃ. ২৯৯

৫. 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের নামকরণ কতদূর যুক্তিবহ হয়েছে তা যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো।

৬. 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের ভাষাদৃষ্টির নৈপুণ্য ব্যাখ্যা করো।

৭. 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে রাঢ় বাংলার কৌলিন্য সমাজ কাঠামোর মধ্যে জাতবৈষ্ণব বা বোষ্টম সমাহেজর সংলগ্নতা ও বিযুক্তির দ্বান্দ্বিকতা স্পষ্ট করো।

৮. ''এইজন্যই তোমাদের পাঠশালায় ছেলে জোটেনি — আমার পাঠশালায় জুটেছে" — এই বক্তব্যের সদর্থকতার মধ্যে যে বিরোধীভাষা আছে তা গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের দ্বারা বৃন্দাবনের লাঞ্ছনায় প্রমাণ হয়, 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করো।

৯. ''শরৎচন্দ্র যেন বাঙালীর মুখের ভাষাতেই উপন্যাস রচনা করেছেন" — আলোচনা করো।

১০. পার্থিব ভোগের সব কিছু থেকেও বৃন্দাবনের জীবন কিভাবে রিক্ত হয়ে গেল তা 'পণ্ডিতমশাই'-এর আখ্যান অবলম্বনে আলোচনা করো।

১১. "একটা ব্যতিক্রমী উপধর্মীয় গোষ্ঠীজীবনের নিতান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিপর্যয়ের আখ্যানের মধ্যেও শরৎচন্দ্র ধারণ করে রেখেছেন ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের প্রধান নগর সন্নিকটস্থ গ্রামজীবনের নিদারুণ সভ্যতাবর্জিত মানুষী জীবনের অসহায় কাল-যাপনের সত্যতা।" — 'পণ্ডিতমশাই' অবলম্বনে মন্তব্যটির সত্যতা পর্যালোচনা করো।

১২. নারীর অসহায় অনিকেত আশ্রয়বাসনা 'পণ্ডিতমশাই'-এ কুসুমের জীবনের সার্বিক যাপনে কিভাবে ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো।

১৩. ''তৎকালীন মানবিক বৃত্তির বঙ্গীয় বিধান অনুসারে কুসুম বৃন্দাবনের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র চরণের প্রতি স্নেহার্দ্র হলেও আত্মমর্যাদা ধুলায় লুটিয়ে স্বামীর দাওয়ায় উঠতে চায়নি— এটাই তার চরিত্রের দৃঢ়তার দিক।"—নারী পুরুষ সম্পর্ক বিন্যাসের নিরিখে 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের পরিণতি চিত্রণে মন্তব্যটি কতদূর অর্থবহ তা আলোচনা করো।

১৪. বৃন্দাবনের জীবনের চলার পথে মৃত্যুর অভিঘাত কিভাবে তাকে বেপথু করে দিয়েছে তা আলোচনা করো।

১৫. ''পুত্র-মৃত্যুর শোকের অতল-গহন চাপ সহ্য করতে না পেরে বৃন্দাবন পণ্ডিত যে গ্রামকে ছেড়ে চলে যায়, তা এক মুমূর্ষু সমাজ শাসনের কবলে বিপর্যস্ত। একে অনায়াসে 'মৃত্যু উপত্যকার' সঙ্গে তুলনা করা যায়।" — আলোচনা করো।

১৬. ''মহামূল্য জীবনে বিপর্যয়ের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সমগ্র জীবন বুঝতে বিপর্যয়ের মূল্যবোধ তাই অপরিহার্য।" — 'পণ্ডিতমশাই'-এর বৃন্দাবনের জীবন বিপর্যয়ের নিরিখে মন্তব্যটির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো।

১৭. ''এ বাড়িতে যেদিকেই চোখ পড়ছে, সেই দিকেই তার ছোট হাত দুখানির দাগ দেখতে পাচ্ছি।"— মন্তব্যটির আলোয় বৃন্দাবনের জীবনে জীবন -বিপর্যয় তত্ত্বের অনিকর্তনীয় প্রকোপের ট্র্যাজিক করুণার ফলশ্রুতি আলোচনা করো।

---

* 'নবচেতনায় শরৎচন্দ্র পুনর্বিচার ও পণ্ডিতমশাই', অরূপকুমার দাস, 'সাহিত্যসঙ্গী'

অনুশীলনী - ২

১. পাঠশালাকে কেন্দ্র করে বৃন্দাবনের স্বপ্নের রূপরেখা ব্যাখ্যা করো। গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার ঘোষণাকালেও বৃন্দাবনের এই আদর্শপ্রার্থনা কিভাবে তার কথায় ও কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করো।

২. উপন্যাসের প্লটের সঙ্গে নাটকের প্লটের মৌলিক পার্থক্য ব্যাখ্যা করে 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে কোন কোন ক্ষেত্রে প্লট গ্রন্থনার সূত্র রাখা হয়েছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৩. 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের গ্রন্থনা বা প্লটের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে সংক্ষেপে এর প্লটের ধরন বিষয়ে আলোচনা করো।

৪. কুসুমের যাপনচিত্রে 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের প্লটের কোন বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো।

৫. 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের দশম থেকে পঞ্চদশ — এই ছয়টি পরিচ্ছেদের দ্রুতি ও অভিমুখ পরিবর্তনের বিশিষ্টতা আলোচনা করো।

৬. 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে বাংলার গ্রামসমাজের জীর্ণ সমাজশৃঙ্খলার যে ছাপ ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা করো।

৭. বৈষ্ণব গোঁড়ামীর গৌড়ীয় ধারার চোখে অচ্ছুৎ কারা? জাতবৈষ্ণব সমাজের এই মানুষরা কিভাবে আত্মঅস্তিত্ব রক্ষা করেছিল? উপন্যাসে চিত্রিত তাদের জীবনধারার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৮. উপন্যাসের মধ্যে সংলাপ কিভাবে আখ্যানকে তীক্ষ্ণতা দেয় তা কুঞ্জর শাশুড়ী, কুসুম ও তারিণী মুখুজ্যের একটি করে সংলাপ উদ্ধৃত করে আলোচনা করো।

৯. বোষ্টম বা জাতবৈষ্ণব সমাজের উৎপত্তি ও বিবর্তন আলোচনা করে এদের অস্তিত্বের লড়াইয়ের প্রতীকী চিত্র 'পণ্ডিতমশাই'-এ কিভাবে ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো।

১০. 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাস থেকে গ্রাম্য নারীর রূক্ষ কথা, আপাত ভদ্র নারীর দুর্বাক্য উচ্চারণ ও সংস্কারান্ধ জাত্যভিমানীর উদ্ধত দুর্বাক্য প্রকাশক সংলাপ উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করো।

১১. বোষ্টম সমাজের বাহ্যিক ও গার্হস্থ্য আচারের চিত্রগুলি 'পণ্ডিতমশাই'-এর কোন্ কোন্ চরিত্রের আচরণ অভিব্যক্তি ও কথায় কিভাবে ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো।

১২. "পুত্রবিয়োগের বেদনারূপ বজ্রাঘাতে ঝলসে বৃন্দাবন পণ্ডিত সকল ছাত্রকে পুত্রজ্ঞান করার চৈতন্যের প্রকৃত উচ্চতায় পৌঁছাল," — 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে বৃন্দাবনের পাঠশালা সংশ্লিষ্ট জীবনখণ্ডের পূর্বাপর বর্ণনা করে মন্তব্যটির যৌক্তিকতা পর্যালোচনা করো।

অনুশীলনী - ৩

১. 'পণ্ডিতমশাই'-এর আখ্যানে অপ্রধান চরিত্র হলেও কুঞ্জর বৌ ব্রজেশ্বরী গ্রন্থিমোচনে কী ভূমিকা কিভাবে পালন করেছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২. 'সামাজিক উপন্যাস'-এর বৈশিষ্ট্য কিভাবে 'পণ্ডিতমশাই' এর পারিবারিক আখ্যানের সঙ্গে বিজড়িত হয়েছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৩. 'পণ্ডিতমশাই' - এর আখ্যানের অব্যবহিত পূর্বকালে বাংলাদেশে উচ্চবর্ণ সমাজের নারীদের জীবনও কম দুর্দশাপূর্ণ ছিল না" — এই মন্তব্যটির পক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ ও কুসুমের অসহায়তার তুলনামূলক ব্যাখ্যা করো।

৪. "বৌকে ফেরানো নয়, বৃন্দাবনের দরকার ছিল ছেলেকে বড় করার জন্য পালকমাতা আর মায়ের শাসনবশ দাসী" — উপন্যাসের শেষে এই সত্য কিভাবে প্রমাণিত হয়েছে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

৫. "বৃন্দাবন 'পণ্ডিতমশাই' পরিচয়ে পরিচিত হলেও বাড়লের বর্ণব্রাহ্মণ সমাজের কাছে তার মর্যাদা ছিল না।" ব্রাহ্মণদের দ্বারা বৃন্দাবনের লাঞ্ছনার কার্যকারণ বর্ণনা করে মন্তব্যটি পর্যালোচনা করো।

৬. পাঠশালার ছাত্রদের বিপদে আপদে বৃন্দাবন কিভাবে সুহৃদের মতো পাশে দাঁড়িয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

৭. বৃন্দাবনের মা এবং কুঞ্জর শাশুড়ী দুই বৃদ্ধাই বৈষ্ণব বা বোষ্টম হলেও তাদের আচরণে কীভাবে চারিত্রিক ভিন্নতা ফুটে রেরিয়েছে তা প্রাসঙ্গিক অংশ ব্যাখ্যা করে আলোচনা করো।

৮. 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে কুঞ্জর বিয়ের ব্যাপারটি কিভাবে অতি দ্রুত রূপায়িত হয়েছে তা আলোচনা করো। এই বিয়ে উপন্যাসের মূল আখ্যানের গতিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে তা ব্যাখ্যা করো।

৯. কুঞ্জর বিয়ের পর বোন কুসুমের সঙ্গে কিভাবে তার সম্পর্ক তিক্ততর হয়ে উঠল তা বর্ণনা করো। কোন উড়ো খবরকে ভিত্তি করে এই সম্পর্ক আবার পূর্বের সুস্থতায় ফিরল তা ব্যাখ্যা করো।

১০. কুঞ্জর শাশুড়ীর সঙ্গে কুসুম তীর্থ করতে যাওয়ায় কিভাবে উপন্যাসের ঘটনাবর্ত জটিলতা পেয়েছে তা বর্ণনা করো।

১১. বাড়ল থেকে বৃন্দাবনের সঙ্গে চরণ ক'বার কুসুমের বাড়িতে এসেছে? চরণের প্রতি কিভাবে কুসুমের মাতৃস্নেহ উদ্রিক্ত হয়? চরণকে কিছুদিন রাখার প্রস্তাব কুসুম কি বলে প্রত্যাখ্যান করে?

১২. বৃন্দাবনের পাঠশালা প্রতিষ্ঠার অন্তঃপ্রেরণা কী ছিল? তার পাঠশালার বিশেষ নিয়ম কি ছিল? এই পাঠশালার আর্থিক সঙ্গতি কে বহন করত? গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাওয়ার কেশবকে পাঠশালা হস্তান্তরে এর আদর্শরক্ষা সম্ভব হবে কিনা তা আখ্যানের পূর্বাপর বর্ণনা করে তোমার স্বাধীন মত হিসাবে ব্যাখ্যা করো।

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. 'নবচেতনায় শরৎচন্দ্র পুনর্বিচার ও পণ্ডিতমশাই', অরূপকুমার দাস, 'সাহিত্যসঙ্গী'।

২. 'শরৎচন্দ্র', সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা: লি:।

৩. 'শরৎচন্দ্র পুনর্বিচার', তরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং।

৪. 'শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ', সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'প্যাপিরাস'।

৫. 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার', অজিতকুমার ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং।

৬. 'শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা', সুরেশচন্দ্র মৈত্র, 'পুথিপত্র'।

৭. 'শরৎচন্দ্র', গোপালচন্দ্র রায়, 'আনন্দ'।

৮. 'শরৎচন্দ্র : দেশ, কাল সাহিত্য', উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, 'পুস্তক বিপণি'।

৯. 'শরৎ সমীক্ষা', শুদ্ধসত্ত্ব বসু, 'মণ্ডল বুক এজেন্সী'।

১০. 'জাতবৈষ্ণব কথা', অজিত দাস, 'সময়', ৮এ, পশুপতি বোস লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৩।

একক ৪ ❑ আরণ্যক—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গঠন

৪.১ উপন্যাসের প্রকাশকাল

৪.২ পরিকল্পনা

৪.৩ পটভূমি

৪.৪ 'আরণ্যক' ভ্রমণকাহিনি, ডায়েরি অথবা উপন্যাস

৪.৫ 'আরণ্যক' উপন্যাসে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনা

৪.৬ উপন্যাসের কাহিনির সংক্ষিপ্তসার

৪.৭ চরিত্রবিচার

৪.৮ অনুশীলনী

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ উপন্যাসের প্রকাশকাল

'আরণ্যক' বিভূতিভূষণের চতুর্থ উপন্যাস। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে মাসিক ''প্রবাসী'' পত্রিকায় কার্তিক ১৩৪৪ থেকে ফাল্গুন ১৩৪৫ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৪৫ (ইং ১৯৩৯)। প্রকাশক, কাত্যায়নী বুকস্টল।

৪.২ পরিকল্পনা

'পথের পাঁচালী' রচনার সময়ই বিভূতিভূষণের মাথায় 'আরণ্যক' উপন্যাস রচনারও পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছিল। ১৯২৪-এর পুজোর সময় তিনি ভাগলপুরে খেলাতচন্দ্র এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ছিলেন। ১৯২৬-এ 'পথের পাঁচালী' লেখা শুরু এবং ১৯২৮-এ শেষ। এই বছরেই ২৬ এপ্রিল 'বিচিত্রা'য় প্রকাশের জন্য পাণ্ডুলিপি পাঠানো হয়। এই সময়কার একাধিক দিনলিপিতে বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' রচনার মানসিক প্রস্তুতির কথা জানা যায়। ঘোড়ায় চড়ে গভীর জঙ্গল পরিক্রমার সময়ই তাঁর মুগ্ধমন সিদ্ধান্ত নেয় 'এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো একটি কঠিন শৌর্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্যজীবনের ছবি। এই বন, এই নির্জনতা, ঘোড়ায় চড়া,

মন হারানো অন্ধকার— এই নির্জনে জঙ্গলের মধ্যে ঝুপড়ি বেঁধে থাকা, মাঝে মাঝে যেমন আজ গভীর বনের নির্জনতা ভেদ করে যে সুঁড়িপথটা বাগানের দিকে চলে গিয়েছে দেখা গেল; ঐরকম সুঁড়িপথ এক বাথান থেকে আর এক বাথানে যাচ্ছে—পথ-হারানো রাত্রের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়ায় করে ঘোরা, এদেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই Virile, active life এই সন্ধ্যায় অন্ধকারে-ভরা গভীর বন, ঝাউবনের ছবি—এই সব'। (*'স্মৃতির রেখা'*, ১২.২.১৯২৮)।"

'অপ্রকাশিত দিনলিপি'তেও একই পরিকল্পনার পুনরাবৃত্তি। সেখানে তিনি তাঁর দেখা এই অরণ্যমহল নিয়ে সরাসরি উপন্যাস রচনার কথা ভাবছেন, 'A novel on forests. এতে নির্জনতার কথা থাকবে, গাছপালার কথা থাকবে। অরণ্যানী—খাড়া উঁচু পাথরের স্তর। ধাতুপ্রস্তর। রঙীন ঝরণা যা অরণ্যের মধ্য দিয়ে নেমে আসছে। পাহাড়ের মাথায় রাঙা রোদ। শিউলিবন...দাবানল টাঁড়বারো অনেকে দেখেছে—গভীর রাত্রের অন্ধকারে খাদানের কাছে দাঁড়িয়ে মহিষের পালকে রক্ষা করবে।' (২১.২.১৯৩৪)। বোঝাই যায় যে, কেবল 'আরণ্যক'-এর পরিকল্পনাই নয় তার নানা ঘটনা ও চরিত্রও লেখকের মনে ক্রমশ একটি স্থায়ীরূপ নিচ্ছে। প্রকৃতি, মানুষ, সৌন্দর্য, সরলতা, দারিদ্র্য ও শোষণ সবকিছুই একটি সংহত চেহারা নিয়ে উপন্যাসে চলে এসেছে, সঙ্গে এসেছে তাদের নানা অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও যুগসঞ্চিত সংস্কার। অরণ্যপরিবেশে যাকে চূড়ান্ত সত্য বলে মনে হবে, অথচ অরণ্যের বাইরে যা চূড়ান্ত অবিশ্বাস্য। উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণের মধ্য দিয়েও আসলে বিভূতিভূষণের সমকালীন অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন। জঙ্গলমহলে কাজ করার সময় তাঁর দেখা বিভিন্ন ঘটনা, চরিত্র বা তাঁর নিজস্ব অনুভূতি সম্পর্কে তিনি যে সমস্ত টুকরো টুকরো দিনলিপি লিখেছিলেন উপন্যাসে অনেক ক্ষেত্রেই তার হুবহু প্রতিফলন ঘটেছে।

৪.৩ পটভূমি

১৯২৩-এর শেষদিকে বিভূতিভূষণ খেলাতচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত হন। ভাগলপুর এবং পূর্ণিয়া জেলার বিস্তৃত অরণ্য-অঞ্চলের সঙ্গে এই সময়েই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। বিশেষ করে ইসমাইলপুর এবং আজিমাবাদের অরণ্যপরিবেশেই ছিল তাঁর কাছারিতে বসবাস এবং ব্যাপক পরিভ্রমণ। প্রকৃতিপ্রেমিক লেখককে এই অরণ্যভূমি মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছিল। অবশ্য প্রথম দর্শনেই লেখক যে এই অঞ্চলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাননি দিনলিপিতে তারও প্রমাণ আছে; "অভিজ্ঞতায় একথা বুঝলাম, আজ যে স্থানটা নতুন, ভাল লাগে না, মন বসে না, যত দিন যায় তার সঙ্গে স্মৃতির যোগ হতে থাকে। ততই সেটা মধুর হয়ে ওঠে। এই ইসমাইলপুর ১৯২৪ সালে আন্দামান দ্বীপের মত ঠেকতো। আজিমাবাদকে তো মনে হতো (১৯২৫ সালেও) সভ্য জগতের প্রান্তভাগ জঙ্গলে ভরা বেলজিয়াম কঙ্গোর কোন নির্জ্জন উপনিবেশ—আজকাল সেই আজমাবাদ সেই ইসমাইলপুর ছেড়ে যেতে হবে ভেবে কষ্ট হচ্ছে।" (*'স্মৃতির রেখা'*) 'আরণ্যক' উপন্যাসের সূচনাতেও সত্যচরণের একই মনোভাবের প্রতিফলন; 'জীবনের বেশীর ভাগ সময় কলিকাতায় কাটাইয়াছি। বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গ, লাইব্রেরী, থিয়েটার, সিনেমা, গানের আড্ডা—এ-সব ভিন্ন জীবন কল্পনা করিতে পারি না—এ অবস্থায় চাকুরীর কয়েকটি টাকার খাতিরে যেখানে আসিয়া পড়িলাম, এত নির্জন স্থানের কল্পনাও কোনদিন করি নাই। প্রথম দিন-দশেক কি কষ্টে যে কাটিল। কতবার মনে হইল চাকুরীতে দরকার নেই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভাল। অবিনাশের অনুরোধে কি ভুলই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে আসিয়া—এ-

জীবন আমার জন্য নয়।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সত্যচরণকেই জঙ্গল যেন পেয়ে বসে। তার নিজেরই স্বীকারোক্তি, 'দিন যতই যাইতে লাগিল, জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল। এর নির্জনতা ও অপরাহ্নের সিঁদুর-ছড়ানো বন-ঝাউয়ের জঙ্গলের কি আকর্ষণ আছে বলিতে পারি না—আজকাল ক্রমশ মনে হয় এই দিগান্তব্যাপী বিশাল বনপ্রান্তর ছাড়িয়া, ইহার রোদপোড়া মাটির তাজা সুগন্ধ এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি ছাড়িয়া কলিকাতার গোলমালের মধ্যে আর ফিরিতে পারিব না।' ('আরণ্যক', তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

৪.৪ 'আরণ্যক' ভ্রমণকাহিনি, ডায়েরি অথবা উপন্যাস

'আরণ্যক' সম্পর্কে বিভূতিভূষণ ভূমিকার এক জায়গায় বলেছিলেন, 'ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরি নহে—উপন্যাস। অভিধানে লেখে 'উপন্যাস' মানে বানানো গল্প। অভিধানকার পণ্ডিতদের কথা আমরা মানিতে বাধ্য। তবে 'আরণ্যক'-এর পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশী নদীর অপরপারে এমন দিগন্ত-বিস্তীর্ণ অরণ্যপ্রান্তর পূর্বে ছিল, এখনও আছে। দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার বনপাহাড় তো বিখ্যাত।'' 'উপন্যাস' মানে কেবল 'বানানো গল্প'—একথা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়। উপন্যাসকে বলা হয় 'মানবজীবনের গদ্যময় রূপ' (prose of man's life)। বাস্তবতার ভিত্তির ওপরই মানবজীবন-কাহিনি দাঁড়িয়ে থাকে, তবে ঔপন্যাসিক অবশ্যই বাস্তবের সঙ্গে কল্পনাকে মিলিয়ে দেন। 'আরণ্যক'-এর ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়েছে। যে অরণ্যপ্রান্তর-এর পটভূমি তা সম্পূর্ণ বাস্তব। সত্যচরণের দেখা প্রকৃতি ও মানুষ আসলে বিভূতিভূষণেরই দেখা। 'স্মৃতির রেখা'র মতো দিনলিপিতে বর্ণিত নানা ঘটনা, চরিত্র এবং লেখকের মন্তব্য অবিকল 'আরণ্যক'-এ ব্যবহৃত হয়েছে। তাই 'আরণ্যক' বাস্তব ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

'আরণ্যক'-এর উপন্যাসলক্ষণ বিচারের আগে এক 'ভ্রমণবৃত্তান্ত' বা 'ডায়েরি' বলা চলে কিনা সে আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে। লেখকের বোধ হয় মনে হয়েছিল যে, সত্যচরণের জঙ্গলমহলে প্রবেশ ও প্রস্থান পাঠকের কাছে একজন ভ্রমণকারীর অভিজ্ঞতা বলে মনে হতে পারে। নিজের জিনিসপত্র নিয়ে একদিন সত্যচরণের বি.এন.ডব্লিউ রেলওয়ের একটি ছোটো স্টেশনে নামা, নিজের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বর্ণনা, তারপর একদিন বিদায়গ্রহণের মধ্যে যেন ভ্রমণকাহিনির স্বভাবধর্ম আছে। ভ্রমণকারীর মতোই যেন সত্যচরণ একের পর এক নানা ঘটনা ও চরিত্রকে নিরাসক্তভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বিশ্লেষণও করেছে। কোনোকিছুর সঙ্গেই স্থায়ী একাত্মবোধ স্থাপন করেনি। কিন্তু নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সত্যচরণ লবটুলিয়া-আজিমবাদ-ইসমাইলপুরে যায়নি, সে গিয়েছিল চাকরি নিয়ে। চাকরি একটা নির্দিষ্ট বন্ধন, যথার্থ ভ্রমণকারী কোনো নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতার শর্তে আবদ্ধ থাকে না। সে নিজের পছন্দমতো পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। দীর্ঘকাল কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকলে ভ্রমণকারীর সচলতা নষ্ট হয়ে যায়। 'আরণ্যক' উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণ তার নিয়োগকর্তা জমিদারের প্রায় পঁচিশ হাজার বিঘে জঙ্গলমহালের প্রজাবিলির দায়িত্ব নিয়ে এসেছিল। দায়িত্ব পালন না করা পর্যন্ত স্থানত্যাগের স্বাধীনতা তার ছিল না। তাই ভ্রমণবৃত্তান্তের চলমানতা আলোচ্য গ্রন্থে নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে লেখকের খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার সম্মিলিত রূপ এই রচনা। এটা ভ্রমণকাহিনির লক্ষণ নয়।

'ডায়েরি' কথাটিও 'আরণ্যক' প্রসঙ্গে স্বয়ং লেখক ব্যবহার করেছেন। ডায়েরি বা দিনপঞ্জিতে প্রতিটি নির্দিষ্ট দিনে লেখকের অভিজ্ঞতা বা তাঁর মনোভাব বর্ণিত হয়। প্রত্যেকটি দিনের কাহিনিই আলাদা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কিন্তু 'আরণ্যক'-এর ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। আঠারোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই বৃহৎ উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যচরণ। তাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত ঘটনা আবর্তিত হয়েছে এবং কাহিনি পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। সত্যচরণের দিনওয়ারি অভিজ্ঞতা এখানে নেই, থাকার কথাও নয়। তাই একে 'ডায়েরি' হিসেবে চিহ্নিত করাও সম্ভব নয়। তবে 'আরণ্যক'-প্রসঙ্গে লেখকের মনে দিনপঞ্জির কথা মনে হওয়ার একটি কারণ থাকতে পারে। তাঁর 'স্মৃতির রেখা' নামক দিনপঞ্জি বা 'অপ্রকাশিত দিনলিপি'-তে 'আরণ্যক'-এর বহু কাহিনি ও ঘটনা পরপর সাজানো আছে। অনেক ক্ষেত্রেই উপন্যাসে তার অবিকল অনুসরণ ঘটেছে। যেহেতু গোটা উপন্যাসটাই অনেক ক্ষেত্রে সত্যচরণের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রতিফলন, তাই তাকে ডায়েরিধর্মী বলে মনে হতেই পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তা ডায়েরি নয়। 'স্মৃতির রেখা'র সঙ্গে 'আরণ্যক'-এর যা পার্থক্য ডায়েরির সঙ্গে উপন্যাসেরও সেই পার্থক্য।

এবার উপন্যাস হিসেবে 'আরণ্যক'-এর শিল্পসার্থকতা বিচার্য—স্বয়ং লেখক একে নিশ্চিতভাবেই 'উপন্যাস' আখ্যা দিয়েছেন, তাই এর উপন্যাসধর্মটির সন্ধান প্রয়োজন। উপন্যাসের পরিচিত ও প্রচলিত কাঠামো এখানে হয়তো সব সময় খুঁজে পাওয়া যাবে না। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ করেছিলেন, 'উপন্যাসটির পরিকল্পনার অভিনবত্ব বিস্ময়কর—ইহা সাধারণ উপন্যাস হইতে সম্পূর্ণ নূতন প্রকৃতির। প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসের গৌরব তাহা এই উপন্যাসে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতি এখানে মুখ্য, মানুষ গৌণ।'' ('বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা') সাধারণভাবে উপন্যাসে মানবপ্রাধান্য হয়। কারণ, আগেই বলা হয়েছে যে, উপন্যাস মুখ্যত মানবজীবনের কাহিনি। এই উপন্যাসেও প্রকৃতি মানবসম্পর্ক-বহির্ভূত নয়। এখানে মানুষ এবং প্রকৃতি অন্তরঙ্গসূত্রে গ্রথিত। 'আরণ্যক' অর্থ অরণ্য-সম্পর্কিত। তাই অরণ্যপ্রকৃতি এবং অরণ্যমানুষ এখানে সমান গুরুত্বের দাবিদার। এখানে কখনো প্রকৃতি মানুষের হয়ে কথা বলেছে আবার কোথাও মানুষই প্রকৃতির হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে।

কিন্তু বিভূতিভূষণের নায়ক সত্যচরণ তো 'প্রস্তাবনা'-তে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিল, 'শুধু বনপ্রান্তর নয়, কত ধরণের মানুষ দেখিয়াছিলাম।' শুধু বনপ্রান্তরের বর্ণনায় উপন্যাস হয় না, মানুষই বনপ্রান্তরের দ্রষ্টা, আস্বাদক, মানুষই অরণ্যপ্রকৃতিকে সজীব করে তোলে। তাই 'আরণ্যক'-এ শেষ পর্যন্ত মানুষেরই প্রাধান্য। অরণ্য-প্রকৃতিকে ছেড়ে আসার জন্য সত্যচরণের যত না কষ্ট হয়েছে, তার চেয়েও বেশি কষ্ট হয়েছে অরণ্যলালিত মানুষগুলিকে ছেড়ে আসার জন্য। নাঢ়া লবটুলিয়ার বিস্তৃত অরণ্যপ্রান্তরকে বিনষ্ট করার জন্য সত্যচরণের মনে একটা অপরাধবোধ ছিল, আর মমত্ববোধ ছিল সেখানকার মানুষগুলির প্রতি; 'কেমন আছে কুন্তা, কত বড় হইয়া উঠিয়াছে সুরতিয়া, মটুকনাথের টোল আজও আছে কিনা, ভানুমতী তাহাদের সেই শৈলবেষ্টিত আরণ্যভূমিতে কি করিতেছে, রাখালবাবুর স্ত্রী, ধ্রুবা, গিরিধারীলাল, কে জানে এতকাল পরে কে কেমন অবস্থায় আছে।.... আর মনে হয় মাঝে মাঝে মঞ্চীর কথা। অনুতপ্তা মঞ্চী কি আবার স্বামীর কাছে ফিরিয়াছে, না আসামের চাবাগানে চায়ের পাতা তুলিতেছে আজও। কতকাল তাহাদের আর খবর রাখি না।' ১৯২৭-এর ৩০ নভেম্বর-এর দিনপঞ্জিতে ('স্মৃতির রেখা') বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাস-ভাবনার পরিচয় দেন এইভাবে, 'মানুষের সত্যিকার ইতিহাস কোথায় লেখা আছে। জগতের বড় বড় ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধবিগ্রহের ঝঞ্ঝনায়, সম্রাট সম্রাজ্ঞী সেনাপতি মন্ত্রীদের সোনালী পোশাকের জাঁকজমকে দরিদ্র গৃহস্থের কথা ভুলে গিয়েছেন। পথের ধারে আমগাছে তাদের পুঁটলি বাঁধা ছাতু কবে ফুরিয়ে গেল, কবে তার শিশুপুত্র প্রথম পাখী দেখে সানন্দে মুগ্ধ হয়ে ডাগর শিশুচোখে চেয়েছিল, সন্ধ্যায় ঘোড়ার হাট থেকে ঘোড়া কিনে এলে পল্লীর মধ্যবিত্ত ছেলে তার মায়ের মনে কোথায় ঢেউ

বইয়েছিল—দু হাজার বছরের ইতিহাসে সে সব কথা লেখা নেই—থাকলেও বড় কম।' এরপরেই আরও একধাপ এগিয়ে তিনি বলেন, 'কিন্তু আরও সূক্ষ্ম, আরও তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস চাই। আজকের তুচ্ছতা হাজার বছর পরের মহাসম্পদ। মানুষ মানুষের বুকের কথা শুনতে চায়।'

একজন মহৎ স্রষ্টার এ এক অসামান্য আত্মোদ্‌ঘাটন। 'পথের পাঁচালী' বা 'আরণ্যক'-এর স্রষ্টাকে এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। রাজারাজড়ার কাহিনি বা নিছক প্রকৃতিবর্ণনাকে তিনি উপন্যাস বলে মনে করেন না। উপন্যাস বলবে মানুষের বুকের কথা, উপন্যাসে মানুষের প্রাণের স্পন্দন শোনা যাবে, 'আরণ্যক'-এ এই দুয়েরই উপস্থিতি লক্ষ করা যাবে। ড. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 'আরণ্যক'-এর উপন্যাসলক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে যে-কথা বলেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, 'একখানি সার্থক উপন্যাসের কাহিনির তিনটি বিশেষ গুণ—ব্যাপকতা, গভীরতা ও অখণ্ডতা। যে কাহিনির মধ্যে জীবনের বিচিত্র ব্যাপার স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই, সে কাহিনি জীবনের অন্তস্তলে প্রবেশ করে নাই সে কাহিনিকে সার্থক উপন্যাস বলি না। তৃতীয়ত, সার্থক উপন্যাসের কাহিনি এক অখণ্ড বস্তু, ইহাতে মানুষের ভাব, চিন্তা ও কর্মের বিচিত্রমুখিতা পাঠকের সামনে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সুষম জগৎ উপস্থিত করে। ইহার ছোট-বড় ঘটনা ও চরিত্র, ইহার বিভিন্ন পরিবেশ, ক্রমশ মনুষ্য-জীবনের একটি মহান সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে। যে কাহিনিতে এই অখণ্ডতা নাই, সেই কাহিনিতে পরিণতিও নাই, অর্থাৎ সে কাহিনি অপরিণত। বস্তুত কাহিনির অখণ্ডতা মূলত ঔপন্যাসিকের দৃষ্টির অখণ্ডতা। (ভূমিকা, 'বিভূতি-রচনাবলী', পঞ্চম খণ্ড)।

ইচ্ছে করেই এই উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ রাখা হল। কারণ, একটি সার্থক উপন্যাসের মূল লক্ষণগুলিই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। 'আরণ্যক'-এ নায়ক নিঃসন্দেহে সত্যচরণ, কিন্তু প্রচলিত অর্থে কোনো নায়িকার সন্ধান এখানে পাওয়া যাবে না। অনেক নারীচরিত্রের সঙ্গেই একের পর এক তার পরিচয় হয়েছে, অনেকের প্রতি মমত্ববোধ করেছে। কিন্তু কারো সঙ্গেই একাত্মতা বোধ করেনি। একমাত্র সাঁওতাল রাজকন্যা ভানুমতী সম্পর্কে তার ক্ষণিকের দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল। লবটুলিয়া ছাড়ার পূর্বমুহূর্তে অন্তত একবার তার মনে হয়েছিল, 'এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম। ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম।...ভানুমতী কালো বটে, কিন্তু এমন নিটোল স্বাস্থ্যবতী মেয়ে বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। আর ওর ওই সতেজ সরল মন। দয়া আছে, মায়া আছে, স্নেহ আছে—তার কত প্রমাণ পাইয়াছি। ....ভাবিতেও বেশ লাগে। কি সুন্দর স্বপ্ন।'' এটা ছিল নিছক স্বপ্নবিলাস। সত্যচরণেরও জানা ছিল যে, ভানুমতীকে নিয়ে ঘর বাঁধা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, সে অরণ্যমহলের ভূমিপুত্র নয়, এখানে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য সে আসেওনি। তাই নায়ক-নায়িকার টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে সাধারণ উপন্যাসের কাহিনি যেভাবে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়—. এখানে তার নিদর্শন নেই।

এই উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে রয়েছে মহাকাব্যিক বিস্তার। তাই এখানে সত্যচরণ নায়ক হলে নায়িকা হন বিশাল অরণ্যপ্রকৃতি। এই প্রকৃতি নারীর মতোই রহস্যময় এবং জটিল। ধীরে ধীরে সত্যচরণের সামনে সে নিজের রহস্য যেন উন্মোচিত করতে থাকে। 'কত রূপে কত সাজেই যে বন্য প্রকৃতি আমার মুগ্ধ অনভ্যস্ত দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া আমাকে ভুলাইল—কত সন্ধ্যা আসিল অপূর্ব্ব রক্তমেঘের মুকুট মাথায়, দুপুরের খরতর রৌদ্র আসিল উন্মাদিনী ভৈরবীর বেশে, গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাবরণী সুরসুন্দরীর সাজে হিমস্নিগ্ধ বনকুসুমের সুবাস মাখিয়া, আকাশভরা তারার মালা গলায় অন্ধকার রজনীতে কালপুরুষের আগুনের খড়গ হাতে দিগ্বিদিক ব্যাপিয়া বিরাট

কালীমূর্তিতে।' ('আরণ্যক', দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, তৃতীয় অধ্যায়) প্রকৃতির বিভিন্নরূপ একদিকে যেমন সত্যচরণকে একাধারে বিস্মিত, মুগ্ধ ও শঙ্কিত করেছিল, অপরদিকে প্রকৃতিলালিত মানুষগুলিও তাকে এক নতুন অভিজ্ঞতা এনে দেয়। কিন্তু কেবল ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণাই উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়, তা একই সঙ্গে একটি জাতি ও সভ্যতার উত্থান ও পতনেরও ইতিহাস। রাজা দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে সত্যচরণের যে মনে হয়েছিল 'আমি, বনোয়ারী সেই বিজয়ী জাতির প্রতিনিধি, বৃদ্ধ দোবরু পান্না, তরুণ যুবক জগরু, তরুণী কুমারী ভানুমতী সেই বিজিত পদদলিত জাতির প্রতিনিধি—উভয় জাতি আমরা এই সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি'—তা ঐতিহাসিক সত্যেরই প্রতিধ্বনি। রাজা দোবরু পান্নার বিপর্যয়ের মধ্যে 'ইতিহাসের যে বিরাট ট্র্যাজেডি' পাঠকের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়—তাই উপন্যাসটিকে মহাকাব্যিক উচ্চতায় তুলে দেয়। এখানেই উপন্যাস হিসেবে 'আরণ্যক'-এর সার্থকতা।

৪.৫ 'আরণ্যক' উপন্যাসে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনা

প্রকৃতিপ্রীতি বিভূতিভূষণের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যমুগ্ধতার মধ্যেই এই মনোভাব সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্যেরও তিনি আজন্ম সন্ধানী। তাঁর প্রকৃতিভাবনার সঙ্গে অনেকেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করেছেন। 'পথের পাঁচালী'-র অপুকে গড়ে তুলেছিল নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম এবং ইছামতীর দুই তীরের অপরূপ প্রকৃতি। এক্ষেত্রে প্রকৃতির যেন শিক্ষকের ভূমিকা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর মনোভাবও ছিল তাই, 'Let nature be your teacher.' তা ছাড়া ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর মতো বিভূতিভূষণও অনেক ক্ষেত্রেই অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখতে চেয়েছেন। এই প্রকৃতি সবসময়ই সজীব। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর 'Prelude' কিশোর নায়কের মনে হয়েছিল যে, 'there is a spirit in the woods.' এই 'spirit' বিভূতিভূষণের অনেক চরিত্রকেই গড়ে তুলেছিল। এই কারণেই তাঁর 'ইছামতী' উপন্যাসের ভবানী বাঁড়ুয্যের মনে হয়েছিল, 'অমনি স্নেহময়ী মা আছে এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে, নইলে এই মা, এই স্নেহ এখানে থাকতো না।' 'কুশল পাহাড়ী' গল্পের সাধুজিরও এই একই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ঘটেছিল। 'কবিই তিনি বটে? বাবা। এখানে বসে বসে দেখি। এই শালগাছটিতে ফুল ফোটে, বর্ষাকালে পাহাড়ে ময়ূর ডাকে, ঝর্ণা দিয়ে জল বয়ে যায়, তখন ভাবি, কবিই বটে তিনি।...তাঁর এই কবিরূপ দেখে ধন্য হয়েছি।' 'কুশল পাহাড়ী'-র এই প্রাচীন সাধুর মতোই তাঁর স্রষ্টা বিভূতিভূষণ বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে বিশ্বস্রষ্টার উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন। 'আরণ্যক'-ও তার ব্যতিক্রম নয়।

প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপকে কীভাবে আত্মস্থ করা সম্ভব তা 'আরণ্যক' উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদের সূচনাতেই বিভূতিভূষণ জানিয়ে দেন, 'প্রকৃতি তাঁর নিজের ভক্তদের যা দেন, তা অতি অমূল্য দান। অনেক দিন ধরিয়া প্রকৃতির সেবা না করিলে কিন্তু সে দান মেলে না। আর কি ঈর্ষার স্বভাব প্রকৃতিবাণীর প্রকৃতিকে যখন চাহিব, তখন প্রকৃতিকে লইয়াই থাকিতে হইবে, অন্য কোন দিকে মন দিয়াছি যদি, অভিমানিনী কিছুতেই তাঁর অবগুণ্ঠন খুলিবেন না।' এইভাবেই লবটুলিয়া বা ফুলকিয়া বইহারের প্রকৃতি সত্যচরণের সামনে ধীরে ধীরে তার গোপন রহস্য ও সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছিল। মহালে প্রথম পা দেবার পর সত্যচরণের মনে অরণ্য সম্পর্কে ছিল প্রবল বিরূপতা, তাই প্রকৃতিও নিজেকে তার কাছে উন্মোচিত করেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রকৃতির সঙ্গে সত্যচরণের ব্যবধান যেন কেটে যায়, সে অনায়াসে তার অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারে। তখন তার রূপমুগ্ধ মনের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি, 'গভীর

রাত্রে ঘরে বাহিরে একা আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি, অন্ধকার প্রান্তরের অথবা ছায়াহীন ধূ-ধূ জ্যোৎস্নাভরা রাত্রির রূপ। তার সৌন্দর্যে পাগল হইতে হয়—একটুও বাড়াইয়া বলিতেছি না—আমার মনে হয় দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ যাহারা, তাহাদের পক্ষের সে-রূপ না দেখাই ভাল, সর্ব্বনাশা রূপ সে, সকলের পক্ষে তার টাল সামলানো বড় কঠিন। তবে একথাও ঠিক, প্রকৃতিকে সে রূপে দেখাও ভাগ্যের ব্যাপার। এমন বিজন বিশাল উন্মুক্ত অরণ্য-প্রান্তরে, শৈলমালা, বনঝাউ, আর কাশের বন কোথায় যেখানে-সেখানে।'

লক্ষণীয়, ওপরের বর্ণনায় কেবল প্রকৃতির স্নিগ্ধ মধুর রোম্যান্টিক রূপটিই চিত্রিত হয়নি, তার 'সর্বনাশী রূপটি'রও আভাস পাওয়া গেছে। প্রকৃতির ভয়ংকর-মূর্তিটির আর একটি চিত্র আঁকা হয়েছে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের রুক্ষ রূপ বর্ণনায়, 'দুপুরে বাহিরে দাঁড়াইয়া তাম্রাভ অগ্নিবর্ষী আকাশ ও অর্দ্ধশুষ্ক বনঝাউ ও লম্বা ঘাসের বন দেখিতে ভয় করে—চারি ধার যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে মাঝে মাঝে আগুনের হল্‌কার মত তপ্ত বাতাস সর্ব্বাঙ্গ ঝলসাইয়া বহিতেছে—সূর্য্যের এ রূপ, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের এ ভয়ানক রুদ্র রূপ কখনও দেখি নাই, কল্পনাও করি নাই।'' আবার প্রকৃতির অপার্থিব রহস্যময় রূপটিও মাঝে মাঝে সত্যচরণের চোখে ধরা পড়ে যায় এইভাবে, 'চারি ধারে চাহিয়া মনে হয় এ সে পৃথিবী নয়, এতদিন যাহাকে জানিতাম, এ স্বপ্নভূমি, এই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নায় অপার্থিব জীবেরা এখানে নামে গভীর রাত্রে, তারা তপস্যার বস্তু, কল্পনা ও স্বপ্নের বস্তু।' এই সব-কিছু মিলিয়েই 'আরণ্যক' উপন্যাসে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ গড়ে ওঠে। কখনও অধ্যাত্মবাদীর দৃষ্টিতে, কখনও রোম্যান্টিকের দৃষ্টিতে আবার কখনও বস্তুবাদীর দৃষ্টিতে তিনি প্রকৃতিকে দেখেন এবং তাকে সেভাবেই চিত্রিত করেন।

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রকৃতির বিপুলতা ও রহস্যকে চেনবার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন বিভূতিভূষণ— এটি তাঁর নিজের স্বীকৃতি। আবার 'বিশ্বমানবের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগসূত্রটি' আবিষ্কারের অন্তর্দৃষ্টিও তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই পান। ('বিচিত্রা' আশ্বিন, ১৩৩৮, 'রবীন্দ্রনাথের দান') রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' ছিল বিভূতিভূষণের অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ। আমি 'ক্ষণিকা'-র বড় ভক্ত। সে-কথায় রাত হয়ে গেল অনেক, কারণ 'ক্ষণিকা'-র কথা একবার উঠলে আমি স্থির থাকতে পারি না।' ('অপ্রকাশিত দিনলিপি' ১১ আগস্ট ১৯৩৩। পৃঃ ১২৮) মনে হয় 'ক্ষণিকা'র কোনো কোনো কবিতার মধ্যে লেখক তাঁর জীবনদর্শনের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনিও যেন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে বলতে পারতেন, 'যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ, ফুরাইলে দিস ফুরাতে।' ('উদ্বোধন', 'ক্ষণিকা') তাই একই সঙ্গে প্রকৃতির তুচ্ছতম রূপটিরও যেমন তিনি ভক্ত, তেমনি আবার প্রকৃতির বিপুল ও গভীর রহস্যেরও তিনি উপাসক। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে বিশ্বস্রষ্টার গূঢ় উপস্থিতির কথা তাই তাঁর বারে বারে মনে হয়। ফুলকিয়া বইহারের জ্যোৎস্নারাত্রির অপরূপ সৌন্দর্যলোক সম্পর্কে তাই তাঁর অনুভূতি, 'অমন মুক্ত আকাশ, অমন নিস্তব্ধতা, অমন নির্জনতা, 'অমন দিগ্‌দিগন্ত বিসর্পিত বনানীর মধ্যেই শুধু অমনতর রূপলোক ফুটিয়া ওঠে। জীবনে একবারও সে জ্যোৎস্নারাত্রি দেখা উচিত, যে না দেখিয়াছে ভগবানের সৃষ্টির একটি অপূর্ব রূপ তাহার নিকট চির অপরিচিত রহিয়া গেল।'

একদিকে ঈশ্বরসৃষ্ট এই রূপলোক, অপরদিকে এই রূপলোকের অন্তরালের অধিবাসী কিছু মানুষ—এই দুইয়ের মিলিত রূপই বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনায় প্রতিফলিত। কিছু চরিত্র এই উপন্যাসে আছে যারা প্রকৃতিরই সন্তান। রাজা দোবরু পান্না ও তার পরিবারের মানুষদের অস্তিত্ব অরণ্য-মহালের বাইরে কল্পনাও করা যায় না। তেমনই কল্পনা করা যায় না যুগলপ্রসাদ বা বালক নৃত্যশিল্পী ধাতুরিয়াকেও। লক্ষণীয় শহরের দিকে পা বাড়াতে

গিয়েই ধাতুরিয়াকে প্রাণ দিতে হয়েছে। 'ছুটি' গল্পের ফটিকের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। সত্যচরণ অরণ্যে ছিল বহিরাগত, তাই যতই এর প্রতি সে আকৃষ্টবোধ করুক এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু প্রকৃতির সন্তান যুগলপ্রসাদেরা ওখানেই থেকে যাবে। নগরসভ্যতার প্রতিনিধি সত্যচরণেরা নিজেদের জীবন ও জীবিকার স্বার্থে অরণ্যকে ধ্বংস করে। কিন্তু যুগলপ্রসাদেরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অরণ্যকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এদের প্রকৃতিপ্রেম নিঃস্বার্থ। সত্যচরণের ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণ এই সত্যটিই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৪.৬ উপন্যাসের কাহিনির সংক্ষিপ্তসার

প্রথম পরিচ্ছেদ : উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণ বি.এ. পাশ করেও দীর্ঘকাল বেকার হয়ে বসেছিল। অনেক চেষ্টাতেও তার চাকরি জোটেনি। এদিকে মেসে তার দুমাসের টাকা বাকি পড়েছে। না দিতে পারলে খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। সৌভাগ্যক্রমে পথে কলেজের পুরনো বন্ধু সতীশের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। সেদিন সরস্বতী পুজো। তার সঙ্গে ছাত্রজীবনের হোস্টেলে গিয়ে আহার যেমন জোটে তেমনি জোটে সন্ধ্যায় জলসার নিমন্ত্রণ। এই হিন্দু হোস্টেলেই পুরনো বন্ধু অবিনাশের সঙ্গে সত্যচরণের দীর্ঘকাল বাদে দেখা। এরা ময়মনসিংহের কোনো অঞ্চলের জমিদার। তাছাড়া পূর্ণিয়া জেলায় তাদের একটা বিশাল জঙ্গল-মহালও আছে। সেখানে প্রায় বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘে জমি বন্দোবস্তের চাকরি নিয়ে সত্যচরণ কলকাতা ছেড়ে সেই নির্জন অরণ্যপ্রদেশে গিয়ে উপস্থিত হয়। প্রথম প্রথম সত্যচরণের অবস্থা হয়ে উঠেছিল শোচনীয়। সেই নির্জন নিঃসঙ্গ পরিবেশে দিনকাটানোই হয়ে উঠেছিল অসম্ভব। কিন্তু ক্রমশই এখানকার প্রকৃতি ও মানুষ তাকে আকৃষ্ট করতে থাকে। ধীরে ধীরে সেও এই পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সমস্ত অরণ্য-মহালটি পায়ে হেঁটে পরিদর্শন সম্ভব নয়। তাই সত্যচরণকে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে হয়। এত হাজার বিঘে জমি অল্প সময়ে বিলি করা খুবই কঠিন। তা ছাড়া আর একটি সমস্যাও ছিল, সমস্ত জমিটাই গঙ্গার চর থেকে উঠে এসেছে। ত্রিশ বছর আগে গঙ্গার ভাঙনে যে জমি বিলুপ্ত হয়েছিল তাই আবার অন্যধারে চর হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু জমিদার কিছুতেই পুরনো প্রজাদের জমি দেবে না। তাহলেই তারা স্বত্ব দাবি করে বসবে। তাই ন্যায্য মালিকদের বঞ্চিত করে বেশি পয়সায় বাইরের লোকজনকে জমিতে বসানোই জমিদারের নির্দেশ। বঞ্চিত প্রজাদের প্রতি সত্যচরণ মমতা-বোধ করে। ধীরে ধীরে তার চারপাশের প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটতে থাকে। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যে সে যেমন মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়, তেমনই এখানকার দরিদ্র সরল মানুষগুলিও তাকে আকৃষ্ট করতে থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ধীরে ধীরে অরণ্যের রুক্ষতা ও ভয়াবহতার সঙ্গে সত্যচরণ পরিচিত হতে থাকে। নিরীহ দরিদ্র মানুষগুলির বিপরীতে একদল হৃদয়হীন, লোভী ও নিষ্ঠুর মানুষের মুখোমুখিও তাকে হতে হয়। সে বোঝে প্রকৃতি মানেই কেবল জ্যোৎস্না নয়, তা অনেক সময় রুক্ষ, জলহীন এবং উত্তপ্ত। নিরীহ সরল মানুষগুলির বিপরীতে অত্যাচারী মহাজন নন্দলাল ওঝারাও আছে, যে ফুলকিয়া বইহারের পুরনো তহশিলদারকে সরিয়ে তার বড়ো ছেলেকে সেখানে বসাতে চায়। কারণ, সেখানে কাঁচা পয়সা আদায়ের অনেক সুযোগ। সত্যচরণ রাজি না হওয়ায় নন্দলাল স্টেটের চিরশত্রু হয়ে থাকল। তবে এই পর্বে সত্যচরণের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হল গ্রীষ্মের

অসহ্য উত্তাপ, মারাত্মক জলকষ্ট এবং বিধ্বংসী দাবানল। প্রকৃতির যে এমন নিষ্ঠুর দিক আছে তাও এইভাবে ধীরে ধীরে তার কাছে স্পষ্ট হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : 'পুণ্যাহ' উৎসব হয় আষাঢ় মাসে। পুণ্যাহ মানে হল 'পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠানের শাস্ত্রসম্মত দিন'। আসলে জমিদারেরা যেদিন প্রজাদের কাছ থেকে নতুন বৎসরের জন্য খাজনা আদায় শুরু করতেন সেদিনই 'পুণ্যাহ' উৎসব। সত্যচরণ এই উপলক্ষে ধারে-কাছের সমস্ত দরিদ্র প্রজাদেরও নিমন্ত্রণ জানায়। অতি দরিদ্র নিম্নবর্ণের মানুষেরা সামান্য চীনাদানা, গুড় এবং জলো টক দই খাওয়ার জন্য যেভাবে উঠোনে বসে প্রবল বৃষ্টিতে ভিজল তা দেখে সত্যচরণ দুঃখ পায়। এত গরিব দেশ এবং গরিব মানুষ যে থাকতে পারে তা তার জানা ছিল না। এদের প্রতি গভীর মমতা নিয়েই সে একদিন এই দরিদ্র মানুষগুলিকে নিমন্ত্রণ করে নানা সুখাদ্য পরিবেশন করায়। জীবনের সেরকম ভোজ খাওয়ার কথা তারা কল্পনাও করেনি।

এই পর্বে ধাওতাল সাহুর মতো মহাজনের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাও সত্যচরণের একটা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। এরকম সরল, নিরাসক্ত ও দার্শনিক মহাজন বিরল। সে অনেক সময়ই বিনা জামিনে প্রজাদের টাকা ধার দেয়, ঋণশোধের জন্য কোনো তাগাদা করে না, মামলা করা তার স্বভাববিরোধী। তাই হাজার হাজার টাকার দলিল অনায়াসে তামাদি হয়ে যায় এবং সে নির্বিকার চিত্তে তা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। অপরদিকে জয়পাল কুমারের মতো দরিদ্র মানুষের শান্ত, অলস উদ্বেগহীন জীবনযাত্রা সত্যচরণের ওপর ধীরে ধীরে একটা প্রভাব ফেলে যায়। চঞ্চল, গতিশীল এবং উৎকণ্ঠাপ্রবণ যে নাগরিক জীবনের সে এতকাল অংশীদার ছিল এর সঙ্গে তার মিল নেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অরণ্যের নানাধরনের চরিত্রের সঙ্গে সত্যচরণের পরিচয় হতে থাকে। প্রবল প্রতাপশালী দেবী সিং রাজপুতের বিধবা স্ত্রী কুন্তার দুর্দশার কথা পাটোয়ারি তাকে জানায়। একদা যে চরম ভোগ-বিলাসের মধ্যে দিন কাটিয়েছে, সে এখন রাতের অন্ধকারে ম্যানেজারবাবুর পাতের এঁটো ভাত নেবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। ছেলেমেয়েদের জন্য লুকিয়ে কুল চুরি করতে গিয়ে ইজারাদারের লোকজনের হাতে মার খায়। আবার প্রকৃতিও ক্রমশ সত্যচরণকে হাতছানি দেয়। বুনো মহিষের ভয় কাটিয়ে সে ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গল-পরিক্রমা করতে থাকে, গ্রাম্য মেলায় গিয়ে সেখানকার লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। আবার এই মেলাতেই গিরিধারীলালের মতো সাচ্চা মানুষের দেখাও সে পায়। আর দেখা পায় নটুয়া বালক ধাতুরিয়ার মতো শিল্পীর। যে হো-হো নাচ বা ছক্কর-বাজি নাচ শিখেই খুশি নয়, তার লক্ষ্য অনেক দূরে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মাঝে মাঝে জঙ্গল থেকে নানা অতিপ্রাকৃত ঘটনার খবর আসে। রামচন্দ্র আসিন বা বৃদ্ধ ইজারাদারের যুবক পুত্রের শোচনীয় পরিণতির কোনো যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা হয় না। অনেকেই নাকি দেখেছে যে রাতের বেলা তাদের খাটিয়ার নীচে জঙ্গল থেকে একটি সাদা কুকুর এসে ঢোকে। আর ভোরবেলায় সে একটি মেয়েমানুষ হয়ে বেরিয়ে যায়। এর অনিবার্য ফল হল তাদের উন্মাদ হয়ে যাওয়া অথবা শোচনীয় মৃত্যুবরণ।

সত্যচরণের মনে হয়েছিল যে, শহরের আলোকোজ্জ্বল বৈঠকখানায় যে কাহিনি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে, এই আদিম অরণ্যের মধ্যে তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবে এই পর্বে রাজু পাঁড়ে চরিত্রটিই সত্যচরণকে আকৃষ্ট করে সবচেয়ে বেশি। এই গরিব ব্রাহ্মণ চরিত্রটি আসলে ভক্ত মানুষ, তার মধ্যে একটি কবিসত্তাও লুকোনো রয়েছে। দু-বিঘে জমি ইজারা নিয়েও সে কোনো চাষের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি, চীনাঘাসের দানা খেয়েই

ছ-মাস কাটিয়ে দিয়েছে। সাত্ত্বিক-প্রকৃতির এই মানুষটির খেতে কাজ করার বদলে গাছের তলায় বসে আধ্যাত্মিক চিন্তায় বিভোর হওয়াই তার বেশি পছন্দের। তাছাড়া রাজুর আর একটি গুণও ছিল। শুয়োরমারি বস্তিতে কলেরার প্রাদুর্ভাব হওয়ার সময়ে জড়িবুটি নিয়ে রাজু চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এর বিনিময়ে সে কোনো অর্থের প্রত্যাশা করে না।

মহালিখারূপের ভীষণ জঙ্গলের মধ্যেও সে অজ্ঞাত এক সৌন্দর্যভূমি রয়েছে সেটাও এই সময়েই সত্যচরণের আবিষ্কার। হিংস্র জন্তুর ভয়কে উপেক্ষা করে এর মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ানোটি ক্রমশ তার নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই অরণ্যের মধ্যেই যেন সভ্যতার আদিম স্তরটি লুকোনো আছে। তাই অরণ্য আদিম মানুষের বাসস্থান।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : জঙ্গল-মহালে এখন ম্যানেজারবাবুর ব্যাপক পরিচিতি। দেশের জন্য তার মন মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয়ে ওঠে ঠিকই। কিন্তু এখানকার প্রকৃতির মধ্যেও সে যেন নতুন ধরনের আকর্ষণ বোধ করে। আবার রাসবিহারী সিং-এর মতো দুর্দান্ত মহাজনের বাড়িতে নিমন্ত্রণ বজায় রাখতে গিয়ে এই ধনী অন্তঃপুরের রুচি ও সৌন্দর্যের অভাবও তার চোখে পড়ে। সেখানে কেবল স্থুল প্রাচুর্যের নিদর্শন। তবে রাসবিহারীর বাড়িতে শিল্পী ধাতুরিয়ার সাক্ষাৎলাভ সত্যচরণের আনন্দের কারণ হয়। এই নৃত্যশিল্পী বালকটিকে তার ভালো লাগে। ধাতুরিয়ার সাধ কলকাতায় গিয়ে নাচ দেখানো। অনেক কষ্ট করে সে যে-সব ভালো ভালো নাচ শিখেছে সেখানেই তার প্রকৃত সমঝদারের দেখা পাওয়া যাবে। কিন্তু কঠোর বাস্তব সত্যটি সত্যচরণের জানা ছিল। শহরে ধাতুরিয়ার কোনো স্থান নেই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপটি উপলব্ধি করতে হলে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হয়, প্রকৃতির আরাধনা করতে হয়। কেবল বাইরে থেকে ক্ষণকালের জন্য দেখলে এর অন্দরমহলে প্রবেশ করা যাবে না। তা ছাড়া প্রকৃতি তার ভক্তদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আনুগত্য দাবি করে, আংশিক আনুগত্য নয়। সত্যচরণ যে মুহূর্তে এই সত্যটি উপলব্ধি করে, সেই মুহূর্তেই প্রকৃতি তার কাছে আর অজানা থাকে না। নির্জন বিশাল লবটুলিয়া বইহারের দিগন্তব্যাপী নিস্তব্ধ অরণ্যে ঘোড়ার উপরে বসে, অথবা গভীর রাতে ঘরের বাইরে একা দাঁড়িয়ে সত্যচরণ ক্রমশ প্রকৃতির অজানা রহস্য, মাধুর্য বা রোমাঞ্চের সন্ধান পায়। আবার মাঝে-মাঝেই কঠোর বাস্তব উঁকি মারে। সীতাপুর গ্রামের এক বাঙালি ডাক্তার রাখালবাবুর অকালমৃত্যুতে তার পরিবারের শোচনীয় দুরবস্থা সত্যচরণকে ব্যথিত করে। এই নিঃস্ব পরিবারটির জন্য জমিদারি থেকে কিছু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা—তার চাকরিজীবনের আর একটি সৎ কাজ। তবে সরস্বতী কুণ্ডী এবং তার সৌন্দর্যের নীরব উপাসক যুগলপ্রসাদের সঙ্গে পরিচয়ই বোধ হয় সত্যচরণের জীবনের চরম প্রাপ্তি। প্রকৃতির এরকম সৌন্দর্যও যেমন তার এর আগে চোখে পড়েনি, তেমনই যুগলপ্রসাদের মতো মানুষও সে আগে আর দেখেনি। নিজের পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করে সে সরস্বতী কুণ্ডীর চারধারে নানা দুষ্প্রাপ্য ফুলের গাছ বসিয়ে যাচ্ছে। সত্যচরণও উৎসাহিত হয়ে সরস্বতী কুণ্ডীকে সুন্দরতর করার কাজে হাত দেয়।

নবম পরিচ্ছেদ : লবটুলিয়া আসার তিন বছর বাদে সত্যচরণের মানসিকতা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। এখন আর শহর তার ভালো লাগে না। ওপরওয়ালাদের ক্রমাগত তাগাদা সত্ত্বেও জঙ্গল নষ্ট করে প্রজা বসাতে তার মন চায় না। বিচিত্র ধরনের আরও কিছু মানুষের সে দেখা পায়। মটুকনাথ পাঁড়ের মতো সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞানহীন

ব্রাহ্মণ পন্ডিত কাছারিতে এসে উপস্থিত হয়। যেখানে সভ্যজগতের মানুষেরই দেখা নেই, সেখানে সে টোল খুলবে। সম্পূর্ণ ফাঁকা ঘরে বসে সে কল্পিত ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়ায়। আবার দুর্ধর্ষ রাজপুত সর্দার ছট্টু সিং ও তার দলবল কীভাবে নিরীহ গাঙ্গোতা প্রজাদের ফসল লুঠ করে নিতে চায় তাও সত্যচরণ চোখের সামনেই দেখে। আপাতত হাঙ্গামা ঠেকানো যায় বটে, কিন্তু ছট্টু সিং-এরা যে ভবিষ্যতে চরম অশান্তির কারণ হয়ে উঠবে তাও তার কাছে স্পষ্ট হয়। আবার ফুলকিয়া বইহারের নির্জন অরণ্যে তাঁবু খাটিয়ে থাকার সময়ই সত্যচরণ বুনো মহিষের দেবতা টাড়বারোর কথা শোনে। এই দেবতা নাকি শিকারিদের হাত থেকে বুনো মহিষদের রক্ষা করেন।

দশম পরিচ্ছেদ : জমি জরিপের কাজে প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও সত্যচরণকে দলবল নিয়ে জঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে থাকতে হয়। কর্মচারীদের সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, তেমনই জঙ্গলের দরিদ্রতম অধিবাসীদের জীবনযাত্রা দেখে সে চিন্তিত হয়। শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য নক্‌ছেদী ভকতরা সপরিবারে যে কলাইয়ের ভূষির মধ্যে শুয়ে থাকে এটা জানার পর সে বোঝে যে, প্রকৃত ভারতবর্ষকে চেনা কত কঠিন। ফসল উঠে যাওয়ার পর ফুলকিয়া বইহারের চেহারা পালটে যায়, বাইরে থেকে ব্যবসায়ীরা মাল কিনতে আসে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আসে নানা দোকানদার ও ফিরিওয়ালা। ঠাকুর-দেবতারও আমদানি ঘটে, রং-তামাশা দেখানো লোকেরাও এসে ভিড় জমায়। সকলেরই এটা দুপয়সা রোজগারের সময়। এখানে নগদ পয়সার কারবার বেশি নেই। ফসলের বিনিময়ে ফিরিওয়ালারা দরিদ্র প্রজাদের জিনিস বেচে এবং তাদের মারাত্মকভাবে ঠকায়। এখানেই আবার বৃদ্ধ নট দশরথের দেখা মেলে। এই ষাট বছরের বৃদ্ধ যখন রং মেখে 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচ নাচে তখন হাসি সামলানো কঠিন হয়। আবার নক্‌ছেদী ভকতের বালিকা-বধূ মঞ্চীর মধ্যে সত্যচরণ এক চিরন্তন নারীর সন্ধান পায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ : সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না এবং তার পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা ছিল সত্যচরণের অরণ্যজীবনের সবচেয়ে বড়ো লাভ। এই রাজবংশই এই অঞ্চলের প্রকৃত মালিক। উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে ছোটনাগপুরের সীমানা, পূর্বে কুশী নদী, পশ্চিমে মুঙ্গের—একদা এই ছিল এঁদের রাজ্যের সীমানা। এঁরা বীর এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী। এদেরই পূর্বপুরুষেরা মোগল সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছে, সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু সেই বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়াতেই এদের সমৃদ্ধির অবসান। সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম নেতা দোবরু পান্না বীরবর্দী এখন অতিবৃদ্ধ এবং খুবই গরিব। তিনি এখন সপরিবারে খোলার চালের বাড়ির বাসিন্দা, গোরু-মহিষ চরানোই এখন তাঁদের জীবিকা। তথাপি এই বনভূমির আদিম অধিবাসীরা তাঁকে এখনো রাজার সম্মান দেয়। সত্যচরণও তাঁকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছে। তবে রাজার নাতির মেয়ে ভানুমতীই সত্যচরণকে মুগ্ধ করেছিল বেশি। তার প্রতি তার মনের গোপন কোণে একটা দুর্বলতাও দেখা দেয়। এই প্রাচীন রাজবংশের সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে সত্যচরণ এক নিষ্ঠুর ঐতিহাসিক সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের ইতিহাস যেন কেবল্ বিজয়ী আর্যসভ্যতার ইতিহাস, বিজিত অনার্যজাতির ইতিহাস নয়। অথচ এরাই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী, এরাই প্রকৃত ভূমিপুত্র।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : মাঝে মাঝে কাছারির ম্যানেজার হিসেবে সত্যচরণকে নানা বিচিত্র ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। কখনও রাজু পাঁড়ের ফসলের খেতকে বুনো শুয়োরের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তাকে বন্দুক নিয়ে উপস্থিত হতে হয়, কখনও রাজুর তরুণ বয়সের প্রেমকাহিনিও শুনতে হয়। আবার কখনও একটি গোঁড় পরিবার, অথবা এক বৃদ্ধ সাধুর সঙ্গেও তার জঙ্গলে দেখা হয়ে যায়। তবে কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের সঙ্গে

পরিচিত হয়ে সত্যচরণের ভালো লাগে। এই গ্রাম্য কবিটি জমি চাওয়ার জন্য তার কাছে আসেনি, এসেছিল কবিতা শোনানোর জন্য। এটিই সত্যচরণের সবচেয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে সে একদিন কবিপত্নীর সঙ্গে আলাপও করে আসে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : লবটুলিয়া ও নাঢ়া বইহারের ওপর সত্যচরণের টান বাড়তে থাকে। সার্ভের কাজের জন্য বাইরে গেলে তার মনে হয় যে, সে বিদেশে আছে। পরিচিত চরিত্রগুলির সঙ্গে দেখা হলে তার মন ভালো হয়ে যায়। অনায়াসেই তাদের ঘরে সে আহার্য গ্রহণ করতে পারে। তবে দোবরু পান্নার রাজধানীতে ঝুলনপূর্ণিমার উৎসব দেখার অভিজ্ঞতা সত্যচরণের কাছে অতুলনীয় বলে মনে হয়। জ্যোৎস্নারাতে ভানুমতী ও তার সহচরীদের সমবেত নাচগান এক অপরূপ স্বর্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে। এর মধ্য দিয়ে যেন প্রাচীন ভারতবর্ষের হারানো সংস্কৃতিরই একটি পরিচয় ফুটে ওঠে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : শহরের লোকের জঙ্গল সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা এবং হাস্যকর ধারণার একটা উদাহরণ একদিন সত্যচরণ হাতেনাতেই পেয়ে যায়। কলকাতা এবং পূর্ণিয়া থেকে এক বাঙালি রায়বাহাদুরের পরিবার সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে পিকনিক করতে এসেছে। এদের প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখার চোখ নেই, রূপ আস্বাদনের ক্ষমতা নেই, আবার এর মধ্যে যে বিপদের আশঙ্কা আছে সে সম্পর্কেও তারা অবহিত নয়। একটা সামান্য দো-নলা শটগান হাতে নিয়ে এই ভীষণ অরণ্যে এরা প্রবেশ করেছে। এদের কাজ প্রকৃতিকে সবদিক দিয়েই দূষিত করা। ঘুরে ফিরে পুরনো চরিত্রদের সঙ্গে সত্যচরণের মাঝে-মাঝেই দেখা হয়। তাদের সুখ-দুঃখের খবর সে নেয়, তারাও সত্যচরণকে নিজেদের লোক ভেবে অনেক মনের কথা বলে। কেবল এখানকার প্রকৃতিই নয়, এখানকার মানুষগুলির সঙ্গেও সে ক্রমশ একাত্ম হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে রাজা দোবরু পান্নার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সত্যচরণ চকমকিটোলায় যায়। মহাজনেরা ঋণের দায়ে তাদের গোরু-মহিষগুলিকে আটকে রেখে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার হস্তক্ষেপে সমস্যার আপাতত সমাধান হয়। ভানুমতীকে সঙ্গে নিয়ে সত্যচরণ দোবরু পান্নার সমাধিতে ফুল ছড়িয়ে দিয়ে যেন এক ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করে। আর্যজাতির কোনো বংশধর বোধ হয় এই প্রথম কোনো অনার্য রাজার স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : ধাওতাল সাহু মহাজনের নির্লোভ এবং নিরাসক্ত চরিত্রের পরিচয় সত্যচরণ আর একবার পায়। সরকারের রেভিনিউ দাখিল করবার প্রয়োজনে তার দশ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়। ধাওতাল কোনো হ্যান্ডনোট ছাড়াই ম্যানেজারবাবুকে অতগুলো টাকা দিয়ে দেয়। আর টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত সে একদিনও কাছারির পথ মাড়ায়নি পাছে কেউ মনে করে যে, সে টাকার তাগাদা দিতে এসেছে। মৃত রাখালবাবুর পরিবারের খোঁজ নিতে গিয়ে তার অবিবাহিতা তিন বয়স্ক কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে সত্যচরণের দুশ্চিন্তা বাড়ে। বিহারের এই সুদূর গ্রামাঞ্চলে এদের উপযুক্ত পাত্র মেলা সম্ভব নয়। এই বাঙালি পরিবারটি যে দ্রুত তাদের বাঙালিত্ব হারিয়ে ফেলছে এ সম্পর্কে তার মনে কোনো সন্দেহই থাকে না। ঘোর বর্ষার দিনে মাইলের পর মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে সত্যচরণের মনে এক অনাস্বাদিত আনন্দের অনুভূতি জাগে। এই বিপুল ও মহান সৌন্দর্যের আড়ালে কোনো এক মহান অদৃশ্য দেবতার উপস্থিতি অনুভব করে। ইসমাইলপুরের কাছারিতে এক বর্ষামুখর শ্রাবণ-দিনে বালকশিল্পী ধাতুরিয়ার সঙ্গে সত্যচরণের আবার দেখা। এখনও তার মনে কলকাতায় যাওয়ার বাসনা, কারণ, সেখানে নাকি নাচের কদর আছে। কিন্তু মাস দুই পরে বাটারিয়া স্টেশনের অদূরে রেললাইনের ধারে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। এটি আত্মহত্যা হতে পারে। কিন্তু তার কারণ জানা যায়নি। তিন বছরের মধ্যে নাঢ়া

বইহার আর লবটুলিয়ার সমস্ত জমি বিলি হয়ে যায়। বাকি থাকে সরস্বতী কুণ্ডীর তীরবর্তী বনভূমি। এ জমি সবচেয়ে বেশি উর্বর, এর জন্য চাহিদাও বেশি। আর কতদিন এই অরণ্যভূমিকে বাঁচানো যাবে, এ সম্পর্কে সত্যচরণের মনেও সন্দেহ জাগে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : এখনও যুগলপ্রসাদের আশা যে, সত্যচরণ সরস্বতী কুণ্ডীটি বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। তাই এখনও সে মহালিখারূপের পাহাড়ে নতুন নতুন গাছপালার সন্ধান করে বেড়ায়। কুণ্ডীর ধারে ধারে পুঁতবে। কিন্তু সত্যচরণের জানা আছে যে, লবটুলিয়া তো গেছেই, সরস্বতী কুণ্ডীও যাবার মুখে। জমির ক্ষুধা বড় ভয়ানক। এরই মাঝে গনোরি তেওয়ারীর দুঃখের জীবনের কাহিনি তাকে শুনতে হয়। একটা জিনিস ক্রমশ সত্যচরণের চোখে পড়ে। যুগলপ্রসাদ ছাড়া এখানকার সবাই বৈষয়িক উন্নতি নিয়ে মাথা ঘামায়, জমি আর মোষের পরিমাণ বৃদ্ধি হলেই তারা খুশি। প্রকৃতি থাকল কি গেল তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। লবটুলিয়া ছাড়ার আগে সত্যচরণ যে-কটি সৎ কাজ করে তার মধ্যে একটি হল কুন্তাকে বিনা খাজনায় দশ বিঘে জমি দেওয়া।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : সন্ধ্যার পর লবটুলিয়াকে দেখতে এখন নতুন লাগে। এখন সেখানে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ব্যাপী শস্যক্ষেত্র আর মাঝে মাঝে অজস্র ছোটো ছোটো গ্রাম। প্রত্যেকটি বাড়িই জঙ্গলের বাঁশে ছাওয়া। কাশ ডাটার বেড়া সেখানে। এই নতুন জনপদে নানা ধর্ম ও বিশ্বাসের মানুষের ভিড়। জাতি বা বর্ণ নিয়ে এখানে কেউ মাথা ঘামায় না, তাই গাঙ্গোতা দ্রোণ মাহাতো ব্রাহ্মণ মটুকনাথ পণ্ডিতকে উপেক্ষা করে শিবপুজো করে। এই নতুন সমাজে মটুকনাথদের নির্দেশ অচল। ইতিমধ্যে ছটপুজো এসে যায়। কার্তিক মাসের ছট-পরব এদেশের বড়ো উৎসব। যেখানে একদা নীলগাইয়ের দল দৌড়ে যেত, হায়েনার হাসি ও বাঘের গলার আওয়াজ শোনা যেত সেখানে এখন উৎসবের কোলাহল। সত্যচরণকে বিভিন্ন টোলায় ছটের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হয়। এর মধ্যেই একদিন গিরিধারীলালের মতো নিরীহ এবং অসুস্থ মানুষকে সত্যচরণের নির্দেশে বন থেকে কাছারিতে নিয়ে আসা হয়। কুষ্ঠ হয়েছে সন্দেহে তাকে কেউ ছোঁয় না, আর তার সারা গায়ে হয়েছে এক রকমের ঘা, রাজু পাঁড়ের জড়িবুটির চিকিৎসায় সে ভালো হয়ে যায়। সত্যচরণ এই দরিদ্র নিরীহ মানুষটিকেও বিনা সেলামিতে কিছু জমির ব্যবস্থা করে দেয়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : সত্যচরণের জঙ্গল থেকে বিদায় নেবার সময় এসে গেছে। যুগলপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে শেষবারের মতো ভানুমতীর সঙ্গে সে দেখা করতে যায়। ভানুমতীদের আতিথেয়তার এবারেও তুলনা নেই। তবে সত্যচরণের মনে এখন বিষণ্ণতার সুর। এই বন, এই পাহাড় বা এই মানুষগুলির সঙ্গে তার আর কোনোদিনই দেখা হবে না। যাবার সময় ভানুমতী হঠাৎ সত্যচরণের প্রতি মনের দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলে, আর সত্যচরণেরও মনে হয় যে, ভানুমতীকে বিবাহ করে এখানে থেকে গেলেই বোধ হয় ভালো হত। কিন্তু তার এও জানা যে, বাস্তবে তা সম্ভব নয়। তবে লবটুলিয়া ছাড়ার সময় একটি দুঃখ সত্যচরণের মনে থেকেই যায়। চাকরির শর্ত পালন করে সব জমি সে বিলি করেছে ঠিকই কিন্তু তার হাতেই তো এ অপূর্ব বনানীর ধ্বংস হয়েছে। এর জন্য অরণ্য-দেবতাদের কাছে সে ক্ষমা-প্রার্থী। জঙ্গল ছেড়ে আসার পনেরো-ষোলো বছর বাদেও মাঝে মাঝে স্বপ্নের মতো অরণ্যজীবনের স্মৃতি তার মনকে উদাস করে দেয়। সেখানকার মানুষগুলির কথাও তার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। এই স্মৃতিটুকুই এখন তার একমাত্র সম্বল।

৪.৭ চরিত্রবিচার

ক. সত্যচরণ : 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রচলিত অর্থে নায়িকা না থাকলেও এর নায়ক নিঃসন্দেহে সত্যচরণ। নায়ক না বলে কেন্দ্রীয় চরিত্র বললেও ক্ষতি নেই। উপন্যাসের প্রথম থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত তার একক অবস্থিতি। বন্ধু অবিনাশদের পূর্ণিয়া জেলার জঙ্গল-মহলে চাকরি নিয়ে এক শীতের বিকেলে বি.এন.ডব্লিউ রেলওয়ের একটি ছোটো স্টেশনে সত্যচরণের নামা থেকে উপন্যাসের কাহিনির আরম্ভ আর প্রায় বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘে জমি বন্দোবস্ত করে তার ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনির ওপর যবনিকাপাত। আঠারোটি পরিচ্ছেদের প্রায় প্রতিটিতেই সত্যচরণ ক্রমাগত নতুন নতুন ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, ধীরে ধীরে প্রকৃতির রহস্য তার সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, এখানকার মানুষগুলিকে তার ভালো লাগা শুরু হয়েছে—এই সব অভিজ্ঞতার বিবরণের মধ্যে দিয়ে যেমন উপন্যাস গড়ে ওঠে, তেমনই সত্যচরণ চরিত্রের ক্রমপরিণতির একটি চিত্রও পাওয়া যায়।

লবটুলিয়ায় পা দেবার প্রথম দিন দশেক সত্যচরণের বেশ কষ্টে কেটেছিল। 'কতবার মনে হইল চাকুরীতে দরকার নাই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভাল।' কিন্তু ক্রমশ এখানকার সরল দরিদ্র মানুষগুলিকে তার ভালো লাগতে শুরু করে। আর জঙ্গলের আকর্ষণও ক্রমশ বাড়তে থাকে; 'দিন যতই যাইতে লাগিল, জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল।' এই উপন্যাসে সত্যচরণের মানবপ্রীতি এবং প্রকৃতিপ্রীতি পাশাপাশি চলেছে। 'প্রস্তাবনা'-তেই সে জানিয়েছিল, 'শুধু বনপ্রান্তর নয়, কত ধরনের মানুষ দেখিয়াছিলাম।' কথাটি আক্ষরিকভাবেই সত্য। প্রকৃতি বিভিন্ন ঋতুতে তার কাছে বিভিন্ন রূপে দেখা দেয়, আর প্রকৃতিসন্তানেরা দেখা দেয় তাদের সুখ-দুঃখ, বিশ্বাস ও সরলতা নিয়ে। তাই সত্যচরণকে বিচার করতে হবে তার দেখা প্রকৃতি ও মানুষের পটভূমিকায়।

সত্যচরণকে স্বাভাবিকভাবেই স্বয়ং বিভূতিভূষণের প্রতিনিধি বলে অনেক সমালোচকের মনে হয়েছে। বিভূতিভূষণের বিভিন্ন দিনলিপির অনেক অভিজ্ঞতার বর্ণনাই 'আরণ্যক'-এ পাওয়া যাবে। বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত অনেক অনুভূতি এবং দেখা ঘটনা উপন্যাসে ব্যবহৃত। বিভূতিভূষণও একদা খেলাতচন্দ্র ঘোষের ভাগলপুর-পূর্ণিয়ার বিস্তীর্ণ অরণ্যমহলের অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরও কাজ ছিল প্রজাদের মধ্যে জঙ্গলের জমি বিলি করা। এখানেই তাঁর মনে 'A novel on forests' লেখার পরিকল্পনা জাগে, 'Forest' এর নভেলে জমিদার অর্থবান ও rich প্রজা দুঃস্থ ও গরিব উভয়ের দ্বন্দ্ব। এইটি ফোটার।' ('অপ্রকাশিত দিনলিপি') পুণ্যাহ উৎসবে প্রজাদের খাওয়ানো, ফাল্গুন মাসে হোলির সময় গ্রাম্য মেলা দেখতে গিয়ে সত্যচরণের অভিজ্ঞতা, অরণ্যের মধ্যকার প্রাচীন রাজবংশের সমাধিস্থল, বেঙ্কটেশ্বর নামক হিন্দিভাষী গ্রাম্য কবি—এদের কথা বিভূতিভূষণের 'অপ্রকাশিত দিনলিপি', 'স্মৃতির রেখা' বা 'উৎকর্ণ' নামক দিনপঞ্জিতে খুঁজে পাওয়া যাবে। সত্যচরণের প্রকৃতিমুগ্ধতা এবং প্রকৃতির মধ্যে অধ্যাত্ম-রহস্যের সন্ধান—এ সমস্তই স্বয়ং বিভূতিভূষণের উত্তরাধিকার। তবে বিভূতিভূষণের সৃষ্টিকৌশলে বাস্তব সত্য এখানে সাহিত্যের মধ্যে রূপান্তরিত।

সংক্ষেপে সত্যচরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। নগরজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকলেও তার মন কৃত্রিম বা যান্ত্রিক হয়ে যায়নি। তাঁর মধ্যে একটা অনুভূতিপ্রবণ মন ছিল, আর ছিল সহজাত মমত্ববোধ, তাই প্রাথমিক বিরূপতা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে লবটুলিয়ার প্রকৃতির মোহে সে আচ্ছন্ন

হয়ে পড়ে, সরস্বতী কুণ্ডীর সৌন্দর্যপূজারি যুগলপ্রসাদ তার কাছেই যোগ্য মর্যাদা পায়। যুগলপ্রসাদের খ্যাপামির সেও অংশীদার হয়। জঙ্গলের অসহায় দরিদ্র মানুষগুলির প্রতি সত্যচরণের গভীর সহানুভূতি তার চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ছ-আনা দামের একটি লোহার কড়াই কিনতে পেরে কাছারির সিপাহি মুনেশ্বর সিং-এর আনন্দ, ভয়ংকর শীতে বিনা নিমন্ত্রণে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কেবল ভাত খেতে পাওয়ার জন্য দরিদ্র প্রজাদের ন-মাইল পথ হেঁটে কাছারিতে আসা, ভরা বর্ষায় ভিজে কাছারির উঠোনে গাঙ্গোতা এবং দোসাদ প্রজাদের মহানন্দে কেবল চীনা ঘাসের দানা, ভেলিগুড় এবং জোলো দই খাওয়া—এসবই মানবজীবন ও মানবচরিত্র সম্পর্কে তার ধারণা পাল্টে দেয়, 'কেন জানি না, ইহাদের হঠাৎ এত ভাল লাগিল। ইহাদের দারিদ্র্য, ইহাদের সারল্য, কঠোর জীবনসংগ্রামে ইহাদের যুঝিবার ক্ষমতা—এই অন্ধকার আরণ্যভূমি ও হিমবর্ষী মুক্ত আকাশ বিলাসিতার কোমল পুষ্পাস্তৃত পথে ইহাদের যাইতে দেয় নাই, ইহাদিগকে সত্যকার পুরুষমানুষ করিয়া তুলিয়াছে।'

তাই এদের উপকারের জন্য তার নিজের হাতে যতটুকু ক্ষমতা ছিল তা সে কাজে লাগিয়েছে। বিনা সেলামিতে বা খাজনায় সে অনেককে জমি দিয়েছে। এদের কেউ ক্ষতি করতে চাইলে বাধা দিয়েছে। বিশেষ করে কুন্তা বা গিরিধারীলালের মতো অসহায় মানুষকে বিনা সেলামিতে জমি দেওয়া যে তার জীবনের অন্যতম সৎকর্ম তা স্বীকার করতেও সে দ্বিধা করেনি। অন্যদিকে রাসবিহারী সিং, নন্দলাল ওঝা বা ছট্টু সিং-এর মতো অত্যাচারী মহাজন বা জোতদারদের প্রতি তার বিরূপতার কথা সত্যচরণ গোপন রাখেনি। নিরীহ প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালিয়েই এদের সমৃদ্ধি। নারীজাতির প্রতি সত্যচরণের বিশেষ মমত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল। কুন্তা, মঞ্চী, রাখালবাবুর বিধবা স্ত্রী বা ভানুমতীর সঙ্গে তার আচরণই এর প্রমাণ। ভানুমতীর প্রতি তার এক ধরনের দুর্বলতাও জন্মেছিল। এমন, কি, ভানুমতীকে বিয়ে করে লবটুলিয়ায় থেকে যাওয়ার কথাও সে ভেবেছে। কিন্তু তা যে অসম্ভব তাও তার জানা ছিল। তাই নীরবে বেদনাবোধ করেই সে সরে গেছে। উপন্যাসের শেষে নিজের হাতেই জঙ্গলটা ধ্বংসের জন্য আদিম অরণ্যদেবতাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার মধ্য দিয়ে সত্যচরণ আধুনিক নগরসভ্যতার এক ট্র্যাজিক নায়ক হয়ে ওঠে।

খ. রাজু পাঁড়ে : সুপুরুষ, পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বছরের সুগঠিত দেহের ব্রাহ্মণ। সেলামি দেওয়ার ক্ষমতা তার ছিল না, তাই আধা-বখরা বন্দোবস্তে স্টেটের কাছ থেকে সে কিছু জমি নিতে চায়। অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক সে খাজনা হিসেবে দেবে। রাজুকে সত্যচরণ একরকম বিনা খাজনাতেই দু বিঘে জমি দিয়েছিল। কিন্তু সে আসলে ভক্ত ও কবিমানুষ। চাষবাস তার ধাতে নেই। তাই দেড়বছরেও সে জঙ্গল পরিষ্কার করে উঠতে পারেনি। চীনা ঘাসের দানা খেয়েই দিন কাটিয়েছে। আবার সে প্রকৃতিপ্রেমিকও বটে। তাই জঙ্গল কাটিতে তার মন চায় না। তার খালি মনে হয় যে, এখানে দেবতারা থাকেন, জঙ্গল গেলেই তাঁরাও চলে যাবেন। রাজু হিন্দি লেখাপড়া জানে, সংস্কৃত সামান্য জানে। টোলে পড়বার সময় অধ্যাপক-কন্যার সঙ্গে তার প্রেম ও বিবাহ। এই রোম্যান্টিক রাজু আবার জড়িবুটি নিয়ে কবিরাজি চিকিৎসাও করে, ওষুধ দেয় ধারে। অনেক সময় পয়সা আদায়ও হয় না। তবে চিকিৎসক হিসাবে রাজু খারাপ ছিল না। গিরিধারীলালের ঘা সে ভালো করে দিয়েছিল। বিনিময়ে কোনো পয়সা নেয়নি। তবে রাজুর পাণ্ডিত্যের গর্ব ছিল প্রচণ্ড। নিরক্ষর নিরীহ গাঙ্গোতা প্রজারা তার বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ। সে তাদের জানিয়ে দিয়েছে যে, আকাশের যেমন শেষ নেই, তেমনই পৃথিবীরও শেষ নেই। সূর্য ঘোরে না, পৃথিবী ঘোরে—সত্যচরণের এই বক্তব্য রাজু হেসে উড়িয়ে দেয়। কারণ, তার গভীর বিশ্বাস যে

সূর্যনারায়ণ উদয় পাহাড়ে উদিত হয়ে, পশ্চিমে সমুদ্রে অস্ত যায়। গাঙ্গোতারা তার কথাই বিশ্বাস করে। আসলে রাজু পাঁড়েই জঙ্গলের লোক, সত্যচরণ নয়। তাই গাঙ্গোতারা তার কথা বিশ্বাস করবে কেন?

গ. ধাতুরিয়া : ধাতুরিয়ার মতো চরিত্র বিভূতিভূষণের মনেই আঁকা সম্ভব। ধাতুরিয়ার সঙ্গে সত্যচরণের প্রথম সাক্ষাৎ কাছারিতে। দক্ষিণ দেশে অজন্মা হওয়ায় অনেকেই নাচের দল নিয়ে বেড়িয়েছে। এরকম একটা দলের সঙ্গেই ধাতুরিয়ার আগমন। অন্যদের নাচগান তেমন ভালো না লাগলেও ধাতুরিয়ার অনুষ্ঠান সকলেরই ভালো লেগেছিল। তখন তার বয়স বারো-তেরো, চেহারা যাত্রাদলের কৃষ্ণঠাকুরের মতো। ভারী শান্ত, সুন্দর চোখ-মুখ, কুচকুচে কালো গায়ের রং। শুধু পেটে দুটি খাবার জন্য এই বালক-নাচের দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পয়সার ভাগ সে বড়ো একটা পায় না। কিন্তু তার মধ্যে একটি শিল্পীমন লুকিয়েছিল। রাসবিহারী সিং-এর বাসায় দ্বিতীয়বার তার নাচ দেখার সময় সত্যচরণ বুঝতে পারে যে, ধাতুরিয়ার বয়সই কেবল বাড়েনি, নাচের দিক দিয়েও সে অনেক পরিণত। সত্যিকারের শিল্পীর নিষ্ঠা তার মধ্যে আছে। তাই ম্যানেজারের ঘোড়ার পিছু পিছু ছুটে এসে সে কাতরকণ্ঠে তাকে কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্য আবেদন জানায়। অনেক কষ্ট করে সে ছক্করবাজি নাচটা শিখেছে, কিন্তু সমঝদারের অভাবে সে নাচ ধাতুরিয়া ভুলতে বসেছে। সে শুনেছে কলকাতায় নাকি নাচগানের বড়ো কদর। কিন্তু ধাতুরিয়ার আশা পূর্ণ হয়নি। শিল্পীকে কোনো বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় না। তাই সত্যচরণ জমি দিয়ে তাকে লবটুলিয়ায় বসাতে চাইলেও সে রাজি হয় না। আবার শহরেও তার যাওয়া হল না। বি. এন. ডব্লিউ. লাইনের কাটারিয়া স্টেশনের ধারে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। হয় সেটা দুর্ঘটনা অথবা আত্মহত্যা, কিন্তু ধাতুরিয়ার মতো শিল্পী অরণ্য-পরিবেশের বাইরে টিকতে পারে না। তার পরিণতি রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের ফটিক চরিত্রের করুণ পরিণতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

ঘ. ভানুমতী : ভানুমতী সাঁওতাল-রাজ দোবরু পান্নার নাতির মেয়ে। রাজবংশের এই একটি মেয়ের সঙ্গেই পাঠকের পরিচয় হয়েছে। সত্যচরণও একে রাজকন্যা বলে অভিহিত করেছে। তার মধ্যে রাজকীয় আভিজাত্য এবং অতিথিপরায়ণতা রয়েছে। প্রথম দিন সত্যচরণ ও তার দলবলের আহার্যের সমস্ত জোগাড়-যন্তর সেই করে দিয়েছিল। এই নিটোল স্বাস্থ্যবতী সুঠাম মেয়েটিকে প্রথম পর্বে সাধারণ সাঁওতাল কন্যা বলেই মনে হবে। সত্যচরণের তাই হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ সে যেন ইতিহাসের এক বিরাট ট্র্যাজেডির নায়িকা হয়ে ওঠে। সে যেন এক তরুণী অনার্য রাজকন্যা, একদা সমগ্র অরণ্যভূমি যে রাজবংশের অধীনে ছিল তাদেরই উত্তরাধিকারিণী পাশাপাশি তার মানবী সত্তাটিও উপন্যাসে প্রধান হয়ে উঠতে থাকে। সত্যচরণের প্রতি তার গোপন অনুরাগ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে দোবরু পান্না মারা যাবার পর অসহায় ভানুমতী যেন সত্যচরণের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল, 'আপনি মাঝে মাঝে আসবেন বাবুজী, আমাদের দেখাশুনো করবেন—ভুলে যাবেন না বলুন।' আবার কখনও সত্যচরণের হাত ধরে সে বলে বসে, 'আজ যেতে দেব না বাবুজী।' সত্যচরণ অবশ্য তার এই জাতীয় আচরণের মধ্যে এক ধরনের বলিষ্ঠ আদিম সরলতা খুঁজে পেয়েছিল। হয়তো একথা ঠিক কিন্তু ভানুমতী যে তাকেও দুর্বল করে তুলেছিল উপন্যাসের অন্তত একজায়গায় তার প্রমাণ আছে, 'এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম। ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম। এই মাটির ঘরের জ্যোৎস্না-ওঠা দাওয়ায় সরলা বন্যবালা হাঁটিতে হাঁটিতে এমনি করিয়া ছেলেমানুষী গল্প করিত—আমি বসিয়া বসিয়া শুনিতাম।'

কিন্তু এসব কিছু হয়নি। সত্যচরণ কলকাতায় ফিরে এসেছে। ভানুমতীও দরিদ্র অরণ্য-জীবনেই থেকে গেছে।

মহাজনের দেনার দায়ে আবদ্ধ এই পরিবারটির পরিণতি আন্দাজ করা যায়। ভানুমতী কি পরিণতি হ্তে পারে তারও একটা ইঙ্গিত বিভূতিভূষণ দিয়ে গেছেন, 'কলের বাঁশীতে তিনটার সিটি বাজিল। ভানুমতী মাথায় করিয়া এঞ্জিনের ঝাড়া কয়লা বাজারে ফিরি করিতে বাহির হইয়াছে—ক-ই-লা চা-ই-ই চার পয়সা ঝুড়ি।' নিজেদের বাসভূমি থেকে বিতাড়িত জনজাতির অনিবার্য পরিণতি যে কারখানা বা খনির মজুরে পরিণত হওয়া— এটা সকলেরই জানা। ভানুমতীর জন্যও যেন সেই পরিণতি অপেক্ষা করছে। সেক্ষেত্রে চিরকালের জন্য তার আদিম সরলতা হারাবে।

৪.৮ অনুশীলনী

ক) 'আরণ্যক' উপন্যাস ডায়েরি না ভ্রমণকাহিনি?

খ) 'আরণ্যক' উপন্যাসে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনার পরিচয় দিন।

গ) উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণ-এর চরিত্রের পরিচয় দিন।

ঘ) 'সত্যচরণ' প্রকৃতপক্ষে বিভূতিভূষণেরই দ্বিতীয় সত্তা—আলোচনা করুন।

ঙ) 'আরণ্যক' উপন্যাসের কয়েকটি অপ্রধান চরিত্রের পরিচয় দিন।

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য—সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২. বিভূতিভূষণ : চিত্তরঞ্জন ঘোষ।

৩. বিভূতি রচনাবলী (৫ম খণ্ড) ভূমিকা, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত (মিত্র ও ঘোষ)।

৪. বিভূতিভূষণ মন ও শিল্প; গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

৫. বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস; রুকাতী সেন।

৬. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর; সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭. বিভূতিভূষণ : উপন্যাস রাজনৈতিক; পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক ৫ □ নাগিনীকন্যার কাহিনী—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গঠন

৫.১ উপন্যাস পরিচিতি

৫.২ পটভূমি, কাহিনি ও চরিত্র

৫.৩ আঞ্চলিক উপন্যাসরূপে বিচার

৫.৪ অনুশীলনী ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ উপন্যাস-পরিচিতি

উপন্যাসের মধ্যে জীবনের সামগ্রিকরূপকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়। ফলে ইচ্ছাপূরক, জন-মনোরঞ্জনের জন্য রচিত উপন্যাস বাদ দিয়ে 'সিরিয়স' উপন্যাস পাঠের ক্ষেত্রে পাঠকের প্রত্যাশা জন্মায় যে এর মধ্যে থাকবে জীবন-অভিজ্ঞতার এক সামগ্রিক পরিচয়। কিন্তু পূর্বোক্ত মন্তব্য যে কোনও উপন্যাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপন্যাসটিও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে তারাশঙ্কর এই উপন্যাসটিতে এমন এক অভিজ্ঞতাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং যে ভাবে সেই অভিজ্ঞতাকে উপন্যাস আধারে পরিবেশন করেছেন যা বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্য সংযোজন বলা যায়। উপন্যাসটি আলোচনার পূর্বে আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল আশ্বিন ১৩৫৯ (ইং ১৯৫১), প্রকাশক—ডি. এম. লাইব্রেরি। উপন্যাসটি তিনি শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীসন্তোষ ঘোষ ও শ্রীঅনিল চক্রবর্তীকে উৎসর্গ করেছিলেন।

৫.২ পটভূমি, কাহিনি ও চরিত্র

রাঢ় বাংলার জীবন-চিত্রণ এবং তারাশঙ্করের কথাসাহিত্য যেন সমার্থবোধক হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যে। একটি অঞ্চল তারাশঙ্করের লেখনীতে বারে বারেই ব্যবহৃত হয়েও যেভাবে নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে তা যেমন পাঠকের সাহিত্য-পাঠজাত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে, তেমনই লেখকের জীবন-অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি ও গভীরতাকেও জানান দেয়। 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'কবি'—উল্লিখিত এই উপন্যাসগুলিতে তারাশঙ্কর ব্যবহার করেছেন রাঢ় অঞ্চলকে। তবে এই উপন্যাসগুলিতে উঠে আসা জীবন-পরিচয় বাংলা উপন্যাসের দিক দিয়ে নতুনতর সংযোজন হলেও যেন ততখানি অ-চেনা বা অ-সাধারণ অভিজ্ঞতা বলে এগুলিকে চিহ্নিত করতে পারি না। কিন্তু লেখক যখন 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' বা 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'-র মতো উপন্যাস লেখেন তখন রাঢ় অঞ্চলের শিল্প-রূপায়ণে তারাশঙ্কর নিজেই নিজেকে অতিক্রম করে যান। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই লেখেন— 'নাগিনীকন্যার পরিকল্পনাটি আশ্চর্যরকমের মৌলিক বাংলাদেশের অসংখ্য মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে একটি গোপনতম জীবন-রস-নির্যাস যেন ইহারই মধ্যে নিহিত। সর্পবিষের মন্ত্র ও ঔষধির মতো উহার অস্তিত্ব ও দুর্বোধ্য ক্রিয়াকলাপ জাতির গণ্ডী-বহির্ভূত সমস্ত মানুষের নিকট হইতে প্রাণপণ প্রয়াসে সংবৃত। তারাশঙ্কর যে কেমন করিয়া দুর্ভেদ্য গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এই গুহাতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন তাহা একটি পরম আশ্চর্যের বিষয়।' ('বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ন বুক এজেন্সি

প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ ১৯৮৪)—এখানে 'কেমন করিয়া' এবং 'পরম আশ্চর্যের বিষয়' বাক্যাংশের ব্যবহার লক্ষণীয়। তারাশঙ্কর যে দুর্লভ অভিজ্ঞতাকে এই উপন্যাসে শিল্পরূপ দিয়েছেন তা সমালোচকের উল্লিখিত বাক্যাংশের মধ্যে সমর্থন লাভ করেছে।

'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে এক বিলীয়মান জনগোষ্ঠীর কথা। হিজল বিলের বিষবেদেদের সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন, তাদের আধিভৌতিক বিশ্বাস, সংস্কার, রীতিনীতি, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, প্রবৃত্তি, রূঢ় জীবনসংগ্রাম—এক আরণ্যক পরিবেশে যেভাবে রূপ পেয়েছে তাতে মনে হয় তারা যেন অন্যকালের মানুষ। ধূর্জটি কবিরাজের জবানিতে লেখক জানিয়েও দেন বিষবেদেরা—'ভূতকালের মানুষ'।

উপন্যাসটিতে রয়েছে দু-জন নাগিনীকন্যার কথা—প্রথম জন শবলা এবং দ্বিতীয় জন পিঙ্গলা। কিন্তু এদের জীবনের একরৈখিক পরিচয় উঠে আসেনি। আসলে নাগিনীকন্যা—এই ধারণাটি (Idea)-র মধ্যেই এমন কে লোকবিশ্বাস প্রোথিত আছে যে কাহিনির মধ্যে অনিবার্যভাবে মিশে গেছে পুরাণ, জনশ্রুতি, কিংবদন্তী; ফলে সম্পূর্ণরূপে পালটে গেছে উপন্যাসটির বিষয়বস্তু।

মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের কাহিনি, মহাভারতের কৃষ্ণের কালীয়নাগ দমনের কাহিনি অবলম্বন করে এবং এর সঙ্গে কল্পনাকে মিশিয়ে সাঁতালীর বিষবেদেদের পূর্বপুরুষদের এক বিচিত্র জীবনকথা নির্মাণ করেছেন লেখক। চম্পাই নগরের ধারে সাঁতালী পাহাড়ে সৃষ্টির আদিকাল থেকে বাস ছিল বিষবেদেদের। তখন তাদের জাতি পরিচয় ছিল বিষবৈদ্য,—ধন্বন্তরির শিষ্য। ধন্বন্তরি চাঁদ সদাগরের মিতা, এইজন্য বিষবৈদ্যরা সাঁতালী পাহাড়ে নিষ্কর বসবাসের ছাড়পত্র পেয়েছিল চাঁদ সদাগরের কাছে। বিষবৈদ্যরা তখন সমাজে আসন পেত, সম্মান পেত, বিষয় লতা পৈতের মতো পরার অধিকার ছিল তাদের। মা-মনসাকে পুজো না দেওয়ার জন্য চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙা ডুবে যায়, মৃত্যু হয় ছ-জন পুত্রের, আর সেই সময়েই বিষহরির কোপে মারা যায় বিষবৈদ্যদের শিরবৈদ্যর একমাত্র কন্যা। একমাত্র কন্যাকে হারিয়ে শিরবৈদ্য শোকে পাগলপ্রায়, আর তখনই মা-মনসা কালনাগিনীকে ছোটো মেয়েটি সাজিয়ে কালরজনীতে হাজির করলেন শিরবৈদ্যের সামনে। গুরুবলে শিরবৈদ্য তাকে চিনতে পারল, কিন্তু 'নিয়তির মায়া' এরকমই যে কন্যা বলে তাকেই জড়িয়ে ধরল বুকে। এই কালনাগিনীই কন্যারূপ ত্যাগ করে ঘুমে নিঝুম সাঁতালী পাহাড়ে রাত্রিবেলায় নিজের রূপ ধারণ করে এবং লোহার বাসরঘরের ছিদ্রপথে ঢুকে লখিন্দরকে দংশন করে। পুত্রহারা চাঁদ সদাগর ক্রোধে অন্ধ হয়ে কেড়ে নেন তাদের নিষ্কর সনদ। —'....এই পাহাড় থেকে—এই সমাজ থেকে—এই দেশ থেকে—তোদের ঠাঁই আমি কেড়ে নিলাম। শিবের আজ্ঞায় রাজা নিলেন কেড়ে। তোদের বাস গেল, জাত গেল, লক্ষ্মী গেল। শিবের আজ্ঞা, আমার শাপান্ত। তোদের কেউ ছোঁবে না, ছোঁওয়া জিনিস নেবে না, বসতির মধ্যে ঠাঁই দেবে না।'

চাঁদের ক্রোধে যেমন বিষবৈদ্যরা বাস্তুহারা হয় তেমনি বিষহরির কৃপায় তারা পায় নতুন ঠাঁই। ধন্বন্তরির শিষ্য হিসেবে তারা পরিচিত ছিল বিষবৈদ্য হিসাবে, এবার তারা হল বিষবেদে। 'তোমাদের জাতি নিলে, কুল নিলে চাঁদ, মা-বিষহরি তোমাদের দিলেন নতুন জাত, নতুন কুল।' মা-বিষহরি জানান তাদের ছোঁওয়া জল, ফুল তিনি নেবেন মাথায়, চাঁদের শাপে গায়ের কালিবর্ণে ফুটে উঠবে সাপের বর্ণের ছটা; ধন্বন্তরি বিদ্যার ওপর দিলেন নতুন মন্ত্র, যে মন্ত্রে যদি বিধির লেখা মৃত্যুদণ্ডের দংশন না হয় তবে নাগের বিষ উড়ে যাবে কর্পূরের মতো। বিষবৈদ্যরা বিষ-চিকিৎসার কোনো মূল্য নিত না, কিন্তু মনসা দিলেন নতুন অধিকার—'তুমি নিতে পাবে গৃহস্থের কাছে পেটের অন্নের জন্য চাল, অঙ্গ ঢাকবার জন্য বস্ত্র। আর দিয়েছেন অধিকার আমার বিষের উপর—এই বিষ গেলে নিয়ে তুমি বিক্রি করবে বৈদ্যদের কাছে, তোমার হাতে গেলে নেওয়া বিষ তারা শোধন

করে নিলে হবে অমৃত। সে অমৃত সূচ-পরিমাণ দিলে মরতে মরতে মানুষ বেঁচে উঠবে।'

বিষবৈদ্যদের সাঁতালী পাহাড়ের বাস উঠে যায় কন্যারূপী কালনাগিনীকে ঠাঁই দেওয়ার জন্য। তাই মা-মনসা বিষবেদেদের কন্যা হয়ে জন্ম নেবেন—এই আশীর্বাদ দেন। নাগিনীকন্যার লক্ষণ চেনার উপায়ও জানিয়ে দেন। প্রথম লক্ষণ পাঁচ বছরের আগে সে কন্যা বিধবা হবে, স্বামী মরবে নাগের বিষে। ষোলো বছর বয়সের আগেই সে কন্যার শরীরে ফুটে উঠবে নাগিনীলক্ষণ। তার কপালে দেখতে পাওয়া যাবে 'চক্রচিহ্ন'।

বিষবেদেদের জীবনাচরণ পূর্বোক্ত লোকবিশ্বাস নিয়ন্ত্রিত। সাধারণত ছ-মাস বয়স থেকে তিন বছর বয়সের বেদের মেয়েদের বিয়ে হয়। পাঁচ বছর বয়সে স্বামীর সর্পাঘাতে মৃত্যুর কারণে বিধবা হলে সেই মেয়ের ওপর নজর থাকে বেদে সমাজের। যদিও বেদে জাতের মধ্যে বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রচলন আছে তবুও এরকম বিধবাদের ষোলো বছরের আগে আর বিয়ে হয় না। কারণ লোকবিশ্বাস অনুযায়ী ষোলো বছর বয়সের আগেই কন্যার কপালে দেখতে পাওয়া যাবে 'চক্রচিহ্ন'। এই 'চক্রচিহ্ন' নজরে পড়ে কেবল বিষবেদের প্রধান শিরবেদের চোখে। সেই চিহ্নিত করে নাগিনীকন্যাকে। শিরবেদে বেদে সমাজের সমাজপতি, কিন্তু তবু এই সমাজে নাগিনীকন্যার স্থান তারও ওপরে। কারণ তার ওপরই রয়েছে বিষহরির পুজোর ভার। অবশ্য এ-কথাও জানানো হয়েছে মনসার মুখ দিয়ে—'তোমাদের কল্যাণ করবে সে, তোমার আজ্ঞাধীন হবে, তোমাকে জানাবে মা-বিষহরির অভিপ্রায়ের কথা।' এখানেই চেনা যায় লোকবিশ্বাস অনুযায়ী শিরবেদের সঙ্গে নাগিনীকন্যার দ্বন্দ্ব-জটিল সম্পর্কের উৎসভূমি। মা-মনসার মানস-কন্যা হল নাগিনীকন্যা সেইজন্য এদিক দিয়ে তার স্থান বেদে সমাজে শিরবেদের থেকেও ওপরে, কিন্তু নাগিনীকন্যা শিরবেদের আজ্ঞাধীন হবে, নাগিনীকন্যার দেহ যাতে কোনও পুরুষ স্পর্শ না করতে পারে, নাগিনীকন্যা যাতে তপস্বিনীর ধর্ম ত্যাগ করে পাপে নিমজ্জিত না হয় এবং সেইসঙ্গে এই কারণে বেদে সমাজকে পাপে নিমজ্জিত করে পতন অবশ্যম্ভাবী করে না তোলে তার জন্য শিরবেদেকে নজর রাখতে হয়। ফলে শিরবেদের সঙ্গে নাগিনীকন্যার দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। অবশ্য কেবল লোকবিশ্বাসজাত দ্বন্দ্ব হিসাবে এটিকে দেখা যায় না, সমাজবিবর্তনের সঙ্গে অন্বিত করেই বিষয়টিকে লক্ষ করতে হয়। সমালোচকও সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে চেয়েছেন উপন্যাসটিকে—'সমাজবিবর্তনের ইতিবৃত্তে সর্বত্রই একটা পর্ব দেখা গেছে : সামাজিক অনুশাসনের অধিকার যার হাতে তার সঙ্গে ধর্মীয় অনুশাসনের অধিকারী কিংবা অধিকারিণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব। এই উপন্যাসের দুটি পর্বে সেই সমাজতান্ত্রিক সমস্যাটি দুজোড়া পৃথক-পৃথক যুযুধান চরিত্রের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে : শবলা বনাম মহাদেব এবং পিঙ্গলা বনাম গঙ্গারাম.....' (পল্লব সেনগুপ্ত, 'হিজল বিল আর কোপাই নদীর পার'; সাহিত্যিক নৃতত্ত্বের দুটি অন্বেষণ ভূমি, 'পশ্চিমবঙ্গ', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, ১৪০৪)।

শিরবেদে-নাগিনীকন্যার দ্বন্দ্ব-জটিল সম্পর্কের পরিচয়টি যাতে বেদেদের লোকবিশ্বাস অনুযায়ী প্রকাশিত হতে পারে তার জন্য যেমন সরাসরি বেদেদের জীবন-যাপন উত্থাপিত হয়েছে, তেমনই অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইটিকে বাস্তবপ্রেক্ষিত থেকে লক্ষ করার জন্যই সংযোজন করা হয়েছে শিবরাম কবিরাজের দৃষ্টিকোণ। উপন্যাসটি বাস্তব জীবন-চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে উপস্থাপন করে ঔপন্যাসিক 'ভূতকালের মানুষ'-এর কথাতে একালের দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন।

হিজল বিল ও মা-বিষহরির আটনের যে রহস্যময় ও অতিলৌকিক বর্ণনা উপন্যাসে আছে তা লোকবিশ্বাস-জাতই বলতে হয়। আবার শবলা নিজেকে যেভাবে নাগিনীকন্যা মনে করে এবং সেই অনুযায়ী সংযত জীবন যাপনের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস চালায় এবং মহাদেব শিরবেদে হিসাবে শবলার প্রতি নজর রাখে তাতে তাদের

জীবন-যাপন ও ভাবনালোক লোকবিশ্বাস নিয়ন্ত্রিত বোঝা যায়। কিন্তু এর মধ্যে নারীকে দেবীর মর্যাদা দিয়ে শোষণের আয়োজনও আছে—এই সত্যটিকে চেনাতে ভোলেননি তারাশঙ্কর। শিরবেদের ওপর কোনও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ নেই, শিরবেদের বংশধর হলেই সে হতে পারে পরবর্তী শিরবেদে। মহাদেবের পর গঙ্গারাম শিরবেদে হয়। এই গঙ্গারাম জেলখাটা আসামী, সংযত জীবন-যাপনেও সে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু বেদেদের বিশ্বাস নাগিনীকন্যার পুণ্যের স্পর্শে মুছে যায় তাদের সমাজের সমস্ত কলুষতা। এই বিশ্বাসের বিধি-নিষেধেই রয়েছে শোষণের আয়োজন।

শবলার প্রতি আকৃষ্ট হয় বেদে সমাজেরই এক যুবক। শবলা প্রথমে নিরস্ত করতে চেয়েছিল যুবকটিকে, তবে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করতে পারে না যুবকটিকে। সে তার সঙ্গে, গাঙের ধারে দেখা করে, তবে যুবকটি তার অঙ্গ স্পর্শ করে না। শবলা পুরোপুরি বিস্মৃত হতে পারে না যে সে নাগিনীকন্যা। কিন্তু আবার তার ভেতর থেকে মানবীসত্তাটিও প্রকাশলাভ করতে চায়। যুবকটি যখন জানায়—'শবলা, ই সব মিছা কথা রে, সব মিছা কথা, মানুষ লাগিনী হয় না। চল্, আমরা দু-জনাতে পালাই;......', তখন সে-কথা আলোড়ন তোলে শবলার মনেও—'কখুনও মনে হ'ত—সে যা বুলেছে সেই সত্যি, যাই তার সাথেই চলে যাই,..........কখনও বা মা-বিষহরির ভয়ে শিউরে উঠতম, বুক কেপ্যা উঠত, কাঁদতম আর বুলতম— না রে, না।'—প্রথার সঙ্গে প্রাণের দ্বন্দ্বের শবলার ক্ষতবিক্ষত রূপটি তুলে ধরে তারাশঙ্কর চরিত্রটিকে লোকবিশ্বাসের বৃত্তের বাইরে স্থাপন করে নাগিনীকন্যার অন্তরালস্থিত মানবীরূপটি উন্মোচন করেছেন।

শবলার প্রেমিক যুবকটির মৃত্যু হয় গোখরোর কামড়ে। শিরবেদে মহাদেব শিবরাম কবিরাজকে জানিয়েছিল—'এই উয়ার নিয়ত।' কারণ তার নজর পড়েছিল নাগিনীকন্যার ওপর। কিন্তু শিবরাম কবিরাজকে শবলা জানায় যে মহাদেব নিজেই গোখরো সাপটি ছেড়ে দেয় যাতে যুবকটি ও শবলা দুজনেই তার কামড়ে মারা যায়। শিরবেদে হিসাবে মহাদেব নাগিনীকন্যার ধর্ম রক্ষার জন্যই যদি বলা যায় যুবকটির সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটিয়েছে, তবুও একথা বুঝতে পারা যায় নিয়তি নয়, মহাদেবের অবলম্বিত পথ নিষ্ঠুর স্বার্থপর বাস্তবতার পথ। শবলা তারই প্রতিশোধ নেবার জন্য 'বিষনখ' শিরবেদের বুকে বসিয়ে মহাদেবকে হত্যা করে।

এই উপন্যাসটির দ্বিতীয় নাগিনীকন্যা পিঙ্গলা চরিত্র-চিত্রণেও প্রথা বনাম প্রাণের দ্বন্দ্বটিকে স্পষ্ট রূপ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। পিঙ্গলার মনে এই দ্বন্দ্বের উৎস-ভূমিতে আছে নাগিনীকন্যা-সংক্রান্ত বেদেদের লোকবিশ্বাস। নাগিনীকন্যার যৌনবাসনা জাগ্রত হলে তার শরীর থেকে চাঁপাফুলের গন্ধ বের হয়—এরকম এক বিশ্বাস প্রোথিত আছে তাদের মনে। তার পিছনে রয়েছে কৃষ্ণের কালীয়নাগ দমন কাহিনির সঙ্গে কল্প-কথার মিশ্রণে গড়ে ওঠা কাহিনি। কৃষ্ণ কালীয়নাগকে দমন করার জন্য তার কন্যাকে বিবাহ করবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আর তিনি ফিরে আসেননি। এদিকে কালীয়নাগের কন্যা চাঁপাফুলের অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে নিত্যদিন অপেক্ষা করেন কৃষ্ণের ফেরার প্রত্যাশায়। অপেক্ষারতা কালীয়নাগের কন্যাকে নাগকন্যারা বিদ্রুপ করলে তিনি তাদের অভিশাপ দেন—নাগকন্যার মনে যৌনবাসনা জাগ্রত হলে তার শরীরে এরকম চাঁপাফুলের গন্ধ বের হবে। নাগিনীকন্যা যদিও মানবী তবুও সেক্ষেত্রেও একই বিশ্বাস রয়েছে তাদের মনে।

পিঙ্গলা ভাবে সে নিশ্চিত নাগিনীকন্যা; আর এই বিশ্বাস থেকে মনে জাগ্রত হয় যে নাগিনীকন্যার নাগলোকে ফিরে যাওয়ার ডাক অচিরেই আসবে, তার নাগিনীকন্যার জীবন থেকে সে মুক্তি পাবে। শিবরাম কবিরাজ বুঝতে পারেন—'পিঙ্গলার এই লক্ষণগুলি কোন দৈব প্রভাব বা দেবভাবের লক্ষণ নয়। এগুলি নিশ্চিতরূপে ব্যাধির লক্ষণ।' পিঙ্গলার এরকম ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থাতেই একদিন এসে হাজির হয় নাগুঠাকুর। সে জানায় যে সে

বিষহরির কাছ থেকে পিঙ্গলার জন্য এনেছে ছুটির হুকুম। পিঙ্গলাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় সে। পিঙ্গলার মনে নাগুঠাকুরের আহ্বানে ঘোর লাগে। এমনকি বিষহরির 'ভর' নামে তার, সেই অবস্থায় জানায়—'কন্যে থাকিবে না, কন্যে থাকিবে না। মা কইছে কন্যে থাকিবে না।' নাগুঠাকুরকে তাড়িয়ে দেয় গঙ্গারাম, পিঙ্গলার শরীরে সে চাঁপাফুলের গন্ধ পায়, একদিন রাত্রে পিঙ্গলাও তা অনুভব করে। পিঙ্গলার আচরণ, নাগুঠাকুরের আগমন, পিঙ্গলার শরীরে চাঁপা-ফুলের গন্ধ নির্গত হওয়া— সমস্তই যেভাবে উপস্থাপন করেন তারাশঙ্কর যাতে মনে হয় যেন এই আধিভৌতিক বিশ্বাসের মধ্যেই উপন্যাসে পিঙ্গলা-পর্বটির ইতি টানবেন।

পিঙ্গলা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকেই বরণ করে নেয়। নাগুঠাকুর বলে গিয়েছিল মা-বিষহরির কাছ থেকে সে পিঙ্গলার মুক্তির আদেশ নিয়ে আসবে, কিন্তু সে ফেরে না, আবার পিঙ্গলা বুঝতে পারে তার শরীরে চাঁপাফুলের গন্ধ বের হচ্ছে। পিঙ্গলা এইজন্য নাগুঠাকুরের রেখে যাওয়া শঙ্খচূড়ের দংশনে নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে আনে। মৃত্যুকালে সে জানায়—'ঠাকুর মিছা শোনে নাই, মিছা বলে নাই। মুক্তির হুকুম আসিছিল, ওই লাগটাই ছিল ছাড়পত্ত।' পিঙ্গলার মৃত্যুবরণ তার সংস্কারজাত সন্দেহ নেই। কিন্তু মৃত্যুর অবলম্বিত পথটির মধ্যে কোনও অলৌকিকতা নেই, সে আত্মহত্যা করে। আবার শরীরে চাঁপাফুলের গন্ধ ওঠা—এটিও গঙ্গারামের চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়। মুর্শিদাবাদ থেকে চাঁপাফুলের আরক নিয়ে এসেছিল গঙ্গারাম, সেই আরকই অলক্ষ্যে নিত্য ছিটিয়ে দিত পিঙ্গলার বিছানায়। অর্থাৎ পিঙ্গলার চম্পকগন্ধা হয়ে ওঠা ব্যাপারটির মধ্যেও নেই কোনো ধর্মীয় কারণ; তারাশঙ্কর এভাবেই শিরবেদে-নাগিনীকন্যার সম্পর্কটিকে শিরবেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসটিকে বাস্তবের মাত্রা দেন।

মহাদেব ও গঙ্গারাম—দুজন শিরবেদেই লোকবিশ্বাস অনুযায়ী নাগিনীকন্যাকে রক্ষা করার কাজে নিযুক্ত থেকেছে, তেমনি আবার নাগিনীকন্যার প্রতি যে তাদের জৈবিক আকর্ষণ তৈরি হয়েছে তা গোপন থাকেনি।

মহাদেব যে শবলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল একথা শবলা নিজেই জানিয়েছে শিবরামকে। আবার 'চতুর ডোমন করেত' গঙ্গারাম চম্পকগন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে পিঙ্গলাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দিতে চেয়েছিল। কারণ সে মনে করেছিল—'পিঙ্গলা একদিন রাতে বের হবে, নয়তো পালাতে চাইবে। পালালে সে তাকে নিয়ে পালাত।' শিরবেদেদের নাগিনীকন্যাদের প্রতি আকর্ষণকেও ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা আছে। শিব তার কন্যা মনসার রূপে মোহিত হয়ে পড়েছিল, যেন এটিই এই সম্পর্কের অনিবার্য সত্য। এখানে ধর্মীয় আচরণের আড়ালে মানুষের আদিম লালসার লাভা-স্রোতটি উন্মোচন করেছেন তারাশঙ্কর।

৫.৩ আঞ্চলিক উপন্যাসরূপে বিচার

বেদে সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন, রীতিনীতি, সংস্কার, সর্পবিদ্যা, সংস্কৃতির পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে চান ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে তাই যে কাহিনি সন্নিবিষ্ট করেছেন সেখানে বাস্তব প্রেক্ষাপট আছে, তেমনি তার সঙ্গে মিশেছে পুরাণ, জনশ্রুতি, কিংবদন্তী। ফলে এই উপন্যাসের কাহিনি-বিন্যাস বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্যের কারণেই ভিন্নতা লাভ করেছে। লোককাহিনি পরিবেশনের কথন-ভঙ্গি এখানে অনেক ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে। যেমন—'বন্যায় ডুবেছে হিজলের ঘাসবন, সাপেরা উঠেছে গাছের ডালে ডালে। কত নূতন কালীনাগ—কত দেশ থেকে গঙ্গার জলে ভেসে আসতে আসতে হিজলের ঝাউডাল দেবদারুডাল জড়িয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠেছে। খুব সাবধান! চাবপাশের জলে দৃষ্টি রেখো, হয়তো ছপ করে নৌকার কিনারা জড়িয়ে ধরবে স্রোতে-ভেসে চলা সাপ।'—একজন গল্প-কথক যেন তার জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যেন এক বা একাধিক জনের কাছে পরিবেশন করছে—এইভাবেই এখানে উপন্যাসের কাহিনি বিবৃত হচ্ছে। ফলে বর্ণনার মধ্যে এক ধরনের চিত্ররূপময়তা লক্ষ করা যায়।

উপন্যাসটিতে অধিকাংশ স্থানে কাহিনির বক্তা হিসেবে হাজির করানো হয়েছে শিবরাম কবিরাজকে। শবলা, পিঙ্গলা, মহাদেব—প্রত্যেকেই নিজেদের ভাবনালোক উন্মোচন করেছে শিবরাম কবিরাজের কাছে। শিবরাম কবিরাজ সমস্ত উপন্যাসটিতে কাহিনি-উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এক সেতুবন্ধের কাজ করেছেন। বেদেদের লোকবিশ্বাস নিয়ন্ত্রিত সমাজ আর অন্যদিকে শিবরাম কবিরাজের সংস্কারমুক্ত মনের দৃষ্টিকোণ দুইয়ে মিলে কাহিনিটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছেন তারাশঙ্কর।

যেহেতু রাঢ় অঞ্চলের বেদে সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনকথা উপন্যাসটিতে তুলে ধরা হয়েছে ফলে সেই কারণে চরিত্রের মুখে ব্যবহৃত হয়েছে এই অঞ্চলের ভাষাও। যেমন শবলার সংলাপ— 'উ গেল্‌ছিল আমাকে খুঁজতে। সে-দিনে আমি উ-বাড়ির রাজাবাবুকে লাচন দেখালছি গায়েন শোনাল্‌ছি; বাবু আমাকে টকটকে রাঙাবরণ শাড়ি দিছে, তাই উ রেতে আমাকে বিছানাতে, না দেখে গেল্‌ছিল আমার সন্ধানে হোথাকে।'

অবশ্য পাশাপাশি শিবরাম কবিরাজ যখন কথা বলেন তখন তাঁর মুখে লেখক ব্যবহার করেন শিষ্টভাষা। শিক্ষা ও শ্রেণি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের পার্থক্য এখানে উঠে আসে। শবলা ও শিবরামের কথোপকথন দৃষ্টান্ত হিসাবে হাজির করা যায়।—

—সাপ চিনবার জন্যে। বুড়া বলেছিল সাপ চিনিয়ে দেবে।

—কত টাকা দিলা? বুড়া তুমাকে কত টাকা ঠকায়ে নিলে?

—হাঁগ। কত টাকা দিছ উয়াকে?

—টাকা কিসের? কি বলছ তুমি?

চরিত্রের মুখের ভাষা বাস্তবতার দাবি মেনেই এখানে রাঢ় অঞ্চলের ভাষাকে অবলম্বন করেছে—এ-কথা সত্য, কিন্তু লক্ষ করার বিষয় বিবৃতি অংশেও লেখক আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করেছেন সুকৌশলে। কারণ প্রায় ক্ষেত্রেই বিষবেদে সমাজের প্রচলিত আধা-পৌরাণিক আধা-কাল্পনিক কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে মহাদেব, শবলা, পিঙ্গলা—এই সকল চরিত্রের মাধ্যমে। ফলে বিবৃতি অংশেও ঢুকে পড়েছে আঞ্চলিক ভাষা।

এছাড়াও উল্লেখ করতে হয় উপন্যাসটিতে গানের বহুল প্রয়োগকে। গানগুলি বিষবেদেদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রকাশ করে তাদের জীবন-যাপনের একটি সার্বিক রূপকে ফুটিয়ে তুলেছে। বিবৃতির মধ্য দিয়ে বা সংলাপের মধ্য দিয়ে 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপস্থাপিত হয়েও যে অপূর্ণতা ছিল তাকে পূর্ণতা প্রদান করেছে গানের প্রয়োগ।

৫.৪ অনুশীলনী ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপন্যাসটিতে দুই নাগিনিকন্যার যে মানবীসত্তা উন্মোচিত হয়েছে তা ব্যক্ত করুন।

২। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপন্যাসে বিষবেদে সমাজের অতীত জীবনের যে পরিচয় উঠে এসেছে তা লিপিবদ্ধ করুন।

৩। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপন্যাসটির কাহিনি-বিন্যাসের অভিনবত্ব বিচার করুন।

৪। আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপন্যাসটির সার্থকতা বিচার করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। তারাশঙ্করের শিল্পীমানস : ড. নিমাই বসু

২। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর : ড. মুক্তি চৌধুরী

একক ৬ ☐ ক্ষুধিত পাষাণ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

৬.১ মূলগল্প
৬.২ প্রস্তাবনা
৬.৩ বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ও বাংলা ছোটগল্প
৬.৪ মূলপাঠ ও আলোচনা
৬.৫ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিনির্ণয়
৬.৬ ক্ষুধিত পাষাণ : গল্পবর্ণনার শৈলী
৬.৭ অতিপ্রাকৃত গল্পের নির্মাণ
৬.৮ রসসৃষ্টি ও সার্থকতা
৬.৯ সারাংশ
৬.১০ অনুশীলনী

৬.১ মূলগল্প

আমি এবং আমার আত্মীয় পূজার ছুটিতে দেশভ্রমণ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় রেলগাড়িতে বাবুটির সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহাকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া আরো ধাঁধা লাগিয়া যায়। পৃথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার সহিত প্রথম পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল কাজ করিয়া থাকেন। বিশ্বসংসারের ভিতরে ভিতরে যে এমন-সকল অশ্রুতপূর্ব নিগূঢ় ঘটনা ঘটিতেছিল, রুশিয়ানরা যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইংরাজদের যে এমন-সকল গোপন মতলব আছে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একটা খিচুড়ি পাকিয়া উঠিয়াছে, এ-সমস্ত কিছুই না জানিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম। আমাদের নবপরিচিত আলাপীটি ঈষৎ কহিলেন : There happen more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your newspapers. আমরা এই প্রথম ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, সুতরাং লোকটির রকম-সকম দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। লোকটা সামান্য উপলক্ষে কখনো বিজ্ঞান বলে, কখনো বেদের ব্যাখ্যা করে, আবার হঠাৎ কখনো পার্সির বয়েত আওড়াইতে থাকে; বিজ্ঞান বেদ এবং পার্সিভাষায় আমাদের কোনোরূপ অধিকার না থাকাতে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এমন-কি, আমার থিয়সফিস্ট্ আত্মীয়টির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, আমাদের এই সহযাত্রীর সহিত কোনো-এক রকমের অলৌকিক ব্যাপারের কিছু-একটা যোগ আছে-কোনো-একটা অপূর্ব ম্যাগনেটিজম্ অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ্ম শরীর, অথবা ঐ ভাবের একটা-কিছু। তিনি এই অসামান্য লোকের সমস্ত সামান্য কথাও ভক্তিবিহ্বল মুগ্ধভাবে শুনিতেছিলেন এবং গোপনে নোট করিয়া লইতেছিলেন। আমার ভাবে বোধ হইল, অসামান্য ব্যক্তিটিও গোপনে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং কিছু খুশি হইয়াছিলেন।

গাড়িটি আসিয়া জংশনে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপেক্ষায় ওয়েটিংরুমে সমবেত হইলাম। তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। পথের মধ্যে একটা-কী ব্যাঘাত হওয়াতে গাড়ি অনেক বিলম্বে আসিবে শুনিলাম। আমি ইতিমধ্যে টেবিলের উপর বিছানা পাতিয়া ঘুমাইব স্থির করিয়াছি, এমন সময়ে সেই অসামান্য ব্যক্তিটি নিম্নলিখিত গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। সে রাত্রে আমার আর ঘুম হইল না।...

রাজ্যচালনা সম্বন্ধে দুই-একটা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে আমি জুনাগড়ের কর্ম ছাড়িয়া দিয়া হাইদ্রাবাদে যখন নিজাম-সরকারে প্রবেশ করিলাম তখন আমাকে অল্পবয়স্ক ও মজবুত লোক দেখিয়া প্রথমে বরীচে তুলার মাশুল-আদায়ে নিযুক্ত করিয়া দিল।

বরীচ জায়গাটি বড়ো রমণীয়। নির্জন পাহাড়ের নীচে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া শুস্তা নদীটি (সংস্কৃত স্বচ্ছতোয়ার অপভ্রংশ) উপলমুখরিত পথে নিপুণা নর্তকীর মতো পদে পদে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুত নৃত্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই নদীর ধারেই পাথর-বাঁধানো দেড় শত সোপানময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে একটি শ্বেত প্রস্তরের প্রাসাদ শৈলপদমূলে একাকী দাঁড়াইয়া আছে— নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। বরীচের তুলার হাট এবং গ্রাম এখান হইতে দূরে।

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় শা-মামুদ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জন স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন হইতে স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধি জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং সেই শীকরশীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্মরখচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া, কোমল নগ্ন পদপল্লব জলাশয়ের নির্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া, তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্বে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া, সেতার কোলে, দ্রাক্ষাবনের গজল গান করিত।

এখন আর সে ফোয়ারা খেলে না, সে গান নাই, সাদা পাথরের উপর শুভ্র চরণের সুন্দর আঘাত পড়ে না— এখন ইহা আমাদের মতো নির্জনবাসপীড়িত সঙ্গিনীহীন মাশুল-কালেক্টরের অতি বৃহৎ এবং অতি শূন্য বাসস্থান। কিন্তু আপিসের বৃদ্ধ কেরানি করিম খাঁ আমাকে এই প্রাসাদে বাস করিতে বারবার নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ইচ্ছা হয় দিনের বেলা থাকিবেন, কিন্তু কখনো এখানে রাত্রিযাপন করিবেন না।" আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। ভৃত্যেরা বলিল, সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিবে কিন্তু রাত্রে এখানে থাকিবে না। আমি বলিলাম, "তথাস্তু।" এ বাড়ির এমন বদনাম ছিল যে, রাত্রে চোরও এখানে আসিতে সাহস করিত না।

প্রথম প্রথম আসিয়া এই পরিত্যক্ত পাষাণপ্রাসাদের বিজনতা আমার বুকের উপর যেন একটা ভয়ংকর ভারের মতো চাপিয়া থাকিত, আমি যতটা পারিতাম বাহিরে থাকিয়া, অবিশ্রাম কাজকর্ম করিয়া, রাত্রে ঘরে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে নিদ্রা দিতাম।

কিন্তু সপ্তাহখানেক না যাইতেই বাড়িটার এক অপূর্ব নেশা আমাকে ক্রমশ আক্রমণ করিয়া ধরিতে লাগিল। আমার সে অবস্থা বর্ণনা করাও কঠিন এবং সে কথা লোককে বিশ্বাস করানোও শক্ত। সমস্ত বাড়িটা একটা সজীব পদার্থের মতো আমাকে তাহার জঠরস্থ মোহরসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।

বোধ হয় এ বাড়িতে পদার্পণমাত্রেই এ প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছিল— কিন্তু আমি যেদিন সচেতনভাবে প্রথম ইহার সূত্রপাত অনুভব করি সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তখন গ্রীষ্মকালের আরম্ভে বাজার নরম; আমার হাতে কোনো কাজ ছিল না। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিম্নতলে একটা আরামকেদারা লইয়া বসিয়াছি। তখন শুস্তা নদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে; ওপারে অনেকখানি বালুতট অপরাহ্নের আভায় রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, এপারে ঘাটের সোপানমূলে স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে নুড়িগুলি ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী পুদিনা ও মৌরীর জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

সূর্য তখন গিরিশিখরের অন্তরালে অবতীর্ণ হইল, তৎক্ষণাৎ দিবসের নাট্যশালায় একটা দীর্ঘ ছায়াযবনিকা পড়িয়া গেল— এখানে পর্বতের ব্যবধান থাকাতে সূর্যাস্তের সময় আলো-আঁধারের সম্মিলন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঘোড়ায় চড়িয়া একবার ছুটিয়া বেড়াইয়া আসিব মনে করিয়া উঠিব-উঠিব করিতেছি, এমন সময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম— কেহ নাই।

ইন্দ্রিয়ের ভ্রম মনে করিয়া পুনরায় ফিরিয়া বসিতেই, একেবারে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল— যেন অনেকে মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়া নামিয়া আসিতেছে। ঈষৎ ভয়ের সহিত এক অপরূপ পুলক মিশ্রিত হইয়া আমার সর্বা। পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। যদিও আমার সম্মুখে কোনো মূর্তি ছিল না তথাপি স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে হইল যে, এই গ্রীষ্মের সায়াহ্নে একদল প্রমোদচঞ্চল নারী শুস্তার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে। যদিও সেই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে, নদীতীরে, নির্জন প্রাসাদে কোথাও কিছুমাত্র শব্দ ছিল না, তথাপি আমি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম নির্ঝরের শতধারার মতো সকৌতুক কলহাস্যের সহিত

পরস্পরের দ্রুত অনুধাবন করিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল। আমাকে যেন লক্ষ করিল না। তাহারা যেমন আমার নিকট অদৃশ্য, আমিও যেন সেইরূপ তাহাদের নিকট অদৃশ্য। নদী পূর্ববৎ স্থির ছিল, কিন্তু আমার নিকট স্পষ্ট বোধ হইল, স্বচ্ছতোয়ার অগভীর স্রোত অনেকগুলি বলয়শিঞ্জিত বাহুবিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, হাসিয়া হাসিয়া সখীগণ পরস্পরের গায়ে জল ছুঁড়িয়া মারিতেছে এবং সন্তরণকারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দুরাশি মুক্তামুষ্টির মতো আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।

আমার বক্ষের মধ্যে একপ্রকার কম্পন হইতে লাগিল; সে উত্তেজনা ভয়ের কি আনন্দের কি কৌতূহলের, ঠিক বলিতে পারি না। বড়ো ইচ্ছা হইতে লাগিল, ভালো করিয়া দেখি, কিন্তু সম্মুখে দেখিবার কিছুই ছিল না; মনে হইল, ভালো করিয়া কান পাতিলেই উহাদের কথা সমস্তই স্পষ্ট শোনা যাইবে— কিন্তু একান্তমনে কান পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লিরব শোনা যায়। মনে হইল, আড়াই শত বৎসরের কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা ঠিক আমার সম্মুখে দুলিতেছে, ভয়ে ভয়ে একটি ধার তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করি— সেখানে বৃহৎ সভা বসিয়াছে, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ গুমোট ভাঙিয়া হু হু করিয়া একটা বাতাস দিল— শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মতো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্তে একসং! মর্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নই বলো আর সত্যই বলো, আড়াই শত বৎসরের অতীত ক্ষেত্র হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমার সম্মুখে যে-এক অদৃশ্য মরীচিকা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা চকিতের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয়া শুস্তার জলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা সিক্ত অঞ্চল হইতে জল নিষ্কর্ষণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না। বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়; বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা তেমনি করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

তখন আমার বড়ো আশঙ্কা হইল যে, হঠাৎ বুঝি নির্জন পাইয়া কবিতাদেবী আমার স্কন্ধে আসিয়া ভর করিলেন। আমি বেচারা তুলার মাশুল আদায় করিয়া খাটিয়া খাই, সর্বনাশিনী এইবার বুঝি আমার মুণ্ডপাত করিতে আসিলেন। ভাবিলাম, ভালো করিয়া আহার করিতে হইবে; শূন্য উদরেই সকল প্রকার দুরারোগ্য রোগ আসিয়া চাপিয়া ধরে। আমার পাচকটিকে ডাকিয়া প্রচুরঘৃতপক্ক মসলা-সুগন্ধি রীতিমত মোগলাই খানা হুকুম করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত ব্যাপারটি পরম হাস্যজনক বলিয়া বোধ হইল। আনন্দমনে সাহেবের মতো সোলা-টুপি পরিয়া, নিজের হাতে গাড়ি হাঁকাইয়া, গড় গড় শব্দে আপন তদন্ত কার্যে চলিয়া গেলাম। সেদিন ত্রৈমাসিক রিপোর্ট লিখিবার দিন থাকাতে বিলম্বে বাড়ি ফিরিবার কথা। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাকে বাড়ির দিকে টানিতে লাগিল। কে টানিতে লাগিল বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হইল, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। মনে হইল সকলে বসিয়া আছে। রিপোর্ট অসমাপ্ত রাখিয়া সোলার টুপি মাথায় দিয়া সেই সন্ধ্যাধূসর তরুচ্ছায়াঘন নির্জন পথ রথচক্রশব্দে সচকিত করিয়া সেই অন্ধকার শৈলান্তবর্তী নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড প্রাসাদে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

সিঁড়ির উপরে সম্মুখের ঘরটি অতি বৃহৎ। তিন সারি বড়ো বড়ো থামের উপর কারুকার্যখচিত খিলানে বিস্তীর্ণ ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকাণ্ড ঘরটি আপনার বিপুল শূন্যতাভরে অহর্নিশি গম গম করিতে থাকে। সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তখনও প্রদীপ জ্বালানো হয় নাই। দরজা ঠেলিয়া আমি সেই বৃহৎ ঘরে যেমন প্রবেশ করিলাম অমনি মনে হইল, ঘরের মধ্যে যেন ভারি একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল— যেন হঠাৎ সভা ভ! করিয়া চারি দিকের দরজা জানালা ঘর পথ বারান্দা দিয়া কে কোন্ দিকে পলাইল তাহার ঠিকানা নাই। আমি কোথাও কিছু না দেখিতে পাইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যেন বহুদিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধ আমার নাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম— ঝর্ঝর শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কী সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না, কোথাও বা স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিত, কোথাও বা নূপুরের নিক্কণ, কখনো বা বৃহৎ তাম্রঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিক-দোলকগুলির ঠুন্ ঠুন্ ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুলবুলের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুর্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার এমন একটা মোহ উপস্থিত হইল, মনে হইল এই অস্পৃশ্য অগম্য অবাস্তব ব্যাপারই জগতে একমাত্র সত্য, আর-সমস্তই মিথ্যা মরীচিকা। আমি যে আমি— অর্থাৎ আমি যে শ্রীযুক্ত অমুক, অমুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুলার মাশুল সংগ্রহ করিয়া সাড়ে চার শো টাকা বেতন পাই, আমি যে সোলার টুপি এবং খাটো কোর্তা পরিয়া টম্‌টম্ হাঁকাইয়া আপিস করিতে যাই, এ-সমস্তই আমার কাছে এমন অদ্ভুত হাস্যকর অমূলক মিথ্যা কথা বলিয়া বোধ হইল যে, আমি সেই বিশাল নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

তখনই আমার মুসলমান ভৃত্য প্রজ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমাকে পাগল মনে করিল কি না জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হইল যে, আমি অমুকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অমুকনাথ বটে; ইহাও মনে করিলাম যে, জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অমূর্ত ফোয়ারা নিত্যকাল উৎসারিত ও অদৃশ্য অঙ্গুলির আঘাতে কোনো মায়া-সেতারে অনন্ত রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে কি না তাহা আমাদের মহাকবি ও কবিবরেরাই বলিতে পারেন, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় সত্য যে, আমি বরীচের হাটে তুলার মাশুল আদায় করিয়া মাসে সাড়ে চার শো টাকা বেতন লইয়া থাকি। তখন আবার আমার পূর্বক্ষণের অদ্ভুত মোহ স্মরণ করিয়া কেরোসিন-প্রদীপ্ত ক্যাম্প্‌টেবিলের কাছে খবরের কাগজ লইয়া সকৌতুকে হাসিতে লাগিলাম।

খবরের কাগজ পড়িয়া এবং মোগলাই খানা খাইয়া একটি ক্ষুদ্র কোণের ঘরে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। আমার সম্মুখবর্তী খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার বনবেষ্টিত অরালী পর্বতের ঊর্ধ্বদেশের একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সহস্র কোটি যোজন দূর আকাশ হইতে সেই অতিতুচ্ছ ক্যাম্প্‌খাটের উপর শ্রীযুক্ত মাশুল-কালেক্টরকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল— ইহাতে আমি বিস্ময় ও কৌতুক অনুভব করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম তাহাও জানি না। সহসা এক সময় শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলাম— ঘরে যে কোনো শব্দ হইয়াছিল তাহা নহে, কোনো যে লোক প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকার পর্বতের উপর হইতে অনিমেষ নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রালোক অনধিকারসংকুচিত ম্লানভাবে আমার বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়াছে।

কোনো লোককেই দেখিলাম না। তবু যেন আমার স্পষ্ট মনে হইল, কে একজন আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে। আমি জাগিয়া উঠিতেই সে কোনো কথা না বলিয়া কেবল যেন তাহার অঙ্গুরীখচিত পাঁচ অঙ্গুলির ইঙ্গিতে অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিল।

আমি অত্যন্ত চুপি চুপি উঠিলাম। যদিও সেই শতকক্ষপ্রকোষ্ঠময়, প্রকাণ্ডশূন্যতাময়, নিদ্রিত ধ্বনি এবং সজাগ প্রতিধ্বনি -ময় বৃহৎ প্রাসাদে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণীও ছিল না, তথাপি পদে পদে ভয় হইতে লাগিল, পাছে কেহ জাগিয়া উঠে। প্রাসাদের অধিকাংশ ঘর রুদ্ধ থাকিত এবং সে-সকল ঘরে আমি কখনো যাই নাই।

সে রাত্রে নিঃশব্দপদবিক্ষেপে সংযতনিশ্বাসে সেই অদৃশ্য আহ্বানরূপিণীর অনুসরণ করিয়া আমি যে কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছিলেন, আজ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। কত সংকীর্ণ অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত গম্ভীর নিস্তব্ধ সুবৃহৎ সভাগৃহ, কত রুদ্ধবায়ু ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ পার হইয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই।

আমার অদৃশ্য দূতীটিকে যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই তথাপি তাহার মূর্তি আমার মনের অগোচর ছিল না। আরব রমণী, ঝোলা আস্তিনের ভিতর দিয়া শ্বেতপ্রস্তররচিতবৎ কঠিন নিটোল হস্ত দেখা যাইতেছে, টুপির প্রান্ত হইতে মুখের উপরে একটি সূক্ষ্ম বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবন্ধে একটি বাঁকা ছুরি বাঁধা।

আমার মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন অন্ধকার নিশীথে সুপ্তিময় বোগ্‌দাদের নির্বাপিতদীপ সংকীর্ণ পথে কোনো-এক সংকটসংকুল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি।

অবশেষে আমার দূতী একটি ঘননীল পর্দার সম্মুখে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া যেন নিম্নে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। নিম্নে কিছুই ছিল না, কিন্তু ভয়ে আমার বক্ষের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। আমি অনুভব করিলাম, সেই পর্দার সম্মুখে ভূমিতলে কিংখাবের সাজ-পরা একটি ভীষণ কাফ্রি খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া, দুই পা ছড়াইয়া দিয়া, বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। দূতী লঘুগতিতে তাহার দুই পা ডিঙাইয়া পর্দার এক প্রান্তদেশ তুলিয়া ধরিল।

ভিতর হইতে একটি পারস্য-গালিচা-পাতা ঘরের কিয়দংশ দেখা গেল। তক্তের উপরে কে বসিয়া আছে দেখা গেল না— কেবল জাফ্‌রান রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির চটি-পরা দুইখানি সুন্দর চরণ গোলাপি মখমল-আসনের উপর অলসভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেজের এক পার্শ্বে একটি নীলাভ স্ফটিকপাত্রে কতকগুলি আপেল, নাশপাতি, নারাঙ্গি এবং প্রচুর আঙুরের গুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে দুইটি ছোটো পেয়ালা ও একটি স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা অপূর্ব ধূপের একপ্রকার মাদক সুগন্ধি ধূম্র আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

আমি কম্পিতবক্ষে সেই খোজার প্রসারিত পদদ্বয় যেমন লঙ্ঘন করিতে গেলাম, অমনি সে চমকিয়া উঠিল— তাহার কোলের উপর হইতে তলোয়ার পাথরের মেজেয় শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল।

সহসা একটা বিকট চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া দেখিলাম, আমার সেই ক্যাম্প্‌খাটের উপরে ঘর্মাক্তকলেবরে বসিয়া আছি— ভোরের আলোয় কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডচাঁদ জাগরণক্লিষ্ট রোগীর মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেছে— এবং আমাদের পাগলা মেহের আলি তাহার প্রাত্যহিক প্রথা অনুসারে প্রত্যুষের জনশূন্য পথে "তফাত যাও" "তফাত যাও" করিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে।

এইরূপে আমার আরব্য উপন্যাসের এক রাত্রি অকস্মাৎ শেষ হইল— কিন্তু এখনো এক সহস্র রজনী বাকি আছে।

আমার দিনের সহিত রাত্রের ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলায় শ্রান্তক্লান্তদেহে কর্ম করিতে যাইতাম এবং শূন্যস্বপ্নময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম— আবার সন্ধ্যার পরে আমার দিনের বেলাকার কর্মবদ্ধ অস্তিত্বকে অত্যন্ত তুচ্ছ মিথ্যা এবং হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত।

সন্ধ্যার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্বেকার কোনো-এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর-একটা অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম, তখন আর বিলাতি খাটো কোর্তা এবং আঁট প্যান্টলুনে আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাথায় এক লাল মখমলের ফেজ তুলিয়া— ঢিলা পায়জামা, ফুল-কাটা কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া, রঙিন রুমালে আতর মাখিয়া বহু যত্নে সাজ করিতাম এবং সিগারেট ফেলিয়া দিয়া গোলাপজলপূর্ণ বহুকুণ্ডলায়িত বৃহৎ আলবোলা লইয়া এক উচ্চগদিবিশিষ্ট বড়ো কেদারায় বসিতাম। যেন রাত্রে কোনো-এক অপূর্ব প্রিয়সম্মিলনের জন্য পরমাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।

তাহার পর অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইত ততই কী-যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে থাকিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঠিক যেন একটা চমৎকার গল্পের কতকগুলি ছিন্ন অংশ বসন্তের আকস্মিক বাতাসে এই বৃহৎ প্রাসাদের বিচিত্র ঘরগুলির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইত। খানিকটা দূর পর্যন্ত পাওয়া যাইত তাহার পরে আর শেষ দেখা যাইত না। আমিও সেই ঘূর্ণমান বিচ্ছিন্ন অংশগুলির অনুসরণ করিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

এই খণ্ডস্বপ্নের আবর্তের মধ্যে, এই ক্বচিৎ হেনার গন্ধ, ক্বচিৎ সেতারের শব্দ, ক্বচিৎ সুরভিজলশীকরমিশ্র বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মতো চকিতে দেখিতে পাইতাম। তাহারই জাফ্‌রান রঙের পায়জামা, এবং দুটি শুভ্ররক্তিম কোমল পায়ে বক্রশীর্ষ জরির চটি পরা, বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির ফুলকাটা কাঁচুলি আবদ্ধ, মাথায় একটি লাল টুপি এবং তাহা হইতে সোনার ঝালর ঝুলিয়া তাহার শুভ্র ললাট এবং কপোল বেষ্টন করিয়াছে।

সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতি রাত্রে নিদ্রার রসাতলরাজ্যে স্বপ্নের জটিলপথসংকুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।

এক-একদিন সন্ধ্যার সময় বড়ো আয়নার দুই দিকে দুই বাতি জ্বালাইয়া যত্নপূর্বক শাহজাদার মতো সাজ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইতাম, আয়নায় আমার প্রতিবিম্বের পার্শ্বে ক্ষণিকের জন্য সেই তরুণী ইরানীর ছায়া আসিয়া পড়িল— পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষু-তারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহকটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুত বেগে ঊর্ধ্বাভিমুখে আবর্তিত করিয়া— মুহূর্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল। গিরিকাননের সমস্ত সুগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া একটা উদ্দাম বায়ুর উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিত; আমি

সাজসজ্জা ছাড়িয়া দিয়া বেশগৃহের প্রান্তবর্তী শয্যাতলে পুলকিতদেহে মুদ্রিতনেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম— আমার চারি দিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই অরালী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল করস্পর্শ নিভৃত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত, কানের কাছে অনেক কলগুঞ্জন শুনিতে পাইতাম, আমার কপালের উপর সুগন্ধ নিশ্বাস আসিয়া পড়িত, এবং আমার কপোলে একটি মৃদুসৌরভরমণীয় সুকোমল ওড়না বারংবার উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া স্পর্শ করিত। অল্পে অল্পে যেন একটি মোহিনী সর্পিণী তাহার মাদকবেষ্টনে আমার সর্বা। বাঁধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া অসাড় দেহে সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম।

একদিন অপরাহ্নে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইব সংকল্প করিলাম— কে আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল জানি না— কিন্তু সেদিন নিষেধ মানিলাম না। একটা কাষ্ঠদণ্ডে আমার সাহেবি হ্যাট এবং খাটো কোর্তা দুলিতেছিল, পাড়িয়া লইয়া পরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় শুস্তা নদীর বালি এবং অরালী পর্বতের শুষ্ক পল্লবরাশির ধ্বজা তুলিয়া হঠাৎ একটা প্রবল ঘূর্ণাবাতাস আমার সেই কোর্তা এবং টুপি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া চলিল এবং একটা অত্যন্ত সুমিষ্ট কলহাস্য সেই হাওয়ার স। ঘুরিতে ঘুরিতে কৌতুকের সমস্ত পর্দায় পর্দায় আঘাত করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উঠিয়া সূর্যাস্তলোকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।

সেদিন আর ঘোড়ায় চড়া হইল না এবং তাহার পরদিন হইতে সেই কৌতুকাবহ খাটো কোর্তা এবং সাহেবি হ্যাট পরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি।

আবার সেইদিন অর্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলাম, কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে— যেন আমার খাটের নীচে, মেঝের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবর্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, 'তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও— কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উদ্ধার করো।'

আমি কেছু আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব। আমি এই ঘূর্ণমান পরিবর্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিবছু তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে, হে দিব্যরূপিণীছু তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমাকে কোন্ বেদুইন দস্যু, বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মতো, মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গনিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল। সেখানে সে কী ইতিহাস। সেই সার ীর সংগীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত। কী অসীম ঐশ্বর্য, কী অনন্ত কারাগার। দুই দিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে। শাহেনশা বাদশা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে; বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মতো হাব্‌শি দেবদূতের মতো সাজ করিয়া খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্চর্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলেছু

এমন সময় হঠাৎ সেই পাগলা মেহের আলি চীৎকার করিয়া উঠিল, "তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।" চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে; চাপরাসি ডাকের চিঠিপত্র লইয়া আমার হাতে দিল এবং পাচক আসিয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কিরূপ খানা প্রস্তুত করিতে হইবে।

আমি কহিলাম, না, আর এ বাড়িতে থাকা হয় না। সেইদিনই আমার জিনিসপত্র তুলিয়া আপিসঘরে গিয়া উঠিলাম। আপিসের বৃদ্ধ কেরানি করিম খাঁ আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিল। আমি তাহার হাসিতে বিরক্ত হইয়া কোনো উত্তর না করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম।

যত বিকাল হইয়া আসিতে লাগিল ততই অন্যমনস্ক হইতে লাগিলাম— মনে হইতে লাগিল, এখনই কোথায় যাইবার আছে— তুলার হিসাব পরীক্ষার কাজটা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে হইল, নিজামের নিজামতও আমার কাছে বেশি-কিছু বোধ হইল না— যাহা-কিছু বর্তমান, যাহা-কিছু আমার চারি দিকে চলিতেছে ফিরিতেছে খাটিতেছে খাইতেছে সমস্তই আমার কাছে অত্যন্ত দীন অর্থহীন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

আমি কলম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, বৃহৎ খাতা বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ টম্‌টম্‌ চড়িয়া ছুটিলাম। দেখিলাম, টম্‌টম্‌ ঠিক গোধূলিমুহূর্তে আপনিই সেই পাষাণ-প্রাসাদের দ্বারের কাছে গিয়া থামিল। দ্রুতপদে সিঁড়িগুলি উত্তীর্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আজ সমস্ত নিস্তব্ধ। অন্ধকার ঘরগুলি যেন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া আছে। অনুতাপে আমার হৃদয় উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু কাহাকে জানাইব, কাহার নিকট মার্জনা চাহিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি শূন্যমনে অন্ধকার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইচ্ছা করিতে লাগিল একখানা যন্ত্র হাতে লইয়া কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া গান গাহি; বলি, 'হে বহ্নি, যে পতঙ্গ তোমাকে ফেলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে আবার মরিবার জন্য আসিয়াছে, এবার তাকে মার্জনা করো, তাহার দুই পক্ষ দগ্ধ করিয়া দাও, ভস্মসাৎ করিয়া ফেলো।'

হঠাৎ উপর হইতে আমার কপালে দুই ফোঁটা অশ্রুজল পড়িল। সেদিন অরালী পর্বতের চূড়ায় ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। অন্ধকার অরণ্য এবং শুস্তার মসীবর্ণ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়াছিল। জল স্থল আকাশ সহসা শিহরিয়া উঠিল; এবং অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্দন্তবিকশিত ঝড় শৃঙ্খলছিন্ন উন্মাদের মতো পথহীন সুদূর বনের ভিতর দিয়া আর্ত চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। প্রাসাদের বড়ো বড়ো শূন্য ঘরগুলা সমস্ত দ্বার আছড়াইয়া তীব্র বেদনায় হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ ভৃত্যগণ সকলেই আপিসঘরে ছিল, এখানে আলো জ্বালাইবার কেহ ছিল না। সেই মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রে গৃহের ভিতরকার নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করিলে লাগিলাম— একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ়বদ্ধমুষ্টিতে আপনার আলুলায়িত কেশজাল টানিয়া ছিঁড়িতেছে, তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে, কখনো সে শুষ্ক তীব্র অট্টহাস্যে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনো ফুলিয়া-ফুলিয়া ফাটিয়া-ফাটিয়া কাঁদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনাবৃত বক্ষে আঘাত করিতেছে, মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাতাস গর্জন করিয়া আসিতেছে এবং মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে।

সমস্ত রাত্রি ঝড়ও থামে না, ক্রন্দনও থামে না। আমি নিষ্ফল পরিতাপে ঘরে ঘরে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কেহ কোথাও নাই; কাহাকে সান্ত্বনা করিব। এই প্রচণ্ড অভিমান কাহার। এই অশান্ত আক্ষেপ কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে।

পাগল চীৎকার করিয়া উঠিল, "তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়।"

দেখিলাম, ভোর হইয়াছে এবং মেহের আলি এই ঘোর দুর্যোগের দিনেও যথানিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার অভ্যস্ত চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ আমার মনে হইল, হয়তো ওই মেহের আলিও আমার মতো এক সময় এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিল, এখন পাগল হইয়া বাহির হইয়াও এই পাষাণ-রাক্ষসের মোহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ প্রত্যূষে প্রদক্ষিণ করিতে আসে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে পাগলের নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেহের আলি, ক্যা ঝুঁট হ্যায় রে?"

সে আমার কথায় কোনো উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজগরের কবলের চতুর্দিকে ঘূর্ণমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বাড়ির চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল। কেবল প্রাণপণে নিজেকে সতর্ক করিবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিল, "তফাত যাও, তফাত যাও, সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়।"

আমি সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মতো আপিসে গিয়া করিম খাঁকে ডাকিয়া বলিলাম, "ইহার অর্থ কী আমায় খুলিয়া বলো।"

বৃদ্ধ যাহা কহিল তাহার মর্মার্থ এই : এক-সময় ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত— সেই-সকল চিত্তদাহে, সেই-সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়। যাহারা ত্রিরাত্রি ওই প্রাসাদে বাস করিয়াছে,

তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার উদ্ধারের কি কোনো পথ নাই।"

বৃদ্ধ কহিল, "একটিমাত্র উপায় আছে, তাহা অত্যন্ত দুরূহ। তাহা তোমাকে বলিতেছি— কিন্তু তৎপূর্বে ওই গুলবাগের একটি ইরানী ক্রীতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক। তেমন আশ্চর্য তেমন হৃদয়বিদারক ঘটনা সংসারে আর কখনো ঘটে নাই।"

এমন সময় কুলিরা আসিয়া খবর দিল, গাড়ি আসিতেছে। এত শীঘ্র? তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বাঁধিতে বাঁধিতে গাড়ি আসিয়া পড়িল। সে গাড়ির ফার্স্ট ক্লাসে একজন সুপ্তোত্থিত ইংরাজ জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া স্টেশনের নাম পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, আমাদের সহযাত্রী বন্ধুটিকে দেখিয়াই 'হ্যালো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইল। আমরা সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলাম। বাবুটি কে খবর পাইলাম না, গল্পেরও শেষ শোনা হইল না।

আমি বলিলাম, লোকটা আমাদিগকে বোকার মতো দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল; গল্পটা আগাগোড়া বানানো।

এই তর্কের উপলক্ষে আমার থিয়সফিস্ট্‌ আত্মীয়টির সহিত আমার জন্মের মতো বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে।

৬.২ প্রস্তাবনা

সবশুদ্ধ চোদ্দোজন গল্পকারের পনেরোটি গল্প এই পাঠ্যবস্তুর অন্তর্গত। বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি গল্প রাখা হয়েছে। তারপর বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্ব পর্যন্ত সময়সীমার অন্তর্গত তেরোজন লেখকের প্রত্যেকের একটি করে গল্প এই পাঠ্যবস্তুর অন্তর্গত। যেভাবে পাঠ্যবস্তু রচিত হয়েছে তাতে ছাত্রছাত্রীরা গল্পগুলি রচনার কালপর্ব এবং পাঠ্য গল্পগুলির সাধারণ পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারবেন। এরপর পাঠ্য গল্পগুলির সর্বাঙ্গীণ পরিচয় এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যাতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই সমস্ত বিষয়টি বুঝে নিতে পারেন। প্রশ্নোত্তরও সেইভাবেই দেওয়া হয়েছে। পয়োজন হলে পাঠকেন্দ্রের সহায়তাও তাঁরা গ্রহণ করতে পারবেন। এ-বিষয়ে গ্রন্থপঞ্জি থেকেও তাঁরা সাহায্য পাবেন।

যে ছোটগল্পগুলি পাঠ্য সেগুলি বাংলার কোন্‌ সময়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে রচিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই প্রস্তাবনায়।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে এসে বাংলা সাহিত্য নবীন রূপ লাভ করে এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা হয়। আধুনিক সাহিত্যে দেখা দেয় সমাজমনস্কতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। সমাজ ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কের দ্বন্দ্বও সূচিত হয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন রূপবন্ধের আদর্শ (মডেল) গৃহীত হয়েছে পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেই। ইউরোপে ছোটগল্পের উদ্ভব উনিশ শতকে। তার আগে আখ্যান প্রচলিত ছিল সব দেশেই, কিন্তু সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটনকে বিভিন্ন দিক থেকে আলো ফেলে দেখাবার প্রবণতা ছিল না। সেই সঙ্গে ছোটগল্পের সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপেরও উদ্ভব হল। একক উপলব্ধি বা প্রতীতিকে কেন্দ্র করে স্বল্পপরিসরে ন্যূনতম চরিত্রের সাহায্যে, ঋজু গতিসম্পন্ন, পরিণামী লক্ষ্যের দিকে ধাবিত কাহিনি বিন্যাসকেই ছোটগল্প বলা যায়। যে কোনো বিষয় বা উপলব্ধি নিয়েই ছোটগল্প রচিত হতে পারে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই আমেরিকায় আধুনিক ছোটগল্পের উদ্ভব হল। আমেরিকার আর্ভিং ওয়ালেস, ন্যাথানিয়েল, হথর্ন, এডগার অ্যালান পো, রাশিয়ার নিকোলাই গোগোল; ফ্রান্স-এর মোপাসাঁ প্রমুখ লেখকদের

কলমে রচিত হল সমৃদ্ধ ছোটগল্প। বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে চলতে থাকে ছোটগল্প লেখার জোরালো প্রচেষ্টা। উনিশ শতকের শেষ দশকে, ১৮৯১ সালে 'হিতবাদী' পত্রিকায় পর পর প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প দিয়েই আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের যাত্রা শুরু। তাঁর হাতেই ছোট গল্পের নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা।

উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রায় অর্ধাংশের কালপর্বে ভারত উপনিবেশ-শাসিত সমাজে ঘটে চলেছে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার; মেয়েদেরও লেখাপড়া শেখার এবং চাকরি করবারও প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী। সেই সঙ্গে ভারতে স্বাধীনতা-আন্দোলন ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। দেখা দিয়েছে বহু রাজনৈতিক মত ও পথের দ্বন্দ্ব। প্রথম মহাযুদ্ধের আঘাতে সমগ্র আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ঘটেছে বিপুল পরিবর্তন। বিশেষ করে দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তীকাল সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছে বাংলার মানুষের মনে ও জনজীবনে। অধিকাংশ গল্পকারই এই সময়-পর্বে আবির্ভূত। ভারতের স্বাধীনতা-উত্তরকালে আবার অতি দ্রুত ঘটেছে সমাজের এই পট-পরিবর্তন। এই সময়ের বিশ্লেষণ একটু বিস্তৃতভাবে করা হল। কারণ আধুনিক কালের ছোটগল্পের ধারা এখনও সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয় না।

৬.৩ বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ও বাংলা ছোটগল্প

বাংলা সাহিত্যে চল্লিশের দশক গতিমুখ পরিবর্তনের কাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫), আগস্ট আন্দোলন (১৯৪২), মন্বন্তর (১৯৪৩), দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশবিভাজন (১৯৪৭), বাস্তুহারা সমস্যা—উত্তাল চল্লিশের এই সকল স্মৃতি ও সমস্যাকে পাথেয় করেই ভারতবর্ষ তথা বাংলার মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল। এই ঘটনাবহুল চল্লিশের বিনাশী আগুনের আঁচ লেগেছিল সাহিত্যেও। কারণ জীবন-যাপনের মূল্য-মান বদল অনিবার্যভাবে ঘটিয়ে দেয় সাহিত্যের পালা বদল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু ইংরেজজাতির ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হওয়াতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে রসদ যোগানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় শোষণ তীব্র হল, ভেঙে পড়ল অর্থনৈতিক অবস্থা। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মন্বন্তর দেখা দিলে গ্রামকে গ্রাম নিঃশেষ হল। যারা বেঁচে থাকল তারা অনেকেই হল বাস্তুহারা, কলকাতার ফুটপাতে একটু ফ্যানের জন্য হাহাকার উঠল। একদিকে মন্বন্তর, অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধ, আবার মনুষ্যসৃষ্ট কালোবাজারি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষকে বিপর্যস্ত করে তুলল। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেল, জীবিকার তাগিদে মানুষের নগরমুখীনতা আরও বেড়ে গেল, ছোট পরিবারের জন্ম হল, অর্থনৈতিক চাপেই ক্রমশ শিথিল হল জাতপাতের বেড়াজাল।

আবার, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বুকে জাতি-দাঙ্গা জীবনকে আরও ভীত, সন্ত্রস্ত করে তুলল। পরিবারের, জাতির বাইরেও যে ভ্রাতৃভাব, শুভবোধ তা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার সঙ্গেই আমরা সম্মুখীন হলাম দেশ-বিভাজনের। দাঙ্গার মধ্যে যে জাতি-বৈরিতার সূচনা হয়েছিল দেশ-বিভাজনের মধ্যে সেই বিনষ্টির প্রকটরূপ প্রকাশ পেল। এই দেশ-বিভাজনের ফলেই দেখা দিল বাস্তুহারা সমস্যা। পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে দলে দলে মানুষ কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চলে ভিড় করল।

অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত, সমাজবন্ধনহীন, এই সকল সাধারণ মানুষ অবস্থার চাপে পড়ে সনাতন মূল্যবোধকে

বিসর্জন দিতে বাধ্য হল। বেঁচে থাকার তাগিদে অর্থচিন্তা প্রধান হয়ে দাঁড়াল। জীবনের মূল্য কানাকড়িও নয়, অথচ বেঁচে থাকাটাই সংগ্রাম—এই অবস্থায় নিজেকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে মানুষ তার পেশাগত শুচিবায়ুতা ত্যাগ করল। মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই ঘোর বিপর্যয়ে ভেঙে ছত্রখান হয়ে পড়ল। জীবিকার তাগিদে মেয়েরা পা দিল বাড়ির বাইরে। একদিকে প্রবল বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকটে সঠিক বয়সে বিবাহ হয়ে না ওঠা, অন্যদিকে নারীর মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা—নাগরিক জীবনে নর-নারীর প্রেমজনিত সম্পর্ক বাড়িয়ে তুলল, নারী আবার অনেক ক্ষেত্রে পণ্যে পরিণত হল। এই সময়কাল এমনই এক সময়কাল, যেখানে জীবন-সম্পর্কিত সমস্ত সুস্থ ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, সংস্কার আমাদের ভেঙে গেছে, অথচ নতুন কোনো বিশ্বাস বা মূল্যবোধ জন্ম নিতে পারেনি। স্বাধীনতা সমকাল ও অব্যবহিত পরবর্তী সময়কালের ছোট গল্পকারেরা—এই রকম ঘোর সংকটকালের মুখোমুখি হয়েছিলেন যেমন, তেমনই তার রূপায়ণও করেছিলেন সাহিত্যে।

'কল্লোল' পত্রিকাকে (১৯২৩-৩০) কেন্দ্র করে নব্যধারার সাহিত্য-সৃষ্টিতে এগিয়ে এসেছিলেন একদল তরুণ লেখক। এই নব্যধারা-সৃষ্টির একদিকে যেমন ছিল রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রমণের প্রয়াস, তেমনই অন্যদিকে এর পিছনে কাজ করছিল স্বদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুন পুন ব্যর্থতা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও সেইজন্য নেমে আসা আর্থিক সংকট রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) আশাবাদ এবং পাশ্চাত্য ভাবধারা ও সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ। এঁদের লেখাতে উঠে এল অপজাত, অবজ্ঞাত মানুষ। কয়লাকুঠি, বস্তি, ফুটপাত, গলির জীবন রূপ পেল। কিন্তু এঁদের লেখা যতখানি রোম্যান্টিক পিপাসায় তাড়িত, ততখানি বাস্তবসঞ্জাত নয়। এই পর্বের ছোটগল্পকার হিসাবে উল্লেখ করা যায়—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রমুখের নাম। 'কল্লোল'-পর্বের লেখকদের রোম্যান্টিকতা, বোহেমিয়ান মনোভাব হয়তো সার্থক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ গল্প রচনাতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু গল্প রচনার চৌহদ্দির সীমানা-প্রসারণে এঁদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

'কল্লোল'-পর্বের লেখকদের অভিজ্ঞতার ফাঁক পূরণ করলেন কল্লোল অব্যবহিত পরবর্তী লেখক তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা তিনজনেই ছোটোগল্প রচনাতে হাত দিলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ই অধিকতর প্রভাব ফেলেছিলেন পরবর্তী ছোট গল্পকারদের লেখায়। কেবল তাই নয়, চল্লিশের দশকেও ছোটগল্প রচনাতে এঁরা ছিলেন সমান-সক্রিয়। এই তিনজন ছাড়া বলতে হয় আর একজনের কথা—তাঁর নাম জগদীশ গুপ্ত। জগদীশ গুপ্তের জীবন-সম্পর্কিত তিক্ততা, নৈরাশ্যবোধ ও নির্মমতা প্রভাব ফেলেছিল পরবর্তী সাহিত্যিকদের ভাবনায়।

চল্লিশের একেবারে গোড়াতেই 'অযান্ত্রিক' আর 'ফসিল'-এর গল্প লিখে আত্মপ্রকাশ করলেন সুবোধ ঘোষ। তিনি যেমন তাঁর গল্পের পটভূমি হিসাবে নির্বাচন করলেন বহির্বঙ্গকে, তেমনি বারে বারেই মধ্যবিত্ত মানুষের আপাত সততার আড়ালে লুকিয়ে থাকা ভণ্ডামি, প্রতারণা, ভীরুতা, নীচতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলেন। মানিকের মতো মনস্তাত্ত্বিক জট-জটিলতার পরিচয় দিয়ে নয়, চরিত্রের আচরণের মধ্যে ধরতে চাইলেন মধ্যবিত্ত মানুষের লুকিয়ে থাকা চেহারাটি। আবার, বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে নয়, পরিবারজীবনকে আশ্রয় করে নগর-মধ্যবিত্তজীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা ঘৃণা-ভালোবাসাকে সময়ের অভিঘাতে প্রকাশ করলেন কোনো কোনো লেখক। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখ লেখকেরা।

প্যারিসের ফ্যাসিবাদবিরোধী সম্মেলনের পর (World Congress of Writers for the Defence of Culture, 1935, 21 June) ভারতের মাটিতে লখনউয়ে প্রতিষ্ঠিত হল 'প্রগতি লেখক সংঘ' (১৯৩৬) এবং

এরই শাখা 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে 'প্রগতি' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করলেন। এই সংকলনে পাঁচজনের গল্প স্থান পেয়েছিল—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। সাহিত্যে এক নতুন চেতনা প্রকাশ করেছিল সংকলনটি। ১৯৩৯-এর জানুয়ারিতে প্রকাশিত 'অগ্রণী' মাসিক পত্রিকা, ১৯৪১-এ প্রকাশিত 'অরণি' নামের পত্রিকা এই প্রগতি আন্দোলনকেই সময়ের প্রেক্ষিতে দিল নতুন মাত্রা। প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদের মন যেমন নাড়া খেয়েছে উত্তাল চল্লিশের ভয়াবহতায়, তেমনি রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা উৎসারিত সাহিত্য-বিশ্বাস থেকে তাঁরা ঘটিয়েছেন এর শিল্প-রূপায়ণ। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, ননী ভৌমিক, নবেন্দু ঘোষ, সোমেন চন্দ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল জানা, সোমনাথ লাহিড়ী, সমরেশ বসু—এঁদের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা সকলেই যে একই বিশ্বাস বা এক জাতীয় গল্প রচনাতে তাঁদের সমগ্র সাহিত্যজীবনে নিয়োজিত ছিলেন বলা যায় না, তবে স্বাধীনতা সমকাল ও অব্যবহিত পরবর্তী সময়কালের পটভূমিকে রূপায়িত করতে গিয়ে তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের ছাপ পড়েছে।

সামাজিক উত্তালতা আর সময়কালের টানাপোড়েন জীবনযাপনের অন্তস্তলে পরিবর্তন আনে, সেই জীবনকে ধরতে গিয়ে পালটে যায় গল্পের অবয়ব এবং বিষয়বস্তু। এই পরিবর্তন তৈরি করে সাহিত্যে নতুন ধারার, কিন্তু তাও একদিন হয়ে ওঠে গতানুগতিক, ভিন্ন সময়কালের মানুষের সমস্যা রূপায়ণের জন্য আসে নতুন বিষয় ও রীতি। কিন্তু তাই বলে মিথ্যা হয়ে যায় না পূর্বতন ধারা। স্বাধীনতা সমকাল ও অব্যবহিত উত্তরকালের বাংলা ছোটগল্পের বাঁকবদল এইজন্যই আমাদের কাছে আজও সমান আগ্রহের বিষয়।

৬.৪ মূলপাঠ ও আলোচনা

এখানে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির রচনাকাল সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি শ্রাবণ ১৩০২ বঙ্গাব্দে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সাধনা' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১২৯৮ বঙ্গাব্দে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে প্রায় প্রতি মাসেই রবীন্দ্রনাথ ওই-পত্রিকায় একটি করে গল্প লেখেন। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-সহ শ্রাবণ ১৩০২ পর্যন্ত 'সাধনা'য় প্রকাশিত সেই গল্পের সংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ। পরে 'অতিথি' গল্পটি ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই ছত্রিশটি গল্পের মধ্যে অতিপ্রাকৃত গল্প হিসেবে 'ক্ষুধিত পাষাণ' উল্লেখযোগ্য।

৬.৫ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিনির্ণয়

'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এর অতিপ্রাকৃত পরিমণ্ডল। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই পরিমণ্ডলটি রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেছেন এই গল্পে। প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষকে, বাস্তব থেকে অবাস্তবে, প্রাকৃত থেকে অতিপ্রাকৃতে যে গল্পের শুরু আবার বিপরীতভাবে অবাস্তব থেকে বাস্তবে, অতিপ্রাকৃত ক্ষেত্র থেকে প্রাকৃত জগতে, অপ্রত্যক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ জগতে তার সমাপ্তি। বিশ্বাস ও সম্মোহন, যুক্তি ও যুক্তিহীনতা, তর্ক ও তর্কাতীতের অদ্ভুত সংমিশ্রণে রচিত এই গল্প।

বিষয়বস্তু ও নির্মাণশৈলী বিশ্লেষণ করলে 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে অতিপ্রাকৃত গল্পের শ্রেণিভুক্ত করা চলে। গল্পটি বর্ণনার শৈলী বিশ্লেষণ করলেই তা বোঝা যাবে।

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য যে সব গল্পের তুলনা করা চলে তা হল 'কঙ্কাল', 'জীবিত ও মৃত' এবং 'নিশীথে'। এগুলি 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর আগেই রচিত ও 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে 'ভারতী' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩০৫) প্রকাশিত 'মণিহারা' গল্পটির সঙ্গে 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সাদৃশ্য মূলত 'ভাঙা পোড়ো বাড়ি', 'কঙ্কালের খট্‌খট্‌ শব্দ' প্রভৃতি ভৌতিক উপাদান নির্ভর।

বাহ্যিক এই সব সাদৃশ্য বাদ দিলে 'ক্ষুধিত পাষাণ' এমন একটি গল্প যার সঙ্গে অন্য কোনটির তুলনা চলে না। বস্তুত 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর তুলনা শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যে কেন, বিশ্বসাহিত্যেই দুর্লভ। শুধু এইটুকুই বলা চলে যে অতিপ্রাকৃত পরিবেশ-নির্ভর যে অল্প কয়েকটি গল্প রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তার মধ্যে 'ক্ষুধিত পাষাণ' তুলনাহীন।

৬.৬ ক্ষুধিত পাষাণ : গল্পবর্ণনার শৈলী

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি 'এক অসামান্য ব্যক্তির' গল্প ফাঁদার গল্প। আসলে এটি গল্পের ভেতরে গল্প। মূল-গল্পকথক লেখক এবং তার এক থিয়সফিস্ট্‌ আত্মীয় ওই অসামান্য ব্যক্তির মুখে গল্পটা শুনেছেন। তার প্রতিক্রিয়াও ঘটেছে দু-রকম। লেখক-বক্তা গল্পটিকে আগাগোড়া বানানো বলে উড়িয়ে দেন। আর তারই পরিণতিতে ঐ দিব্যজ্ঞানী আত্মীয়ের সঙ্গে তার চিরবিচ্ছেদ ঘটে।

তর্ক অমীমাংসিত থেকে গেছে। গল্পটি কতদূর সত্য, কতটা বানানো সে-তর্কের শেষ হয়নি। এমনকি গল্পটি শেষও হয়নি। ক্ষুধিত পাষাণের তৃষ্ণার্ত হাহাকার রব প্রতিধ্বনিত হয়েই চলে। প্রাসাদের মধ্যে যারা ত্রি-রাত্রি বাস করেছে তারা কেউ তার গ্রাস এড়াতে পারেনি। গল্পকথক করিম খাঁকে প্রাসাদের সংঘটিত ঘটনার অর্থ জিজ্ঞাসা করে। জানতে চায় উদ্ধারের উপায়। তখন করিম খাঁ একটিমাত্র উপায়ের কথা উল্লেখ করে। তারও আগে যখন সে ওই গুলবাগের এক ইরানি ক্রীতদাসীর পুরনো ইতিহাস বলবার উপক্রম করেছে, এই সময় স্টেশনে গাড়ি এসে গেল। গল্পের আসর ভঙ্গ হল। গল্পকথক ও গল্পের শ্রোতার মধ্যে ঘটে গেল বিচ্ছেদ। গল্পের কথকের পরিচয় জানা হল না। গল্পের শেষটাও জানা গেল না।

স্টেশনের ওয়েটিং রুমে গল্পের আসরে 'ক্ষুধিত পাষাণ'এর মূলগল্পটি বর্ণিত। গল্পটির মূলে আছে একটি বাড়ির প্রতি মোহ। বাড়ি মানে আড়াই-শো বছরের পুরনো এক প্রাসাদ। দ্বিতীয় শাহ মামুদ আড়াই-শো বছর আগে ভোগবিলাসের জন্য এটা নির্মাণ করেছিলেন। গল্পকথক হাইদ্রাবাদে নিজামের চাকরি করে এসে এই প্রাসাদের মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে এই মোহ তাকে গ্রাস করে। শেষ পর্যন্ত তাকে মুক্তির উপায় খুঁজতে হয়।

গল্পের শুরু এই মোহজাল-বদ্ধ হওয়ার বর্ণনায়। শুস্তা নদীর ধারে এই প্রাসাদ। নদীর ধারে দেড়-শো পাথর-বাঁধানো সোপানময় ঘাট। তার ওপরে পাহাড়ের নীচে শ্বেতপাথরের প্রাসাদ। শোনা যায় ত্রি-রাত্রি যারা ওই প্রাসাদে বাস করেছে তারা কেউ এর গ্রাস থেকে মুক্তি পায়নি। ব্যতিক্রম মেহের আলি। সে এই পাষাণ রাক্ষসের মোহজাল ছিন্ন করে বাইরে আসতে পেরেছিল ঠিকই, কিন্তু পাগল হয়ে গিয়েছিল, পাগল মেহের আলি প্রত্যেকদিন এই প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করতে করতে বলে ওঠে; 'তফাৎ যাও তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়'।

মেহের আলির প্রলাপ এ গল্পের আবহ রচনা করে। অন্যদিকে মাশুল কালেক্টরের চাকরি নিয়ে আসা লোকটি ক্রমেই এই প্রাসাদের মোহপাশে বদ্ধ হয়। তার আপিসের বৃদ্ধ কেরানি করিম খাঁ তাকে ওই প্রাসাদে রাত্রি যাপন করতে নিষেধ করেছিল। ভৃত্যেরা এখানে রাতে থাকতে রাজি হয়নি। তবুও এই প্রাসাদে সে থেকেই গেল। আর সাতদিনের মধ্যে ওই পাষাণপুরীর মোহ তাকে পেয়ে বসে।

একদিন হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। যেন অনেকে একসাথে ঘাটের পথ বেয়ে নেমে আসছে। যেন প্রমোদচঞ্চল নারীরা শুস্তার জলে স্নান করতে নামছে। সকৌতুক কলহাস্যের শব্দ শোনা গেল। সেই শুরু। আড়াশ-শো বছরের অতীত যেন পাষাণের রূপ ধরে মোহবিস্তার করেছে।

সেই মোহ ছড়িয়ে গেছে গল্পকথকের মনে। অথচ সেই গল্পকথক কে তার পরিচয় নেই। এগল্পের পরিবেশ, চরিত্র, ঘটনা সবই ছায়া ছায়া। স্পষ্ট করে বোঝা যায় না, শুধু উপলব্ধি করা যায়। ইরানি ক্রীতদাসী কে তাও জানা যায় না। শুধু অনুভব করা যায় তার ক্রন্দনধ্বনি, অশ্রুত স্বর। সব মিলিয়ে এক অধরা ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশই এই গল্পশৈলীর মূলে। সেখানেই লেখকের বর্ণনার জাদু, কথনের কৌশল।

'ক্ষুধিত পাষাণ' যে অনবদ্য গল্প তার অন্যতম কারণ এই পরিবেশনির্মাণে লেখকের অসাধারণ কৃতিত্ব।

৬.৭ অতিপ্রাকৃত গল্পের নির্মাণ

এই আলোচনাস্তম্ভে আমরা অতিপ্রাকৃত গল্পনির্মাণ বিষয়ে অনুশীলন করব।

প্রথমে বোঝা দরকার আমাদের আলোচিতব্য বিষয়টি। সেটিকে এইভাবে সাজানো চলে—

(ক) অতিপ্রাকৃত গল্প কাকে বলে?

(খ) অতিপ্রাকৃত গল্পের বৈশিষ্ট্য কী?

(গ) 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে কেন অতিপ্রাকৃত গল্প বলা হবে?

(ক) অতিপ্রাকৃত গল্প কাকে বলে?

এই প্রশ্নের উত্তর-সন্ধানে প্রথমে গল্পকে দুটি সরল শ্রেণিতে ভাগ করা চলে—

(১) প্রাকৃত গল্প। (২) অতিপ্রাকৃত গল্প।

প্রাকৃত জগৎ ও জীবন বিষয়ে লেখা গল্পকে প্রাকৃত গল্প বলা চলে। এই শ্রেণিতে সামাজিক, পারিবারিক প্রভৃতি নানাধরনের গল্প থাকতে পারে। অতিপ্রাকৃত গল্প এই ধরনের গল্প থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

অতিপ্রাকৃত গল্প বলতে অতিপ্রাকৃত জগৎ ও অনুভূতিবিষয়ক গল্পকেই বোঝায়। এই ধরনের গল্পে এমন সব ঘটনা ও অনুভূতির বর্ণনা থাকে যাকে সহজবুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

অতিপ্রাকৃত জগৎ প্রাকৃত জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক জগৎ। তাই এই জগতের অনুভূতি ও ঘটনা প্রাকৃত হলেও মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সাধারণত ভৌতিক, রোমাঞ্চকর ও যুক্তিবুদ্ধির অতীত ঘটনা ও অনুভূতিই এই ধরনের গল্পে বর্ণিত হয়।

(খ) অতিপ্রাকৃত গল্পের বৈশিষ্ট্য কী?

অতিপ্রাকৃত গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো এই রকম—

১। প্রাকৃত জগতের অতীত কোনো অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

২। ইচ্ছাকৃতভাবে যুক্তি ও বুদ্ধির অতীত এক জগৎ-পরিবেশ সৃষ্টি।

৩। অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা।

৪। প্রাকৃত পরিবেশ ও অতিপ্রাকৃত পরিবেশ পাশাপাশি রেখেই উভয়ের পার্থক্য দেখিয়ে দেওয়া।

৫। বর্তমান ও সুদূর অতীতের সহাবস্থানে অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার।

৬। যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না—এমন শঙ্কা-শিহরিত পরিবেশ নির্মাণ।

অতিপ্রাকৃত গল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো সূত্রাকারে পড়লেই বোঝা যায় যে অতিপ্রাকৃত জগৎ এক ভিন্নতর জগৎ। সেখানে জাগতিক বোধ-বুদ্ধি সব সময় ক্রিয়াশীল থাকে না। সে এক ছায়াঘেরা অনুভূতি আর অনুভবের জগৎ।

অতিপ্রাকৃত গল্প এই পরিবেশেই নির্মিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' অতিপ্রাকৃত পরিবেশনির্ভর এক অসাধারণ অতিপ্রাকৃত গল্প।

৬.৮ রসসৃষ্টি ও সার্থকতা

'ক্ষুধিত পাষাণ' অতিপ্রাকৃত গল্পরূপে সার্থক এক রসসৃষ্টি।

একটি গল্প তখনই সার্থক রসসৃষ্টি হতে পারে যখন তা নির্মিত উপাদানের শিল্পোচিত ব্যবহারে সার্থক হয়ে ওঠে।

'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর নির্মাণে লেখক যে-সব উপাদান ব্যবহার করেছেন তা এই রকম—

১। যুক্তিগ্রাহ্য পরিবেশ রচনার পাশাপাশি যুক্তিবুদ্ধির অতীত পরিবেশের সহাবস্থান।

২। বর্ণময়, ধ্বনিময় ও অনুভূতিপূর্ণ এক অতিপ্রাকৃত জগতের আভাস দান।

৩। সময় ও কালের ব্যবধানকে যথোচিতভাবে ব্যবহার।

মূলত এই তিনটি মুখ্য উপাদানকেই লেখক কাজে লাগিয়েছেন।

'ক্ষুধিত পাষাণ' যে একটি সার্থক রসসৃষ্টি তাতে সন্দেহ থাকে না।

গল্পটি পড়েই এক অনির্বচনীয় অনুভূতি জাগে। যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না, সম্পূর্ণ বোঝা যায় না, ভালোভাবে দেখাও যায় না এমন এক জগৎকে গল্পকথক প্রত্যক্ষ করে। তাকে ভূতগ্রস্ত করে ফেলেছে ওই পাষাণপুরী। তার টানে সে বারবার সেখানে ছুটে যায়। কেন যায়, কে টেনে নিয়ে যায় তার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না।

'ক্ষুধিত পাষাণ' যে অভিশপ্ত পুরী তা বোঝা যায়। লোকের বিশ্বাস থেকেও তা প্রকট হয়। কিন্তু কেন তা বোঝা যায় না।

গল্পকথক কীভাবে মুক্তি পেল, গল্পের শেষে কী ঘটল তাও বোঝা গেল না। এমনভাবে অদেখা, অচেনা রোমাঞ্চমধুর এক রহস্যময় পরিবেশ নির্মাণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

শেষ হয়েও যেন শেষ হয় না; ছোটগল্পরূপে রসসৃষ্টির অতি সার্থক নিদর্শন এই 'ক্ষুধিত পাষাণ'।

৬.৯ সারাংশ

১। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পপাঠের আগে এই গল্পরচনার ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

২। 'ক্ষুধিত পাষাণ' কোন্ শ্রেণির গল্প ও তার বৈশিষ্ট্যগুলিও বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। বিশেষত অতিপ্রাকৃত গল্প হিসেবে এর স্থান ও গুরুত্ব বোঝা দরকার।

৩। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পরচনার ভঙ্গিটি প্রথমে বোঝা দরকার। এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বর্ণনার সংমিশ্রণের কৌশলটিও বোঝা প্রয়োজন। এই গল্প বর্ণনার শৈলী একান্তভাবেই অতিপ্রাকৃত পরিবেশ রচনার ওপর নির্মিত।

৪। অতিপ্রাকৃত গল্পের কতকগুলি লক্ষণ থাকে। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এ তা অত্যন্ত স্পষ্ট।

৫। রসসৃষ্টিরূপে 'ক্ষুধিত পাষাণ' অত্যন্ত সার্থক। পাঠকমনে তার স্থায়ী প্রভাব পড়ে। বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যে রসসৃষ্টির এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

৬.১০ অনুশীলনী ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির মূল কাঠামো কীভাবে নির্মিত?

২. ক্ষুধিত পাষাণের নির্মাণশৈলী বলতে কী বোঝেন?

৩. কী কী উপাদানে গল্পটি নির্মিত?

৪. পরিবেশ বর্ণনায় লেখক কতদূর সার্থক?

৫. লেখক-অনুসৃত গল্পবর্ণনার কৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

৬. সাধারণ গল্প আর অতিপ্রাকৃত গল্পের পার্থক্য নির্ণয় করুন।

৭. অতিপ্রাকৃত বলতে কী বোঝেন?

৮. অতিপ্রাকৃত গল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

৯. ক্ষুধিত পাষাণ কেন সার্থক রসসৃষ্টি?

১০. কীভাবে নির্ণয় করা যাবে এই সার্থকতার স্বরূপ?

১১. 'ক্ষুধিত পাষাণ' কী ধরনের গল্প?

১২. 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে কেন অতিপ্রাকৃত গল্পের উদাহরণ বলা হয়?

১৩. অতিপ্রাকৃত গল্পের লক্ষণ বর্ণনা করুন।

১৪. 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের পরিবেশ রচনায় রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা নিরূপণ করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : প্রমথনাথ বিশী।

২. রবীন্দ্রছোটগল্পের শিল্পরূপ : তপোব্রত ঘোষ।

একক ৭ ❑ হালদার গোষ্ঠী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

৭.১ মূলগল্প

৭.২ রচনাকাল

৭.৩ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণি নির্ণয়

৭.৪ গল্পের গঠন-বিশ্লেষণ

৭.৫ সমাজপ্রেক্ষিত ও চরিত্রনির্মাণ

৭.৬ রসসৃষ্টির সার্থকতা

৭.৭ সারাংশ

৭.৮ অনুশীলনী ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৭.২ মূলগল্প

এই পরিবারটির মধ্যে কোনোরকমের গোল বাধিবার কোনো সংগত কারণ ছিল না। অবস্থাও সচ্ছল, মানুষগুলিও কেহই মন্দ নহে। কিন্তু তবুও গোল বাধিল।

কেননা, সংগত কারণেই যদি মানুষের সব-কিছু ঘটিত তবে তো লোকালয়টা একটা অঙ্কের খাতার মতো হইত, একটু সাবধানে চলিলেই হিসাবে কোথাও কোনো ভুল ঘটিত না; যদি বা ঘটিত সেটাকে রবার দিয়া মুছিয়া সংশোধন করিলেই চলিয়া যাইত।

কিন্তু, মানুষের ভাগ্যদেবতার রসবোধ আছে; গণিতশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য আছে কি না জানি না, কিন্তু অনুরাগ নাই; মানবজীবনের যোগবিয়োগের বিশুদ্ধ অঙ্ক-ফলটি উদ্ধার করিতে তিনি মনোযোগ করেন না। এইজন্য তাঁহার ব্যবস্থার মধ্যে একটা পদার্থ তিনি সংযোগ করিয়াছেন, সেটা অসংগতি। যাহা হইতে পারিত সেটাকে সে হঠাৎ আসিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়। ইহাতেই নাট্যলীলা জমিয়া উঠে, সংসারের দুই কুল ছাপাইয়া হাসিকান্নার তুফান চলিতে থাকে।

এ ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিল— যেখানে পদ্মবন সেখানে মত্তহস্তী আসিয়া উপস্থিত। পঙ্কের সঙ্গে পঙ্কজের একটা বিপরীত রকমের মাখামাখি হইয়া গেল। তা না হইলে এ গল্পটি সৃষ্টি হইতে পারিত না।

যে পরিবারের কথা উপস্থিত করিয়াছি তাহার মধ্যে সব চেয়ে যোগ্য মানুষ যে বনোয়ারিলাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে নিজেও তাহা বিলক্ষণ জানে এবং সেইটেতেই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। যোগ্যতা এঞ্জিনের স্টীমের মতো তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে; সামনে যদি সে রাস্তা পায় তো ভালই, যদি না পায় তবে যাহা পায় তাহাকে ধাক্কা মারে।

তাহার বাপ মনোহরলালের ছিল সাবেককেলে বড়োমানুষি চাল। যে সমাজ তাঁহার, সেই সমাজের মাথাটিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি তাহার শিরোভূষণ হইয়া থাকিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। সুতরাং সমাজের হাত-পায়ের সঙ্গে তিনি কোনো সংস্রব রাখেন না। সাধারণ লোকে কাজকর্ম করে, চলে ফেরে; তিনি কাজ না-করিবার ও না-চলিবার বিপুল আয়োজনটি কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া বিরাজ করেন।

প্রায় দেখা যায়, এইপ্রকার লোকেরা বিনা চেষ্টায় আপনার কাছে অন্তত দুটি-একটি শক্ত এবং খাঁটি লোককে যেন চুম্বকের মতো টানিয়া আনেন। তাহার কারণ আর কিছু নয়, পৃথিবীতে একদল লোক জন্মায় সেবা করাই তাহাদের ধর্ম। তাহারা আপন প্রকৃতির চরিতার্থতার জন্যই এমন অক্ষম মানুষকে চায় যে লোক নিজের ভার ষোলো-আনাই তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারে। এই সহজ সেবকরা নিজের কাজে কোনো সুখ পায় না; কিন্তু আর-একজনকে নিশ্চিন্ত করা, তাহাকে সম্পূর্ণ আরামে রাখা, তাহাকে সকলপ্রকার সংকট হইতে বাঁচাইয়া চলা, লোকসমাজে তাহার সম্মানবৃদ্ধি করা, ইহাতেই তাহাদের পরম উৎসাহ। ইঁহারা যেন একপ্রকারের পুরুষ মা; তাহাও নিজের ছেলের নহে, পরের ছেলের।

মনোহরলালের যে চাকরটি আছে, রামচরণ, তাহার শরীররক্ষা ও শরীরপাতের একমাত্র লক্ষ্য বাবুর দেহ রক্ষা করা। যদি সে নিশ্বাস লইলে বাবুর নিশ্বাস লইবার প্রয়োজনটুকু বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে সে অহোরাত্র কামারের হাপরের মতো হাঁপাইতে রাজি আছে। বাহিরের লোকে অনেক সময় ভাবে, মনোহরলাল বুঝি তাঁহার সেবককে অনাবশ্যক খাটাইয়া অন্যায় পীড়ন করিতেছেন। কেননা, হাত হইতে গুড়গুড়ির নলটা হয়তো মাটিতে পড়িয়াছে, সেটাকে তোলা কঠিন কাজ নহে, অথচ সেজন্য ডাক দিয়া অন্য ঘর হইতে রামচরণকে দৌড় করানো নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু, এই-সকল ভূরি ভূরি অনাবশ্যক ব্যাপারে নিজেকে অত্যাবশ্যক করিয়া তোলাতেই রমাচরণের প্রভূত আনন্দ।

যেমন তাঁহার রামচরণ, তেমনি তাঁহার আর-একটি অনুচর নীলকণ্ঠ। বিষয়রক্ষার ভার এই নীলকণ্ঠের উপর। বাবুর প্রসাদপরিপুষ্ট রামচরণটি দিব্য সুচিক্কণ, কিন্তু নীলকণ্ঠের দেহে তাহার অস্থিকঙ্কালের উপর কোনোপ্রকার আব্রু নাই বলিলেই হয়। বাবুর ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দ্বারে সে মূর্তিমান দুর্ভিক্ষের মতো পাহারা দেয়। বিষয়টা মনোহরলালের, কিন্তু তাহার মমতাটা সম্পূর্ণ নীলকণ্ঠের।

নীলকণ্ঠের সঙ্গে বনোয়ারিলালের খিটিমিটি অনেক দিন হইতে বাধিয়াছে। মনে করো, বাপের কাছে দরবার করিয়া বনোয়ারি বড়োবউয়ের জন্য একটা নূতন গহনা গড়াইবার হুকুম আদায় করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, টাকাটা বাহির করিয়া লইয়া নিজের মনোমত করিয়া জিনিসটা ফরমাশ করে। কিন্তু, সে হইবার জো নাই। খরচপত্রের সমস্ত কাজই নীলকণ্ঠের হাত দিয়াই হওয়া চাই। তাহার ফল হইল এই, গহনা হইল বটে, কিন্তু কাহারও মনের মতো হইল না। বনোয়ারির নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, স্যাকরার সঙ্গে নীলকণ্ঠের ভাগবাটোয়ারা চলে। কড়া লোকের শত্রুর অভাব নাই। ঢের লোকের কাছে বনোয়ারি ঐ কথাই শুনিয়া আসিয়াছে যে, নীলকণ্ঠ অন্যকে যে পরিমাণে বঞ্চিত করিতেছে নিজের ঘরে তাহার ততোধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

অথচ দুই পক্ষে এই যে-সব বিরোধ জমা হইয়া উঠিয়াছে তাহা সামান্য পাঁচ-দশ টাকা লইয়া। নীলকণ্ঠের বিষয়বুদ্ধির অভাব নাই— এ কথা তাহার পক্ষে বুঝা কঠিন নহে যে, বনোয়ারির সঙ্গে বনাইয়া চলিতে না পারিলে কোনো-না-কোনো দিন তাহার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু, মনিবের ধন সম্বন্ধে নীলকণ্ঠের একটা কৃপণতার বায়ু আছে। সে যেটাকে অন্যায্য মনে করে মনিবের হুকুম পাইলেও কিছুতেই তাহা সে খরচ করিতে পারে না।

এ দিকে বনোয়ারির প্রায়ই অন্যায্য খরচের প্রয়োজন ঘটিতেছে। পুরুষের অনেক অন্যায্য ব্যাপারের মূলে যে কারণ থাকে সেই কারণটি এখানেও খুব প্রবলভাবে বর্তমান। বনোয়ারির স্ত্রী কিরণলেখার সৌন্দর্য সম্বন্ধে নানা মত থাকিতে পারে, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তাহার মধ্যে যে-মতটি বনোয়ারির, বর্তমান প্রসঙ্গে একমাত্র সেইটেই কাজের। বস্তুত স্ত্রী প্রতি বনোয়ারির মনের যে পরিমাণ টান সেটাকে বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে করে। অর্থাৎ, তাহারা নিজের স্বামীর কাছ হইতে যতটা আদর চায় অথচ পায় না, ইহা ততটা।

কিরণলেখার বয়স যতই হউক, চেহারা দেখিলে মনে হয় ছেলেমানুষটি। বাড়ির বড়োবউয়ের যেমনতরো গিন্নিবান্নি ধরনের আকৃতি-প্রকৃতি হওয়া উচিত সে তাহা একেবারেই নহে। সবসুদ্ধ জড়াইয়া সে যেন বড়ো স্বল্প।

বনোয়ারি তাহাকে আদর করিয়া অণু বলিয়া ডাকিত। যখন তাহাতেও কুলাইত না তখন বলিত পরমাণু। রসায়নশাস্ত্রে যাঁহাদের বিচক্ষণতা আছে তাঁহারা জানেন, বিশ্বঘটনায় অণুপরমাণুগুলির শক্তি বড়ো কম নয়।

কিরণ কোনোদিন স্বামীর কাছে কিছুর জন্য আবদার করে নাই। তাহার এমন একটি উদাসীন ভাব, যেন তাহার বিশেষ-কিছুতে প্রয়োজন নাই। বাড়িতে তাহার অনেক ঠাকুরঝি, অনেক ননদ; তাহাদিগকে লইয়া সর্বদাই তাহার সমস্ত মন ব্যাপৃত— নবযৌবনের নবজাগ্রত প্রেমের মধ্যে যে একটা নির্জন তপস্যা আছে তাহাতে তাহার তেমন প্রয়োজন-বোধ নাই। এইজন্য বনোয়ারির সঙ্গে ব্যবহারে তাহার বিশেষ একটা আগ্রহের লক্ষণ দেখা যায় না। যাহা সে বনোয়ারির কাছ হইতে পায় তাহা সে শান্তভাবে গ্রহণ করে, অগ্রসর হইয়া কিছু চায় না। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, স্ত্রীটি কেমন করিয়া খুশি হইবে সেই কথা বনোয়ারিকে নিজে ভাবিয়া বাহির করিতে হয়। স্ত্রী যেখানে নিজের মুখে ফরমাশ করে সেখানে সেটাকে তর্ক করিয়া কিছু-না-কিছু খর্ব করা সম্ভব হয়, কিন্তু নিজের সঙ্গে তো দর-কষাকষি চলে না। এমন স্থলে অযাচিত দানে যাচিত দানের চেয়ে খরচ বেশি পড়িয়া যায়।

তাহার পরে স্বামীর সোহাগের উপহার পাইয়া কিরণ যে কতখানি খুশি হইল তাহা ভালো করিয়া বুঝিবার জো নাই। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে বলে— বেশত্ব ভালোত্ব কিন্তু, বনোয়ারির মনের খটকা কিছুতেই মেটে না; ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হয়, হয়তো পছন্দ হয় না। কিরণ স্বামীকে ঈষৎ ভর্ৎসনা করিয়া বলে, "তোমার ঐ স্বভাব। কেন এমন খুঁতখুঁত করছ। কেন, এ তো বেশ হয়েছে।"

বনোয়ারি পাঠ্যপুস্তকে পড়িয়াছে— সন্তোষগুণটি মানুষের মহৎ গুণ। কিন্তু, স্ত্রীর স্ব ভাবে এই মহৎ গুণটি তাহাকে পীড়া দেয়। তাহার স্ত্রী তো তাহাকে কেবলমাত্র সন্তুষ্ট করে নাই, অভিভূত করিয়াছে, সেও স্ত্রীকে অভিভূত করিতে চায়। তাহার স্ত্রীকে তো বিশেষ কোনো চেষ্টা করিতে হয় না— যৌবনের লাবণ্য আপনি উছলিয়া পড়ে, সেবার নৈপুণ্য আপনি প্রকাশ হইতে থাকে। কিন্তু পুরুষের তো এমন সহজ সুযোগ নয়; পৌরুষের পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে কিছু-একটা করিয়া তুলিতে হয়। তাহার যে বিশেষ একটা শক্তি আছে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে পুরুষের ভালোবাসা ম্লান হইয়া থাকে। আর-কিছু না'ও যদি থাকে, ধন যে একটা শক্তির নিদর্শন, ময়ূরের পুচ্ছের মতো স্ত্রীর কাছে সেই ধনের সমস্ত বর্ণচ্ছটা বিস্তার করিতে পারিলে তাহাতে মন সান্ত্বনা পায়। নীলকণ্ঠ বনোয়ারির প্রেমনাট্যলীলার এই আয়োজনটাতে বারংবার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। বনোয়ারি বাড়ির বড়োবাবু, তবু কিছুতে তাহার কর্তৃত্ব নাই, কর্তার প্রশ্রয় পাইয়া ভৃত্য হইয়া নীলকণ্ঠ তাহার উপরে আধিপত্য করে— ইহাতে বনোয়ারির যে অসুবিধা ও অপমান সেটা আর-কিছুর জন্য তত নহে যতটা পঞ্চশরের তূণে মনের মতো শর জোগাইবার অক্ষমতা-বশত।

একদিন এই ধনসম্পদে তাহারই অবাধ অধিকার তো জন্মিবে। কিন্তু যৌবন কি চিরদিন থাকিবে? বসন্তের রঙিন পেয়ালায় তখন এ সুধারস এমন করিয়া আপনা-আপনি ভরিয়া উঠিবে না; টাকা তখন বিষয়ীর টাকা হইয়া খুব শক্ত হইয়া জমিবে, গিরিশিখরের তুষারসংঘাতের মতো— তাহাতে কথায় কথায় অসাবধানের অপব্যয়ের ঢেউ খেলিতে থাকিবে না। টাকার দরকার তো এখনই, যখন আনন্দে তাহা নয়-ছয় করিবার শক্তি নষ্ট হয় নাই।

বনোয়ারির প্রধান শখ তিনটি— কুস্তি, শিকার এবং সংস্কৃতচর্চা। তাহার খাতার মধ্যে সংস্কৃত উদ্ভটকবিতা একেবারে বোঝাই করা। বাদলার দিনে, জ্যোৎস্নারাত্রে দক্ষিণা হাওয়ায়, সেগুলি বড়ো কাজে লাগে। সুবিধা এই, নীলকণ্ঠ এই কবিতাগুলির অলংকারবাহুল্যকে খর্ব করিতে পারে না। অতিশয়োক্তি যতই অতিশয় হউক, কোনো খাতাঞ্চি-সেরেস্তায় তাহার জন্য জবাবদিহি নাই। কিরণের কানের সোনায় কার্পণ্য ঘটে কিন্তু তাহার কানের কাছে যে মন্দাক্রান্তা গুঞ্জরিত হয় তাহার ছন্দে একটি মাত্রাও কম পড়ে না এবং তাহার ভাবে কোনো মাত্রা থাকে না বলিলেই হয়।

লম্বাচওড়া পালোয়ানের চেহারা বনোয়ারির। যখন সে রাগ করে তখন তাহার ভয়ে লোকে অস্থির। কিন্তু, এই জোয়ান লোকটির মনের ভিতরটা ভারি কোমল। তাহার ছোটো ভাই বংশীলাল যখন ছোটো ছিল তখন সে তাহাকে মাতৃস্নেহে লালন করিয়াছে। তাহার হৃদয়ে যেন একটি লালন করিবার ক্ষুধা আছে।

তাহার স্ত্রীকে সে যে ভালোবাসে তাহার সঙ্গে এই জিনিসটিও জড়িত, এই লালন করিবার ইচ্ছা। কিরণলেখা তরুচ্ছায়ার মধ্যে পথহারা রশ্মিরেখাটুকুর মতোই ছোটো, ছোটো বলিয়াই সে তাহার স্বামীর মনে ভারি একটা দরদ জাগাইয়া রাখিয়াছে; এই স্ত্রীকে বসনে ভূষণে নানারকম করিয়া সাজাইয়া দেখিতে তাহার বড়ো আগ্রহ। তাহা ভোগ করিবার আনন্দ নহে, তাহা

রচনা করিবার আনন্দ, তাহা এককে বহু করিবার আনন্দ, কিরণলেখাকে নানা বর্ণে নানা আবরণে নানারকম করিয়া দেখিবার আনন্দ।

কিন্তু কেবলমাত্র সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বনোয়ারির এই শখ কোনোমতেই মিটিতেছে না; তাহার নিজের মধ্যে একটি পুরুষোচিত প্রভুশক্তি আছে তাহাও প্রকাশ করিতে পারিল না, আর প্রেমের সামগ্রীকে নানা উপকরণে ঐশ্বর্যবান করিয়া তুলিবার যে ইচ্ছা তাহাও তার পূর্ণ হইতেছে না।

এমন করিয়াই এই ধনীর সন্তান তাহার মানমর্যাদা, তাহার সুন্দরী স্ত্রী, তাহার ভরা যৌবন— সাধারণত লোকে যাহা কামনা করে তাহার সমস্ত লইয়াও সংসারে একদিন একটা উৎপাতের মতো হইয়া উঠিল।

সুখদা মধুকৈবর্তের স্ত্রী, মনোহরলালের প্রজা। সে একদিন অন্তঃপুরে আসিয়া কিরণলেখার পা জড়াইয়া ধরিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। ব্যাপারটা এই— বছর কয়েক পূর্বে নদীতে বেড়জাল ফেলিবার আয়োজন-উপলক্ষে অন্যান্য বারের মতো জেলেরা মিলিয়া একযোগে খৎ লিখিয়া মনোহরলালের কাছারিতে হাজার টাকা ধার লইয়াছিল। ভালোমত মাছ পড়িলে সুদে আসলে টাকা শোধ করিয়া দিবার কোনো অসুবিধা ঘটে না; এইজন্য উচ্চ সুদের হারে টাকা লইতে ইহারা চিন্তামাত্র করে না। সে বৎসর তেমন মাছ পড়িল না, এবং ঘটনাক্রমে উপরি উপরি তিন বৎসর নদীর বাঁকে মাছ এত কম আসিল যে জেলেদের খরচ পোষাইল না, অধিকন্তু তাহারা ঋণের জালে বিপরীত রকম জড়াইয়া পড়িল। যে-সকল জেলে ভিন্ন এলেকার তাহাদের আর দেখা পাওয়া যায় না; কিন্তু, মধুকৈবর্ত ভিটাবাড়ির প্রজা, তাহার পলাইবার জো নাই বলিয়া সমস্ত দেনার দায় তাহার উপরেই চাপিয়াছে। সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার অনুরোধ লইয়া সে কিরণের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিরণের শাশুড়ির কাছে গিয়া কোনো ফল নাই তাহা সকলেই জানে; কেননা, নীলকণ্ঠের ব্যবস্থায় কেহ যে আঁচড়টুকু কাটিতে পারে এ কথা তিনি কল্পনা করিতেও পারেন না। নীলকণ্ঠের প্রতি বনোয়ারির খুব একটা আক্রোশ আছে জানিয়াই মধুকৈবর্ত তাহার স্ত্রীকে কিরণের কাছে পাঠাইয়াছে।

বনোয়ারি যতই রাগ এবং যতই আস্ফালন করুক, কিরণ নিশ্চয় জানে যে, নীলকণ্ঠের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোনো অধিকার তাহার নাই। এইজন্য কিরণ সুখদাকে বার বার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "বাছা, কী করব বলো। জানই তো এতে আমাদের কোনো হাত নেই। কর্তা আছেন, মধুকে বলো, তাঁকে গিয়ে ধরুক।"

সে চেষ্টা তো পূর্বেই হইয়াছে। মনোহরলালের কাছে কোনো বিষয়ে নালিশ উঠিলেই তিনি তাহার বিচারের ভার নীলকণ্ঠের 'পরেই অর্পণ করেন, কখনোই তাহার অন্যথা হয় না। ইহাতে বিচারপ্রার্থীর বিপদ আরো বাড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাঁহার কাছে আপিল করিতে চায় তাহা হইলে কর্তা রাগিয়া আগুন হইয়া উঠেন— বিষয়কর্মের বিরক্তিই যদি তাঁহাকে পোহাইতে হইল তবে বিষয় ভোগ করিয়া তাঁহার সুখ কী!

সুখদা যখন কিরণের কাছে কান্নাকাটি করিতেছে তখন পাশের ঘরে বসিয়া বনোয়ারি তাহার বন্দুকের চোঙে তেল মাখাইতেছিল। বনোয়ারি সব কথাই শুনিল। কিরণ করুণকণ্ঠে যে বার বার করিয়া বলিতেছিল যে তাহারা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে অক্ষম, সেটা বনোয়ারির বুকে শেলের মতো বিঁধিল।

সেদিন মাঘীপূর্ণিমা ফাল্গুনের আরম্ভে আসিয়া পড়িয়াছে। দিনের বেলাকার গুমট ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ একটা পাগলা হাওয়া মাতিয়া উঠিল। কোকিল তো ডাকিয়া ডাকিয়া অস্থির; বার বার এক সুরের আঘাতে সে কোথাকার কোন্ ঔদাসীন্যকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর, আকাশে ফুলগন্ধের মেলা বসিয়াছে, যেন ঠেলাঠেলি ভিড়; জানলার ঠিক পাশেই অন্তঃপুরে বাগান হইতে মুচুকুন্দফুলের গন্ধ বসন্তের আকাশে নিবিড় নেশা ধরাইয়া দিল। কিরণ সেদিন লট্‌কানের-রঙ-করা একখানি শাড়ি এবং খোঁপায় বেলফুলের মালা পরিয়াছে। এই দম্পতির চিরনিয়ম-অনুসারে সেদিন বনোয়ারির জন্যও ফাল্গুন-ঋতুযাপনের উপযোগী একখানি লট্‌কানে-রঙিন চাদর ও বেলফুলের গোড়েমালা প্রস্তুত। রাত্রির প্রথম কাটিয়া গেল তবু বনোয়ারির দেখা নাই। যৌবনের ভরা পেয়ালাটি আজ তাহার কাছে কিছুতেই রুচিল না। প্রেমের বৈকুণ্ঠলোকে এত বড়ো

কুষ্ঠা হইয়া সে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া। মধুকৈবর্তের দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সে ক্ষমতা আছে নীলকণ্ঠের। এমন কাপুরুষের কণ্ঠে পরাইবার জন্য মালা কে গাঁথিয়াছে।

প্রথমেই সে তাহার বাহিরের ঘরে নীলকণ্ঠকে ডাকাইয়া আনিল এবং দেনার দায়ে মধুকৈবর্তকে নষ্ট করিতে নিষেধ করিল। নীলকণ্ঠ কহিল, মধুকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহা হইলে এই তামাদির মুখে বিস্তর টাকা বাকি পড়িবে; সকলেই ওজর করিতে আরম্ভ করিবে। বনোয়ারি তর্কে যখন পারিল না তখন যাহা মুখে আসিল গাল দিতে লাগিল। বলিল, ছোটোলোক। নীলকণ্ঠ কহিল, "ছোটোলোক না হইলে বড়োলোকের শরণাপন্ন হইব কেন।" বলিল, চোর। নীলকণ্ঠ বলিল, "সে তো বটেই, ভগবান যাহাকে নিজের কিছুই দেন নাই' পরের ধনেই তো সে প্রাণ বাঁচায়।" সকল গালিই সে মাথায় করিয়া লইল; শেষকালে বলিল, "উকিলবাবু বসিয়া আছেন, তাঁহার সং! কাজের কথাটা সারিয়া লই। যদি দরকার বোধ করেন তো আবার আসিব।"

বনোয়ারি ছোটো ভাই বংশীকে নিজের দলে টানিয়া তখনই বাপের কাছে যাওয়া স্থির করিল। সে জানিত, একলা গেলে কোনো ফল হইবে না, কেননা এই নীলকণ্ঠকে লইয়াই তাহার বাপের সঙ্গে পূর্বেই তাহার খিটিমিটি হইয়াছে। বাপ তাহার উপর বিরক্ত হইয়াই আছেন। একদিন ছিল যখন সকলেই মনে করি, মনোহরলাল তাঁহার বড়ো ছেলেকেই সব চেয়ে ভালোবাসেন। কিন্তু, এখন মনে হয়, বংশীর উপরেই তাঁহার পক্ষপাত। এইজন্যই বনোয়ারি বংশীকেও তাহার নালিশের পক্ষভুক্ত করিতে চাহিল।

বংশী, যাহাকে বলে, অত্যন্ত ভালো ছেলে। এই পরিবারের মধ্যে সেই কেবল দুটো এক্‌জামিন পাস করিয়াছে। এবার সে আইনের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দিনরাত জাগিয়া পড়া করিয়া তাহার অন্তরের দিকে কিছু জমা হইতেছে কি না অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু শরীরের দিকে খরচ ছাড়া আর কিছুই নাই।

এই ফাল্গুনের সন্ধ্যায় তাহার ঘরে জানালা বন্ধ। ঋতুপরিবর্তনের সময়টাকে তাহার ভারি ভয়। হাওয়ার প্রতি তাহার শ্রদ্ধামাত্র নাই। টেবিলের উপর একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছে; কতক বই মেজের উপরে চৌকির পাশে রাশীকৃত, কতক টেবিলের উপরে; দেয়ালে কুলুঙ্গিতে কতকগুলি ঔষধের শিশি।

বনোয়ারির প্রস্তাবে সে কোনোমতেই সম্মত হইল না। বনোয়ারি রাগ করিয়া গর্জিয়া উঠিল, "তুই নীলকণ্ঠকে ভয় করিস্‌!" বংশী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। বস্তুতই নীলকণ্ঠকে অনুকূল রাখিবার জন্য তাহার সর্বদাই চেষ্টা। সে প্রায় সমস্ত বৎসর কলিকাতার বাসাতেই কাটায়; সেখানে বরাদ্দ টাকার চেয়ে তাহার বেশি দরকার হইয়াই পড়ে। এই সূত্রে নীলকণ্ঠকে প্রসন্ন রাখাটা তাহার অভ্যস্ত।

বংশীকে ভীরু, কাপুরুষ, নীলকণ্ঠের চরণ-চারণ-চক্রবর্তী বলিয়া খুব একচোট গালি দিয়া বনোয়ারি একলাই বাপের কাছে গিয়া উপস্থিত। মনোহরলাল তাঁহাদের বাগানে দিঘির ঘাটে তাঁহার নধর শরীরটি উদঘাটন করিয়া আরামে হাওয়া খাইতেছেন। পারিষদগণ কাছে বসিয়া কলিকাতার বারিস্টারের জেরায় জেলাকোর্টে অপর পল্লীর জমিদার অখিল মজুমদার যে কিরূপ নাকাল হইয়াছিল তাহারই কাহিনী কর্তাবাবুর শ্রুতিমধুর করিয়া রচনা করিতেছিল। সেদিন বসন্তসন্ধ্যার সুগন্ধ বায়ু-সহযোগে সেই বৃত্তান্তটি তাঁহার কাছে অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ বনোয়ারি তাহার মাঝখানে পড়িয়া রসভঙ্গ করিয়া দিল। ভূমিকা করিয়া নিজের বক্তব্য কথাটা ধীরে ধীরে পাড়িবার মতো অবস্থা তাহার ছিল না। সে একেবারে গলা চড়াইয়া শুরু করিয়া দিল, নীলকণ্ঠের দ্বারা তাহাদের ক্ষতি হইতেছে। সে চোর, সে মনিবের টাকা ভাঙিয়া নিজের পেট ভরিতেছে। কথাটার কোনো প্রমাণ নাই এবং তাহা সত্যও নহে। নীলকণ্ঠের দ্বারা বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে, এবং সে চুরিও করে না। বনোয়ারি মনে করিয়াছিল, নীলকণ্ঠের সংস্বভাবের প্রতি অটল বিশ্বাস আছে বলিয়াই কর্তা সকল বিষয়েই তাহার 'পরে এমন চোখ বুজিয়া নির্ভর করেন। এটা তাহার ভ্রম। মনোহরলালের মনে নিশ্চয় ধারণা যে, নীলকণ্ঠ সুযোগ পাইলে চুরি করিয়া থাকে। কিন্তু, সেজন্য তাহার প্রতি তাঁহার কোনো অশ্রদ্ধা নাই। কারণ, আবহমান কাল এমনি ভাবেই সংসার চলিয়া আসিতেছে। অনুচরগণের চুরির উচ্ছিষ্টেই তো চিরকাল বড়োঘর পালিত। চুরি

করিবার চাতুরী যাহার নাই, মনিবের বিষয়রক্ষা করিবার বুদ্ধিই বা তাহার জোগাইবে কোথা হইতে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়া তো জমিদারির কাজ চলে না। মনোহর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, নীলকণ্ঠ কী করে না-করে সে কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।" সেই সঙ্গে ইহাও বলিলেন, "দেখো দেখি, বংশীর তো কোনো বালাই নাই। সে কেমন পড়াশুনা করিতেছে। ঐ ছেলেটা তবু একটু মানুষের মতো।"

ইহার পরে অখিল মজুমদারের দুর্গতিকাহিনীতে আর রস জমিল না। সুতরাং, মনোহরলালের পক্ষে সেদিন বসন্তের বাতাস বৃথা বহিল এবং দিঘির কালো জলের উপর চাঁদের আলোর ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিবার কোনো উপযোগিতা রহিল না। সেদিন সন্ধ্যাটা কেবল বৃথা হয় নাই বংশী এবং নীলকণ্ঠের কাছে। জানলা বন্ধ করিয়া বংশী অনেক রাত পর্যন্ত পড়িল এবং উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নীলকণ্ঠ অর্ধেক রাত কাটাইয়া দিল।

কিরণ ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া জানলার কাছে বসিয়া। কাজকর্ম আজ সে সকাল-সকাল সারিয়া লইয়াছে। রাত্রের আহার বাকি, কিন্তু এখনো বনোয়ারি খায় নাই, তাই সে অপেক্ষা করিতেছে। মধুকৈবর্তের কথা তাহার মনেও নাই। বনোয়ারি যে মধুর দুঃখের কোনো প্রতিকার করিতে পারে না, এ সম্বন্ধে কিরণের মনে ক্ষোভের লেশমাত্র ছিল না। তাহার স্বামীর কাছ হইতে কোনোদিন সে কোনো বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাইবার জন্য উৎসুক নহে। পরিবারের গৌরবেই তাহার স্বামীর গৌরব। তাহার স্বামী তাহার শ্বশুরের বড়ো ছেলে, ইহার চেয়ে তাহাকে যে আরো বড়ো হইতে হইবে, এমন কথা কোনোদিন তাহার মনেও হয় নাই। ইহারা যে গোঁসাইগঞ্জের সুবিখ্যাত হালদার-বংশ!

বনোয়ারি অনেক রাত্রি পর্যন্ত বাহিরের বারান্দায় পায়চারি সমাধা করিয়া ঘরে আসিল। সে ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহার খাওয়া হয় নাই। কিরণ যে তাহার অপেক্ষায় না-খাইয়া বসিয়া আছে এই ঘটনাটা সেদিন যেন তাহাকে বিশেষ করিয়া আঘাত করিল। কিরণের এই কষ্টস্বীকারের সঙ্গে তাহার নিজের অকর্মণ্যতা যেন খাপ খাইল না। অন্নের গ্রাস তাহার গলায় বাধিয়া যাইবার জো হইল। বনোয়ারি অত্যন্ত উত্তেজনার সহিত স্ত্রীকে বলিল, "যেমন করিয়া পারি মধুকৈবর্তকে আমি রক্ষা করিব।" কিরণ তাহার এই অনাবশ্যক উগ্রতায় বিস্মিত হইয়া কহিল, "শোনো একবার! তুমি তাহাকে বাঁচাইবে কেমন করিয়া।"

মধুর দেনা বনোয়ারি নিজে শোধ করিয়া দিবে এই তাহার পণ, কিন্তু বনোয়ারির হাতে কোনোদিন তো টাকা জমে না। স্থির করিল, তাহার তিনটে ভালো বন্দুকের মধ্যে একটা বন্দুক এবং একটা দামি হীরার আংটি বিক্রয় করিয়া সে অর্থ সংগ্রহ করিবে। কিন্তু, গ্রামে এ-সব জিনিসের উপযুক্ত মূল্য জুটিবে না এবং বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে চারি দিকে লোকে কানাকানি করিবে। এইজন্য কোনো-একটা ছুতা করিয়া বনোয়ারি কলিকাতায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় মধুকে ডাকিয়া আশ্বাস দিয়া গেল, তাহার কোনো ভয় নাই।

এ দিকে বনোয়ারির শরণাপন্ন হইয়াছে বুঝিয়া, নীলকণ্ঠ মধুর উপরে রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। পেয়াদার উৎপীড়নে কৈবর্তপাড়ার আর মানসম্ভ্রম থাকে না।

কলিকাতা হইতে বনোয়ারি যেদিন ফিরিয়া আসিল সেই দিনই মধুর ছেলে স্বরূপ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে বনোয়ারির পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউহাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। "কী রে কী, ব্যাপারখানা কী।" স্বরূপ বলিল, তাহার বাপকে নীলকণ্ঠ কাল রাত্রি হইতে কাছারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বনোয়ারির শরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল। কহিল, "এখনি গিয়া থানায় খবর দিয়া আয় গে।"

কী সর্বনাশ! থানায় খবর! নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে! তাহার পা উঠিতে চায় না। শেষকালে বনোয়ারির তাড়নায় থানায় গিয়া সে খবর দিল। পুলিশ হঠাৎ কাছারিতে আসিয়া বন্ধনদশা হইতে মধুকে খালাস করিল এবং নীলকণ্ঠ ও কাছারির কয়েকজন পেয়াদাকে আসামি করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চালনা করিয়া দিল।

মনোহর বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মকদ্দমার মন্ত্রীরা ঘুষের উপলক্ষ করিয়া পুলিসের সঙ্গে ভাগ করিয়া টাকা লুটিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে এক বারিস্টার আসিল, সে একেবারে কাঁচা, নূতন-পাস-করা। সুবিধা এই, যত ফি তাহার নামে খাতায় খরচ পড়ে তত ফি তাহার পকেটে উঠে না। ও দিকে মধুকৈবর্তের পক্ষে জেলা-আদালতের একজন মাতব্বর উকিল নিযুক্ত

হইল। কে যে তাহার খরচ জোগাইতেছে বোঝা গেল না। নীলকণ্ঠের ছয় মাস মেয়াদ হইল। হাইকোর্টের আপিলেও তাহাই বহাল রহিল।

ঘড়ি এবং বন্দুকটা যে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে তাহা ব্যর্থ হইল না— আপাতত মধু বাঁচিয়া গেল এবং নীলকণ্ঠের জেল হইল। কিন্তু, এই ঘটনার পরে মধু তাহার ভিটায় টিকিবে কী করিয়া। বনোয়ারি তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "তুই থাক্, তোর কোনো ভয় নাই।" কিসের জোরে যে আশ্বাস দিল তাহা সেই জানে— বোধ করি, নিছক নিজের পৌরুষের স্পর্ধায়।

বনোয়ারি যে এই ব্যাপারের মূলে আছে তাহা সে লুকাইয়া রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করে নাই। কথাটা প্রকাশ হইল; এমন-কি, কর্তার কানেও গেল। তিনি চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "বনোয়ারি যেন কদাচ আমার সম্মুখে না আসে।" বনোয়ারি পিতার আদেশ অমান্য করিল না।

কিরণ তাহার স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া অবাক। এক কী কাণ্ড। বাড়ির বড়োবাবু— বাপের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ। তার উপরে নিজেদের আমলাকে জেলে পাঠাইয়া বিশ্বের লোকের কাছে নিজের পরিবারের মাথা হেঁট করিয়া দেওয়া। তাও এই এক সামান্য মধুকৈবর্তকে লইয়া!

অদ্ভুত বটে! এ বংশে কতকাল ধরিয়া কত বড়োবাবু জন্মিয়াছে এবং কোনোদিন নীলকণ্ঠের অভাব নাই। নীলকণ্ঠেরা বিষয়ব্যবস্থার সমস্ত দায় নিজেরা লইয়াছে আর বড়োবাবুরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বংশগৌরব রক্ষা করিয়াছে। এমন বিপরীত ব্যাপার তো কোনোদিন ঘটে নাই।

আজ এই পরিবারের বড়োবাবুর পদের অবনতি ঘটাতে বড়োবউয়ের সম্মানে আঘাত লাগিল। ইহাতে এতদিন পরে আজ স্বামীর প্রতি কিরণের যথার্থ অশ্রদ্ধার কারণ ঘটিল। এতদিন পরে তাহার বসন্তকালের লট্‌কানে-রঙের শাড়ি এবং খোঁপার বেলফুলের মালা লজ্জায় ম্লান হইয়া গেল।

কিরণের বয়স হইয়াছে অথচ সন্তান হয় নাই। এই নীলকণ্ঠই একদিন কর্তার মত করাইয়া পাত্রী দেখিয়া বনোয়ারির আর-একটি বিবাহ প্রায় পাকাপাকি স্থির করিয়াছিল। বনোয়ারি হালদারবংশের বড়ো ছেলে, সকল কথার আগে এ কথা তো মনে রাখিতে হইবে। সে অপুত্রক থাকিবে, ইহা তো হইতেই পারে না। এই ব্যাপারে কিরণের বুক দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, ইহা সে মনে মনে না স্বীকার করিয়া থাকিতে পারে নাই যে, কথাটা সংগত। তখনো সে নীলকণ্ঠের উপরে কিছুমাত্র রাগ করে নাই, সে নিজের ভাগ্যকেই দোষ দিয়াছে। তাহার স্বামী যদি নীলকণ্ঠকে রাগিয়া মারিতে না যাইত এবং বিবাহসম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া পিতামাতার সঙ্গে রাগারাগি না করিত তবে কিরণ সেটাকে অন্যায় মনে করিত না। এমন-কি, বনোয়ারি যে তাহার বংশের কথা ভাবিল না, ইহাতে অতি গোপনে কিরণের মনে বনোয়ারির পৌরুষের প্রতি একটু অশ্রদ্ধাই হইয়াছিল। বড়ো ঘরের দাবি কি সামান্য দাবি। তাহার যে নিষ্ঠুর হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো তরুণী স্ত্রীর কিংবা কোনো দুঃখী কৈবর্তের সুখদুঃখের কতটুকুই বা মূল্য।

সাধারণত যাহা ঘটিয়া থাকে এক-একবার তাহা না ঘটিলে কেহই তাহা ক্ষমা করিতে পারে না, এ কথা বনোয়ারি কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। সম্পূর্ণরূপে এ বাড়ির বড়োবাবু হওয়াই তাহার উচিত ছিল; অন্য কোনো প্রকারের উচিত-অনুচিত চিন্তা করিয়া এখানকার ধারাবাহিকতা নষ্ট করা যে তাহার অকর্তব্য, তাহা সে ছাড়া সকলেরই কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

এ লইয়া কিরণ তাহার দেবরের কাছে কত দুঃখই করিয়াছে। বংশী বুদ্ধিমান; তাহার খাওয়া হজম হয় না এবং একটু হাওয়া লাগিলেই সে হাঁচিয়া কাশিয়া অস্থির হইয়া উঠে, কিন্তু সে স্থির ধীর বিচক্ষণ। সে তাহার আইনের বইয়ের যে অধ্যায়টি পড়িতেছিল সেইটেকে টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় উপুড় করিয়া রাখিয়া কিরণকে বলিল, "এ পাগলামি ছাড়া আর-কিছুই নহে।" কিরণ অত্যন্ত উদবেগের সহিত মাথা নাড়িয়া কহিল, জান তো ঠাকুরপো, তোমার দাদা যখন ভালো আছেন তখন বেশ আছেন, কিন্তু একবার যদি খ্যাপেন তবে তাঁহাকে কেহ সামলাইতে পারে না। আমি কী করি বলো তো।"

পরিবারের সকল প্রকৃতিস্থ লোকের সঙ্গেই যখন কিরণের মতের সম্পূর্ণ মিল হইল তখন সেইটেই বনোয়ারির বুকে সকলের চেয়ে বাজিল। এই একটুখানি স্ত্রীলোক, অনতিস্ফুট চাঁপাফুলটির মতো পেলব, ইহার হৃদয়টিকে আপন বেদনার কাছে টানিয়া

আনিতে পুরুষের সমস্ত শক্তি পরাস্ত হইল। আজকের দিনে কিরণ যদি বনোয়ারির সহিত সম্পূর্ণ মিলিতে পারিত তবে তাহার হৃদয়ক্ষত দেখিতে দেখিতে এমন করিয়া বাড়িয়া উঠিত না।

মধুকে রক্ষা করিতে হইবে এই অতি সহজ কর্তব্যের কথাটা, চারি দিক হইতে তাড়নার চোটে, বনোয়ারির পক্ষে সত্য-সত্যই একটা খ্যাপামির ব্যাপার হইয়া উঠিল। ইহার তুলনায় অন্য সমস্ত কথাই তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল। এ দিকে জেল হইতে নীলকণ্ঠ এমন সুস্থভাবে ফিরিয়া আসিল যেন সে জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। আবার সে যথারীতি অম্লানবদনে আপনার কাজে লাগিয়া গেল।

মধুকে ভিটেছাড়া করিতে না পারিলে প্রজাদের কাছে নীলকণ্ঠের মান রক্ষা হয় না। মানের জন্য সে বেশি কিছু ভাবে না, কিন্তু প্রজারা তাহাকে না মানিলে তাহার কাজ চলিবে না, এইজন্যই তাহাকে সাবধান হইতে হয়। তাই মধুকে তৃণের মতো উৎপাটিত করিবার জন্য তাহার নিড়ানিতে শান দেওয়া শুরু হইল।

এবার বনোয়ারি আর গোপনে রহিল না। এবার সে নীলকণ্ঠকে স্পষ্টই জানাইয়া দিল যে, যেমন করিয়া হউক মধুকে উচ্ছেদ হইতে সে দিবে না। প্রথমত, মধুর দেনা সে নিজে হইতে সমস্ত শোধ করিয়া দিল; তাহার পর আর-কোনো উপায় না দেখিয়া সে নিজে গিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইয়া আসিল যে, নীলকণ্ঠ অন্যায় করিয়া মধুকে বিপদে ফেলিবার উদ্‌যোগ করিতেছে।

হিতৈষীরা বনোয়ারিকে সকলেই বুঝাইল, যেরূপ কাণ্ড ঘটিতেছে তাহাতে কোন্‌দিন মনোহর তাহাকে ত্যাগ করিবে। ত্যাগ করিতে গেলে যে-সব উৎপাত পোহাইতে হয় তাহা যদি না থাকিত তবে এতদিনে মনোহর তাহাকে বিদায় করিয়া দিত। কিন্তু, বনোয়ারির মা আছেন এবং আত্মীয়স্বজনের নানা লোকের নানাপ্রকার মত, এই লইয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিতে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছুক বলিয়াই এখনো মনোহর চুপ করিয়া আছেন।

এমনি হইতে হইতে একদিন সকালে হঠাৎ দেখা গেল, মধুর ঘরে তালা বন্ধ। রাতারাতি সে যে কোথায় গিয়াছে তাহার খবর নাই। ব্যাপারটা নিতান্ত অশোভন হইতেছে দেখিয়া নীলকণ্ঠ জমিদার-সরকার হইতে টাকা দিয়া তাহাকে সপরিবারে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছে। পুলিস তাহা জানে; এজন্য কোনো গোলমাল হইল না। অথচ নীলকণ্ঠ কৌশলে গুজব রটাইয়া দিল যে, মধুকে তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসমেত অমাবস্যা-রাত্রে কালীর কাছে বলি দিয়া মৃতদেহগুলি ছালায় পুরিয়া মাঝগঙ্গায় ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভয়ে সকলের শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং নীলকণ্ঠের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা পূর্বের চেয়ে অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গেল।

বনোয়ারি যাহা লইয়া মাতিয়াছিল উপস্থিতমত তাহার শান্তি হইল। কিন্তু সংসারটি তাহার কাছে আর পূর্বে মতো রহিল না।

বংশীকে একদিন বনোয়ারি অত্যন্ত ভালোবাসিত; আজ দেখিল বংশী তাহার কেহ নহে, সে হালদারগোষ্ঠীর। আর, তাহার কিরণ, যাহার ধ্যানরূপটি যৌবনারম্ভের পূর্ব হইতে ক্রমে ক্রমে তাহার হৃদয়ের লতাবিতানটিকে জড়াইয়া জড়াইয়া আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, সেও সম্পূর্ণ তাহার নহে, সেও হালদারগোষ্ঠীর। একদিন ছিল যখন নীলকণ্ঠের ফরমাশে-গড়া গহনা তাহার এই হৃদয়বিহারিণী কিরণের গায়ে ঠিকমত মানাইত না বলিয়া বনোয়ারি খুঁতখুঁত করিত। আজ দেখিল, কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া অমরু ও চৌর কবির যে-সমস্ত কবিতার সোহাগে সে প্রেয়সীকে মণ্ডিত করিয়া আসিয়াছে আজ তাহা এই হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউকে কিছুতেই মানাইতেছে না।

হায় রে, বসন্তের হাওয়া তবু বহে, রাত্রে শ্রাবণের বর্ষণ তবু মুখরিত হইয়া উঠে এবং অতৃপ্ত প্রেমের বেদনা শূন্য হৃদয়ের পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়।

প্রেমের নিবিড়তায় সকলের তো প্রয়োজন নাই; সংসারের ছোটো কুনকের মাপের বাঁধা বরাদ্দে অধিকাংশ লোকের বেশ চলিয়া যায়। সেই পরিমিত ব্যবস্থায় বৃহৎ সংসারে কোনো উৎপাত ঘটে না। কিন্তু, এক-একজনের ইহাতে কুলায় না। তাহারা অজাত পক্ষীশাবকের মতো কেবলমাত্র ডিমের ভিতরকার সংকীর্ণ খাদ্যরসটুকু লইয়া বাঁচে না, তাহারা ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে, নিজের শক্তিতে খাদ্য-আহরণের বৃহৎ ক্ষেত্র তাহাদের চাই। বনোয়ারি সেই ক্ষুধা লইয়া জন্মিয়াছে, নিজের প্রেমকে নিজের পৌরুষের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য তাহার চিত্ত উৎসুক, কিন্তু যে দিকেই সে ছুটিতে চায় সেই দিকেই হালদারগোষ্ঠীর পাকা ভিত; নড়িতে গেলেই তাহার মাথা ঠুকিয়া যায়।

দিন আবার পূর্ব্বে মতো কাটিতে লাগিল। আগের চেয়ে বনোয়ারি শিকারে বেশি মন দিয়াছে, ইহা ছাড়া বাহিরের দিক হইতে তাহার জীবনের আর বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা গেল না। অন্তঃপুরে সে আহার করিতে যায়, আহারের পর স্ত্রীর সঙ্গে যথাপরিমাণে বাক্যালাপও হয়। মধুকৈবর্তকে কিরণ আজও ক্ষমা করে নাই, কেননা, এই পরিবারে তাহার স্বামী যে আপন প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছে তাহার মূল কারণ মধু। এইজন্য ক্ষণে ক্ষণে কেমন করিয়া সেই মধুর কথা অত্যন্ত তীব্র হইয়া কিরণের মুখে আসিয়া পড়ে। মধুর যে হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, সে যে শয়তানের অগ্রগণ্য, এবং মধুকে দয়া করাটা যে নিতান্তই একটা ঠকা, এ কথা বার বার বিস্তারিত করিয়াও কিছুতে তাহার শান্তি হয় না। বনোয়ারি প্রথম দুই-একদিন প্রতিবাদের চেষ্টা করিয়া কিরণের উত্তেজনা প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করে না। এমনি করিয়া বনোয়ারি তাহার নিয়মিত গৃহধর্ম রক্ষা করিতেছে; কিরণ ইহাতে কোনো অভাব-অসম্পূর্ণতা অনুভব করে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বনোয়ারির জীবনটা বিবর্ণ, বিরস এবং চির-অভুক্ত।

এমন সময় জানা গেল, বাড়ির ছোটোবউ, বংশীর স্ত্রী গর্ভিণী। সমস্ত পরিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিরণের দ্বারা এই মহদ্‌বংশের প্রতি যে কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছিল, এতদিন পরে তাহা পূরণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে; এখন ষষ্ঠীর কৃপায় কন্যা না হইয়া পুত্র হইলে রক্ষা।

পুত্রই জন্মিল। ছোটোবাবু কলেজের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ, বংশের পরীক্ষাতেও প্রথম মার্ক পাইল। তাহার আদর উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল, এখন তাহার আদরের সীমা রহিল না।

সকলে মিলিয়া এই ছেলেটিকে লইয়া পড়িল। কিরণ তো তাহাকে এক মুহূর্ত কোল হইতে নামাইতে চায় না। তাহার এমন অবস্থা যে, মধুকৈবর্তের স্বভাবের কুটিলতার কথাও সে প্রায় বিস্মৃত হইবার জো হইল।

বনোয়ারির ছেলে-ভালোবাসা অত্যন্ত প্রবল। যাহা কিছু ছোটো, অক্ষম, সুকুমার, তাহার প্রতি তাহার গভীর স্নেহ এবং করুণা। সকল মানুষেরই প্রকৃতির মধ্যে বিধাতা এমন একটা কিছু দেন যাহা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, নহিলে বনোয়ারি যে কেমন করিয়া পাখি শিকার করিতে পারে বোঝা যায় না।

কিরণের কোলে একটি শিশুর উদয় দেখিবে, এই ইচ্ছা বনোয়ারির মনে বহুকাল হইতে অতৃপ্ত হইয়া আছে। এইজন্য বংশীর ছেলে হইতে প্রথমটা তাহার মনে একটু ঈর্ষার বেদনা জন্মিয়াছিল, কিন্তু সেটাকে দূর করিয়া দিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। এই শিশুটিকে বনোয়ারি খুবই ভালোবাসিতে পারিত, কিন্তু ব্যাঘাতের কারণ হইল এই যে, যত দিন যাইতে লাগিল কিরণ তাহাকে লইয়া অত্যন্ত বেশি ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর সঙ্গে বনোয়ারির মিলনে বিস্তর ফাঁক পড়িতে লাগিল। বনোয়ারি স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, এতদিন পরে কিরণ এমন একটা-কিছু পাইয়াছে তাহা তাহার হৃদয়কে সত্যসত্যই পূর্ণ করিতে পারে। বনোয়ারি যেন তাহার স্ত্রীর হৃদয়হর্ম্যের একজন ভাড়াটে; যতদিন বাড়ির কর্তা অনুপস্থিত ছিল ততদিন সমস্ত বাড়িটা সে ভোগ করিত, কেহ বাধা দিত না— এখন গৃহস্বামী আসিয়াছে তাই ভাড়াটে সব ছাড়িয়া তাহার কোণের ঘরটি মাত্র দখল করিতে অধিকারী। কিরণ স্নেহে যে কতদূর তন্ময় হইতে পারে, তাহার আত্মবিসর্জনের শক্তি যে কত প্রবল, তাহা বনোয়ারি যখন দেখিল তখন তাহার মন মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এই হৃদয়কে আমি তো জাগাইতে পারি নাই, অথচ আমার যাহা সাধ্য তাহা তো করিয়াছি।'

শুধু তাই নয়, এই ছেলেটির সূত্রে বংশীর ঘরই যেন কিরণের কাছে বেশি আপন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত মন্ত্রণা আলোচনা বংশীর সঙ্গেই ভালো করিয়া জমে। সেই সূক্ষ্মবুদ্ধি সূক্ষ্মশরীর রসরক্তহীন ক্ষীণজীবী ভীরু মানুষটার প্রতি বনোয়ারির অবজ্ঞা ক্রমেই গভীরতর হইতেছিল। সংসারের সকল লোকে তাহাকেই বনোয়ারির চেয়ে সকল বিষয়ে যোগ্য বলিয়া মনে করে তাহা বনোয়ারির সহিয়াছে; কিন্তু আজ সে যখন বার বার দেখিল, মানুষ হিসাবে তাহার স্ত্রীর কাছে বংশীর মূল্য বেশি, তখন নিজের ভাগ্য এবং বিশ্বসংসারের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন হইল না।

এমন সময়ে পরীক্ষার কাছাকাছি কলিকাতার বাসা হইতে খবর আসিল, বংশী জ্বরে পড়িয়াছে এবং ডাক্তার আরোগ্য অসাধ্য বলিয়া আশঙ্কা করিতেছে। বনোয়ারি কলিকাতায় গিয়া দিনরাত জাগিয়া বংশীর সেবা করিল, কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না।

মৃত্যু বনোয়ারির স্মৃতি হইতে সমস্ত কাঁটা উৎপাটিত করিয়া লইল। বংশী যে তাহার ছোটো ভাই এবং শিশুবয়সে দাদার কোলে যে তাহার স্নেহের আশ্রয় ছিল, এই কথাই তাহার মনে অশ্রুধৌত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার সমস্ত প্রাণের যত্ন দিয়া শিশুটিকে মানুষ করিতে সে কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু, এই শিশু সম্বন্ধে কিরণ তাহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছে। ইহার প্রতি তাহার স্বামীর বিরাগ সে প্রথম হইতেই লক্ষ করিয়াছে। স্বামীর সম্বন্ধে কিরণের মনে কেমন্ ধারণা হইয়া গেছে যে, অপর সাধারণের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহার স্বামীর পক্ষে ঠিক তাহা উল্টা। তাহাদের বংশের এই তো একমাত্র কুলপ্রদীপ, ইহার মূল্য যে কী তাহা আর-সকলেই বোঝে; নিশ্চয় সেইজন্যই তাহার স্বামী তাহা বোঝে না। কিরণের মনে সর্বদাই ভয়, পাছে বনোয়ারির বিদ্বেষদৃষ্টি ছেলেটির অম ল ঘটায়। তাহার দেবর বাঁচিয়া নাই, কিরণের সন্তানসম্ভাবনা আছে বলিয়া কেহই আশা করে না, অতএব এই শিশুটিকে কোনোমতে সকলপ্রকার অকল্যাণ হইতে বাঁচায়িা রাখিতে পারিলে তবে রক্ষা। এইরূপে বংশীর ছেলেটিকে যত্ন করিবার পথ বনোয়ারির পক্ষে বেশ স্বাভাবিক হইল না।

বাড়ির সকলের আদরে ক্রমে ছেলেটি বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার নাম হইল হরিদাস। এত বেশি আদরের আওতায় সে যেন কেমন ক্ষীণ এবং ক্ষণভ ুর আকার ধারণ করিল। তাগা-তাবিজ-মাদুলিতে তাহার সর্বা ! আচ্ছন্ন, রক্ষকের দল সর্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া।

ইহার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে বনোয়ারির স ! তাহার দেখা হয়। জ্যাঠামশায়ের ঘোড়ায় চড়িবার চাবুক লইয়া আস্ফালন করিতে সে বড়ো ভালোবাসে। দেখা হইলেই বলে 'চাবু'। বনোয়ারি ঘর হইতে চাবুক বাহির করিয়া আনিয়া বাতাসে সাঁই সাঁই শব্দ করিতে থাকে, তাহার ভারি আনন্দ হয়। বনোয়ারি এক-একদিন তাহাকে আপনার ঘোড়ার উপর বসাইয়া দেয়, তাহাতে বাড়িসুদ্ধ লোক একেবারে হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে। বনোয়ারি কখনো কখনো আপনার বন্দুক লইয়া তাহার স ! খেলা করে, দেখিতে পাইলে কিরণ ছুটিয়া আসিয়া বালককে সরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু, এই-সকল নিষিদ্ধ আমোদেই হরিদাসের সকলের চেয়ে অনুরাগ। এইজন্য সকলপ্রকার বিঘ্ন-সত্ত্বে জ্যাঠামশায়ের স ! তাহার খুব ভাব হইল।

বহুকাল অব্যাহতির পর এক সময়ে হঠাৎ এই পরিবারে মৃত্যুর আনাগোনা ঘটিল। প্রথমে মনোহরের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তাহার পরে নীলকণ্ঠ যখন কর্তার জন্য বিবাহের পরামর্শ ও পাত্রীর সন্ধান করিতেছে এমন সময় বিবাহের লগ্নের পূর্বেই মনোহরের মৃত্যু হইল। তখন হরিদাসের বয়স আট। মৃত্যুর পূর্বে মনোহর বিশেষ করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র এই বংশধরকে কিরণ এবং নীলকণ্ঠের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন; বনোয়ারিকে কোনো কথাই বলিলেন না।

বাক্স হইতে উইল যখন বাহির হইল তখন দেখা গেল, মনোহর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরিদাসকে দিয়া গিয়াছেন। বনোয়ারি যাবজ্জীবন দুই শত টাকা করিয়া মাসোহারা পাইবেন। নীলকণ্ঠ উইলের এক্‌জিক্যুটর; তাহার উপরে ভার রহিল, সে যতদিন বাঁচে, হালদার-পরিবারের বিষয় এবং সংসারের ব্যবস্থা সেই করিবে।

বনোয়ারি বুঝিলেন, এ পরিবারে কেহ তাঁহাকে ছেলে দিয়াও ভরসা পায় না, বিষয় দিয়াও না। তিনি কিছুই পারেন না, সমস্তই নষ্ট করিয়া দেন, এ সম্বন্ধে এ বাড়িতে কাহারও দুই মত নাই। অতএব, তিনি বরাদ্দমত আহার করিয়া কোণের ঘরে নিদ্রা দিবেন, তাঁহার পক্ষে এইরূপ বিধান।

তিনি কিরণকে বলিলেন, "আমি নীলকণ্ঠের পেন্‌সন খাইয়া বাঁচিব না। এ বাড়ি ছাড়িয়া চলো আমার স ! কলিকাতায়।"

"ওমা৷ সে কি কথা। এ তো তোমারই বাপের বিষয়, আর হরিদাস তো তোমারই আপনার ছেলের তুল্য। ওকে বিষয় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তুমি রাগ কর কেন।"

হায় হায়, তাহার স্বামীর হৃদয় কী কঠিন। এই কচি ছেলের উপরেও ঈর্ষা করিতে তাহার মন ওঠে। তাহার শ্বশুর যে উইলটি লিখিয়াছে কিরণ মনে মনে তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস, বনোয়ারির হাতে যদি বিষয় পড়িত তবে রাজ্যের যত ছোটোলোক, যত যদু মধু, যত কৈবর্ত এবং মুসলমান জোলার দল তাহাকে ঠকাইয়া কিছু আর বাকি রাখিত না এবং হালদার-বংশের এই ভাবী আশা একদিন অকূলে ভাসিত। শ্বশুরের কুলে বাতি জ্বালিবার দীপটি তো ঘরে আসিয়াছে, এখন তাহার তৈলসঞ্চয় যাহাতে নষ্ট না হয় নীলকণ্ঠই তো তাহার উপযুক্ত প্রহরী।

বনোয়ারি দেখিল, নীলকণ্ঠ অন্তঃপুরে আসিয়া ঘরে ঘরে সমস্ত জিনিসপত্রের লিস্ট্ করিতেছে এবং যেখানে যত সিন্দুক-বাক্স আছে তাহাতে তালাচাবি লাগাইতেছে। অবশেষে কিরণের শোবার ঘরে আসিয়া সে বনোয়ারির নিত্যব্যবহার্য সমস্ত দ্রব্য ফর্দভুক্ত করিতে লাগিল। নীলকণ্ঠের অন্তঃপুরে গতিবিধি আছে, সুতরাং কিরণ তাহাকে লজ্জা করে না। কিরণ শ্বশুরের শোকে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু-মুছিবার অবকাশে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বিশেষ করিয়া সমস্ত জিনিস বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

বনোয়ারি সিংহগর্জনে গর্জিয়া উঠিয়া নীলকণ্ঠকে বলিল, "তুমি এখনি আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাও।"

নীলকণ্ঠ নম্র হইয়া কহিল, "বড়োবাবু, আমার তো কোনো দোষ নাই। কর্তার উইল-অনুসারে আমাকে তো সমস্ত বুঝিয়া লইতে হইবে। আসবাবপত্র সমস্তই তো হরিদাসের।"

কিরণ মনে মনে কহিল, 'দেখো একবার, ব্যাপারখানা দেখো। হরিদাস কি আমাদের পর। নিজের ছেলের সামগ্রী ভোগ করিতে আবার লজ্জা কিসের। আর, জিনিসপত্র মানুষের সঙ্গে যাইবে না কি। আজ না হয় কাল ছেলেপুলেরাই তো ভোগ করিবে।'

এ বাড়ির মেঝে বনোয়ারির পায়ের তলায় কাঁটার মতো বিঁধিতে লাগিল, এ বাড়ির দেয়াল তাহার দুই চক্ষুকে যেন দগ্ধ করিল। তাহার বেদনা যে কিসের তাহা বলিবার লোকও এই বৃহৎ পরিবারে কেহ নাই।

এই মুহূর্তেই বাড়িঘর সমস্ত ফেলিয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য বনোয়ারির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু, তাহার রাগের জ্বালা যে থামিতে চায় না। সে চলিয়া যাইবে আর নীলকণ্ঠ আরামে একাধিপত্য করিবে, এ কল্পনা সে সহ্য করিতে পারিল না। এখনি কোনো-একটি গুরুতর অনিষ্ট করিতে না পারিলে তাহার মন শান্ত হইতে পারিতেছে না। সে বলিল, 'নীলকণ্ঠ কেমন বিষয় রক্ষা করিতে পারে আমি তাহা দেখিব।'

বাহিরে তাহার পিতার ঘরে গিয়া দেখিল, সে ঘরে কেহই নাই। সকলেই অন্তঃপুরের তৈজসপত্র ও গহনা প্রভৃতির খবরদারি করিতে গিয়াছে। অত্যন্ত সাবধান লোকেরও সাবধানতার ত্রুটি থাকিয়া যায়। নীলকণ্ঠের হুঁশ ছিল না যে, কর্তার বাক্স খুলিয়া উইল বাহির করিবার পরে বাক্সয় চাবি লাগানো হয় নাই। সেই বাক্সয় তাড়াবাঁধা মূল্যবান সমস্ত দলিল ছিল। সেই দলিলগুলির উপরেই এই হালদার-বংশের সম্পত্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

বনোয়ারি এই দলিলগুলির বিবরণ কিছুই জানে না, কিন্তু এগুলি যে অত্যন্ত কাজের এবং ইহাদের অভাবে মামলা-মকদ্দমায় পদে পদে ঠকিতে হইতে তাহা সে বোঝে। কাগজগুলি লইয়া সে নিজের একটি রুমালে জড়াইয়া তাহাদের বাহিরের বাগানে চাঁপাতলার বাঁধানো চাতালে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নীলকণ্ঠ বনোয়ারির কাছে উপস্থিত হইল। নীলকণ্ঠের দেহের ভঙ্গি অত্যন্ত বিনম্র, কিন্তু তাহার মুখের মধ্যে এমন একটা-কিছু ছিল, অথবা ছিল না, যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তাহার মনে হইল, নম্রতার দ্বারা নীলকণ্ঠ তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

নীলকণ্ঠ বলিল, "কর্তার শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে—"

বনোয়ারি তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "আমি তাহার কী জানি।"

নীলকণ্ঠ কহিল, "সে কী কথা। আপনিই তো শ্রাদ্ধাধিকারী।"

'মস্ত অধিকারটা! শ্রাদ্ধের অধিকারটা! সংসারে কেবল ঐটুকুতে আমার প্রয়োজন আছে— আমি আর কোনো কাজেরই না।' বনোয়ারি গর্জিয়া উঠিল, "যাও যাও। আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না।"

নীলকণ্ঠ গেল কিন্তু তাহার পিছন হইতে বনোয়ারির মনে হইল, সে হাসিতে হাসিতে গেল। বনোয়ারির মনে হইল, বাড়ির সমস্ত চাকরবাকর এই অশ্রদ্ধিত, এই পরিত্যক্তকে লইয়া আপনাদের মধ্যে হাসিতামাসা করিতেছে। যে মানুষ বাড়ির অথচ বাড়ির নহে, তাহার মতো ভাগ্যকর্তৃক পরিহাসিত আর কে আছে। পথের ভিক্ষুকও নহে।

বনোয়ারি সেই দলিলের তাড়া লইয়া বাহির হইল। হালদার-পরিবারের প্রতিবেশী ও প্রতিযোগী জমিদার ছিল প্রতাপপুরের বাঁড়ুজ্যে জমিদারেরা। বনোয়ারি স্থির করিল, 'এই দলিল-দস্তাবেজ তাহাদের হাতে দিব, বিষয়সম্পত্তি সমস্ত ছারখার হইয়া যাক।'

বাহির হইবার সময় হরিদাস উপরের তলা হইতে তাহার সমধুর বালককণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিয়া কহিল, "জ্যাঠামশায়, তুমি বাহিরে যাইতেছ, আমিও তোমার সংগে বাহিরে যাইব।"

বনোয়ারির মনে হইল, 'বালকের অশুভগ্রহ এই কথা তাহাকে দিয়া বলাইয়া লইল। আমি তো পথে বাহির হইয়াছি, উহাকেও আমার সঙ্গে বাহির করিব। যাবে যাবে, সব ছারখার হইবে।'

বাহিরের বাগান পর্যন্ত যাইতেই বনোয়ারি একটা বিষম গোলমাল শুনিতে পাইল। অদূরে হাটের সংলগ্ন একটি বিধবার কুটিরে আগুন লাগিয়াছে। বনোয়ারির চিরাভ্যাসক্রমে এ দৃশ্য দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার দলিলের তাড়া সে চাঁপাতলায় রাখিয়া আগুনের কাছে ছুটিল।

যখন ফিরিয়া আসিল, দেখিল, তাহার সেই কাগজের তাড়া নাই। মুহূর্তের মধ্যে হৃদয়ে শেল বিঁধাইয়া এই কথাটা মনে হইল, 'নীলকণ্ঠের কাছে আবার আমার হার হইল। বিধবার ঘর জ্বালিয়া ছাই হইয়া গেলে তাহাতে ক্ষতি কী ছিল।' তাহার মনে হইল, চতুর নীলকণ্ঠই ওটা পুনর্বার সংগ্রহ করিয়াছে।

একেবারে ঝড়ের মতো সে কাছারিঘরে আসিয়া উপস্থিত। নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বনোয়ারিকে প্রণাম করিল। বনোয়ারির মনে হইল, ঐ বাক্সের মধ্যেই সে কাগজ লুকাইল। কোনো-কিছু না বলিয়া একেবারে সেই বাক্সটা খুলিয়া তাহার মধ্যে কাগজ ঘাঁটিতে লাগিল। তাহার মধ্যে হিসাবের খাতা এবং তাহারই জোগাড়ের সমস্ত নথি। বাক্স উপুড় করিয়া ঝাড়িয়া কিছুই মিলিল না।

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বনোয়ারি কহিল, "তুমি চাঁপাতলায় গিয়াছিলে?"

নীলকণ্ঠ বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, গিয়াছিলাম বৈকি। দেখিলাম, আপনি ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছেন, কী হইল তাহাই জানিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম।"

বনোয়ারি। আমার রুমালে-বাঁধা কাগজগুলা তুমিই লইয়াছ।

নীলকণ্ঠ নিতান্ত ভালোমানুষের মতো কহিল, "আজ্ঞা, না।"

বনোয়ারি। মিথ্যা কথা বলিতেছ। তোমার ভালো হইবে না, এখনি ফিরাইয়া দাও।

বনোয়ারি মিথ্যা তর্জন গর্জন করিল। কী জিনিস তাহার হারাইয়াছে তাহাও সে বলিতে পারিল না এবং সেই চোরাই মাল সম্বন্ধে তাহার কোনো জোর নাই জানিয়া সে মনে মনে অসাবধান মূঢ় আপনাকেই যেন ছিন্ন ছিন্ন করিতে লাগিল।

কাছারিতে এইরূপ পাগলামি করিয়া সে চাঁপাতলায় আবার খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিল। মনে মনে মাতৃদিব্য করিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল, 'যে করিয়া হউক এ কাগজগুলা পুনরায় উদ্ধার করিব তবে আমি ছাড়িব।' কেমন করিয়া উদ্ধার করিবে তাহা চিন্তা করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, কেবল ক্রুদ্ধ বালকের মতো বার বার মাটিতে পদাঘাত করিতে করিতে বলিল, 'উদ্ধার করিবই, করিবই, করিবই।'

শ্রান্তদেহে সে গাছতলায় বসিল। কেহ নাই, তাহার কেহ নাই এবং তাহার কিছুই নাই। এখন হইতে নিঃসম্বলে আপন ভাগ্যের সংগে এবং সংসারের সংগে তাহাকে লড়াই করিতে হইবে। তাহার পক্ষে মানসম্ভ্রম নাই, ভদ্রতা নাই, প্রেম নাই, স্নেহ নাই, কিছুই নাই। আছে কেবল মরিবার এবং মারিবার, অধ্যবসায়।

এইরূপ মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে নিরতিশয় ক্লান্তিতে চাতালের উপর পড়িয়া কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যখন জাগিয়া উঠিল তখন হঠাৎ বুঝিতে পারিল না কোথায় সে আছে। ভালো করিয়া সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিয়া দেখে, তাহার শিয়রের কাছে হরিদাস বসিয়া। বনোয়ারিকে জাগিতে দেখিয়া হরিদাস বলিয়া উঠিল, "জ্যাঠামশায়, তোমার কী হারাইয়াছে বলো দেখি।"

বনোয়ারি স্তব্ধ হইয়া গেল। হরিদাসের এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না।

হরিদাস কহিল, "আমি যদি দিতে পারি আমাকে কী দিবে।"

বনোয়ারির মনে হইল, হয়তো আর-কিছু। সে বলিল, "আমার যাহা আছে সব তোকে দিব।"

এ কথা সে পরিহাস করিয়াই বলিল; সে জানে, তাহার কিছুই নাই।

তখন হরিদাস আপন কাপড়ের ভিতর হইতে বনোয়ারির রুমালে-মোড়া সেই কাগজের তাড়া বাহির করিল। এই রঙিন রুমালটাতে বাঘের ছবি আঁকা ছিল; সেই ছবি তাহার জ্যাঠা তাহাকে অনেকবার দেখাইয়াছে। এই রুমালটার প্রতি হরিদাসের বিশেষ লোভ। সেইজন্যই অগ্নিদাহের গোলমালে ভৃত্যেরা যখন বাহিরে ছুটিয়াছিল সেই অবকাশে বাগানে আসিয়া হরিদাস চাঁপাতলায় দূর হইতে এই রুমালটা দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল।

হরিদাসকে বনোয়ারি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; কিছুক্ষণ পরে তাহার চোখ দিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, অনেকদিন পূর্বে সে তাহার এক নূতন-কেনা কুকুরকে শায়েস্তা করিবার জন্য তাহাকে বার বার চাবুক মারিতে বাধ্য হইয়াছিল। একবার তাহার চাবুক হারাইয়া গিয়াছিল, কোথাও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যখন চাবুকের আশা পরিত্যাগ করিয়া সে বসিয়া আছে এমন সময় দেখিল, সেই কুকুরটা কোথা হইতে চাবুকটা মুখে করিয়া মনিবের সম্মুখে আনিয়া পরমানন্দে লেজ নাড়িতেছে। আর-কোনোদিন কুকুরকে সে চাবুক মারিতে পারে নাই।

বনোয়ারি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, "হরিদাস, তুই কী চাস্‌ আমাকে বল্‌।"

হরিদাস কহিল, "আমি তোমার ঐ রুমালটা চাই, জ্যাঠামশায়।"

বনোয়ারি কহিল, "আয় হরিদাস, তোকে কাঁধে চড়াই।"

হরিদাসকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া বনোয়ারি তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। শয়নঘরে গিয়া দেখিল, কিরণ সারাদিন-রৌদ্রে-দেওয়া কম্বলখানি বারান্দা হইতে তুলিয়া আনিয়া ঘরের মেজের উপর পাতিতেছে। বনোয়ারির কাঁধের উপর হরিদাসকে দেখিয়া সে উদ্‌বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, "নামাইয়া দাও, নামাইয়া দাও। উহাকে তুমি ফেলিয়া দিবে।"

বনোয়ারি কিরণের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "আমাকে আর ভয় করিয়ো না, আমি ফেলিয়া দিব না।"

এই বলিয়া সে কাঁধ হইতে নামাইয়া হরিদাসকে কিরণের কোলের কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। তাহার পরে সেই কাগজগুলি লইয়া কিরণের হাতে দিয়া কহিল, "এগুলি হরিদাসের বিষয়সম্পত্তির দলিল। যত্ন করিয়া রাখিয়ো।"

কিরণ আশ্চর্য হইয়া কহিল, "তুমি কোথা হইতে পাইলে।"

বনোয়ারি কহিল, "আমি চুরি করিয়াছিলাম।"

তাহার পর হরিদাসকে বুকে টানিয়া কহিল, "এই নে বাবা, তোর জ্যাঠামশায়ের যে মূল্যবান সম্পত্তিটির প্রতি তোর লোভ পড়িয়াছে, এই নে।"

বলিয়া রুমালটি তাহার হাতে দিল।

তাহার পর আর-একবার ভালো করিয়া কিরণের দিকে তাকাইয়া দেখিল। দেখিল, সেই তন্বী এখন তো তন্বী নাই, কখন মোটা হইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউয়ের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমরুশতকের কবিতাগুলাও বনোয়ারির অন্য সমস্ত সম্পত্তির সংগে বিসর্জন দেওয়াই ভালো।

সেই রাত্রেই বনোয়ারির আর দেখা নাই। কেবল সে একছত্র চিঠি লিখিয়া গেছে যে, সে চাকরি খুঁজিতে বাহির হইল। বাপের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সে অপেক্ষা করিল না। দেশসুদ্ধ লোক তাই লইয়া তাহাকে ধিক্ ধিক্ করিতে লাগিল।

৭.২ রচনাকাল

'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩২১) 'হালদারগোষ্ঠী' প্রকাশিত হয়। বাংলা ২৫ বৈশাখ ১৩২১ সালে রবীন্দ্র জন্মদিনে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। এই পত্রিকা ছিল বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের দূত। গতানুগতিকতা, নির্জীবতা, প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাই ভাষা পেয়েছিল এই পত্রিকায়।

একই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'সবুজের অভিযান' কবিতায় নবীনপ্রাণের অভিযান বর্ণনা করেছিলেন। 'হালদারগোষ্ঠী' গল্পের নায়ক সেই বিদ্রোহ অভিযানের এক অভিযাত্রী। হালদার-পরিবারের বদ্ধ খাঁচা ভেঙে সে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। এই নবীন, পরিবারের প্রবীণতাকে প্রাণের দাবিতে অস্বীকার করে চলে গেছে।

সব দিক থেকে বিচার করলে বলা চলে 'হালদারগোষ্ঠী' রবীন্দ্রনাথের 'সবুজপত্র'-যুগে রচিত নতুন স্বাদের গল্প। বনোয়ারির পৌরুষ ও বিদ্রোহের যে ছবি এই গল্পে আঁকা হয়েছে তা 'সবুজপত্র'-এর বিদ্রোহী ভাবনাকেই ভাষা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভের কিছুকাল বাদেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। 'হালদারগোষ্ঠী' রচনার এই কালপর্ব স্মরণীয়।

৭.৩ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিনির্ণয়

'হালদারগোষ্ঠী' গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জমিদার-প্রজার সংঘাতের প্রেক্ষাপটে বংশের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ। অন্যদিকে আছে জমিদার-প্রজার সংঘাত।

এই গল্পে হালদারগোষ্ঠীর বিচিত্র কাজকর্ম ফুটে উঠেছে। ঘটনা ঘটেছে একদিকে পারিবারিক বৃত্তে অন্যদিকে সামাজিক বৃত্তে। পারিবারিক সীমার মধ্যে গল্প থেমে থাকেনি। তাই মধু কৈবর্তের লড়াই, জয় এবং জমিদারের কূটকৌশলে দেশত্যাগে বাধ্য হওয়ার ঘটনাগুলো হালদার-পরিবারের বাইরে বৃহত্তর সমাজ-পরিবেশকে চিনিয়ে দেয়।

পারিবারিক বৃত্ত থেকে সামাজিক বৃত্তের মেশামেশি ঘটেছে নিছক গল্পের প্রয়োজনে নয়, সমাজ-ইতিহাসের অমোঘ পরিণতি রূপে। এই অর্থে গল্পটি সামাজিক অভিধা পাবার যোগ্য। আবার তার অন্যদিকও আছে।

নায়ক বনোয়ারির বিদ্রোহ, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা, একাকিত্ব ও আত্মস্বাতন্ত্র্যের পথে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রভৃতি ঘটনাগুলো শুধু আত্মকেন্দ্রিক কোনো মানুষের জীবনের ঘটনা নয়। পরিবর্তিত সমাজ পরিস্থিতিতে পরিবার-নির্ভরতা তথা পূর্বপুরুষের ভূ-সম্পত্তির ওপর নির্ভরশীলতার ভূমি কেমন করে সরে যায় তা এ-গল্পে দেখানো হয়েছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে ও সামাজিক-পরিস্থিতিকে রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে এখানে দেখানো হয়েছে। কালবাহিত জমিদারতন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধতাকে কীভাবে ও কতটা সামাল দেয় অথবা কতটা ব্যর্থ হয় তাও এই গল্পে দেখানো হয়েছে। পারিবারিক জীবনেও তাই সামাজিক জীবনের অভিঘাতেই ছবি এ-গল্পে।

এই সব কারণে 'হালদারগোষ্ঠী' একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক গল্প।

৭.৪ গল্পের গঠন-বিশ্লেষণ

'হালদারগোষ্ঠী' গল্পের মূলে আছে বনোয়ারির সংগ্রাম তার নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে। এই লড়াই আসলে তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পদচিহ্ন। এর আবার কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথমত, বনোয়ারি তাদের গোমস্তা নীলকণ্ঠকে শুধুমাত্র অপছন্দই করত না, তার প্রতি সে ছিল অত্যন্ত বিরূপ। এই বিরূপতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বনোয়ারির আহত অহংবোধ। দ্বিতীয়ত, বনোয়ারি তাদের গোমস্তার প্রতি বিরূপতাবশত সে তাদের প্রজা মধুর পক্ষ নেয় ও লড়াই করে। তৃতীয়ত, কিরণের কাছে তার ক্ষমতা জাহির করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। স্ত্রীর কাছে নিজের ক্ষমতা প্রমাণ করতে চাওয়াটা তার আহত অভিমান ও মর্যাদাবোধের অন্যদিক।

'হালদারগোষ্ঠী' প্রচলিত গল্পে ছকে বাঁধা পড়েনি। অসাধারণ দক্ষতায় রবীন্দ্রনাথ শোষিত প্রজা মধুর জন্য এমন একজন দরদি মানুষের ছবি এঁকেছেন যে নিজেই জমিদারবংশের লোক। ফলে বনোয়ারিকে লড়তে হয়েছে তার বাবা মনোহরলাল আর তাদের গোমস্তা নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে। এই বিরুদ্ধতা শেষ পর্যন্ত পরিবারের সীমানায় আবদ্ধ থাকেনি।

ফলে এই গল্পে প্রজাবিদ্রোহ একটা নতুন মাত্রা পায়। আপাতভাবে নীলকণ্ঠের জেল হয়। মধুর জয় কার্যত বনোয়ারিরই জয়রূপে গণ্য। তবুও জেল থেকে ফিরে নীলকণ্ঠ কৌশলে মধুকে দেশত্যাগে বাধ্য করে। মধু কৈবর্তের জয় ও দেশান্তরী হওয়ার মধ্যেও জমিদারি পীড়নের নতুনতর রূপ ধরা পড়ে।

গল্পের শেষে বনোয়ারি তার সম্পত্তিগত উত্তরাধিকার হারায়। অথচ সে দলিল চুরি করে সম্পত্তি-লোলুপ হতেও পারে না; আবার হরিদাসের প্রতি মমতাবশত বিষয়সম্পত্তি ছারখার করে দিতেও পারে না। শেষ পর্যন্ত সে চাকরি খুঁজতে বার হয়।

৭.৫ সমাজপ্রেক্ষিত ও চরিত্রনির্মাণ

'হালদারগোষ্ঠী' একদিকে পরিবার অন্যদিকে সমাজের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত।

পরিবারের ভিত্তি আবার তিনপুরুষের ধারাবাহিকতায় প্রদর্শিত। বনোয়ারির সঙ্গে তার বাবার বনিবনা হয়নি, এবং প্রথম পুত্রকে সম্পত্তিগত উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে যান পিতা মনোহরলাল। অন্যদিকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও বনোয়ারি তার ভাইপো হরিদাসের প্রতি মমতাশূন্য হয়ে ওঠে না। বস্তুত জমিদারতন্ত্রের একটা সংক্ষিপ্ত অথচ সংহত রূপ এই গল্পের ধরা পড়ে। তাতে জমিদারি ব্যবস্থার বিচিত্র রূপ উন্মোচিত হয়।

সামাজিক ভিত্তিতে জমিদার-প্রজার সম্পর্ক। অত্যাচার, মিথ্যাচার ও শোষণের ভয়াল রূপটিও উপেক্ষিত নয়। বরং ফিউডালশক্তির বিরুদ্ধে প্রজার লড়াই ও পরিণাম সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের নানা দিককে ছুঁয়ে যায়। মূলত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্পর্ধা ও পরিণামকে সামাজিক-পারিবারিক প্রেক্ষাপটে দেখানোর শিল্পসম্মত প্রকাশ গল্পটিকে মহিমামণ্ডিত করেছে।

চরিত্রচিত্রণের বিচারে কেন্দ্রীয় চরিত্র বনোয়ারি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বনোয়ারি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এবং কিছুটা নিন্দিতও বটে। আক্ষরিক অর্থে নেতা না হয়েও নিপীড়িত প্রজার হয়ে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে লড়াই করে। তার আত্মবোধই তাকে একগুঁয়ে ও লড়াকু করেছে।

সমাজ থেকে, পরিবার থেকে সে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হালদার গোষ্ঠীর অন্যতম অংশীদার হয়েও সে সবই হারায়। কখন তার বিচ্ছিন্নতা প্রতীকী রূপ পায় চাকরি সন্ধানের মধ্যে।

বনোয়ারি তার পিতার আস্থা অর্জন করতে পারেনি। স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্কও যে খুব নিবিড় তাও বলা যাবে না। সন্দেহ নেই বনোয়ারি তার স্ত্রী কিরণকে ভালবাসত। বরং কিরণের প্রতি তার যে টান ছিল সেটাকে অন্যান্য মেয়েরা বাড়াবাড়ি বলেই মনে করত। অন্যদিকে কিরণ তার স্বামীর 'নবযৌবনের প্রেমের মধ্যে যে একটা নির্জন তপস্যা' ছিল তা নিয়ে মাথা ঘামাত না। সে তার অনেক ননদ, অনেক ঠাকুরঝিদের নিয়ে ব্যস্ত থাকত। এমনকি বনোয়ারির দ্বিতীয় বিবাহের সম্ভাবনাতেও সে বিক্ষুব্ধ হয়নি।

স্ত্রীর মনে বনোয়ারির এই সম্পর্ক তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকামী মনোভাবের জন্য অনেকটাই দায়ী। সে যে পারিবারিক স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তার একটা কারণ এই কিরণ। কিরণের কাছে সে নিজের ক্ষমতা জাহির করতে চেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ফলে মধু কৈবর্তের পক্ষ নিয়ে লড়াই করাটাও সেই জাহির করার অন্যদিক।

আবার এইভাবে নিজের ক্ষমতা জাহির করতে গিয়েই বনোয়ারি তাদের গোমস্তা নীলকণ্ঠর বিরুদ্ধতা করেছে। নীলকণ্ঠ গোমস্তারূপে জমিদার মনোহরলালের আদেশ ও পরামর্শ মতেই চলেছে। বংশের বড়োছেলের সম্মান পেলেও বনোয়ারি নীলকণ্ঠকে নিজের মর্জিমতো চালাতে পারেনি। সে চেষ্টা করে বিফল হয়ে অবশেষে একলা চল রে'—এই পথ ধরেছে। বনোয়ারি স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে এইভাবেই।

'হালদারগোষ্ঠী' গল্পে চরিত্রচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। হালদারবংশের ভিতরে সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখাতে চেয়ে চরিত্রগুলো প্রয়োজনমাফিক এঁকেছেন। তাই জমিদার মনোহরলাল অনাবশ্যকভাবে চিত্রিত নয়। গোমস্তা নীলকণ্ঠ জমিদার-প্রতিনিধিরূপে জমিদারি কৌশল ও পীড়নের কারিগর হয়ে ওঠে। তারই কৌশলে মধু জমিদারির থেকে চিরবিদায় নেয়।

সমাজ ও পরিবারের পটভূমিতে 'হালদারগোষ্ঠী' রচিত। এই পারিবারিক সম্পর্ক ও সমস্যার মতো সামাজিক সম্বন্ধ বিশেষত জমিদার ও প্রজার অথবা পীড়ক ও পীড়িতের সম্বন্ধ ওই গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তবে ব্যক্তির বিদ্রোহ ও পরিণামকেই কেন্দ্রবিন্দু করে তোলা হয়েছে এই গল্পে।

৭.৬ রসসৃষ্টির সার্থকতা

'হালদারগোষ্ঠী' গল্পটি সফল এক রসসৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'-এর এক অতি উজ্জ্বল মণি এই গল্পটি। বনোয়ারি চরিত্রের নির্মাণে তার পিতা, পত্নী, ভাই, ভাইপো, উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। তেমনই নীলকণ্ঠ গোমস্তার সঙ্গে তার বিবাদ, জমিদার ও প্রজার লড়াই, জমিদারের পরাজয় ও প্রতিশোধ গ্রহণ, এসবই এ-গল্পের নির্মাণের ছায়া ফেলে যায়। বনোয়ারির মন ও মানসিকতার রসসিক্ত অভিব্যক্তিরূপে গল্পটি রসোত্তীর্ণ।

৭.৭ সারাংশ

'সবুজপত্র'-যুগে রচিত গল্পগুলির মধ্যে 'হালদারগোষ্ঠী'-রও স্থান অতি বিশিষ্ট। গল্পটি অবশ্যই নতুন স্বাদের ও ভিন্ন রসভঙ্গিমার।

সামাজিক গল্পরূপে 'হালদারগোষ্ঠী'র স্থান ও গুরুত্ব বোঝা চাই। গল্পটিতে পারিবারিক সংঘাতের সঙ্গে সামাজিক সংঘাতেরও ছবি আছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকামী নায়কের মনোমুকুরে গল্পটি আশ্চর্য রসরূপ লাভ করেছে।

'হালদারগোষ্ঠী' গল্পে গঠন প্রচলিত গল্পের ছকে বাঁধা নয়। প্রজাবিদ্রোহ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দুটোই এ-গল্পে নতুন মাত্রা পেয়েছে।

চরিত্রচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ দক্ষ তা এই গল্পের সর্বত্র প্রমাণিত।

পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত এগল্প এক অপূর্ব রসসৃষ্টি।

৭.৮ অনুশীলনী ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. 'হালদারগোষ্ঠী' গল্পে পরিবারের ভূমিকা কতটুকু?

২. 'হালদারগোষ্ঠী' গল্পের সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।

৩. 'হালদারগোষ্ঠী'কে সামাজিক গল্প বলা যায় কি?

৪. 'হালদারগোষ্ঠী' গল্পের মূল দ্বন্দ্বটা কোথায়?.

৫. 'হালদারগোষ্ঠী' গল্পের জমিদার ও প্রজার যে সম্পর্ক ধরা পড়েছে তার স্বরূপ বোঝান।

৬. 'হালদারগোষ্ঠী' গল্পের গঠন বিশ্লেষণ করুন।

৭. 'হালদারগোষ্ঠী' গল্পের পারিবারিক পটভূমি বর্ণনা করুন।

৮. সামাজিক সম্পর্কের কোন্ ভিত্তির ওপর 'হালদারগোষ্ঠী' নির্মিত?

৯. বনোয়ারি চরিত্রের বিকাশ ও পরিণাম ব্যাখ্যা করুন।

১০. 'হালদারগোষ্ঠী' গল্পের শিল্প-নিপুণতার স্বরূপ বোঝান।

১১. সামাজিক পারিবারিক গল্পরূপে 'হালদারগোষ্ঠী'র রসসার্থকতা বিচার করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : প্রমথনাথ বিশী।

২. রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ : তপোব্রত ঘোষ।

৩. কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ : বুদ্ধদেব বসু।

একক ৮ ❑ নয়নচাঁদের ব্যবসা—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

গঠন

৮.১ মূলগল্প

৮.২ গল্পকার ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯)

৮.৩ গল্পের বৈশিষ্ট্য

৮.৪ গঠনবিশ্লেষণ

৮.৫ সমাজপ্রেক্ষিত ও চরিত্রনির্মাণ

৮.৬ রসসৃষ্টি

৮.৭ সারাংশ

৮.৮ অনুশীলনী

৮.১ মূলগল্প

প্রথম পর্ব : আঠারো

নয়নচাঁদের বাড়ি ফরাশ-ডাঙ্গা। নয়নচাঁদ গুলি খাইয়া থাকেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা, নয়ন, লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বন্ধুগণ আড্ডায় বসিয়া নিত্য-ক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। ক্রিয়াটির গুণ এই যে, মাঝে মাঝে মজার মজার কথা চাই, তাহা না হইলে, প্রাণে ততটা আয়েস হয় না।

তাই, লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,— "নয়ান! আজকাল তোমার কিছু সুখ সাওয়াল দেখিতেছি। চিনির জলে আর সে তোমার ঘোলা নাই এখন সন্দেশটুকু রসগোল্লাটুকু এ না হইলে আর তোমার চা'ট হয় না। মুখে একটু তোমার কান্তি বাহির হইয়াছে, শরীরে লাবণ্য দেখা দিয়াছে, গায়ে তোমার তেল্লা মারিয়াছে। যকের টাকা পাইয়াছ না কি?"

আর সকলেও বলিয়া উঠিলেন,— "সত্য হে! ব্যাপারখানা কি বল দেখি নয়ান। গুলিখোর বলিয়া তোমাকে আর চেনা যায় না। স্বয়ং মা লক্ষ্মীকে বাঁটিয়া যেন তুমি মুখে মাখিয়াছ। নয়ান। কিসে তোমার কপাল ফিরিল, তা বল।"

নয়ন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বিশেষ চিন্তা করিয়া, অবশেষে, বাজখাঁই স্বরে বলিলেন,— "আড্ডাধারী মহাশয়! ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, ইঁহারা হিন্দু কি মুসলমান?"

গগন বলিলেন,— "ধান ভানিতে শিবের গীত। কোথাকার কথা কোথা! মুসলমান কেন আমরা হইতে যাইলাম? কবে তুমি কারে কাছা খুলিয়া নামাজ করিতে দেখিয়াছ যে, ফট করিয়া এমন কথা জিজ্ঞাসা করিলে? নয়ান! আজ তুমি আর অধিক ছিটে টানিও না, তোমার হেড় খারাপ হইয়া গিয়াছে।"

নয়ন উত্তর করিলেন,— "চটো কেন ভাই। কথাটা যখন বলিলাম,তখন অবশ্য তাহার মানে আছে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিলে যে, আমার সংসার সচ্ছল কীসে হইল? যদি সব কথা খুলিয়া বলি, হয় তো তোমরা হাসিয়া উঠিবে। তারচেয়ে

না বলা ভালো। আজকাল আমার হইল ধর্মগত প্রাণ। বন্ধু হইলে কী হয়? তোমাদের মতি-গতি অন্যরূপ। কীসে আমার দু পয়সা হইল, তা আমি তোমাদিগকে বলিতে চাই না। আর তোমরাও জিজ্ঞাসা করিও না।''

নয়নের কথায় সকলের ঘোরতর কুতূহল জন্মিল। কীসে পয়সা হইল, এ কথাটি শুনিবার জন্য সকলের প্রাণ বড়োই উৎসুক হইল। বলিবার জন্য নয়নকে সকলে বার বার অনুরোধ করিলেন। নয়ন কিছুতেই বলেন না। অবশেষে স্বয়ং আড্ডাধারী মহাশয় আসিয়া অনুরোধ করিলে, নয়ন বলিতে লাগিলেন।

নয়ন বলিলেন,— ''আমি বলি। কিন্তু যাহা বলিব, তাহা শুনিয়া যদি হাসো, কী ঠাট্টা বিদ্রুপ করো তাহা হইলে জানিব যে, তোমরা বন্ধু নও, তোমরা মুসলমান, নাস্তিক, শাক্ত, খৃস্টান, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী,— আর কি নাম করিতে বাকি রহিল, আড্ডাধারী মহাশয়?''

আড্ডাধারী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,— ''আর কি বাকি আছে? বাকি আর কিছুই নাই। সে যে ব্রাহ্মণ-দেবতা বলিয়াছিলেন— 'ওরে আঁটকুড়োর বেটারা। যদি সতেরো পর্যন্ত বলিলি, তবে আর আঠারোর বাকি কি রাখিলি?' ছেলেরা কেবল সাতরো পর্যন্ত বলিয়াছিল; তা নয়ান! তুমি সাতরো ছাড়িয়া উনিশ পর্যন্ত উঠিয়াছ। বাকি আর কিছু রাখ নাই। হিন্দু, ব্রহ্মজ্ঞানী, খৃস্টান যা কিছু আছে সব বলিয়াছ।''

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,— ''ব্রাহ্মণ কারে গালি দিয়াছিল, আর এ সতেরো আঠারোর মানে কি?''

আড্ডাধারী মহাশয় উত্তর করিলেন,— ''এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আঠারো বলিলে খেপিতেন। দেখা পাইলেই ছেলেরা তাই তাঁকে আঠারো বলিয়া খেপাইত। গালি তো যা মুখে আসিত তা দিতেন, তা ছাড়া ইট, পাটকেল, যাহা সম্মুখে পাইতেন, তাহা ছাড়িয়া সেই ব্রাহ্মণদেবতা ছেলেদের মারিতেন। একদিন এক পুষ্করিণীতে ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন। কতকগুলি ছেলেও সেই পুকুরে স্নান করিতেছিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আঠারো বলিবার নিমিত্ত ছেলেদের মুখ চুলকাইয়া উঠিল। কিন্তু ভয়! ছেলের গন্ধ পাইয়াই রাগে ব্রাহ্মণের গা গশ্ গশ্ করিতেছিল, জবা ফুলের মতো চক্ষু করিয়া মাঝে মাঝে তিনি কট্‌কট্ করিয়া ছেলেদের পানে চাহিতেছিলেন। একবার আঠারো বলিলে হয়! মনে মনে ভাবটা তাঁর এইরূপ। বড়োই বিপদ! আঠারো না বলিলেও নয়, ও-দিকে ব্রাহ্মণের এইরূপ উগ্রশর্মা মূর্তি। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একজন বালক হঠাৎ বলিয়া উঠিল,— 'ভাই! এ পুকুরপাড়ে কয়টা তাল গাছ আছে? এই কথা বলিতেই অপর সব বালকেরা গুণিতে আরম্ভ করিল—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো, বারো, তেরো, চোদ্দ, পনেরো, ষোলো, সতেরো।— এতক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। ছেলেরা যেই সতেরো বলিল, আর ব্রাহ্মণ একেবারে রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন— 'তবে রে আঁটকুড়োর বেটারা! আর বাকি রইল কী? যদি সতেরো পর্যন্ত বলিলি তবে আর আঠারোর বাকি রাখিলি কি?' এই বলিয়া নানারূপ গালি দিয়া ব্রাহ্মণ ছেলেদের মারিতে দৌড়িলেন। ছেলেরা পুষ্করিণী হইতে উঠিয়া যে যে দিকে পাইল, ছুটিয়া পলাইল। তাই বলিতেছি, নয়ান! তুমি আমাদিগকে খৃস্টান বলিলে, শাক্ত বলিলে, বৈষ্ণব বলিলে, মায় ব্রহ্মজ্ঞানী পর্যন্ত বলিলে। বাকি আর কী রহিল? আঠারো ছাড়িয়া উনিশ, বিশ পর্যন্ত হইয়া গেল।''

নয়ন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। নয়নের মন কিছু নরম হইল। নয়ন বলিলেন,— না, না, তোমাদের আমি ও সব কথা বলি নাই। শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, খৃষ্টান কী তোমাদের আমি বলিতে পারি? আমি বলিয়াছি, যে, যে আমার কথা বিশ্বাস না করিবে, সে তাই।''

দ্বিতীয় পর্ব : কপাৎ

নয়ন বলিলেন,— ''মনের মিল থাকে, তবে বলি ইয়ার। তোমরা হিন্দু হও, আমিও তাই। মুসলমান হও, আমিও তাই। তোমরা যে ঠাকুরগুলি মানিবে, আমিও সেগুলিকে মানিব, আমিও যে ঠাকুরগুলিকে মানিব, তোমাদেরও সেগুলিকে মানিতে হইবে। তা না হইলে মনের মিল রহিল কোথায়?''

সকলে বলিলেন,— "ঠিক! ঠিক! নয়ান বলিতেছে ভালো। আমাদেরও ঐমত।"

নয়ন বলিলেন,— "আমি হক্ কথা বলিব। আজ আমার অবস্থা একটু ফিরিয়াছে বলিয়া, পুরাতন বন্ধুদের আমি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিব না; তবে দেশের হাওয়া বুঝিয়া আমি তোমাদিগকে কাজ করিতে বলি। আজকাল দেশের যেরূপ হাওয়া পড়িয়াছে, তাতে সেকালের মতো আর হাবড় হাটি ব্রহ্মজ্ঞান তেত্রিশ কোটী দেবতার পায় তেল দিলে চলিবে না। উহারই মধ্যে দুই চারিটি মাতালো মাতালো দেবতা বাছিয়া লইতে হইবে। পূজা দিতে হয়, সেই দুই চারিটি দেবতার দাও। আর সব দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া থাকেন, থাকুন! ঘরের ভাত বেশি করিয়া খাবেন।"

সকলেই বলিলেন,— "ঠিক! ঠিক! ঠিককথা। হাবড় তাবড় তেত্রিশ কোটীর চাল-কলা জোগায় কে হে, বাপু! পূজা না পাইয়া মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাক, থাক! বেচারি গুলিখোরদের যে পুঁটি মাছের প্রাণ, সে-টি তো বুঝিতে হবে? উহার মধ্যে দু-একটি বাছিয়া লও, লইয়া বাকি সব না-মঞ্জুর করিয়া দাও।"

নয়ন বলিলেন,—"আমারও ঠিক ঐ মত। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি দুইটি দেবতা বাহির করিয়াছি, এক হলেন কাটিগঙ্গা, আর এক হইলেন ফণী মনসা। বাকি সব না-মঞ্জুর।"

সকলেই একবাক্য হইয়া সায় দিলেন। সকলেই স্বীকার করিলেন যে, এই দুইটি দেবতাই অতি চমৎকার দেবতা। আর সমুদয় দেবতাকে না-মঞ্জুর করিয়া, মাটিতে মাথা ঠুকিয়া, এই দুইটি দেবতাকে সকলে প্রণাম করিতে লাগিলেন। মাটিতে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে সকলে বলিলেন,— "হে মা কাটিগঙ্গা! হে বাবা ফণীমনসা। তোমাদের পায়ে গড়। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ।"

নয়ন পুনরায় বলিলেন— "কিন্তু এখনও আসল দেবতাটির কথা বলা হয় নাই। শেষে বলিব, তাই মনে করিয়া সেটি বাকি রাখিয়াছি। সে দেবতাটি, মা শীতলা। তাঁরই বরে আমার সুখ, সম্পত্তি, আর আমার ঐশ্বর্য। সাবধান! কচাঁ খাওয়া দেবতা!"

সকলেই বলিলেন— "এ বাপু ঘেঁটু নয়, পেঁচো নয়, তোমার মানিকপীর নয়। এ মা শীতলা। ইংরেজি খবরের কাগজে পর্যন্ত মার নাম বাহির হইয়াছে। মার বরে আমার সব।"

শীতলার নাম শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত। ভয়ে সকলের প্রাণ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। আর একটু আগে তেত্রিশ কোটী দেবতা না-মঞ্জুর হইয়া গিয়াছিল। আড়াল হইতে পাছে শীতলা সে কথাটি শুনিয়া থাকেন, এই ভয়ে সকলের মনে ঘোরতর আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে গগন একটু সাহসী পুরুষ ছিলেন। অতি সাহসে ভর করিয়া গগন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিয়া হইল, ভাই? তুমি আধ পয়সার চিনির জলে ঘোলা ফেরিয়া, সেই ঘোলাটি চুষিয়া চা'ট করিতে। তা ঘুচিয়া আজ তোমার সন্দেশ রসগোল্লা কী করিয়া হইল, ভাই?"

নয়ন বলিলেন,— "হাঁ! এখন পথে এস। পূজা মানো তো সব কথা খুলিয়া বলি, তা না হইলে নয়ান এই চুপ!"

এই কথা বলিয়া নয়ন "কপাৎ" করিয়া মুখ বুজিলেন।

যার যেমন ক্ষমতা সকলে শীতলার পূজা মানিলেন। নয়ন তখন পুনরায় মুখের চাবি খুলিয়া আপনার কথা আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় পর্ব : এই কিল তো এই কিল।

নয়ন বলিতেছেন,— "এবার আমার বড়োই দুর্বৎসর পড়িয়াছিল। খাওয়া কোনও দিন হয়, কোনও দিন হয় না। ভাগ্যক্রমে এমন সময় কলকাতায় বসন্তের হিড়িকটি পড়িল। পরে যিনি যা করুন, কিন্তু ফিকিরটি আমিই প্রথমে বাহিরকরি। জলা হইতে দিব্য একটু এঁটেল মাটি লইয়া আসিলাম। তাই দিয়া চমৎকার একটি শীতলা গড়িলাম। শীতলা গড়া কিছুমাত্র

কঠিন নয়। গোল করিয়া মাটির একটি চাবড়া করিলেই হইল। তাহার উপর উত্তমরূপে সিন্দুর মাখাইলাম। টানাটানা লম্বা লম্বা দুইটি চক্ষু করিলাম। পুরাতন রাঙতা দিয়া শীতলাটি ছোটো বড়ো বসন্তে ছাইয়া ফেলিলাম। শীতলাটি হাতে করিয়া গিন্নীকে সঙ্গে লইয়া, কলকাতায় চলিলাম।

সেখানে উপস্থিত হইয়া এক স্থানে শুনিলাম যে, একজন শীতলার পাণ্ডা ছিল। বসন্ত রোগে তাহার তিনটি ছেলে মরিয়া গিয়াছে। রাগ করিয়া লাঠি দিয়া সে তাহার শীতলা ভাঙিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। সন্ধান করিয়া সে যে খোলার ঘরে থাকিত, আমি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার সেই ঘরটি ভাড়া করিলাম। বাড়িওয়ালী ও আশে পাশের লোককে বলিলাম যে মা আমাকে স্বপ্ন দিয়াছেন। স্বপ্নে বলিয়াছিলেন যে, ওই যে পাণ্ডা ছিল, সে ভালো করিয়া মা'র পূজা করিত না। লোকে পূজা দিলে আগে থাকিতে সে নৈবিদ্যির মাথার মণ্ডাটি খাইয়া ফেলিত। মা তাই তার উপর কুপিত হইয়া তাহাকে নির্বংশ করিয়াছেন। সেই দুরাচারের পরিবর্তে মা আমাকে সেবাদাস নিযুক্ত করিয়াছেন। তখন চারিদিকে খুব ডামাডোল, খুব মহামারী, লোক মরিয়া উড়কুড় উঠিতেছে। ভয়ে লোক কাঁটা হইয়া রহিয়াছে। আমাকে পাইয়া সকলের প্রাণটা আশ্বস্ত হইল। সকলেই বলিল যে,— 'মা জাগ্রত বটে! একজন পাণ্ডা যাইতে না যাইতে, কোথা হইতে শীতলা হাতে করিয়া আর একটি পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইল। আর আমাদের কোনও ভয় নাই।'

পাড়ায় আমার বিলক্ষণ পসার প্রতিপত্তি হইল। পাড়ার পূজাতেই অনায়াসে আমার সব খরচ নির্বাহ হইতে পারিত। কিন্তু অভিপ্রায় আমার তো আর তা নয়! আমার অভিপ্রায় যে, মরশুম থাকিতে থাকিতে দু পয়সা রোজগার করিয়া পুনরায় ইয়ার বক্সির কাছে ফিরিয়া আসি। কলকাতার আড্ডাগুলি সাহেবরা সব উঠাইয়া দিয়াছেন। সেখানে আমার মন টিকে না। তাই, শীতলাটি হাতে করিয়া প্রতিদিন ভিক্ষায়ও বাহির হইতাম। তাই কী ছাই শীতলার গান জানি! কিন্তু চিরকাল হইতে আমি দশ-কর্মা; যে কাজে দাও, সেই কাজে আছি, সব কাজে হুনহর। নিজেই একটি শীতলার ছড়া বাঁধিলাম, তাহার কতকটা বলি, শুন—

"শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই।
ছেলে বুড়ো অ্যাণ্ডা বাচ্ছা টপ্ টপ্ খাই।।
চৌষট্টি হাজার এই বসন্তের দল।
গৃহস্থের ঘরে গিয়া দেয় রসাতল।।
বড়ো বসন্ত ছোটো বসন্ত বসন্তের নাতি।
কারো ঘরে নাহি রাখে বংশে দিতে বাতি।।
ডেকে বলে যত ঐ কাল বসন্তের পাল।
পাঁটা ছাড়া কোরে ছাড়াই লোকের গায়ের ছাল।।
ফাটা বসন্ত বলে আমরা কেও-কেটা নই।
ফেটে মরে মানুষ যেন তপ্ত খোলার খই।।
নেচে নেচে বলে ওই ধসা বসন্ত যত।
মাংস পচা গন্ধে প্রাণ করি ওষ্ঠাগত।।
পাতাল-মুখো বসন্ত বলে নীচে কোরে মুখ।
হাড় মাস খেয়ে আমরা প্রাণে পাই সুখ।।

খুদে বসন্ত বলে তোমরা মিছে কর গোল।
আমার চোটে লোকের গা ফুলে হয় ঢোল।।
হাড়ভাঙ্গা বসন্ত বলে যারে যেথা পাই।
ছেলে বুড়ো সব আমরা কাঁচা ধোরে খাই।।
শীতলা বলেন আমি চা'ল পয়সা চাই।
না দিলে ছেলের মা আর রক্ষা নাই।।
চা'ল পয়সা আনো হবে পুজোর বাজার।
বসন্ত ধরিবে নয় তো চৌষট্টি হাজার।।"

বলিব কি ভাই আর রোজগারের কথা। ধামা ধামা চা'ল আর গণ্ডা গণ্ডা পয়সা। ধামায় যেন পয়সা বৃষ্টি হইতে লাগিল। সে সময় যদি কেহ বলিত যে,— 'নয়ান। হাইকোর্টের জজগিরি খালি হইয়াছে, তুমি সেই জজগিরিটি কর।' আমি তাতেও রাজি হইতাম না। প্রথম দিনের রোজগারটি আনিয়া গিন্নিকে বলিলাম— 'গিন্নি। একবার বাহির হইয়া দেখ দেখি বাপ-ধোন। ব্যাপারখানা কী? বড়ো যে গুলিখোর বলিয়া মুখঝামটা দাও। গুলিখোর না হইলে এরূপ ফিকির বাহির করে কে, বাপ-ধোন? এরূপ বুদ্ধি জোগায় কার?'

কিন্তু, দেখ লম্বোদর ভায়া। তোমাদের আমি একটি জ্ঞানের কথা বলি। সাদা-চোখোদের যে কখনও বিশ্বাস করিবে না, সেকথা বলা বাহুল্য। সাদা-চোখোদের মনটি সদাই জিলেপির পাক। সত্যকথা কারে বলে, তারা একেবারে জানে না। প্রমাণ চাও? আচ্ছা প্রমাণও করিয়া দিই। এই দেখ, ছিঁচকে-চোর বলিয়া তাহারা আমাদের মিথ্যা অপবাদ রটায়। আচ্ছা তাহারা তামা, তুলসী, গঙ্গাজল হাতে করিয়া বলুক,—কবে কার ছিঁচকে কোন্ গুলিখোর চুরি করিয়াছে? আড্ডাধারী মহাশয়। আপনিও বলুন,—ছিটের জন্য কবে কোন্ গুলিখোর আপনার নিকট ছিঁচকে আনিয়াছে? ঘটি চোর বল, বাটি চোর বল, ঘাড় হেঁট করিয়া মানিয়া লই। তোমাদের দু'কড়ার ছিঁচকে কে কবে চুরি করে বাপু? তাই বলি, হে সাদা-চোখোগণ। ভুলিয়াও কি তোমরা কখনও সত্যকথা বলিতে শিখিবে না?"

লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ। সাদা-চোখোদের বিশ্বাস নাই। সাদা-চোখোদের ছাঁওয়া মাড়াইলে নাইতে হয়।"

নয়ন বলিলেন,—'আর বিশ্বাস করিও না এই পেশাদার মাতালদের। মন তাদের সাদা বটে, কিন্তু কখন্ কী ভাবে থাকে, তার ঠিক নাই। সাত ঘাটের জল এক করিয়া তুমি চারিটি পয়সা জোগাড় করিলে, আড্ডায় আসিয়া সেই চারি পয়সার ছিটে টানিলে, নেশাটি করিয়া তুমি আড্ডা হইতে বাহির হইলে, আর হয় তো কোথা হইতে একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল। তোমার নেশাটি চটিয়া গেল। শীতকালে, মেঘ করিয়াছে, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, ফুর ফুর করিয়া বাতাস হইতেছে, সহজেই নেশাটি বজায় রাখা ভার, তার উপর কোথা হইতে হয়তো একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ে হড়-হড় বমি করিয়া দিল। তোমার নেশাটির দফা একবারে রফা হইয়া গেল। পেশাদার মাতালেরা এইরূপ লোকের মর্মান্তিক করে। পা'ল-পার্বণে পেট ভরিয়া মদটুকু খাওয়া গেল, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকা গেল, মৌজ হইল, এ কথা বুঝি। তা নয়। সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, দিন নাই, ক্ষণ নাই, অষ্টপ্রহর তুমি মদ খাইয়া তর্ হইয়া থাকিবে। মেজাজটি গরম করিয়া রাখিবে। ঠাকুর দেবতা লইয়া তোমার বাড়িতে লোকে গান করিতে আসিবে, আর লাঠি লইয়া তুমি তাদের মারিতে দৌড়িবে। এ কী বাপু! এরে কি ভালো কাজ বলে? না এরে হিন্দুধর্ম বলে? থুঃ। ছি!"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এইরূপ কোনও একটা মাতালের পাল্লায় পড়িয়াছিলেন না কি?"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"হাঁ ভাই! তবে ভাগ্যে আমার শীতলাটি জাগ্রত, হেলা ফেলা গুড়ুক তামাকের শীতলা, নয়, তাই সে যাত্রা আমি রক্ষা পাইয়াছিলাম।"

সকলেই অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপারখানা কি বল দেখি?"

নয়ন বলিলেন,—'ভাই! এক দিন প্রাতঃকাল শীতলাটি হাতে করিয়া এক মাতালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। জানি কী ছাই যে, সে মাতালের বাড়ি? তাহা হইলে কী আর যাইতাম? তার বাড়িতে গিয়া, মন্দিরেটি বাজাইয়া, সবে মাত্র আরম্ভ করিয়াছি,—"শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই" আর মিন্‌সে করিল কী জানো ভাই! এক না কম্বল-মুড়ি দিয়া, 'আঁ আঁ' শব্দ করিতে করিতে, ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে দৌড়িয়া করিলাম। তা ভাই! পলাইতে না পলাইতে বেটা যেন ঠিক কেঁদো বাঘের মতো আসিয়া আমার পিঠের উপর পড়িল। তারপর দুঃখের কথা বলিব কি ভাই, এই কিল! এই কিল, তো এই কিল! আর সে কিল তো নয়। এক একটি কিলে মনে হইল যেন পিঠের সব জায়েন খুলিয়া গেল। ভাবিলাম,—হায় হায় হায়! কেন মরিতে শীতলার ব্যবসা করিতে গিয়াছিলাম। শীতলার ব্যবসা করিতে গিয়া, এমন যে সখের প্রাণটি, সে প্রাণটি আজ হারাইলাম।"

চতুর্থ পর্ব : বসিয়া আছে দুইটি ভূত

যাহা হউক, মনের সাধে কিল মারিয়া মিনসে আমার শীতলাটি কাড়িয়া লইল। আমি পলাইলাম। প্রাণটা যে রক্ষা পাইল, তাই ঢের। পথে যাইতে যাইতে, মনে মনে শীতলাকে বলিলাম যে,—"মা! আর তোমার গান করিতে আমি চাই না, তোমার চা'ল পয়সা আর চাই না। পিঠের হাড়গুলি যে চুরমার হইয়া গিয়াছে এখন তাই তুমি রক্ষা কর, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।"

গগন বলিলেন,—"ঈশ! তাই তো। এ যে ঠিক সেই ঘোষের কথা।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুবলের কি হইয়াছিল?"

গগন বলিলেন,—"দুধ বেচিয়া সুবলের পিসি কিছু টাকা করিয়াছিলেন। পিসি মরিয়া যাইলে সুবল সেই টাকাগুলি পাইলেন। টাকা পাইয়া সুবল মনে করিলেন যে, দুর্গোৎসবটি করি। ঠাকুর গড়া হইল, পূজার দিন আসিল। সিঙ্গি, চোরা, ময়ূর, গণেশের শুঁড়, এই সব দেখিয়া সুবলের মনে বড়ো আনন্দ হইল, হাড়ে হাড়ে তাঁর ভক্তি বিঁধিয়া গেল। পূজার কয়দিন স্বয়ং নিজে ক্রমাগত শাঁক বাজাইলেন। প্রাণপণ চিক্কুড়ে শাঁকে ফুঁ দিলেন। কোঁৎ পাড়িয়া শাঁক বাজাইতে বাজাইতে এখন গোগগোলটি বাহির হইয়া পড়িল। তার পর সেই গোগগোলের জ্বালায় অস্থির! গোগগোলের জ্বালায় অস্থির হইয়া, বিসর্জনের সময় ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গলায় কাপড় দিয়া হাত জোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,—

ধন চাই না, মা! মান চাই না মা! চাই না পুত্তর বর।

এখন শঙ্খ বাজাইতে গিয়া এই বেরিয়েছে গোগগোল তাই রক্ষা কর। নয়ানের ঠিক তাই হইয়াছিল। চা'ল চাই না মা। পয়সা চাই না মা। এখন এই হাড়গুলি যোড় লাগাইয়া দাও। কেমন হে নয়ান! ঠিক নয়?"

নয়ন বলিলেন,—"হাঁ, ভাই ঠিক তাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা বলিব কী ভাই। পাঁচ সাত দিন পরে আমার নামে এক চিঠি। যে শীতলা কাড়িয়া লইয়াছিল, তার চিঠি। ডাকে সেই খোলার ঘরে গিয়া চিঠি উপস্থিত। মাতালটা আমার ঠিকানা জানিল কি করিয়া? চিঠিতে লেখা ছিল যে, শীঘ্র আসিয়া তোমার শীতলা লইয়া যাইবে। তোমার এ জাগ্রত শীতলা। এ শীতলা লইয়া আমি বড়ো বিপদে পড়িয়াছি। তোমার কোনো ভয় নাই। শীঘ্র তোমার শীতলা লইয়া যাইবে।

যাই কি না যাই? এই কথা লইয়া মনে মনে অনেক তোলা-পাড়া করিতে লাগিলাম। গিন্নি রাগিয়া বলিলেন,—"যাও-ই-না ছাই! তোমায় সে কী খাইয়া ফেলিবে?"

আমি বলিলাম,—'তুমি তো বলিলে, যাও-ই-না ছাই! কিন্তু সে কিলের স্বাদ তো আর তুমি জানো না? মনে করিতে গেলে এখনও আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। চুনে-হলুদ বাটিয়া হাতে তোমার কড়া পড়িয়া গেল, তবু বল, যাই-ই-না ছাই। এঁটেল মাটি দিয়া আর একটি শীতলা গড়িতে পারিব, প্রাণটি তো আর এঁটেল মাটি দিয়া গড়িতে পারিব না।'

যাহা হউক, অবশেষে যাওয়াই স্থির করিলাম। সন্ধ্যার পর, ভয়ে ভয়ে, কাঁপিতে কাঁপিতে, প্রাণটি হাতে করিয়া সেই মাতালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ন জনঃ ন মানবঃ। কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। বাহিরে ঘরের দ্বারের নিকটে গিয়া একটু উঁকি মারিয়া দেখিলাম, বাপ্ রে বলিতে এখনও সর্ব শরীর শিহরিয়া উঠে। বাহিরের ঘরের ভিতরে দেখি, না, বসিয়া আছে দুইটি ভূত।"

লম্বোদর বলিলেন,—"মাইরি?"

নয়ন বলিলেন,—"মাইরি ভাই! দেখিলাম যে, ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন দুইটি ভূত।"

সর্বশরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে লাগিল। পা যেন মাটিতে পুতিয়া গেল। টাকরা পর্যন্ত ধুলি মাড়িয়া গেল। পলাইতে পা উঠে না, চেঁচাইতে রা সরে না! অজ্ঞান হতভম্ব হইয়া আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দুই জনের মধ্যে যিনি কর্তা-ভূত, আমাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুখ দিয়া তাঁর আগুনের হল্‌কা বাহির হইতে লাগিল। তিনি আমাকে হাতছানি-দিয়া ভিতরে ডাকিলেন। আমাতে কি আর আমি ছিলাম যে, ভাবিব চিন্তিব? সুড় সুড় করিয়া ভিতরে যাইলাম। আমাকে বসিতে বলিলেন। আস্তে আস্তে আমি ঘরের এক পাশে বসিলাম।

কর্তা ভূত বলিলেন,—'আমাকে চিনিতে পারিলে না? আমি আর কেহ নই, আমি সেই মিত্তির জা, যে তোমার শীতলা কাড়িয়া লইয়াছিল। তোমার এ শীতলাটি জাগ্রত বটে। কেবল ঐ শীতলাটির জন্য ভূত হইয়া আমাকে আটকে থাকিতে হইয়াছে, তা না হইলে বাস আমার বৈকুণ্ঠে। এখন তোমার শীতলাটি ফিরিয়া লও, যে আমি বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাই।'

দ্বিতীয় ভূত বলিলেন,—'আহা! ইহারে তুমি অনেক কিল মারিয়াছ, তাড়াতাড়ি বিদায় করিও না। ইহার শীতলা কেন যে জাগ্রত, সে কথাগুলি ইহাকে খুলিয়া বল। লোকের কাছে গিয়া এ গল্প করিবে। তাহা হইলে লোকে আরও ভক্তিভাবে ইহার শীতলাকে পূজা দিবে। ইহার দুপয়সা রোজগার হইবে। পেটে খাইলে পিঠে সয়। পিঠে বিলক্ষণ হইয়াছে; এখন পেটে খাইবার সুবিধা করিয়া দাও।'

কর্তা-ভূত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— 'কেমন হে! সব কথা শুনিতে চাও? কীসে বৈকুণ্ঠটি আমার কানের কাছ দিয়া গিয়াছে, সে কথা শুনিতে চাও?'

ভূতেদের কথা শুনিয়া আমার মনে অনেকটা সাহস হইয়াছিল, ধড়ে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল; আমি বলিলাম,—'আজ্ঞে হাঁ, শুনিতে চাই বই কী? তবে মহাশয়ের কিলের কথা মনে হইলে, আর জ্ঞান থাকে না।'

কর্তা-ভূত হাসিয়া বলিলেন,—'না, না, আর কিল মারিব না। তোমার ঘাড়ও মটকাইয়া দিব না। কেন তোমার শীতলাকে জাগ্রত বলিতেছি, এখন সে সকল কথা শুন।'

আড্ডাধারী মহাশয় ও লম্বোদর গগন প্রভৃতি বলিয়া উঠিলেন,—"নয়ান! তোমার সাহস তো কম নয়। স্বচ্ছন্দে বসিয়া ভূতেদের সঙ্গে তুমি গল্পগাছা করিলে? বুকের পাটা তো কম নয়?"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"বেঁধে মারে সয় ভালো। করি কী? ভূতের খর্পরে গিয়া পড়িয়াছি, পলাইবার তো যো ছিল না। কাজেই কাদায় গুণ ফেলিয়া পড়িয়া থাকিতে হইল। তা না হইলে সদাই হইতেছিল। কী জানি? ভূতের মরজি! যদি বলিয়া বসে যে, তোমার পিঠ দেখিয়া আমাদের হাত সুড়-সুড় করিতেছে; এস দুইটি কিল মারি। তোমার ঘাড় দেখিয়া আমাদের

হাত নিশ-পিশ করিতেছে, এস ভাঙিয়া দিই! তাহা হইলে কী করিতাম! যাহা হউক, সেরূপ কোনো বিপদ ঘটে নাই। ভূতগুলি দেখিলাম, ভালো-মানুষ ভূত। সেই কর্তা-ভূতের এখন আশ্চর্য কাহিনি শুন।''

পঞ্চম পর্ব : কর্তা-ভূত বলিতেছেন

কর্তা-ভূত বলিতেছেন,—তামার শীতলাটি কাড়িয়া মনে মনে আমার বড়োই আনন্দ হইল। কারণ এইরূপ কাজে যেরূপ আমার আনন্দ হইত, এমন আর কোনো নয়। কিন্তু তোমার শীতলাটি জাগ্রত শীতলা, মরা শীতলা নয়। ভালো এঁটেল মাটি, ভালো সিন্দুর, ভালো রাঙতা দিয়া গড়া। বেলে মাটি নয়, মেটে সিন্দুর নয়, জাল রাঙতা নয়। তাই দুই দিন পরেই আমার বসন্ত হইল। তোমার সেই চৌষট্টি হাজার বসন্তে আমায় ছাইয়া ধরিল। চুলের ডগা পায়ের কোড়ে আঙুলের আগা পর্যন্ত, তিল রাখিবার স্থান ছিল না। বৈদ্য আসিয়া মহাদেব-চূর্ণ ও গৌরচন্দ্রিকা ঘৃতের ব্যবস্থা করিলেন। মহাদেব-চূর্ণ খাইতে দিলেন, আর গৌরচন্দ্রিকা ঘৃত গায়ে মাখিতে বলিলেন। ঔষধের ব্যবস্থা দেখিয়াই বুঝিলাম যে, এবার গতিক বড়ো ভালো নয়। তিন দিন পরে রাত্রিকালে যমদূতেরা আমাকে লইতে আসিল। চারিটি যমদূত আসিয়াছিল। সব বিকটমূর্তি, দেখিলেই প্রাণ শুকাইয়া যায়।

যমদূতেরা আসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া টিকিটি খুঁজিতে লাগিল, ইচ্ছা যে, টিকিটি ধরিয়া আমাকে যমপুরে লইয়া যায়! কিন্তু আগে থাকিতে আমি একটি বুদ্ধির কাজ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই দিন প্রাতঃকালে, রোগের বে-গতিক দেখিয়া মনে মনে করিলাম যে, পৃথিবীতে আসিয়া আমি কখনও কখনও একটি পুণ্যকর্ম করি নাই। চিরকাল পাপ করিয়াছি। নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, চুরি, প্রভৃতি যাহা কিছু পাপ কর্ম সকলই করিয়াছি। ভালো কাজ একটিও কখনও করি নাই। এখন তো দেখিতেছি, মৃত্যু উপস্থিত। যমকে গিয়া জবাব দিব কী? তাই মনে করিলাম যে, এই অন্তিমকালে একটি পুণ্য কাজ করি। আমি চন্দ্রায়ণটি করিলাম। গোয়ালে আমার একটি এঁড়ে বাছুর ছিল। আমি মিত্তির জা। আমার গোয়ালের এঁড়ে বাছুর কেমন তা বুঝিয়া লও। এক ফোঁটা দুধ থাকিতে গাইকে আমি কখনও ছাড়ি নাই। মা'র দুধ কারে বলে বাছুরটি তা কখনও চক্ষে দেখে নাই। অন্য খাওয়া দাওয়াও তদ্রূপ। সুতরাং না খাইয়া খাইয়া বাছুরটি অস্থিচর্ম-সার হইয়াছিল। মর-মর হইয়াছিল। সেই এঁড়ে বাছুরটি একজন ব্রাহ্মণকে দান করিলাম। দড়ি ধরিয়া বাছুরটিকে ব্রাহ্মণ লইয়া চলিলেন। আমার বাড়ির বাহির হইয়াই রাস্তার উপর বাছুর শুইয়া পড়িল, সেইখানেই মরিয়া গেল।

চন্দ্রায়ণ করিতে মাথাটি নেড়া হইয়াছিলাম। মাথাটি ঠিক্ বোম্বাই ওলের মতো হইয়াছিল। যমদূতেরা টিকি ধরিয়া আমাকে যমের বাড়ি লইয়া যাইবেন, তার যো ছিল না। অন্ধকারে যমদূতেরা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দেখিল যে, টিকি নাই। যমদূতেরা ফাঁপরে পড়িল। কী ধরিয়া আমাকে লইয়া যায়? অবশেষে চিন্তা করিয়া তাহারা আমার হাত ধরিল। গৌরচন্দ্রিকা-ঘৃতে আর বসন্তের রসে আমার গা হড়-হড় হইয়াছিল। অনায়াসেই আমি হাতটি ছাড়াইয়া লইলাম। পা ধরিল, হড়াৎ করিয়া পা-টিও ছাড়াইয়া লইলাম। যেখানে ধরে আর আমি পিছলে সরিয়া বসি। কখনও তক্তপোষের উপর, কখনও তক্তপোষের নীচে, কখনও ঘরের মাঝখানে, কখনও পাশে, এ কোণে, সে কোণে, যমদূতদিগের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে আমি এইরূপ পেছলা-পিছলি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তারা হইল চারি জন, আমি হইলাম একা। কতক্ষণ আর পেছলা-পিছলি করিব? ভোর মাথায় তাহারা হাতে ছাই ও মাটি মাখিয়া আসিল। সুতরাং আর আমি পিছলে যাইতে পারিলাম না। আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

উত্তমরূপে বাঁধিয়া, যমদূতেরা আমাকে কাঁটাবন দিয়া হিঁচড়ে দিয়া হিচড়ে লইয়া চলিল। আমি পাপী কি না? কাঁটা ফুটিয়া, ছাড়িয়া গিয়া, শরীর হইতে আমার দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। অবশ্য জীয়ন্ত অবস্থায় যে শরীরে আমি মিত্তিরজা ছিলাম, সে শরীর নয়। যে শরীর যমালয়ে যায়, সেই শরীর; ঠিক বুড়ো আঙুলের মতো। সকাল হইল। প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিবার নিমিত্ত যমদূতেরা একটি পুকুরের সানবাঁধা ঘাটে গিয়া বসিল। একটি যমদূত আমার নিকট পাহারা রহিল, বাকি তিন জন মাঠে ঘাটে যাইল।

আমার নিকট যে যমদূতটি ছিল, সে আমাকে বলিল,— "খুব মজার লোক তো তুমি। এত লোককে আমরা লইয়া যাই, কিন্তু সমস্ত রাত্রি পেছলা-পিছলি কাহারও সঙ্গে কখনও করিতে হয় নাই। আচ্ছা, ভালো, তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার মাথায় তো টিকি দেখিলাম না। অনেককের মাথায় আজকাল টিকি দেখিতে পাই না। টিকি না পাইলে আমাদের বড়োই অসুবিধা হয়। তা আমাদের অসুবিধা হয় হউক, তাহাতে বড়ো ক্ষতি নাই। কিন্তু কথাটা জিজ্ঞাসা করি এই যে, এই যাদের মাথায় টিকি না থাকে, তাদের সঙ্গে লোকের ঝগড়া হইলে, লোকেরা কি ধরিয়া তাদের দুই গালে দুই থাপ্পর মারে?"

আমি উত্তর করিলাম,— "চড় খাইতে সুবিধা হইবে বলিয়া কি লোকে মাথায় টিকি রাখে?"

যমদূত জিজ্ঞাসা করিলেন,— "তবে কীসের জন্য? আমরা ভালো করিয়া ধরিতে পারিব, সেই জন্যে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"তাও নয়। ঐ যে তারের খবর আছে, সেই টুক টুক করিয়া শব্দ হয়? টিকি না থাকিলে, মাথা দিয়া সেই তারের খবর বাহির হইয়া যায়। সেই জন্য লোকে মাথায় টিকি রাখে।"

যমদূত বলিলেন,—"ওঃ! বটে। সেই জন্যে? এখন বুঝিলাম।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যমদূত বলিলেন,—"তোমাদের পাড়ার নেই-আঁকুড়ে দাদাকে জানিতে?"

আমি বলিলাম,—"জানিতাম বই কি, আজ কয় বৎসর তিনি মরিয়া গিয়াছেন, শুনিয়াছি মরিয়া ভূত হইয়াছেন।"

যমদূত বলিলেন,— "হাঁ। তিনি ভূত হইয়াছেন। ভগিনীকে যমযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, তিনি বলিয়াছিলেন, এই পুষ্করিণীটি আমার।"

আমি বলিলাম,— "এ পুষ্করিণী তাঁর কেন হবে? এ পুকুর যে রাঘব গাঙ্গুলির।"

যমদূত বলিলেন,— "হাঁ, এ-পুষ্করিণী রাঘব গাঙ্গুলির বটে, তবে নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিয়াছিলেন যে, আমার— সে কেবল ভগিনীকে যমের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,— "কি হইয়াছিল, বলিবেন?"

যমদূত বলিলেন,— "বলিব না কেন, বলিব। তবে তুমি যে মহিরাবণের বেটা অহিরাবণের মত পেছলা-পিছলি কর! সে জন্য তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। যাই হউক, শুন।"

ষষ্ঠ পর্ব : নেই-আঁকুড়ে দাদা

যমদূত বলিতেছেন,— নেই-আঁকুড়ে দাদার একটি বিধবা ভগিনী ছিলেন। একাদশীর দিন বৈকালবেলা বাড়ির নিকট বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি কলা গাছে দিব্য একখানি আগুট পাতা রহিয়াছে। মনে মনে করিলেন যে, কা'ল এই আগুট পাতাখানিতে আমি ভাত খাইব। দৈবের কর্মে, সেই রাত্রিতে তাঁর মৃত্যু হইল। বিধবা অতি পুণ্যবতী ছিলেন। সেই জন্য বিষ্ণুদূতেরা তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিল। এদিকে আবার একাদশীর দিন খাবার বাসনা করিয়াছিলেন, সুতরাং আমরাও তাঁহাকে লইতে আসিলাম। বিধবাকে লইয়া বিষ্ণুদূতে ও যমদূতে কাড়াকাড়ি উপস্থিত হইল। ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়াইল। সেই ঘরের ভিতর, সেই রাত্রিতে বিষ্ণুদূতে আর যমদূতে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অবশেষে আমরা জিতিলাম। বিষ্ণুদূতদিগকে তাড়াইয়া দিলাম। যেমন তোমাকে লইয়া যাইতেছি সেইরূপ বিধবাকেও কাঁটাবন দিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম। যমপুরীতে লইয়া উপস্থিত করিলাম। বিধবার মাথায় ক্রমাগত ডাঙ্গস মারিতে যম হুকুম দিলেন। ডাঙ্গসের প্রহারে জর-জর হইয়া বিধবা পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল যে,— "হায় রে! যদি আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, কি করিয়া যম আমার এরূপ সাজা দিত? যমের কানে সেই কথাটি প্রবেশ করিল। যম জিজ্ঞাসা করিলেন,— "মাগি কী বলিতেছে?"

আমরা বলিলাম,— "বিধবা বলিতেছে যে, আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, যম কি করিয়া আমার এরূপ সাজা করিত।" যমের রাগ হইল। যম বলিলেন,— "নিয়ে আয় তো রে, ওর নেই-আঁকুড়ে দাদাকে। দেখি, কী করিয়া সে আপনার বোনকে বাঁচায়?" নেই-আঁকুড়ে দাদাকে আনিতে আমরা দৌড়িলাম। নেই-আঁকুড়ে দাদা ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ভগিনী যে মরিয়াছে, ভগিনীর যে এরূপ দুর্দশা হইয়াছে, তাহার তিনি কিছুই জানিতেন না। আমরা তাঁহাকে উঠাইলাম। আমরা বলিলাম,— "চলুন, যম আপনাকে ডাকিতেছেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,— "আমার কী সময় হইয়াছে?" আমরা বলিলাম;— "না, আপনার এখনও সময় হয় নাই, এই শরীরেই আপনাকে একবার যমের বাড়ি যাইতে হইবে। একটা কথার মীমাংসা করিয়া আপনি ফিরিয়া আসিবেন।" নেই-আঁকুড়ে দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন,— "কথাটা কি? শুনিতে পারি না?" যমের বাড়ি গিয়া তাহার ভগিনী কী বলিয়াছিলেন, আমরা সে সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম, নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিলেন,— "বটে। আচ্ছা চল যাই।" পথে যাইতে যাইতে নেই-আঁকুড়ে দাদা ক্রমাগত বলিতে বলিতে চলিলেন,— "দেখ, এই স্থলে আমি একটি দেবালয় করিব মানস করিয়াছি।" আবার খানিক দূর গিয়া,— "এই স্থলে আমি একটি অতিথিশালা করিব, আমার এই ইচ্ছা।" আবার খানিকদূর গিয়া "সাধারণ জল পান করিবে বলিয়া এই জলাশয়টি আমি করিয়া দিয়াছি।" এইরূপ স্কুল, কলেজ, ডাক্তারখানা, রাস্তা, ঘাট করিবার কথা আমাদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন। যমপুরীতে উপস্থিত হইলাম, যমের সম্মুখে নেই-আঁকুড়ে দাদাকে খাড়া করিয়া দিলাম। যম বলিলেন,— "নেই-আঁকুড়ে শোন, তোর বোন ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। একাদশীর দিন আঙট পাতে ভাত খাইবার মানস করিয়াছিল। সেই পাপের জন্য আমি তার মাথায় ডাঙ্গস মারতে হুকুম দিয়াছি। সে বলে, আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা থাকিলে যম আমার এরূপ সাজা দিতে পারিত না। তার আস্পর্ধার কথা শুনিয়া তোরে আমি এখানে আনিয়েছি। কী করিয়া বোনকে বাঁচাইবি বাঁচা!" নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিলেন,— "আমার ভগিনীকে আপনি খালাস দিন।" নেই-আঁকুড়ের কী পুণ্য আছে দেখিবার নিমিত্ত যম চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন। খাতাপত্র দেখিয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন যে, নেই-আঁকুড়ের পুণ্য কিছুই নাই। রাগিয়া যম বলিলেন,— "শুনলি তো নেই-আঁকুড়ে, তোর এক ছটাকও পুণ্য নাই! বোনকে তার আবার ভাগ দিবি কি?" নেই-আঁকুড়ে উত্তর করিলেন,— "পুণ্য আছে কি না আছে, আপনার এই সমুদয় দূতদিগকে জিজ্ঞাসা করুন।" যম আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা বলিলাম,— "হাঁ মহাশয়। পথে আসিতে আসিতে, এখানে দেবালয় করিবার মানস আছে, এখানে স্কুল করিবার মানস আছে, নেই-আঁকুড়ে এইরূপ নানা কথা বলিয়াছিলেন।" যম আরও রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন,— "ভণ্ড! সে সকল কাজ তো তুই করিস্ নাই, কেবল মনে মনে মানস করিলে কী হইবে?" নেই-আঁকুড়ে উত্তর করিলেন,— "আমার ভগিনী আঙটপাতে ভাত খাইয়াছিলেন, না কেবল মাস করিয়াছিলেন?" যম বলিলেন,— "মানস করিয়াছিল।" নেই-আঁকুড়ে বলিলেন,— "তবে?" যম বুঝিলেন। যম বুঝিলেন যে, কেবল মানস করিলে যদি পাপের শাস্তি দিতে হয়, তাহা হইলে পুণ্যের মানস করিলেও পুণ্যের ফল দিতে হয়। বে-আইনি করিয়া তিনি বিধবার মাথায় ডাঙ্গস মারিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যম এখন তাহা বুঝিলেন। বিধবাকে মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। বিষ্ণু-দূতেরা আসিয়া বিধবাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল। নেই-আঁকুড়ে দাদা আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার কিছুদিন পরে নেই-আঁকুড়ের মৃত্যু হইল, তাঁহার গতি হয় নাই। ভূত হইয়া তিনি এখন লোকের উপর উপদ্রব করিতেছেন।

সপ্তম পর্ব : এঁড়ে গোরু

কর্তা-ভূত অর্থাৎ মিত্তির-জা বলিতেছেন,— যমদূতদিগের কাজ সারা হইলে পুনরায় তাহারা আমাকে যমালয় অভিমুখে লইয়া চলিল। অনেকক্ষণ পরে যমপুরীতে গিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম। যমদূতেরা যমের সম্মুখে আমাকে খাড়া করিয়া দিল। যম সিংহাসনে বসিয়া আছেন। পাশে খাতা পত্র লইয়া চিত্রগুপ্ত। চারিদিকে শত শত বিকটমূর্তি যমদূত। কাহারও হাতে মুগুর, কাহারও হাতে ডাঙ্গস, কাহারও হাতে সাঁড়াশী। পাপ-পুণ্যের হিসাব দেখিতে যম চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন।

অনেক খাতা-পত্র উল্টাইয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন,— মহাশয়! ইহার পুণ্য তো কিছুই দেখিতে পাই না, সকলই পাপ! অতি উৎকট উৎকট পাপ। ইহার মতো মহাপাতকী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ছিল না। মরিবার সময় এ যে চান্দ্রায়ণটি করে, তাও সব ফাঁকি। যমদূতদিগকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত বেল মাথাটি নেড়া হইয়াছিল। পুণ্য ইহার কিছুমাত্র নাই, কেবল পাপ। তবে এক বিন্দু পুণ্য আছে এই যে, মৃত্যু হইবার পূর্বে এক জন ব্রাহ্মণকে একটি মর-মর এঁড়ে গরু দান করিয়াছিল। কিন্তু বাছুরটি ব্রাহ্মণের ঘরে লইয়া যাইতে হয় নাই; পথেই শুইল আর মরিল। মরিয়া সে এঁড়ে বাছুরটি এখন যমপুরীতে আসিয়াছে।

আমাকে সম্বোধন করিয়া যম বলিলেন,— "কেমন হে মিত্তির-জা! চিত্রগুপ্তের মুখে তোমার হিসাব শুনলে তো! এখন তুমি কী করিতে চাও। তোমার যে রতিমাত্র পুণ্যটুকু আছে, আগে তাহার ফল ভোগ করিয়া লইতে চাও, না আগে পাপের ভোগ ভুগিতে চাও?"

আমি উত্তর করিলাম,— "মহাশয়। আপনার এখানে কিরূপ দস্তুর, কিরূপ আইনকানুন, তা তো আমি জানি না? আমাকে একটু বুঝাইয়া বলুন, আমার পুণ্যের ফল কিরূপ হইবে, আর পাপের ভোগই বা কী প্রকার হইবে? তারপর আমি আপনাকে বলিব, আগে আমি কোন্‌টি চাই।"

যম উত্তর করিলেন,— "সমস্ত জীবন তুমি উৎকট উৎকট মহাপাপ করিয়াছ। সে জন্য চিরকাল তোমাকে রৌরব প্রভৃতি নরকে বাস করিতে হইবে। তোমার গলিত দেহে কৃমি প্রভৃতি নানারূপ ভয়াবহ কীট দংশন করিবে, অগ্নিতে তোমাকে পুড়িতে হইবে। অষ্টপ্রহর যমদূত তোমার মাথায় ডাঙ্গস মারিবে। সাঁড়াশি দিয়া যমদূতেরা তোমার গায়ের মাংস ছিঁড়িবে। বিধিমতে তোমার যন্ত্রণা হইবে, যাতনায় তুমি চিৎকার করিবে। চিরকাল তোমাকে এইরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তবে সেই যে সামান্য একটু নাম মাত্র পুণ্য করিয়াছিলে, মরিবার পূর্বে সেই যে মর মর এঁড়ে বাছুরটি ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলে, কেবল মাত্র এক দিনের জন্য সেই পুণ্যটুকুর ফল ভোগ করিতে পাইবে। সেই এঁড়ে গোরুটি এখন এখানে আসিয়াছে। এক দিনের জন্য তাহারে তুমি যা আনিয়া দিতে বলিবে, তাহাই সে আনিয়া দিবে; যা করিতে বলিবে, তাহাই সে করিবে। তোমার পুণ্যের ফল এই।"

আমি বলিলাম,— "পুণ্যের ফলটি আমি প্রথমে ভোগ করিয়া লইব। পাপের দণ্ড যাহা হয় তাহার পর আপনি করিবেন।"

যম আজ্ঞা করিলেন,— "ওরে! মিত্তিরজার সেই এঁড়ে গোরুটা আন্‌তো!"

এঁড়ে গোরু আনিতে যমদূত সব দৌড়িল। এঁড়ে গোরু আনিয়া যমের দরবারে হাজির করিল। আমি দেখিলাম, এখন আর সে অস্থিচর্মসার এঁড়ে বাছুর নাই। আমার ঘরে খাবার কষ্ট ছিল, যমের ঘরে তো আর সে কষ্ট ছিল না। যমপুরীতে অনেক খোল ভুসি খাইয়া বাছুরটি এখন বিপর্যয় এক ষাঁড় হইয়াছিল। লম্বা লম্বা বিপর্যয় দুই সিং। দেখিলে হরিভক্তি উড়িয়া যায়! চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ। রাগে আস্ফালন করিয়া ফোঁশ ফোঁশ করিতেছে। রাগে পা দিয়া মাটি চষিয়া ফেলিতেছে। কারে গুঁতাই, কারে মারি, সদাই এই মন। দুইদিকে দুই দড়ি ধরিয়া চারি জন যমদূত টানিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

যম বলিলেন— "মিত্তির-জা। এই তোমার সেই এঁড়ে গোরু! তুমি ইহাকে যাহা বলিবে, এই এঁড়ে গোরু আজ সমস্ত দিন তাহাই করিবে।"

এঁড়ে গোরুকে ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত যম আদেশ করিলেন। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, সিং নীচে করিয়া, এঁড়ে গোরু আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "কেমন হে এঁড়ে গোরু! আজ আমি তোমাকে যা বলিব, তাই তুমি করিবে তো?"

এঁড়ে গোরু উত্তর করিল,— "আজ্ঞে হাঁ। আজ সমস্ত দিন আপনি যাহা করিতে হুকুম করিবেন, আমি তাহাই করিব।"

আমি বলিলাম,— "এঁড়ে গোরু। তবে তুমি এক কাজ করো। তোমার একটি সিং যমের নাভিকুণ্ডলে প্রবিষ্ট করিয়া দাও, আর একটি সিং চিত্রগুপ্তের নাভিকুণ্ডলে দিয়া, আজ সমস্ত দিন এই দুই জনকে ঘুরাও, সমস্ত দিন দুই জনকে বন্ বন্ করিয়া চরকীর পাক খাওয়াও।"

লম্বোদর, গগন, আড্ডাধারী মহাশয়, সকলেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন,— "বাহবা। বাহবা। মিত্তির-জা। তুমি একজন লোক বটে! কিন্তু নয়ান, মিত্তিরজা তোমাকে ঠিক কথা বলেন নাই। নাভিকুণ্ডলে মিত্তির-জা যে সিং দিতে বলিবেন, মিত্তির-জা তেমন পাত্র নন্। শরীরের অন্যস্থানে সিং দিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু কথাটি ভদ্রসমাজে বলিবার যোগ্য নয়। সেই জন্য বোধ হয় মিত্তির-জা তোমার নিকট আসল কথাটি গোপন করিয়াছিলেন।"

নয়ন উত্তর করিলেন,— "আমারও মনে সে সন্দেহটি উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, যখন এই নাভিকুণ্ডলের কথাটি বলেন, তখন মিত্তির-জা-ভূতের মুখে ঈষৎ একটু হাসির রেখা দেখা দিয়াছিল। যাহা হউক, মিত্তির-জা ভূত কী বলিতেছেন, তাহা শুনা।"

মিত্তিরজা-ভূত বলিলেন,— আমার আদেশ পাইয়া এঁড়ে গোরু, যম ও চিত্রগুপ্তকে তাড়া করিল। ভয়ে দুই জনের প্রাণ উড়িয়া গেল। সিংহাসন হইতে যম লাফাইয়া পড়িলেন। খাতা-পত্র ফেলিয়া চিত্রগুপ্তও লাফাইয়া পড়িলেন। তারপর এই দৌড়। দৌড়। প্রাণপণ যতনে দৌড়।

কিন্তু দৌড়িয়া যাবেন কোথা? এঁড়ে গোরু না-ছোড়-বান্দা। যেখানে দৌড়িয়া পালান, সিং বাগাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই আমার এঁড়ে গোরু গিয়া উপস্থিত হয়।

অষ্টম পর্ব : মিত্তিরজার পুণ্য

কর্তা-ভূত বলিতেছেন,— যমপুরীরর ভিতর কোনো স্থলে যম ও চিত্রগুপ্ত নিস্তার পাইলেন না। যেখানে তাঁহারা যান, আরক্তঘূর্ণিত নয়নে এঁড়ে গোরুও সেই স্থলে গিয়া তাঁহাদিগকে তাড়া করে। যমপুরী ছাড়িয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দুই জনে ইন্দ্রের ইন্দ্রলোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানেও এঁড়ে গোরু সঙ্গে সঙ্গে। শিবের শিললোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানেও এঁড়ে গোরু! ব্রহ্মার ব্রহ্মলোকে, সেখানেও এঁড়ে গোরু! পরিত্রাণ আর কোথাও পান না। অবশেষে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দুই জনে বৈকুণ্ঠে গিয়া উপস্থিত। সেখানে নারায়ণ শুইয়া আছেন, আর লক্ষ্মী পা টিপিতেছিলেন, গলদঘর্ম মুমূর্ষপ্রায় যম ও চিত্রগুপ্ত সেই স্থলে গিয়া উপস্থিত। বৈকুণ্ঠের দ্বারে সুদর্শন চক্র ঘুরিতেছিল। এঁড়ে গোরু বৈকুণ্ঠের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। সিং পাতিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। যম ও চিত্রগুপ্ত বাহির হইলেই তাঁহাদিগকে সিঙে লইয়া ঘুরাইবে।

যম ও চিত্রগুপ্তের দুরবস্থা দেখিয়া, নারায়ণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নারায়ণকে তাঁহার আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনাইলেন। নারায়ণ বলিলেন,— "এ মানুষটি দেখিতেছি, সাধারণ মনুষ্য নয়। ইহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া বশ করিতে হইবে। তা না হইলে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, শিবের শিবত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, আমার নারায়ণত্ব, এ সব কাড়িয়া লইবে। দেশে দেশে আমাদিগকে ফকির হইয়া বেড়াইতে হইবে। চল, আমরা এখন সকলে সেই সেই মানুষটির কাছে যাই।"

যম বলিলেন,— "দ্বারে সেই এঁড়ে গোরু দাঁড়াইয়া আছে। বাহির হইলেই আমাদের সে নিগ্রহ করিবে। আপনি গিয়া সেই মিত্তির-জাকে সান্ত্বনা করুন, আমরা এই স্থলে বসিয়া থাকি।"

নারায়ণ বলিলেন,— "তোমাদের ভয় নাই, তোমরা আমার সহিত এস।

আমি এঁড়ে গোরুকে বুঝাইয়া বলিব, সে তোমাদের প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করিবে না।"

এইরূপ আশ্বাস পাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত ভয়ে ভয়ে নারায়ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, নারায়ণ আগে আগে চলিলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে, এঁড়ে গোরু সিং পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নারায়ণকে দেখিয়া এঁড়ে গোরু বলিল,— "মহাশয়! আপনার বাটীতে যম ও চিত্রগুপ্ত গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। শীঘ্র তহাদিগকে বাহির করিয়া দিন। তাহাদিগকে সিঙে লইয়া আমি ঘুরাইব। মিত্তির-জা আমাকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন!"

সুমিষ্টভাবে নারায়ণ বলিলেন,— "এঁড়ে গোরু! তুমি ব্যস্ত হইও না। যম ও চিত্রগুপ্ত পলায় নাই। এ দেখ, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তাহাদিগকে সিঙে লইয়া ঘুরাইতে মিত্তির-জা তোমাকে বলিয়াছেন। আচ্ছা মিত্তির-জা যদি যম ও চিত্রগুপ্তকে অব্যাহতি দেন, তাহা হইলে তুমি তাঁর কথা শুনিবে তো?"

এঁড়ে গোরু উত্তর করিল,— "মিত্তির-জা আমাকে হুকুম দিয়াছেন। মিত্তির-জা যদি পুনরায় বলেন, না, ইহাদিগকে সিঙে করিয়া ঘুরাইতে হইবে না, তাহা হইলে তাঁর কথা শুনিব না কেন? অবশ্য শুনিব।"

নারায়ণ বলিলেন,— "তবে আমার সঙ্গে এস! সকলে চল, মিত্তির-জার কাছে যাই।"

নারায়ণ আগে, তাঁহার পশ্চাতে এঁড়ে গোরু, তাহার পশ্চাতে যম ও চিত্রগুপ্ত; এইরূপে সকলে পুনরায় যমপুরীর দিকে চলিলেন। এঁড়ে গোরু দুই চারি পা যায়, আর মাঝে মাঝে পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখে, পাছে যম ও চিত্রগুপ্ত পলায়।

মিত্তির-জা ভূত বলিলেন,— আমার নিকট হইতে পলাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত কী করিয়াছিলেন, কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা আমি চক্ষে দেখি নাই। পরে নারায়ণের নিকট যাহা আমি শুনিয়াছিলাম, তাহাই তোমাকে বলিলাম। জাগ্রত শীতলার পাণ্ডা! তুমি মনে করিও না যে, আমি— মিত্তির-জা, এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলাম। যম যেই সিংহাসন ফেলিয়া পলাইলেন, আর টুপ করিয়া আমি সেই খালি সিংহাসনে গিয়া বসিলাম। সিংহাসনে বসিয়া যমদূতদিগকে হুকুম দিলাম,— "যমপুরীতে যত পাপী আছে, এই মুহূর্তে তোমরা তাদের সকলকে খালাস কর।"

যমপুরীতে তৎক্ষণাৎ মহা-সমারোহে পড়িয়া গেল। শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, পাপী খালাস পাইতে লাগিল। দুর্গন্ধ পূতিময় নরক হইতে উঠাইয়া পাপীগণকে স্নান করাইতে লাগিলাম, সুগন্ধ আতর গোলাপ তাহাদিগের দেহে সিঞ্চন করিতে লাগিলাম। অগ্নিময় জ্বলন্ত নরক হইতে উঠাইয়া সুস্নিগ্ধ জলে পাপীদিগের শরীর সুশীতল করিতে লাগিলাম। শত শত কর্মকার আনিয়া পাপীদিগের হস্ত পদের শৃঙ্খল কাটাইতে লাগিলাম। মর্মভেদী কান্নার ধ্বনি বিলুপ্ত হইয়া যমপুরীতে আজ চারিদিকে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। সহস্র সহস্র পাপী গলবস্ত্র হইয়া জোড়হাতে আমার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইল। সকলে বলিতে লাগিল,— "ধন্য মিত্তির-জা। শুভক্ষণে আপনার মা আপনাকে গর্ভে ধরিয়াছিলেন। আজ আপনার কৃপায় যমযন্ত্রণা হইতে আমরা রক্ষা পাইলাম। না হইলে, নির্দয় যম আরও কতকাল আমাদিগকে পীড়ন করিত, তাহা বলিতে পারি না।"

সম্মুখে দাঁড়াইয়া জোড়হাতে পাজিগণ এইরূপে আমার স্তবস্তুতি করিতেছে, এমন সময় নারায়ণ, এঁড়ে গোরু, যম ও চিত্রগুপ্ত সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভক্তিভাবে তাঁহার পায়ে গিয়া পড়িলাম।

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,— "মিত্তির-জা! এ কি বল দেখি? যমের উপর তোমার এত রাগ কেন?"

আমি উত্তর করিলাম,— "আজ্ঞে না। যমের উপর আর আমার আড়ি কী? তবে রসিকতা করিয়া যম বলিলেন, চিরকাল আমাকে নরকভোগ করিতে হইবে, কেবল একটি দিন আমি পুণ্যের ফল ভোগ করিতে পাইব। তাই যা! সে যা হউক, এখন আর আমার পাপ কোথায়? এই সাক্ষাতে দেখুন লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে আমি উদ্ধার করিলাম, যে পাদপদ্ম ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ধ্যানে পায় না, আজ সেই শ্রীপাদপদ্ম আমি স্পর্শ করিলাম। তবে আর-আমার পাপ কোথায় রহিল?"

নারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,— "না মিত্তির-জা! তোমার আর কিছুমাত্র পাপ নাই, তুমি আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠে চল। এঁড়ে গোরুকে মানা করিয়া দাও, যেন যম ও চিত্রগুপ্তের প্রতি সে কোনোরূপ অত্যাচার না করে।"

এঁড়ে গোরুকে আমি মানা করিয়া দিলাম। এঁড়ে গোরু আপনার গোয়ালে চলিয়া গেল। নারায়ণের সঙ্গে আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম। যাইবার পূর্বে জোড়হস্তে নারায়ণের নিকট একটি প্রার্থনা করিলাম যে, এই পাপীগুলিকে যেন সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি। সুপ্রসন্ন হইয়া নারায়ণ অনুমতি করিলেন। সেই লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে সঙ্গে করিয়া নারায়ণের সঙ্গে আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম।

ক্রমে সকলে বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া কিন্তু সুদর্শন চক্র ফোঁশ করিয়া উঠিল। আর সকলকে ভিতরে যাইতে দিবে, কেবল আমাকে ভিতরে যাইতে দিবে না। নারায়ণের পায়ে আমি পুনরায় কাঁদিয়া পড়িলাম।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নারায়ণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "নয়নচাঁদ বলিয়া এক ব্যক্তির শীতলা কি তুমি কাড়িয়া লইয়াছিলে?"

আমি উত্তর করিলাম,— "হাঁ মহাশয়! মৃত্যুর পূর্বে আমি সে কাজটি করিয়াছিলাম?"

নারায়ণ বলিলেন,— ঈশ! করিয়াছ কি? সে যে ভারি জাগ্রত শীতলা। এমন কাজও করেছ আর সব পাপ আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু সে শীতলা-কাড়া পাপটি আমি ক্ষমা করিতে পারি না। যাও, শীঘ্র ভূত হইয়া তুমি মর্ত্যে ফিরিয়া যাও। নয়ন চাঁদের শীতলাটি ফিরিয়া দাও। আর, সকলকে গিয়া বল, যেন নয়নচাঁদের শীতলাকে সকলে পূজা করে।"

কি করিব? কাজেই ভূত হইয়া আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। এখন তোমার শীতলাটি লইয়া যাও যে, পুনরায় আমি বৈকুণ্ঠে গমন করি। এই বলিয়া মিত্তির-জা-ভূত আমার শীতলাটি আমাকে ফিরিয়া দিলেন।

নবম পর্ব : পরিশেষ

আড্ডাধারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,— "আচ্ছা নয়ান। সেই যে আর একটি ভূত সেখানে বসিয়াছিল, সে ভুতটি কে? তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?"

নয়ন উত্তর করিলেন,— "হাঁ, করিয়াছিলাম। শুনি যে, সেটি নেই-আঁকুড়ে দাদার ভূত। মর্ত্যে আসিবার পূর্বে তাহাকেও উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, মিত্তির-জা নারায়ণের অনুমতি পাইয়াছিলেন।"

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "তাহার পর কি হইল?"

নয়ন বলিলেন,— "শীতলাটি হাতে করিয়া আমি বাহিরে দাঁড়াইলাম। ভূত দুইটি সরু সরু বাঁশের সলার মতো লম্বা হইল। তাহার পর হাউই-বাজির মতো একে একে সোঁ সোঁ করিয়া আকাশে উঠিল। বৈকুণ্ঠ চলিয়া গেল।"

সকলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,— "তাহার পর তুমি কী করিলে?"

নয়ন বলিলেন,— "আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আগে যদি এক গুণ পসার ছিল, এখন দশ গুণ পসার হইল। কালেজের সেই যারা এম এ পাশ দিয়াছে, সভা করিয়া তাহারা আমার শীতলার বক্তৃতা করিল। খবরের কাগজে আমার শীতলার নাম উঠিল। ফিরিঙ্গিরা আসিয়া আমার শীতলার পূজা দিতে আরম্ভ করিল। এক দিন লোক সব হাঁড়ি-চড়ানো বন্ধ করিয়া খই-কলা খাইয়া রহিল। আমার বুজরুকি চারিদিকে খুব জাহির হইল। ক্রমে আমি বসন্তর ডাক্তার হইলাম। টাকা-কড়ি ঘরে ধরে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মরশুমটি কমিয়া গেল। সাহেবরা গণিয়া বলিয়াছেন যে, আবার পাঁচ বৎসর পরে সেইরূপ হিড়িক পড়িবে। তখন তোমাদেরও এক একটি শীতলা বানাইয়া দিব। রাত্রি হইয়াছে। আজ আর নয়। এস, একবার সাধের দেবতাগুলিকে নমস্কার করিয়া আপনার আপনার ঘরে যাই।"

সকলে মাটিতে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন। আর বলিতে লাগিলেন,— "হে মা কাটি-গঙ্গা। হে বাবা ফণী মনসা। তোমাদের পায়ে গড়, ওঁ নমঃ ওঁ নমঃ, ওঁ নম।"

৮.২ গল্পকার ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯)

বঙ্কিমযুগের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত এক গল্পকার ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ। কটকে পুলিশ সাবইনসপেক্টর থাকাকালীন 'উৎকল শুভঙ্করী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পরে 'বেঙ্গল গেজেটিয়ার'-এর বড়োবাবুর পদেও কিছুদিন কাজ করেন। স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যাকাউন্টের কাজেও নিযুক্ত ছিলেন কিছুদিন। পরে কলকাতা যাদুঘরের কিউরেটরও হন। বহু কর্মে বহু অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ মানুষটি সাহিত্যসৃষ্টির কাজে ছিলেন অনলস : সৃষ্টিমুখর। তার ফলে 'ভূত ও মানুষ', 'মজার গল্প', 'পূজার ভূত' প্রভৃতি অনেক গল্পের মতো 'কঙ্কাবতী', 'ফোকলা দিগম্বর', 'মুক্তামালা' প্রভৃতি উপন্যাসও রচনা করেন।

গল্পকাররূপে ত্রৈলোক্যনাথের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের মিশ্রণে এক আশ্চর্য জগৎ ও আবহ নির্মাণ। এছাড়াও রয়েছে তাঁর হাস্যরসসৃষ্টির নিজস্ব প্রক্রিয়া। ভূত ও অতিপ্রাকৃত পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' অতি গুরুত্বপূর্ণ।

৮.৩ গল্পের বৈশিষ্ট্য

'নয়নচাঁদের ব্যবসা' 'ভূত ও মানুষ' ১৮৯৬ গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল গল্পের নির্মাণে বাস্তব ঘটনা ও বর্ণনায় লৌকিক ও অতিপাকৃত উপাদানের বিমিশ্রণ। এইজন্য এই গল্পের তিনটি স্তর—

(ক) বাস্তব ঘটনা বর্ণনার স্তর।

(খ) লৌকিক ঘটনা বা লোকবিশ্বাস-নির্ভর ঘটনাবর্ণনা।

(গ) অতিপ্রাকৃত ঘটনাবর্ণনা।

গল্পটি বিশ্লেষণ করলে এই সব উপাদানগত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

এই গল্পের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এর কথনভঙ্গি। গুলিখোরদের আড্ডার আসরে বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে নয়নচাঁদ তার অর্থসৌভাগ্যের কারণ বর্ণনা করেছে। সেই বর্ণনার মধ্যেই আবার কর্তাভূতের কাহিনি বর্ণিত। অর্থাৎ একই গল্পের বক্তা দুজন, নয়নচাঁদ ও কর্তাভূত।

এই গল্পের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল এই গল্পের আশ্চর্য গঠন বা বাঁধুনি। নয়টি পর্বে বিন্যস্ত এই গল্প সর্ব-অর্থে লেখকের গল্প পরিবেশনে অপূর্ব ও অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ।

এই গল্পের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল চরিত্রসৃষ্টি। নয়নচাঁদ, আড্ডাধারী, কর্তাভূত প্রভৃতি আশ্চর্য চরিত্রের রূপায়ণে গল্পটি শিল্পশ্রী লাভ করেছে।

এই গল্পের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল পরিহাসরস, রসিকতা। সমস্ত গল্পের মজাদার পরিবেশ ও চরিত্র প্রচ্ছন্ন কৌতুকও অমরসৃষ্টির সহায়ক হয়েছে।

৮.৪ গঠন বিশ্লেষণ

'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পটির গঠনকৌশল অন্যবদ্য। এই গল্পের মধ্যে যে তিনটি স্তর আছে তা হল—

স্তর	বিষয়বস্তু
(ক) বাস্তব ঘটনাস্তর	গুলি আড্ডার বাস্তব বর্ণনা
(খ) লৌকিক ঘটনার স্তর	নয়নের লৌকিক বিশ্বাসকেন্দ্রিক ব্যবসা
(গ) অতিপ্রাকৃত ঘটনাস্তর	ভূতের মুখে বর্ণিত ঘটনা

ফলে দেখা যাচ্ছে তিনটি বিচিত্র স্তরের ঘটনার সমন্বয়ে এ গল্প গড়ে উঠেছে।

প্রথম স্তরে নয়ন ও আড্ডাধারীর কথোপকথন গল্পের সূত্র ধরিয়ে দেয়। নয়নচাঁদ কী করে অর্থকৌলীন্য লাভ করল তার সহজ উত্তর এখানে নেই। আছে তার উত্তরদানের প্রয়াসে গল্পের সুতো ছাড়া। নয়নের মুখ দিয়ে এই কাজটি আসলে করেছেন লেখক স্বয়ং। তাই নয়নের শীতলাপুজো ও অন্যান্য কর্ম কীভাবে তার অর্থোপার্জনের পথ প্রশস্ত করেছে তার কৌতুকাবহ বর্ণনা আছে। প্রথম স্তরে আড্ডা যতটাই বাস্তব দ্বিতীয় স্তরে শীতলাপুজো সংক্রান্ত বর্ণনা ততটাই লোকবিশ্বাসের বর্ণনা। তৃতীয় স্তরে আছে ভূতের মুখের কাহিনি যা যমরাজপুরীতে সংঘটিত। শেষ পর্যন্ত ভূতের স্বর্গলোকযাত্রা ও নয়নের ব্যবসার পসার গল্পটির সমাপ্তিতে এনে দেয় প্রসন্ন হাস্যরস-রসিকতার আমেজ।

৮.৫ সমাজপ্রেক্ষিত ও চরিত্রনির্মাণ

'নয়নচাঁদের ব্যবসা' ত্রিমাত্রিক শৈলীতে নির্মিত। এই শৈলীর একটা বৈশিষ্ট্য হল এই যে গল্পের তিনটি স্তরেই সমাজ-প্রেক্ষিতকে সমানভাবে আঁকার চেষ্টা আছে।

প্রথম স্তরে নয়ন ও অন্যান্য গুলিখোরদের আড্ডার বর্ণনা বাস্তবসম্মত। গুলিখোর ব্যক্তিরা আড্ডার আসরে অলস ও মন্থর গালগল্পে ডুবে থাকে। এটা তাদের মৌতাতের বিশেষত আড্ডার জমাট আসরের বৈশিষ্ট্য। আড্ডাধারীদের পারস্পরিক বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, গল্পবর্ণনার সত্যমিথ্যা, সবই এই আড্ডার আসরের উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় স্তরে সমাজের প্রেক্ষিত বর্ণিত হয়েছে নয়নচাঁদের জীবিকার্জনের বাস্তবসম্মত বর্ণনায়। সে শীতলাপুজোর আয়োজন করে ও লোকবিশ্বাসকে নির্ভর করে অর্থোপার্জন করে। পরে কীভাবে তার ব্যবসা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে—সেকথাও লোকের বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সূত্র ধরেই বর্ণিত হয়েছে।

ধর্মব্যবসায়ের প্রতি লেখকের ব্যঙ্গ শর নিক্ষেপ—এ অংশের বিশেষত্ব।

তৃতীয় স্তরে ভূত ও যমপুরীর বর্ণনায় সমাজপ্রেক্ষিত অন্তর্হিত হলেও চরিত্র বর্ণনায় বাস্তব জীবনেরই ছায়া পড়ে। তাই অলৌকিক ও অপ্রাকৃত চরিত্র বর্ণনায় লেখক বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। যমলোকের প্রাকৃত-অপ্রাকৃত চরিত্রগুলো যে হাস্যরসের উদ্রেক করেছে তার কারণ মানবজগতের প্রতিভাস রচিত হয়েছে এখানে। পাত্রপাত্রীর আচরণ বর্ণনার ক্ষেত্রেও সেকথা সমান সত্য।

হিন্দুধর্মের আচারসর্বস্বতাকে ত্রৈলোক্যনাথ ব্যঙ্গ করেছেন এ অংশে। তাঁর অবলম্বন হিন্দু পুরাণ তথা ধর্মবিশ্বাসধৃত যমালয়ে ইহজীবনের কর্মানুযায়ী আত্মার পাপ-পুণ্যের বিচারের সংস্কার।

৮.৬ রসসৃষ্টি

ত্রৈলোক্যনাথের 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পটি এক অনবদ্য রসসৃষ্টি। এর কারণ ছিল :

১। ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসসৃষ্টিতে লেখকের অনায়াস সাফল্য।

২। বাস্তব বর্ণনায় লেখকের নিজস্ব কৌশল।

৩। অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক বর্ণনার সঙ্গে হাস্যরসের প্রচ্ছন্ন সহাবস্থান।

৪। বাস্তব-অবাস্তব ও হাস্য-পরিহাসের পরিমিশ্রণে নতুন রসলোক নির্মাণ।

৫। রসসৃষ্টিতে লেখকের শিল্পীমনের সার্থকতা।

এই পাঁচটি কারণ বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে ত্রৈলোক্যনাথ লেখক হিসেবে একেবারে স্বতন্ত্র জাতের। সহজে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। সমসাময়িক যুগে এমন পরিহাসরসিক এমন জীবনবোধের রসরূপ দানে সফল সাহিত্যিক বড়ো দুর্লভ।

রসসৃষ্টির সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে লেখকের নির্মাণকৌশল। এই নির্মাণকৌটি ত্রৈলোক্যনাথের নিজস্ব। এই কৌশল এতই স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত ও রসসৃষ্টিতে সফল যে ত্রৈলোক্যনাথকে অতি সহজেই পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গল্পকারদের সঙ্গে একাসনে স্থান দেওয়া চলে।

৮.৭ সারাংশ

১। ত্রৈলোক্যনাথের 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' কোন্ ধরনের গল্প বোঝা প্রয়োজন। এইজন্য ত্রৈলোক্যনাথ ঠিক কী ধরনের গল্প লেখেন সেটাও অনুধাবন করা দরকার।

২। 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পটার অসাধারণ গঠন বোঝা চাই। এই গঠনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার বর্ণনা-কৌশল।

৩। বর্ণনাকৌশলে যে তিনটি প্রধান স্তর আছে তার স্বরূপ বোঝা দরকার। এই স্তরগুলো কীভাবে মিলেমিশে শিল্পশ্রী লাভ করেছে সেটা হৃদয়ঙ্গম করা দরকার।

৪। রসসৃষ্টির রূপ গল্পটি কেন সার্থক তা বুঝতে হলে এর সমাজপ্রেক্ষিত ও চরিত্রসৃষ্টির অভিনবত্ব বোঝা দরকার।

৫। গল্পকার ত্রৈলোকানাথের বৈশিষ্ট্যগুলো এই গল্পে যেভাবে ফুটে উঠেছে তা সূত্রাকারে বোঝা চাই।

৬। ত্রৈলোক্যনাথের ভূত ও ভৌতিক জগৎসৃষ্টির অভিনবত্বও গুরুত্বপূর্ণ।

৮.৮ অনুশীলনী

১. নয়নচাঁদের ব্যবসার প্রকৃত তাৎপর্য কী?

২. ব্যবসা বর্ণনায় নয়নের আপত্তির কারণ ছিল কি? কেন?

৩. ভূতের মুখের কাহিনিকে লেখক কীভাবে নয়নের ভাগ্যোদয় ও বিত্তোপার্জনের কাহিনিতে রূপদান করেন?

৪. 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পের গঠন কি সরল না জটিল? বিশ্লেষণ করে দেখান।

৫. 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পের ঘটনাপরম্পরা বর্ণনা করুন।

৬. ত্রৈলোক্যনাথের হাস্যরসসৃষ্টির সাফল্যের কারণ কী মনে করেন?

৭. বাস্তব চরিত্র-চিত্রণে ত্রৈলোক্যনাথের নিজস্ব পদ্ধতি কী ছিল তা ব্যাখ্যা করে বোঝান।

৮. সামাজিক প্রেক্ষিত বর্ণনার সঙ্গে হাস্যরসসৃষ্টির যোগাযোগ কোথায় তা বোঝান।

৯. রসসৃষ্টিরূপে 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পের সার্থকতা নিরূপণ করুন।

১০. জীবনরসরসিক ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পকৌশল ও তার সাফল্য বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১১. গল্পকার ত্রৈলোক্যনাথের সাফল্য তাঁর 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্প রচনায় কতদূর তা নির্ণয় করুন।

১২. ত্রৈলোক্যনাথ যে একজন প্রথম সারির গল্পলেখক তা আপনার পঠিত গল্প অবলম্বনে প্রমাণ করুন।

১৩. ভৌতিক ও অতিপ্রাকৃত জগৎসৃষ্টিতে ত্রৈলোক্যনাথের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট করুন।

১৪. বাস্তব জীবনের রূপকার রূপে ত্রৈলোক্যনাথের অসাধারণত্ব বর্ণনা করুন।

১৫. চরিত্র-চিত্রণে ত্রৈলোক্যনাথ কি টাইপচরিত্র অঙ্কনে বিশ্বাসী ছিলেন? আপনার পঠিত গল্প অবলম্বনে তার উত্তর অনুসন্ধান করুন।

১৬. ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের স্বরূপ ও মনোহারিত্ব ব্যাখ্যা করুন।

একক ৯ ☐ অরূপের রাস—জগদীশ গুপ্ত

গঠন

৯.১ মূলগল্প

৯.২ গল্পকার জগদীশ গুপ্ত

৯.৩ গল্পের বৈশিষ্ট্য

৯.৪ গঠনকৌশল

৯.৫ মনস্তাত্ত্বিকতা

৯.৬ রসসৃষ্টি

৯.৭ সারাংশ

৯.৮ অনুশীলনী

৯.১ মূলগল্প

রাণুর সঙ্গে আমার ভাব ছিলো—

কিন্তু হঠাৎ একদিন আড়ি হইয়া গেলো।

রাণু ছোটো, আমিও ছোটো; সে সাত, আমি চৌদ্দো বছরের।...বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেই শ্রেষ্ঠ হয় না, তথাপি বয়ঃকনিষ্ঠদের সম্বন্ধে বয়োজ্যেষ্ঠদের সহজ একটা দায়িত্ব বুঝি থাকেই, বিশেষত যদি প্রতিবেশী হয়।—

রাণুর সম্বন্ধেও আমার দায়িত্ব ছিলো... তার শারীরিক কোনো হানি না হয় ইত্যাদি।

তত্ত্বাবধায়কের পদগুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মাঝে-মাঝে তাহাকে শাসন করিতেও যাইতাম; কিন্তু সে শাসনের ফলে তাহার সংশোধন কতদূর হইত তাহা নির্দেশ করিতে যাওয়া, তার রূপের ব্যাখ্যার মতোই নিষ্প্রয়োজন।

আমার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিয়া আমার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িত; বলিত,— "কানুদা একটা বড়ো মানুষ কিনা,, তাই বকতে বসেছে। হি, হি, হি'...

কিন্তু হতোদ্যম আমি কখনই হই নাই।

রাণুর পিতা যদুগোপাল দত্ত মহাশয় অবস্থাপন্ন নহেন, নিঃস্বও নহেন। তাঁহার চাকরিতে উপরি পাওনাও ছিলো; এই পয়সাটা অধর্মের পয়সা— কিন্তু মাহিনার অল্প টাকাতেই সাংসারিক খরচটা কুলাইয়া ঐ অধর্মের পয়সার সবটাই জমিত।

জন্ম, মৃত্যু, পাশ, ফেল, আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি, বিবাহ— এই রকমের সামান্য পারিবারিক পরিবর্তন ছাড়া গৃহস্থ বাঙালির ঘরে উল্লেখযোগ্য বড়ো কিছু ঘটে না; আমাদেরও ঘটে নাই। আমি একবার ফেল, একবার পাশ করিয়াছি, আর একবার কী করিব তাহা দৈবের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছি; যদুগোপাল বাবুর চার টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং আর একটা বৃদ্ধি আসন্ন হইয়াছে।...

রাণুর বয়স দশ, আমার সতেরো।—

রাণু আমার পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া আমার পাঠ্যপুস্তকের নেলসনের মৃতদৃশ্যের উপর আঙুল রাখিয়া বলিল,— এটা কিসের ছবি, কানুদা?

...যুদ্ধের ছবি। এই লোকটার বুকে গুলি লেগেছে, গুলি খেয়ে সে মরছে।... বলিয়া ডান হাত দিয়ে মরণোন্মুখ নেলসনকে দেখাইয়া দিলাম এবং বাঁ হাত দিয়া রাণুর কটি বেষ্টন করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

চট করিয়া একবার পিছন দিককার দরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রাণু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল,—আর কী কী ছবি আছে দেখাও!

রাণুর ঐ চট করিয়া দরজার দিকে চাহিবার অর্থটা আমার না বুঝিবার কথা নয়—

এবং অক্লেশে তাহা বুঝিয়া ফেলিয়া দশ বৎসরে বালিকার এই অকাল পরিপক্কতায় আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু আমার কী দুর্মতি ঘটিল জানি না, সকৌতুকে হাসিয়া বলিলাম,—ঢের ছবি আছে; কিন্তু আগে তুই বল, তুই ছবি দেখতেই এসেছিস না আর কোনো মতলব আছে?

মনে হইল রাণু এই ঘুরানো কথাটার অর্থ ধরিতেই পারিবে না; তবু পারে কিনা দেখিবার জন্য একটা উৎকণ্ঠাও জন্মিল।

রাণু তৎক্ষণাৎ কথাটার উত্তর দিলো না— খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ চলিয়া যাইতে-যাইতে বলিল,— এসেছিলাম তুমি রসগোল্লার হাঁড়ি নিয়ে বসে আছো তাই শুনে। ছবি দেখা মিছে কথা।

চেঁচাইয়া বলিলাম,— রসগোল্লা খেয়ে যা রাণু।

রাণুও তখন চিৎকার করিয়া বলিতেছিল,— রাধা, পুতুলের একটা বাকশোর একটা টোপ শেলাই করবো, দুপুর বেলা একটিবার আসিস, ভাই।... তাহার চিৎকারে আমার ডাক ডুবিয়া গেলো।

আমার উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হইল, কিন্তু পরাজয়ের একটা অব্যক্ত লাঞ্ছনায় আমি নিবিয়া একেবারে অন্ধকার হইয়া গেলাম।... ব্যাপারটা নিছক কৌতুক, কিন্তু হঠাৎ বিশ্রী হইয়া গেলো।

দুদিন পরে রাণু আসিয়া খবর দিলো... কানুদা আমার বিয়ে।

—বলিস কী?

—হ্যাঁ, সত্যিই। কাল দেখতে আসবে।

বিস্ময়ের কারণ এ সংবাদে কিছুই না। বিবাহরূপ পরিবর্তন বাঙালির জীবনে নিত্য ঘটিতেছে— কাহারও অল্প, কাহারও বেশি, কাহারও মধ্য বয়সে। রাণুর না হয় দশম বৎসরেই সেই সাধারণ পরিবর্তনটা ঘটিয়া যাইবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম,— কোথায়?

—তা জানিনে। বাবা-মা ভারি ব্যস্ত। কতরকম খাবার তৈরি হচ্ছে। খেয়ে এলাম।

জিহ্বায় জল আসিল— পুলকিত কণ্ঠে বলিলাম,— নিয়ে আয় কিছু, আমিও খাই।

—আনছি। বলিয়া রাণু চলিয়া গেলো।

আঁচলের আড়ালে লুকাইয়া একটি বাটি আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া ঠেলিয়া দিয়া রাণু কহিল,— খাও।

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। সে মুখে বলিল 'খাও' কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে আহ্বানের বাষ্পমাত্রও ছিলো না, বরং বিরুদ্ধ দিকেই যেন একটা ধাক্কা অনুভব করিলাম।... হঠাৎ এ রাগ কেন?

যখন সে যায় তখন তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখি নাই; কিন্তু এখন লক্ষ করিলাম, রাণুর মুখাবয়বের প্রত্যেকটি রেখা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

রাণু বলিল,— খাচ্ছো না যে?

কণ্ঠস্বর কর্কশ শুনাইল।

—তুই রাগ ক'রে দিলি কেন? রাগ ক'রে খাবার ঠেলে দিলে কেউ খেতে পারে?

রাণু উত্তর দিলো না।

একটু মুচকি হাঁসিয়া বলিলাম, চুরি ধরা প'ড়ে গেছে বুঝি?

—চুরি করিনি, চেয়ে এনেছি।

—তবে বামুনকে খেতে দিতে রাগ করলি কেন?

—রাগ কই করলাম? বললাম খাও।

আমি তাহার দিকে বাটিটা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

আমারও রাগ হইয়াছিল।... এতো ভুরু কোঁচকানো কিসের?...

উঠানে একটা কুকুর শুইয়াছিল—

রাণু দ্রুতপদে নামিয়া যাইয়া তাহারই সম্মুখে সেই দুধ, ক্ষীর, ছানা, সরের মিষ্টান্নগুলির বাটিসুদ্ধ উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বাড়ি চলিয়া গেলো।...

পূর্বে যে আড়ির কথা বলিয়াছি, এই ঘটনায় তাহার সূত্রপাত।—

রাণুর রূপ-গুণের পরীক্ষা হইবে—

দেখিতে গেলাম।—

প্রথমেই দৃষ্টি পড়িল ধোঁয়ার আড়ালে লুকানো-মুখ একখানি দেহের উপর...

ধূমাকর্ষণের আর বিরাম নাই... নিরবচ্ছিন্ন ধূমপটল, এক সময় সরিয়া যাইতেছে দেখিলাম, কাঁচা-পাকা মোটাসোটা প্রৌঢ় একটি ভদ্রলোক হাত বাড়াইয়া রাণুর বাবার হাতে হুঁকা দিতেছেন।—

বারান্দায় একটা মাদুর বিছানো হইয়াছে; তাহারই উপর রাণুর বাবা কন্যার পিতার মতো সবিনয়ে, বরের যে-ই হোন, তিনি বরপক্ষীয় কর্তাব্যক্তির মতো মাথা উঁচু করিয়া বসিয়া আছেন; এবং আমারই বয়সী একটি ছোঁড়া অধোমুখে মাদুরের বয়ন-কৌশল প্রাণপণে নিরীক্ষণ করিয়াও দেখা শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বুঝিলাম, এটা দূত, পাত্রকে গোপনে কনের রূপের কথা শুনাইবে।—

পাত্রপক্ষীয় সেই কর্তাব্যক্তি বলিলো,— মেয়ে পছন্দ হবেই। যেমন শুনেছি ঠিক তেমনটি যদি না-ও হয় তবু আপনার মেয়ে সুন্দরীই।

যদুগোপাল বাবু বলিলেন,— মায়ের আমার স্বাস্থ্যও খুব ভালো।

—হবেই তো, একটিমাত্র সন্তান ঐ মেয়েটি, খাইয়েছেন দাইয়েছেন ভালোই। দেশের মেয়েরা তো না খেতে পেয়েই আকারে ছোটো হ'য়ে যাচ্ছে। তাদের যে সন্তান হচ্ছে তারাও আকারে ছোটোই হচ্ছে। বলিয়া ভগোদামের মতো তিনিও যেন আকারে কিছু ছোটো হইয়া গেলেন।

যদুগোপাল বাবু নিঃসংশয়ে বলিলেন,— যে আজ্ঞে, তাতে কি আর সন্দেহ আছে! আমার তো মনে হয়, ছোটো হ'তে-হ'তে একদিন বাঙালি ব'লে কোনো জাত পৃথিবীতে থাকবে না...

আমার কিন্তু হাসি পাইতে লাগিল—

কন্যাদায় বিপদ নিশ্চয়ই; এই কনে দেখাদেখির ব্যাপারটা সমগ্র কন্যাদায়ের অংশ হইলেও, উদ্ধারটা প্রধানত উহারই উপর নির্ভর করে বলিয়া ঢের বেশি জাগ্রত।... উৎকণ্ঠায়-আশঙ্কায় বুক ঢিপঢিপ করিতে থাকে— কন্যার পিতা একবার কন্যার মুখাবলোকন এবং একবার পরীক্ষকের মুখাবলোকন করিয়া একবার দেখেন কন্যার শ্রী, একবার অন্বেষণ করেন পরীক্ষকের প্রীতি।... স্বর্ণপ্রতিমার সহিত যে-কন্যার রূপের উপমা চলে সেই কন্যার পিতার পরমাত্মাও এই সময়ে শুকাইয়া উঠিয়া দুলিতে থাকে; অথচ জীবনের ট্র্যাজিডি এমনি উৎকট যে, ঠিক এই সময়টিতেই, মন যখন টাটায় তখন মনের সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন রাখিয়া তোশামোদকে বিনিময়ের বেশে বাহির করিয়া বহু মিষ্টকথা উচ্চারণ করিতে হয়। ব্যাপারটা কষ্টের হইলেও ভিতরে-ভিতরে হাস্যকরই।—

সে যা-ই হোক, কর্তা বলিলেন,— পুরুষদেরও সেই কথা। তারাও কি পেট ভ'রে খেতে পায় ভেবেছেন? হুঁ।

যদুগোপালবাবু পূর্বে এ-বিষয়ে কিছু ভাবিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু বাঙালি পুরুষদের আধপেটা দুরবস্থার বার্তা কর্তার মুখে যেন হঠাৎ এই প্রথম পাইলেন এমনি বিস্ময়ে তাঁর চোখ খুব ভড়া হইয়া উঠিল; বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন,— আজ্ঞে না, বিস্তর পুরুষ আছে যারা বারোমাসই একরকম...

বোধহয় বলিতে যাইতেছিলেন, অনাহারে কাটায়।

কিন্তু কর্তা তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দিলেন না; বলিলেন,— বেলা বেড়ে যাচ্ছে, বেশি সাজগোজের দরকার নেই, বাড়িতে যেমন থাকে তেমনি আনতে বলুন।

যদুগোপালবাবু এবার বাঙালি পুরুষ সাধারণের দুরবস্থার সঙ্গে নিজের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া আরও ম্রিয়মাণ হইয়া কহিলেন— গরিবের ঘরের মেয়ে সাজগোজ কোথায় পাবো যে তাকে সাজাবো, বেয়াই!— তারপর কণ্ঠস্বর উচ্চতর করিয়া বলিলেন, ঝি, হ'লো তোমাদের?

ঘরের ভিতর হইতে উত্তর আসিল— হয়েছে।

বেয়াই— ইনি তবে পাত্রের পিতা স্বয়ং।

একটু পরে ঝি হাত ধরিয়া রাণুকে চৌকাঠের ধারে আনতেই সেইদিকে চাহিয়া আমার মুখ দিয়া সহসা বাহির হইয়া গেলো— বাঃ।

শাদা শেমিজের উপর লাল চওড়া পেড়ে একখানা কাপড় পরনে লাল একটা রেশমি ফিতা দিয়া মাথার মাঝখানটা বাঁধা, কপালের উপর চুলের পাতা, পায়ে আলতা, দুই ভ্রুর মাঝখানে ছোট্টো একটি কালো টিপ;— পরীক্ষা দেবার উপযোগী বেশ পরিপাট্য রাণুর মাত্র এইটুকু,—

কিন্তু এই নিতান্ত সাধারণ বেশেই রাণুর রূপ অসাধারণ নূতন মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া আমার চোখে পড়িয়া গেলো।

রাণুর মুখের উপর হইতে চোখ ফিরাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া যদুগোপালবাবুর বেয়াই বলিলেন— বাঃ-ই বটে।... এসো, মা, এসো ব'সো। বলিয়া সম্মুখস্থ খালি স্থানটিতে হাত রাখিলেন।

ধীরে-ধীরে নামিয়া আসিয়া রাণু তাঁহার সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়া বসিল; ঝি পাশের দিকে মুখ করিয়া তাহার গা ঘেঁষিয়া বসিল।

কিন্তু আমার বুকের ভিতরকার বাকস্ফূর্তি যেন অকস্মাৎ অবরুদ্ধ হইয়া গেলো... বহুদূরের কুজ্ঝটিকার আবরণ যেমন দেখায় তেমনি একটা অনির্দেশ্য অস্পষ্ট ইচ্ছায় আমার মনের আকাশ ধীরে-ধীরে আবিল হইয়া উঠিতে লাগিল।

হঠাৎ চমক ভাঙিয়া শুনিলাম, বেয়াই বলিতেছেন, আপনার মেয়ে সুলক্ষণা এবং সুন্দরী বটে; সচরাচর এমনটি চোখে পড়ে না। রূপের খ্যাতি যেমন শুনে এসেছিলাম তার শতগুণ বেশি রূপবতী আপনার মেয়ে... কানে শুনে এ-রূপ ধারণা করা যায় না। এ-মেয়ে আমি নেবো। বলিয়া রাণুর হাত দুখানি তুলিয়া ধরিলেন।

যদুগোপালবাবু বলিলেন,— আপনার অগাধ দয়া।

—দয়া নয়, গরজ। আপনার মেয়ের অদৃষ্টে আমার ছেলে রাজা হবে।

যদুগোপাল বাবু হাসিলেন।

কিন্তু হাসিলেন বলিলে যেন ঠিক হয় না; বেয়াইয়ের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের টানে তাঁহার প্রাণের আনন্দ ও গর্ব যেন এক ঝলক উথলিয়া পড়িল।

আমিও মনে-মনে সর্বান্তঃকরণে কর্তার উক্তির সমর্থনই করিলাম। রাণুকে যে বিবাহ করিবে সে যে রাজ্যেশ্বরের মতোই ভাগ্যবান, এবং দুটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সে যে রাজৈশ্বর্যই গৃহে লইয়া যাইবে তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই।—

যদুগোপালবাবু কিছুক্ষণ ইতস্তত এদিক-ওদিক করিয়া পণের কথাটা তুলিয়া ফেলিলেন; বলিলেন— বড়ো দরিদ্র আমি, শুধু মেয়েটিকেই নিয়ে ব'সে আছি; তাকে কী দিয়ে বিদায় দেবো সে সংস্থান—

যদুগোপালবাবু যেন কত বড়ো একটা লজ্জাকর শ্রুতির অযোগ্য কথা কহিতে শুরু করিয়াছেন এমনি শশব্যস্তে বেয়াই জিব কাটিয়া বসিলেন; বলিলেন,— সর্বনাশ! অমন কথাও বলবেন না। স্বয়ং মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে যাবো, তিনিই আমার ঘর ধনে-পুত্রে পূর্ণ ক'রে তুলবেন। আপনার দু-এক হাজারের ওপর আমার লোভ নেই।

শুনিয়া, কেন জানি না, আমারই চোখে জল আসিল।

এই দুঃসহ সুসংবাদটা যদুগোপালবাবুর একেবারেই অপ্রত্যাশিত।... যদুগোপালবাবু স্থিরদৃষ্টিতে মিনিটখানেক বেয়াইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আচম্বিতে তাঁহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন।—

বেয়াইয়ের এ-বিপদটাও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

নিজের কথার ফলে এ-হেন সঙ্কটে পড়িতে হইবে জানিলে তিনি বিনা পণে রাজলক্ষ্মী ঘরে তুলিবার শুভ-ইচ্ছাটা মুখোমুখি না বলিয়া বোধ করি ডাকযোগেই জ্ঞাপন করিতেন।— মোটা মানুষ, তাহার উপর পায়ের উপর আস্ত একটা মানুষ উপুড় হইয়া পড়িয়া— সহসা পিছে হটা বা উঠিয়া দাঁড়ানো বেয়াইয়ের সাধ্যাতীত; সে চেষ্টাও তিনি করিলেন না।... যদুগোপালবাবুর দুই কাঁধ তিনি দুই হাতে ধরিয়া পায়ের উপর হইতে তাঁহাকে একরকম ঠেলিয়াই তুলিয়া দিলেন; অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন,... বেয়াই, এ কী কাণ্ড আপনি ক'রে বসলেন, মেয়ের সামনে আপনি আমাকে লজ্জা কেন দিলেন, চোখে আপনার জলই বা কেন?

—রাণুর মুখের দিকে চাহিলাম—

তার রাগ দেখিয়াছি, কান্না দেখিয়াছি, অবাধ্যতা দেখিয়াছি, চঞ্চলতা দেখিয়াছি—

কিন্তু লজ্জা দেখিলাম এই প্রথম—

রঙের এই লীলাপুলক।

নিম্নের সকল বাষ্পাচ্ছন্নতা অস্পষ্টতার ঊর্ধ্বে সদ্যোত্থিত সূর্যের শোণিতাভা শৈলশীর্ষে যেমন—

তেমনি করিয়া রাণুর এই প্রথম লজ্জার রক্তরাগ আমার অন্তরায়তনের সর্বোচ্চ স্থানটি দীপ্ত করিয়া স্পর্শ করিয়া রহিল।

...এ-কাণ্ড কেন করিলেন, মেয়ের সামনে বেয়াইকে কেন লজ্জা দিলেন, তার চোখেই বা জল কেন?... যদুগোপালবাবু এ প্রশ্নত্রয়ের একটিরও উত্তর দিলেন না; বেয়াইয়ের ঠেলায় খাড়া হইয়া বসিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন,— আমার মেয়ের বড়ো সৌভাগ্য যে আপনার মতো মহাপুরুষের ঘরে সে যাবে। রাণু, তোমার শ্বশুরকে প্রণাম করো, মা।

রাণুর চোখের পক্ষ্মরাজির সূক্ষ্ম কৃষ্ণ রেখাটা শুধু দেখা যাইতেছিল—

এইবার সে চোখ তুলিয়া ভাবী শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিল; তারপর চোখ নামাইয়া হাত বাড়াইয়া অত্যন্ত ধীরে-ধীরে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করি। তিনি বিড়বিড় করিয়া অস্পষ্ট ভাষায় রাণুকে বোধহয় আশীর্বাদ করিলেন; এবং ঝিকে বলিলেন,— মাকে ধরে নিয়ে যাও, দেখা শেষ হয়েছে।

ঝি রাণুর হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলো।... তার পিঠের উপর এলানো চুল বাতাসে একবার দুলিয়া উঠিল... পায়ের আলতার আভা চোখে পড়িল... একটা মিষ্ট গন্ধ নাকে গেলো।...

সবই বুঝিলাম, কেবল বুঝিলাম না ইহাই যে শুধু 'মিষ্টিমুখ' করিতে বসিয়া যদুগোপালবাবুর বেয়াই এতো মিষ্টান্ন গহ্বরস্থ করিলেন কেন— সেই দূতটাও গিলিল অনেক।

বোধহয় বাপ-মায়ের আদেশেই রাণু বাড়ির বাহির হওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া দুর্লভদর্শন হইয়া উঠিল। তা উঠুক...তিনমাস পরেই যে-মেয়ে শ্বশুরালয়ে যাইবে তাহার নৃত্যপরায়ণতা মানায় না।...

কিন্তু মাঝখান হইতে আমি তাহার চক্ষুশূল হইয়া উঠিলাম কেন।... অনেক ভাবিয়াও কারণটা ঠিক করিতে পারি না।... কথা বলা একদম বন্ধ করিয়া দিয়াছে; দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়— যেন আমার সঙ্গে তাহার মুখ চিনাচিনিও নাই।... একদিন দৈবাৎ তাহাকে হাতের কাছে পাইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলাম; তাহাতে সে হঠাৎ এমনই গর্জন করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল যে, আমি সাত তাড়াতাড়ি তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া পলাইবার পথ পাই নাই।...

বাঙালির মেয়ে শিশুকাল হইতেই বিবাহের কথায় লজ্জা পায়—

বিবাহের পাত্র স্থির হইয়া গেলো, তা সে যতো ছোটো মেয়েই হোক না, কেমন ভারভারতিক ভাব ধারণ করে।... আমি এখন রাণুর কাছে পরপুরুষ, রাণু তাই আমাকে লজ্জা করিতেছে; এবং সেদিনকার সেই মিষ্টান্নঘটিত ব্যাপারে অপমান বোধ করিয়া সে রাগ করিয়া আছে তাহা নহে।... লজ্জা রাগ এক কথা, বিরাগভরে পরিহার করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা— একটিকে অন্যটি বলিয়া ভুল করা অসম্ভব।... রুষ্ট মুখে মিষ্টান্ন দিলে তাহা প্রত্যাহার করা ন-দশ বৎসরের বালিকার বিরুদ্ধে এতো বড়ো অপরাধ নহে যে তাহা সে ভুলিতেই পারে না... যাহা হউক, রাণুকে একগুঁয়ে বলিয়া মনে-মনে গালি দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, সে আগে কথা না বলিলে আমিও যাচিয়া কথা বলিতে যাইব না।—

বিনা পণে কন্যার বিবাহ—

যদুগোপাল বাবুর এতোখানি সৌভাগ্যের সংবাদে তাঁর আত্মীয় প্রতিবেশী শুভার্থীদের আহ্লাদে চোখ কপালে উঠিয়া যাওয়া ছাড়া তার আর একটি ফল হইল ইহাই যে, যাঁহারা কন্যার পিতা তাঁহারা আশা করিতে লাগিলেন, দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে— কন্যার বিবাহের পর তাঁহাদের আর কৌপীন ধারণ করিতে হইবে না।—

এই সময় রাণু একদিন আমার সঙ্গে যাচিয়াই কথা কহিল।

—কানুদা, তুমি নাকি আমার বিয়েতে পদ্য লিখবে?

দুর্দৈব ঘটিবেই, কাজেই ঠিক মুহূর্তেই আমি প্রীতি-উপহারকে আরও উপদেশপূর্ণ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটা লাইন কাটিয়া পরিবর্তে নূতন লাইন যোজনা করিতেছিলাম।

কাগজের উপর চোখ রাখিয়াই বলিলাম,—

—কী লিখেছো পড়ো দেখি শুনি।

একটু গর্বিত ভাবেই পড়িলাম।—

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, স্বদেশ, শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী প্রভৃতি গুরুজন; দেবর, ননদ, দাস-দাসী, সমগ্র মানবজাতি এবং গৃহপালিত পশু-পক্ষীর প্রতি নারীর কর্তব্য, কিছুই আমার পদ্যে বাদ পড়ে নাই; অপরিচিত ও বিপদসঙ্কুল সংসার-কাননে

প্রবেশোদ্যত নবদম্পতির মস্তকে করুণা ও আশীর্বাদ বর্ষণ করিতে ভগবানকে সানুনয়ে আহ্বান করিয়া প্রীতি-উপহার শেষ করিয়াছি।—

পড়া শেষ করিয়া কাগজখানি পরম মমতার সহিত টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিতেছি— এমন সময় রাণু ছোঁ মারিয়া কাগজখানা টানিয়া লইয়া বোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেলো।... চেঁচাইতে-চেঁচাইতে প্রীতি-উপহারের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া যখন রাণুদের বাড়িতে ঢুকিলাম তখন রাণু রান্নাঘর হইতে বাহির হইতেছে।

হাঁকিয়া বলিলাম,— আমার কাগজ দে।

রাণু আঙুল তুলিয়া রান্নাঘরের ভিতরটা দেখাইয়া দিয়া সরিয়া গেলো।—

রাণুর মা রান্নাঘরের ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন— কী রে, কানু?

আমি বলিলাম,— আমি উপহার লিখেছিলাম; রাণু নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

—ওমা, তাই বুঝি জ্বলন্ত উনুনে দিয়ে গেলো। এমন হতভাগ মেয়েও তো জন্মে দেখিনি।—

ক্রন্দন দমন করিতে করিতে চলিয়া আসিলাম; দুর্জয় ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল।— প্রীতি-উপহার নিজের নাম সংবলিত করিয়া ছাপাইয়া বিতরণ করিতে পারিলাম না বলিয়া আমার আদৌ দুঃখ হইল না; ক্ষোভে-দুঃখে আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল ইহাই যে, এতো শ্রম এতো চিন্তার ফল রচনাটিকে নিষ্প্রয়োজনে সে এমন নৃশংসভাবে নষ্ট করিয়া ফেলিল।... সাত দিনের দিন পদ্যটি খাড়া করিয়াছিলাম,— কতো কাটিয়া-ছাঁটিয়া কতোবার নকল করিয়া তবে তাহাকে মনের মতো করিয়া তুলিয়াছিলাম... ভাবিতে-ভাবিতে কতোবার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে— দিনে দুশোবার পড়িয়াও তৃপ্তি হয় নাই,— সেই পদ্য কিনা আগুনে দিয়া পুড়াইল।... নিজের মাথা হইতে শব্দ বাহির করিয়া ছন্দ মিলাইয়া পদ্য লেখা এই আমার প্রথম— আমার আদিতম মানস-তনয়াকে লইয়া সে এ কী করিল। তাহাকে জ্বলন্ত উনানে ঠেলিয়া দিয়া পুড়াইল।... শোকাগুনে আমি পুড়িতে লাগিলাম।—

রোশনচৌকি বাজিতেছে—

আজ রাণুর বিবাহ।

সেদিন রাণুর সঙ্গে রাজৈশ্বর্যের উপমাটা দৈবাৎ মনে আসিয়াছিল।...

আজ সেইটাই যেন খচখচ করিয়া কোথায় বাঁধিতে লাগিল— একটা আপশোসের মতো।—

রাণু ঘোমটা টানিয়া শ্বশুরবাড়ি গেলো; আমি বাকশো-বিছানা বাঁধিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিলাম।

রাণু পিত্রালয়ে আসে, আমিও বাড়ি আসি।...

কিন্তু বলিবার মতো কিছু ঘটে না।...

যেদিন ঘটিল, সেদিন অপূর্ব অননুভূতপূর্ব একটা অসামান্য অনুভূতির অতিশয় বেগবান হিল্লোলে আমি সহসা পূর্ণ হইয়া গেলাম— শুষ্ক নদী যেমন বন্যার জলে দেখিতে-দেখিতে পূর্ণ হইয়া যায়।... সুপ্তোত্থিত স-বসন্ত রতিপতি কখন আসিয়া উঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছিল টের পাই নাই—

সহসা সে সিংহদ্বার খুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল—

এবং সেই মুহূর্তেই আমার উল্লসিত চোখের সম্মুখে জলস্থল অন্তরীক্ষে একটা লোহিত মায়াঞ্জন ব্যাপ্ত হইয়া গেলো।...

রাণু আমাকে দেখিতে পায় নাই—

আমিই তাহার জ্বলন্ত রূপ আর দুরন্ত যৌবনের দিকে চাহিয়াছিলাম,— নেত্রে সেই উন্মত্ত সম্ভোগ জীবনের প্রতিদিনের বস্তু নয়, চোখের পলক পড়িতে চাহে নাই।...

ঘটনা আমাদের বাড়িতেই—

যখন দৈবাৎ এক সময়ে তাহার সঙ্গে আমার দৃষ্টির মিলন হইয়া গেলো, তখনই রাণু লাল হইয়া উঠিয়া শশব্যস্তে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলো।— অন্তরের তৃষ্ণার্ত কলুষ অগ্নি-তুরঙ্গের মতো আমার বুক জুড়িয়ে গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল।—

রাণুর বয়স এখন চৌদ্দ—

কিন্তু অতুলনীয় প্রচুর স্বাস্থ্যের প্রভাবে সে ঐ বয়সেই কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণ-যৌবনের মধ্যাহ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—

দুদিন পরেই রাণুর সঙ্গে দুই বাড়ির যাতায়াতের পথে দেখা হইল। আমাকে দূর হইতে দেখিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল... যেন ফিরিয়া যাইবে—

কিন্তু তার বদলে সে আঁচল তুলিয়া মুখ আড়াল করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।—

পাশ দিয়া যাইতে-যাইতে মুখে বলিলাম,— আমি কানু।

কিন্তু মনের ভিতর যে কাণ্ড চলিতে লাগিল তাহার মূর্তি ঝটিকাহত সিন্ধুর মতো—

রাণু বলিল,— তা জানি! তুমি আমার মুখ দেখবার যোগ্য নও। বলিয়া সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেলো।

ঘটনার সূত্র ধরিয়া কথার অর্থ ঠিকই বুঝিলাম,কিন্তু বিদ্ধ হইয়া অভিমান করিতে পারিলাম না।... তাহাকে নূতন চক্ষে দেখিয়া অবধি বুকে যে ঝড় উঠিয়াছিল, ক্রোধ-অভিমানের সাধ্যই ছিলো না তার মধ্যে মাথা তোলে।...

অন্তরলোকের জ্যোতির্মঞ্চের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, নিঃসঙ্গ দুটি গ্রহের মতো সে আর আমি।

এতো খবর রাণু জানে না।—

রাণু স্বামীর ঘর গেলো।

...কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন মৃত্যু ক্ষুধিত রাক্ষসের মূর্তিতে দেখা দিয়া নর-নারীগুলিকে যেন দুই হাতে মুখে তুলিয়া অবিরাম গ্রাস করিতে লাগিল।... ক্রন্দনে হরিধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হইয়া গেলো... শববাহকের মুখে হরিধ্বনি, পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে হরিধ্বনি, দলবদ্ধ লোকের মুখে হরিধ্বনি... কিন্তু হরি ঠাকুর ভয়ার্ত জীবিতের আকুল আহ্বানে কর্ণপাতও করিলেন না—

লোক মরিতেই লাগিল।

মহামারী আরম্ভ হইবার সপ্তম দিনে রাণুর পিতা ও মাতা মাত্র বারো ঘণ্টার ব্যবধানে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।—

রাণুকে দুঃসংবাদটা দিয়া আমরা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলাম।

দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি।

ছয়মাসে শ্মশান আবার লোকালয়ের আকার ধারণ করিয়াছে।

বাবা রাণুকে তাহাদের ঘর-বাড়ির একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য পত্র লিখিলেন।

রাণু লিখিল, বাড়ি বেচিয়া ফেলুন।

সেদিন আমিও একখানা পত্র পাইলাম; দেখিয়াই চিনিলাম, ঠিকানা লেখা রাণুর।— লিখিয়াছে—

'কানুদা, তোমার সঙ্গে জীবনে আর দেখা হইবেই না, জীবনে ইহাই আমার সকল দুঃখের বড়ো দুঃখ।

দুটি দিনের কথা তোমার মনে পড়ে?... যেদিন রাগ করিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া খাবার খাও নাই, আর যেদিন তোমার প্রীতি-উপহারের কাগজ আগুনে ফেলিয়া দিয়েছিলাম? কারণ কী, তুমি নিশ্চয়ই জানো না। শুধু এইটুকু জানিয়া রাখো, তোমার সে-উল্লাস আমার সহ্য হয় নাই।— তুমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্রাণী; আমার প্রণাম গ্রহণ করো। ইতি— রাণু।'

২

রাণুর পত্র পড়িয়া শূন্যের দিকে চাহিয়া আমার দৃষ্টি নিষ্পলক হইয়া গিয়াছিল—

অবাক মন দিশা পায় নাই। কিন্তু অদৃষ্টে ছিলো রাণুর সঙ্গে আবার দেখা হইবে।

রাণুর স্বামী বদলি হইয়া আমাদের দেশে রাণুরই হস্তান্তরিত বাড়িতে ভাড়াটে হইয়া আসিল।

রাণু প্রথমটা কান্নাকাটি করিয়া আমার স্ত্রীর সখিত্বে সুস্থির হইলে দেখিলাম, রাণু ইন্দিরাকে একান্ত সন্নিকটে টানিয়া লইয়া আমাকে তার রাজ্য হইতে একেবারে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছে।

আশা করিয়াছিলাম, অন্ততপক্ষে কানুদা বলিয়া ডাক দিয়া রাণু আমার পায়ের ধুলা লইয়া যাইবে; কিন্তু আসিল না।

ইন্দিরা বলিল,— রাণুর ছেলেটি বড়ো সুন্দর হয়েছে।

—হবারই তো কথা; ওরা দুজনেই সুন্দর।

—ছেলেটাকে আমায় দেবে বলেছে।

ইন্দিরার পক্ষ হইতে ছেলে চাওয়া অস্বাভাবিক নয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, চেয়েছিলে বুঝি?

—না, না, চাইবো কেন! সে-ই বললে, বউ আমার ছেলেটা তুই ...

—বেশ দয়ালু তো!

হঠাৎ ইন্দিরা লাল হইয়া উঠিল। তাহার এই চমৎকার লজ্জা দেখিয়াই মনে পড়িয়া গেলো, আমার শেষ কথাটার অর্থ বহুদূর যায়।... পুত্রবর্তী হইবার আশা একেবারে ত্যাগ করিয়া না বসিলে রাণুর দানে দয়ার কথাটা আসে না।... কিন্তু ইন্দিরার বয়স সবে পনেরো।

জিজ্ঞাসা করিলাম,— ছেলের নাম কী?

—বেণু।

মনে-মনে আবৃত্তি করিলাম, কানু—বেণু। কেন জানি না, ছেলের নাম বেণু রাখা এবং ব্যাপার বেনামিতে নিষ্পন্ন করিয়া তাহাকে আমার ক্রোড়ে অর্পণ করিবার অসত্য প্রস্তাবের একটা গভীর নিহিত অর্থ ও অভিসন্ধি যেন ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

হয়তো আমার কল্পনা অমূলক—

হয়তো চিন্তা ও ইচ্ছা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য—

কিন্তু ভ্রান্তির মাঝে জন্মলাভ করিয়া হর্ষের যে-কম্পন প্রাণের উপর দিয়া শিরশির করিয়া বহিয়া গেলো তাহা পরম তৃপ্তির সঙ্গেই উপভোগ করিলাম; সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাইতে কোথাও টান পড়িল না।—

বেণুর মুখের দিকে চাহিয়া ইন্দিরা বলিল, দুটি দাঁত উঠেছে মুক্তোর মতো নেবে কোলে?

—দাও। বলিয়া হাত বাড়াইতেই বেণু নির্বিবাদে আমার কোলে আসিল।

ইন্দিরা হাসিয়া বলিল,— বেশ আলাপী।

কথাটা কানে গেলো, কিন্তু মন তখন অন্যদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে.. তাহারই অঙ্গবিচ্যুত এই শিশু—

তাহারই সুনিবিড় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির এই বিগ্রহ—

তাহারই প্রাণের স্পন্দন দেহের বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত রক্ত, হৃদয়ের আনন্দ-রস স্থানান্তরিত হইয়া আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আছে।...

মুখ তুলিয়া দেখিলাম, ইন্দিরা বেণুর দিকে অত্যন্ত লালসার চক্ষে চাহিয়া আছে; আমি চোখ তুলিতেই ইন্দিরা একটু হাসিয়া

সরিয়া গেলো,— আমারও চক্ষে লালসা ছিলো, কিন্তু দুটিতে এমনি অমিল যেন হাসি আর কান্না।

বেণুর চোখের দিকে চাহিলাম...

ঠিক তেমনি চক্ষু দুটি; কোথায় প্রভেদ কোথায় নয়; মিল অমিলের কোথায় সন্ধিস্থল সে-বিশ্লেষণ নিমেষেই অতিক্রম করিয়া আমার দৃষ্টি সেই দৃষ্টির নীল পারাবারে ডুবিয়া গেলো।

...সহসা মনে হইল, আমি যেন অপূর্ণ; জীবনের অর্ধাংশ বিচ্ছিন্ন কক্ষচ্যুত হইয়া আমাকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছে...সর্বত্রই ঐক্য, শান্তি; কেবল কী হইলে কী হইত ইহারই একটা অস্থির উত্তপ্ত কল্পনা আমার একটা দিক যেমন শুষ্ক বেদনাময় করিয়া তুলিয়াছে, অন্য দিকে একটা দুরুদুরু শঙ্কারও শেষ নাই— পাছে এই বেদনা অসাড় হইয়া একদিন মনে নিরাশার লোল স্থবিরত্ব আসিয়া যায়।...

ইন্দিরা আসিয়া অস্থির হইয়া গেলো— ছেলে কোলে করার রকম ঐ নাকি?

বেণুকে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলাম,— রকম দুরস্ত হ'য়ে আসবে; যতোদিন তা না হয় ততোদিন পরের ছেলে একটু অসুবিধা ভোগ করলই বা।

একটা ধমক খাইলাম।—

...আমার অন্তর্গূঢ় সুখের শত্রু হইয়া উঠিল, ঈর্ষা। থাকিয়া-থাকিয়া বুক টনটন করিয়া চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে, আমার নিজেরই ধিক্কানিত জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া একটা ছবি—

রাণু পরস্ত্রী—

... এই জ্ঞানটা অনায়াস সুখ-সমাদরের সঙ্গে মনে-মনে লালন করিবার বস্তু নয়—

অনিবার্য অঙ্কুশ-তাড়না যেন ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে চায়।

ইন্দিরা একটা নূতন খবর দিলো— রাণুটা একটা পাগল।

—মানে?

—বলে, আয় বৌ, তুই আর আমি এক হয়ে যাই।

—পাগলের লক্ষণই বটে। তুমি কী বললে?

জিজ্ঞাসা করিলাম, ইন্দিরা কী একটা উত্তরও দিলো—

কিন্তু ইন্দিরা তখন তাহার শব্দ-স্পর্শ লইয়া আমার সম্মুখ হইতে একেবারে মুছিয়া গেছে...

সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চের কণ্টকোৎসব জাগাইয়া আনন্দের সুতীব্র শিখা আমার স্নায়ু-শিরায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে।...

কতক্ষণ এই উদ্বেলিত আনন্দে মুহ্যমান হইয়াছিলাম, কী করিয়াছিলাম জানি না।—হুঁশ ফিরিলে দেখিলাম ইন্দিরা অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে।... একটু হাসির আমদানি করিয়া বলিলাম,— কী বলছিলাম যেন?

ইন্দিরা বলিল,— তুমি কিছু বলছিলে না, আমিই বলছিলাম যে— বলিয়া হঠাৎ থামিয়া সে উঠিল দাঁড়াইল।

ইন্দিরার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম,— উঠলে যে? হঠাৎ রাগ হ'লো কিসে?

—রাগ হয়নি, কিন্তু তোমার মতো অন্যমনস্ক লোকের সঙ্গে কথা বলাই বালাই।

—আচ্ছা, এবারকার মতো মাপ করো।... রাণু পাগলের মতো কী কথা কয়েছে, তুমি তাতে কী বললে?

ইন্দিরা সমগ্র ব্যাপারটা কী ভাবে গ্রহণ করিল সে-ই জানে, সহজ কণ্ঠেই বলিল, 'আমি বললাম, পারো হও। কিন্তু একজনকে তাহলে বৌ খোয়াতে হবে।'— রাণু বললো 'কানুদাকে জিগ্যেশ করিস সে খোয়াতে রাজি আছে কিনা।'

—মোটেই না। বলিয়া ইন্দিরাকে আলিঙ্গন করিতে হাত উঠি-উঠি করিয়াই থামিয়া গেলো। বলিলাম, 'বসন্তবাবুর সঙ্গে একটা আপোস ক'রে নিতে পারলে একরকম বন্দোবস্ত করা যায়।...'

কিন্তু হঠাৎ ইন্দিরার উৎসাহ যেন নিবিয়া গেলো।

ছ-মাস কাটিয়াছে।

টেলিগ্রামে বসন্তবাবুর বদলির খবর আসিয়াছে।

রাণুর সঙ্গে এতোদিন মুখোমুখি দেখা হয় নাই। আমাদের বাড়িতে সে আসে নাই।

ইন্দিরাকে বলিয়াছে, 'বড়ো ঝামেলা, ভাই; গল্প জমে না।' ইন্দিরাকে সে ডাকিয়া লইয়াছে।...

যাইবার আগের দিন রাণু আমাদের বাড়িতে আসিল।... ছেলেটিকে ইন্দিরার কোলে দিয়া আমার পায়ের কাছে একটা প্রণাম রাখিয়া কহিল,— 'কানুদা কাল আমরা যাবো। তোমার বৌ আজ রাত্তিরে আমার কাছে শোবে। বৌটি বড়ো ভালো মানুষ।'

আমি বলিলাম,— ভালোমানুষ বৈকি। বলিয়া রাণুর দিকে চাহিয়া হাসিব কি ইন্দিরার দিকে চাহিয়া হাসিব তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আইনের পুস্তকের দিকে চাহিয়াই একটু হাসিলাম।...

—রাজি তো?

নিজেরই চমকানো দেখিয়া বুঝিলাম অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম।

—কিসে?

ইন্দিরা বলিল— ঐ রকমই, কথায়-কথায় অন্যমনস্ক।

রাণু বলিল,— ঐ যে বললাম, বৌ রাত্তিরে আমার কাছে শোবে। আর তো দেখা হবে না...

কণ্ঠস্বর গাঢ় শুনাইল।

বলিলাম,—আচ্ছা।

ইন্দিরা বলিল,—যা বলেছি ঠিক তাই।

—কী?

—রাণুটা একটা পাগল।

—আবার কী বললে?

ইন্দিরা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—কে জানত...

বলিয়া থামিয়া খুব হাসিতে লাগিল।

আমি নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইন্দিরার হাসি থামিলে জিজ্ঞাসা করিলাম— কথাটা কী?

ইন্দিরা বলিল,— যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া গেলাম।—

ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক রক্ত পূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে।... আমি তৃপ্ত।

৯.২ গল্পকার জগদীশ গুপ্ত

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যখন পালাবদল ঘটেছিল তখন অর্থাৎ বিংশ শতকের প্রথম দিকে জগদীশ গুপ্তের আবির্ভাব। তবে সাহিত্যিকরূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটে একটু দেরিতে। 'বিজলী' পত্রিকায় (ফাল্গুন ১৩৩১) যখন তাঁর

প্রথম গল্প 'পেয়িং গেস্ট' প্রকাশিত হয় তখন তার বয়স ছিল ৩৭ বছর। তার কয়বছর পরে তাঁর প্রথম গল্পসংকলন 'বিনোদিনী' (পৌষ ১৩৩৪) যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স ৪১ বছর।

তবে জগদীশ গুপ্ত যেসব গল্প লিখেছিলেন তা স্বাদে ছিল স্বতন্ত্র। 'অরূপের রাস' গল্পটি পড়লেই তা বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের উপস্থিতি সত্ত্বেও স্বাতন্ত্র্যদীপ্তি ছিল জগদীশ গুপ্তের রচনা। মানুষ এক দুর্নিরীক্ষ ও অজ্ঞেয় শক্তির হাতে ক্রীড়নক মাত্র তা তাঁর অনেক লেখার বিষয়। আর মানুষের অন্তর্নিহিত নীচতা, হীনতা, দেহসর্বস্বতা অথবা গোপন মনোবাসনায় কাতরতা প্রভৃতি বিষয়গুলি বিভিন্নভাবে ও ভঙ্গিতে তাঁর গল্পে প্রকাশিত।

'অরূপের রাস' গল্পে একদিকে আছে মনস্তাত্ত্বিকতা অন্যদিকে আছে প্রেমসম্বন্ধের এক গভীর বিবরণ। এই বিবরণ দানে গল্পকার জগদীশ গুপ্তের অনন্যতা ধরা পড়ে।

৯.৩ গল্পের বৈশিষ্ট্য

'অরূপের রাস' গল্পের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য হল—

(১) সংক্ষিপ্ততা, (২) সাংকেতিকতা, (৩) মনস্তাত্ত্বিকতা।

এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ এমনভাবে ঘটেছে যে অনেক না-বলা কথা এই গল্পে দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়েছে।

সংক্ষিপ্ততা প্রকাশ পেয়েছে ঘটনাবর্ণনায়। ফলে ছোট ছোট সংক্ষিপ্ত ঘটনাগুলো দ্রুত লাফিয়ে লাফিয়ে ঘটে যায়। আর তা পড়ে পাঠকমনে এক অপূর্ব রসসঞ্চার ঘটে। কানুর সঙ্গে রাণুর ছেলেবেলার প্রণয়, বিবাহের পূর্বে ও পরে রাণুর আচরণ কানুর মনে তার অভিঘাত প্রভৃতির অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে এ গল্পে।

এই গল্পে বর্ণিত অনেক ঘটনাই সাংকেতিক। কানুর বউকে নিয়ে রাণুর প্রথম ও শেষ শুতে যাওয়া ও তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সাংকেতিকভাবে এই গল্পের সৌন্দর্য ও রসকে বাড়িয়ে দেয়।

মনস্তাত্ত্বিক গল্পে অন্তর্মনের যে ছবি ফুটিয়ে তোলা হয় জগদীশ গুপ্তের গল্পে তা পাওয়া যায়। কানু ও রাণুর ভালোবাসা, বিবাহোত্তর জীবনে কানুর জন্য রাণুর আকুলতার মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ দান করেছেন লেখক। রাণুর পাগলের মতো আচরণ বা কানুর বউয়ের চোখে রাণু পাগল প্রতিপন্ন হওয়ার মধ্যেও তার পরিচয় আছে।

বহির্ঘটনার অভিঘাতে অন্তর্মনের ছবি ফুটিয়ে তোলাতেই এই গল্পের সার্থকতা।

৯.৪ গঠনকৌশল

'অরূপের রাস' গল্পটি দু'টি ভাগে বিভক্ত। মোটা দাগে সংখ্যা দিয়ে এক ও দুই চিহ্নিত ভাগ দুটি আসলে রাণুর বিবাহপূর্ব ও বিবাহোত্তর জীবনের গল্প।

প্রথম ভাগে আছে কানুর সঙ্গে রাণুর সম্পর্কের বর্ণনা। কানু রাণুর চেয়ে বয়সে সাত বছরের বড়ো এবং কানু ব্রাহ্মণ ও রাণু শূদ্রাণী। তাদের প্রণয়ে যেমন হা-হুতাশ নেই তেমনই নেই জটিলতার স্পর্শ। তাদের বিবাহ হবে না এটা যতটা স্বাভাবিক কানু ও রাণুর বিচ্ছেদও ততটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিঃসঙ্গ দুটি গ্রহের মতো এই দুই চরিত্রের পারস্পরিক ক্রমাবর্তনকে লেখক তুলে ধরেছেন তার গল্পে।

দ্বিতীয় ভাগে আছে রাণু ও কানুর পুনরায় সাক্ষাতের বর্ণনা। প্রথম ভাগে যেমন মাত্র দু-একটি ঘটনা দিয়ে রাণুর মনের গহনে আলোকপাত করা হয়েছে, দ্বিতীয় ভাগেও তা ঘটে। তবে প্রথম ভাগে ছিল বিবাহপূর্ব জীবনের ঘটনা। রাণুর বিবাহসংবাদে খুশি কানুকে সক্রোধে মিষ্টি এনে সৎকারের ঘটনা তার উদাহরণ। এই ভাগে বিবাহের অব্যবহিত পরে দু-জনের সাক্ষাৎ ও পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার বর্ণনাও আছে। এরপর রাণুর শেষ চিঠি।

দ্বিতীয় ভাগে সন্তানবতী রাণুর সঙ্গে কানুর সাক্ষাৎ। তখন কানুও বিবাহিত। কিন্তু রাণু তার ছেলের নাম কানুর সঙ্গে মিলিয়ে রাখে বেণু। পরস্ত্রী রাণু কানুর সঙ্গে যেভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করতে চেয়েছে তাকে পাগলের আচরণই বলা যায়। রাণু কানুর বৌকে বলেছে, তারা এক হবে। একথার অর্থ যাই হোক কানুর মনে এই কথার ভাবোদ্দীপনা জেগেছে।

গল্পের শেষে রাণু ও কানুর বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু অরূপ রাস কানুকে তৃপ্ত করেছে। সে তৃপ্তির সাংকেতিক মনস্তাত্ত্বিক রূপ গল্পে ফুটে উঠেছে। এই গল্পের পরিচ্ছন্ন ও পরিমিত গঠনকৌশলে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে।

৯.৫ মনস্তাত্ত্বিকতা

জগদীশ গুপ্ত এমন একজন ব্যতিক্রমী গল্পকার যিনি অতি অল্প আয়াসে মানুষের মনের গহনের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করে দেন। 'অরূপের রাস' গল্পে রাণু ও কানুর মনের অতলে কী ঘটেছে তা বাহ্য ঘটনার প্রেক্ষাপটে দেখানো হয়েছে। ফলে একদিকে বাইরের ঘটনা অন্যদিকে তার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়াগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে গল্পটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। রাণুর বিবাহ ঠিক হল। রাণু সে-খবর কানুকে জানাতে এল। কানু শুনে খুশি হল। এই উপলক্ষে কতরকম খাবার তৈরি হয়েছে এবং রাণু তার থেকে কিছু খেয়ে এসেছে শুনে কানুও মিষ্টি খেতে চাইল। রাণু মিষ্টি নিয়ে এল ও রাগ প্রকাশ পেল তার আচরণে। কানু সে মিষ্টি খেল না। রাণু মুখে বলল, সে রাগ করেনি। তারপর উঠোনের কুকুরকে সেই দই, ক্ষীর, ছানা-সরের মিষ্টিগুলো খেতে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

ছোট্ট এই দৃশ্যে রাণু ও কানুর মনের কথা গোপন থাকেনি। রাণুর বিবাহসংবাদে কানু খুশি হয়েছে এটাই রাণুর কাছে হৃদয়বিদারক। তার অন্তরের জ্বালা-ক্ষোভ ও অতৃপ্তি সবই মিশেছে তার বাহ্য আচরণের রূঢ়তায়। তাই কানুও তাকে সহজেই ভুল বুঝেছে এই আচরণের রূঢ়তায়। তাদের পারস্পরিক ভালোবাসার মনস্তাত্ত্বিক ফাটল ভাষারূপ পেয়েছে এখানে।

'অরূপের রাস' গল্পে এই রকম বর্ণনা অনেক আছে।

৯.৬ রসসৃষ্টি

'অরূপের রাস' একটি রসোত্তীর্ণ ছোট গল্প। দুটি প্রণয়বিধুর নরনারীর প্রণয়কাতরতা, মিলনেচ্ছার আশ্চর্য মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গল্পটি সার্থক। অন্যদিকে সামাজিক-পারিবারিক প্রেক্ষাপটে এখানে গল্পের আবহ রচনা করেছে। জাতপাতের বিষয়টিকেও ইঙ্গিতে এমন শিল্পকৌশলে ছুঁয়েছেন লেখক যে বিন্দুমাত্র প্রচারমুখী হয়ে ওঠেনি গল্পটি।

রসসৃষ্টির সোপানরূপে গল্পটির সংকেতময়তা, বিরল বর্ণনা ও মানসিক ঘাতপ্রতিঘাতের নিপুণ চিত্রনির্মাণ প্রভৃতির উল্লেখ করা চলে। সার্থক ছোটগল্প পাঠকের মনকে চকিতে নাড়া দেয়। বিদ্যুৎবিভায় হঠাৎ আলোকিত হয় কোনো একটি বিষয়। এই গল্পে আশ্চর্য কৌশলে সেটাই ঘটেছে।

'রাস' কথাটির দুটি অর্থ। রাস মানে লাগাম বা অশ্ববল্গা। আবার রাস মানে কার্তিকী পূর্ণিমায় গোপনারীদের সঙ্গে কৃষ্ণের নৃত্যোৎসব। যে প্রেমের রূপ প্রত্যক্ষ নয়, তা যে দুটি নরনারীকে গোপনে শাসন করে। অথচ লাগাম টেনে ধরার পরেও তাদের প্রেমাচরণের রূপ অপ্রত্যক্ষ থাকে না। অন্যদিকে পরস্ত্রীর সঙ্গে কানুর আচরণ অথবা পরপুরুষ কানুর সঙ্গে পরনারী রাণুর আচরণ রাসলীলার দূরাভাস বহন করে। গল্পটির নাম, চরিত্রের নাম, ঘটনাবর্ণনায় সর্বত্রই সংকেতময়তা এমন স্পষ্ট ও উজ্জ্বল যে সার্থক রসসৃষ্টিরূপে এর গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়।

'অরূপের রাস' যে সার্থক রসসৃষ্টি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৯.৭ সারাংশ

গল্পকার বা ছোটগল্প লেখকরূপে জগদীশ গুপ্তর স্থান ও গুরুত্ব প্রথমেই বোঝা দরকার। বাংলা ছোটগল্পে তার অবদান কী সেটাও জানা চাই।

'অরূপের রাস' এমন একটি গল্প যার শিল্পনৈপুণ্য অসাধারণ। এই অসাধারণ গল্পের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বগুলো জানা চাই। এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গল্পটির গঠনবিশ্লেষণও জরুরি। এমনভাবে গল্পটি লিখিত যাতে মনস্তাত্ত্বিকতার সঙ্গে সংকেতময়তা মিশে আছে। সেই সব বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে গল্পটি একটি সার্থক সৃষ্টি।

৯.৮ অনুশীলনী

১ 'অরূপের রাস' গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি গল্পটির গঠনকৌশলের সঙ্গে কীভাবে মিশেছে?

২. 'অরূপের রাস' গল্প বর্ণনার মধ্যে কী ধরনের ঘটনাসমাবেশ ঘটেছে?

৩. 'অরূপের রাস' গল্পটির প্রধান ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করুন এবং অখণ্ড গল্পটির নির্মাণে ঘটনাগুলোর স্থান ও গুরুত্ব বোঝান।

৪. মনস্তাত্ত্বিক গল্পের বৈশিষ্ট্য কী?

৫. মনস্তাত্ত্বিক গল্পরূপে 'অরূপের রাস'-এর গুরুত্ব কী?

৬. সার্থক ছোটগল্প কাকে বলে?

৭. 'অরূপের রাস' কেন সার্থক ছোটগল্প।

মূল গল্পটি ওপরের আলোচনা ও অনুশীলনীভিত্তিক পাঠ করার পর নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর সমাধান করা দরকার :

১. বাংলা ছোটগল্পে জগদীশ গুপ্তের স্থান ও গুরুত্ব কোথায়?

২. ছোটগল্পকাররূপে জগদীশ গুপ্তের কৃতিত্ব আপনার পঠিত গল্প অবলম্বনে বোঝান।

৩. 'আমি তৃপ্ত'—বক্তা কে? তার তৃপ্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

৪. 'অরূপের রাস' গল্পে মনস্তাত্ত্বিকতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

৫. প্রচলিত প্রেমের গল্পরূপে 'অরূপের রাস' গল্পটিকে বিচার করা যায় কি? গল্পটির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আলোচনা করুন।

একক ১০ ☐ স্টোভ—প্রেমেন্দ্র মিত্র

গঠন

১০.১ মূলগল্প

১০.২ গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র

১০.৩ গল্পের বৈশিষ্ট্য

১০.৪ ছোটগল্পরূপে সার্থকতা

১০.৫ সারাংশ

১০.৬ অনুশীলনী

১০.১ মূলগল্প

স্টোভ আর না বাতিল করলে নয়। পাম্প করতে-করতে হাতে ব্যথা ধ'রে যায়। কোনোরকমে যদি বা তারপর ধরে তবু থেকে-থেকে অদ্ভুত শব্দ ক'রে এমন দপদপ ক'রে ওঠে যে ভয় করে।

সত্যি ভয় করে? বাসন্তীর মনে প্রশ্নটা ঝিলিক দিয়ে উঠতে না উঠতেই স্বামী শশিভূষণ মাঝখানের দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করে— 'কি গো, এখনো চা হল না? তোমার চা খাওয়াতে ওদের ট্রেন ফেল করিয়ে ছাড়বে নাকি?'

'তা হলই বা ট্রেন ফেল। জলে তো আর পড়েনি। একটা রাত আমরা জায়গা দিতে পারব।'

শশিভূষণ এবার আরো একটু ব্যস্তভাবে ঘরেই এসে দাঁড়ায়। 'না না, তুমি বুঝতে পারছ না...'

শশিভূষণকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বাসন্তী একটু ঝংকার দিয়েই বলে, 'বুঝতে খুব পারছি কিন্তু কী করব বলো। দুটো বৈ দশটা হাত আর নেই!'

শশিভূষণের এতক্ষণে স্টোভটার দিকে দৃষ্টি পড়ে। অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে সে বলে, 'তুমি আবার এই স্টোভ বার করেছ!'

'বার করব না তো করব কী? একটা উনুনে এত তাড়াতাড়ি সব-কিছু হয়?'

—শশিভূষণের দিকে চেয়ে তারপর একটু হেসে সে বলে— 'তোমার অতিথিকে শুধু চা দিয়ে তো আর বিদেয়-করতে পারি না।'

কথাটায় প্রচ্ছন্ন একটু খোঁচা ছিল কি না কে জানে!

শশিভূষণের দৃষ্টি কিন্তু তখনো স্টোভটার দিকে। চিন্তিতভাবে বলে, 'স্টোভটা কিন্তু না জ্বাললেই পারতে।'

'আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকে অত ভাবতে হবে না। এদিকে তাড়াতাড়িও চাই, আবার স্টোভ ধরালেও ভাবনা। যাও, তুমি ততক্ষণ গল্প করগে যাও দেখি। আমি এখুনি চা নিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু তার আগে আমিই না এসে পারলাম না। আচ্ছা, এসব হচ্ছে কি বলুন তো বউদি?' মল্লিকা এসে বোধ হয় জুতো পায়ে থাকার দরুণ চৌকাঠের ওপারেই দাঁড়ায়।

মল্লিকার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় অনেকক্ষণ হয়েছে, তবু বউদি ডাকটা একেবারে নতুন। বাসন্তীর উত্তর দিতে তাই বোধ হয় একটু দেরি হয়। মল্লিকার দিকে খানিক চেয়ে থেকে সে বলে— 'কী আর হচ্ছে ভাই। কিছুই তো পারলাম না।'

মল্লিকা জুতোটা খুলে এবার ঘরেই এসে বাসন্তীর পাশে ব'সে পড়ে।

'আহা শুধু মাটিতে বসলে কেন,'— ব'লে বাসন্তী একটা আসন তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেয়।

আসনটা সরিয়ে রেখে মল্লিকা বলে— 'থাক, শুধু মাটিতে বসলে আমার মান যাবে না। কিন্তু আপনি যে রীতিমতো কুটুম্বিতে শুরু ক'রে দিলেন। তবু যদি নিজে থেকে খোঁজ ক'রে না আসতে হ'ত।'

বাসন্তী স্বামীর দিকে একবার চকিত কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে বলে— 'সে দোষ তো ভাই আমার নয়।'

এতক্ষণে নাগাড়ে পাম্প দেওয়ার পর স্টোভটা ধরে উঠেছে। চায়ের কেটলিটি তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে বাসন্তী উঠে পড়ে, বলে— 'আমায় একটু রান্নাঘরে যেতে হচ্ছে ভাই। আপনারা ব'সে ততক্ষণ গল্প করুন।'

বাসন্তী উঠে চ'লে যায়। মল্লিকা মাথা নিচু ক'রে ব'সে থাকে। শশিভূষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ঠিক কী করা উচিত বুঝতে পারে না। স্টোভের সাইলেন্সারটাও খারাপ। তার একঘেয়ে কর্কশ শব্দ বেশ একটু অস্বস্তিকর।

মল্লিকা মাথা নিচু ক'রেই হঠাৎ ঈষৎ চাপা-গলায় বলে— 'এভাবে এসে বোধ হয় ভালো করিনি।'

কথাগুলো আরো মৃদুস্বরেই মল্লিকা বুঝি বলতে চেয়েছিল। স্টোভের আওয়াজের দরুণ গলাটাকে একটু বেশি উঠাতে হয়। মনে হয়, কথাগুলো যেন উঁচু পর্দায় ওঠার দরুণই মর্যাদা হারায়, কেমন যেন একটু সুলভ হয়ে পড়ে।

'না, না, খারাপ আবার কিসের?' শশিভূষণ কেমন একটু আড়ষ্টভাবেই জবাব দেয়। কিন্তু জবাবটা ঠিক এভাবে মল্লিকা আশা করেনি। এবার শশিভূষণের মুখের দিকে চোখ তুলে সে বলে, 'কেন যে এতদিন বাদে এ-খেয়াল হ'ল নিজেই জানি না, অথচ এই লাইনে আরো দু-তিনবার গেছি। গাড়ি বদলাবার জন্যে স্টেশনে অপেক্ষাও করেছি চার পাঁচ ঘণ্টা। তখনো জানতাম তোমরা এখানেই আছ।'

শশিভূষণ কোনো জবাব দেয় না।

স্টোভটা হঠাৎ দপদপ ক'রে ওঠে, তারপর আঁচটা কেমন নিবে যায়। বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই মল্লিকা একটু স'রে ব'সে পাম্প দিতে আরম্ভ করে। স্টোভের শিখাটা বেড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে কর্কশ আওয়াজটায় সমস্ত ঘর ভ'রে যায়।

হঠাৎ শশিভূষণ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বলে, 'আরে আরে করছ কী? অত পাম্প দিয়ো না।'

পাম্পটা থামিয়ে মল্লিকা শশিভূষণের দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করে—'কেন?'

'মানে, স্টোভটা অনেক দিনের পুরনো, খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ ফেটে যেতে পারে।'

শশিভূষণ চোখে পরিপূর্ণ স্থির দৃষ্টি রেখে মল্লিকা বলে, 'তা হলে ভয়ানক একটা কেলেঙ্কারি হয়—না?'

শশিভূষণের কেমন একটু সংকুচিতভাবে চোখটা সরিয়ে নেয়।

মল্লিকা কিন্তু চোখ না নামিয়েই আবার বলে, 'তোমার স্ত্রী—মানে বউদি তো এই স্টোভই জ্বালেন?'

শশিভূষণ অন্যদিকে চেয়েই বলে— 'না, খারাপ হয়ে গেছে ব'লে এটা ব্যবহারই হয় না। আজ কেন যে বার করেছে কে জানে।'

'ও' ব'লে মল্লিকা এবার মাথা নিচু ক'রে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। হঠাৎ শশিভূষণ চমকে উঠে বলে—'ও কী হচ্ছে কী? বলছি পাম্প দিয়ো না, বিপদ হতে পারে।'

স্টোভের আওয়াজের দরুণ শশিভূষণকে কথাগুলো বেশ চেঁচিয়েই বলতে হয় বাসন্তী তখন রান্নাঘর থেকে বড়ো একটা থালা হাতে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে— 'বিপদ আবার কি হ'ল?'

মুখ ফিরিয়ে বাসন্তীর দিকে চেয়ে মল্লিকা সকৌতুক হাসির সঙ্গে বলে— 'দেখুন তো বউদি! আপনার স্টোভে একটু বেশি পাম্প দিলেই নাকি বিপদ হবে। স্টোভটা কি অতই খারাপ নাকি?'

বাসন্তী স্বামীর দিকে একবার তাকায়, তারপর রান্নাঘর থেকে আনা গরম খাবারের থালাটা ছোটো টেবিলটার ওপর রেখে বলে— 'খারাপ হতে যাবে কেন? ওঁর ওইরকম অদ্ভুত ধারণা। একটু পুরনো হ'লেই বুঝি স্টোভ অচল হয়ে যায়!'

'আমিও তাই বলি।' মল্লিকা সমানে স্টোভটায় পাম্প দিতে থাকে। কেটলির তলা থেকে নীল আগুনের শিখা হিংস্র গর্জন ক'রে চারিধারে যেন ফণা তোলে।

শশিভূষণ কী বলতে গিয়ে যেন বলতে পারে না। কেমন একটু ভীত অসহায়ভাবে বাসন্তীর দিকে তাকায়। বাসন্তী তবু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ শশিভূষণ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাসন্তী একটু হেসে মল্লিকার পাশে ব'সে পড়ে, স্টোভটা একটু সরিয়ে নিয়ে বলে— 'থাক ভাই থাক, আর দরকার নেই। দু-দণ্ডের জন্যে দেখা করতে এসে অত খাটলে আমাদের যে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না। আপনি ও-ঘরে গিয়ে বসুন, আমি এখুনি চা নিয়ে যাচ্ছি। আপনার ভাই বোধ হয় এতক্ষণ একা-একা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।'

মল্লিকা সব কথা শুনতে পায় কিনা কে জানে। হঠাৎ যেন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে সে বলে— 'আপনি বোধ হয় ভয় পাচ্ছিলেন যে স্টোভটা আমি ফাটিয়েই দিলাম।'

'না, ভয় পাব কেন? ফাটবার হলে ও-স্টোভ অনেক আগেই ফাটত।' বাসন্তী গলার সুরটা তারপর পাল্টে বলে— 'আপনাকে কিন্তু সত্যিই এবার উঠে ও-ঘরে যেতে হবে। এমনিতেই অতিথি-সৎকারের যথেষ্ট ত্রুটি হয়ে গেছে।'

'না, আপনি লৌকিকতার চরম ক'রে ছাড়লেন।'— ব'লে মল্লিকা এবার পাশের ঘরে চ'লে যায়।

স্টোভের আওয়াজটা পাশের ঘরেও বেশ প্রচণ্ড। তবে একেবারে অত দুঃসহ নয়। মল্লিকার পায়ের শব্দ তাই বোধ হয় শশিভূষণ শুনতে পায় না। একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর চমকে মুখ তুলে তাকায়। তারপর কেমন যেন একটু সংকুচিতভাবে বলে 'তোমার ভাই আবার একটু ঘুরে বেড়াতে গেল। ট্রেনের সময় হয়ে যাবে ব'লে ভয় দেখালাম— তবু শুনল না।'

'তা যাকগে। তোমার ভয় নেই। ট্রেন আমরা কিছুতেই ফেল করব না।'

কথাটা কোনোরকম ঝাঁজ না দিয়েই মল্লিকা বলে। তারপর শশিভূষণের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না তাকিয়েও পারে না। শশিভূষণ কি এ-কথারও একটা উত্তর দিতে পারে না?

শশিভূষণ কিন্তু নীরবে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। মল্লিকার ইচ্ছে হয়, হঠাৎ চিৎকার ক'রে বলে— 'তোমার ভয় নেই, ভয় নেই। পাঁচ বছর বাদে আজ হঠাৎ তোমার সংসারে ভাঙন ধরাব ব'লে আমি আসিনি। তবে আগুন অনেক নিবে গেলেও একটু দুটো স্ফুলিঙ্গ হয়তো এখনো আছে, নির্লজ্জের মতো এই আশাই করেছিলাম।'

এসব কিছুই সে বলে না অবশ্য। নিতান্ত সহজভাবেই সাধারণ আলাপ করবার চেষ্টা করে— 'তোমার এখানকার চাকরি তো প্রায় চার বছর হল—না?'

'হ্যাঁ, প্রায় তাই।'

'ভালো লাগে এইরকম মফস্‌সল শহরে প'ড়ে থাকতে?

'না লাগলে উপায় কী? কলকাতার কোনো কলেজে চাকরি পাওয়া তো সোজা নয়।'

উপায় কী? ঠিক শশিভূষণেরই যোগ্য উত্তর। এই শশিভূষণের সত্যকার চরিত্র। চিরকাল ভাগ্যের কাছে আগে থাকতে হার মেনে সে ব'সে আছে। স্রোতের বিরুদ্ধে একটিবার রুখে দাঁড়াবার সাহসও তার নেই। পাঁচ বৎসর আগেও এমনি ক'রেই

সে দুর্বলভাবে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। সেদিন এতটুকু দৃঢ়তা তার মধ্যে থাকলে হয়তো তাদের জীবনের ইতিহাস আর একরকম হতে পারত।

সেদিনটা এখনো তার ভালো ক'রেই মনে আছে। অনেক ভেবে-চিন্তে মিউজিয়ামের একটা ঘর তখন তারা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ঠিক ক'রে নিয়েছিল। কলেজে দেখা হলেও কথা বলা সমীচীন নয়। তাই সময় ও সুবিধা হলেই একজন আরেকজনের জন্যে এই ঘরটিতে এসে অপেক্ষা করত। মিউজিয়মের সেটা পাথুরে নমুনার ঘর। তাদের জীবনের অনেক উদ্বেল মুহূর্তের সাক্ষী এই ঘর। বারবার পৃথিবীর নিদারুণ চাপে, বারবার সর্বনাশা প্রলয়ের আগুনে যত মাটি নিষ্পেষিত দগ্ধ হয়ে আশ্চর্য পাথর হয়ে গেছে, গ্রহলোক থেকে যত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার কঙ্কালাবশেষ পৃথিবীতে ফেলে গেছে, সে-ঘরে তারই নিদর্শন সঞ্চিত।

সেদিন মল্লিকাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকক্ষণ। বিশাল ঘরের সব ক'টা নিদর্শন দু-তিনবার ঘুরে দেখেও আর সময় ফুরোতে চায়নি। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে শশিভূষণ ঘরে ঢুকেছিল। তার মুখ দেখেই মল্লিকার যেন কিছু বুঝতে আর বাকি থাকেনি। তবু সে এ-হতাশাকে আমল দিতে চায়নি।

খানিকক্ষণ কেউই কোনো কথা বলেনি। নিঃশব্দে একটু ঘোরবার পর মল্লিকাই আর থাকতে পারেনি। সমস্ত সংকোচ জয় ক'রে নিজেই জিজ্ঞাসা করেছে— 'কী বললেন?'

'মা?' শশিভূষণ যেন চমকে গেছে একটু। তারপর চুপ করে থেকে মুখ ফিরিয়ে বলেছে— 'মাকে কিছু বলিনি এখনো।'

মল্লিকা স্তব্ধ হয়ে গেছে একেবারে। শশিভূষণই আবার ক্লান্ত হতাশ স্বরে বলেছে— 'মার শরীর খুব খারাপ। আজই দেওঘরে যাচ্ছেন কিছুদিন চেঞ্জের জন্য।'

অনেকক্ষণ, প্রায় যেন এক যুগ স্তব্ধ হয়ে থাকবার পর মল্লিকা অর্ধস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করেছে, 'তুমি,—তুমিও যাচ্ছ নাকি?'

একটু ইতস্তত ক'রে শশিভূষণ বলেছে, 'মা যেতে বলছেন তাছাড়া—তা ছাড়া ভাবছি যা-কিছু বলার সেখানে বললেই সুবিধে হবে।'

মল্লিকা আর কোনো কথা বলেনি। সে যেন বুঝতে পেরেছে সমস্ত প্রশ্নের প্রয়োজন তখনই শেষ হয়ে গেছে।

শশিভূষণই খানিক বাদে বলেছে— 'আমি না বললেও বাড়ির সবাই জানে— মা-ও জানেন।'

এ-কথারও কোনো উত্তর দেওয়ার প্রবৃত্তি মল্লিকার হয়নি। একান্তভাবে ছোটো একটা উল্কাপিণ্ডের নমুনার দিকে মনোনিবেশ ক'রে সে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করেছে।

শশিভূষণ আবার বলেছে, অত্যন্ত অপরাধীর মতো— 'শরীর খারাপের ওপর মা হয়তো বড়ো বেশি বিচলিত হয়ে উঠবেন, এই ভয়েই এখনো কিছু বলিনি। আমি জানি মাকে শেষ পর্যন্ত বোঝাতে পারব।'

একটা জ্বালাময় উত্তর বুক থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত উথলে উঠেছে। শুধু তোমার মাকে বোঝানোটাই কি এত বড়ো! আমার কি বাড়ি-ঘর আত্মীয়-সমাজ কিছু নেই? তোমার মার অনুগ্রহের ভিক্ষার ওপরই কি আমার জীবন নির্ভর করছে?

মল্লিকা কিন্তু নিজেকে সংযত করেছে আবার। এবং সেইখানেই বোধ হয় জীবনের চরম ভুল করেছে। শশিভূষণ সেই জাতের মানুষ, নিজের মনকে নিজেই যারা সাহস ক'রে চিনতে চায় না। তাদের পেতে হলে জোর ক'রে আঘাত দিয়ে টেনে নিতে হয়। কী ক্ষতি ছিল সেদিন আর একটু নির্লজ্জ হয়ে শশিভূষণের এই জড়তা ভেঙে চুরমার ক'রে দিলে? সে জানে, সেদিন চেষ্টা করলে শশিভূষণকে সে আর ফিরে না যেতে দিতে পারত। শশিভূষণের নিজের মধ্যে কোনো প্রেরণা নেই। কিন্তু ইচ্ছে করলে সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি মল্লিকাই তার মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারত, দেয়নি শুধু নারীসুলভ সংকোচে আর লজ্জায়, আর বুঝি একটু আহত অভিমানে। কী ভুলই সেদিন করেছে!

কিন্তু সত্যি ভুল করেছে কি? চকিতে এ-প্রশ্ন তার মনের সমস্ত দিগন্ত যেন একটা নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে দেয়। এই আত্মবিশ্বাসহীন অসহায় দুর্বল মানুষটির জন্যে গত পাঁচ বছর ধ'রে প্রতিটি মুহূর্তে সে নিঃশব্দে পুড়ে-পুড়ে খাক হয়েছে, কিন্তু সত্যি একে জয় ক'রে নিলে সে কি সুখী হত? ভিজে সলতেয় সারা জীবন ধরে আগুন ধরিয়ে রাখার ব্রত ক্রমশ একদিন দুর্বহ হয়ে উঠত না কি?

'স্টোভটার আওয়াজটা বড়ো বিশ্রী শোনাচ্ছে না?'— শশিভূষণের কথায় মল্লিকার চমক ভাঙে।

অদ্ভুতভাবে হেসে সে বলে— 'ভয় হচ্ছে নাকি! কিন্তু বউদি তো বললেন স্টোভ মোটেই খারাপ নয়।'

কেটলির জল ফুটে উঠে স্টোভের উপর উথলে পড়তেই বাসন্তীর যেন হুঁশ হয়।

কেটলি নামিয়ে চায়ের পটে জল ঢেলে স্টোভটা নিবিয়ে দেবার জন্যে সে চাবিটার দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে যাওয়ায় চাবি ঘোরানো আর হয় না।

সত্যিই কি স্টোভটা আজ হঠাৎ এই মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে? ভাগ্যের সঙ্গে এ-বাজি খেলবার সাহস তার আছে কি? একদিন ছিল। সেদিন সত্যিই স্টোভটাই সে শেষমুক্তির পথ ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছিল। কেউ কিছু জানবে না, কিছু বুঝবে না, কোনো অপবাদ কারুর গায়ে লাগবে না। সবাই জানবে শুধু একটা দুর্ঘটনা হল।

সেদিন অত বড়ো নিদারুণ সংকল্প তাকে করতে হয়েছিল শুধু এই মল্লিকার জন্যে, ভাবতে এখন তার আশ্চর্য লাগে। মল্লিকাকে সে চোখে দেখেনি, তার একটা ছবি পর্যন্ত নয়। কিন্তু এ-বাড়িতে প্রথম পদার্পণের সঙ্গে-সঙ্গে শুভানুধ্যায়ীদের কল্যাণে ওই একটি নাম তার দিনরাত্রি বিষাক্ত ক'রে তুলেছে।

মল্লিকাকে সে কিভাবেই না কল্পনা করেছে। সে-কল্পনার সঙ্গে আজকে এই চাক্ষুষ পরিচয়ের এত তফাত হবে সে ভাবতেও পারেনি। মল্লিকাকে কুশ্রী বলা চলে না। কিন্তু সে-রূপও তার নেই যাতে পুরুষের মনে অনির্বাণ আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারে। লেখাপড়া শেখা আধুনিক মেয়ে ব'লে সাজসজ্জার একটা পরিচ্ছন্নতা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বয়সের ছাপটাও একেবারে আর লুকানো নেই। স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে কলেজে পড়ত, সুতরাং বয়স নেহাত কম তো হয় না।

স্বামীর কাছে মল্লিকার নাম সে বিয়ের পর কোনোদিন শোনেনি, কিন্তু আর পাঁচজন হিতৈষী তো আছে, সাবধান করবার, পরামর্শ দেবার।

ফুলশয্যার রাত্রেই তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে, ঘরে পাঠাবার আগে আর সব মেয়েদের উদ্দেশ্য ক'রে এক ঠানদি সম্পর্কীয়া প্রৌঢ়া সেকেলে অভদ্র রসিকতা ক'রে বলেছিলেন— 'ওরে সাজিয়ে তো দিলি, সঙ্গে একটা শিকলি দিয়েছিস তো? নইলে ও উড়ো পাখিকে বাঁধবে কী দিয়ে?'

প্রথমটা কিছু বুঝতে না পেরে শুধু রসিকতার ধরনে বাসন্তী লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল কিন্তু বোঝানোই যাদের আনন্দ তারা না বুঝিয়ে ছাড়বে কেন? একটু-একটু ক'রে কিছুই তার প্রায় শুনতে বাকি থাকেনি।

স্বামীর মুখে একবার-আধবার মল্লিকার নাম শুনলে সে বোধ হয় অতটা আহত হত না, যতটা হয়েছে তাঁর আপাতনির্বিকার নীরবতায়। কতদিন বিছানায় স্বামীকে চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে দেখে তার বুকের ভেতরটা জ্বালা ক'রে উঠেছে। হয়তো— হয়তো কেন, নিশ্চয়ই স্বামী এখন মল্লিকার কথাই ভাবছেন।

মল্লিকাই যদি তোমার দিবারাত্রির ধ্যান তো আমায় বিয়ে করতে গেছিলে কেন?— ইতরের মতো ঝগড়া ক'রে এ-কথা বলতে পারলে, বুঝি খানিকটা বুকের জ্বালা কমত, কিন্তু তার বদলে সে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে বাইরে চ'লে গেছে।

শশিভূষণ খিল খোলার শব্দে একটু চমকে জিজ্ঞাসা করেছে— 'যাচ্ছ কোথায়?'

'বাইরে বারান্দায় যাচ্ছি।'

ব্যস, আর কিছু বলবার দরকার হয়নি। হঠাৎ বারান্দায় যাবার কোনো কারণই স্বামী জানতে চান না। তাঁর কোনো কৌতূহলই নেই। বাসন্তীর মনে হয়েছে যে, সে যদি বলত, 'গঙ্গায় ডুবে মরতে যাচ্ছি' তা হলেও স্বামী বোধ হয় শুধু একটু 'ও' ব'লে নিশ্চিন্ত মনে চুপ ক'রে থাকতেন। অসহ্য, অসহ্য এই নির্বিকার ঔদাসীন্য, এর চেয়ে সুস্পষ্ট অপমানও ঢের ভালো ছিল।

একদিন এই স্টোভের সামনে ব'সেই তাই তার মনে হয়েছে, কী ক্ষতি হয় সব একেবারে শেষ ক'রে দিলে। শাশুড়ী তখনো বেঁচে। তাকে স্টোভ জ্বালিয়ে চা করতে দেখে খানিক আগেই তিনি সাবধান ক'রে গেছেন— 'ও-স্টোভটা তুমি কেন আবার জ্বালতে গেলে বউমা? ওটা খারাপ হয়ে গেছে ব'লে আমি কাউকে ছুঁতেই দিই না। দেখো বাপু, ফেটে-টেটে আবার একটা কেলেঙ্কারি না হয়।'

ফেটে গিয়ে কেলেঙ্কারি। হ্যাঁ, এরকম দুর্ঘটনা খুব নতুন নয়। বাসন্তী প্রাণপণে স্টোভটায় পাম্প দিয়েছে। কোনো দুর্ঘটনাই কিন্তু ঘটেনি।

তারপর ধীরে-ধীরে কবে থেকে যে সব বদলে গেছে, বাসন্তী ঠিক স্মরণ করতেই পারে না। কিন্তু ক্রমশই তার মনে হয়েছে, এই একান্ত অসহায় পরনির্ভর মানুষটি, এক-পা যে তার সাহায্য বিনা চলতে পারে না, নিজের অসুখটা পর্যন্ত যার বাসন্তীর কাছে জেনে নিতে হয়, গভীর কোনো ভালোবাসা তার মনে চিরন্তন হয়ে আছে এ কি বিশ্বাস করবার যোগ্য? যার মনের, হৃদয়ের সমস্ত ব্যাপার আজ বাসন্তীর কাছে জলের মতো স্বচ্ছ, এমন কোনো আশ্চর্য গোপন স্থান তার কোথাও কি থাকতে পারে যেখানে অত বড়ো ভালোবাসা নিঃশব্দে গোপন ক'রে রাখা যায়। কোনোদিন কোনো রং যদি শশিভূষণের মনে লেগে থাকে, বাসন্তী স্থির বিশ্বাসে জানে যে, সে-রং অনেক আগেই ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

একদিন সে নিজেই তাই মল্লিকার কথা তুলেছে স্বামীর কাছে।

'ওগো এখানকার গোকুলপুরের স্কুলে নতুন কে হেড মিস্ট্রেস হয়েছেন জানো? তোমাদের সেই মল্লিকা রায়।'

মল্লিকা সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলাপ এই প্রথম। তবু বাসন্তীর কথায় বা কথার ধরনে শশিভূষণের কোনো ভাবান্তরই চোখে পড়ে না। নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই সে বলে— 'হ্যাঁ, শুনেছি।'

এতটা নির্লিপ্ততা বুঝি বাসন্তীও আশা করেনি। সে আবার একটু খোঁচা দেবার জন্যেই বলে— 'আমাদের এই জংশন স্টেশনেই তো গাড়ি বদল ক'রে যেতে হয়। একবার আসতে বলো না কেন?'

'কি জন্যে?' শশিভূষণ যেন একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করেছে।

'কি জন্যে আবার। একবার একটু দেখতাম।'— ব'লে বাসন্তী সেখান থেকে চ'লে গেছে।

শশিভূষণ আসতে অবশ্য বলেনি। মল্লিকা আজ এতদিন বাদে নিজে থেকেই এসেছে। না, সত্যিই কোনো জ্বালা, কোনো সংশয় বাসন্তীর মনে আর নেই। সে বরং খুশি হয়েছে মনে-মনে। তার এই পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের দিনই মল্লিকাকে সে এনে দেখাতে চেয়েছিল। যত জ্বালা সে এতদিন পেয়েছে, এ যেন তারই ঋণশোধ।

ও-ঘরে ব'সে এখনো ওরা গল্প করছে। কী গল্প করছে কে জানে? যাই করুক, কিছু আসে যায় না। বাসন্তী জানে, তার কোনো ভয় আর নেই।

ঠিক এই মুহূর্তে স্টোভটা কি ফেটে যেতে পারে?

হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে যাওয়ায় বাসন্তী চমকে ওঠে। কী ভাববে তা হলে মল্লিকা? কী ভুল ধারণাই না সে করতে পারে। অনায়াসেই ভাবতে পারে এই নিদারুণ নাটকীয় পরিণামের সেই বুঝি মূল। বুঝি সে আসাতেই বহুদিনের নিরুদ্ধ বেদনার এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণ।

না, না, এ মিথ্যে গৌরবের সুযোগ কিছুতেই মল্লিকাকে দেওয়া যায় না। স্টোভটা নেবাবার জন্যে বাসন্তী চাবিটাকে ঘোরাতে যায়, হঠাৎ চাবিটা এত এঁটে গেলই বা কী করে? বাসন্তী সমস্ত শক্তি দিয়েও সেটা ঘোরাতে পারে না। হঠাৎ ভয়

পেয়ে তার মনে হয় শশিভূষণকে ডাকবে কিনা। কিন্তু, না, সে বড়ো লজ্জার ব্যাপার। তা হলেও মল্লিকার কাছে মান থাকে না।

স্টোভটা কিন্তু সত্যি যেন উন্মাদের মতো হিংস্র গর্জন করছে! উঠে কোথাও স'রে যাবার কথাও বাসন্তী ভাবতে পারে না। প্রাণপণ শক্তিতে সে চাবিটা খোলবার চেষ্টা করে। কিছুতেই আজ কোনো দুর্ঘটনা যে ঘটতে দেওয়া যায় না।

১০.২ গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কথাকার ও কবি। একদিকে দলিত-নিপীড়িত মানুষদের বিষয়ে তাঁর কবিতায় সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে তাঁর বৈজ্ঞানিক মন বিচিত্র ছোটগল্পের রসসম্ভার উপহার দিয়েছে বাঙালি পাঠককে।

একদা 'পাঁক' লিখে প্রেমেন্দ্র মিত্র সাড়া জাগান। তারপর অসংখ্য ছোটগল্প ও বেশ কিছু উপন্যাস লেখেন। মূলত শহরজীবন ও মধ্যবিত্ত মানুষের মূল্যবোধই তাঁর গল্পের প্রধান বিষয়। 'ঘনাদা'-র গল্প অবশ্য স্বতন্ত্র মেজাজের।

'স্টোভ' মধ্যবিত্ত জীবনের প্রেক্ষাপটে লেখা একটি অত্যুজ্জ্বল ছোটগল্প। এই গল্পে মাত্র তিনটি চরিত্র আছে। তারই সাহায্যে লেখক মধ্যবিত্ত জীবন পরিসরে একটি গল্প রচনা করেছেন।

গল্পের মূল কেন্দ্রে আছে একটি স্টোভ। এই স্টোভ অতীত জীবনের বহুদিনের নিরুদ্ধ বেদনার বিস্ফোরণ হয়ে ওঠেনি অবশ্য। শুধু সোঁ সোঁ শব্দ গর্জনে কাঁপিয়ে তুলেছে চারিদিকে। কাঁপিয়ে দিয়েছে কয়েকটি মধ্যবিত্ত মনকে।

১০.৩ গল্পের বৈশিষ্ট্য

'স্টোভ' একটি ছোটগল্প। মূলত তিনটি চরিত্র নিয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের প্রেক্ষাপটে আঁকা। একদিকে আছে বাসন্তী ও তার স্বামী শশিভূষণ। অন্যদিকে আছে মল্লিকা—শশির পূর্ব পরিচিতা ও একদা প্রেমিকা। আর গল্পটি জুড়ে আছে একটি স্টোভের কথা। সব মিলিয়ে মধ্যবিত্ত সংসার ও মনের ছবি। সংশয় আর দ্বিধায় ভরা।

মল্লিকা হঠাৎ এসে পড়েছে শশিভূষণের বাড়িতে। তাকে চা খাওয়াতে শশি পুরাতন স্টোভ জ্বালাতে বলেছে বাসন্তীকে। বাসন্তীর ওই পুরাতন স্টোভ পাম্প দেওয়ার পর ধরে ওঠে। কিন্তু মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ করছে প্রতীকীভাবে। ফেটে যাওয়ারও সম্ভাবনা কম নয়। যে কোনো মুহূর্তে ফেটে আগুন ধরে যেতে পারে। কিন্তু ফাটে না। শুধু উন্মাদের মতো হিংস্র গর্জন করে চলে। আর বাসন্তী প্রাণপণে তা নেভাবার চেষ্টা করে চলে। সে দুর্ঘটনা ঘটতে দেবে না তার জন্য চেষ্টা চালায়।

'স্টোভ' গল্পের দুটি স্তর—(১) অতীত কাহিনি, (২) বর্তমানের কাহিনি। এই দুটি স্তর মিলেমিশে গল্পটির রসসৃষ্টি হয়।

মল্লিকা একদিন বিয়ে করতে চেয়েছিল শশিকে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। একদা সে ক্ষোভে দুঃখে স্টোভ ধরিয়ে আত্মঘাতী হতে চেয়েছিল। আর আজ সেই বেদনা যেন আত্মঘাতী বিস্ফোরণের রূপ নিতে চাইছে। আবার তা কিছুতেই ঘটতে দেবে না বাসন্তী।

এইভাবেই এ গল্পের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সার্থক হয়ে ওঠে গল্পটি। এই সংক্ষিপ্ত অথচ প্রতীকী নির্মাণকৌশল গল্পটিকে অন্য মাত্রা দান করে। বলা যেতে পারে এটি একটি সার্থক ছোটগল্প।

১০.৪ ছোটগল্পরূপে সার্থকতা

'স্টোভ' গল্পটি কেন একটি সার্থক ছোটগল্প?

এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে হলে গল্পটির পরিবেশ ও চরিত্রলিপির স্বরূপ বোঝা চাই।

পরিবেশ : বাসন্তীর ছোট সংসারের পরিবেশে গল্পটি গড়ে ওঠে। মল্লিকা এসেছে। তাকে যৎসামান্য আপ্যায়ন ব্যবস্থা করতে হবে। তাই স্টোভ জ্বালা।

অন্যদিকে মল্লিকার সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ে এতদিন কোনো কথাই বলেনি শশি তার বউ বাসন্তীকে। এই প্রথম তারা মল্লিকার বিষয়ে কথা বলে।

দুটি ঘরে চরিত্রগুলো ছড়িয়ে যায়। রান্নাঘরে বাসন্তী, বসার ঘরে শশি ও মল্লিকা। আবার কখনও স্টোভের কাছে এসে বসে মল্লিকা, বাসন্তীকে সাহায্য করতে চায়। আবার ঐ দুরন্ত গোঁ গোঁ করা স্টোভ দেখে সে তার অতীতকে মনে করে। সে যে একদিন স্টোভ জ্বালিয়ে আত্মঘাতী হতে চেয়েছিল তা তার মনে পড়ে।

চরিত্র : তিনটি চরিত্র অসাধারণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। একদিকে স্বামী-স্ত্রী—শশি ও বাসন্তী। মধ্যবিত্ত মন ও মানসিকতায় পূর্ণ। আপাত তৃপ্ত। অতৃপ্তিগুলো সব লুকানো রয়েছে। অন্যদিকে বাসন্তী অতৃপ্ত। এই সব ক্ষোভ যেন স্টোভের গোঁ গোঁ ও ফেটে পড়ার ভয় হয়ে পরিবেশকে উত্তপ্ত করেছে। আভাসে-ইঙ্গিতে গল্পের পরিণতি বোঝা যায়। শিল্পদীপ্তিতে সার্থক হয়।

১০.৫ সারাংশ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'স্টোভ' তিনটি চরিত্র ভিত্তি করে লেখা গল্প। এই গল্পে দুই মধ্যবিত্ত মহিলার চরিত্র আছে। আছে একটি পুরুষ চরিত্র। একজনের সঙ্গে বিবাহ হবার কথা ছিল, কিন্তু হয়েছে অন্য মহিলার সঙ্গে। মাঝখানে আছে শশিভূষণ চরিত্রটি।

অতীতের নিরুদ্ধ বেদনা যেন আত্মঘাতী বিস্ফোরণের রূপ নিতে চেয়েছে। তাই টান টান শ্বাসরোধী পরিবেশ তৈরি হয়। বাসন্তী তার সৌভাগ্যের সংসার দেখিয়ে যেন তৃপ্তি পায়। আর মল্লিকা তার না-পাওয়া প্রেমিকের সংসার নিজে চোখে দেখতে এসে ভাববিহ্বল হয়ে পড়ে। একদিন সে আত্মঘাতী হতে চেয়েছিল স্টোভের আগুন জ্বালিয়ে। সে-কথাও মনে পড়ে যায়। বাসন্তী স্টোভ নিভাতে ব্যস্ত হয়। অথচ স্টোভ গর্জন করে চলে ফেটে পড়ার দুরন্ত ও ভয়ংকর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ছোটগল্পের অনবদ্য বাঁধুনি লক্ষ করা যায় এই গল্পে। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে আশ্চর্য শিল্পসার্থকতা পেয়েছে। কেমনভাবে পেয়েছে সেটাও বোঝা দরকার।

১০.৬ অনুশীলনী

১. 'স্টোভ' কী প্রেমের গল্প?

২. 'স্টোভ' কী মধ্যবিত্ত সংসারের গল্প?

৩. 'স্টোভ'-কে কতদূর মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতিচ্ছবি বলা যায়?

৪. 'স্টোভ' গল্পের চরিত্র ও পরিবেশ নির্মাণে লেখকের সার্থকতা নিরূপণ করুন।

৫. 'স্টোভ' গল্পের শিল্পসার্থকতা নিরূপণ করুন।

৬. ছোটগল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিভার যে পরিচয় 'স্টোভ' গল্পে আছে তার পরিচয় দিন।

৭. পরিবেশ ও চরিত্রনির্মাণে লেখকের সাফল্য বিচার করুন।

একক ১১ ◻ শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড — পরশুরাম

গঠন

১১.১ মূলগল্প

১১.২ পরশুরামের পরিচিতি

১১.৩ গল্পের পরিচিতি

১১.৪ গল্পটির সারাংশ ও আবহ

১১.৫ কেন্দ্রীয় চরিত্র

১১.৬ নামকরণ

১১.৭ সার্থক ছোটগল্প হিসাবে বিচার

১১.৮ ভাষা ও গঠনশৈলী

১১.৯ কয়েকজন সাহিত্য সমালোচকের মতামত

১১.১০ অনুশীলনী

১১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ মূলগল্প

মাঘ মাস ১৩২৬ সাল। এই মাত্র আরমানি গির্জার ঘড়িতে বেলা এগারোটা বাজিয়াছে। শ্যামবাবু চামড়ার ব্যাগ হাতে ঝুলাইয়া জুডাস লেনের একটি তেতলা বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। বাড়িটি বহু পুরাতন, ক্রমাগত চুন ও রঙের প্রলেপে লোলচর্ম কলপলিত-কেশ বৃদ্ধের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। নীচের তলায় অন্ধকারময় মালের গুদাম। উপরতলায় সম্মুখভাগে অনেকগুলি ব্যবসায়ীর আপিস, পশ্চাতে বিভিন্ন জাতীয় কয়েকটি পরিবার পৃথক পৃথক অংশে বাস করেন। প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই তেতলা পর্যন্ত বিস্তৃত কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশের দেওয়াল আগাগোড়া তাম্বুলরাগচর্চিত—যদিও নিষেধের নোটিস লম্বিত আছে। কতিপয় নেংটে ইঁদুর ও আরশোলা পরস্পর অহিংসভাবে স্বচ্ছন্দে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। ইহারা আশ্রমমৃগের ন্যায় নিঃশঙ্ক সিঁড়ির যাত্রিগণকে গ্রাহ্য করে না। অন্তরালবর্তী সিন্ধি-পরিবারের রান্নাঘর হইতে নির্গত হিঙের তীব্র গন্ধের সহিত নর্দমার গন্ধ মিলিত হইয়া সমস্ত স্থান আমোদিত করিয়াছে। আপিস-সমূহের মালিকগণ তুচ্ছ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া কেনা-বেচা-তেজি-মন্দি আদায়-উসুল ইত্যাদি মহৎ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দিন যাপন করিতেছিলেন।

শ্যামবাবু তেতলায় উঠিয়া একটি ঘরের তালা খুলিলেন। ঘরের দরজার পাশে কাষ্ঠফলকে লেখা আছে—ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল, জেনার্ল্ মার্চেন্টস। এই কারবারের স্বত্বাধিকারী স্বয়ং শ্যামবাবু (শ্যামলাল গাঙুলী) এবং তাঁহার শ্যালক বিপিন চৌধুরী, বি. এস-সি। ঘরে কয়েকটি পুরাতন টেবিল, চেয়ার, আলমারি প্রভৃতি আপিস-সরঞ্জাম। টেবিলের উপর নানাপ্রকার খাতা, বিতরণের জন্য ছাপানো বিজ্ঞাপনের স্তূপ, একটি পুরাতন থ্যাকার্স ডিরেক্টরি, একখণ্ড ইন্ডিয়ান কম্পানিজ অ্যাক্ট,

কয়েকটি বিভিন্ন কম্পানির নিয়মাবলি বা articles, এবং অন্যাবিধ কাগজপত্র। দেওয়ালে সংলগ্ন তাকের উপর কতকগুলি ধূলিধূসর কাগজমোড়া শিশি এবং শূন্যগর্ভ মাদুলি। এককালে শ্যামবাবু পেটেন্ট ও স্বপ্নাদ্য ঔষধের কারবার করিতেন, এগুলি তাহারই নিদর্শন।

শ্যামবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গাঢ় শ্যামবর্ণ, কাঁচা-পাকা দাড়ি, আকণ্টলম্বিত কেশ, স্থূল লোমশ বপু। অল্পবয়স হইতেই তাঁহার স্বাধীন ব্যবসায়ে ঝোঁক, কিন্তু এ পর্যন্ত নানাপ্রকার কারবার করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ই. বি. রেলওয়ে অডিট আপিসের চাকরিই তাঁহার জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায়। দেশে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি এবং একটি জীর্ণ কালীমন্দির আছে, কিন্তু তাহার আয় সামান্য। চাকরির অবকাশে ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন—এ বিষয়ে শ্যালক বিপিনই তাঁহার প্রধান সহায়। সন্তানাদি নাই, কলিকাতার বাসায় পত্নী এবং শ্যালকসহ বাস করেন। ব্যবসায়ের কিছু উন্নতি হইলেই চাকরি ছাড়িয়া দিবেন, এইরূপ সংকল্প আছে। সম্প্রতি ছয় মাসের ছুটি লইয়া নূতন উদ্যমে ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল নামে আপিস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্যামবাবু ধর্মভীরু লোক, পঞ্জিকা দেখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং অবসর-মতো তান্ত্রিক সাধনা করিয়া থাকেন। বৃথা—অর্থাৎ ক্ষুধা না থাকিলে—মাংসভোজন, এবং অকারণে কারণ পান করেন না। কোন্ সন্ন্যাসী সোনা করিতে পারে, কাহার নিকট দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ বা একমুখী রুদ্রাক্ষ আছে, কে পারদ ভস্ম করিতে জানে, এই সকল সন্ধান প্রায়ই লইয়া থাকেন। কয়েক মাস হইতে বাটীতে গৈরিক বাস পরিধান করিতেছেন এবং কতকগুলি অনুরক্ত শিষ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্যামবাবু আজকাল মধ্যে মধ্যে নিজেকে 'শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী' আখ্যা দিয়া থাকেন, এবং অচিরে এই নামে পরিচিত হইবেন এরূপ আশা করেন।

শ্যামবাবু তাঁহার আপিস ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—'বাঞ্ছা, ওরে বাঞ্ছা।' বাঞ্ছা শ্যামবাবুর আপিসের বেয়ারা—এতক্ষণ পাশের গলিতে টুলে বসিয়া ঢুলিতেছিল—প্রভুর ডাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল। শ্যামবাবু বলিলেন—'গঙ্গাজলের বোতলটা আন, আর খাতাপত্রগুলো একটু ঝেড়ে-মুছে রাখ, যা ধুলো হয়েছে।' বাঞ্ছা একটা তামার কুপি আনিয়া দিল। শ্যামবাবু তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক লইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক গৃহমধ্যে ছিটাইয়া দিলেন। তারপর টেবিলের দেরাজ হইতে একটা সিন্দুর-চর্চিত রবার স্ট্যাম্পের সাহায্যে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখিলেন। স্ট্যাম্পে ১২ লাইন 'শ্রীশ্রীদুর্গা' খোদিত আছে, সুতরাং ৯ বার ছাপিলেই কার্যোদ্ধার হয়। এই শ্রমহারক যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা শ্রীমান বিপিন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন—'দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ' এবং পেটেন্ট লইবার চেষ্টায় আছেন।

উক্তপ্রকার নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া শ্যামবাবু প্রসন্নচিত্তে ব্যাগ হইতে ছাপাখানার একটি ভিজা প্রুফ বাহির করিয়া সংশোধন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জুতার মশমশ শব্দ করিতে করিতে অটলবাবু ঘরে আসিয়া বলিলেন—'এই যে শ্যামদা, অনেকক্ষণ এসেছেন বুঝি? বড়ো দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না—হাইকোর্টে একটা মোশন ছিল। ব্রাদার-ইন-ল কোথায়?'

শ্যামবাবু। বিপিন গেছে বাগবাজারে তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যের কাছে। আজ পাকা কথা নিয়ে আসবে। এই এল ব-লে।

অটলবাবু চাপকান চোগা-ধারী সদ্যোজাত অ্যাটর্নি, পিতার আপিসে সম্প্রতি জুনিয়ার পার্টনার-রূপে যোগ দিয়াছেন। গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, বিপিনের বাল্যবন্ধু। বয়সে নবীন হইলেও চাতুর্যে পরিপক্ক। জিজ্ঞাসা করিলেন—'বুড়ো রাজি হল? আচ্ছা, ওকে ধরলেন কি করে?'

শ্যাম। আরে তিনকড়িবাবু হলেন গে শরতের খুড়শ্বশুর। বিপিনের মাসতুতো ভাই শরৎ। ওই শরতের সং গিয়ে তিনকড়ি-বাবুকে ধরি। সহজে কী রাজি হয়? বুড়ো যেমন কঞ্জুস তেমনি সন্দিগ্ধ। বলে—আমি হলুম রায়সাহেব, রিটায়ার্ড ডেপুটি, গভরমেন্টের কাছে কত মান। কোম্পানির ডিরেক্টর হয়ে কি শেষে পেনশন খোয়াব? তখন নজির দিয়ে বোঝালুম—কত রিটায়ার্ড বড়ো বড়ো অফিসার তো ডিরেক্টরি করছেন, আপনার কীসের ভয়? শেষে যখন শুনলে যে, প্রতি মিটিং এ ৩২

টাকা কি পাবে, তখন একটু ভিজল।

অটল। কত টাকা শেয়ার নেবে?

শ্যাম। তাতে বড়ো হুঁশিয়ার। বলে—তোমার ব্রহ্মচারী কোম্পানি যে লুট করবে না, তার জামিন কে? তোমরা শালা ভগ্নীপতি মিলে ম্যানেজিং এজেন্ট হয়ে কোম্পানিকে ফেল করলে আমার টাকা কোথায় থাকবে? বললুম—মশায়, আপনার মতো বিচক্ষণ সাবধানী ডিরেক্টর থাকতে কার সাধ্য লুঠ করে। খরচপত্র তো আপনার চোখের সামনেই হবে। ফেল হতে দেবেন কেন? মন্দটা যেমন ভাবছেন, ভালোর দিকটাও দেখুন। কী রকম লাভের ব্যাবসা। খুব কম ক'রেও যদি ৫০ পারসেন্ট ডিভিডেন্ড পান তবে দু-বছরের মধ্যেই তো আপনার ঘরের টাকা ঘরে ফিরে এল। শেষে অনেক তর্কাতর্কির পর বললে—আচ্ছা, আমি শেয়ার নেব, কিন্তু বেশি নয়, ডিরেক্টর হতে হলে যে টাকা দেওয়া দরকার তার বেশি দেব না। আজ মত স্থির করে জানাবেন, তাই বিপিনকে পাঠিয়েছি।

অটল। অমন খুঁতখুঁতে লোক নিয়ে ভালো করলেন না শ্যাম-দা। আচ্ছা, মহারাজকে ধরলেন না কেন?

শ্যাম। মহারাজকে ধরতে বড়ো-শিকারি চাই, তোমার আমার কর্ম নয়। তা ছাড়া পাঁচ ভূতে তাঁকে শুষে নিয়েছে, কিছু আর পদার্থ রাখেনি।

অটল। খোট্টাটি ঠিক আছে তো? আসবে কখন?

শ্যাম। সে ঠিক আছে, এই রকম দাঁও মারতেই তো সে চায়। এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল। প্রস্পেক্টসটা তোমাদের শুনিয়ে আজই ছাপাতে দিতে চাই। তিনকড়িবাবুকে আসতে বলেছিলুম, বাতে ভুগছেন, আসতে পারবেন না জানিয়েছেন।

'রাম রাম বাবুসাহেব।'

আগন্তুক মধ্যবয়স্ক, শ্যামবর্ণ, পরিধানে সাদা ধুতি, লম্বা কালো বনাতের কোট, পায়ে বার্ণিশ-করা জুতা, মাথায় হলদে রঙের ভাঁজ-করা মখমলের পাগড়ি, হাতে অনেকগুলি আংটি, কানে পান্নার মাকড়ি, কপালে ফোঁটা।

শ্যামবাবু বলিলেন— 'আসুন, আসুন—ওরে বাঙ্কা, আর একটা চেয়ার দে। এই ইনি হচ্ছেন অটলবাবু, আমাদের সলিসিটর দত্ত কোম্পানির পার্টনার। আর ইনি হলেন আমার বিশেষ বন্ধু—বাবু গন্ডেরিরাম বাটপারিয়া।'

গন্ডেরি। নোমোস্কার, আপনার নাম শুনা আছে, জান পহ্চান হয়ে বড়ো খুশি হল।

অটল। নমস্কার, এই আপনার জন্যই আমরা বসে আছি। আপনার মতো লোক যখন আমাদের সহায়, তখন কোম্পানির আর ভাবনা কি।

গন্ডেরি। হেঁ হেঁ, সোকোলি ভগবানের ইচ্ছা। হামি একেলা কী করতে পারি? কুছু না।

শ্যাম। ঠিক, ঠিক। যা করেন মা তারা দীনতারিণী। দেখ অটল, গন্ডেরিবাবু যে কেবল পাকা ব্যবসাদার তা মনে করো না। ইংরিজি ভালো না জানলেও ইনি বেশ শিক্ষিত লোক, আর শাস্ত্রেও বেশ দখল আছে।

অটল। বাঃ, আপনার মতো লোকের সংগে আলাপ হওয়ায় বড়ো সুখী হলুম। আচ্ছা মশায়, আপনি এমন সুন্দর বাংলা বলতে শিখলেন কি করে?

গন্ডেরি। বহুত বাংগালির সংগে হামি মিলা মিসা করি। বাংলা কিতাব ভি অনেক পড়েছি। বঙ্কিমচন্দ, রবীন্দরনাথ, আউর ভি সব।

এমন সময় বিপিনবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। ইনি একটু সাহেবি মেজাজের লোক, এককালে বিলাত যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিধানে সাদা প্যান্ট কালো কোট, লাল নেকটাই, হাতে সবুজ ফেল্ট হ্যাট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ক্ষীণকায়, গোঁফের দুই প্রান্ত কামানো। শ্যামবাবু উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— 'কী হল?'

বিপিন। ডিরেক্টর হবেন বলেছেন, কিন্তু মাত্র দু হাজার টাকার শেয়ার নেবেন। তোমাকে অটলকে আমাকে পরশু সকালে ভাত খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। এই নাও চিঠি।

অটল। তিনকড়িবাবু হঠাৎ এত সদয় যে?

শ্যাম। বুঝলুম না। বোধ হয় ফেলো ডিরেক্টরদের একবার বাজিয়ে যাচাই করে নিতে চান।

অটল। যাক, এবার কাজ আরম্ভ করুন। আমি মেমোরান্ডম আর আর্টিকেল্‌সের মুসাবিদা এনেছি। শ্যাম-দা, প্রসপেক্টসটা কী রকম লিখলেন পড়ুন।

শ্যাম। হাঁ, সকলে মন দিয়ে শোন। কিছু বদলাতে হয়, তো এই বেলা। দুর্গা—দুর্গা—

জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ

১৯১৩ সালের ৭ আইন অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

মূলধন—দশ লক্ষ টাকা, ১০ হিসাবে ১০০,০০০ অংশে বিভক্ত। আবেদনের সঙ্গে অংশ পিছু ২ প্রদেয়। বাকি টাকা চার কিস্তিতে তিন মাসের নোটিশে প্রয়োজন মতো দিতে হইবে।

অনুষ্ঠানপত্র

ধর্মই হিন্দুগণের প্রাণস্বরূপ। ধর্মকে বাদ দিয়া-এ জাতির কোনো কর্মসম্পন্ন হয় না। অনেকে বলেন—ধর্মের ফল পরলোকে লভ্য। ইহা আংশিক সত্য মাত্র। বস্তুত ধর্মবৃত্তির উপযুক্ত প্রয়োগে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ উপকার এতদর্থে সদ্য সদ্য চতুর্বর্গ লাভের উপায়স্বরূপ এই বিরাট ব্যাপারে দেশবাসীকে আহ্বান করা হইতেছে।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত দেবমন্দিরগুলির কীরূপ বিপুল আয় তাহা সাধারণে জ্ঞাত নহেন। রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে ব:দেশের একটি দেবমন্দিরের দৈনিক যাত্রিসংখ্যা গড়ে ১৫ হাজার। যদি লোক পিছু চার আনা মাত্র আয় ধরা যায়, তাহা হইলে বাৎসরিক আয় প্রায় সাড়ে তেরো লক্ষ দাঁড়ায়। খরচ যতই হউক, যথেষ্ট টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। কিন্তু সাধারণে এই লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত।

দেশের এই বৃহৎ অভাব দূরীকরণার্থে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে একটি জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি স্থাপিত হইতেছে। ধর্মপ্রাণ শেয়ারহোল্ডারগণের অর্থে একটি মহান তীর্থক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে, এবং জাগ্রত দেবী সমন্বিত সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত হইবে। উপযুক্ত ম্যানেজিং এজেন্টের হস্তে কার্যনির্বাহের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। কোনও প্রকার অপব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। শেয়ারহোল্ডারগণ আশাতীত দক্ষিণা বা ডিভিডেন্ড পাইবেন এবং একধারে ধর্ম অর্থ মোক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

ডিরেক্টরগণ।—(১) অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ বিচক্ষণ ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট রায়সাহেব শ্রীযুক্ত গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া। (৩) সলিসিটর্স দত্ত অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদার শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত, M……,B.L. (৪) বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিস্টার বি. সি. চৌধুরী,B.Sc., A.S.S. (U.S.A.) (৫) কালীপদাশ্রিত সাধক ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ শ্যামানন্দ (ex-officio)।

অটলবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—'বিপিন আবার নতুন টাইটেল পেলে কবে?'

শ্যাম। আর বলো কেন। পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রে আমেরিকা না কামস্কাটকা কোথা থেকে তিনটে হরফ আনিয়েছে।

বিপিন। বা, আমার কোয়ালিফিকেশন না জেনেই বুঝি তারা শুধু শুধু একটা ডিগ্রী দিলে? ডিরেক্টর হতে গেলে একটা পদবি থাকা ভালো নয়?

গন্ডেরি। ঠিক বাত। ভেক বিনা ভিখ মিনে না। শ্যামবাবু, আপনিও এখনসে ধোতি-উতি ছোড়ে লঙোটি পিনহুন।

শ্যাম। আমি তো আর নাগা সন্ন্যাসী নই। আমি হলুম শক্তিমন্ত্রের সাধক, পরিধেয় হল রক্তাম্বর। বাড়িতে তো গৈরিকই ধারণ করি। তবে আপিসে পরে আসি না, কারণ, ব্যাটারা সব হাঁ করে চেয়ে থাকে। আর একটু লোকের চোখ-সহ্য হয়ে গেলে সর্বদাই গৈরিক পরব। যাক, পড়ি শোন—

মেসার্স ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল এই কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্সি লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন — ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁহারা লাভের উপর শতকরা দুই টাকা মাত্র কমিশন লইবেন এবং যতদিন না—

অটলবাবু বলিলেন—'কমিশনের রেট অত কম ধরলেন কেন? দশ পার্সেন্ট অনায়াসে ফেলতে পারেন।'

গন্ডেরি। কুছ দরকার নেই। শ্যামবাবুর পরবস্তি অপ্‌নেসে হোয়ে যাবে। কমিশনের ইরাদা থোড়াই করেন।

এবং যতদিন না কমিশনে মাসিক ১০০০ টাকা পোষায়, ততদিন শেষোক্ত টাকা অ্যালাউয়েন্স রূপে পাইবেন।

গন্ডেরি। শুনেন অটলবাবু, শুনেন। আপনি শ্যামবাবুকে কি শিখ্‌লাবেন?

হুগলি জেলা অন্তঃপাতী গোবিন্দপুর গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী দেবী বহু শতাব্দী যাবৎ প্রতিষ্ঠিতা আছেন। দেবীমন্দির ও তৎসংলগ্ন সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সম্প্রতি স্বপ্নাদেশ পাইয়াছেন যে উক্ত গোবিন্দপুর গ্রামে অধুনা সর্বপীঠের সমন্বয় হইয়াছে এবং মাতা তাঁহার মাহাত্ম্যের উপযোগী সুবৃহৎ মন্দিরে বাস করিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী অবলা বিধায় এবং উক্ত দৈবাদেশ স্বয়ং পালন করিতে অপারগ বিধায়, উক্ত দেবত্র সম্পত্তি মায় মন্দির বিগ্রহ জমি আওলাত আদি এই লিমিটেড কোম্পানিকে সমর্পণ করিতেছেন।

অটল। নিস্তারিণী দেবী আবার কোথা থেকে এলেন? সম্পত্তি তো আপনার বলেই জানতুম।

শ্যাম। উনি আমার স্ত্রী। সেদিন তাঁর নামেই সব লেখাপড়া করে দিয়েছি। আমি এসব বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে চাই না।

গন্ডেরি। ভালো বন্দোবস্ত্ কিয়েছেন। আপনেকো কোই দুস্‌বে না। নিস্তার্‌নী দেবীকো কোন্ পহ্‌চানে। দাম কেতো লিচ্ছেন?

অতঃপর তীর্থপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরনির্মাণ, দেবসেবাদি কোম্পানি কর্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং এতদর্থে কোম্পানি মাত্র ১৫,০০০ টাকা পণে সমস্ত সম্পত্তি খরিদার্থে বায়না করিয়াছেন।

গন্ডেরি। হদ্দ কিয়া শ্যামবাবু। জঙ্গল কি ভিতর পুরানা মন্দিল, উস্‌মে দো-চার শও ছুছুন্দর, ছটাক ভর জমিন, উস্‌পর দো-চার বাঁশ ঝাড়—বস্, ইসিকা দাম পন্দ্র হজার।

শ্যাম। কেন, অন্যায়টা কী হল? স্বপ্নাদেশ, একান্ন পীঠ এক ঠাঁই, জাগ্রত দেবী—এসব বুঝি কিছু নয়। গুড-উইল হিসেবে পনেরো হাজার টাকা খুবই কম।

গন্ডেরি। আচ্ছা। যদি কোই শেয়ারহোল্ডার হাইকোর্ট মে দরকাস্ত পেশ করে—স্বপনঃউপন সব ঝুট, ছকলায়কে রূপয়া লিয়া—তব্?

অটল। সে একটা কথা বটে, কিন্তু এই সব আধিদৈবিক ব্যাপার বোধ হয় অরিজিনাল সাইডের জুরিস্‌ডিক্‌শনে পড়ে না। আইন বলে—*caveat emptor*, অর্থাৎ ক্রেতা সাবধান। সম্পত্তি কেনবার সময় যাচাই করনি কেন? যা হোক একবার *expert opinion* নেব।

শীঘ্রই নূতন দেবালয় আরম্ভ হইবে। তৎসংলগ্ন প্রশস্ত নাটমন্দির, নহবতখানা, ভোগশালা, ভান্ডার প্রভৃতি আনুষঙ্গিক গৃহাদিও থাকিবে। আপাতত দশ হাজার যাত্রীর উপযুক্ত অতিথিশালা নির্মিত হইবে। শেয়ারহোল্ডারগণ বিনা খরচায় সেখানে

সপরিবারে বাস করিতে পারিবেন। হাট বাজার যাত্রা থিয়েটার বায়োস্কোপ ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের আয়োজন যথেষ্ট থাকিবে। যাঁহারা দৈবাদেশ বা ঔষধপ্রাপ্তির জন্য হত্যা দিবেন তাঁহাদের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকিবে। মোট কথা, তীর্থযাত্রী আকর্ষণ করিবার সর্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বিত হইবে। স্বয়ং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী "সেবার ভার লইবেন।

যাত্রিগণের নিকট হইতে যে দর্শনী ও প্রণামী আদায় হইবে, তাহা ভিন্ন আরও নানা উপায়ে অর্থাগম হইবে। দোকান হাট বাজার অতিথিশালা মহাপ্রসাদ বিক্রয় প্রভৃতি হইতে প্রচুর আয় হইবে। এতদ্‌ভিন্ন by-product recovery-র ব্যবস্থা থাকিবে। "সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হবে এবং প্রসাদী বিল্বপত্র মাদুলিতে ভরিয়া বিক্রীত হইবে। চরণামৃতও বোতলে প্যাক করা হইবে। বলির জন্য নিহত ছাগসমূহের চর্ম ট্যান করিয়া উৎকৃষ্ট কিড-স্কিন প্রস্তুত হইবে এবং বহুমূল্যে বিলাতে চালান যাইবে। হাড় হইতে বোতাম হইবে। কিছুই ফেলা যাইবে না।

গন্ডেরি। বকরি মারবেন? হামি ইসিমি নহি, রামজি কিরিয়া। হামার নাম কাটিয়ে নিন।

শ্যাম। আপনি তো আর নিজে বলি দিচ্ছেন না। আচ্ছা, না হয় কুমড়ো-বলির ব্যবস্থা করা যাবে।

অটল। কুমড়োর চামড়া তো ট্যান হবে না। আয় কমে যাবে। কিহে বৈজ্ঞানিক, কুমড়োর খোসার একটা গতি করতে পার?

বিপিন। কস্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে বোধ হয় ভেজিটেব্‌ল শু হতে পারে। এক্সপেরিমেন্ট করে দেখব।

গন্ডেরি। জো খুশি করো। হমার কি আছে। হামি থোড়া রোজ বাদ আপনা শেয়ার বিলকুল বেচে দিব।

হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে কোম্পানির বাৎসরিক লাভ অন্তত ১২ লক্ষ টাকা হইবে এবং অনায়াসে ১০০ পারসেন্ট ডিভিডেন্ড দেওয়া যাইবে। ৩০ হাজার শেয়ারের আবেদন পাইলে অ্যালটমেন্ট হইবে। সত্বর শেয়ারের জন্য আবেদন করুন। বিলম্বে এই সুবর্ণসুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

গন্ডেরি। লিখে লিন—ঢাই লাখ টাকার শেয়ার বিক্রি হয়ে গেছে। হামি এক লাখ লিব, বাকি দেড় লাখ শ্যামবাবু বিপিন বাবু অটলবাবু সমান হিস্‌সা লিবেন।

শ্যাম। পাগল আর কী। আমি আর বিপিন কোথা থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ হাজার বার করব? আপনারা না হয় বড়োলোক আছেন।

গন্ডেরি। হামি-শালা রুপয়া ডালবো আর তুমি লোগ মৌজ করবে? সো হোবে না। সব্‌কা ঝৌথি লেনা পড়েগা। শ্যামবাবু মতলব সমঝেলন না? টাকা কোই দিব না। সব হাওলাতী থাকবে। মেনেজিং এজিন্ট মহাজন হোবে।

অটল। বুঝলেন শ্যাম-দা? আমরা সকলে যেন ম্যানেজিং এজেন্টস্‌দের কাছ থেকে কর্জ করে নিজের নিজের শেয়ারের টাকা কোম্পানিকে দিচ্ছি; আবার কোম্পানি ওই টাকা ম্যানেজিং এজেন্টস্‌দের কাছে গচ্ছিত রাখছে। গাঁট থেকে এক পয়সাও কেউ দিচ্ছেন না, টাকাটা কেবল খাতাপত্রে জমা থাকবে।

শ্যাম। তার পর তাল সামলাবে কে? কোম্পানি ফেল হলে আমি মারা যাই আর কি। বাকি সকলের টাকা দেব কোথা থেকে?

গন্ডেরি। ডরেন কেনো? শেয়ার পিছু তো অভি দো টাকা দিতে হোবে। ঢাই লাখ টাকার শেয়ারে সির্ফ্ পচাস হজার দেনা হোয়। প্রিমিয়ম মে সব বেচে দিব—সুবিস্তা হোয় তো আউর ভি শেয়ার ধ'রে রাখবো। বহুত মুনাফা মিলবে। চিম্‌ড়িমল ব্রোকারসে হামি বন্দোবস্ত কিয়েছি। দো চার দফে হম লোগ আপ্‌না শেয়ার লেকে খেলবো, হাঁথ বাদলাবো, দাম চড়বে, বাজার গরম হোবে। তখন সব কোই শেয়ার মাংবে, দাম কা বিচার করবে না। কবিরজী কি বচন শুনিয়ে—

ঐসী গতি সন্‌সারমে যো গাড়র কি ঠাট
একা পড়া যব গাঢ়মে সবৈ যাত তেহি বাট।।

মানি হচ্ছে—সন্‌সারের লোক সব যেন ভেড়ার পাল। এক ভেড়া যদি খাদ্দেমে গির পড়ে তো সব কোই উসিমে ঘুসে।

শ্যামবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—'তারা ব্রহ্মময়ী, তুমিই জানো। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তোমার কাজ তুমিই উদ্ধার করে দাও মা—অধম সন্তানকে যেন মেরো না।'

গন্ডেরি। শ্যামবাবু, মন্দিল-উন্দিলকা কোম্পানি যো কর্‌না হ্যায় কিজিয়ে। উস্‌কি সাথ ঘই-এর কারবার ভি লাগায় দিন। টাকায় টাকা লাভ।

অটল। ঘই কি চিজ?

গন্ডেরি। ঘই জানেন না? ঘিউ হচ্ছে আস্‌লি চিজ—যো গায় ভঁইস বকড়িকা দুধসে বনে। আউর নক্‌লি যো হ্যায় সো ঘই কহ্‌লাতা। চর্বি, চীনাবাদাম তল ওগায়রহ্‌ মিলা কর্‌ বনায়া যাতা। পর্‌ সাল হামি ঘই-এর কামে পচিশ হজার লাগাই, সাড়ে চৌবিশ হজার মুনাফা মিলে।

অটল। উঃ বিস্তর সাপ মেরেছিলেন বলুন।

গান্ডেরি। আরে সাঁপ কাঁহাসে মিল্‌বে? উ সব ঝুট বাত।

অটল। আচ্ছা গন্ডারজি—

গন্ডেরি। গন্ডার নেহি, গন্ডেরি।

অটল। হাঁ, হাঁ, গন্ডেরিজি। বেগ ইওর পার্ডন। আচ্ছা, আপনি তো নিরামিষ খান, ফোঁটা কাটেন, ভজন-পূজনও করেন।

গন্ডেরি। কেনো করবো না? হামি হর্‌ রোজ গীতা আউর রামচরিতমানস পড়ি, রামভজন ভি করি।

অটল। তবে অমন পাপের ব্যাবসাটা করলেন কী বলে?

গন্ডেরি। পাঁপ? হামার কোনো পাঁপ হোবে? বেবসা তো করে কাসেম আলি। হামি রহি কলকত্তা, ঘই বনে হাথরস্‌মে। হামি ন আঁখসে দেখি, না নাকসে শুংখি—হনুমানজী কিরিয়া। হামি তো সির্প মহাজন আছি—রুপয়া দে কর্‌ খালাস। সুদ লি, মুনাফার আধা হিস্‌সা ভি লি। যদি হামে টাকা না দি, কাসেম আলি দুসরা ধনীসে লিবে। পাপ হোলে তো শালা কাসেম আলিকা হোবে। হামার কী? যদি ফিন কুছ্‌ দোষ লাগে—জানে রন্‌ছোড়জি—হামার পুন্‌ভি থোড়া-বহত জমা আছে। একাদ্‌শী, শিউরাত, রামনওমীমে উপবাঁস, দান-খয়রাত ভি কুছু করি। আট আটঠো ধরমশালা বানোআয়া—লিলুয়ামে, বালিমে, শেওড়াফুলিমে—

অটল। লিলুয়ার ধর্মশালা তো আশরফিলাল ঠুনঠুনওয়ালা করেছে।

গন্ডেরি। কিয়েছে তো কি হইয়েছে? সভি তো ওহি কিয়েছে। লেকিন বানিয়ে দিয়েছে কোন্‌? তদারক কোন্‌ কিয়েছে? ঠিকাদার কোন্‌ লাগিয়েছে? সব হামি। আশরফি হমার চাচেরা ভাই লাগে। হামি সলাহ্‌ দিয়েছি তব্‌ না রুপয়া খরচ কিয়েছে।

অটল। মন্দ নয়, টাকা ঢাললে আশরফি, পুণ্য হল গন্ডেরির।

গন্ডেরি। কেনো হোবে না? দো দো লাখ রুপয়া হর্‌ জগেমে খরচ দিয়া। জোড়িয়ে তো কেতনা হোয়। উস পর কম্‌সে কম সঁয়কড়া পাঁচ রুপয়া দস্তুরি তো হিসাব কিজিয়ে। হাম তো বিলকুল ছোড় দিয়া। আশরফিলালকা পুন্‌ যদি সোলহ্‌ লাখকা হোয়, মেরা ভি অস্‌সি হজার মোতাবেক হোনা চাহ্‌তা।

অটল। চমৎকার ব্যবস্থা। পুণ্যেরও দেখছি দালালি পাওয়া যায়। আমাদের শ্যাম-দা গন্ডেরি-দা যেন মানিকজোড়।

গন্ডেরি। অটলবাবু, আপনি দো চার অংরেজি কিতাব পঢ়িয়ে হামাকে ধরম কি শিখ্‌লাবেন? বাংলি ধরম জানে না। তিস রুপয়ার নোকরি করবে, পাঁচ পইসার হরিলুঠ দিবে। হামার জাত রুপয়া ভি কামায় হিসাবসে, পুন্‌ ভি করে হিসাবসে।

আপ্‌নেদের রবীন্দরনাথ কী লিখছেন—

বৈরাগ সাধন মুক্তি সো হমার নেহি।

হামি এখ্‌ন চলছি, রেস খেলনে। কোন্থি গেরিল ঘোড়ে পর্ আজ দো-চারশও লাগিয়ে দিব।

অটল। আমিও উঠি শ্যাম-দা। আর্টিকেলের মুসাবিদা রেখে যাচ্ছি, দেখে রাখবেন। প্রস্‌পেক্টাস্ তো দিব্বি হয়েছে। একটু আধটু বদ্‌লে দেব এখন। পরশু আবার দেখা হবে। নমস্কার।

বাগবাজারে গলির ভিতর রায়সাহেব তিনকড়িবাবুর বাড়ি। নীচের তলায় রাস্তার সম্মুখে নাতিবৃহৎ বৈঠকখানা-ঘরে গৃহকর্তা এবং নিমন্ত্রিতগণ গল্পে নিরত, অন্দর হইতে কখন ভোজনের ডাক আসিবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। আজ রবিবার, তাড়া নাই, বেলা অনেক হইয়াছে।

তিনকড়িবাবুর বয়স ষাট বৎসর, ক্ষীণ দেহ, দাড়ি কামানো। শীর্ণ গোঁফে তামাকের ধোঁয়ায় পাকা খেজুরের রং ধরিয়াছে—কথা কহিবার সময় আরসোলার দাড়ার মতো নড়ে। তিনি দৈব ব্যাপারে বড়ো একটা বিশ্বাস করেন না। প্রথম পরিচয়ে শ্যামবাবুকে বুজরুক সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কেবল লাভের আশায় কোম্পানিতে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু আজ কালীঘাট হইতে প্রত্যাগত সদ্যঃস্নাত শ্যামবাবুর অভিনব মূর্তি দেখিয়া কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্যামবাবুর পরিধানে লাল চেলী, গেরুয়া রঙের আলোয়ান, পায়ে বাঘের চামড়ার শিং-তোলা জুতা। দাড়ি এবং চুল সাজিমাটি দ্বারা যথাসম্ভব ফাঁপানো, এবং কপালে মস্ত একটি সিন্দুরের ফোঁটা।

তিনকড়িবাবু তামাক-টানার অন্তরালে বলিতেছিলেন— 'দেখুন স্বামীজি, হিসেবই হল ব্যবসার সব। ডেবিট ক্রেডিট যদি ঠিক থাকে, আর ব্যালান্স যদি মেলে, তবে সে বিজনেসের কোনও ভয় নেই।'

শ্যামবাবু। আজ্ঞে, বড়ো যথার্থ কথা বলেছেন। সেইজন্যেই তো আমরা আপনাকে চাই। আপনাকে আমরা মধ্যে মধ্যে এসে বিরক্ত করব, হিসেব সম্বন্ধে পরামর্শ নেব—

তিনকড়ি। বিলক্ষণ, বিরক্ত হব কেন। আমি সমস্ত হিসেব ঠিক ক'রে দেব। মিটিংগুলো একটু ঘন ঘন করবেন। না হয় ডিরেক্টর্স্ ফি বাবদ কিছু বেশি খরচ হবে। দেখুন, অডিটার-ফডিটার আমি বুঝি না। আরে বাপু, নিজের জমাখরচ যদি নিজে না বুঝলি তবে বাইরের একটা অর্বাচীন ছোকরা এসে তার কী বুঝবে? ভারী আজকাল সব বুক-কিপিং শিখেছেন। সে কী জানেন—একটা গোলকধাঁধা, কেউ যাতে না বোঝে তারই চেষ্টা। আমি বুঝি—রোজ কত টাকা এল, কত খরচ হল, আর আমার মজুদ রইল কত। আমি যখন আমড়াগাছি সবডিভিশনের ট্রেজারির চার্জে, তখন এক নতুন কলেজ-পাস গোঁফকামানো ডেপুটি এলেন আমার কাছে কাজ শিখতে। সে ছোকরা কিছুই বোঝে না, অথচ অহংকারে ভরা। আমার কাজে গলদ ধরবার আস্পর্ধা। শেষে লিখলুম কোল্ডহাম সাহেবকে, যে হুজুর, তোমরা রাজার জাত, দুঘা দাও তাও সহ্য হয়, কিন্তু দিশি ব্যাঙাচির লাথি বরদাস্ত করব না। তখন সাহেব নিজে এসে সমস্ত বুঝে নিয়ে আড়ালে ছোকরাকে ধমকালেন। আমাকে পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন—ওয়েল তিনকড়িবাবু, তুমি হ'লে কতকালের সিনিয়র অফিসর, একজন ইয়ং চ্যাপ তোমার কদর কী বুঝবে? তারপর দিলেন আমাকে নওগাঁয়ে গাঁজা-গোলার চার্জে বদলি করে। যাক সে কথা। দেখুন, আমি বড়ো কড়া লোক। জবরদস্ত হাকিম বলে আমার নাম ছিল। মন্দির টন্দির আমি বুঝি না, কিন্তু একটি আধলাও কেউ আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। রক্ত জল করা টাকা আপনার জিম্মায় দিচ্ছি, দেখবেন যেন—

শ্যাম। সে কি কথা? আপনার টাকা আপনারই থাকবে আর শতগুণ বাড়বে। এই দেখুন না—আমি আমার যথাসর্বস্ব পৈতৃক পঞ্চাশ হাজার টাকা এতে ফেলেছি। আমি না হয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, অর্থে প্রয়োজন নেই, লাভ যা হবে মায়ের সেবাতেই ব্যয় করব। বিপিন আর এই অটল ভায়াও প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার ফেলছেন। গণ্ডেরি এক লাখ টাকার শেয়ার নিয়েছে। সে মহা হিসেবি লোক—লাভ নিশ্চিত না জানলে কী নিত?

তিনকড়ি। বটে, বটে? শুনে আশ্বাস হচ্ছে। আচ্ছা, একবার কোল্ডহাম সাহেবকে কনসাল্ট করলে হয় না? অমন সাহেব আর হয় না।

ঠাঁই হয়েছে'—চাকর আসিয়া খবর দিল।

উঠতে আজ্ঞা হক ব্রহ্মচারী মশায়, আসুন অটলবাবু, চল হে বিপিন। তিনকড়িবাবু সকলকে অন্দরের বারান্দায় আনিলেন।

শ্যামবাবু বলিলেন—'করেছেন কি রায়সাহেব, এ যে রাজসূয় যজ্ঞ। কই আপনি বসলেন না?'

তিনকড়ি। বাতে ভুগছি, ভাত খাইনে, দু-খানা সুজির রুটি বরাদ্দ।

শ্যাম। আমি একটা ফেৎকারিণী-তন্ত্রোক্ত কবচ পাঠিয়ে দেব, ধারণ ক'রে দেখবেন। শাক ভাজা, কড়াইয়ের ডাল—এটা কী দিয়েছ ঠাকুর, এঁচোড়ের ঘন্ট? বেশ, বেশ? শোধন করে নিতে হবে। সুপক্ক কদলী আর গব্যঘৃত বাড়িতে হবে কি? আয়ুর্বেদে আছে—পনসে কদলং কদলে ঘৃতম্। কদলীভক্ষণে পনসের দোষ নষ্ট হয়, আবার ঘৃতের দ্বারা কদলীর শৈত্যগুণ দূর হয়। পুঁটি মাছ ভাজা— বাঃ। রোহিতাদপি রোচকঃ পুষ্টিকাঃ সদ্যভর্জিতাঃ। ওটা কীসের অম্বল বললে—কামরাঙা? সর্বনাশ, তুলে নিয়ে যাও। গত বৎসর শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে ওই ফলটি জগন্নাথ প্রভুকে দান করেছি। অম্বল জিনিসটা আমারও সয়ও না—শ্লেষ্মার ধাত কি না। উস্‌প্, উস্‌প্, উস্‌প্। প্রাণায় অপানায় স্বাহা। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ ভোজনে তু জনার্দনম্। আরম্ভ করো হে অটল।

অটল। (জনান্তিকে) আরম্ভের ব্যবস্থা যা দেখছি তাতে বাড়ি গিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে।

তিনকড়ি। আচ্ছা ঠাকুরমশায়, আপনাদের তন্ত্রশাস্ত্রে এমন কোনো প্রক্রিয়া নেই যার দ্বারা লোকের —ইয়ে—মানমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে?

শ্যাম। অবশ্য আছে। যথা কুলার্ণবে—অমানিনা মানদেন। অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলে অমানী ব্যক্তিকেও মান দেন। কেন বলুন তো?

তিনকড়ি। হাঃ হাঃ, সে একটা তুচ্ছ কথা। কী জানেন, কোল্ডহাম সাহেব বলেছিলেন, সুবিধা পেলেই লাট সাহেবকে ধরে আমায় বড়ো খেতাব দেওয়াবেন। বার বার তো রিমাইন্ড করা ভালো দেখায় না তাই ভাবছিলুম যদি তন্ত্রে-মন্ত্রে কিছু হয়। মানিনে যদিও, তবুও—

শ্যাম। মানতেই হবে। শাস্ত্র মিথ্যা হতে পারে না। আপনি নিশ্চিত থাকুন, এ বিষয়ে আমার সমস্ত সাধনা নিয়োজিত করব। তবে সদ্‌গুরু প্রয়োজন, দীক্ষা ভিন্ন এসব কাজ হয় না। গুরুও আবার যে-সে হলে চলবে না। খরচ—তা আমি যথা সম্ভব অল্পেই নির্বাহ করতে পারব।

তিনকড়ি। হুঁ। দেখা যাবে এখন। আচ্ছা, আপনাদের আপিসে তো বিস্তর লোকজন দরকার হবে, তা—আমার একটি শালীপো আছে, তার একটা হিল্লে লাগিয়ে দিতে পারেন না? বেকার বসে বসে আমার অন্ন ধ্বংস করছে, লেখাপড়া শিখলে না, কুসঙ্গে মিশে বিগড়ে গেছে। একটা চাকরি জুটলে বড়ো ভালো হয়। ছোকরা বেশ চটপটে আর স্বভাব-চরিত্রও বড়ো ভালো।

শ্যাম। আপনার শালীপো? কিছু বলতে হবে না। আমি তাকে মন্দিরের হেড-পাণ্ডা করে দেব। এখনি গোটা-পনেরো দরখাস্ত এসেছে—তাঁর মধ্যে পাঁচজন গ্রাজুয়েট। তা আপনাদের আত্মীয়ের ক্লেম সবার ওপর।

তিনকড়ি। আর একটি অনুরোধ। আমার বাড়িতে একটি পুরনো কাঁসর আছে—একটু ফেটে গেছে, কিন্তু আদত খাঁটী কাঁসা। এ জিনিসটা মন্দিরের কাজে লাগানো যায় না? সস্তায় দেব।

শ্যাম। নিশ্চয়ই নেব। ওসব সেকেলে জিনিস কি এখন সহজে মেলে?

গন্ডেরির ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের জোরে এবং প্রতিষ্ঠাতৃগণের চেষ্টায় সমস্ত শেয়ারই বিলি হইয়া গিয়াছে। লোকে শেয়ার লইবার জন্য অস্থির, বাজারে চড়া দামে বেচা-কেনা হইতেছে।

অটলবাবু বলিলেন—'আর কেন শ্যাম-দা, এইবার নিজের শেয়ার সব ঝেড়ে দেওয়া যাক। গন্ডেরি তো খুব একচোট মারলে। আজকে ডবল দর। দু-দিন পরে কেউ ছোঁবেও না।'

শ্যাম। বেচতে হয় বেচ, মোদ্দা কিছু তো হাতে রাখতেই হবে, নইলে ডিরেক্টর হবে কি করে?

অটল। ডিরেক্টারি আপনি করুন গে। আমি আর হাঙ্গামায় থাকতে চাইনে। সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় আপনার তো কার্যসিদ্ধি হয়েছে।

শ্যাম। এই তো সবে আরম্ভ। মন্দির, ঘরদোর, হাট-বাজার সবই তো বাকি। তোমাকে কী এখন ছাড়া যায়?

অটল। থেকে আমার লাভ? পেটে খেলে পিঠে সয়। এখন তো ব্রাদার-ইন-ল কোম্পানির মরশুম চলল। আমাদের এইখানে শেষ।

শ্যাম। আরে ব্যস্ত হও কেন, এক যাত্রায় কি পৃথক্‌ ফল হয়? সন্ধেবেলা যাব এখন তোমাদের বাড়িতে,—গন্ডেরিকেও নিয়ে যাব।

দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল কোম্পানির আপিসে ডিরেক্টরগণের সভা বসিয়াছে। সভাপতি তিনকড়িবাবু টেবিলে ঘুষি মারিয়া বলিতেছিলেন—'আ—আ—আমি জানতে চাই, টাকা সব গেল কোথা। আমার তো বাড়িতেই টেকা ভার,—সবাই এসে তাড়া দিচ্ছে। কয়লাওয়ালা বলে তার পঁচিশ হাজার টাকা পাওনা, ইটখোলার ঠিকাদার বলে বারো হাজার, তার পর ছাপাখানাওলা, শার্পার কোম্পানি, কুন্ডু মুখুজ্যে, আরও কত কে আছে। বলে আদালতে যাব। মন্দিরের কোথা কি তার ঠিক নেই—এর মধ্যে দু-লাখ টাকা ফুঁকে গেল? সে ভন্ড জোচ্চোরটা গেল কোথা? শুনতে পাই ডুব মেরে আছে, আপিসে বড়ো-একটা আসে না।'

অটল। ব্রহ্মচারী বলেন, মা তাঁকে অন্য কাজে ডাকছেন—এদিকে আর তেমন মন নেই। আজ তো মিটিং-এ আসবেন বলেছেন।

বিপিন বলিলেন—'ব্যস্ত হচ্চেন কেন সার, এই তো ফর্দ রয়েছে, দেখুন না—জমি-কেনা, শেয়ারের দালালি, preliminary expense, ইট-তৈরি, establishment, বিজ্ঞাপন, আপিস-খরচ—'

তিনকড়ি। চোপ রও ছোকরা। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।

এমন সময় শ্যামবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—'ব্যাপার কি?'

তিনকড়ি। ব্যাপার আমার মাথা। আমি হিসেব চাই।

শ্যাম। বেশ তো, দেখুন না হিসেব। বরঞ্চ একদিন গোবিন্দপুরে নিজে গিয়ে কাজকর্ম তদারক করে আসুন।

তিনকড়ি। হ্যাঁ, আমি এই বাতের শরীর নিয়ে তোমার ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুর গিয়ে মরি আর কি। সে হবে না—আমার টাকা ফেরত দাও। কোম্পানি তো যেতে বসেছে। শেয়ারহোল্ডাররা মার-মার কাট-কাট করছে।

শ্যামবাবু কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিলেন—'সকলই জগন্মাতার ইচ্ছা। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। এতদিন তো মন্দির শেষ হওয়ারই কথা। কতকগুলো অজ্ঞাতপূর্ব কারণে খরচ বেশি হয়ে গিয়ে টাকার অনটন হয়ে পড়ল, তাতে আমাদের আর অপরাধ কী? কিন্তু চিন্তার কোনও কারণ নেই, ক্রমশ সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একটা call-এর টাকা তুললেই সমস্ত দেনা শোধ হয়ে যাবে, কাজও এগোবে।'

গন্ডেরি বলিলেন—'আউর টাকা কোই দিবে না, আপকো থোড়াই বিশোআস করবে।'

শ্যাম। বিশ্বাস না করে, নাচার। আমি দায়মুক্ত, মা যেমন করে পারেন নিজের কাজ চালিয়ে নিন। আমাকে বাবা বিশ্বনাথ কাশীতে টানছেন, সেখানেই আশ্রয় নেব।

তিনকড়ি। তবে বলতে চাও, কোম্পানি ডুবল।

গন্ডেরি। বিশ হাঁথ পানি।

শ্যাম। আচ্ছা তিনকড়িবাবু, আমাদের ওপর যখন লোকের এতই অবিশ্বাস, বেশ তো, আমরা না হয় ম্যানেজিং এজেন্সি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার নাম আছে সম্ভ্রম আছে, লোকেও শ্রদ্ধা করে, আপনিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে কোম্পানি চালান না?

অটল। এইবার পাকা কথা বলেছেন।

তিনকড়ি। হ্যাঁ, আমি বদনামের বোঝা ঘাড়ে নিই, আর ঘরের খেয়ে বুনো মোষ তাড়াই।

শ্যাম। বেগার খাটবেন কেন? আমিই এই মিটিং-এ প্রস্তাব করছি যে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ব্যানার্জী মহাশয়কে মাসিক ১০০০ পারিশ্রমিক দিয়ে কোম্পানি চালাবার ভার অর্পণ করা হোক। এমন উপযুক্ত কর্মদক্ষ লোক আর কোথা? আর, আমরা যদি ভুলচুক করেই থাকি, তার দায়ী তো আর আপনি হবেন না।

তিনকড়ি। তা-তা-আমি চট্ ক'রে কথা দিতে পারিনে। ভেবে-চিন্তে দেব।

অটল। আর দ্বিধা করবেন না রায়সাহেব। আপনিই এখন ভরসা।

শ্যাম। যদি অভয় দেন তো আর একটি নিবেদন করি। আমি বেশ বুঝেছি, অর্থ হচ্ছে সাধনের অন্তরায়। আমার সমস্ত সম্পত্তিই বিলিয়ে দিয়েছি, কেবল এই কোম্পানির ষোলোশো খানেক শেয়ার আমার হাতে আছে। তাও সৎপাত্রে অর্পণ করতে চাই। আপনিই সেটা নিয়ে নিন। প্রিমিয়ম চাই না-আপনি কেনাদাম ৩২০০ মাত্র দিন।

তিনকড়ি। হ্যাঁঃ, ভালো করে আমার ঘাড় ভাঙবার মতলব।

শ্যাম। ছি ছি। আপনার ভালোই হবে। না হয় কিছু কম দিন, —চব্বিশ-শ-দু-হাজার—হাজার—

তিনকড়ি। এক কড়াও নয়।

শ্যাম। দেখুন, ব্রাহ্মণ হতে ব্রাহ্মণের দান-প্রতিগ্রহ নিষেধ, নইলে আপনার মতো লোককে আমার অমনিই দেবার কথা। আপনি যৎকিঞ্চিৎ মূল্য ধরে দিন। ধরুন—পাঁচশো টাকা। ট্রান্স্ফার ফর্ম আমার প্রস্তুতই আছে—নিয়ে এস তো বিপিন।

তিনকড়ি। আমি এ—এ—আসি টাকা দিতে পারি।

শ্যাম। তথাস্তু। বড়োই লোকসান হল কিন্তু সকলেই মায়ের ইচ্ছা।

গন্ডেরি। বাহবা তিনকৌড়িবাবু, বহুত কিফায়ত হুয়া?

তিনকড়িবাবু পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া সদ্যঃপ্রাপ্ত পেনশনের টাকা হইতে আটখানা আনকোরা দশ টাকার নোট সন্তর্পণে গণিয়া দিলেন। শ্যামবাবু পকেটস্থ করিয়া বলিলেন—'তবে এখন আমি আসি। বাড়িতে সত্যনারায়ণের পূজা আছে। আপনিই কোম্পানির ভার নিলেন এই কথা স্থির। শুভমস্তু—মা-দশভূজা আপনার মঙ্গল করুন।'

শ্যামবাবু প্রস্থান করিলে তিনকড়িবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'লোকটা দোষে গুণে মানুষ। এদিকে যদিও হাম্বগ, কিন্তু মেজাজটা দিলদরিয়া। কোম্পানির ঝক্কিটা তো এখন আমার ঘাড়ে পড়ল। ক-মাস বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলুম, কিছুই দেখতে পারিনি, নইলে কি কোম্পানির অবস্থা এমন হয়? যা হোক, উঠে-পড়ে লাগতে হল—আমি লেফাফা-দুরস্ত কাজ চাই, আমার কাছে কারও চালাকি চলবে না।'

গন্ডেরি। অপ্‌নের কুছ তকলিফ করতে হোবে না। কম্পানি তো ডুব গিয়া। অপ্‌কোভি ছুট্টি।

তিনকড়ি। তা হ'লে কি বলতে চাও আমার মাসহারাটা—

গন্ডেরি। হাঃ, হাঃ, তুম্‌ভি রুপয়া লেওগে? কাঁহাসে মিলবে বাতলাও। তিনকৌড়িবাবু, শ্যামবাবুকা কার্‌বারই নহি সমঝা? নব্বে হাজার রুপয়া কম্প্‌নিকা দেনা। দো রাজ বাদ লিকইডেশন। লিকুইডেটের সিকিস্ত কল আদায় করবে, তব্‌ দেনা শুধবে।

তিনকড়ি। হ্যাঁ, বল কি? আমি এক পয়সাও দিচ্ছি না।

গন্ডেরি। আলবত দিবেন। গবরমিন্ট কান পকড়্‌কে আদায় করবে। আইন এইসি হ্যায়।

তিনকড়ি। আরও টাকা যাবে। সে কত?

অটল। আপনার একলার নয়। প্রত্যেক অংশীদারকেই শেয়ারপিছু ফের দু-টাকা দিতে হবে। আপনার পূর্বের ২০০ শেয়ার ছিল, আর শ্যাম-দার ১৬০০ আজ নিয়েছেন। এই ১৮০০ শেয়ারের ওপর আপনাকে ছত্রিশশো টাকা দিতে হবে। দেনা শোধ, লিকুইডেশনের খরচা—সমস্ত চুকে গেলে শেষে সামান্য কিছু ফেরত পেতে পারেন।

তিনকড়ি। তোমাদের কত গেল?

গন্ডেরি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—'কুছ্‌ভি নহি, কুছ্‌ভি নহি। আরে হামাদের ঝড়তি-পড়তি শেয়ার তো সব শ্যামবাবু লিয়েছিল—আপ আপ্‌নেকে বিক্‌কিরি কিয়েছে।'

তিনকড়ি। চোর—চোর—চোর। আমি এখনি বিলেতে কোল্ডহাম সাহেবকে চিঠি লিখছি—

অটল। তবে আমরা এখন উঠি। আমাদের তো আর শেয়ার নেই, কাজেই আমরা এখন ডিরেক্টর নই। আপনি কাজ করুন। চল গন্ডেরি।

তিনকড়ি। অ্যাঁ—

গন্ডেরি। রাম রাম। [ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩২৯ (১৯২২)]

১১.২ পরশুরামের পরিচিতি

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে পরশুরাম অর্থাৎ রাজশেখর বসু একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন, বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে তার আবির্ভাব। পরশুরাম ছদ্মনাম, পৌরাণিক পরশুরামের পরিচয় ছিল আলাদা। তাঁর হাতে ছিল পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করার জন্য কুঠার। আর রাজশেখর বসু তথা পরশুরাম লেখনীসম কুঠার ধরেছিলেন আমাদের চার পাশের সমাজ এবং তজ্জনিত নানা অসঙ্গতি দূর করার জন্য। ১৬.৩.১৮৮০ খ্রি: রাজশেখর বসুর জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার দার্শনিক পণ্ডিত চন্দ্রশেখর, পরশুরাম কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে এম্.এ. পাশ করেন। তিনি ১৯০৩ খ্রি: বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে কর্মচারী ও পরে পরিচালক হন। বেশি সময়ে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল। তাঁর লেখা 'গড্ডালিকা', 'কজ্জলী' ও 'হনুমানের স্বপ্ন' বইগুলি বাঙলার রসিক মহলকে আলোড়িত করেছিল। রসরচনা ছাড়াও 'লঘুগুরু', 'বিচিন্তা', 'ভারতের খনিজ', 'কুটির শিল্প' প্রভৃতি তাঁর গ্রন্থ। ১৯৩৭ খ্রিঃ তাঁর অসামান্য কীর্তি বাংলা অভিধান 'চলন্তিকা' প্রকাশিত হয়। বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, মেঘদূত, হিতোপদেশের গল্প তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ। তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার, অকাদেমি পুরস্কার এবং পদ্মভূষণ উপাধি পেয়েছিলেন। ১৯৫৭-৫৮ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধি প্রদান করে। একদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ অন্যদিকে ব্যবসা

পরিচালনার কাজ উভয় ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। পরশুরাম ব্যঙ্গরসের অনন্যসাধারণ শিল্পী। তাঁর রচনায় ওতপ্রোত থাকে হাস্যরস। এই রস শুধুমাত্র কৌতুক বা প্রাণখোলা হাসি নয়। তা হল শিল্পীর নিপুণ সৃষ্টি। পরশুরামের হাসির গল্পের মধ্যে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার লুকিয়ে থাকে অনেক সময়।

পরশুরামের গল্পগুচ্ছের সংখ্যা নয়। 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'ধন্বন্তরী মায়া', 'নীলতারা', 'চমৎকুমারী' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ, তিনি রচনা করেন। তাঁর চারপাশের জগৎ ও জীবন থেকে গল্পগুলির উপাদান সংগ্রহীকৃত। আঁচ না লাগলেও প্রথম মহাযুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব আমাদের দেশে পড়েছিল, দারিদ্র, বেকারত্ব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, অর্থনৈতিক তীব্র সমস্যা এসব কিছু ঝেঁপে বলেছিল সমাজে। কৌতুকের আবরণে তিনি সমাজের সমস্যাগুলিতে তীব্র ব্যঙ্গ করলেন। আড্ডার ইমেজ তাঁর গল্পের অন্যতম আকর্ষণ। ১৪ নং পার্সীবাগান লেনে পরশুরামের পৈতৃক বাসভবনে প্রতিদিন মজলিশ বসত। জমজমাট আড্ডা হত রবিবার। বৈঠকখানা গম্‌গম্ করত। সেদিন সকলের ছুটি, এই আড্ডার নাম উৎকেন্দ্র সমিতি। নামটা পরশুরামের দেওয়া। এই বৈঠকে ডাক্তার, অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, শিল্পী সকলে উপস্থিত হতেন। পরশুরামের সাহিত্যে এমন আড্ডার উল্লেখ আছে। বংশলোচন বাবুর বৈঠকখানার আড্ডা (লম্বকর্ণ), হবসীবাগান লেনের মেসের আড্ডা (বিরিঞ্চিবাবা), ক্যালকাটা টি কেবিনের আড্ডা (চাঙ্গায়নী সুধা), সিদ্ধিনাথের আড্ডা (সিদ্ধিনাথের প্রলাপ) এরকম আরও কত কি। আজগুবি বিষয় পরিবেশনে তাঁর দক্ষতা অনবদ্য। বিরিঞ্চিবাবা এবং লম্বকর্ণ তার প্রমাণ। পরশুরাম বাস্তববাদী, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, যুক্তিবাদী সাহিত্যিক ছিলেন। সমাজের অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য পরশুরাম হাস্যরসের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। স্কেচ বা ছবির ব্যবহার (যতীন্দ্রনাথ সেনের) আঁকা তাঁর ছোট গল্পে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলী'র ঐশ্বর্যলেখার সঙ্গে ছবি। ছবিগুলির জন্য পাঠক গল্পের বিষয় সম্পর্কে বেশি সচেতন হয়ে ওঠেন। এই বই দুটিতে লেখা ও রেখা এমনভাবে মিলে গেছে যে গল্পের জন্য ছবি নাকি ছবির জন্য গল্প — পাঠক এ বিষয়ে সংশয়িত হন। বর্তমান জীবনের তাড়াহুড়া, ব্যস্ততা, হৈ চৈ, জগঝম্পকে অতিক্রম করে এ গল্পগুলি রয়ে সয়ে জীবন কাটানোর জন্য অতীত ছবি দেখায়। বংশলোচনবাবুর বাড়ির আড্ডায় বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে যাওয়ার নেমন্তন্ন তো ১৪ নম্বর পার্সীবাগান লেনের আড্ডার প্রতিচ্ছবি মনে হয়।

১১.৩ গল্পের পরিচিতি

পরশুরামের সাহিত্যের আলোচনার অনুষঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা এসে পড়ে। ত্রৈলোক্যনাথ পরিহাসরস ও কৌতুকের সঙ্গে উদ্ভট ব্যাপারের মিশ্রণে কাহিনি রচনা করেন। 'কঙ্কাবতী', 'ভূত ও মানুষ', 'ফোরলা দিগম্বর' তাঁর বই। ত্রৈলোক্যনাথ চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। পরশুরামের গল্পে আছে বাস্তবের আবহ। যুগের পরিবর্তনে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। ত্রৈলোক্যনাথ হাস্যরসের যে ধারার সূচনা করেছিলেন, পরশুরাম তার একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে উঠলেন। একটি লেখায় রাজশেখর বসু অর্থাৎ পরশুরাম বলেছিলেন তিনি বেশি লোক দেখেননি বা বেশি দেশ ভ্রমণ করেননি। হাস্যরস ফকিরের আল্লাখাল্লা, নানা রঙের কাপড়ের কোলার্জ। বেঙ্গল স্কুল অব কেমিস্ট্রির রসায়নবিদ পরশুরাম সেই রীতিতে হাসির গল্পগুলি সৃষ্টি করেছেন। 'গড্ডলিকা' পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে এই বইখানি 'চরিত্র চিত্রশালা'। রবীন্দ্রনাথের মতে - 'আমি দেখিলাম তিনি মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি।' রবীন্দ্রনাথের এই সাহিত্য সমালোচনার উত্তরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জানিয়েছিলেন যে পরশুরামের সাহিত্য সেবায় বেঙ্গল কেমিক্যালের

কাজকর্মের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। কেননা তাঁর আর একটি পরিচয় যে তিনি দক্ষ রসায়নবিদ। তাই প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন কৌতুক করে যে আর একটি তীব্র সমালোচনা করুন যাতে পরশুরামের হাত থেকে কুঠার খসে পড়ে। রাজশেখর বসুকে একেবারে খাঁটি খনিজ সোনা আখ্যা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩ খ্রিঃ এই 'খাঁটি সোনা' বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজারের পদ ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যভাবনায় মগ্ন হলেন। ধীরে ধীরে তাঁর লেখা হয়ে উঠেছে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাণিত ব্যঙ্গ - Satire। তাঁকে রসসাহিত্যিক বললে বিরক্ত হতেন পরশুরাম, বলতেন, 'এটা অত্যন্ত অপমানকর রসসাহিত্যিক আবার কি, আমি কি হাঁড়িতে রস ফুটিয়ে তৈরি করি। তবে তাঁ Satire তীক্ষ্ণ হলেও কখনও তা কাউকে আঘাত করেনি।

পরশুরামের বুদ্ধিদীপ্ত শ্লেষের মধ্যে একটা উদারতা মিশ্রিত আছে। তাই তাঁর স্যাটায়ারের আক্রমণ তীব্র না হয়ে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর রসরচনার গোড়ায় রয়েছে উইটের সুনিপুণ ব্যবহার। 'চিকিৎসা সঙ্কট' গল্পে ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসকের চিকিৎসার নানা পদ্ধতি হাস্যরসের উপাদান যুগিয়েছে। 'লম্বকর্ণ' বা 'রাজমহিষী' গল্পে পশুদের স্বাভাবিক ব্যবহারকে লেখন অসামান্য দক্ষতায় কৌতুক সৃষ্টির উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। 'রাজমহিষী' গল্পে 'সহসা মোষ মাথা নামিয়ে গামলায় মুখ দিল। তারপর সেই নির্জন প্রাঙ্গণের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মৃদু মন্দ আওয়াজ উঠলো - চবৎ, চবৎ, চবৎ।' রাজমহিষী ভোজন করেছেন - তখনই হাসির সুর চড়া হয়। 'ভুশণ্ডীর মাঠে' পরশুরামের অনন্য সৃষ্টি। 'ভূশণ্ডীর মাঠে শিবু ও নেতার তিন জন্মের স্ত্রী ও স্বামীদের নিয়ে যে দাম্পত্য দ্বন্দ্ব কলহের সৃষ্টি করেছেন - ভূতেদের বিশেষ ব্যবহার হাস্যরসের কারণ হয়ে উঠেছে। লেখক অবশ্য সামান্য কটাক্ষ করে বলেছেন যে এই উৎকট দাম্পত্য কলহের মীমাংসা করার জন্য শরৎ চাটুজ্জে' চারু বাঁড়ুয্যে, নরেশ সেনগুপ্তকে আহ্বান করেছেন। 'কচি সংসদ'এ অন্য কথা। কেষ্ট এই গল্পে কালাপাহাড়ী ভঙ্গিতে নারীর প্রেমের বিরুদ্ধে বড়ো মানুষেরা যে সব কথা বলেছেন তা উদ্ধৃত করে অবশেষে নিজে বলেছে— 'প্রেম একটা ধাপ্পাবাজি, যার দ্বারা স্ত্রী পুরুষকে ঠকায়' — সেই কেষ্ট রাত্রি বারোটার সময়ে কাঁদো কাঁদো মুখে চাউনি পাগলের মতন করে টুনিদিকে বলেছে — 'পদ্মের সঙ্গে বে না হলে সে এ প্রাণ রাখবে না, আর তর সইছে না, হয় পদ্ম - নয় কি একটা এ্যাসিড।' 'বিরিঞ্চিবাবা যার সঙ্গে জেসাস ক্রাইস্ট, গোতম বুদ্ধ থেকে বৈবস্বত মুনির মোলাকাত হামেশাই হয়, তাকে সত্যব্রত জাপটে ধরলে বাবা বলেন - 'আঃ ছাড় ছাড় - লাগে, মাইরি এমন ইয়ারকি ভাল লাগে না।

১১.৪ গল্পটির সারাংশ ও আবহ

'গড্ডালিকা' বইটির অন্তর্গত 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটি ১৯২২ খ্রি: 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে দেশকে দারিদ্র্যের তিক্ততা, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক মন্দাবাজার সব কিছু এক কালো ছায়ার মতো ঘিরে ধরে। এইরকম অস্থির, ক্ষয়রোগগ্রস্ত সমাজে মানুষ সর্বদা সময়ের মূল্য মাপতে ব্যস্ত। এই পরিপেক্ষিতে পরশুরাম গতানুগতিক রীতির গল্পকথা না বলে, মনস্তত্ত্বের জটিল অন্ধকারময় পিচ্ছিল পথে পা না বাড়িয়ে তীক্ষ্ণ, নিপুণ বাস্তবতায় গণ্ডেরি, শ্যামানন্দ, তিনকড়ি, অটল, বিপিনদের আমাদের সামনে উপস্থাপিত করলেন। সাহিত্যিক পরশুরাম তাঁর বিয়াল্লিশ বছর বয়সে প্রকাশিত প্রথম গল্পে অতর্কিত চমকে দিয়ে পাঠক মনকে অধিকার করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুনাফাখোর আর কালোবাজারীর ভিড়ে এদেশের বাজার ভরে গিয়েছিল। নিপুণ ভবিষৎ দ্রষ্টার মতো পরশুরাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই তাঁর গল্পে এসব কলোবাজারীদের উপস্থিত করেছেন। নির্মোহ, নিরাসক্ত ব্যঙ্গচিত্রী তাঁর গল্পে ধর্মের নামে যথেচ্ছচারী ও ক্ষমতালোভীদের চিনিয়ে দিয়েছেন।

আলোচ্য গল্পটিতে পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি বয়সের মূল নায়ক নিঃসন্তান শ্যামলাল গাঙ্গুলী ই. বি. রেলওয়ের অডিট অফিসের চাকুরে। বরাবর তার স্বাধীন ব্যবসা করার ইচ্ছে। তাঁর কারবারের নাম ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদার ইন ল, জেনারেল মার্চেন্ট্স। শ্যামবাবু ধর্মভীরু। তার স্ত্রী নিস্তারিণী দেবীর উপর জাগ্রতাদেবী সিদ্ধেশ্বরীর স্বপ্নাদেশ হলে শ্যামবাবু স্বগ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে। এই ব্যবসার সঙ্গে আরো অনেকে যুক্ত হয়। শ্যামবাবু ও তার কোম্পানির বাকি চার ডিরেক্টর নিজেরা কোনো অর্থ না দিয়ে মোটা টাকার শেয়ার খাতায় কলমে কিনে কোম্পানির কর্ণধার হয়। প্রচারের ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সব শেয়ার বিক্রি হয়। এর মধ্যে গন্ডেরি ও অটল মোটা টাকায় সব শেয়ার বিক্রি করে। শ্যামবাবু ও অন্যদের ধাপ্পাবাজিতে কোম্পানি ডুবে যায়। কোম্পানির ভরাডুবিতে মাসিক হাজার টাকা পারিশ্রমিকে তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যেকে ডিরেক্টর করে তারা সরে পড়ে।

১১.৫ কেন্দ্রীয় চরিত্র

এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গাঢ় শ্যামবর্ণ, কাঁচা-পাকাদাড়ি, আকণ্ঠলম্বিত বেশ, স্থূল রোমশ বপু। সে নিঃসন্তান, ধর্মভীরু, তন্ত্রসাধনায় অভ্যস্ত। প্রয়োজনে মাংসাহারী ও মদ্যপ, অলৌকিকে বিশ্বাসী। সংসারে তারা কেবল স্বামী স্ত্রী আর শ্যালক বিপিন সঙ্গে থাকে। অর্থলোভ চরিতার্থ করতে ধর্মভীরুর খোলস পড়ে ঘুরে বেড়ায়। তার ধর্মাচরণ কেবল ছলনামাত্র। ১০৮ বার দুর্গানাম জপ এবং তার পেটেন্ট নেওয়া তার প্রমাণ। শ্যামানন্দবাবু ব্যবসাদার, দেশসেবা ও ধর্মের নামে ব্যবসাই তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য। তিনি নিজেকে মাঝে মাঝে শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী বলে অভিহিত করেন। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের মেমোরাণ্ডম অ্যান্ড আর্টিকেল্সের মুসাবিদায় তার চাতুর্যের পরিচয় মেলে। মুসাবিদায় বলা হয়েছে ১) দেশের বৃহৎ অভাব দূরীকরণার্থে, ২) ধর্মপ্রাণ শেয়ার হোল্ডারদের অর্থে মহান তীর্থক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগৃহীত অর্থের একমাত্র প্রয়োজন। ধর্মই হিন্দুদের প্রাণ স্বরূপ। ধর্মকে বাদ দিয়ে কোনো জাতির কাজ সম্পন্ন হয় না। এই অনুষ্ঠান পত্রের বয়ান শ্যামানন্দের রচিত। সমস্ত গল্পটি শ্যামানন্দের দ্বারা চালিত। তার চারপাসে গন্ডেরী, বিপিন, অটল, তিনকড়ির সমাহার। শ্যামানন্দ তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যের মতো রায়সাহেব, রিটায়ার্ড ডেপুটিকে বোকা বানিয়েছে। কোম্পানির অভিনব প্রসপেক্টাস তৈরি করে, স্ত্রীকে নিজের সম্পত্তি দান করে, শেয়ার বিক্রির টাকায় মন্দির তৈরির পরিকল্পনা করে, সমস্ত টাকা সরিয়ে দিয়ে কোম্পানিকে দেউলিয়া করে। সেই লিকুইডেটেড কোম্পানির দায়িত্ব কৃপণ, সন্দিগ্ধ তিনকড়িকে দিয়ে সে গল্প থেকে বিদায় নেয়। কিন্তু আশচর্যের বিষয়, এমন চরিত্রের উপরে রাগ করা যায় না। তার ধূর্ততা, ফাঁকি দেওয়ার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে প্রশংসা করতে হয়। এখানেই পরশুরামের চরিত্র সৃষ্টির অভিনবত্ব। ধর্মের নামে জাল জুয়াচুরি করতে শ্যামানন্দ দক্ষ। সে আসন্ন কাশীবাসের খবর জানিয়ে শেষ পর্যন্ত কোম্পানির ১৬০০ খানেক শেয়ার বেচে ৩২০০ টাকার কড়কড়ে নোট বাগিয়ে প্রস্থান করে। গল্পের তিনকড়িবাবু তার স্বরূপ অনুধাবন করতে পারেনি। 'লোকটা দোষে গুণে মানুষ। এদিকে যদিও হাম্‌বগ, কিন্তু মেজাজটা দিলদরিয়া।' — এসব কথা শ্যামবাবু সম্পর্কে সে বলেছে বটে, পরে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে লোকটির প্রকৃতি কি জাতীয়। এই ধরনের চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে লেখক পরশুরাম সমকালীন সমাজকে চিনিয়ে দিয়েছেন।

এই গল্পের আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র গন্ডেরিরাম বাটপারিয়া। তার নাম তার চরিত্রের পরিচায়ক। অ্যাটর্নি অটল বলেছে — 'আমাদের শ্যামদা ও গন্ডে দা যেন মানিকজোড়।' দুজনেই বাটপাড় আর ধর্মধ্বজী। কিন্তু দুজনের মধ্যে স্বভাবে বড় পার্থক্য আছে। ব্রহ্মচারী অসৎ হলেও ভীতু। তার শঠতার পরিকল্পনা সীমিত। শ্যামানন্দের মতো

তার স্বভাবে গোপনতা নেই। সে স্পষ্টবক্তা, কাজে ও কথায় এক। সে যা বিশ্বাস করে, তাই সকলকে বিশ্বাস করাতে চায়। শ্যামানন্দ অনেক মুসাবিদা করে পনের হাজার টাকা দাবি করেছে এবং ম্যানেজিং এজেন্সির কমিশন হিসেবে এক হাজার টাকা চেয়েছে। কিন্তু গন্ডেরিরাম দুঃসাহসিক ব্যবসায়ী তাই দু-চার হাজার টাকা নয়, দু-চার লাখের জগতে সে এক কথায় পাঠককে পৌঁছে দেয়, কারও এক পয়সা খরচ হল না কিন্তু আড়াই লাখ টাকার শেয়ার বিক্রি হয়ে গেল। শ্যামানন্দ পর্যন্ত এই ধরনের বিরাট ধাপ্পাবাজির জন্য প্রস্তুত ছিল না এবং গন্ডেরিরামের প্রস্তাব শুনে চমকে গিয়েছিল। গন্ডেরির ধর্মাচরণের ধরনটাও আলাদা। তার কাছে আচারই ধর্ম। নীতি ও অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। একাদশী, রামনবমী ও শিবরাত্রিতে উপবাস করে সে। জীবহত্যা হলে সে শ্যামানন্দের কোম্পানিতে যুক্ত থাকবে না। এই দ্বিধাহীন ধর্মবিশ্বাসে সে উৎসাহী ও অবিচল। তার চরিত্রে মতো পোশাকটি আকর্ষণীয় ও বিচিত্র। মধ্যবয়স্ক, শ্যামবর্ণ, পরিধানে সাদা ধুতি, লম্বা কালো বনাতের কোট, পায়ে বার্ণিশ করা জুতো, মাথায় হলদে রঙের ভাঁজ করা মখমলের পাগড়ি, হাতে অনেকগুলি আংটি, কানে পান্নার মাকড়ি, কপালে ফোঁটা। গন্ডেরির হিন্দি বাংলা মেশানো বিচিত্র সংলাপ ও বাংলা শব্দের অবাঙালি উচ্চারণ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পাঠের অহমিকা, রবীন্দ্রনাথের 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়' কবিতাকে বিচিত্র উচ্চারণ করে অপব্যাখ্যা করা (এই অপব্যাখ্যা তার জীবনে সর্বাংশে সত্য) কিংবা কঠীরে রাণীর উচ্চারণে কৌতুক ও ব্যঙ্গাত্মক বোধ মিলে মিশে যায়। তার লাভের আকাঙ্ক্ষা তাকে ঘোড়দৌড়ের মাঠে টেনে নিয়ে গেছে, বাঙালি ও নিজের জাতের মধ্যে তফাৎ দেখতে গন্ডেরিরামের যুক্তিটি অনবদ্য। 'বাঙালি ধর্ম জানে না। তিনরূপয়া নোকরি করবে আর পাঁচ পইসার হরি লুঠ দেবে। হামার জাত রূপয়া ভি কামায় হিসাবসে, পুন ভি করে হিসাবসে। পাপপুণ্যের বিচারটাও সে অভিনব ভাবে বিচার করতে বসে। গন্ডেরি স্বাবলম্বী এবং নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ। গন্ডেরিরাম চরিত্রে ভাঁড়ামো নেই, তার আচারনিষ্ঠতা এবং বিবেকহীনতা দুটোই এই গল্পে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত। গন্ডেরি বিশ শতকের বুর্জোয়া অর্থনীতি ব্যবস্থার প্রতিভূ। সে বাচাল, রসিক, টাকা পয়সার হিসেব নিকেশে ধূর্ত, অত্যন্ত বুদ্ধিমান একটি মানুষ।

১১.৬ নামকরণ

গল্পটির নাম 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'। এক দেবীর শুভ নামে গল্পটির নাম। শ্যামানন্দ রচিত মেমোরান্ডম ও আর্টিকেল্‌সের মুসাবিদার শিরোনামে লেখা আছে। 'জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ'। তার নীচে জায়েন্ট স্টক কোম্পানির নাম। সিদ্ধিদাতা গণেশ ব্যবসায়ীদের পূজা দেবতা। গোবিন্দপুর গ্রামে সিদ্ধেশ্বরীদেবীর বহু শতাব্দীর প্রাচীন একটি মন্দির আছে। সেটি শ্যামানন্দের জমির অন্তর্গত। সেই মন্দির ও তার সংলগ্ন জমি আধুনিকীকরণের কারণে শ্যামানন্দের ব্যবসা আরম্ভ। মুসাবিদায় এর কথা আছে। তাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড। শ্যামানন্দ এই মন্দির ও জমি স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছে। শ্যামানন্দের স্ত্রী নিস্তারিনী অবলা নারী। তাছাড়া স্বপ্নাদেশ দেওয়ায় এই জমি ও মন্দির নিস্তারিনী দেবী এই লিমিটেড কোম্পানিকে সমর্পণ করেছেন। 'স্বপ্নাদেশ', একান্ন পাঠ এক ঠাঁই, জাগ্রত দেবী এ সব কারণে এই দেবীর নামে লিমিটেড কোম্পানি। তাই গল্পের নামকরণ আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দেশসেবা এবং ধর্মপ্রাণ জনগণের সেবা করতে চেয়েছে শ্যামানন্দ। এটি লিমিটেড কোম্পানি হলে এবং ম্যানেজিং এজেন্ট কার্যনির্বাহীর দায়িত্ব নিলে মুসাবিদ অনুয়ায়ী ১) শেয়ারহোল্ডারগণ বেশি টাকা পাবে, ২) ধর্ম অর্থ মোক্ষ লাভ হবে, ৩) শেয়ারহোল্ডারগণ বা মন্দির সংলগ্ন বাসগৃহে বাস করতে পারবে। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরীর নামাঙ্কিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লিমিটেড শব্দ যোগ করলে তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। লিমিটেড কোম্পানির ডিরেক্টর

হতে গিয়ে পাঁচটি দরিদ্র মিথ্যে টাকার ঋণ দেখিয়ে যেভাবে শেয়ার বিক্রি করেছে তাতে এ ধরনের নামের অন্তরালে তাদের কার্যসিদ্ধির পক্ষে তা সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে। জনগণের টাকা শ্যামানন্দ ও বিপিন লুটে নেয় গন্ডেরি, অটল ও বাকি দুজন সমস্ত লভ্যাংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এ রকম অনেক কোম্পানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই কোম্পানির ডিরেক্টররা ধর্মের নামে উৎসর্গীকৃত এবং লিমিটেড নামে অভিহিত গল্পের শিরোনাম সমস্ত গল্পটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

১১.৭ সার্থক ছোটগল্প হিসাবে বিচার

বাংলা গল্প সাহিত্যের ধারায় 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটিকে একটি সার্থক ল্যান্ডমার্ক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এর শিল্পরূপ সংযত ও সংহত। এর কৌতুক ও ব্যঙ্গ গল্পটির রসাস্বাদনে অতিরিক্ত মর্যাদা দান করেছে। এই গল্পে পরশুরামের রঙ্গব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, গন্ডেরিরাম, বিপিন চৌধুরী, অটল মিত্র ও তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যে। এর কেউ ধর্মভীরু, ভন্ড, ধূর্ত ব্যবসায়ী, নকল বিজ্ঞানী, ঠকবাজ, উকিল, উদ্বাকাশী আমলা আর তোষামোদকারী মধ্যবিত্ত মানুষ। এদের চরিত্রে ন্যায়নীতিহীনতা তো আজ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়নি। তাই পরশুরামের অঙ্কিত এই চরিত্রগুলি শুধু বিংশ শতকের আজকের যুগেরও সমাজের সার্থক প্রতিচ্ছবি। পরশুরাম তাঁর লেখনী কুঠারে চরিত্রগুলির অন্তর্লীন পরিচয়কে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, শ্যামানন্দ ও তিনকড়ি - এই দুটি চরিত্রের সূত্র ধরে গল্পের জাল বোনা হয়েছে। নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে গল্পের চরমক্ষণের বিস্তার, শেষে সভা থেকে তথা মূল গল্প থেকে বাড়িতে সত্যনারায়ণের পুজোর অজুহাতে শ্যামানন্দের বিদায়ের মধ্যে দিয়ে গল্পটির সার্থকতা মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। অবশ্য তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যের আপন অসহায় অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার মধ্যে দিয়ে গল্পটি শেষ হয়েছে। গল্পের শেষে উল্লেখ রয়েছে। — 'তিনকড়ি' - 'চোর - চোর - চোর। আমি এখনি বিলেতে কোল্ডহ্যম সাহেবকে চিঠি লিখছি' - অটল 'আমাদের তো আর শেয়ার নেই। কাজেই আমার এখন ডিরেক্টর নই। আপনি কাজ করুন! চল গন্ডেরি'

তিনকড়ি। অ্যাঁ—

গন্ডেরি - রাম রাম।

চরিত্রের হাত ধরে ঘটনা পরম্পরায় গল্প এগিয়ে চলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ছোটগল্প সম্পর্কে যে শেষ হয়ে না হৈল শেষ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য গল্পের সমাপ্তিতে তিনকড়ি যেখানে গল্পের রাশ টেনে ধরে। সেখান থেকে অনু গল্প শুরু হয়। তিনকড়ির অসহায়তার গল্প, অতিরিক্ত লোভে পড়ে বোকা হয়ে যাওয়া, ঠকে যাওয়ার গল্প। সর্ব অর্থেই 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' একটি কালোত্তীর্ণ, রসোত্তীর্ণ গল্পের মর্যাদা দাবি করতে পারে।

১১.৮ ভাষা ও গঠনশৈলী

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পটির বীজ অঙ্কুরিত হয়ে রয়েছে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ডমরু চরিত্রের' পঞ্চম গল্পের পঞ্চম পরিচ্ছেদের 'স্বদেশী কোম্পানী' কথা অংশটি, এটি একটি ব্যঙ্গধর্মী গল্প। পাঁচটি প্রধান চরিত্র এই গল্পের সমস্ত ঘটনাকে রূপায়িত করেছে। লোকে শেয়ার নেবার জন্য অস্থির, বাজারে তা চড়া দামে বেচা কেনা হচ্ছে আর গল্পের শেষে কোম্পানি ডুবে যেতে বসেছে - এই দুটি পরস্পর বিপরীত ঘটনা দিয়ে গল্পের প্লট তৈরি হয়েছে। এই গল্পের শেষে একটা নাটকীয় চমক আছে। একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কখনো সিরিয়াস আলাপ আলোচনা আবার কখনো বা বৈঠকী হাসি তামাশা চলেছে। আর তাতে চরিত্রগুলির অন্তর্গত স্বভাব লেখকের সুনিপুণ

বর্ণনায় ভাস্কর হয়ে উঠেছে। চরিত্রগুলি একসঙ্গে বসে কথা বলে যখন, একটা বৈঠকী মেজাজ ধরা পড়ে। এই গল্পের সময়কাল দেড় বছর। সেখানে লুকিয়ে আছে গল্পটির চরমমুহূর্ত। সে বলে — 'আচ্ছা তিনকড়িবাবু, আমাদের ওপর যখন লোকের এতই অবিশ্বাস, বেশ তো, আমরা না হয় ম্যানেজিং এজেন্সি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার নাম আছে, সম্ভ্রম আছে, লোকেও শ্রদ্ধা করে, আপনিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে কোম্পানি চালান না।' তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যের অসহায় পরিণতিতে গল্পের সমাপ্তি। শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী যেখানে বিদায় নিয়েছে সেখানে গল্পের হাল ধরেছে তিনকড়ি। বিশ শতকের এই জাতীয় ব্যবসা যে এক Continued process শ্যামাপদ থেকে তিনকড়িতে নির্ভরতা তারই প্রতীকীরূপ। তিনকড়ির পরিণতি সঠিক ভাবে তলে ধরা, শ্যামানন্দ ব্যবসায়িক ভন্ডামি আর একজনের উপর চাপিয়ে দেওয়া আর শ্যামানন্দের সৃষ্টি তিনকড়িকে দিয়ে গল্পে নতুন dimension আনা - এসব গল্পে এভাবে অভিনবত্ব এসেছে। পরশুরামের আলোচ্য এই গল্পটিতে চরিত্রগুলি অত্যন্ত পরিচিত। শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, গন্ডেরিরাম বাটপারিয়া, তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যে এসব চরিত্র, মুরারীশীল ভাঁড়ুদত্ত বা ঠকচাচার আমল থেকে বাংলা সাহিত্যে উঁকি মেরেছে। পরশুরামের সাহিত্যে তারা আবার নবপরিচয়ে উপস্থিত। এই প্রথম গল্পরচনায় পরিচ্ছন্ন, বাহুল্য বর্জিত, সুপ্রযুক্ত ভাষা ব্যবহৃত। পরশুরামের সমকালের পাঠকসমাজ যখন সাধু ভাষার আয়ু ফুরিয়ে গেছে বলে মনে করেছিল। তখন 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলী' বইটির ভাষা দেখে চমকে গেল, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী ভাষাভঙ্গিকে এড়িয়ে এ ভাষার জন্মলাভ। আলোচ্য গল্প সূচনায় বিবরণধর্মী পরে সংলাপধর্মী। এই সংলাপধর্মীতা নাট্যরীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিবরণধর্মী অংশটি সাধুভাষায় লেখা আর সংলপধর্মী অংশটি চলিত ভাষায় লেখা। একই গল্পের মধ্যে দুটি ভাষারীতি অনুসৃত। তাতে গল্পের ভারসাম্য ক্ষুন্ন হয়নি। বরং কৌতুককর বর্ণনায় সাধুভাষার ব্যবহার কৌতুকের ঘনত্বকে বাড়িয়ে তুলেছে। যেমন - 'ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল' বাড়িটির বর্ণনাতে — 'কতিপয় নেংটি ইঁদুর ও আরশোলা পরস্পর অহিংসভাবে স্বচ্ছন্দে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। ইহারা আশ্রমমৃগের ন্যায় নিঃশঙ্ক সিঁড়ির যাত্রিগণকে গ্রাহ্য করে না।' চরিত্রগুলির সংলাপে আবার কোনো চরিত্রে সংলাপ হিন্দিভাষা আশ্রিত। 'হদ্দ কিয়া শ্যামবাবু! জঙ্গল কি ভিতর পুরানা মন্দিল, উসমে দো-চার শও ছুছুন্দর, ছটাক ভর জমিন, উস্‌পর দো-চার বাঁশঝাড় - বস, ইসিকা দাম পন্দ্র হাজার।' ঝরঝরে ভাষার সহজ সরলগতি গল্পের স্রোত কোথাও থেমে থাকতে দেয়নি।

১১.৯ কয়েকজন সাহিত্য সমালোচকের মতামত

বাংলা সাহিত্যে যখন যুদ্ধোত্তর কালের নানা বিভীষিকা, আন্তর্জাতিকতাবাদ, শিল্পবিপ্লব, শ্রমিক আন্দোলন, প্রতীকীবাদ, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব, যৌনতা এ সব আসন অধিকার করে বসেছে। পরশুরাম তখন মানুষের বিচিত্র স্বভাবের কথা তাঁর লেখায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন দেশি বিদেশি বই তিনি বেশি পড়েননি, বেশি মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেননি। সেজন্য নিজেকে সাহিত্যিক বলতে দ্বিধা বোধ করেছেন। কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে তিনি যা করেছেন, অল্প লোকেই তা পারে, তাঁর গল্পের চরিত্রদের আমরা চিনি, জানি, শুধু চিহ্নিত করতে পারি না। এই চিহ্নিত করার কাজে পরশুরামের শিল্পগত কৃতিত্ব বেশি। পরশুরামের লেখা মায়া-দর্পণ। তাতে বাস্তব অসঙ্গতি, ভন্ডামি ও মূর্খতাগুলো রূপকথার মতো রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। খাপছাড়ার জগৎ তাঁর গল্পের জগৎ। এই খাপছাড়া জগতের অসঙ্গতি তিনি আমাদের দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'খাপছাড়া' বইটি পরশুরামকে উৎসর্গ করে লিখেছেন — শ্রী রাজশেখর বসু / বন্ধুবরেষু 'চর্তুমুখের চেনা কবিটিরে বলিলে / তোমরা যতই হাস, রবে সেটা দলিতে / দেখাবে সৃষ্টি নিয়ে খেলে বটে কল্পনা, অনাসৃষ্টিতে তবু ঝোঁকটাও অল্প না/' রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার

মুখোপাধ্যায় লিখেছেন- বসু - মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথ অতিশয় স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতেন। ...... রাজশেখরকে কবি যে 'খাপছাড়া' উৎসর্গ করিলেন তা অর্থপূর্ণ, কারণ রাজশেখর এই খাপছাড়ার প্রবর্তক। শান্তিনিকেতনের সঙ্গেও কবি রাজশেখরের নাম যুক্ত করিলেন, কজে - ল্যাবোরোটোরির নাম দেওয়া হইল 'রাজশেখর বিজ্ঞান সদন'। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরশুরাম সম্পর্কে বলেছেন - 'তাঁর হাসির মধ্যে মানব মনের নানা গোপন তত্ত্বকথা নিহিত রয়েছে। তাঁর দেশের ও কালের অর্থাৎ এখনকার বাংলা এবং এই চলন্তিকা জীবধারার নানাপ্রকারের সামাজিক রাষ্ট্রিক আর সাংস্কৃতিক সাময়িক আর চিরস্থায়ী তথ্যের খুঁটিনাটিতে তাঁর রসরচনা ভরপুর। শ্যামানন্দ, গন্ডেরিরাম বা অটল এরা কেউ আম জনতার অন্তর্ভুক্ত নন, এরা সমাজের নিরানব্বই ভাগ লোক নন, আলাদামাত্র, তবু এদের জন্যই সমাজ দুষিত হয়। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছিলেন যে 'রাজশেখরবাবু সঙ্গে সু-শাণিত -র সুপ্রয়োগ এবং শ্লেষ বক্রোরি সুরুচিসঙ্গত অনুশীলনে বঙ্গ রসিকতার রচনাকে উদ্ধ অভিজাত্য সাহিত্যে পরিণত করিয়াছেন। এগুলি হাসায় ক্ষণকালের জন্য, কিন্তু ভাবায় বহু দিন ধরিয়া।' প্রমথনাথ বিশী পরশুরামের সাহিত্য বিশেষতঃ 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটি সম্পর্কে লেখেন যে, 'শ্যামনন্দ ব্রহ্মচারী, গন্ডেরিরাম বাটপারিয়া, নন্দবাবু, তারিণী কবিরাজ, কেদার চাটুজ্যে, লাটুবাবু, নাদু মল্লিক - এরা কি আজকের। এদের কেউ কেউ মুরারী শীলের সঙ্গে ভাগে ব্যবসা করেছে, ভাঁড়ু দত্তর সঙ্গে বাজারে তোলা আদায় নিয়ে ভাগাভাগি করেছে। আবার ঠক চাচার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেছে, দুনিয়া বুরা মুই সাচাহয়ে কি করবো? ডমরু ধারা আসছে কেদার চাটুজ্যে গল্পের শিকল কেনেনি এবং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী যে নদের চাঁদের ব্যবসার পার্টনার ছিল না এমন কথা কে হলফ করে বলবে? এরা সবাই অতিপরিচারে আড়ালে প্রচ্ছন্ন দিন বলেই টান্‌তে পার যায়নি।" **(পরশুরাম গল্প সমগ্র, প্রমথনাথ বিশীর ভূমিকা, এস. সি. সরকার, নতুন সংস্করণ, ২০১০)।**

- আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন পরশুরাম সম্পর্কে — 'পরশুরামে'র কুঠারের তীক্ষ্ণ ধারে বাটপাড় জয়েন্ট-স্টক কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা, হোমড়া চোমড়া ডাক্তার প্রেততত্ত্ববিদ দার্শনিক, গুলি (থুড়ী, থুড়ী সিগারেট খোর), কেহই নিস্তার পায় নাই, অথচ তাঁহার নির্মল, সৌম্য হাস্য কাহারও অন্তরে বেদনা রাখিয়া যায় নাই। ...' (*ভারতবর্ষ* পত্রিকা, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা)
- আলোচ্য 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটি সম্পর্কে সমালোচক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন যে 'বলিষ্ঠ কল্পনাশক্তি প্রয়োগের ফলে শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পে ব্যবসায় বুদ্ধি সোজাসুজি ভাবে সম্মুখে আসিয়া আপনার প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছে — স্বপ্নদেশ, একান্নপীঠ এক ঠাঁই এই সবই ব্যবসায়ের অঙ্গীভূত হইয়াছে, এমনকি বন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বেই কোম্পানী বিশ হাত জলের নীচে চলিয়া গিয়াছে। এখানেই প্রতিভাবান জুয়াচোর শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর মৌলিকতা।' (হাস্যরসিক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *পরশুরাম*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী, ১লা বৈশাখ, ১৩৮৬)। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রাজশেখরকে বলেছিলেন, "তোমার বই খুলিয়া পড়িতে পড়িতে এই বৃদ্ধ বয়সে হাসিতে হাসিতে choked হইতেছি।"
- সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে — 'বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছোট গল্পের অন্যতম স্বর্ণযুগ। চারিদিকে তখন মানুষের সর্বাত্মক বিকৃতি ফেটে পড়ছে, সমাজ, ধর্ম, সংস্কার এবং পারিবারিক জীবনের ভিত্তি নড়ে উঠেছে। পুঞ্জীভিভূত গ্লানিতে জাতি তখন পঙ্কস্নান করছে, মানুষের লোভের ষড়যন্ত্রে গড়া দুর্ভিক্ষ সমস্ত বাংলাদেশ নরকে পরিণত হয়েছে, আর কালোবাজারীরা মুক্ত শিকারীর ভূমিকা নিয়েছে। ওদিকে ইংরেজ সরকারের হৃদয়হীন উদাসীনতা আগস্ট বিপ্লব দমন করবার নামে সীমাহীন নিষ্ঠুরতা....। এই অসহ্য যন্ত্রণার

চাবুকে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল সেদিনের বাঙালি। লেখক কলমের মুখে ক্ষিপ্ত বেদনার বজ্রদ্যুতি সঞ্চার করেছিলেন। পরশুরাম তখন যুগের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেননি.... বাংলা সাহিত্যে পরশুরামের আবির্ভাব এই বস্তুতান্ত্রিকতা থেকে।'

আসলে পরশুরামের হাসির উৎস গভীর মর্মযন্ত্রণা। দেশ ও দেশবাসীর প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা তাঁকে সাহিত্যিক রূপে আবির্ভাবের প্রেরণা যুগিয়েছে। শুধুমাত্র ব্যঙ্গশিল্পীর থেকেও তাঁর বড় পরিচয় তিনি জীবন রসিক, মানব দরদী, বৈজ্ঞানিক নির্মোহ দৃষ্টি সম্পন্ন মঙ্গলকামী শিল্পী।

১১.১০ অনুশীলনী

১. 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটি কার লেখা? এই গল্পটির মূল অর্থ বিশ্লেষণ করুন।

২. গল্পকার পরশুরামের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৩. 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে গন্ডেরিরাম ও শ্যামানন্দ চরিত্রটির তাৎপর্য আলোচনা করুন।

৪. গল্পের নামকরণ 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' সুপ্রযুক্ত হল কিনা এ বিষয়ে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

৫. সমকালীন সমাজ 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা করুন।

৬. পঠিত গল্প অবলম্বনে হাস্যরস ও ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে পরশুরামের দক্ষতা আলোচনা করুন।

১১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. *পরশুরাম গল্পসমগ্র*, রাজশেখর বসু, সম্পাদনা দীপঙ্কর বসু, এম্. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, মূল্য ৩৫০ টাকা, অক্টোবর ২০১০।

২. *রাজশেখর বসু জীবন ও সাহিত্য*, কল্যানী ঘোষ, ফার্মা কে. এল. এম., কলকাতা, ১৯৮৩, মূল্য ৫৫ টাকা।

৩. *বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, ৮ই মে, ২০০০, মূল্য ২০০ টাকা।

৪. *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ডিসেম্বর ১৯৯৮।

একক ১২ ❑ রস—নরেন্দ্রনাথ মিত্র

গঠন

১২.১ মূলগল্প
১২.২ বাংলা কথাসাহিত্য ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র
১২.৩ রসগল্প কাহিনি
১২.৪ মুখ্য চরিত্র
১২.৫ নামকরণ
১২.৬ ছোটগল্প হিসাবে সার্থকতা
১২.৭ 'রস' গল্পের ভাষাশৈলী
১২.৮ অনুশীলনী
১২.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ মূলগল্প

কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে শুরু করল মোতালেফ। তারপর দিন পনের যেতে না যেতেই নিকা করে নিয়ে এল পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজুখাতুনকে। পাড়াপড়শী সবাই তো অবাক। এই অবশ্য প্রথম সংসার নয় মোতালেফের। এর আগের বউ বছর খানেক আগে মারা গেছে। তবু পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের জোয়ান পুরুষ মোতালেফ। আর মাজুখাতুন ত্রিশে না পৌঁছলেও তার কাছাকাছি গেছে। ছেলেপুলের ঝামেলা অবশ্য মাজুখাতুনের নেই। মেয়ে ছিল একটি, কাঠিখালির শেখদের ঘরে বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঝামেলা যেমন নেই, তেমনি মাজুখাতুনের আছেই বা কি। বাক্স সিন্দুক ভরে যেন কত সোনাদানা রেখে গেছে রাজেক মৃধা, মাঠ ভরে যেন কত ক্ষেত-খামার রেখে গেছে যে তার ওয়ারিশি পাবে মাজুখাতুন। ভাগের ভাগ ভিটার পেয়েছে কাঠা খানেক, আর আছে একখানি পড়ো পড়ো শণের কুঁড়ে। এই তো বিষয়-সম্পত্তি, তারপর দেখতেই বা এমন কি একখানা ডানকাটা হুরীর মত চেহারা। দজ্জাল মেয়েমানুষের আঁট-সাঁট শক্ত গড়নটুকু ছাড়া কি আছে মাজুখাতুনের যা দেখে ভোলে পুরুষেরা, মন তাদের মুগ্ধ হয়।

সিকদার-বাড়ির, কাজী-বাড়ির বউঝিরা হাসাহাসি করল, 'তুক করছে মাগী, ধুলা-পড়া দিছে চৌখে।'

মুন্সীদের ছোটবউ সাকিনা বলল, 'দিছে ভালো করছে। দেবে না? অমন মানুষের চৌখে ধূলাপড়া দেওয়নেরই কাম। খোদা তো পাতা দেয় নাই চৌখে। দেখছো তো কেমন ট্যারাইয়া ট্যারাইয়া চায়। ধুলা ছিটাইয়া থাকে তো বেশ করছে।'

কথাটা মিথ্যা নয়, চাউনিটা একটু তেরছা তেরছা মোতালেফের। বেছে বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকায়। সুন্দর মুখের খোঁজ ক'রে ঘোরে তার চোখ। অল্পবয়সী খুবসুরৎ চেহারার একটি বউ আনবে ঘরে, এতদিন ধরে সেই চেষ্টাই সে করে এসেছে। কিন্তু দরে পটেনি কারো সঙ্গে। যারই ঘরে একটু ডাগর গোছের সুন্দর মেয়ে আছে সে-ই হেঁকে বসেছে পাঁচকুড়ি সাতকুড়ি। সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল মোতালেফের ফুলবানুকে। চরকান্দার এলেম সেখের মেয়ে ফুলবানু। আঠার উনিশ বছর হবে বয়স। রসে টলটল করছে সর্বাঙ্গ, টগবগ করছে মন। ইতিমধ্যে অবশ্য একহাত ঘুরে এসেছে ফুলবানু। খেতে পরতে

কষ্ট দেয়, মার ধোর করে এই সব অজুহাতে তালাক নিয়ে এসেছে কইড়ুবির গফুর সিকদারের কাছ থেকে। আসলে বয়স বেশি আর চেহারা সুন্দর নয় বলে গফুরকে পছন্দ হয়নি ফুলবানুর। সেই জনাই ইচ্ছা ক'রে নিজে ঝগড়া কোন্দল বাঁধিয়েছে তার সঙ্গে। কিন্তু একহাত ঘুরে এসেছে বলে কিছু ক্ষয়ে যায়নি ফুলবানুর, বরং চেকনাই আর জেল্লা খুলেছে দেহের, রসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে মনের মধ্যে। চরকান্দায় নদীর ঘাটে ফুলবানুকে একদিন দেখেছিল মোতালেফ। এক নজরেই বুঝেছিল যে, সেও নজরে পড়েছে। চেহারাখানা তো বেমানান নয় মোতালেফের। নীল লুঙ্গী পরলে ফর্সা ছিপছিপে চেহারায় চমৎকার খোলতাই হয় তার, তাছাড়া এমন ঢেউ-খেলানো টেরিকাটা বাবরিই বা এ তল্লাটে ক'জনের মাথায় আছে। ফুলবানুর সুনজরের কথা বুঝতে বাকি ছিল না মোতালেফের। খুঁজে খুঁজে গিয়েছিল সে এলেম সেখের বাড়িতে। কিন্তু এলেম তাকে আমল দেয়নি। বলেছে গত বার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে তার। এবার আর না দেখে শুনে যার তার হাতে মেয়ে দেবে না। আসলে টাকা চায় এলেম। গাঁটের কড়ি যা খরচ করতে হয়েছে মেয়েকে তালাক নেওয়াতে গিয়ে, সুদে আসলে তা পুষিয়ে নিতে চায়। গুনাগার চায় সেই লোকসানের। আঁচ নিয়ে দেখেছে মোতালেফ সে গুণাগার দু'এক কুড়ি নয়, পাঁচকুড়ি একেবারে। তার কমে কিছুতেই রাজী হবে না এলেম। কিন্তু অত টাকা সে দেবে কোত্থেকে।

মুখ ভার ক'রে চলে আসছিল মোতালেফ। আশশেওড়া আর চোর-উদানের আগাছার জঙলা ভিটার মধ্যে ফের দেখা হল ফুলবানুর সঙ্গে। কলসী কাঁখে জল নিতে চলেছে ঘাটে। মোতালেফ বুঝল সময় বুঝেই দরকার পড়েছে তার জলের।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিক ক'রে একটু হাসল ফুলবানু, 'কি মেঞা, গোসা কইরা ফিরা চললা নাকি?'

'চলব না? সোনলা নি টাকার খাককাই তোমার বা-জানের!'

ফুলবানু বলল, 'হ, হ, শুনছি। চাছি তো দোষ হইছে কি? পছন্দসই জিনিস নেবা বা-জানের গুনা, তার দাম দেবা না?'

মোতালেফ বলল, 'ও খাককাইটা আসলে বা-জানের নয়, বা-জানের মাইয়ার। হাটে বাজারে গেলেই পারো ধামায় উইঠা।'

মোতালেফের রাগ দেখে হাসল ফুলবানু, 'কেবল ধামায় ক্যান, পালায় উইঠা বসব। মুঠ ভইরা ভইরা সোনা জহরৎ ওজন কইরা দেবা পালায়। বোঝব ক্ষেমতা, বোঝব কেমন পুরুষ মাইনষের মুঠ।' মোতালেফ হন হন ক'রে চলে যাচ্ছিল। ফুলবানু ফের ডাকল পিছন থেকে, 'ও সোন্দর মিঞা, রাগ করলানি? শোন শোন।'

মোতালেফ ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কি শোনব?'

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আরো একটু এগিয়ে এল ফুলবানু, 'শোনবা আবার কি, শোনবা মনের কথা। শোন, বা-জানের মাইয়া টাকা চায় না, সোনা দানাও চায় না, কেবল মান রাখতে চায় মনের মাইনষের। মাইনষের ত্যাজ দেখতে চায়, বুঝছ?'

মোতালেফ ঘাড় নেড়ে জানালে, বুঝেছে।

ফুলবানু হেসে বলল, 'খুব থাকব। তেমন বেসবুর বিবি ভাইবো না আমারে।'

গাঁয়ে এসে আর একবার ধারের চেষ্টা করে দেখল মোতালেফ। গেল মল্লিকবাড়ি, মুখুজ্যেবাড়ি, সিকদারবাড়ি, মুন্সীবাড়ি— কিন্তু কোথাও সুরাহা হয়ে উঠল না টাকার। নিলে তো আর সহজে হাত উপুড় করবার অভ্যেস নেই মোতালেফের। ধারের টাকা তার কাছ থেকে আদায় ক'রে নিতে বেজায় ঝামেলা। সাধ ক'রে কে পোয়াতে যাবে সেই ঝক্কি।

কিন্তু নগদ টাকা ধার না পেলেও শীতের সূচনাতেই পাড়ার চার পাঁচ কুড়ি খেজুর গাছের বন্দোবস্ত পেল মোতালেফ। গত বছর থেকেই গাছের সংখ্যা বাড়ছিল, এবার চৌধুরীদের বাগানের দেড়কুড়ি গাছ বেশি হল। গাছ কেটে হাঁড়ি পেতে রস নামিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক রস মালিকের, অর্ধেক তার। মেহনৎ কম নয়, এক একটি ক'রে এতগুলি গাছের শুকনো মরা ডালগুলি বেছে বেছে আগে কেটে ফেলতে হবে। বালিকাচায় ধার তুলে তুলে জুৎসই ক'রে নিতে হবে ছ্যান। তারপর সেই ধারালো ছ্যানে গাছের আগা চেঁছে চেঁছে তার মধ্যে নল পুততে হবে সরু কঞ্চি ফেড়ে। সেই নলের মুখে লাগসই ক'রে বাঁধতে হবে মেটে হাঁড়ি। তবে তো রাতভরে টুপ টুপ ক'রে রস পড়বে সেই হাঁড়িতে। অনেক খাটুনি, অনেক খেজমৎ।

শুকনো শক্ত খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে হলে আগে ঘাম বের করতে হয় গায়ের। এতো আর মার দুধ নয়, গাইয়ের দুধ নয় যে বোঁটায় বানে মুখ দিলেই হল।

'অবশ্য কেবল খাটতে জানলেই হয় না, গাছে উঠতে-নামতে জানলেই হয় না, গুণ থাকা চাই হাতের। যে ধারালো ছ্যান একটু চামড়ায় লাগলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে মানুষের গা থেকে, হাতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁয়ায় খেজুর গাছের ভিতর থেকে মিষ্টি রস চুঁইয়ে পড়ে। এ তো আর ধান কাটা নয়, পাট কাটা নয় যে, কাচির পোঁচে গাছের গোড়াসুদ্ধ কেটে নিলেই হল। এর নাম খেজুরগাছ কাটা। কাটতেও হবে, আবার হাত বুলোতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোন ক্ষতি না হয় গাছের। একটু এদিক ওদিক হলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে গাছের দফা রফা হয়ে যাবে, মরা মুখ দেখতে হবে গাছের। সে গাছের গুড়িতে ঘাটের পৈঠা হবে ঘরের পৈঠা হবে, কিন্তু ফোঁটায় ফোঁটায় সে গাছ থেকে হাঁড়ির মধ্যে রস ঝরবে না রাত ভরে।'

খেজুর গাছ থেকে রস নামাবার বিদ্যা মোতালেফকে নিজে হাতে শিখিয়েছিল রাজেক মৃধা। রস সম্বন্ধে এ-সব তত্ত্বকথা আর বিধি-নিষেধও তার মুখের। রাজেকের মত অমন নামডাকওয়ালা 'গাছি' ধারে-কাছে ছিল না। যে গাছের প্রায় বারো আনা ভালই শুকিয়ে এসেছে সে গাছ থেকেও রস বেরুত রাজেকের হাতের ছোঁওয়ায়। অন্য কেউ গাছ কাটলে যে গাছ থেকে রস পড়তো আধ-হাঁড়ি, রাজেকের হাতে পড়লে সে রস গলা-হাঁড়িতে উঠতো। তার হাতে খেজুর গাছ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকত গৃহস্থরা। গাছের কোন ক্ষতি হত না, রসও পড়ত হাঁড়ি ভরে। বছর কয়েক ধরে রাজেকের সাকরেদ হয়েছিল মোতালেফ, পিছনে পিছনে ঘুরত, কাজ করত সঙ্গে সঙ্গে। সাকরেদ দু'চারজন আরো ছিল রাজেকের— সিকদারদের মকবুল, কাজীদের ইসমাইল। কিন্তু মোতালেফের মত হাত পাকেনি কারো। রাজেকের স্থান আর কেউ নিতে পারেনি তার মত।

কিন্তু কেবল গাছ কাটলেই তো হবে না কুড়িতে কুড়িতে, রসের হাঁড়ি বয়ে আনলেই তো হবে না বাঁশের বাখারির ভরায় ঝুলিয়ে, রস জ্বাল দিয়ে গুড় করবার মত মানুষ চাই। পুরুষ মানুষ গাছ থেকে কেবল রসই পেড়ে আনতে পারে,— কিন্তু উনান কেটে, জ্বালানি জোগাড় ক'রে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে সেই তরল রস জ্বাল দিয়ে তাকে ঘন পাটালিগুড়ে পরিণত করবার ভার মেয়েমানুষের ওপর। শুধু কাঁচা রস দিয়ে তো লাভ নেই, রস থেকে গুড় আর গুড় থেকে পয়সায় কাঁচা রস যখন পাকা রূপ নেবে তখন সিদ্ধি, কেবল তখনই সার্থক হবে সকল খেজমৎ মেহনৎ। কিন্তু বছর দুই ধরে বাড়িতে সেই মানুষ নেই মোতালেফের। ছেলেবেলায় মা মরেছিল। দু'বছর আগে বউ মরে ঘর একেবারে খালি করে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর মোতালেফ এসে দাঁড়াল মাজুখাতুনের ঝাঁপ-আঁটা ঘরের সামনে, 'জাগনো আছো নাকি মাজুবিবি?'

ঘরের ভিতর থেকে মাজুখাতুন সাড়া দিয়ে বলল, 'কেডা?'

'আমি মোতালেফ। শুইয়া পড়ছ বুঝি? কষ্ট কইরা উইঠা যদি ঝাপটা একবার খুইলা দিতা, কয়ডা কথা কইতাম তোমার সাথে।'

মাজুখাতুন উঠে ঝাপ খুলে দিয়ে বলল, 'কথা যে কি কবা তা তো জানি। রসের কাল আইছে আর মনে পইড়া গেছে মাজুখাতুনরে। রস জ্বাল দিয়া দিতে হবে। কিন্তু সেরে চাইর আনা কইরা পয়সা দেবা মেঞা। তার কমে পারব না। গতরে সুখ নাই এ বছর।'

মোতালেফ মিষ্টি ক'রে বলল, 'গতরের আর দোষ কি বিবি। গতর তো মনের হাত ধইরা ধইরা চলে। মনের সুখই গতরের সুখ।'

মাজুখাতুন বলল, 'তা যাই কও তাই কও মেঞা, চাইর আনার কমে পারব না এবার।'

মোতালেফ এবার মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'চাইর আনা ক্যানে বিবি, যদি ষোল আনা দিতে চাই, রাজী হবা তো নিতে?'

মোতালেফের হাসির ভঙ্গিতে মাজুখাতুনের বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন ক'রে উঠল, কিন্তু মুখে বলল, 'তোমার রঙ্গ

তামাসা থুইয়া দাও মেঞা। কাজের কথা কবা তো কও, নইলে যাই, শুই গিয়া।'

মোতালেফ বলল, 'শোবাই তো। রাইত তো শুইয়া ঘুমাবার জন্যেই। কিন্তু শুইলেই কি আর চোখে ঘুম আসে মাজুবিবি, না চাইয়া চাইয়া এই শীতের লম্বা রাইত কাটান যায়?'

ইসারা ইঙ্গিত রেখে এরপর মোতালেফ আরো স্পষ্ট ক'রে খুলে বলল মনের কথা। কোনরকম অন্যায় সুবিধা সুযোগ নিতে চায় না সে। মোল্লা ডেকে কলমা পড়ে সে নিকা ক'রে নিয়ে যেতে চায় মাজুখাতুনকে। ঘর গেরস্থালির ষোল আনা ভার তুলে দিতে চায় তার হাতে।

প্রস্তাব শুনে মাজুখাতুন প্রথমে অবাক হয়ে গেল, তারপর একটু ধমকের সুরে বলল, 'রঙ্গ তামাসার আর মানুষ পাইলা না তুমি! ক্যান, কাঁচা বয়সের মাইয়া পোলার কি অভাব হইছে নাকি দেশে যে তাগো থুইয়া তুমি আসবা আমার দুয়ারে।'

মোতালেফ বলল, 'অভাব হবে ক্যান মাজুবিবি। কম বয়সী মাইয়া পোলা অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু শত হইলেও, তারা কাঁচা রসের হাঁড়ি।'

কথার ভঙ্গিতে একটু কৌতুক বোধ করল মাজুখাতুন, বলল, 'সাঁচাই নাকি। আর আমি?'

'তোমার কথা আলাদা। তুমি হইলা নেশার কালে তাড়ি আর নাস্তার কালে গুড়, তোমার সাথে তাগো তুলনা?'

তখনকার মত মোতালেফকে বিদায় দিলেও তার কথাগুলি মাজুখাতুনের মন থেকে সহজে বিদায় নিতে চাইল না। অন্ধকার নিঃসঙ্গ শয্যায় মোতালেফের কথাগুলি মনের ভিতরটায় কেবলই তোলপাড় করতে লাগল। মোতালেফের সঙ্গে পরিচয় অল্পদিনের নয়। রাজেক যখন বেঁচে ছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে যখন কাজকর্ম করত মোতালেফ, তখন থেকেই এ বাড়িতে তার আনাগোনা, তখন থেকেই জানাশোনা দু'জনের। কিন্তু সেই জানাশোনার মধ্যে কোন গভীরতা ছিল না। মাঝে মাঝে একটু হাল্কা ঠাট্টা তামাসা চলত, কিন্তু তার বেশি এগুবার কথা মনেই পড়েনি কারো। মোতালেফের ঘরে ছিল বউ, মাজুখাতুনের ঘরে ছিল স্বামী। স্বভাবটা একটু কঠিন আর কাটখোট্টা ধরনেরই ছিল রাজেকের। ভারি কড়া-কড়া চাঁছা-ছোলা ছিল তার কথাবার্তা। শীতের সময় কুড়িতে কুড়িতে রসের হাঁড়ি আনত মাজুখাতুনের উঠানে আর মাজুখাতুন সেই রস জ্বাল দিয়ে করত পাটালিগুড়। হাতের গুণ ছিল মাজুখাতুনের। তার তৈরি গুড়ের সের দু'পয়সা বেশি দরে বিক্রী হতো বাজারে। রাজেক মরে যাওয়ার পর পাড়ার বেশির ভাগ খেজুর গাছই গেছে মোতালেফের হাতে। দু'এক হাঁড়ি রস কোনবার ভদ্রতা ক'রে তাকে খেতে দেয় মোতালেফ কিন্তু আগেকার মত হাঁড়িতে আর ভরে যায় না তার উঠান। গতবার মাসখানেক তাকে রস জ্বাল দিতে দিয়েছিল মোতালেফ। চুক্তি ছিল দু' আনা ক'রে পয়সা দেবে প্রতি সেরে, কিন্তু মাসখানেক পরেই সন্দেহ হয়েছিল মোতালেফের মাজুখাতুন গুড় চুরি ক'রে রাখছে, অন্য কাউকে দিয়ে গোপনে গোপনে বিক্রী করাচ্ছে সেই গুড়, ষোল আনা জিনিস পাচ্ছে না মোতালেফ। ফলে কথান্তর মনান্তর হয়ে সে বন্দোবস্ত ভেস্তে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তার ঘরে রসের হাঁড়ি পাঠাবার প্রস্তাব নিয়ে আসেনি মোতালেফ, মাজুখাতুনকেই নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এমন প্রস্তাব পাড়ার আধ-বুড়োদের দলের আরো করেছে দু'একজন কিন্তু মাজুখাতুন কান দেয়নি তাদের কথায়। ছেলে ছোকরাদের মধ্যে যারা একটু বেশি বাড়াবাড়ি রকমের ইয়ার্কি দিতে এসেছে তাদের কান কেটে নেওয়ার ভয় দেখিয়েছে মাজুখাতুন। কিন্তু মোতালেফের প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাকে যেন তেমনভাবে তাড়ান যায় না। তাকে তাড়ালেও তার কথাগুলি ফিরে ফিরে আসতে থাকে মনের মধ্যে। পাড়ায় এমন চমৎকার কথা বলতে পারে না আর কেউ, অমন খুবসুরৎ মুখও কারোও নেই, অমন মানানসই কথাও নেই কারো মুখে।

মোতালেফকে আরো আসতে হল দু'ক সন্ধ্যা, তারপর নীল রঙের জোলাকী শাড়ি পরে, রঙ-বেরঙের কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়ে মোতালেফের পিছনে পিছনে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো মাজুখাতুন।

ঘরদোরের কোন শ্রী ছাঁদ নেই, ভারি অপরিষ্কার আর অগোছাল হয়ে রয়েছে সব। কোমরে আঁচল জড়িয়ে মাজুখাতুন লেগে গেল ঘরকন্নার কাজে। ঝাঁট দিয়ে দিয়ে জঞ্জাল দূর করল উঠানের, লেপেপুঁছে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ক'রে তুলল ঘরের

মেঝে।

কিন্তু ঘর আর ঘরণীর দিকে তাকাবার সময় নেই মোতালেফের, সে আছে গাছে গাছে। পাড়ায় আরো অনেকের—বোসেদের, বাঁড়ুয্যেদের গাছের বন্দোবস্ত নিয়েছে মোতালেফ। গাছ কাটছে, হাঁড়ি পাতছে, হাঁড়ি নামাচ্ছে, ভাগ ক'রে দিচ্ছে রস। পাঁকাটির একখানা চালা তুলে দিয়েছে মাজুখাতুনকে মোতালেফ উঠানের পশ্চিমদিকে। সারে সারে উনান কেটে তার ওপর বড় বড় মাটির জালা বসিয়ে সেই চালাঘরের মধ্যে বসে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রস জ্বাল দেয় মাজুখাতুন। জ্বালানির জন্যে মাঠ থেকে খড়ের নাড়া নিয়ে আসে মোতালেফ, জোগাড় করে আনে খেজুরের শুকনো ডাল। কিন্তু তাতে কি কুলোয়। মাজুখাতুন এর ওর বাগান থেকে জঙ্গল থেকে শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে আনে ঝাঁকা ভরে ভরে, পলো ভরে ভরে, বিকেলে বসে বসে দা দিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে শুকনো ডাল কাটে জ্বালানির জন্যে। বিরাম নেই বিশ্রাম নেই, খাটুনি গায়ে লাগে না, অনেকদিন পরে মনের মত কাজ পেয়েছে মাজুখাতুন, মনের মত মানুষ পেয়েছে ঘরে।

ধামা ভরে ভরে হাটে-বাজারে গুড় নিয়ে যায় মোতালেফ, বিক্রি ক'রে আসে চড়া দামে। বাজারের মধ্যে সেরা গুড় তার। পড়ন্ত বেলায় ফের যায় গাছে গাছে হাঁড়ি পাততে। লম্বা বাঁশের একেকটি ক'রে চোঙা ঝুলতে থাকে গাছে। সকালে রসের হাঁড়ি নামিয়ে ঝরার চোঙা বেঁধে দিয়ে যায় মোতালেফ। সারাদিনের ময়লা রস চোঙাগুলির মধ্যে জমা থাকে। চোঙা বদলে গাছ চেঁছে হাঁড়ি পাতে বিকেলে এসে। চোঙার ময়লা রস ফেলা যায় না। জ্বাল দিয়ে চিটে গুড় হয় তাতে তামাক মাখবার। বাজারে তাও বিক্রি হয় পাঁচ আনা ছ' আনা সের। দু'বেলা দু'বার ক'রে এতগুলি গাছে উঠতে নামতে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে মোতালেফের, পৌষের শীতেও সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝড়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। সকালবেলায় রোমশ বুকের মধ্যে ঘামের ফোঁটা চিক চিক করে। পায়ের নিচে দূর্বার মধ্যে চিক চিক করে রাত্রির জমা শিশির। মোতালেফের দিকে তাকিয়ে পাড়াপড়শীরা অবাক হয়ে যায়। চিরকালই অবশ্য খাটিয়ে মানুষ মোতালেফ কিন্তু বেশি উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে, দিনরাত এমন কলের মত পরিশ্রম করতে এর আগে তাকে দেখা যায়নি কোনোদিন। ব্যাপারটা কি? গাছ কাটা অবশ্য মনের মত কাজই মোতালেফের, কিন্তু পছন্দসই মনের মানুষ কি সত্যিই এল ঘরে?

সেরা গাছের সবচেয়ে মিষ্টি দু' হাঁড়ি রস আর সের তিনেক পাটালি গুড় নিয়ে মোতালেফ গিয়ে একদিন উপস্থিত হল চরকান্দায় এলেম শেখের বাড়িতে। সেলাম জানিয়ে এলেমের পায়ের সামনে নামিয়ে রাখলে রসের হাঁড়ি, গুড়ের সাজি, তারপর কোঁচার খুঁটের বাঁধন খুলে বের করল পাঁচখানা দশ টাকার নোট, বলল, 'অর্ধেক আগাম দিলাম মেঞাসাব।'

এলেম বলল, 'আগাম কিসের?'

মোতালেফ বলল, 'আপনার মাইয়ার—'

তাজা করকরে নোট বেছে নিয়ে এসেছে মোতালেফ। কোণায়, কিনারে চুল পরিমাণ ছিঁড়ে যায় নি কোথাও, কোন জায়গায় ছাপ লাগেনি ময়লা হাতের। নগদ পঞ্চাশ টাকা। নোটগুলির ওপর হাত বুলোতে বুলোতে এলেম বলল, 'কিন্তু এখন আর টাকা আগাম নিয়া আমি কি করব মেঞা? তুমি তো শোনলাম নেকা কইরা নিছ রাজেক মেরধার কবিলারে। সতীনের ঘরে যাবে ক্যান্ আমার মাইয়া। যাইয়া কি ঝগড়া আর চিল্লাচিল্লি করবে, মারামারি কাটাকাটি কইরা মরবে দিন রাইত।'

মোতালেফ মুচকে হাসল। বলল, 'তার জৈন্যে ভাবেন ক্যান্ মেঞাসাব। গাছে রস যদ্দিন আছে, গায়ে শীত যদ্দিন আছে, মাজুখাতুনও তদ্দিন আছে আমার ঘরে। দক্ষিণা বাতাস খেললেই সব সাফ হইয়া যাবে উইড়া।'

এলেম শেখ জলচৌকি এগিয়ে দিল মোতালেফকে বসতে, হাতের হুঁকোটা এগিয়ে ধরল মোতালেফের দিকে, তারিফ ক'রে বলল, 'মগজের মধ্যে তোমার সাঁচাই জিনিস আছে মিঞা, সুখ আছে তোমার সাথে কথা কইয়া, কাম কইরা।'

ফুলবানুকেও একবার চোখের দেখা দেখে যেতে অনুমতি পেল মোতালেফ। আড়াল থেকে দেখতে শুনতে ফুলবানুর কিছু বাকী ছিল না। তবু মোতালেফকে দেখে ঠোঁট ফুলালো ফুলবানু, 'বেসবুর কেডা হইল মেঞা? এদিকে আমি রইলাম

পথ চাইয়া আর তুমি ঘরে নিয়া ঢুকাইয়া আর একজনারে।'

মোতালেফ জবাব দিল, 'না ঢুকায়ে করি কি!'

মানের দায়ে জানের দায়ে বাধ্য হয়ে তাকে এই ফন্দি খুঁজতে হয়েছে। ঘরে কেউ না থাকলে পানি-চুনি দেয় কে, প্রাণ বাঁচে কি ক'রে। ঘরে কেউ না থাকলে রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করে কে। আর সেই গুড় বিক্রি ক'রে টাকা না আনলেই বা মান বাঁচে কি ক'রে।

ফুলবানু বলল, 'বোঝলাম, মানও বাঁচাইলা, জানও বাঁচাইলা, কিন্তু গায়ে যে আর একজনের গন্ধ জড়াইয়া রইল তা ছাড়াবা কেমনে।'

মনে এলেও মুখফুটে এ কথাটা বলল না মোতালেফ যে, মানুষ চলে গেলে তার গন্ধ সত্যিই আর একজনের গায়ে জড়িয়ে থাকে না, তা যদি থাকত তা'হলে সে গন্ধ তো ফুলবানুর গা থেকেও বেরুতে পারত। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে মোতালেফ ঘুরিয়ে জবাব দিল, বলল, 'গন্ধের জন্য ভাবনা কি ফুলবিবি। সোডা সাবান কিনা দেব বাজার গুনা। ঘাটের পৈঠায় পা ঝুলাইয়া বসব তোমারে লইয়া। গতর গুনা ঘইস্যা ঘইস্যা বদ্ গন্ধ উঠাইয়া ফেইলো।'

মুখে আঁচল চাপতে চাপতে ফুলবানু বলল, 'সাঁচাই নাকি?'

মোতালেফ বলল, 'সাঁচা না ত কি মিছা? শুইঙ্গা দেইখো তখন নতুন মাইনষের নতুন গন্ধে ভুর ভুর করবে গতর। দক্ষিণা বাতাসে চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে ভুর ভুর করবে, কেবল সবুর কইরা থাক আর দুইখান মাস।'

ফুলবানু আর একবার ভরসা দিয়ে বলল, 'বেসবুর মানুষ ভাইবো না আমারে।'

যে কথা সেই কাজ মোতালেফের, দু'মাসের বেশি সবুর করতে হল না ফুলবানুকে। গুড় বেচে আরও পঞ্চাশ টাকার জোগাড় হতেই মোতালেফ মাজুখাতুনকে তালাক দিল। কারণটাও সঙ্গে সঙ্গে পাড়াপড়শীকে সাড়ম্বরে জানিয়ে দিল। মাজুবিবির স্বভাব-চরিত্র খারাপ। রাজেকের দাদা ওয়াহেদ মৃধার সঙ্গে তার আচার-ব্যবহার ভারি আপত্তিকর।

মাজুখাতুন জিভ কেটে বলল, 'আউ আউ, ছি ছি। তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোতিমেঞা, ভিতর সোন্দর না। এত শয়তানি, এত ছলচাতুরী তোমার মনে? গুড়ের সময় পিপড়ার মত লাইগা ছিলা, আর গুড় যাই ফুরাইল অমনি দুর্ দুর্।'

কিন্তু অত কথা শোনবার সময় নেই মোতালেফের; ধৈর্যও নেই।

আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পরে এল বসন্ত, মাজুখাতুনের পরে এল ফুলবানু। ফুলের মতই মুখ। ফুলের গন্ধ তার নিঃশ্বাসে। পাড়াপড়শী বলল, 'এবার মানাইছে, এবার সাঁচাই বাহার খোলছে ঘরের।'

ফুর্তির অন্ত নেই মোতালেফের মনে। দিনভর কিষাণ কামলা খাটে। তারপর সন্ধ্যা হতে না হতেই সে আঁচল ধরে ফুলবানুর, 'থুইয়া দাও তোমার রান্ধন-বাড়ন ঘরগেরস্থলি। কাছে বস আইসা।'

ফুলবানু হাসে, 'সবুর সবুর। এ কয়মাস কাটাইলা কি কইরা মেঞা?'

মোতালেফ জবাব দেয়, 'খেজুর গাছ লইয়া।'

নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে ফুলবানুর, একটু নিঃশ্বাস নিয়ে হেসে বলে, 'তুমি আবার সেই গাছের কাছেই ফিরা যাও। 'গাছি'র আদর গাছেই সইতে পারে।'

মোতালেফ বলে, 'কিন্তু গাছির কাছেও যে গাছের রস দুই-চাইর মাসেই ফুরায় ফুলজান, কেবল তোমার রসই বছরে বার মাস চোঁয়াইয়া চোঁয়াইয়া পড়ে।'

মাজুখাতুন ফের গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল রাজেকের পড়ো-পড়ো শণের কুঁড়েয়। ভেবেছিল আগের মতই দিন কাটবে।

কিন্তু দিন যদিবা কাটে, রাত কাটে না। মোতালেফ তার সর্বনাশ ক'রে ছেড়েছে। পাড়াপড়শীরা এসে সাড়ম্বর সালঙ্কারে মোতালেফ আর ফুলবানুর ঘরকন্নার বর্ণনা করে, একটু বা সকৌতুক তিরস্কারের সুরে বলে, 'নাঃ, বউ বউ কইরা পাগল হইয়াই গেল মানুষটা। যেখানেই যায় বউ ছাড়া আর কথা নাই মুখে।'

বুকের ভিতরটা জ্বলে ওঠে মাজুখাতুনের। মনে হয় সেও বুঝি হিংসায় পাগল হয়ে যাবে। বুক ফেটে মরে যাবে সে।

দিন কয়েক পরে রাজেকের বড় ভাই ওয়াহেদই নিয়ে এল সম্বন্ধ। বউটার দশা দেখে ভারি মায়া হয়েছে তার। নদীর ওপারে তালকান্দায় নাদির শেখের সঙ্গে দোস্তি আছে ওয়াহেদের। এক মাল্লাই নৌকা বায় নাদির। মাসখানেক আগে কলেরায় তার বু মারা গেছে। অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে গেছে অনেকগুলি। তাদের নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছে বেচারা। কমবয়সী ছুঁড়ী-টুঁড়িতে দরকার নেই তার। সে হয়তো পটের বিবি সেজে থাকবে, ছেলেমেয়ের যত্ন-আত্তি করবে না। তাই মাজুখাতুনের মত একটু ভারিক্কি ধীরবুদ্ধি গৃহস্থঘরের বউই তার পছন্দ। তার ওপর নির্ভর করতে পারবে সে।

মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'বয়স কত হবে তার?'

ওয়াহেদ জবাব দিল, 'তা আমাগো বয়সীই হবে। পঞ্চাশ, এক-পঞ্চাশ।'

মাজুখাতুন খুশী হয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল— হ্যাঁ ওই রকমই তার চাই। কম বয়সে তার আস্থা নেই। বিশ্বাস নেই যৌবনকে।

তারপর মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'গাছি না তো সে? খাজুর গাছ কাটতে যায় না তো শীতকালে?'

ওয়াহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'গাছ কাটতে যাবে ক্যান্। ওসব কাম কোন কালে জানে না সে। বর্ষাকালে নৌকা বায়, শীতকালে কিষাণ কামলা খাটে, ঘরামির কাজ করে। ক্যান্ বউ, 'গাছি' ছাড়া, রসের ব্যাপারী ছাড়া কি তুমি নিকা বসবা না কারো সাথে?'

মাজুখাতুন ঠিক উল্টো জবাব দিল। রসের সঙ্গে কিছুমাত্র যার সম্পর্ক নেই, শীতকালের খেজুর গাছের ধারে কাছেও যে যায় না, নিকা যদি বসে মাজুখাতুন তার সঙ্গেই বসবে। রসের ব্যাপারে মাজুখাতুনের ঘেন্না ধরে গেছে।

ওয়াহেদ বলল, 'তাহ'লে কথাবার্তা কই নাদিরের সাথে? সে বেশি দেরি করতে চায় না।'

মাজুখাতুন বলল, 'দেরি কইরা কাম কি।'

দেরি বেশি হলও না, সপ্তাহখানেকের মধ্যে কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল। নাদিরের সঙ্গে এক মাল্লাই নৌকায় গিয়ে উঠল মাজুখাতুন। পার হয়ে গেল নদী।

মোতালেফ স্ত্রীকে বলল, 'আপদ গেল। পেত্নীর মত ফাঁৎ ফাঁৎ নিশ্বাস ফেলত, চোখের উপর শাপমন্যি করত দিন রাইত, তার হাতগুনা তো বাঁচলাম, কি কও ফুলজান?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'পেত্নীরে খুব ডরাও বুঝি মেঞা?'

মোতালেফ বলল, 'না, এখন আর ডরাই না। পেত্নী তো ছুইটাই গেল। এখন চোখ মেললেই তো পরী। এখন ডরাই পরীরে।'

'ক্যান্, পরীরে আবার ডর কিসের তোমার?'

'ডর নাই? পাখা মেইলা কখন্ উরাল দেয় তার ঠিক কি!'

ফুলবানু বলল, 'না মেঞা, পরীর আর উরাল দেওয়ার সাধ নাই। সে তার পছন্দসই সব পাইয়া গেছে। এখন ঘরের মাইনষের পছন্দ আর নজরডা বরাবর এই রকম থাকলে হয়।'

মোতালেফ বলল, 'চৌখ যদ্দিন আছে, নজরও তদ্দিন থাকবে।'

দিনরাত ভারি আদরে তোয়াজে রাখল মোতালেফ বউকে। কোন্ মাছ খেতে ভালোবাসে ফুলবানু হাটে যাওয়ার আগে জেনে যায়, ট্যাঁকে পয়সা না থাকলে কারো কাছ থেকে পয়সা ধার ক'রে কেনে সেই মাছ। ডিমটা, আনাজটা, তরকারিটা যখন যা পারে হাট-বাজার থেকে নিয়ে আসে মোতালেফ। ফি হাটে আনে পান সুপারি খয়ের মসলা।

ফুলবানু বলে, 'অত পান আন ক্যান্, তুমিতো বেশি ভক্ত না পানের। দিন রাইত খালি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ তামাক টানো।'

মোতালেফ বলল, 'পান আনি তোমার জৈন্যে। দিন ভইরা পান খাবা, খাইয়া খাইয়া ঠোঁট রাঙ্গাবা।'

ফুলবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'ক্যান্, আমার ঠোঁট এমনে বুঝি রাঙ্গা না যে, পান খাইয়া রাঙ্গাইতে হবে? আমি পান সাইজা দেই, তুমিই বরং দিন রাইত খাওয়া ধর। তামাক খাইয়া খাইয়া কালা হইয়া গেছে ঠোঁট, পানের রসে রাঙ্গাইয়া নেও।'

মোতালেফ হেসে বলল, 'পুরুষ মাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঙ্গা হয় না।' নিজের ভুঁই ক্ষেত নেই মোতালেফের। মল্লিকদের, মুখুজ্যেদের কিছু কিছু জমি বর্গা চষে। কিন্তু ভালো কৃষাণ বলে তেমন খ্যাতি নেই, জমির পরিমাণ, ফসলের পরিমাণ অন্য সকলের মত নয়। সিকদারদের, মুন্সীদের জমিতে কিষাণ খাটে। পাট নিড়ায়, পাট কাটে, পাট জাগ দেয়, ধোয়, মেলে। ভারি খেজমৎ খাটুনি খাটে। ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে কালো হয়ে যায় মোতালেফের। বর্গা জমির পাট খুব বেশি ওঠে না উঠানে। সিকদাররা, মুন্সীরা নগদ টাকা দেয়। কেবল মল্লিক আর মুখুজ্যেদের বিঘেচারেক ভুঁইয়ের ভাগের ভাগ অর্ধেক জাগ-দেওয়া পাট নৌকা ভরে খালের ঘাটে এনে নামায় মোতালেফ। পাট ছাড়াতে ভারি উৎসাহ ফুলবানুর। কিন্তু মোতালেফ সহজে তাকে পাটে হাত দিতে দেয় না, বলে, 'কষ্ট হবে, পচা গন্ধ হবে গায়।'

ফুলবানু বলে, 'ইইল তো বইয়া গেল, রউদে পুইড়া তুমি কালা কালা হইয়া গেলা, আর আমি পাট নিতে পারব না, কষ্ট হবে! কেমনতরো কথাই যে কও তুমি মেঞা।'

নিজেদের পাট তো বেশি নয়, পাঁকাটি পাওয়া যায় না। ফুলবানুর ইচ্ছা, অন্য বাড়ির জাগ-দেওয়া পাটও সে ছাড়িয়ে দেয়। সেই ছাড়ানো পাটের পাটখড়িগুলি পাওয়া যাবে তাহ'লে। কিন্তু মোতালেফ রাজী নয় তাতে, অত কষ্ট বউকে সে করতে দেবে না।

আশ্বিনের শেষের দিকে আউস ধান পাকে। অন্যের নৌকায় পরের জমিতে কিষাণ খাটতে যায় মোতালেফ। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে ধান কাটে। আঁটিতে আঁটিতে ধান তুলতে থাকে নৌকায়। কিন্তু মোমিন, করিম, হামিদ, আজিজ— এদের সঙ্গে সমানে সমানে কাচি চলে না তার। হাত বড় 'ধীরচ' মোতালেফের, জলে ভারি কাতর মোতালেফ। একক দিন পিঠে বগলে জোঁক লেগে থাকে। ফুলবানু তুলে ফেলতে ফেলতে বলে, 'জোঁকটাও ছাড়াইতে পার না মেঞা, হাত তো ছিল সঙ্গে?'

মোতালেফ বলে, 'ধান কাটার হাত দুইখান সাথেই ছিল, জোঁক ফেলাবার হাত থুইয়া গেছিলাম বাড়িতে।'

যেখানে যেখানে জোঁকে মুখ দিয়েছিল সে সব জায়গায় সযত্নে চুন লাগিয়ে দেয় ফুলবানু, আরো পাঁচজন কৃষাণের সঙ্গে ধান মলন দেয় মোতালেফ, দেউনি পায় পাঁচভাগের একভাগ। ধামায় ক'রে পৈঁকায় ক'রে ধান নিয়ে আসে। ফুলবানু ধান রোদে দেয়, কুলোয় ক'রে চিটা ঝেড়ে ফেলে ধান থেকে। মোতালেফ একেকবার বলে, 'ভারি কষ্ট হয় বউ, না?'

ফুলবানু বলে, 'হ, কষ্টে একেবারে মইরা গেলাম না। কার নাগাল কথা কও তুমি মেঞা। গেরস্থ ঘরের মাইয়া না আমি, না সাঁচাই আশমান গুনা নাইমা আইছি?'

বসন্ত যায়, বর্ষা যায়, কাটে আশ্বিন কার্তিক, ঘুরে ঘুরে ফের আসে শীত। রসের দিন মোতালেফের বতনের দিন। কিন্তু শীতটা এবার যেন একটু বেশি দেরিতে এসেছে। তা হোক, আরো বেশি গাছের বন্দোবস্ত নিয়ে পুষিয়ে ফেলবে মোতালেফ। খেজুর গাছের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ে। এ কাজে নাম ডাক আছে মোতালেফের, এ কাজে গাঁয়ের মধ্যে সে-ই সেরা। এবারেও বাঁড়ুজ্যেদের কুড়িদেড়েক গাছ বেড়ে গেল।

গাছ কাটাবার ধুম লেগে গেছে। একটুও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই মোতালেফের, সময় নেই তেমন ফুলবানুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি রঙ্গরসিকতার। ধার দেনা শোধ দিতে হবে, সারা বছরের রসদ জোগাড় করতে হবে রস বেচে, গুড় বেচে। দৈত্যের

মত দিনভর খাটে মোতালেফ, আর বিছানায় গা দিতে না দিতেই ঘুমে ভেঙে আসে চোখ। দু'হাতে ঠেলে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফুলবানু, কিন্তু মানুষকে নয়, যেন আস্ত একটা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে। অসাড়ে ঘুমোয় মোতালেফ। শব্দ বেরোয় নাক থেকে, আর কোন অঙ্গ সাড়া দেয় না। মোটা কাঁথার মধ্যেও শীতে কাঁপে ফুলবানু। মানুষের গায়ের গরম না পেলে, এত শীত কি কাঁথায় মানে?

কেবল রস আনলেই হয় না, রস জ্বাল দেওয়ার জ্বালানি চাই। এখান থেকে ওখান থেকে শুকনো তালপাতা আর খড় বয়ে আনে মোতালেফ। ফুলবানুকে বলে, 'রস জ্বাল দেও,— যেমন মিঠা হাত, তেমন মিঠা গুড় বানান চাই, সেরা আর সরেস জিনিস হওয়া চাই বাজারের।'

কিন্তু হাঁড়িতে হাঁড়িতে রসের পরিমাণ দেখে মুখ শুকিয়ে যায় ফুলবানুর, বুক কাঁপে। দু' এক হাঁড়ি রস জ্বাল দিয়েছে সে বাপের বাড়িতে, কিন্তু এত রস এক সঙ্গে সে কোনদিন দেখেনি, কোনকালে জ্বাল দেয়নি।

মোতালেফ তার ভঙ্গি দেখে হেসে বলে, 'ভয় কি, আমি তো আছিই কাছে কাছে— আমারে পুছ কইরো, আমি কইয়া কইয়া দেব। মনের মইধ্যে যেমন টগবগ করে রস, জ্বালার মধ্যেও তেমন করা চাই।'

কিন্তু উনানের কাছে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে মনের রস শুকিয়ে আসে ফুলবানুর, নিবু নিবু করে উনানের আগুন, তেমন ক'রে টগবগ করে না জ্বালার রস। সারা দুপুর উনানের ধারে বসে বসে চোখ-মুখ শুকিয়ে আসে ফুলবানুর, রূপ ঝলসে যায়, তবু গুড় হয় না পছন্দমত। কেমন যেন নরম নরম থাকে পাটালি, কোনদিন বা পুড়ে তেতো হয়ে যায়।

মোতালেফ রুক্ষস্বরে বলে, 'কেমনতরো মাইয়ামানুষ তুমি, এত কইরা কইয়া দেই, বুঝাইলে বোঝ না। এই গুড় হইছে, এই নি খইদ্দারে কেনবে পয়সা দিয়া?'

ফুলবানু একটু হাসতে চেষ্টা করে বলে, 'কেনবে না ক্যান। বেচতে জানলেই কেনবে।'

মোতালেফ খুশি হয় না হাসিতে, বলে, 'তাইলে তুমি যাইয়া ধামা লইয়া বইস বাজারে। তুমি আইস বেইচা। খুবসুরৎ মুখের দিকে চাইয়া যদি কেনে, গুড়ের দিকে চাইয়া কেনবে না।'

বোকা তো নয় ফুলবানু, অকেজো তো নয় একেবারে। বলতে বলতে শেখাতে শেখাতে দু'চারদিনের মধ্যেই কোনরকমে চলনসই গুড় তৈরি করতে শিখল ফুলবানু, বাজারে গুড় একেবারে অচল রইল না। কিন্তু দর ওঠে না গতবারের মত, খদ্দেররা তেমন খুশি হয় না দেখে।

পুরনো খদ্দেররা একবার গুড়ের দিকে চায় আর একবার মুখের দিকে চায় মোতালেফের, 'এ তোমার কেমনতরো গুড় হইল মিঞা? গত হাটে নিয়া দেখলাম গেল বছরের মত সোয়াদ পাইলাম না। গেলবারও তো গুড় খাইছি তোমার, জিহ্বায় যেন জড়াইয়া রইছে, আস্বাদ ঠোঁটে লাইগা রইছে। এবার তো তেমন হইল না। তোমার গুড়ের থিকা এবার ছদন শেখ, মদন সিকদারের গুড়ের সোয়াদ বেশি।'

বুকের ভিতর পুড়ে যায় মোতালেফের, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। গতবারের মত এবার স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে। কেন, সে তো কম খাটছে না, কম পরিশ্রম করছে না গতবারের চেয়ে। তবু কেন স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে, তবু কেন দর উঠছে না, লোকে দেখে খুশি হচ্ছে না, খেয়ে খুশি হচ্ছে না, গুড়ের সুখ্যাতি করছে না তার। অত নিন্দামন্দ শুনতে হচ্ছে কেন, কিসের জন্যে?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রস জ্বাল দেওয়ার কৌশলটা আরো বার কয়েক মোতালেফ বলল ফুলবানুকে, 'হাতায় কইরা কইরা ফোঁটা দেইখো নামাবার সময় হইল কিনা, ঢালবার সময় হইল কিনা রস।'

ফুলবানু বিরক্ত বিরস মুখে বলে, 'হ হ, চিনছি। আর বক বক কইরো না, ঘুমাইতে দেও মাইনষেরে।'

হঠাৎ মোতালেফের মন পড়ে গেল মাজুখাতুনের কথা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে রস আর গুড়ের কত আলোচনা করেছে তার সঙ্গে মোতালেফ। মাজুখাতুন এমন ক'রে মুখ ঝামটা দেয়নি, অস্বস্তি জানায়নি ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে, সাগ্রহে শুনেছে,

সানন্দে কথা বলেছে।

পরদিন বেলা প্রায় দুপুর নাগাদ কোত্থেকে একবোঝা জ্বালানি মাথায় ক'রে নিয়ে এল মোতালেফ, এনে রাখল সেই পাঁকাটির চালার দোরের কাছে, 'কি রকম গুড় হইতেছে আইজ ফুলজান?'

কিন্তু চালার ভিতর থেকে কোন জবাব এল না ফুলবানুর। আরো একবার ডেকে সাড়া না পেয়ে বিস্মিত হয়ে চালার ভিতর মুখ বাড়াল মোতালেফ, কিন্তু ফুলবানুকে সেখানে দেখা গেল না। কি রকম গন্ধ আসছে যেন ভিতর থেকে, জালার মধ্যে ধরে গেল নাকি গুড়? সারে সারে গোটা পাঁচেক জালায় রস জ্বাল হচ্ছে, টগবগ করছে রস জালার মধ্যে। মুখ বাড়িয়ে দেখতে এগিয়ে গেল মোতালেফ। যা ভেবেছে ঠিক তাই। সবচেয়ে দক্ষিণকোণের জালাটার রস বেশি জ্বাল পেয়ে কি ক'রে যেন ধরে গেছে একটু। পোড়া পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে ভিতর থেকে। বুকের মধ্যে জ্বালাপোড়া ক'রে উঠল মোতালেফের, গলা চিরে চীৎকার বেরুল,— 'কই, কোথায় গেলি হারামজাদী?'

ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ফুলবানু। বেলা বেশি হয়ে যাওয়ায় দু'দিন ধ'রে স্নান করতে পারেনি। শীতের দিন না নাইলে গা কেমন চড় চড় করে, ভালো লাগে না। তাই আজ একটু সোডা সাবান মেখে ঘাট থেকে সকাল সকাল স্নান ক'রে এসেছে। নেয়ে এসে পরেছে নীল রঙের শাড়ি। গামছায় চুল নিংড়ে তাতে তাড়াতাড়ি একটু চিরুনি বুলিয়ে নিচ্ছিল ফুলবানু, মোতালেফের চিৎকার শুনে ত্রস্তে চিরুনি হাতেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ভিজে চুল লুটিয়ে রইল পিঠের ওপর। এক মুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল মোতালেফ, তারপর ছুটে গিয়ে মুঠি ক'রে ধরল সেই ভিজে চুলের রাশ, 'হারামজাদী, গুড় পুইড়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই তোমার, তুমি আছ সাজগোজ লইয়া, পটের ভিতর গুনা বাইরাইয়া আইলা তুমি বিদ্যাধরী, এই জৈন্যেই গুড় খারাপ হয় আমার, অপমান হয়, বদনামে দেশ ছাইয়া গেল তোমার জৈন্যে!'

ফুলবানু বলতে লাগল, 'খবরদার, চুল ধইরো না তাই বইলা, গায়ে হাত দিও না।'

'ও, হাতে মারলে মান যায় বুঝি তোমার?' পায়ের কাছ থেকে একটা ছিটা কঞ্চি তুলে নিয়ে তাই দিয়ে হাতে বুকে পিঠে মোতালেফ সপাসপ চালাতে লাগল ফুলবানুর সর্বাঙ্গে, বলল, 'কঞ্চিতে মারলে তো আর মান যাবে না শেখের ঝির। হাতেই দোষ, কঞ্চিতে তো আর দোষ নাই।'

ভারি বদরাগী মানুষ মোতালেফ। যেমন বেসবুর বেবুঝ তার অনুরাগ, রাগও তেমনি প্রচণ্ড।

খবর পেয়ে এলেম শেখ এল চরকান্দা থেকে। জামাইকে শাসলো, বকলো, ধমকালো, মেয়েকেও নিন্দামন্দ কম করল না।

ফুলবানু বলল, 'আমারে লইয়া যাও বা'জান তোমার সাথে— এমন গোঁয়ার মাইন্ষের ঘর করব না আমি।'

কিন্তু বুঝিয়ে শুঝিয়ে এলেম রেখে গেল মেয়েকে। একটু আস্কারা দিলেই ফুলবানু পেয়ে বসবে, আবার তালাক নিতে চাইবে। কিন্তু গৃহস্থঘরে অমন বারবার অদল-বদল আর ঘর-বদলানো কি চলে। তাতে কি মান-সম্মান থাকে সমাজের কাছে। একটু সবুর করলেই আবার মন নরম হয়ে আসবে মোতালেফের। দু'দণ্ড পরেই আবার মিলমিশ হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি। দিনে হয়, রাত্রে মেটে। তা নিয়ে আবার একটা ভাবনা।

মিটে গেলও। খানিক বাদেই আবার যেচে আপোষ করল মোতালেফ। সেধেভেজে মান ভাঙাল ফুলবানুর। পরদিন ফের আবার উনানের পিঠে রস জ্বাল দিতে গিয়ে বসল ফুলবানু। দুপুরের পর ধামায় বয়ে গুড় নিয়ে চলল মোতালেফ হাটে। যাবার সময় বলল, 'এই দুইটা মাস কাইটা গেলে কোন রকমে তোমার কষ্ট সারে ফুলজান।'

ফুলবানু বলল, 'কষ্ট আবার কি।'

কিন্তু কেবল মুখের কথা, কেবল যেন ভদ্রতার কথা। মনের কথা যেন ফুটে বেরোয় না দু'জনের কারোরই মুখ দিয়ে। সে কথার ধরন আলাদা; তা তো আর চিনতে বাকি নেই কারো। বলেও জানে, শোনেও জানে।

হাটের পর হাট যায়, রসের বছর প্রায় শেষ হয়ে আসে; গুড়ের খ্যাতি বাড়ে না মোতালেফের, দর চড়ে না; কিন্তু তা

নিয়ে ফুলবানুর সঙ্গে বাড়ি এসে আর তর্কবিতর্ক করে না মোতালেফ, চুপ ক'রে ব'সে হুঁকোয় তামাক টানে। খেজুর গাছ থেকে নল বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রস পড়ে হাঁড়ির মধ্যে। ভোরে গাছে উঠে রসভরা বড় বড় হাঁড়ি নামিয়ে আনে মোতালেফ, কিন্তু গত বছরের মত যেন সুখ নেই মনে, স্ফূর্তি নেই। ঘামে এবারও সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, কিন্তু শুকনো পাঁকাটির মত খট খট করে মন, দুপুরের রোদের মত খাঁ খাঁ করে। কোথাও ছিটা ফোঁটা নেই রসের। রসের হাঁড়িতে ভরে যায় উঠান, রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি-খালি মনে হয় দুনিয়া।

একদিন হাটের মধ্যে দেখা হয়ে গেল নদীর পারের নাদির শেখের সঙ্গে।

'সেলম মেঞাসাব।'

'আলেকম আসলাম।'

মোতালেফ বলল, 'ভালো তো সব, ছাওয়ালপান ভালো তো—?'

মাজুখাতুনের কথাটা মুখে এনেও আনতে পারল না মোতালেফ। নাদির একটু হেসে বলল, 'হ মেঞা, ভালোই আছে সব। খোদার দয়ায় চইলা যাইতেছে কোন রকম সকমে।'

মোতালেফ একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'ছাওয়ালপানের জৈন্যে সের দুই তিন গুড় লইয়া যান না মেঞা। ভালো গুড়।'

নাদির হেসে বলল, 'ভালোই তো। আপনার গুড় তো কোনকালে খারাপ হয় না।'

হঠাৎ ফস ক'রে কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় মোতালেফের, 'না মেঞা, সে দিনকাল আর নাই।'

অবাক হয়ে নাদির এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে মোতালেফের দিকে। এ কেমনতরো ব্যাপারী! গুড় বেচতে এসে নিজের গুড়ের নিন্দা কি কেউ নিজে করে?'

নাদির জিজ্ঞাসা করে, 'কত কইরা দিতেছেন?'

'দামের জৈন্যে কি? দুই সের গুড় দিলাম আপনার পোলাপানরে খাইতে। কয়ন জানি, চাচায় দিছে।'

নাদির ব্যস্ত হয়ে বলে, 'না না না, সে কি মেঞা, আপনার বেচবার জিনিস, দাম না দিয়া নেব ক্যান আমি।'

মোতালেফ বলে, 'আইচ্ছা, নিয়া তো যায়ন আইজ; খাইয়া দ্যাখেন, দাম না হয় সামনের হাটে দিবেন।'

বলতে বলতে কথাগুলো যেন মুখে আটকে যায় মোতালেফের। এবারেও জিনিস কাটাবার জন্যে বলতে হয় এসব কথা, গুড়ের গুণপনার কথা ঘোষণা করতে হয় খদ্দেরের কাছে, কিন্তু মনে মনে জানে কথাগুলি কত মিথ্যা, পরের হাটে এসব খদ্দের আর পারতপক্ষে গুড় কিনবে না তার কাছ থেকে, ভিড় করবে না তার গুড়ের ধামার সামনে।

অনেক বলা-কওয়ায় একসের গুড় কেবল বিনা দামে নিতে রাজী হয় নাদির, আর বাকি দু' সেরের পয়সা গুনে দেয় জোর ক'রে মোতালেফের হাতের মধ্যে।

মাজুখাতুন সব শুনে আগুন হয়ে ওঠে রেগে, 'ও গুড় ছাওয়ালপানরে খাওয়াইতে চাও খাওয়াও, কিন্তু আমি ও গুড় ছোব না হাত দিয়া, তেমন বাপের বিটি না আমি।'

এক হাট যায়, নাদির আর ঘেঁষে না মোতালেফের গুড়ের কাছে। মাজুখাতুন নিষেধ ক'রে দিয়েছে নাদিরকে, 'খবরদার, ওই মাইন্‌ষের সাথে যদি ফের খাতির নাতির কর, আমি চইলা যাব ঘরগুনা। রাইত পোহাইলে আমারে আর দেখতে পাবা না।'

মনে মনে মাজুখাতুনকে ভারি ভয় করে নাদির। কাজে-কর্মে সরেস, কথায়-বার্তায় বেশ, কিন্তু রাগলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না বিবির।

দিন কয়েক পরে একদিন ভোরবেলায় দু'টি সেরা গাছের সবচেয়ে ভালো দু' হাঁড়ি রস নিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে খেয়া নৌকায় উঠে বসল মোতালেফ। ঝাপ্‌টানো কুলগাছটার পাশ দিয়ে ঢুকল গিয়ে নাদিরের উঠানে; 'বাড়ি আছেন নাকি মেঞা?'

হুঁকো হাতে নাদির বেরিয়ে এল ঘর থেকে; 'কেডা? ও, আপনে? আসেন, আসেন। আবার রস নিয়া আইছেন ক্যান্ মেঞাসাব?'

মোতালেফকে আমন্ত্রণ জানাল বটে নাদির কিন্তু মনে মনে ভারি শঙ্কিত হয়ে উঠল মাজুখাতুনের জন্য। যে মানুষের নাম গন্ধ শুনতে পারে না বিবি, সেই মানুষ নিজে এসে সশরীরে হাজির হয়েছে। না জানি, কি কেলেঙ্কারিটাই ঘটায়।

যা ভেবেছে নাদির, তাই। বাঁখারি বেড়ার ফাঁক দিয়ে মোতালেফকে দেখতে পেয়েই স্বামীকে ঘরের ভিতর ডেকে নিল মাজুখাতুন, তারপর মোতালেফকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'যাইতে কও এ বাড়িগুনা, এখনই নাইমা যাইতে কও। একটুও কি সরম ভরম নাই মনের মইধ্যে? কোন মুখে উঠল আইসা এখানে?'

নাদির ফিস ফিস ক'রে বলে, 'আস্তে, আস্তে— একটু গলা নামাইয়া কথা কও বিবি। শোনতে পাবে। মাইন্‌ষের বাড়ি মানুষ আইছে, অমন কইরা কথা কয় নাকি। কুকুর বিড়ালডারেও তো অমন কইরা খেদায় না মাইন্‌ষে।'

মাজুখাতুন বলল, 'তুমি বোঝবা না মিঞা, কুকুর বিড়াল থিকাও অধম থাকে মানুষ শয়তান থিকাও সাংঘাতিক হয়। পুছ কর, রস খাওয়াইতে যে আইল আমারে, একটুও ভয়ডর নাই মনে, একটুও কি নাজসরম নাই?'

একটা কথাও মৃদুস্বরে বলছিল না মাজুখাতুন, তার সব কথাই কানে যাচ্ছিল মোতালেফের। কিন্তু আশ্চর্য, এত কঠিন, এত রূঢ় ভাষাও যেন তাকে ঠিক আঘাত করছিল না, বরং মনে হচ্ছিল এত নিন্দা-মন্দ, এত গালাগাল তিরস্কারের মধ্যেও কোথায় যেন একটু মাধুর্য মিশে আছে; মাজুখাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহত বঞ্চিতা নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে যেন একটু একটু। ছ্যানের খোঁচায় নলের ভিতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রস।

দাওয়ায় উঠে রসের হাঁড়ি দু'টি হাত থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে মোতালেফ নাদিরকে ডেকে বলল, 'মেঞাসাব, শোনবেন নি একটু?'

নাদির লজ্জিত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'বসেন মেঞা, বসেন। ধরেন, তামাক খান।'

নাদিরের হাত থেকে হুঁকোটা হাত বাড়িয়ে নিল মোতালেফ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুখ লাগিয়ে টানতে শুরু করল না, হুঁকোটা হাতেই ধরে রেখে নাদিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার হইয়া একটা কথা কন বিবিরে।'

নাদির বলল, 'আপনেই ক'ন না, দোষ কি তাতে।'

মোতালেফ বলল, 'না, আপনেই কন, কথা কবার মুখ আমার নাই। ক'ন যে মোতালেফ মেঞা খাওয়াবার জৈন্যে আনে নাই রস, সেইটুকু বুদ্ধি তার আছে।'

নাদির কিছু বলবার আগেই মাজুখাতুন ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠল, 'তয় কিসের জৈন্যে আনছে?'

নাদিরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই জবাব দিল মোতালেফ, বলল, 'কয়ন যে আনছে জ্বাল দিয়া দুই সের গুড় বানাইয়া দেওয়ার জৈন্যে। সেই গুড় ধামায় কইরা হাটে নিয়া যাবে মোতালেফ মিঞা। নিয়া বেচবে অচেনা খইদ্দারের কাছে। এ বছর একছটাক পছন্দসই গুড়ও তো সে হাটে বাজারে বেচতে পারে নাই। কেবল গাছ বাওয়াই সার হইছে তার।' গলাটা যেন ধরে এল মোতালেফের। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, বাঁখারির বেড়ার ফাঁকে চোখে পড়ল কালো বড় বড় আর-দুটি চোখ ছল্ ছল্ করে উঠেছে। চুপ ক'রে তাকিয়ে রইল মোতালেফ। আর কিছু বলা হল না।

হঠাৎ যেন হুঁস হল নাদির শেখের, বলল, 'ও কি মেঞা, হুঁকাই যে কেবল ধইরা রইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না? আগুননি নিবা গেল কইলকার?'

হুঁকোতে মুখ দিতে দিতে মোতালেফ বলল, 'না মেঞাভাই, নেবে নাই।'

১২.২ বাংলা কথাসাহিত্য ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।' যে কোনো প্রতিভার কর্মের মূল্যায়ণ করতে গেলে তার জীবনটিকে আগে জেনে বুঝে নেওয়া দরকার। বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সারির স্রষ্টা নরেন্দ্রনাথ মিত্র। তাঁর কলমের যাদুতে সৃষ্ট এক একটি গল্প উজ্জ্বল নক্ষত্র। বার বার পঠন-পাঠনের পরেও পাঠক তাঁর সাহিত্যের প্রতি সমান আকর্ষিত হন। চলমান জীবনের নানারূপ, ছোটোখাটো দুঃখ, কষ্ট, বেদনা সবই তিনি তাঁর কলমে তুলে ধরেছেন। ইচ্ছাপূরণের গল্প লেখেননি নরেন্দ্রনাথ কিম্বা কোনো নীতিবাক্য প্রচার বা বিশেষ উদ্দেশ্যে কলম ধরেননি। জীবনের নিত্য দিনের সুখ, দুঃখ, আনন্দ তাঁর লেখায় চিরন্তন রূপ লাভ করেছে। এই কারণে তাঁর গল্প ও উপন্যাস কালোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। সময় বদলেছে, যুগের পরিবর্তন ঘটেছে তবু এই লেখকের পাঠকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনা সম্পর্কে তাঁর বন্ধু ও প্রাবন্ধিক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছিলেন যে, 'নরেন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস থেকে সমস্ত অবান্তরের আবরণকে যদি সরিয়ে নেওয়া যায় প্রধানত আমরা যে নরেন্দ্রনাথের সাহায্য পাব, তিনি কঠিনে কোমলে মেলানো রিয়ালিস্ট নরেন্দ্রনাথ। এই যে কঠিন, এর সবটাই জীবনের কঠিনতা— লেখকের রিয়ালিটি বোধ থেকে আসা কঠিনতা। আর এই যে কোমল এর খানিকটা অবশ্য জীবনের নিজের নিজেরই কোমলতা, কোমলতার বাকি খানিকটা এসেছে লেখকের স্বভাব থেকে। তাকে বলতে পারি নরেন্দ্রনাথের রচনার বাতাবরণ, রচনার মমতা মসৃণ খোলস।'

১৯১৬ খ্রিঃ ৩০শে জানুয়ারি ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। অল্পদিন পরে তাঁর মা মারা যান। পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন তারপর। নরেন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত রচনা কিন্তু গল্প নয় কবিতা। ১৯৩৬ খ্রিঃ দেশে প্রকাশিত। কবিতাটির নাম 'মূক্' লেখকের মতে তাঁর নিজের কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে নামটি সুপ্রযুক্ত। গল্প রচনার জন্য নরেন্দ্রনাথকে বেশি চিন্তা করতে হত না। গল্প যেন নিজে এসে তাঁর কাছে ধরা দিত। 'গল্প ছিল তাঁর ছায়া। গল্প হাঁটত তাঁর পায়ে পায়ে। বসে বসেই, রাস্তা হাঁটতে হাঁটতেই, ভিড়ের মধ্যে কোনো যুবক-যুবতীর কেবল একটিই মাত্র সংলাপ শুনে নরেন্দ্রনাথ মিত্র খাড়া করতে পারতেন এক একটি নিটোল গল্প।' (পায়ে পায়ে যাঁর গল্প) তাঁর গল্পগুলিতে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজের কথা আছে। চারপাশের ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে গল্পগুলি লেখা। কিছুটা প্রথাসিদ্ধ লেখক ছিলেন তিনি, জগৎ গত তাঁর গল্পের উপাদান। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একটা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করল। এই যুদ্ধ তখন সমাজ ও সাহিত্যে প্রবল প্রভাব ফেলেছে, শহরের মতো গ্রামও যুদ্ধ, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ থেকে রেহাই পেল না। মন্বন্তর আমাদের বেআব্রু করল, ঘরের মেয়েরা পথে দাঁড়াল, পারিবারিক সম্পর্ক শিথিল হল, প্রচলিত মূল্যবোধ ঘা খেল, ন্যায়নীতি, বিবেক, সতীত্ব ইত্যাদি ব্যাপারগুলো মর্যাদা হারাল। জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির এইসব বদল বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করল যথেষ্ট। ছোটগল্পের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, বক্তব্য প্রয়াস স্বল্প। ক্ষুদ্র পরিধিতে থাকে খণ্ড জীবনের ছবি, তাই লেখকরা আত্মানুভূতির প্রকাশে ছোটগল্পকে বেছে নিয়েছেন। তাদের একক অনুভূতির স্ফুলিঙ্গে গড়ে উঠেছে এক একটি ছোটগল্প, সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামীর মতে— 'গল্পের ভিতর দিয়েই ঘটনা জীবন্ত হয়ে ওঠে, পরিপূর্ণতা পায় এবং গল্পের ভিতর দিয়েই সে তার মর্মব্যথা প্রকাশ করে।'

নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর গল্পে মনুষ্যত্বের গোপন কথা, মানুষকে মানুষের ভালবাসার গল্প শুনিয়েছেন বারবার। তাঁর মতে— 'সমাজে শঠতা আছে, ক্রুরতা আছে তা আমি জানি। হিংসা বিদ্বেষেরও অভাব নেই। কিন্তু সমাজ জীবনের এই অন্ধকার দিকের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় কম। ..... শান্ত মধুর ভাবই আমার রচনায় বেশি।..... জীবনের পঙ্কিল অথবা ক্লেদাক্ত দিকে আমার নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা তেমন কিছু নেই। আমার মেজাজ রোম্যান্টিক সৌন্দর্যময়। তাই মহত্বই আমায় আকর্ষণ করে বেশি।' নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সমকালে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং সন্তোষ

কুমার ঘোষ সমাজের অবক্ষয়ের রূঢ় রূপ আঁকতে গিয়ে জীবনের অন্ধকার দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। চল্লিশের দশকেরও গল্পকারদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ কমবেশি নির্মম, নরেন্দ্রনাথ মিত্র তা নন। এক সময়ে সন্তোষ কুমার ঘোষ গল্পকার নরেন্দ্রনাথের রচনার প্রশংসা করে তাঁকে মোপাসাঁ, হেনরি এবং চেকভের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, সমবেদনার সঙ্গে নির্লিপ্ততা, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং বাহুল্যবর্জিত ভাষা সর্বোপরি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে উন্মোচনের সাহিত্য প্রতিভা তাকে বাংলা সাহিত্যের সেরা গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম আসন দান করেছে।

১৩৫৩ বঙ্গাব্দে 'অসমতল' গল্প সংকলন তাঁর প্রথম প্রকাশনা। এই সংকলনের মধ্যে 'চোর', 'পালঙ্ক', 'সেতার', 'হেডমাস্টার', 'রস' এসব গল্প ছিল। এই লেখকের বেশির ভাগ গল্পে মেয়েদের কথা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। অতি সাধারণ নারীরাই তাঁর গল্পের মুখ্য উপাদান। 'উল্টোরথ' পত্রিকার লেখক শ্রী কিরণকুমার রায়কে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন— 'ছেলেবেলা থেকে বই পড়তে ভালোবাসতাম। বই যে লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করতে হয় অল্প বয়সে আমার সে ধারণা ছিল না, বইয়ের জন্য পাড়ার সদ্য বিবাহিতা বউদিদের কাছে হাত পাততাম। পাঠক হিসেবে মেয়েদের সঙ্গে সেই যে আমার গোপন আত্মীয়তা হয়েছিল আজ লেখক হিসেবেও প্রায় তাই আছে। গভর্নমেন্ট অফ দি পিপল্, বাই দি পিপল্, এ্যান্ড ফর দি পিপল্ এর মত আমি মেয়েদের নিয়ে লিখি, মেয়েদের হয়ে লিখি, মেয়েদের জন্য লিখি। একথা বলতে আমার লজ্জা নেই। পুরুষ পাঠক যদি দু'একজন মেলে তাকে বাধ্য বলে মানি।''

এদেশে চল্লিশের দশকে দেশভাগের আশঙ্কায় এবং দাঙ্গার ফলে পূর্ববঙ্গের অসংখ্য মানুষ পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিলেন। স্বাধীনতার পর মুহূর্তে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে রইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এক অগ্নিগর্ভ দিনে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প সংকলন প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন চারদিকে বিক্ষোভ আর বিদ্রোহ। নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই বিদ্রোহ বিক্ষোভের মানুষ। যেখানে মানুষ মহৎ ও শক্তিমান সেখানে মানুষের যথার্থ পরিচয় আছে তা নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে নয় বা জীবনকে বাদ দিয়ে নয়— দুঃখে সুখে ভরা জীবনকে ভালবেসে তাঁর গল্পকে তিনি নানা রঙ ও রূপে সাজিয়েছেন। 'রস' গল্প সম্পর্কে লেখক বলেছেন— 'এ গল্পের যে পটভূমি তা আমার খুবই পরিচিত। পূর্ববঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়িতে পূর্বদিকে ছিল একটি পুকুর। সেই পুকুরের চারধারে ছিল অজস্র খেজুর গাছ। ছেলেবেলা থেকে দেখতাম আমাদের প্রতিবেশী কিষাণকে সেই সব খেজুর গাছের মাথা চেঁছে মাটির হাঁড়ি বেঁধে রাখতে। বাঁশের নল বেয়ে সেই হাঁড়িতে সারারাত ধরে ঝির ঝির করে রস পড়ত। সেই রস কড়াইতে করে, বড় বড় মাটির হাঁড়িতে করে জ্বালিয়ে গুড় তৈরি করতেন আমাদের মা-জ্যেঠীমারা। শীতের দিনে সে থেকে গুড় তৈরির এই প্রক্রিয়া মায়ের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে রোজ দেখতাম। আমার চিরচেনা এই পরিবেশ থেকে রস গল্পটি বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু রসের যে কাহিনি অংশ, মোতালেফ মাজুখাতুন আর ফুলবানুকে নিয়ে যে হৃদয়দ্বন্দ্ব, খেজুর রসকে ঘিরে রূপাসক্তির সঙ্গে যে জীবিকার সংঘাত তা কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আসেনি। সেই কাহিনি আমি দেখিওনি, শুনিওনি। তা মনের মধ্যে যেন আপনা থেকেই বানিয়ে বানিয়ে উঠেছে।' (গল্প লেখার গল্প, নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্পমালা, ভূমিকা অষ্টম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৬, আনন্দ পাবলিশার্স)

১২.৩ রস : গল্প কাহিনি

এই গল্পের মুখ্য চরিত্র তিনজন। গাজি মোতালেফ, রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজুখাতুন এবং এলেম শেখের মেয়ে ফুলবানু। মোতালেফ বিপত্নীক খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করতে ওস্তাদ। রসের কারবারী সে, রূপসী নারীর প্রতি তাঁর অসীম দুর্বলতা, সে সুন্দরী বউ খোঁজে। ফুলবানুকে তার ভারি পছন্দ। কিন্তু পণের টাকা জোগাড় করতে পারে না। রাজেক মৃধার কাছে মোতালেফ গাছ থেকে রস সংগ্রহের বিদ্যা শেখা, পরে রাজেক মারা গেলে মোতালেফকে তার খেজুর গাছ কাটা রস থেকে পাটালি গুড় বানিয়ে দেয় বিধবা মাজুখাতুন। মাজুর হাতে জাদু আছে। মাজুকে তার সন্দেহ হয়। হয়তো অজান্তে তার প্রাপ্য গুড় অংশও বেচে দিচ্ছে। তবু তার কাছে মাজু অপরিহার্য। কারণ মোতালেফের পাটালি গুড়ের সুনামের অন্তরালে আছে মাজুর হাতের গুণ। নিজের বিক্রিবাটা, গুড়ের সুনাম আর পণের টাকা দিয়ে সুন্দরী ফুলবানুকে ঘরে আনার মতলবে সে মাজুকে নিকা করে নিয়ে যেতে চায় নিজের ঘরে, বিধবা মাজুর নিকার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু মোতালেফের প্রস্তাব সে ফেরাতে না পারায় মাজু তার গৃহিনী হয়ে ওঠে। সে বছর মাজুর হাতের দৌঁয়ায় সুস্বাদু পাটালি বেচে টাকা পয়সা ঘরে তোলে মোতালেফ। তারপর স্ত্রীকে দুশ্চরিত্র বলে অভিযুক্ত করে ঘর থেকে তাড়ায়। ক্ষুব্ধ, মর্মাহত মাজুবিবি ঘৃণাভরে বলে— 'তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোতি মেঞা, ভিতর সোন্দর না। এত শয়তানি, এত ছলচাতুরী তোমার মনে? গুড়ের সময় পিপড়ার মত লাইগা ছিলা, আর গুড় যাই ফুরাইল অমনি দূর দূর।' উচ্ছল ফুলবানুকে মোতালেফ নিকা করে ঘরে আনে। রসবতী ফুলবানু মোতালেফের জীবন দাম্পত্য সুধায় ভরিয়ে তোলে। ফুলবানুর রূপের সুধায় মোতালেফ ডুবে থাকে। শীতের সময়ে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহের মরশুম এলে মোতালেফ আগের চেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে খেজুর গাছের বন্দোবস্ত করে। ফুলবানুকে সযত্নে গুড় তৈরির পদ্ধতি শিখিয়ে দিতে চায়। সে আশ্বাস দেয়, ফুলবানুকে 'ভয় কি, আমি আছিই কাছে কাছে— আমারে পুছ কইরো, আমি কইয়া দেব। মনের মইধ্যে, যেমন টগবগ করে রস, জালার মধ্যেও তেমন করা চাই।' শীত আসতে না আসতে তাদের দু'জনের মধ্যে কেমন এক ব্যবধান তৈরি হয়ে যায়। উনানের কাছে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে মনের রস শুকিয়ে আসে ফুলবানুর। তার রূপ ঝলসে যায়। গুড় ঠিক মতো তৈরি হয় না। নরম থাকে পাটালি, কোনোদিন বা পুড়ে তেতো হয়ে যায়। রাতে বিছানায় শুয়ে রস জ্বাল দেওয়ার প্রসঙ্গ মোতালেফ আলোচনা করতে চাইলে ফুলবানু বিরক্ত হয়। দু'জনের মধ্যে ব্যবধান দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। শীতের রাতে স্বামীর উষ্ণ সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে ফুলবানু কাঁথার ভিতর শীতে কাঁপে আর ভাল পাটালি গুড় না পেয়ে মোতালেফ ক্রমশ ক্ষুব্ধ হয়। মাঝে মাঝে মাজুবিবির কথা তার মনে পড়ে। ফুলবানুর অসতর্কতায় জ্বালার রস একদিন পুড়ে যায়। রাগে অন্ধ হয়ে সে বিবিকে কঞ্চিপেটা করে। বিবাদ এক সময়ে মিটে গেলেও তারা একে অপরের কাছে স্বাভাবিক হতে পারে না। ইতিমধ্যে মাজুখাতুন মধ্যবয়স্ক নাদির শেখকে নিকে করেছে। মোতালেফ নাদির শেখের বাড়ি নীরস পাটালি গুড় পৌঁছে দেয়। তারপর একদিন ভোরবেলায় সেরা দুটি গাছের সবচেয়ে ভালো দু হাঁড়ি রস নিয়ে গিয়ে দুইসের গুড় বানিয়ে দেবার জন্য পরোক্ষে মাজুখাতুনকে অনুরোধ করে। এক ছটাক পছন্দসই গুড়ও সে এ মরশুমে হাটে বেচতে পারেনি। তাই তার এই করুণ মিনতি আর তখনই বাঁখারির বেড়ার ফাঁকে মাজুর কালো বড় বড় দুটি চোখ মোতালেফের চোখে পড়ল। নাদির শেখ যখন মোতালেফের হুঁকোয় আগুন নিভে যাওয়ার কথা মনে করায় তখন মোতালেফের প্রতীকী বাক্য 'না মেঞাভাই নেবে নাই।'

১২.৪ মুখ্য চরিত্র

গল্প বা উপন্যাসে চরিত্র সৃজনে নরেন্দ্রনাথ মিত্র এক দক্ষ শিল্পী। তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অনন্য সাধারণ। 'রস' গল্পের চরিত্রাবলীতে সেই পর্যবেক্ষণ দক্ষতার ছাপ পড়ে রয়েছে। এই গল্পের নায়ক মোতালেফ, সে বিপত্নীক তরুণ, তার কর্মক্ষমতায় পরিশ্রম ও দক্ষতার ছাপ। সূক্ষ্ম শিল্পীর মতো খেজুর গাছ কেটে হাঁড়ি বসিয়ে রস সংগ্রহ করতে পারে। সে বলে— 'কাটতেও হবে আবার হাত বুলোতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোন ক্ষতি না হয় গাছের।' একটু এদিক ওদিক হলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে গাছের দফা রফা হয়ে যাবে।' মরা মুখ দেখতে হবে গাছের।' রূপ সত্তা এই পুরুষটি রূপের পূজারী। তাই 'বেছে বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকায়। সুন্দর মুখের খোঁজ করে ঘোরে তার চোখ'। মোতালেফকে কেন্দ্র করে প্রেমের দুইরূপ এখানে প্রকাশিত। রূপের মোহ আর তার দুরন্ত নেশা তাড়ানো প্রেম এবং শান্ত স্নিগ্ধ, সুগভীর প্রেম। সমস্ত কাহিনীটি আখ্যান ধর্মীতায় বিন্যস্ত। ফুলবানু, মাজুখাতুন এবং মোতালেফ এদের সকলেরই অতীত জীবনের বর্ণনা আছে। কাহিনি দীর্ঘ হওয়ায় গল্পের মূল রস ব্যাহত হয়নি। গল্পের প্লটে কোনো শিথিলতা নেই। মোতালেফের দিক থেকে মাজুখাতুনকে বিয়ে করা এবং তালাক দেওয়া, ফুলবানুকে বিয়ে ও তাকে শেষ পর্যন্ত রেখে মাজুখাতুনের কাছে আবার যাওয়া, মাজুখাতুনের তৃতীয় বিয়ে এসব গল্পের প্রয়োজনে ঘটেছে। চরিত্রগুলি এ গল্পের মূল সম্পদ।

মোতালেফের জীবনে প্রথমে আসে মাজুখাতুন। সেখানে তার পেশা, তার শিল্পী মনের স্বার্থে সে বাজারের সেরা গুড় তৈরির জন্য মাজুখাতুনের স্বারস্থ হয়। পরে ফুলবানুকে বিবাহ করে এবং মাজুখাতুনকে তালাক দেয়। মাজুখাতুনকে সে যেভাবে তালাক দেয় তা অনৈতিক। ফুলবানু তার কর্মসহচরী এবং নর্মসহচরী দুই-ই হোক এটাই সে চেয়েছে। কিন্তু ফুলবানু মোতালেফের কাজের সঙ্গিনী হতে পারেনি। রূপের প্রতি আসক্তিতে সে ফুলবানুর জন্য মাজুখাতুনকে দুশ্চরিত্র হিসাবে অভিযুক্ত করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। শয়তানি আর ছলচাতুরী তাকে ভর করেছিল ঠিকই, কিন্তু পরে ফুলবানু গুড় তৈরি করতে না পারায় সে অনুতপ্ত হয়। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে গুড় যদি ফুলবানু ঠিকঠাক তৈরি করতে পারত তবে কি মোতালেফের আপন কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হত। তবে তো গল্পটি অন্যমাত্রা পেত। রূপমোহের সঙ্গে জীবিকার লড়াই থাকত না। গল্পের শেষে মোতালেফ ভালোবাসার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করেছে। জীবন ও জীবিকার তাগিদে তার প্রেম শরীরমুখী না হয়ে হৃদয়বৃত্তির দিকে ধাবিত হয়েছে।

মাজুখাতুন এ গল্পের আর একটি সার্থক চরিত্র। সে জীবনকে বিচিত্ররূপে দেখেছে। প্রথম বিবাহে সে পরিপূর্ণ সুখী ছিল না। মোতালেফ তার জীবনে বসন্তের বাতাস বয়ে এনেছিল। যৌবনের উন্মাদনা দিয়ে মোতালেফকে ভোলাবার ক্ষমতা তার নেই। এই যুবকটির সঙ্গে তার পূর্বপরিচয় ছিল। কিন্তু সেই জানাশোনার মধ্যে কোনো গভীরতা ছিল না। হাল্কা ঠাট্টা তামাসার মধ্যে সে পরিচিতি সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম স্বামী রাজেকের ঘরে রস জ্বাল দিয়ে পাটালি গুড় তৈরি করত সে। হাতের গুণ ছিল তার। এই পূর্ব পরিচিতির ক্ষেত্রে কোনো সময়েই বিশ্বস্ততার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি দু'জনের মধ্যে। এর আগেও মাজুখাতুনের কাছে দু'একজন বিবাহের প্রস্তাব করেছে। কিন্তু মাজু তাতে মন দেয়নি। এমনকি ছেলে ছোকরাদের মধ্যে যারা বাড়াবাড়ি রকম ইয়ার্কি করতে এসেছে তাদের কান কেটে নেওয়ার ভয় দেখিয়েছে সে। কিন্তু মোতালেফকে তাড়াতে পারেনি মাজু। তার কথাগুলো বারবার ফিরে এসেছে মনের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত নীল রঙের জোনাকী শাড়ী পরে, রঙ বেরঙের কাঁচের চুড়ি পরে মোতালেফের বিবি হয়ে পৌঁছয় তার বাড়ি। মনের মতো মানুষ পেয়ে মাজুখাতুন ঘর গেরস্থালী সামাল দেয়। কিন্তু সে মোতালেফের মনের মানুষ কিনা একথা ভেবে না দেখে

মস্ত বড় ভুল করে বসে। আর তাই মোতালেফের সঙ্গে ফুলবানুর সম্পর্ক গাঢ় হলে মাজু কিছু জানতে পারে না। জানতে চায় না। বেবাক ঠকে যায় সে। তাকে দুশ্চরিত্রা বলে অভিযুক্ত করে পাড়া পড়শীকে সাড়ম্বরে জানিয়ে মাজুকে তালাক দেয়। অসাধারণ দক্ষতায় লেখক তার চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন। মোতালেফ ফুলবানুর দাম্পত্য জীবনের বিবরণ পাড়া-পড়শীর কাছে শুনে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে সে। হয়তো ক্ষণিকের দাম্পত্য জীবনের তীব্র আস্বাদের জ্বালায় সে নাদির শেখকে বিবাহ করে। অসামান্য স্বাদের গুড় তৈরি করার শিল্পীজনোচিত বোধকে চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়ে সে নাদির শেখের ঘরনী হয়। কেননা 'গাছি'র ব্যাপারে, রসের ব্যাপারীদের মাজুখাতুনের ঘেন্না ধরে গেছে। মোতালেফের কাছে সে তার শিল্পসত্তার স্বীকৃতি পেয়েছিল। আর তৃতীয় বিবাহের পরে তার যে জীবন সেখানে রসের কোনো কারবার নেই। মাতৃত্বের দায় গ্রহণ করতে হয়েছে তাকে। শূন্যতায় পরিপূর্ণ হয়ে সে যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত। তাই মোতালেফ গুটিগুটি পায়ে যখন তার আঙিনায় আসে পাটালির পসরা নিয়ে সে ক্রুদ্ধ হয়। অস্বীকার করে আবার কোথাও একটা গভীর গোপন চোরা স্রোতের মতো টান অনুভব করে বলে বাঁখারির বেড়ার অন্তরাল থেকে তার দুটি চোখ ছলছল করে। এখানে চরিত্রটি অনবদ্য হয়ে ওঠে আর শৈল্পিক মহিমায় ভূষিত হয়। আঁটসাঁট গড়নের এই দজ্জাল মেয়েমানুষটি তার চারিত্রিক গুণে অসামান্য হয়ে উঠে। জীবন পরিবর্তনশীল। সেখানে কোনো কিছুর স্থায়িত্ব নেই। তাই সম্পর্কগুলি ভেঙেচুরে ক্রমশ বদলে যায়। মাজুখাতুন, মোতালেফ আর ফুলবানু তিনজনে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে ঘর করেছে। এ যেন এক বিরামহীন অন্বেষণ। মোতালেফ নিজেকে মাজুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারেনি। অথচ এ সম্পর্কের তো কোনো পরিণতি নেই। মাজুকে আর গুড় বানাতে হয় না। নাদির শেখের সঙ্গে বিবাহিত জীবনে সে নাদিরের সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছে। তবু মোতালেফের অসহায়তায় তার চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে। ফুলবানু কি কোনোদিন মাজুর শূন্যতা ভরাট করতে পারবে। মাজুর চোখের জলের ভাষা আসলে মোতালেফের ভেতরে অতৃপ্ত শিল্পীমনকে ছুঁতে চায়। এক্ষণে তারা দু'জন একই রসের কারিগর।

ফুলবানু 'রস' গল্পের আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। সে নিঃসন্তান, বয়স্ক স্বামী গফুরের সঙ্গে সে থাকতে পারেনি। চরকান্দার এলেম সেখের মেয়ে ফুলবানু। আঠার উনিশ বছর বয়স। সে বড় রসবতী নারী। অসুন্দর বেশি বয়সের স্বামী তার মনে ধরেনি। তাই নিজেই কোন্দল করে বেরিয়ে এসেছে স্বামীর ঘর থেকে। মোতালেফের সুন্দর চেহারা তার মনে ধরেছে। শেষ পর্যন্ত ফুলেন মুখশ্রী নিয়ে ফুলবানু এল মোতালেফের গৃহে। দাম্পত্য জীবনে তার রূপ স্বামীকে কিছুকাল বিমুগ্ধ করে রাখে বটে। কিন্তু রস থেকে গুড় তৈরিতে সে সিদ্ধহস্ত নয়। সে মোতালেফের সম্ভোগের সঙ্গিনী হয়েছে বটে, কিন্তু শিল্পী মনের সমঝদার হতে পারেনি। মাজুখাতুনের মতো সে সুনিপুণ গৃহিনী নয়। রসের হাঁড়ি জ্বাল দিয়ে নিঁখুত পাটালি বানাতে সিদ্ধ কাম নয়। আর এ বিষয়ে তার তেমন কোনো আশ্রয় নেই। দু'জনের সম্পর্কে চিড় ধরে। এমনকি ফুলবানুর বাবাও জানে একটু আস্কারা পেলে মেয়ে তালাক চাইবে আবার। স্বামীর প্রয়োজনে সে অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। মোতালেফের চাহিদা অনুযায়ী সে তার 'গাছি' জীবনের উপযুক্ত সঙ্গিনী হয়ে উঠতে পারেনি। আর ফুলবানু নিজেও বোধ হয় তা হয়ে উঠতে চায়নি। বয়সে, রূপে, দেহসম্ভোগে সে মাজুখাতুনের থেকে এগিয়ে থেকেছে ঠিকই দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে কিন্তু মোতালেফকে ছুটতে হয় মাজুখাতুনের জন্য। গুড় তৈরির ক্ষেত্রে মোতালেফের শিল্পী মনটির মধ্যে কোনও জায়গা থাকে না ফুলবানুর জন্য। বাঁধা গতে অভ্যস্ত দাম্পত্যজীবনে বৈচিত্র্যহীনতায় বন্দী হয়ে পড়ে তারা। মোতালেফের জীবনের ছন্দে রসকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবন রসহীনতায় পর্যবসিত হয়। গোঁয়ার জেদি মানুষের ঘর করতে চায় না ফুলবানু। কেন না মোতালেফের হাতে সে এমনকি নির্মমভাবে প্রহৃত হয়। সে সুখ নেই, সে স্ফূর্তির অভাব। শুকনো পাঁকাটির মতো ঘট ঘট করে মন।

নাদির শেখই গল্পের নাদির শেখ ভদ্র, সাংসারিক, সৌজন্য রক্ষায় অভিজ্ঞ মানুষ, ঘোর সংসারী প্রৌঢ় মানুষের মানসিকতায় অভ্যস্ত এই বয়সে নতুন স্ত্রী ঘরে এসেছে। কিন্তু মাজু মোতালেফের সম্পর্কের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিয়ে সে বিশেষ ভাবনা চিন্তা করেনি, বিনা পয়সায় সে মোতালেফের কাছ থেকে গুড় নিতে স্বীকৃত হয়নি। আবার মাজু ঘরে আসা অতিথি মোতালেফকে অপমান করলে সে ক্ষুব্ধ হয়েছে, কাহিনি সূত্রটির বেঁধে রাখা প্রসঙ্গে এই চরিত্রটির প্রয়োজন ছিল।

১২.৫ নামকরণ

বীরেন্দ্র দত্তের মতে— 'নামকরণের দিক থেকে 'রস' নামটি ছাড়া বুঝি এ গল্পের অন্য কোনো নামই হতে পারে না। এই গল্পের কেন্দ্রে আছে রস— খেজুর রস। এই রসের থেকে গুড় বানানো নিয়েই মাজুখাতুনের সঙ্গে প্রথমে, পরে ফুলবানুর সঙ্গে মোতালেফের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মাজুখাতুনকে তালাক ও ফুলবানুর সঙ্গে সম্পর্কের গভীর তিক্ততা এই রসের কারণেই। আর এই রসই গল্পের শেষে মাজুখাতুন ও মোতালেফের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে গোপনে, ব্যঙ্গতনায়। তাই মোটা অর্থে কাহিনির সুতোয় নামটি ঠিকই মানিয়ে যায়।' (বাংলা ছোটগল্প, প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ আগস্ট, ১৯৮৫) রস অর্থ সুধা এবং গরল। এই দুই বৈপরীত্যকে ধরে আছে রস শব্দ। রস কখনও উত্তেজক, কখনও তা তৃষ্ণা মেটায়। কখনও সে মেটায়ক্ষুধা, কখনও আচ্ছন্ন করে নেশায়। এই খেজুর গাছের রস এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। সেই রস থেকে পাটালি তৈরি করার প্রসঙ্গে গল্পের অগ্রগতি। খেজুর রস মোতালেফের জীবনেরও কেন্দ্রবিন্দু। এই অনুষঙ্গে তার জীবনে দুই নারীর আবির্ভাব। তার জীবন ও জীবিকার সঙ্গে খেজুর রস ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। তাছাড়া ফুলবানুর প্রতি মোতালেফের যে আসক্তি তা রূপ ও রসের সীমানায় আবদ্ধ। আর মাজুর প্রতি মোতালেফের যে টান তা হল পাটালি তৈরি করার পক্ষে শিল্পী জ্ঞানোচিত রসবোধের প্রতি টান। জীবন রসের রসবোধ আছে যার জীবনবোধও তার এঘর। মাজুর সঙ্গে মোতালেফের গল্পের শেষে যে টানের প্রকাশ তা রস, আনন্দ ও প্রেমে পরিপূর্ণ।

তাছাড়া এই গল্পে বার বার রস শব্দটি উচ্চারিত। ফুলবানুর চেহারা বর্ণনায় 'রস' কথাটি প্রযুক্ত। পাটালি প্রস্তুত করার বর্ণনায় এ শব্দ ব্যবহৃত। কমবয়সী যেন কাঁচা রসের হাঁড়ি, এ গল্পে আছে পানের রসে ঠোঁট রাঙানোর কথা। কিংবা গল্পের শেষে মোতালেফ ভালোবাসার যথার্থ স্বরূপকে অনুভব করেছে। মাজুখাতুনের প্রতি মোতালেফের প্রেম শরীর নির্ভরতা ছাড়িয়ে হৃদয়বৃত্তির দিকে ধাবিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত এই যে মোতালেফের মতো ব্যক্তির জীবনে প্রেম ক্ষণিক স্বপ্ন, জীবিকার্জনই মুখ্য দাবি। একদিকে নারীর রূপের চাহিদা, অন্যদিকে নিজের বৃত্তির মান বজায় রাখতে টানাপোড়েনে পড়েছে মোতালেফ। রূপের প্রতি উদগ্র বাসনার কাছে জীবিকা জয়লাভ করেছে। মোতালেফের গেছো শিল্পের সূক্ষ্ম আবেদন শিল্পী মাজুর কাছে নত হয়েছে। রসকেন্দ্রিক টানাপোড়েনের বিবর্তনে গল্পটির শৈল্পিক উৎকর্ষ লাভ করেছে।

১২.৬ ছোটগল্প হিসাবে সার্থকতা

'রস' গল্পের ঘটনাগুলি কোথাও অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না। উপস্থাপনার স্বাভাবিকতায় গল্পটি ঈষৎ বড় হলেও ছোট গল্পের গ্রন্থনা বা বাঁধুনি থেকে তা সরে যায়নি। তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে যে আখ্যানধর্মীতা বজায় ছিল, নরেন্দ্রনাথ মিত্র তা থেকে বঞ্চিত নন, গল্পের মুখ্য চরিত্রদের অতীত জীবন গল্পে,

অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। প্লটে কোনো শিথিলতা নেই। মুখ্য চরিত্রগুলি গল্পের প্রাণ। চরিত্র নির্মাণের দক্ষতায় লেখক অনবদ্য। প্রেমই এই গল্পের মুখ্য বিষয়, ধীরে ধীরে গল্পের শেষে তা ক্লাইম্যাক্সে' পৌঁছেছে। বিষয়ের গভীরতায় পাঠক নিবিষ্ট হয়ে যান। সুবন্ধু ভট্টাচার্যের মতে গল্পটি পাঠ করার পর পাঠকের মনেও নিশ্চয়ই লেগে থাকে। এই রকম আবেগতপ্ত প্রেমের গল্প নরেন্দ্রনাথ খুব বেশি লেখেননি। (সুবন্ধু ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অমৃত, ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৭৬)

অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্যের মতে— 'বরং এই অনন্য সাধারণ প্রেমের গল্পটিতে নরেন্দ্রনাথ মোতালেফের মতো স্বার্থপর ও নীতিজ্ঞানহীন ব্যক্তির চিত্তে প্রকৃত ভালোবাসার অমৃত সরস এক প্রলোবণের মুখ খুলে দিয়েছেন। যে ভালোবাসা শরীর সর্বস্ব নয়, রূপকামনার মুখ্যতাই যার প্রধান কথা নয়, যে ভালোবাসা নারী-পুরুষের সম্মিলিত জীবন-যাপনে, পরস্পরের সহায়তায়, কর্মপ্রার্থনায় উধস্তঅভূত ও বিকশিত হয়ে ওঠে সেই ভালোবাসার স্বাদ মোতালেফের জানা ছিল না। মানুষের ভালোবাসা শরীর নির্ভরতা ছাড়িয়ে চিদ্‌বৃত্তির দিকে ধাবিত হয়। সেই চিদ্‌বৃত্তির উন্মেষ ঘটেছে মাজুখাতুনের দরজায় মোতালেফের দু'হাড়ি খেজুর রসের বিনম্র নিবেদনে। মাজুখাতুনের সজল আঁখি পল্লবেও সেই বিগত সবল মধুর প্রেম সম্পর্কের স্মৃতি ছায়া ফেলে যায়। 'রস' নামটি এখানে এই দুই নর-নারীর চিত্তের গভীর এক মানস-বন্ধনের করুণ মধুর সরসত্তার দিকে ইঙ্গিত করেছে। বিশ্বসাহিত্যে এই প্রেমের গল্পটি সার্থকতার নিরিখে নিঃসন্দেহে প্রথম সারিতে স্থান পাবার যোগ্য।' (*নরেন্দ্রনাথ মিত্র জীবন ও সাহিত্য*, অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপণি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসে. ১৯৯৮)। এই গল্পটিতে প্রেম কোনো সোজা সরল পথে অগ্রসর হয়নি। মানুষ যে কোনো একজনকে ভালবাসে তা সে নিজেও বোঝে না। মানুষের মনের এই অব্যক্ত, অস্পষ্ট, জটিল ও রহস্যময় মনোবৃত্তি 'রস' গল্পে ব্যক্ত। রূপহীনা রমণী মাজুখাতুনের জটিল ও অসহায় ভালোবাসা রূপ পেয়েছে তাঁর গল্পে। লেখক আসলে হৃদয়ের কারবারী। তাই সমাজের দৃশ্যমান বাস্তব সমস্যার চেয়ে এ গল্পে হৃদয়কে বেশি মূল্য দিয়েছেন। এই গল্পে লেখক পক্ষপাতহীন শিল্পীর মতো স্বাভাবিকভাবে বর্ণনা করেছেন মানুষের আনোমথিত ও অন্তর্দ্বন্দ্বদীর্ন চিত্তের বেদনা ও যন্ত্রণা। বাস্তব জীবনের স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে মোতালেফ ও মাজুখাতুনের হৃদয়ের টান প্রকাশিত। এখানে গল্পের শেষে মোতালেফ অনুভব করেছে তার ভালোবাসার টান। তাই সে আর মাজু দু'জনেই ভেতরে ভেতরে বেদনায় বিদ্ধ হয়ে নিঃশব্দে ক্ষয়ে যায়। এই গল্পের তিনটি মুখ্যচরিত্র বাহ্যত বেঁচে থাকার দাবিকে অস্বীকার না করে সাংসারিক কর্তব্য করে গেলেও অন্তরের শূন্যতায় হাহাকার করে যাবে। মাজুখাতুন, ফুলবানু ও মোতালেফ সমাজবিধিকে মেনেছে কিন্তু চিন্তাকে বশে আনতে পারেনি। তবে নরেন্দ্রনাথের 'হেডমিস্ট্রেস' বা 'অবতরণিকা' গল্পের মতো আলোচ্য রস গল্পটিতেও মোতালেফের মতো পুরুষ চরিত্রে নারীকে নিজস্ব অধিকারের বস্তু বলে মনে করার একটা প্রবণতা আছে। মোতালেফের ইচ্ছের পুতুল হয়ে মাজুখাতুনের স্বল্পদিনের দাম্পত্য জীবন কেটেছে। ফুলবানুকে বিবাহ করার উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্য মাজুকে নিয়ে ঘর বাঁধে মোতালেফ। আবার প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করে বিতাড়িত করে। আর ফুলবানুকে তো সে মারধোর করতেও বাকি রাখেনি। গুড় জাল দিয়ে স্বাদু পাটালি তৈরি করার চুক্তিতে কিন্তু ফুলবানু মোতালেফের ঘরে আসেনি। তাই তাকে একাজে দক্ষতা না দেখানোয় শারীরিক নির্যাতন করা চূড়ান্ত অনৈতিক কাজ। 'রস' গল্পটিতে মোপাসাঁর ছোটগল্পের মতো তীব্রভাবে নাড়া দেওয়া পরিসমাপ্তি নেই অথচ গল্পের শেষে অনুভূতির একটা সূক্ষ্ম অথচ গভীর মোচড় অনুভব করা গেল। সমাপ্তি বিন্দুর একটি শিল্পময় উন্মোচন এ গল্প সার্থকতা লাভ করেছে। গল্পের শেষে হুঁকো নিভে গেছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে মোতালেফ যখন মাজুখাতুনের স্বামীকে বলে 'না মিঞাভাই নেবে নাই।' তখন এই সাধারণ কথাটি আমাদের পৌঁছে দেয় শিল্পের অসাধারণ রাজ্যে, এটি কোনো অলঙ্কৃত ভাষা নয়, কিন্তু মানুষের জীবনের কোনো কোনো মুহূর্তের অত্যন্ত সাধারণ

বাক্যও যে গভীর অর্থবহ হয়ে ওঠে তা মোতালেফের বাক্যের সুতীব্র ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়েছে। গল্পের নিজস্ব বিন্যাসে বাক্যটি হয়ে উঠেছে অসাধারণ এবং তা গল্পের পরিণতিকে নিটোল শিল্পে পরিণত করেছে, অনেক ছোটগল্পের শিল্পরূপের সার্থকতার রহস্য এই শেষ মুহূর্তের আকস্মিক উদ্ভাষণের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'রস' তার ব্যতিক্রম নয়।

১২.৭ 'রস' গল্পের ভাষাশৈলী

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের বিবৃতিতে আকস্মিক চমক সৃষ্টি এবং নাটকীয়তার প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁর গল্পের ভাষা নিরাভরণ। সেই নিরাভরণ ভাষায় অসামান্য ইঙ্গিত ব্যঞ্জনাময় এক একটি বাক্য প্রয়োগ করেছেন। তাঁর গল্পের ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য গতিময়তা। কোনো সময়ে তিনি ভাষাকে নিশ্চল বা শিথিল হতে দেননি। কাব্যধর্ম তাঁর ভাষার আর এক বৈশিষ্ট্য। কখনো প্রকৃতির সহযোগে, কখনো আবেগের সূক্ষ্মতায়, কখনো রূপের মুগ্ধতায়, কখনো সব কিছুর সংমিশ্রণে তাঁর গল্পভাষায় ধ্বনিত হয় কবিতা। রস গল্পে 'আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পরে এল বসন্ত, মাজুখাতুনের পরে এল ফুলবানু। ফুলের মতোই মুখ। ফুলের গন্ধ তার নিশ্বাসে।' নরেন্দ্রনাথের ভাষা অতুলনীয় কুশলতায় সেই বিচিত্র মধুর সূক্ষ্ম অনুভবকে প্রকাশ করেছে একটি অনবদ্য লিরিক কবিতার মতো। নরেন্দ্রনাথের অনুজ ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে— 'দাদার লেখ ভঙ্গি চিরদিনই সহজ সরল। অনুপ্রাসের দিকে দাদার যে একটু স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল, এসব গল্পে তা অনুপস্থিত। ছোট গল্পকারের যেটা বড় হাতিয়ার, গল্পের মধ্যে যত সূক্ষ্মভাবেই হোক একটু চমকের সৃষ্টি করা, তাকেও দাদা সযত্নে সরিয়ে রেখেছে। একেবারে সাদা-মাটা ভাবে গল্প বলে যাওয়া অথচ একটি দুর্লভ অনুভূতিকে মুক্তি দিতে গিয়ে গল্পগুলি কি আশ্চর্যরকম ঋজু। এ গল্পের মার নেই।' (ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র সংকলন; *বিকালের আলো*, প্রথম প্রকাশ : ৩০শে জানু. ১৯৮৩, কলকাতা)।

জমি, পালঙ্ক এসব গল্পের মতো 'রস' গল্পে পূর্ববঙ্গের ভাষা ও ভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে। এদের ভাষাও তাঁর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল। মাজুখাতুন মোতালেফকে শুনিয়ে বলে— 'যাইতে কও এ বাড়িগুনা, এখনই নাইমা যাইতে কও। একটুও কি সরম ভরম নাই মনের মইধ্যে?' নরেন্দ্রনাথের গল্প প্রাণ পেয়েছে এই অকৃত্রিম ও আপাতচমকহীন ভাষার সাহায্যে। 'রস' গল্পে বিবৃতিময় ভাষা প্রাধান্য পেয়েছে। গল্পের শুরু থেকে তিনি মূল ঘটনার প্রতি পাঠককে আকৃষ্ট করেন। নারায়ণ চৌধুরীর মতে— 'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আঙ্গিক আর ভাষার বিন্যাস যেমন সুষম কারুকার্যমণ্ডিত তেমনি তাঁর গল্প বলার ধরণটিও অতি মনোরম। তাঁর গল্পের উপজীব্য চিত্র ও চরিত্রে সমাজবাস্তবতা তথা মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতার কারুকার্য তেমন নেই, তবু সব জড়িয়ে তার গল্পের আবেদন স্নিগ্ধ আর ওইখানেই তাঁর ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য।' (নারায়ণ চৌধুরী; '*ছোটগল্প কথাসাহিত্য*', ভাদ্র, ১৩৭০, পৃঃ ৩৬) কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের মতে— 'ভাষা ও সংলাপের ক্ষেত্রেও নরেন্দ্রনাথের গদ্য আকর্ষণীয়; ছোট ছোট বাক্য এক্ষেত্রে স্বল্প ভাষায় তিনি পাঠক মনকে নাড়া দিতে পেরেছিলেন।' (কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত; '*নরেন্দ্রনাথ মিত্র : আনুষঙ্গিক ভাবনা*', মাসিক বাংলাদেশ, ৪র্থ বর্ষ, সংখ্যা ৯ম ও ১০ম, পৃঃ ৪০৩)। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পটিতে অনবদ্য ভঙ্গিতে লেখক গল্পের ব্যঞ্জনাময় মুহূর্তগুলিকে ব্যক্ত করেছেন। ভাষার এই সাবলীলতার জন্য যে কোনো ধরনের পাঠকের কাছে তার গল্পের কথনভঙ্গির তীব্র আকর্ষণীয়তা।

১২.৮ অনুশীলনী

১) *নরেন্দ্রনাথ মিত্র/জীবন ও সাহিত্য* — অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ - ডিসেম্বর ১৯৯৪।

২) *আধুনিক ছোটগল্প/মনে ও মননে* — সম্পাদনা দোস্ত মহম্মদ, সাহিত্য সঙ্গী, প্রথম প্রকাশ - আগষ্ট ২০১১।

৩) *বাংলা ছোটগল্প/প্রসঙ্গ ও প্রকরণ* — বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ - আগষ্ট ১৯৮৫।

৪) প্রসঙ্গ : নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সম্পাদনা সমীর বসু, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০১, প্রকাশক পদক্ষেপ।

৫) *নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্পমালা*/প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮৬, আনন্দ পাবলিশার্স।

৬) উজাগর; *নরেন্দ্রনাথ* মিত্র সংখ্যা।

১২.৯ গ্রন্থপঞ্জি

ক) ১) 'রস' গল্পটি ছোটগল্প হিসাবে সার্থক কিনা সে বিষয়ে আলোচনা কর।

২) বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পকার হিসেবে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অবদান আলোচনা করুন।

৩) মোতালেফ মাজুখাতুনের পারস্পরিক সম্পর্কটি আলোচনা কর।

৪) মোতালেফ ফুলবানুর সম্পর্কটির টানাপোড়েনটি বিবৃত কর।

৫) 'রস' গল্পে লেখকের অনবদ্য রচনাভঙ্গী ও গল্পটির গঠনশৈলী বিশ্লেষণ করুন।

৬) 'রস' গল্পটির নামকরণ সার্থক ও সুপ্রযুক্ত কিনা তা নির্ণয় কর।

খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :—

১) নাদির শেখ কে ছিল?

২) মাজুখাতুনের প্রথম স্বামীর নাম কি ছিল? সে কী কাজ করত?

৩) মোতালেফ ফুলবানুকে নিকে করার টাকা কিভাবে জোগাড় করল?

৪) খেজুর গাছের রস থেকে পাটালি কিভাবে তৈরি হয়?

৫) 'না মেঞাভাই, নেবে নাই'— কে কাকে কোন্ প্রসঙ্গে বলেছে? এ কথাটির তাৎপর্য কি?

একক ১৩ ❑ পথের কাঁটা — শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গঠন

১৩.১ গোয়েন্দাসাহিত্যে শরদিন্দুর অবস্থান

১৩.২ মূল গল্প

১৩.৩ 'পথের কাঁটা', নাকি, গ্রামোফোন পিন হত্যারহস্য?

১৩.৪ 'পথের কাঁটা'র লিখনকাল, পত্রিকাপ্রকাশ এবং গ্রামোফোন পিন হত্যারহস্যের ঘটনাকাল

১৩.৫ কাহিনির বিশ্লেষণী পাঠ

১৩.৬ সাইকেল ঘণ্টিতে গ্রামোফোন পিনের কারসাজি—আদৌ কি সম্ভব?

১৩.৭ প্রফুল্ল প্রদত্ত দশ টাকার নোট

১৩.৮ অনুশীলনী

১৩.১ মূলগল্প

ব্যোমকেশ খবরের কাগজখানা সযত্নে পাট করিয়া এক পাশে রাখিয়া দিল। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া অন্যমনস্কভাবে জানালার বাহিরে তাকাইয়া রহিল।

বাহিরে কুয়াশা-বর্জিত ফাল্গুনের আকাশে সকালবেলার আলো ঝলমল করিতেছিল। বাড়ির তেতলার ঘর কয়টি লইয়া আমাদের বাসা, বসিবার ঘরটির গবাক্ষপথে শহরের ও আকাশের একাংশ বেশ দেখা যায়। নীচে নবোদ্‌বুদ্ধ নগরীর কর্মকোলাহল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, হ্যারিসন রোডের উপর গাড়ি-মোটর-ট্রামের ছুটাছুটি ও ব্যস্ততার অন্ত নাই। আকাশেও এই চাঞ্চল্য কিয়ৎপরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে। চড়াইপাখিগুলো অনাবশ্যক কিচিমিচি করিতে করিতে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে; তাহাদের অনেক ঊর্ধ্বে একঝাঁক পায়রা কলিকাতা শহরটাকে নীচে ফেলিয়া যেন সূর্যলোক পরিক্রমণ করিবার আশায় ঊর্ধ্ব হইতে আরো ঊর্ধ্বে উঠিতেছে বেলা প্রায় আটটা, প্রভাতী চা ও জলখাবার শেষ করিয়া আমরা দুজন অলসভাবে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে বহির্জগতের বার্তা গ্রহণ করিতেছিলাম।

ব্যোমকেশ জানালার দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল— "কিছুদিন থেকে কাগজে একটা মজার বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে, লক্ষ করেছ?"

আমি বলিলাম— "না। বিজ্ঞাপন আমি পড়ি না।"

ভ্রূ তুলিয়া একটু বিস্মিতভাবে ব্যোমকেশ বলিল— "বিজ্ঞাপন পড় না? তবে পড় কি?"

"খবরের কাগজে সবাই যা পড়ে, তাই পড়ি—খবর।"

"অর্থাৎ মাঞ্চুরিয়ান্দর কার আঙুল কেটে গিয়ে রক্তপাত হয়েছে আর ব্রেজিলে কার একসঙ্গে তিনটে ছেলে হয়েছে,

এই পড়। ওসব পড়ে লাভ কী? সত্যিকারের খাঁটি খবর যদি পেতে চাও, তাহলে বিজ্ঞাপন পড়।"

ব্যোমকেশ অদ্ভুত লোক, কিন্তু সে পরিচয় ক্রমশ প্রকাশ পাইবে। বাহির হইতে তাহাকে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া একবারও মনে হয় না যে, তাহার মধ্যে অসামান্য কিছু আছে কিন্তু তাহাকে খোঁচা দিয়া, প্রতিবাদ করিয়া, একটু উত্তেজিত করিয়া দিতে পারিলে ভিতরকার মানুষটি কচ্ছপের মতো বাহির হইয়া আসে। সে স্বভাবত স্বল্পভাষী, কিন্তু ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া একবার তাহাকে চটাইয়া দিতে পারিলে তাহার ছুরির মতো শানিত ঝক্‌ঝকে বুদ্ধি সঙ্কোচ ও সংযমের পরদা ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে, তখন তাহার কথাবার্তা সত্যই শুনিবার মতো বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

আমি খোঁচা দিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না, বলিলাম— "ও, তাই না কি? কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা তাহলে ভারি শয়তান, সমস্ত কাগজখানা বিজ্ঞাপনে ভরে না দিয়ে কতকগুলো বাজে খবর ছাপিয়ে পাতা নষ্ট করে।"

ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল। সে বলিল— "তাদের দোষ নেই। তোমার মতো লোকের চিত্তবিনোদন না করতে পারলে বেচারাদের কাগজ বিক্রি হয় না, তাই বাধ্য হয়ে ওই সব খবর সৃষ্টি করতে হয়। আসল কাজের খবর থাকে কিন্তু বিজ্ঞাপনে। দেশের কোথায় কি হচ্ছে, কে কি ফিকির বার করে দিন-দুপুরে ডাকাতি করছে, কে চোরাই মাল পাচার করবার নূতন ফন্দি আঁটছে—এইসব দরকারি খবর যদি পেতে চাই তো বিজ্ঞাপন পড়তে হবে। রয়টারের টেলিগ্রামে ওসব পাওয়া যায় না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম— "তা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু,—থাক—। এবার থেকে না হয় বিজ্ঞাপনই পড়ব। কিন্তু তোমার মজার বিজ্ঞাপনটা কী শুনি?"

ব্যোমকেশ কাগজখানা আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল— "পড়ে দেখ, দাগ দিয়ে রেখেছি।"

পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক কোণে একটি অতি ক্ষুদ্র তিন লাইনের বিজ্ঞাপন দৃষ্টিগোচর হইল। লাল পেন্সিল দিয়া দাগ দেওয়া ছিল বলিয়াই চোখে পড়িল, নচেৎ খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত।

"পথের কাঁটা"

"যদি কেহ পথের কাঁটা দূর করিতে চান, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র দোকানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ল্যাম্পপোস্টে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন।"

দুই-তিনবার পড়িয়াও বিজ্ঞাপনের মাথামুণ্ডু বুঝিতে পারিলাম না, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— "ল্যাম্পপোস্টে হাত রেখে মোড়ের মাথায় দাঁড়ালেই পথের কাঁটা দূর হয়ে যাবে। এ বিজ্ঞাপনের মানে কী? আর পথের কাঁটাই বা কী বস্তু?"

ব্যোমকেশ বলিল— "সেটা এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি। বিজ্ঞাপনটা তিন মাস ধরে ফি শুক্রবার বার হচ্ছে, পুরনো কাগজ ঘাঁটলেই দেখতে পাবে।"

আমি বলিলাম— "কিন্তু এ বিজ্ঞাপনের সার্থকতা কী? কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়েই তো লোকে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে? এর তো কোনো মানেই হয় না!"

ব্যোমকেশ বলিল— "আপাতত কোনও উদ্দেশ্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না বটে, কিন্তু তাই বলে উদ্দেশ্য নেই বলা চলে না। অকারণে কেউ গাঁটের কড়ি খরচ করে বিজ্ঞাপন দেয় না।— লেখাটা পড়লে একটা জিনিস সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"

"কী?"

"যে ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তার আত্মগোপন করবার চেষ্টা। প্রথমত দেখ, বিজ্ঞাপনে কোনও নাম নেই। অনেক সময় বিজ্ঞাপনে নাম থাকে না বটে, কিন্তু খবরের কাগজের অফিসে খোঁজ নিলে নাম-ধাম সব জানতে পারা যায়। সে রকম বিজ্ঞাপনে বক্স-নম্বর দেওয়া থাকে। এতে তা নেই। তারপর দেখ, যে লোক বিজ্ঞাপন দেয়, সে জনসাধারণের সঙ্গে কোনও একটা কারবার চালাতে চায়— এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু মজা এই যে, এ লোকটি নিজে অদৃশ্য থেকে কারবার চালাতে চায়।"

"বুঝতে পারলুম না।"

"আচ্ছা, বুঝিয়ে বলছি, শোন। যিনি এই বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, তিনি জনসাধারণকে ডেকে বল্‌ছে— 'ওহে, তোমরা যদি পথের কাঁটা দূর করতে চাও তো অমুক সময় অমুক স্থানে দাঁড়িয়ে থেকো—এমনভাবে দাঁড়িয়ে থেকো—যাতে আমি তোমাকে চিনতে পারি।'—পথের কাঁটা কি পদার্থ, সে তর্ক এখন দরকার নেই, কিন্তু মনে কর তুমি ওই জিনিসটা চাও। তোমার কর্তব্য কী? নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়িয়ে থাকা। মনে কর, তুমি যথাসময় সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে। তারপর কী হল?"

"কী হল?"

"শনিবার বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় ওই জায়গায় কী রকম লোক-সমাগম হয় সেটা বোধ হয় তোমাকে বলে দিতে হবে না। এদিকে হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল ওদিকে নিউ মার্কেট, চারিদিকে গোটা পাঁচ-ছয় সিনেমা হাউস। তুমি ল্যাম্পপোস্ট ধরে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলে আর লোকের মেলা ঠেলা খেতে লাগলে, কিন্তু যে আশায় গিয়েছিলে, তা হল না— কেউ তোমার পথের কাঁটা উদ্ধার করবার মহৌষধ নিয়ে হাজির হল না। তুমি বিরক্ত হয়ে চলে এলে, ভাবলে, ব্যাপারটা আগাগোড়া ভুয়ো। তারপর হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখলে, একখানি চিঠি কে ভিড়ের মধ্যে তোমার পকেটে ফেলে গেছে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি? চোরে-কামারে দেখা হল না অথচ সিঁধকাটি তৈরি হবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে তোমার লেনদেনের সম্বন্ধ স্থাপিত হল অথচ তিনি কে, কি রকম চেহারা, তুমি কিছুই জানতে পারলে না।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম— "যদি তোমার যুক্তিধারাকে সত্যি বলেই মেনে নেওয়া যায়, তাহলে কি প্রমাণ হয়?"

"এই প্রমাণ হয় যে, 'পথের কাঁটা'র সওদাগরটি নিজেকে অত্যন্ত সঙ্গোপনে রাখতে চান এবং যিনি নিজের পরিচয় দিতে এত সঙ্কুচিত, তিনি বিনয়ী হতে পারেন, কিন্তু সাধু-লোক কখনই নন।"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম— "এ তোমার অনুমান মাত্র, একে প্রমাণ বলতে পার না।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া ঘরে পায়চারি করিতে করিতে কহিল— "আরে, অনুমানই তো আসল প্রমাণ। যাকে তোমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে থাকো, তাকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো অনুমান বই আর কিছুই থাকে না। আইনে যে circumstantial evidence বলে একটা প্রমাণ আছে, সেটা কী? অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ তারই জোরে কত লোক যাবজ্জীবন পুলিপোলাও চলে যাচ্ছে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, মন হইতে সায় দিতে পারিলাম। অনুমান যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সমকক্ষ হইতে পারে, এ কথা সহজে মানিয়া লওয়া যায় না। অথচ ব্যোমকেশের যুক্ত খণ্ডন করাও কঠিন কাজ। সুতরাং নীরব থাকাই শ্রেয়

বিবেচনা করিলাম। জানিতাম, এই নীরবতায় সে আরও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবে এবং অচিরাৎ আরো জোরালো যুক্তি আনিয়া হাজির করিবে।

একটা চড়াই পাখি কুটা মুখে করিয়া খোলা জানালার উপর আসিয়া বসিল এবং ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া উজ্জ্বল ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়া আমাদের পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ব্যোমকেশ হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল— "আচ্ছা, ওই পাখিটা কী চায় বলতে পার?"

আমি চমকিত হইয়া বলিলাম— 'কী চায়? ওঃ, বোধহয় বাসা তৈরি করবার একটা জায়গা খুঁজছে।"

"ঠিক জানো? কোনো সন্দেহ নেই?"

"কোনো সন্দেহ নেই।"

দুই হাত পশ্চাতে রাখিয়া মৃদুহাস্যে ব্যোমকেশ বলিল— "কী করে বুঝলে? প্রমাণ কি?"

"প্রমাণ আর কী! ওর মুখে কুটো—"

"কুটো থাকলেই প্রমাণ হয় যে, বাসা বাঁধতে চায়?"

দেখিলাম ব্যোমকেশের ন্যায়ের প্যাঁচে পড়িয়া গিয়াছি।

কহিলাম, "না—তবে—"

"অনুমান। পথে এস। এতক্ষণ তবে দেয়ালা করছিলে কেন?"

"দেয়ালা করিনি। কিন্তু তুমি কী বলতে চাও, চড়াই পাখি সম্বন্ধে যে অনুমান খাটে, মানুষের বেলাতেও সেই অনুমান খাটবে?"

"কেন নয়?"

"তুমি যদি কুটো মুখে করে একজনের জানালায় উঠে বসে থাক, তাহলে কি প্রমাণ হবে যে তুমি বাসা বাঁধতে চাও?"

"না। তাহলে প্রমাণ হবে যে, আমি একটা বদ্ধ পাগল।"

"সে প্রমাণের দরকার আছে কী?"

ব্যোমকেশ হাসিতে লাগিল। বলিল— "চটাতে পারবে না। কিন্তু কথাটা তোমায় মানতেই হবে— প্রত্যক্ষ প্রমাণ বরং অবিশ্বাস করা যেতেপারে, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত অনুমান একেবারে অমোঘ। তার ভুল হবার জো নেই।"

আমারও জিদ চড়িয়া গিয়াছিল, বলিলাম— "কিন্তু ওই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে তুমি যে সব উদ্ভট অনুমান করলে,তা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না।"

ব্যোমকেশ বলিল— "সে তোমার মনের দুর্বলতা, বিশ্বাস করবারও ক্ষমতা চাই। যা হোক, তোমার মতো লোকের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণই ভালো। কাল শনিবার, বিকেলে কোনো কাজও নেই। কালই তোমার বিশ্বাস করিয়ে দেবো।"

"কী ভাবে?"

আমাদের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনা গেল। ব্যোমকেশ উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া বলিল, — "অপরিচিত ব্যক্তি— প্রৌঢ়—মোটাসোটা, নাদুস-নুদুস বললেও অত্যুক্তি হবে না— হাতে লাঠি আছে— কে ইনি? নিশ্চয়ই আমাদের সাক্ষাৎ চান, কারণ, তেতলায় আমরা ছাড়া আর কেউ থাকে না। "বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।"

বাহিরের দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। ব্যোমকেশ ডাকিয়া বলিল— "ভেতরে আসুন—দরজা খোলা আছে।"

দ্বার ঠেলিয়া একটি মধ্যবয়সি স্থূলকায় ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি মোটা মলক্কা বেতের রুপার মুঠযুক্ত লাঠি, গায়ে কালো আলপাকার গলাবদ্ধ কোট, পরিধানে কোঁচানো থান। গৌরবর্ণ সুশ্রী, মুড়ে দাড়ি গোঁফ কামানো, মাথার সম্মুখভাগ টাক পড়িয়া পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তেতলার সিঁড়ি ভাঙিয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রথমটা কথা সহিতে পারিলেন না। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে লাগিলেন।

ব্যোমকেশ মৃদুস্বরে আমাকে শুনাইয়া বলিল— ''অনুমান। অনুমান।''

আমি নীরবে তাহার এই শ্লেষ হজম করিলাম। কারণ, এক্ষেত্রে আগন্তুকের চেহারা সম্বন্ধে তাহার অনুমান যে বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভদ্রলোকটি দম লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— ''ডিটেকটিভ ব্যোমকেশবাবু কার নাম?''

মাথার উপর পাখাটা খুলিয়া দিয়া একখানা চেয়ার নির্দেশ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল— ''বসুন। আমারই নাম ব্যোমকেশ বক্সী, কিন্তু ওই ডিটেক্‌টিভ কথাটা আমি পছন্দ করি না; আমি একজন সত্যান্বেষী। যা হোক, আপনি বড়ো বিপন্ন হয়েছেন দেখছি। একটু জিরিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নিন্, তারপরে আপনার গ্রামোফোন পিনের রহস্য শুনবো।''

ভদ্রলোকটি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া ব্যোমকেশের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। আমরাও বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে গ্রামাফোন-পিন রহস্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা কীরূপে সম্ভব হইল, তাহা একেবারেই আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। ব্যোমকেশের অদ্ভুত ক্ষমতার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, কিন্তু এটা যেন ভোজবাজির মতো ঠেকিল।

ভদ্রলোক অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন— ''আপনি—আপনি জানলেন কী করে?''

সহাস্যে ব্যোমকেশ বলিল— ''অনুমান মাত্র। প্রথমত, আপনি প্রৌঢ়, দ্বিতীয়ত, আপনি সঙ্গতিপন্ন, তৃতীয়ত, আপনি সম্প্রতি ভীষণ বিপদে পড়েছেন এবং শেষ কথা— আমার সাহায্য নিতে চান। সুতরাং— ''কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিয়া ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া বুঝাইয়া দিল যে, ইহার পর তাঁহার আগমনের হেতু আবিষ্কার করা শিশুর পক্ষেও সহজসাধ্য।

এইখানেই বলিয়া রাখা ভালো যে, কিছুদিন হইতে এই কলিকাতা শহরে যে অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপার ঘটিতেছিল এবং যাহাকে 'গ্রামোফোন পিন মিস্ট্রি' নাম দিয়া শহরের দেশি-বিলাতি সংবাদপত্রগুলি বিরাট হুলস্থুল বাধাইয়া দিয়াছিল; তাহার ফলে কলিকাতাবাসী লোকের মনে কৌতূহল, উত্তেজনা ও আতঙ্কের অবধি ছিল না। সংবাদপত্রের রোমাঞ্চকর ও ভীতিপ্রদ বিবরণ পাঠ করিবার পর চায়ের দোকানের জল্পনা উত্তেজনায় একেবারে দড়ি ছেঁড়া হইয়া উঠিয়াছিল এবং গৃহ হইতে পথে বাহির হইবার পূর্বে প্রত্যেক বাঙালি গৃহস্থেরই গায়ে কাঁটা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ব্যাপারটা এই— মাস দেড়েক পূর্বে সুকীয়া স্ট্রিট নিবাসী জয়হরি সান্যাল নামক জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রাতঃকালে কর্নওয়ালিস্ স্ট্রিট দিয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন রাস্তা পার হইয়া অন্য ফুটপাথে যাইবার জন্য যেমনই পথে নামিয়াছেন, অমনই হঠাৎ মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গেলেন। সকালবেলা রাস্তায় লোকজনের অভাব ছিল না, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া আনিবার পর দেখিল তাঁহার দেহে প্রাণ নাই। হঠাৎ কীসে মৃত্যু হইল অনুসন্ধান করিতে গিয়া চোখে পড়িল যে, তাঁহার বুকের উপর একবিন্দু রক্ত লাগিয়া আছে— আর কোথাও আঘাতের কোনও চিহ্ন নাই। পুলিশ অপমৃত্যু সন্দেহ করিয়া লাস হাসপাতালে পাঠাইয়া দিল। সেখানে মরণোত্তর পরীক্ষায় ডাক্তার এক অদ্ভুত রিপোর্ট দিলেন। তিনি লিখিলেন, মৃত্যুর কারণ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটি গ্রামাফোনের পিন বিঁধিয়া আছে। কেমন করিয়া এই পিন হৃৎপিণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার কৈফিয়তে বিশেষজ্ঞ অস্ত্র

চিকিৎসক লিখিলেন, বন্দুক অথবা ওই জাতীয় কোনও যন্ত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত এই পিন মৃতের সম্মুখ দিক হইতে বক্ষের চর্ম ও মাংস ভেদ করিয়া মর্মস্থানে প্রবেশ করিয়াছে এবং মৃত্যুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে।

এই ঘটনা লইয়া সংবাদপত্রে বেশ একটু আন্দোলন হইল এবং মৃতব্যক্তির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতও বাহির হইয়া গেল। ইহা হত্যাকাণ্ড কি না এবং যদি তাই হয় তবে কীরূপে ইহা সঙ্ঘটিত হইল, তাহা লইয়া অনেক গবেষণা প্রকাশিত হইল। কিন্তু একটা কথা কেহই পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিলেন না— এই হত্যার উদ্দেশ্য কী এবং যে হত্যা করিয়াছে তাহার ইহাতে কী স্বার্থ! সরকারের পুলিশ যে ইহার তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও কাগজে প্রকাশ পাইল। চায়ের দোকানের কাজিয়া ফতোয়া দিলেন, ও কিছু নয়, লোকটার হার্টফেল করিয়াছিল, কিন্তু উপস্থিত ভালো সংবাদের দুর্ভিক্ষ ঘটায় কাগজওয়ালারা এই নূতন ফন্দি বাহির করিয়া তিলকে তাল করিয়া তুলিয়াছে।

ইহার দিন আষ্টেক পরে শহরে সকল সংবাদপত্রে দেড়-ইঞ্চি টাইপে যে সংবাদ বাহির হইল, তাহাতে কলিকাতার ভদ্র বাঙালী সম্প্রদায় উত্তেজনায় খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিলেন। চায়ের বৈঠকের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের তৃতীয় নয়ন একবারে বিস্ফাপিত হইয়া খুলিয়া গেল। এত প্রকার গুজব, আন্দাজ ও জনশ্রুতি জন্মগ্রহণ করিল, যে, বর্ষাকালে ব্যাঙের ছাতাও বোধ করি এত জন্মায় না।

'দৈনিক কালকেতু' লিখিল—

আবার গ্রামাফোন পিন

অদ্ভুত রোমাঞ্চকর রহস্য

কল্লিকাতার পথঘাট নিরাপদ নয়

"'কালকেতু'র পাঠকগণ জানেন, কয়েকদিন পূর্বে জয়হরি সান্ন্যাল পথ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরীক্ষায় তাঁহার হৃৎপিণ্ড হইতে একটি গ্রামোফোন পিন বাহির হয় এবং ডাক্তার উহাই মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমরা তখনি সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, ইহা সাধারণ ব্যাপার নয়, ইহার ভিতরে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র লুক্কায়িত আছে। আমাদের সেই সন্দেহ সত্যে পরিণত হইয়াছে, গতকল্য অনুরূপ আর একটি লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছে। কলিকার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী কৈলাসচন্দ্র মৌলিক কল্য অপরাহ্নে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় মোটরে চড়িয়া গড়ের মাঠের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। রেড রোডের কাছে গিয়া তিনি মোটর থামাইয়া পদব্রজে বেড়াইবার জন্য যেমনি গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া কিছুদূর গিয়াছেন, অমনি 'উঃ' শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার সোফার ও রাস্তার অন্যান্য লোক মিলিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে আবার গাড়িতে তুলিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অল্পকালমধ্যেই পুলিশ আসিয়া পড়িল। কৈলাসবাবুর গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি ছিল, পুলিস তাঁহার বুকের কাছে এক বিন্দু রক্তের দাগ দেখিয়া অপঘাত-মৃত্যু সন্দেহ করিয়া তৎক্ষণাৎ লাশ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। শবব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, কৈলাসবাবুর হৃৎপিণ্ডে একটি গ্রামাফোন পিন আটকাইয়া আছে, এই পিন তাঁহার সম্মুখ দিক হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে।

"স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইহা আকস্মিক দুর্ঘটনা নহে, একদল ক্রূরকর্মা নরঘাতক কলিকাতা শহরে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা কে এবং কী উদ্দেশ্যে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে খুন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ইহাদের হত্যা করিবার প্রণালী; কোথা হইতে কোন্ অস্ত্রের সাহায্যে ইহারা হত্যা করিতেছে, তাহা গভীর রহস্যে আবৃত।

"কৈলাশবাবু অতিশয় হৃদয়বান্ অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার সহিত কাহারও শত্রুতা থাকা সম্ভব বলিয়া

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ অন্য প্রশ্ন করিল— "আপনার এমন কোনও শত্রু আছে, যে আপনাকে খুন করতে পারে?"

"না। অন্তত আমি জানি না।"

"আপনি বিবাহ করেননি, সুতরাং ছেলেপুলে নেই। ভাইপোই বোধ হয় আপনার ওয়ারিস?"

একটু ইতস্তত করিয়া আশুবাবু বলিলেন— "না।"

"উইল করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কার নামে সম্পত্তি উইল করেছেন?"

আশুবাবুর গৌরবর্ণ মুখ ধীরে ধীরে রক্তাভ হইয়া উঠিতেছিল, তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সঙ্কোচ-জড়িত স্বরে বলিলেন— "আমাকে আর সব কথা জিজ্ঞাসা করুন, শুধু ওই প্রশ্নটি আমায় করবেন না। ওটা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব কথা— প্রাইভেট—" বলিতে বলিতে প্রতিভভাবে থামিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ তীক্ষ্দৃষ্টিতে আশুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া শেষে বলিল— "আচ্ছা থাক। কিন্তু আপনার ভাবী ওয়ারিশ— তিনি যে-ই হোন— আপনার উইলের কথা জানেন কি?"

"না। আমি আর আমার উকিল ছাড়া আর কেউ জানে না।"

"আপনার ওয়ারিসের সঙ্গে আপনার দেখা হয়?"

চক্ষু অন্য দিকে ফিরাইয়া আশুবাবু বলিলেন— "হয়।"

"আপনার ভাইপো কতদিন হল জেগে গেছে?"

আশুবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন— "তা প্রায় তিন হপ্তা হবে।"

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল— "আজ তাহলে আপনি আসুন। আপনার ঠিকানা আর ঘড়িটা রেখে যান; যদি কিছু জানবার দরকার হয়, আপনাকে খবর দেব।"

আশুবাবু শঙ্কিতভাবে বলিলেন— "কিন্তু আমার সম্বন্ধে তো কোনো ব্যবস্থা করলেন না। ইতিমধ্যে যদি আবার—"

ব্যোমকেশ বলিল— "আপনার সম্বন্ধে ব্যবস্থা এই যে, পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেরুবেন না।"

আশুবাবু পাণ্ডুর মুখে বলিলেন— "বাড়িতে আমি একলা থাকি— যদি—"

ব্যোমকেশ বলিল— "না, বাড়িতে আপনার কোনো আশঙ্কা নেই, সেখানে আপনি নিরাপদ। তবে ইচ্ছে হয়, একজন দারোয়ান রাখতে পারেন।"

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন— "বাড়ি থেকে একেবারে বেরুতে পারব না?"

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল— "একান্তই যদি রাস্তায় বেরুনো দরকার হয়ে পড়ে, ফুটপাথ দিয়ে যাবেন। কিন্তু খবরদার রাস্তায় নামবেন না। রাস্তায় নামলে আপনার জীবন সম্বন্ধে আমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না।"

আশুবাবু প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ ললাট ভ্রূকুটি-কুটিল করিয়া বসিয়া রহিল। চিন্তা করিবার নূতন সূত্র সে অনেক

বার করলাম, তখন দেখি, তার কচখানা গুঁড়ো হয়ে গেছে—আর—আর একটা গ্রামাফোনের পিন ঘড়িটাকে ফুঁড়ে মুখ বার করে আছে।"

আশুবাবু বলিতে বলিতে আবার ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কপালের ঘাম মুছিয়া কম্পিত হস্তে পকেট হইতে একটি ঘড়ির বাক্স বাহির করিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিলেন— "এই দেখুন সেই ঘড়ি—"

ব্যোমকেশ বাক্স খুলিয়া একটি গান-মেটালের পকেট ঘড়ি বাহির করিল। ঘড়ির কাচ নাই, ঠিক নয়টা কুড়ি মিনিটে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার মর্মস্থল ভেদ করিয়া একটি গ্রামাফোন পিনের অগ্রভাগ হিংস্রভাবে পশ্চাদ্দিকে মুখ বাহির করিয়া আছে। ব্যোমকেশ ঘড়িটা কিছুক্ষণ গভীর মনঃসংযোগে নিরীক্ষণ করিয়া আবার বাক্সে রাখিয়া দিল। বাক্সটা টেবিলের উপর রাখিয়া আশুবাবুকে বলিল— "তারপর?"

আশুবাবু বলিলেন— "তারপর কী করে যে বাড়ি ফিরে এলাম সে আমি জানি আর ভগবান জানেন। দুশ্চিন্তায় আতঙ্কে সমস্ত রাত্রি চোখের পাতা বুঝতে পারিনি। ভাগ্যে পকেটে ঘড়িটা ছিল, তাই তো প্রাণ বেঁচে গেল— নইলে আমিও তো এতক্ষণ হাসপাতালে মড়ার টেবিলে শুয়ে থাকতাম—" আশুবাবু শিহরিয়া উঠিলেন— "এক রাত্রিতে আমার দশ বছর পরমায়ু ক্ষয় হয়ে গেছে, মশায়। প্রাণ নিয়ে কোথায় পালাব, কী করে আত্মরক্ষা করব, সমস্ত রাত এই শুধু ভেবেছি। শেষ রাত্রে আপনার নাম মনে পড়ল, শুনেছিলাম আপনার আশ্চর্য ক্ষমতা, তাই ভোর না হতেই ছুটে এসেছি। বন্ধ গাড়িতে চড়ে এসেছি মশায়, হেঁটে আসতে সাহস হয়নি— কী জানি যদি—"

ব্যোমকেশ উঠিয়া গিয়া আশুবাবু স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিল— "আপনি নিশ্চিন্ত হোন; আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনার আর কোনো ভয় নেই। কাল আপনার একটা মস্ত ফাঁড়া গেছে সত্যি, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি আমার কথা শুনে চলেন, তাহলে আপনার প্রাণের কোনো আশঙ্কা থাকবে না।"

আশুবাবু দুই হাতে ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া বলিলেন— "ব্যোমকেশবাবু, আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন, প্রাণ বাঁচান, আমি আপনাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেব।'

ব্যোমকেশ নিজের চেয়ারে ফিরিয়া বসিয়া মৃদুহাস্যে বলিল— "এ তো খুব ভালো কথা। সবসুদ্ধ তাহলে তিন হাজার হল— গভর্নমেন্টেও দু হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে না? কিন্তু সে পরের কথা, এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন। কাল যে সময় আপনার বুকে ধাক্কা লাগল ঠিক সেই সময় আপনি কোনও শব্দ শুনেছিলেন?"

"কী রকম শব্দ?"

"মনে করুন, মোটরের টায়ার ফাটার মতো শব্দ।"

আশুবাবু নিঃসংশয়ে বলিলেন— "না।"

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল— "আর কোনো রকম শব্দ?"

"আমি তো কিছুই মনে করতে পারছি না।"

"ভেবে দেখুন"

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া আশুবাবু বলিলেন— "রাস্তায় গাড়িঘোড়া চললে যে শব্দ হয়, সেই শব্দই শুনেছিলাম আর মনে হচ্ছে যেন— যে সময় ধাক্কাটা লাগে, সেই সময় সাইকেলের ঘন্টির কিড়িং কিড়িং শব্দ শুনেছিলাম।"

"কোনো রকম অস্বাভাবিক শব্দ শোনেননি?'

"না।"

খুলে বলুন, অ-দরকারি বলে কোনও কথা বাদ দেবেন না। আমার কাছে অ-দরকারি কিছু নেই।''

ভদ্রলোক কতকটা সামলাইয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন— ''আমার নাম শ্রী আশুতোষ মিত্র, কাছেই নেবুতলায় আমি থাকি। আঠারো বছর বয়স থেকে সারা জীবন ব্যবসা উপলক্ষ্যে ঘুরে ঘুরেই বেড়িয়েছি— বিয়ে-থা করবার অবকাশ পাইনি। তা ছাড়া, ছেলেপিলে নেন্ডি-গেন্ডি আমি ভালবাসি না, তাই কোনওদিন বিয়ে করবার ইচ্ছাও হয়নি। আমি গোছালো লোক, একলা থাকতে ভালবাসি। বয়সও কম হয়নি— আসছে মাঘে একান্ন বছর পরবে। প্রায় বছর দুই হল কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়েছি, সারা জীবনের উপার্জন লাখ দেড়েক টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। তারই সুদে আমার বেশ চলে যায়। বাড়িভাড়াও দিতে হয় না, বাড়িখানা নিজের। সামান্য গান-বাজনার শখ আছে, তাই নিয়ে বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল।''

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল— ''অবশ্য পোষ্য কেউ আছে?''

আশুবাবু মাথা নাড়িয়ে বলিলেন— ''না। আত্মীয় বলতে কেউ নেই, তাই ও হাঙ্গামা পোহাতে হয় না। শুধু একটা লক্ষ্মীছাড়া বখাটে ভাইপো আছে, সেই মাঝে মাঝে টাকার জন্যে জ্বালাতন করতে আসত। কিনতু সে ছোঁড়া একেবারে বেহেড মাতাল আর জুয়াড়ি, ওরকম লোক আমি বরদাস্ত করতে পারি না, মশায়, তাই তাকে আর বাড়ি ঢুকতে দিই না।''

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল— ''ভাইপোটি কোথায় থাকেন?''

আশুবাবু বেশ একটু পরিতৃপ্তির সহিত বলিলেন— ''আপাতত শ্রীঘরে। রাস্তায় মাতলামি করার জন্যে এবং পুলিশের সঙ্গে মারামারি করার অপরাধে দু-মাস জেল হয়েছে।''

''তারপর বলে যান।''

''বিনোদ ছোঁড়া—আমার গুণধর ভাইপো, জেলে যাবার পর ক-দিন বেশ আরামে ছিলাম মশায়, কোনও হাঙ্গামা ছিল না। বন্ধু-বান্ধব আমার কেউ নেই, কিন্তু জেনে শুনে কোনও দিন কারও অনিষ্ট করিনি; সুতরাং আমার যে শত্রু আছে, এ কথাও ভাবতে পারি না। কিন্তু হঠাৎ কাল বিনামেঘে বজ্রাঘাত হল। এমন ব্যাপার যে ঘটতে পারে, এ আমার কল্পনার অতীত। গ্রামোফোন পিন রহস্যের কথা কাগজে পড়েছি বটে, কিন্তু ও আমার বিশ্বাস হত না, ভাবতাম সব গাঁজাখুরি। কিন্তু সে ভুল আমার ভেঙে গেছে।

''কাল সন্ধ্যাবেলা আমি অভ্যাসমতো বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। রোজই যাই। জোড়াসাঁকোর দিকে একটা গানবাজনার মজলিস আছে, সেখানে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে ন-টা সাড়ে ন-টার সময় বাড়ি ফিরে আসি। হেঁটেই যাতায়াত করি, আমার যে বয়স, তাতে নিয়মিত হাঁটলে শরীর ভালো থাকে। কাল রাত্রিতে আমি বাড়ি ফিরছি, আমহার্স্ট স্ট্রিট আর হ্যারিসন রোডের চৌমাথার ঘড়িতে তখন ঠিক সওয়া ন-টা। রাস্তায় তখনও গাড়ি-মোটরের খুব ভিড়। আমি কিছুক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইলাম, দুটো ট্রাম পাস করে গেল। একটু ফাঁক দেখে আমি চৌমাথা পার হতে গেলাম রাস্তার মাঝামাঝি যখন পৌঁছেছি, তখন হঠাৎ বুকে একটা বিষম ধাক্কা লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বুকের চামড়ার ওপর কাঁটা ফোঁটার মতন একটা ব্যথা অনুভব করলাম, মনে হল, আমার বুক-পকেটের ঘড়ির ওপর কে যেন একটা প্রকাণ্ড ঘুষি মারলে। উলটে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কোনও রকমে সামলে নিয়ে গাড়ি-ঘোড়া বাঁচিয়ে সামনের ফুটপাথে উঠে পড়লাম।

''মাথাটা যেন ঘুলিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে বুকে ধাক্কা লাগল, কিছুই ধারণা করতে পারলাম না। পকেট থেকে ঘড়িটা বার করতে গিয়ে দেখি, ঘড়ি বার হচ্ছে না, কীসে আটকে যাচ্ছে। সাবধানে পকেটের কাপড় সরিয়ে যখন ঘড়ি

মনে হয় না। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র আটচল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। কৈলাসবাবু বিপত্নীক ও অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যাই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। আমরা কৈলাসবাবুর শোকসন্তপ্ত কন্যা ও জামাতাকে আমাদের আন্তরিক সহায়নুভূতি জানাইতেছি।

"পুলিশ সজোরে তদন্ত চালাইয়াছে। প্রকাশ যে, কৈলাসবাবুর সোফার কালী সিংকে সন্দেহের উপর গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।"

অতঃপর দুই হপ্তা ধরিয়া খবরের কাগজে খুব হই চই চলিল। পুলিশ সবেগে অনুসন্ধান চালাইতে লাগিল এবং অনুসন্ধানের বেগে বোধ করি গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিল। কিন্তু অপরাধী ধরা তো দূরের কথা, গ্রামাফোন পিনের জমাট রহস্য-অন্ধকারের ভিতরে আলোকের রশ্মিটুকু পর্যন্ত দেখা গেল না।

পনেরো দিনের মাথায় আবার গ্রামাফোন পিন দেখা দিল। এবার তাহার শিকার সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের একজন ধনাঢ্য মহাজন—নাম কৃষ্ণদয়াল লাহা। ধর্মতলা ও ওয়েলিংটন স্ট্রিটের চৌমাথা পার হইতে গিয়া ইনি ভূপতিত হইলেন, আর উঠিলেন না। সংবাদপত্রে যে বিরাট রই-রই আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনার অতীত। পুলিসের অক্ষমতা সম্বন্ধেও সম্পাদকীয় মন্তব্য তীব্র ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। কলিকাতার অধিবাসীদিগের বুকের উপর ভূতের ভয়ের মতো একটা বিভীষিকা চাপিয়া বসিল। বৈঠকখানায়, চায়ের দোকানে, রেস্তোরাঁ ও ড্রয়িংরুমে অন্য সকল প্রকার আলোচনা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

তারপর দ্রুত অনুক্রমে আরও দুইটি অনুরূপ খুন হইয়া গেল। কলিকাতা শহর বিহ্বল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো অসহায়ভাবে পড়িয়া রহিল, এই অচিন্তনীয় বিপৎপাতে কী করিবে, কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে, কিছুই যেন ভাবিয়া পাইল না।

বলা বাহুল্য, ব্যোমকেশ এই ব্যাপারে গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। চোর ধরা তাহার পেশা এবং এই কাজে সে বেশ একটু নামও করিয়াছে। 'ডিকেট্‌টিভ' শব্দটার প্রতি তাহার যতই বিরাগ থাক, বস্তুত সে যে একজন বে-সরকারি ডিটেক্‌টিভ ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা সে মনে মনে ভলো রকমই জানিত। তাই এই অভিনব হত্যাকাণ্ড তাহার সমস্ত মানসিক শক্তিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন অকুস্থানগুলি আমরা দুইজনে মিলিয়া দেখিয়াও আসিয়াছিলাম। ইহার ফলে ব্যোমকেশ কোনো নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছিল কি না জানি না; করিয়া থাকিলেও আমাকে কিছুবলে নাই। কিন্তু গ্রামোফোন পিন সম্বন্ধে সে যেখানে যেটুকু সংবাদ পাইত, তাহাই সযত্নে নোটবুকে টুকিয়া রাখিত। বোধ হয় তাহার মনে মনে ভরসা ছিল যে, একদিন এই রহস্যের একটা ছিন্নসূত্র তাহার হাতে আসিয়া পড়িবে।

তাই আজ যখন সত্যসত্যই সূত্রটি তাহার হাতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন দেখিলাম, বাহিরে শান্ত সংযত ভাব ধারণ করিলেও ভিতরে ভিতরে সে ভয়ানক উত্তেজিত ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

ভদ্রলোকটি বলিলেন— "আপনার নাম শুনে এসেছিলাম, দেখছি ঠকিনি। গোড়াতেই যে আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিলেন, তাতে ভরসা হচ্ছে আপনিই আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন। পুলিশের দ্বারা কিছু হবে না, তাদের কাছে আমি যাইনি, মশায়। দেখুন না, চোখের সামনে দিন-দুপুরে পাঁচ-পাঁচটা খুন হয়ে গেল, পুলিস কিছু করতে পারলে কি? আমিও তো প্রায় গিয়েছিলাম আর একটু হলেই।" তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে থামিয়া গেল, কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিল।

ব্যোমকেশ সান্ত্বনার স্বরে বলিল— "আপনি বিচলিত হবেন না। পুলিশে না গিয়ে যে আমার কাছে এসেছেন, ভালোই করেছেন। এ ব্যাপারে কিনারা যদি কেউ করতে পারে তো সে পুলিশ নয়। আমাকে গোড়া থেকে সমস্ত কথা

পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই আমি তাহার চিন্তায় বাধা দিলাম না। প্রায় আধ ঘণ্টা নীরব থাকিবার পর সে মুখ তুলিয়া বলিল— "তুমি ভাবছ, আমি আশুবাবুকে পথে নামতে মানা করলুম কেন এবং বাড়িতে তিনি নিরাপদ, এ কথাই বা জানলুম কি করে?"

চকিত হইয়া বলিলাম— "হ্যাঁ।"

ব্যোমকেশ বলিল— "গ্রামোফোন-পিন ব্যাপারে একটা জিনিস নিশ্চয় লক্ষ করেছ— সব হত্যাই রাস্তায় হয়েছে। ফুটপাথেও নয়। রাস্তার মাঝখানে। এর কারণ কী হতে পারে, ভেবে দেখেছো?"

"না, কি কারণ?"

"এর দুটো কারণ হতে পারে। প্রথমত, রাস্তায় খুন করলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা কম— যদিও আপাতদৃষ্টিতে সেটা অসম্ভব বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত, যে অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়, রাস্তায় ছাড়া অন্যত্র তাকে ব্যবহার করা চলে না।"

আমি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— "এমন কী অস্ত্র হতে পারে?"

ব্যোমকেশ বলিল— "তা যখন জানতে পারব, গ্রামোফোন-পিন রহস্য তখন আর রহস্য থাকবে না।"

আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসিয়াছিল, বলিলাম— "আচ্ছা, এমন কোনো বন্দুক বা পিস্তল যদি কেউ তৈরি করে, যা দিয়ে গ্রামোফোন-পিন ছোঁড়া যায়?"

সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া ব্যোমকেশ বলিল— "বুদ্ধি খেলিয়েছ বটে, কিন্তু তাতে দু-একটা বাধা আছে। যে ব্যক্তি বন্দুক কিংবা পিস্তল দিয়ে খুন করতে চায়, সে বেছে বেছে রাস্তার মাঝখানে খুন করবে কেন? সে তো নির্জন স্থানই খুঁজবে। বন্দুকের কথা ছেড়ে দিই, পিস্তল ছুঁড়লে যে আওয়াজ হয়, রাস্তার গোলমালেও সে আওয়াজ ঢাকা পড়ে না। তা ছাড়া বারুদের গন্ধ আছে। কথায় আছে— শব্দে শব্দ ঢাকে, গন্ধ ঢাকে কীসে?"

আমি বলিলাম— "মনে কর, যদি এয়ার-গান হয়?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল— "এয়ার-গান ঘাড়ে করে খুন করতে যাওয়ার পরিকল্পনায় নূতনত্ব আছে বটে, কিন্তু সুবুদ্ধির পরিচয় নেই।— না হে না, অত সহজ নয়। এর মধ্যে ভাববার বিষয় হচ্ছে, অস্ত্র যা-ই হোক ছোঁড়বার সময় তার একটা শব্দ হবেই, সে শব্দ ঢাকা পড়ে কী করে?"

আমি বলিলাম— "তুমিই তো এখনি বলছিলে— শব্দে শব্দ ঢাকে—"

ব্যোমকেশ হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, অস্ফুট স্বরে কহিল— "ঠিক তো—ঠিক তো—"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম— "কী হল?"

ব্যোমকেশ নিজের দেহটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া যেন চিন্তার মোহ ভাঙিয়া ফেলিল, বলিল— "কিছু না। এই গ্রামোফোন-পিন রহস্য নিয়ে যতই ভাবা যায়, ততই এই ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয় যে, হত্যা এক সুতোয় গাঁধা। সবগুলোর মধ্যেই একটা অদ্ভুত মিল আছে, যদিও তা হঠাৎ চোখে পড়ে না।'

"কী রকম?"

ব্যোমকেশ করাগ্রে গণনা করিতে করিতে বলিল— "প্রথমত দেখ, যাঁরা খুন হয়েছেন, তাঁরা সবাই যৌবনের সীমা অতিক্রম করেছিলেন। আশুবাবু— যিনি ঘড়ির কল্যাণে বেঁচে গেছেন— তিনিও প্রৌঢ়। তারপর দ্বিতীয় কথা, তাঁরা সকলেই অর্থবান লোক ছিলেন— হতে পারে কেউ বেশি ধনী কেউ কম ধনী, কিন্তু গরিব কেউ নয়। তৃতীয় কথা,

সকলেই পথের মাঝখানে হাজার লোকের সামনে খুন হয়েছেন এবং শেষ কথা— এইটেই সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য— তাঁরা সবাই অপুত্রক।''

আমি বলিলাম— ''তুমি তাহলে অনুমান কর যে—''

ব্যোমকেশ বলিল ''অনুমান এখনও আমি কিছুই করিনি। এগুলো হচ্ছে আমার অনুমানের ভিত্তি, ইংরাজিতে যকে বলে *premise*.''

আমি বলিলাম— ''কিন্তু এই ক-টি *premise* থেকে অপরাধীদের ধরা—''

আমাকে শেষ করিতে না দিয়া ব্যোমকেশ বলিল— ''অপরাধীদের নয় অজিত, অপরাধীর। গৌরবে ছাড়া এখানে বহুবচন একবারে অনাবশ্যক। খবরের কাগজয়ালারা 'মার্ডারিস্ গ্যাং' বলে যতই চিৎকার করুক, গ্যাং-এর মধ্যে কেবল একটি লোক আছেন। তিনিই এই নরমেধযজ্ঞের হোতা, ঋত্বিক এবং যজমান। এক কথায়, পরব্রহ্মের মতো ইনি, একমেবাদ্বিতীয়ম।''

আমি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলাম— ''এ কথা তুমি কি করে বলতে পারো? কোনো প্রমাণ আছে?''

ব্যোমকেশ বলিল— ''প্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু উপস্থিত একটা দিলেই যথেষ্ট হবে। এমন অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করবার শক্তি পাঁচজন লোকের কখনও সমান মাত্রায় থাকতে পারে? প্রত্যেকটি পিন অব্যর্থভাবে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে—একটু উঁচু কিম্বা নীচু হয়নি। আশুবাবুর কথাই ধর ঘড়িটি না থাকলে ঐ পিন কোথায় গিয়ে পৌঁছুত বল দেখি? এমন টিপ কি পাঁচজনের হয়? এ যেন চক্রছিদ্রপথে মৎস্য-চক্ষু বিদ্ধ করার মতো,— দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর মনে আছে তো? ভেবে দেখ, সে কাজ একা অর্জুনই পেরেছিল, মহাভারতের যুগেও এমন অমোঘ নিশানা একজন বই দু-জনের ছিল না।'' বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে উঠিয়া পড়িল।

আমাদের এই বসিবার ঘরের পাশে আর একটা ঘর ছিল— সেটা ব্যোমকেশের নিজস্ব। এ ঘরে সে সকল সময় আমাকেও ঢুকিতে দিত না। বস্তুত এ ঘরখানা ছিল একাধারে তাহার লাইব্রেরি, মিউজিয়ম ও গ্রিনরুম। আশুবাবুর ঘড়িটা তুলিয়া সেই ঘরটায় প্রবেশ করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল— ''খাওয়া-দাওয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়ে এটার তত্ত্ব আহরণ করা যাবে। আপাতত স্নানের বেলা হয়ে গেছে।''

বৈকালে প্রায় সাড়ে তিনটার সময় ব্যোমকেশ বাহির হইয়া গিয়াছিল। কী কাজে গিয়াছিল, জানি না। যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়াছে; আমি তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, চায়ের সরঞ্জামও তৈয়ার ছিল, সে আসিতেই ভৃত্য টেবিলের উপর চা-জলখাবার দিয়া গেল। আমরা নিঃশব্দে জলযোগ সমাধা করিলাম। এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, ওই কার্যটা একত্র না করিলে মনঃপুত হইত না।

একটু চুরুট ধরাইয়া, চেয়ারে ঠেসান দিয়া বসিয়া ব্যোমকেশ প্রথম কথা কহিল; বলিল— ''আশুবাবু লোকটিকে তোমার কেমন মনে হয়?''

ঈষৎ বিস্মিতভাবে বলিলাম— ''কেন বল দেখি? আমার তো বেশ ভালো লোক বলেই মনে হয়— নীরিহ ভালোমানুষ গোছের—''

ব্যোমকেশ বলিল— ''আর নৈতিক চরিত্র?''

আমি বলিলাম— ''মাতাল ভাইপোর উপর যে রকম চটা, তাতে নৈতিক চরিত্র তো ভালো বলেই মনে হয়। তার ওপর বয়স্ক লোক। বিয়ে করেননি, যৌবনে যদি কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা করে থাকেন তো অন্য কথা। কিন্তু এখন আর ওঁর

সে সব করবার বয়স নেই।"

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিয়া বলিল— "বয়স না থাকতে পারে, কিন্তু একটি স্ত্রীলোক আছে। জোড়াসাঁকোর যে গানের মজলিসে আশুবাবু নিত্য গানবাজনা করে থাকেন, সেটি ঐ স্ত্রীলোকের বাড়ি। স্ত্রীলোকের বাড়ি বললে বোধ হয় ঠিক বলা হয় না, কারণ, বাড়ির ভাড়া আশুবাবুই দিয়ে থাকেন এবং গানের মজলিস বললেও বোধ হয় ভুল বলা হয়, যেহেতু দুটি প্রাণীর বৈঠককে কোনো মতেই মজলিস বলা চলে না।"

"বল কি হে! বুড়োর প্রাণে তো রস আছে দেখছি।"

"শুধু তাই নয়, গত বারো তের বছর ধরে আশুবাবু এই নাগরিকাটির ভরণ-পোষণ করে আসছেন, সুতরাং তাঁর একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। আবার অন্য পক্ষেও একনিষ্ঠতার অভাব নেই, আশুবাবু ছাড়া অন্য কোনও সঙ্গীত-পিপাসুর সেখানে প্রবেশাধিকার নেই; দরজায় কড়া পাহারা।"

উৎসুক হইয়া বলিলাম— "তাই না কি? সঙ্গীত-পিপাসু সেজে ঢোকবার মতলব করেছিলে বুঝি? নাগরিকাটির দর্শন পেলে? কী রকম দেখতে শুনতে?"

ব্যোমকেশ বলিল— "একবার চকিতের ন্যায় দেখা পেয়েছিলুম। কিন্তু রূপবর্ণনা করে তোমার মতো কুমার-ব্রহ্মচারীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে চাই না। এক কথায়, অপূর্ব রূপসী। বয়স ছাব্বিশ সাতাশ, কিন্তু দেখে মনে হয়, বড়ো জোর উনিশ কুড়ি। আশুবাবুর রুচির প্রশংসা না করে থাকা যায় না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম— "তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তুমি হঠাৎ গুপ্ত জীবন সম্বন্ধে এত কৌতূহলী হয়ে উঠলে কেন?"

ব্যোমকেশ বলিল— "অপরিমিত কৌতূহল আমার একটা দুর্বলতা। তা ছাড়া, আশুবাবুর উইলের ওয়ারিশ সম্বন্ধে মনে একটা খটকা লেগেছিল।"

"ইনিই তাহলে আশুবাবুর উত্তরাধিকারিণী?"

"সেই রকমই অনুমান হচ্ছে। সেখানে একটি ভদ্রলোকের দেখা পেলুম; ফিটফাট বাবু, বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, দ্রুতবেগে এসে দারোয়ানের হাতে একখানা চিঠি গুঁজে দিয়ে দ্রুতবেগে চলে গেলেন। কিন্তু ও কথা যাক্। বিষয়টা মুখরোচক বটে, কিন্তু লাভজনক নয়।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিল।

বুঝিলাম, অবান্তর আলোচনায় আকৃষ্ট হইয়া পাছে তাহার মন প্রকৃত অনুসন্ধানের পথ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, পাছে আশুবাবুর জীবনের গোপন ইতিহাস তাঁহার উপস্থিত বিপদ ও বিপন্মুক্তির সমস্যা অপেক্ষা বড়ো হইয়া উঠে, এই ভয়ে ব্যোমকেশও আলোচনাটা আর বাড়িতে দিল না। এমনিভাবেই যে মানুষের মন নিজের অজ্ঞাতসারে গৌণবস্তুকে মুখ্যবস্তু অপেক্ষা প্রধান করিয়া তুলিয়া শেষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তাহা আমারও অজ্ঞাত ছিল না। আমি তাই জিজ্ঞাসা করিলাম— "ঘড়িটা থেকে কিছু পেলে?"

ব্যোমকেশ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদুহাস্যে বলিল— "ঘড়ি থেকে তিনটি তত্ত্ব লাভ করেছি। এক— গ্রামাফোন পিনটি সাধারণ এডিসন্-মার্কা পিন, দুই— তার ওজন দু রতি, তিন— আশুবাবুর ঘড়িটা একেবারে গেছে, আর মেরামত হবে না।"

আমি বলিলাম— "তার মানে দরকারি তথ্য কিছুই পাওনি।"

ব্যোমকেশ চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল— "তা বলতে পারি না। প্রথমত বুঝতে পেরেছি যে, পিন ছোঁড়বার সময় হত্যাকারীর আর হত ব্যক্তির মধ্যে ব্যবধান সাত আট গজের বেশি হবে না। একটা গ্রামোফোন পিন এত হাল্‌কা জিনিস যে, সাত আট গজের বেশি দূর থেকে ছুঁড়লে অমন অব্যর্থ-লক্ষ্য হতে পারে না। অথচ হত্যাকারীর টিপ কী রকম অভ্রান্ত, তা তো দেখছ। প্রত্যেকবার তীর একেবারে মর্মস্থানে গিয়ে ঢুকেছে।"

আমি বিস্মিত অবিশ্বাসের সুরে বলিলাম— "সাত আট গজ দূর থেকে মেরেছে, তবু কেউ ধরতে পারলে না?"

ব্যোমকেশ বলিল— "সেইটেই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধান প্রহেলিকা। ভেবে দেখ, খুন করবার পর লোকটা হয়তো দর্শকদের মধ্যেই ছিল, হয়তো নিজের হাতে তুলে মৃতদেহ স্থানান্তরিত করেছে; কিন্তু তবু কেউ বুঝতে পারলে না, কি করে সে এমনভাবে আত্মগোপন করলে?"

আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলাম— "আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, হত্যাকারী পকেটের ভিতর এমন একটা যন্ত্র নিয় বেড়ায়— যা থেকে গ্রামোফোন পিন ছোঁড়া যায়। তারপর তার শিকারের সামনে এসে পকেট থেকেই যন্ত্রটা ফায়ার করে। পকেটে হাত দিয়ে অনেকেই রাস্তায় চলে, সুতরাং কারুর সন্দেহ হয় না।"

ব্যোমকেশ বলিল— "তা যদি হত, তাহলে ফুটপাথের ওপরেই তো কাজ সারতে পারত। রাস্তায় নামতে হয় কেন? তা ছাড়া, এমন কোনো যন্ত্র আমার জানা নেই— যা নিঃশব্দে ছোঁড়া যায় অথচ তার নিক্ষিপ্ত গুলি একটা মানুষের শরীর ফুটো করে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে পৌঁছতে পারে। তাতে কতখানি শক্তির দরকার, ভেবে দেখেছ?"

আমি নিরুত্তর হইয়া রইলাম। ব্যোমকেশ হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া ও করতলে চিবুক ন্যস্ত করিয়া বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; শেষে বলিল— "বুঝতে পারছি, এর একটা খুব সহজ সমাধান হাতের কাছেই রয়েছে, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছি না। যতবার ধরবার চেষ্টা করছি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।"

রাত্রিকালে এ বিষয়ে আর কোনও কথা হইল না। নিদ্রার পূর্ব পর্যন্ত ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক ও বিমনা হইয়া রহিল। সমস্যার যে উত্তরটা হাতের কাছে থাকিয়াও তাহার যুক্তির ফাঁদে ধরা দিতেছে, না, তাহারই পশ্চাতে তাহার মন যে ব্যাধের মতো ছুটিয়াছে, তাহা বুঝিয়া আমিও তাহার একাগ্র অনুধাবনে বাধা দিলাম না।

পরদিন সকালে চিন্তাক্রান্ত মুখেই সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইয়া এক পেয়ালা চা গলাধঃকরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল। ঘণ্টা তিনেক পরে যখন ফিরিল, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম— "কোথায় গিছলে?"

ব্যোমকেশ জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে অন্যমনে বলিল— "উকিলের বাড়ি।" তাহাকে উন্মনা দেখিয়া আমি আর প্রশ্ন করিলাম না।

অপরাহ্নের দিকে তাহাকে কিছু প্রফুল্ল দেখিলাম। সমস্ত দুপুর সে নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া কাজ করিতেছিল; একবার টেলিফোনে কাহার সহিত কথা কহিল, শুনিতে পাইলাম। প্রায় সাড়ে চারটের সময় সে দরজা খুলিয়া গলা বাড়াইয়া বলিল— "ওহে, কাল কী ঠিক হয়েছিল ভুলে গেলে? 'পথের কাঁটার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেবার সময় যে উপস্থিত।"

সত্যই 'পথেরকাটা'র কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল— "এস এস, তোমায় একটু সাজসজ্জা করে দিই। এমনি গেলে তো চলবে না।"

আমি তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম— "চলবে না কেন?"

ব্যোমকেশ একটা কাঠের কবাট-যুক্ত আলমারি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি টিনের বাক্স বাহির করিল। বাক্স

হইতে ক্রেপ, কাঁচি, স্পিরিট-গাম ইত্যাদি বাছিয়া লইয়া বুরুশ দিয়া আমার মুখে স্পিরিট-গাম লাগাইতে বলিল— "অজিত বন্দ্যো যে ব্যোমকেশ বক্সীর বন্ধু, এ খবর অনেক মহাত্মাই জানেন কিনা তাই একটু সতর্কতা।"

মিনিট পনেরো পরে আমার অঙ্গসজ্জা শেষ করিয়া যখন ব্যোমকেশ ছাড়িয়া দিল, তখন আয়নার সম্মুখে গিয়া দেখি,—কি সর্বনাশ! এ তো অজিত বন্দ্যো নয়, এ যে অসম্পূর্ণ আলাদা লোক। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও ছুঁচালো গোঁফ যে অজিত বন্দ্যোর কস্মিনকালেও ছিল না বয়সও প্রায় দশ বছর বাড়িয়া গিয়াছে। রং বেশ একটু ময়লা। আমি ভীত হইয়া বলিলাম— "এই বেশে রাস্তায় বেরুতে হবে। যদি পুলিশে ধরে?"

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল— "মা ভৈঃ! পুলিশের বাবার সাধ্য নেই তোমাকে চিনতে পারে। বিশ্বাস না হয়, নীচের তলায় কোনও চেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কয়ে দেখ। জিজ্ঞাসা কর— অজিতবাবু কোথায় থাকেন?"

আমি আরও ভয় পাইয়া বলিলাম— "না না, তার দরকার নেই আমি এমনই যাচ্ছি।"

বাহির হইবার সময় ব্যোমকেশ বলিল— "কি করতে হবে, তোমার তো জানাই আছে— শুধু ফেরবার সময় একটু সাবধানে এস, পেছু নিতে পারে।"

"সে সম্ভাবনাও আছে না কি?"

"অসম্ভব নয়। আমি বাড়িতেই রইলুম, যত শীগ্‌গির পার, ফিরে এস।"

পথে বাহির হইয়া প্রথমটা ভারী অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে যখন দেখিলাম, আমার ছদ্মবেশ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে না তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম, একটু হাসহও হইল। মোড়ের একটা দোকানে আমি নিয়মিত পান খাইতাম, খোট্টা পানওয়ালা আমাকে দেখিলেই সেলাম করিত, সেখানে গিয়া সদর্পে পান চাহিলাম। লোকটা নির্বিকারচিত্তে পান দিয়া পয়সা কুড়াইয়া লইল, আমার পানে ভালো করিয়া দৃক্‌পাতও করিল না।

পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছিল, সুতরাং আর বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত নয় বুঝিয়া ট্রামে চড়িলাম। এস্‌প্ল্যানেডে নামিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সঙ্কেতস্থানে উপস্থিত হইলাম। মনের অবস্থা যদিও ঠিক অভিসারিকার মতো নহে, তবু বেশ একটু কৌতুক ও উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিলাম।

কৌতুক কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না। যে পথে জনস্রোত জলস্রোতের মতোই ছুটিয়া চলিয়াছে, সেখানে স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া থাকা সহজ ব্যাপার নহে। দুই চারিটা কনুই-এর গুঁতা নির্বিকারভাবে হজম করিলাম। অকারণে সঙ-এর মতো ল্যাম্পপোস্ট ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকার জন্য বিপদও আছে। চৌমাথার উপর একটা সার্জেন্ট দাঁড়াইয়াছিল, সে সপ্রশ্নভাবে আমার দিকে দুই তিনবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এখনই হয়তো আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কেন দাঁড়াইয়া আছ? কি করি, ফুটপাথের ধারেই হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল-এর দোকানের একটা প্রকাণ্ড কাচ-ঢাকা জানলায় নানাবিধ বিলাতি পণ্য সাজান ছিল, সেই দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম। মনে ভাবিলাম, পাড়াগেঁয়ে ভূত মনে কর ক্ষতি নাই, গাঁটকাটা ভাবিয়া হাতে হাতকড়া না পরায়।

ঘড়িতে দেখিলাম, পাঁচটা পঞ্চাশ। কোনোক্রমে আর দশটা মিনিট কাটাইতে পারিলে বাঁচা যায়। অধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, মনটা নিজের পাঞ্জাবির পকেটের মধ্যে পড়িয়া রহিল। দুই একবার পকেটে হাত দিয়াও দেখিলাম, কিন্তু সেখানে নূতন কিছুই হাতে ঠেকিল না।

অবশেষে ছয়টা বাজিতেই একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ল্যাম্পপোস্ট পরিত্যাগ করিলাম। পকেট দুটি ভালো করিয়া পরীক্ষা করিলাম, চিঠিপত্র কিছুই নাই, নিরাশার সঙ্গে সঙ্গে একটা স-মৎসর আনন্দও হইতে লাগিল, যাক্‌, ব্যোমকেশের অনুমান যে অভ্রান্ত নহে, তাহার একা দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। এইবার তাহাকে বেশ একটু খোঁচা দিতে

হইবে। এরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে এস্‌প্ল্যানেডের ট্রাম-ডিপোতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

"ছইব লিবেন, বাবু!"

কানের অত্যন্ত নিকটে শব্দ শুনিয়া চমকিয়া ফিরিয়া দেখি, লুঙ্গি-পরা নীচ শ্রেণির একজন মুসলমান একখানা খাম আমার হাতে গুঁজিয়া দিতেছে। বিস্মিতভাবে খুলিতেই একখানা কুৎসিত ছবি বাহির হইয়া পড়িল। এরূপ ছবির ব্যবসা কলিকতার রাস্তাঘাটে চলে জানিতাম; তাই ঘৃণাভরে সেটা ফেরত দিতে গিয়া দেখি লোকটা নাই। সম্মুখে, পশ্চাতে, চারিদিকে চক্ষু ফিরাইলাম; কিন্তু ভিড়ের মধ্যে সেই লুঙ্গি-পরা লোকটাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

অবাক্ হইয়া কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় একটি ছোট্ট হাসির শব্দে চমক ভাঙিয়া দেখিলাম, একজন বৃদ্ধ গোছের ফিরিঙ্গি ভদ্রলোক আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমার দিকে না তাকাইয়াই তিনি পরিষ্কার বাঙ্গলায় একান্ত পরিচিত কণ্ঠে বলিলেন— "চিঠি তো পেয়ে গেছ দেখছি, বোর বাড়ি যাও। একটু ঘুরে যেও। এখান থেকে ট্রামে বৌবাজারের মোড় পর্যন্ত যেও, সেখান থেকে বাসে করে হাওড়ার মোড় পর্যন্ত, তারপর ট্যাক্সিতে করে বাড়ি যাবে।"

সার্কুলার রোডের ট্রাম আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, সাহেব তাহাতে উঠিয়া বসিলেন।

আমি সমস্ত শহর মাড়াইয়া যখন বাড়ি ফিরিলাম, তখন ব্যোমকেশ আরাম-কেদারার উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া সিগার টানিতেছে। আমি তাহার সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলাম— "সাহেব কখন এলে?"

ব্যোমকেশ ধূম উদগীরণ করিয়া বলিল— 'মিনিট কুড়ি।"

আমি বলিলাম— "আমার পেছু নিয়েছিলে কেন?"

ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিয়া বলিল— "যে কারণে নিয়েছিলুম, তা সফল হল না, এক মিনিট দেরি হয়ে গেল।— তুমি যখন ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়য়েছিলে, আমি তখন ঠিক তোমার পাঁচ হাত দূরে লেড্‌ল'র দোকানের ভিতর জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সিল্কের মোজা পছন্দ করছিলুম। 'পথের কাঁটা'র ব্যাপারী বোধ হয় কিছু সন্দেহ করে থাকবে, বিশেষত তুমি যে-রকম ছটফট করছিলে আর দু'মিনিট অন্তর পকেটে হাত দিচ্ছিলে, তাতে সন্দেহ হবারই কথা। তাই সে তখন চিঠিখানা দিলে না। তুমি চলে যাবারপর আমিও দোকান থেকে বেরিয়েছি, মিনিট দুই-তিন দেরি হয়েছিল— তারি মধ্যে লোকটা কাজ হাসিল করে বেরিয়ে গেল। আমি যখন পৌঁছলুম, তখন তুমি খাম হাতে করে ইয়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে।— কী করে খাম পেলে?

কি করিয়া পাইলাম, তাহা বিবৃত করিলে পর ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল— "লোকটাকে ভালো করে দেখেছিলে? কিছু মনে পরছে?"

আমি চিন্তা করিয়া বলিলাম— "না। শুধু মনে হচ্ছে, তার নাকের পাশে একটা মস্ত আঁচিল ছিল।"

ব্যোমকেশ হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল— "সেটা আসল্ নয়—নকল। তোমার গোঁফ-দাড়ির মতো। যাক, এখন চিঠিখানা দেখি, তুমি ইতিমধ্যে বাথরুমে গিয়ে তোমার দাড়ি-গোঁফ ধুয়ে এস।"

মুখের রোমবাহুল্য বর্জন করিয়া স্নান সারিয়া যখন ফিরিলাম, তখন ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। দুই হাত পিছনে দিয়া সে দ্রুতপদে ঘরে পায়চারি করিতেছে, তাহার মুখে চোখে এমন একটা প্রদীপ উল্লাসের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা দেখিয়া আমার বুকের ভিতরটা লাফাইয়া উঠিল। আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম— "চিঠিতে কি দেখলে? কিছু পেয়েছ না কি?" ব্যোমকেশ উচ্ছ্বসিত আনন্দবেগে আমার পিঠ চাপড়াইয়া

বলিল— "শুধু একটা কথা অজিত, একটি ছোট্ট কথা। কিন্তু এখন তোমাকে কিছু বলব না। হাওড়ার ব্রিজ কখনও খোলা অবস্থায় দেখেছ? আমার মনের অবস্থা হয়েছিল ঠিক সেই রকম, দুই দিক থেকে পথ এসেছে, কিন্তু মাঝখানটিতে একটুখানি ফাঁক, একটি পনটুন খোলা। আজ সেই ফাঁকটুকু জোড়া লেগে গেছে।"

"কী করে জোড়া লাগল? চিঠিতে কী আছে?"

"তুমিই পড়ে দেখ।" বলিয়া ব্যোমকেশ খোলা কাগজখানা আমার হাতে দিল।

খামের মধ্যে কুৎসিত ছবিটা ছাড়া আর একখানা কাগজ ছিল, তাহা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু পড়িবার সুযোগ হয় নাই। এখন দেখিলাম, পরিষ্কার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

"আপনার পথের কাঁটা কে? তাহার নাম ও ঠিকানা কী? আপনি কী চান, পরিষ্কার করিয়া লিখুন। কোনো কথা লুকাইবেন না। নিজের নাম স্বাক্ষর করিবার দরকার নাই। লিখিত পত্র খামে ভরিয়া আগামী রবিবার ১০ই মার্চ রাত্রি বারোটার সময় খিদিরপুর রেস্‌কোর্সের পাশের রাস্তা দিয়া পশ্চিম দিকে যাইবেন। একটি লোক বাইসিক্ল চড়িয়া আপনার সম্মুখ দিক্ হইতে আসিবে, তাহার চোখে মোটর-গগ্‌ল দেখিলেই চিনিতে পারিবেন। তাহাকে দেখিবামাত্র আপনার পত্র হাতে লইয়া পাশের দিকে হাত বাড়াইয়া থাকিবেন। বাইসিক্ল আরোহী আপনার হাত হইতে চিঠি লইয়া যাইবে। অতঃপর যথাসময়ে আপনি সংবাদ পাইবেন।

"পদব্রজে একাকী আসিবেন। সঙ্গী থাকিলে দেখা পাইবেন না।"

দুই তিনবার সাবধানে পড়িলাম। খুব অসাধারণ বটে এবং যৎপরোনাস্তি রোমান্টিক— তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে ব্যোমকেশের অসম্বৃত আনন্দের কোনও হেতু খুঁজিয়া পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম— "কি ব্যাপার বল দেখি! আমি তো এমন কিছু দেখছি না—"

"কিছু দেখতে পেলে না?"

"অবশ্য তুমি কাল যা অনুমান করেছিলে, তা বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই। লোকটার আত্মগোপান করবার চেষ্টার মধ্যে হয়তো কোন বদ মতলব থাকতে পারে। কিন্তু তা ছাড়া আর তো আমি কিছু দেখছি না।"

"হায় অন্ধ! অতবড় জিনিসটা দেখতে পেলে না?" ব্যোমকেশ হঠাৎ থামিয়া গেল, বাহিরে সিঁড়িতে পদশব্দ হইল। ব্যোমকেশ ক্ষণকাল একাগ্রমনে শুনিয়া বলিল— "আশুবাবু এ সব কথা ওঁকে বলবার দরকার নেই— "বলিয়া চিঠিখানা আমার হাত হইতে লইয়া পকেটে পুরিল।

আশুবাবু ঘরে প্রবেশ করিলে তাঁহার চেহারা দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। একদিনের মধ্যে মানুষের চেহারা এতখানি পরিবর্তিত হইতে পারে, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। মাথার চুল অবিন্যস্ত, জামা-কাপড়ের পারিপাট্য নাই, গালের মাংস ঝুলিয়া গিয়াছে, চোখের কোলে কালি, যেন অকস্মাৎ কোন মর্মান্তিক আঘাত পাইয়া একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। কাল সদ্য মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা পাইবার পরও তাঁহাকে এত অবসন্ন ম্রিয়মান দেখি নাই। তিনি একখানা চেয়ারে অত্যন্ত ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন— "একটা দুঃসংবাদ পেয়ে আপনাকে খবর দিতে এসেছি, ব্যোমকেশবাবু। আমার উকিল বিলাস মল্লিক পালিয়েছে।"

ব্যোমকেশ গম্ভীর অথচ সদয় কণ্ঠে কহিল— "সে পালাবে আমি জানতুম। সেই সঙ্গে আপনার জোড়াসাঁকোর বন্ধুটিও গেছেন, বোধহয় খবর পেয়েছেন?"

আশুবাবু হতবুদ্ধির মতো কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন—"আপনি—আপনি সব জানেন?"

ব্যোমকেশ শান্ত স্বরে কহিল—"সমস্ত। কাল আমি জোড়াসাঁকোয় গিয়েছিলুম, বিলাস মল্লিককেও দেখেছি। বিলাস মল্লিকের সঙ্গে ওই স্ত্রীলোকটির অনেক দিন থেকে ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র চলছি— আপনি কিছুই জানতেন না। আপনার উইল তৈরি করবার পরই বিলাস উকিল আপনার উত্তরাধিকারিণীকে দেখতে যায়। প্রথমটা বোধহয় কৌতূহলবশে গিয়েছিল, তারপর ক্রমে— যা হয়ে থাকে। ওরা এতদিন সুযোগের অভাবেই কিছু করতে পারছিল না। আশুবাবু, আপনি দুঃখিত হবেন না, এ আপনার ভালোই হল— অসৎ স্ত্রীলোক এবং কপট বন্ধুর ষড়যন্ত্র থেকে আপনি মুক্তি পেলেন। আর আপনার জীবনের কোনও ভয় নেই— এখন আপনি নির্ভয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন।"

আশুবাবু শঙ্কাব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন— "তার মানে?"

ব্যোমকেশ বলিল— "তার মানে, আপনি যা মনে মনে সন্দেহ করছেন অথচ বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই ঠিক। ওরাই দু-জনে আপনাকে হত্যা করবার মতলব করেছিল; তবে নিজের হাতে নয়। এই কলকাতা শহরেই একজন লোক আছে— যাকে কেউ চেনে না, কেউ চোখে দেখেনি— অথচ যার নিষ্ঠুর অস্ত্র পাঁচজন নিরীহ নিরপরাধ লোককে পৃথিবী থেকে নিঃশব্দে সরিয়ে দিলে। আপনাকেও সরাতো, শুধু পরমায়ু ছিল বলেই আপনি বেঁচে গেলেন।"

আশুবাবু বহুক্ষণ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন, শেষে মর্মন্তুদ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন— "বুড়ো বয়সে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি, কাউকে দোষ দেবার নেই।— আটত্রিশ বছর পর্যন্ত আমি নিষ্কলঙ্ক জীবনযাপন করেছিলাম, তারপর হঠাৎ পদস্খলন হয়ে গেল। একদিন দেওঘরে তপোবন দেখতে গিয়েছিলাম, সেখানে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে দেখে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলাম। বিবাহে আমার চিরদিনের অরুচি, কিন্তু তাকে বিবাহ করবার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে উঠলাম। শেষে একদিন জানতে পারলাম, সে বেশ্যার মেয়ে। বিবাহ হল না, কিন্তুতাকে ছাড়তেও পারলাম না। কলকাতায় এনে বাড়ি ভাড়া করে রাখলাম। সেই থেকে এই বারো তেরো বছর তাকে স্ত্রীর মতোই দেখে এসেছি। তাকে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলুম, সে তো আপনি জানেন। ভাবতাম, সেও আমাকে স্বামীর মতো ভালোবাসে— কোনও দিন সন্দেহ হয়নি! বুঝতে পারিনি যে, পাপের রক্তে যার জন্ম, সে কখনও সাধ্বী হতে পারেনা। যাক, বুড়ো বয়সে যে শিক্ষা পেলাম, হয়তো পরজন্মে কাজে লাগবে।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন— "ওরা— তারা কোথায় গিয়েছে, আপনি জানেন কি?"

ব্যোমকেশ বলিল— "না। আর সে জেনেও কোনো লাভ নেই। নিয়তি তাদের যে পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সে পথে আপনি যেতে পারবেন না। আশুবাবু, আপনার অপরাধ সমাজের কাছে হয়তো নিন্দিত হবে, কিন্তু আমি আপনাকে চিরদিন শ্রদ্ধা করব জানবেন। মনের দিক থেকে আপনি খাঁটি আছেন, কাদা ঘেঁটেও আপনি নির্মল থাকতে পেরেছেন এইটেই আপনার সবচেয়ে বড়ো প্রশংসার কথা। এখন আপনার খুবই আঘাত লেগেছে, এ রকম বিশ্বাসঘাতকতায় কার না লাগে? কিন্তু ক্রমে বুঝবেন, এর চেয়ে ইষ্ট আপনার আর কিছু হতে পারত না।"

আশুবাবু আবেগপূর্ণ স্বরে কহিলেন— "ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমার চেয়ে অনেক ছোটো, কিন্তু আপনার কাছে আমি যে সান্ত্বনা পেলাম, এ আমি কোথাও প্রত্যাশা করিনি। নিজের লজ্জাকর পাপের ফল যে ভোগ করে, তাকে কেউ সহানুভূতি দেখায় না, তাই তার প্রায়শ্চিত্ত এত ভয়ঙ্কর। আপনার সহানুভূতি পেয়ে আমার অর্ধেক বোঝা হালকা হয়ে গেছে। আর বেশি কি বলব, চিরদিনের জন্য আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।"

আশুবাবু বিদায় লইবার পর তাহার অদ্ভুত ট্র্যাজিডির ছায়ায় মনটা আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। শয়নের পূর্বে ব্যোমকেশকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম— "আশুবাবুকে খুন করবার চেষ্টার পেছনে যে বিলাস উকিল আর ওই স্ত্রীলোকটা আছে, একথা তুমি কবে জানলে?"

ব্যোমকেশ কড়িকাঠ হইতে চক্ষু নামাইয়া বলিল— "কাল বিকেলে"

'তবে পালাবার আগেতাদের ধরলে না কেন?"

"ধরলে কোনো লাভ হত না, তাদের অপরাধ কোনও আদালতে প্রমাণ হত না।"

"কিন্তু তাদের কাছ থেকে আসল হত্যাকারী গ্রামাফোন পিনের আসামীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারত।"

ব্যোমকেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল— "তা যদি সম্ভব হত, তাহলে আমি নিজে তাদের তাড়াবার চেষ্টা করতুম না।"

"তুমি তাদের তাড়িয়েছো।"

হ্যাঁ। আশুবাবু দৈবক্রমে বেঁচে যাওয়াতে তারা উড়ু উড়ু করছিলই, আমি আজ সকালে বিলাস উকিলের বাড়ি গিয়ে ইশারা ইঙ্গিতে বঝিয়ে দিলুম যে আমি অনেক কথাই জানি, যদি এই বেলা সরে না পড়েন তো হাতে দড়ি পড়বে। বিলাস উকিল বুদ্ধিমান লোক, সন্ধ্যারগাড়িতেই বামাল সমেত নিরুদ্দেশ হলেন।"

ব্যোমকেশ একটা হাই তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল— "লাভ এমন কিছু নয়, কেবল একটু দুষ্টের দমন করা গেল। বিলাস উকিল শুধু-হাতে নিরুদ্দেশ হবার লোক নন, মক্কেলের টাকাকড়ি যা তাঁর কাছে ছিল সমস্তই সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং এতক্ষণে বোধ করি, বর্ধমানের পুলিস তাঁকে হাজতে পুরেছে— আগে থাকতেই তারা খবর জানত কী না। যা হোক, বিলাসচন্দ্রের দু-বছর সাজা কেউ ঠেকাতে পারবে না। যদিও ফাঁসিই তার উচিত শাস্তি, তবু তা যখন উপস্থিত দেওয়া যাচ্ছে না, তখন দু-বচ্ছরই মা নন্দ কী?"

পরদিন প্রাতঃকালে একজন অপরিচিত আগন্তুক দেখা করিতে আসিল।

সবেমাত্র চায়ের বাটি নামাইয়া রাখিয়া খবরের কাগজখানা খুলিবার জোগাড় করিতেছি, এমন সময় দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সচকিত হইয়া বলিল— "কে? ভেতরে আসুন।"

একটি ভদ্রবেশধারী সুশ্রী যুবক প্রবেশ করিল। দাড়ি-গোঁফ কামানো, একহারা ছিপছিপে গড়ন, বয়স ত্রিশের মধ্যেই— চেহারা দেখিলে মনে হয়, একজন অ্যাথ্‌লেট। সম্মুখে আমাদের দেখিয়া স্মিতমুখে নমস্কার করিয়া বলিল— "কিছু মনে করবেন না, সকালবেলাই বিরক্ত করতে এলাম। আমার নাম প্রফুল্ল রায়— আমি একজন বিমা কোম্পানির এজেন্ট।" বলিয়া অনাহুতভাবেই একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল।

ব্যোমকেশ বিরস স্বরে বলিল— "আমাদের জীবনবিমা করবার মতো পয়সা নেই।"

প্রফুল্ল রায় হাসিয়া উঠিল। এক একজন লোক আছে, যাহাদের মুখ দেখিতে বেশ সুশ্রী, কিন্তু হাসিলেই মুখের চেহারা বদলাইয়া যায়। দেখিলাম, প্রফুল্ল রায়েরও তাহাই হইল। লোকটি বোধ হয় অতিরিক্ত পানখোর, কারণ, দাঁতগুলো পানের রসে রক্তাক্ত হইয়া আছে। সুন্দর মুখ এত সহজে এমন বিকৃত হইতে পারে দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হয়।

প্রফুল্ল রায় হাসিতে হাসিতে বলিল— "আমি বিমা কোম্পানির লোক, বটে, কিন্তু ঠিক বিমার কাজে আপনাদের কাছে আসিনি। অবশ্য আজকাল আমাদের আসতে দেখলে আত্মীয়-স্বজনরাও দোরে খিল দিতে আরম্ভ করেছেন; নেহাৎ দোষ দেওয়াও যায় না। কিন্তু আপনারা নিশ্চিত হতে পারেন, উপস্থিত আমার কোনও দুরভিসন্ধি নেই।— আপনারই নাম তো ব্যোমকেশবাবু।— বিখ্যাত ডিটেকটিভ? আপনার কাছে একটু প্রাইভেট পরামর্শ নিতে এসেছি, মশায়। যদি আপত্তি না থাকে—"

ব্যোমকেশ বেজারভাবে মুখখানা বাঁকাইয়া বলিল— "পরামর্শ নিতে হলে অগ্রিম কিছু দর্শনী দিতে হয়।"

প্রফুল্ল রায় তৎক্ষণাৎ মানিব্যাগ হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল— "আমার কথা অবশ্য গোপনীয় কিছু নয়, তবু—" বলিয়া অর্থপূর্ণভাবে আমার পানে চাহিল।

আমি উঠিবার উপক্রম করিতেছি দেখিয়া ব্যোমকেশ বেশ একটু কড়া সুরে বলিল— "উনি আমার সহকারী এবং বন্ধু। যা বলবেন, ওঁর সামনেই বলুন।"

প্রফুল্ল রায় বলিল— "বেশ তো, উনি যখন আপনার সহকারী, তখন আর আপত্তি কীসের? আপনার নামটি—? মাফ করবেন অজিতবাবু, আপনি যে ব্যোমকেশবাবুর বন্ধু, তা আমি বুঝতে পারিনি। আপনি ভাগ্যবান্ লোক মশায়, সর্বদা এত বড়ো একজন ডিটেক্‌টিফ সঙ্গে সঙ্গে থাকা, কত রকম বিচিত্র *crime*-এর মর্মোদ্‌ঘাটনে সাহায্য করা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। আপনার জীবনের একটা মুহূর্তও বোধ হয় *dull* নয়! আমার এক এক সময় মনে হয়, এই একঘেয়ে বিমার কাজ ছেড়ে আপনার মতো জীবনযাপন করতে যদি পারতাম—" বলিয়া পকেট হইতে পানের ডিবা বাহির করিয়া একটা পান মুখে দিল।

ব্যোমকেশ ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতেছিল, বলিল— "এইবার আপনার পরামর্শের বিষয়টা যদি প্রকাশ করে বলেন— তাহলে সব দিক দিয়েই সুবিধে হয়।"

প্রফুল্ল রায় তাড়াতাড়ি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল— 'এই যে বলি।— আমি বিমা কোম্পানির এজেন্ট, তা তো আগেই শুনেছেন। বম্বের জুয়েল ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানির তরফ থেকে আমি কাজ করি। কোম্পানির হয়ে দশ বারো লাখ টাকার কাজ আমি করেছি, তাই কোম্পানি খুশি হয়ে আমাকে কলকাতার অফিসের চার্জ দিয়ে পাঠিয়েছেন। গত আট মাস আমি স্থায়িভাবে কলকাতাতেই আছি।

"প্রথম মাস দুই বেশ কাজ চালিয়েছিলাম মশাই কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে এক আপদ এসে জুটল। কারুর নাম করবার দরকার নেই, কিন্তু অন্য বিমা কোম্পানির একটা লোক আমার পেচন্দনে লাগল। চুনোপুঁটির কারবার আমি করি না, দু-চার হাজারে কাজ আমার অধীনস্থ এজেন্টরাই করে; কিন্তু বড়ো বড়ো খদ্দেরের বেলা আমি নিজে করি। এই লোকটা আমার বড়ো বড়ো খদ্দের— ভালো ভালো লাইফ— ভাঙাতে আরম্ভ করলে। আইম যেখানেই যাই, আমার পেছু পেছু সে-ও সেখানে গিয়ে হাজির হয়— কোম্পানির নামে নানারকম দুর্নাম দিয়ে খদ্দের ভড়কে দেয়। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, বড়ো বড়ো লাইফগুলো আমার হাত থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল।

"এইভাবে চার পাঁচ মাস কাটল। কোম্পানি থেকে তাগাদা আসতে লাগল, কিন্তু কী করব, কেমন করে লোকটার হাত থেকে ব্যবসা বাঁচাব, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না।

মামলা-মোকদ্দমা করাও সহজ নয়— তাতে কোম্পানির ক্ষতি হয় অথচ ছিনে জোঁক পেছনে লেগেই আছে। আরও মাসখানেক কেটে গেল, লোকটাকে জব্দ করবার কোনও উপায়ই ভেবে পেলাম না।"

প্রফুল্ল রায় মানিব্যাগ হইতে সযত্নে রক্ষিত দুটি চিরকুট বাহির করিয়া ছোটো টুকরাটি ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিল— "দিন বারো চৌদ্দ আগে এই বিজ্ঞানপটি হঠাৎ চোখে পড়ল। আপনার নজরে বোধহয় পড়েনি, পড়বার কথাও নয়! কিন্তু পাঁচ লাইনের বিজ্ঞাপন হলে কি হয় মশাই, পড়বামাত্র আমার প্রাণটা লাফিয়ে উঠল! পথের কাঁটা আর কাকে বলে? ভাবলাম, দেখি তো আমার পথের কাঁটা উদ্ধার হয় কি না। মনের তখন এমনই অবস্থা যে, স্বপ্নাদ্য মাদুলী হলেও বোধ করি আপত্তি করতাম না।"

গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, এ সেই পথের কাঁটার বিজ্ঞাপনের কাটিং। প্রফুল্ল রায় বলিল— "পড়লেন তো? বেশ মজার নয়? যা হোক, আমি তো নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ গত শনিবারের আগের শনিবার— কদমতলায় কেষ্ট ঠুকুরের মতো ল্যাম্পপোস্ট ধরে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে অস্বস্তির কথা আর কি বলব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেল, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা—কোথাও কেউ নেই। ডিস্‌গাস্‌টেড হয়ে ফিরে আসছি, হঠাৎ দেখি, পকেটে একখানা চিঠি!"

দ্বিতীয় কাগজখানা ব্যোমকেশকে দিয়া বলিল— "এই দেখুন সে চিঠি।"

ব্যোমকেশ চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল, আমি উঠিয়া আসিয়া তাহার পিঠের উপর ঝুঁকিয়া দেখিলাম— ঠিক আমার পত্রেরই অনুরূপ, কেবল রবিবারের পরিবর্তে আগামী সোমবার ১১ই মার্চ রাত্রি বারোটার সময় সাক্ষাৎ করিবার নির্দেশ আছে।

প্রফুল্ল রায় একটু থামিয়া চিঠিখানা পড়িবার অবকাশ দিয়া বলিতে লাগিল— "একে তো পকেটে চিঠি এল কি করে, ভেবেই পেলাম না, তার ওপর চিঠি পড়ে অজানা আতঙ্কে ভেতরটা কেঁপে উঠল। আমি মিষ্টি ভালোবাসি না মশাই, কিন্তু এ চিঠির যেন আগাগোড়াই মিষ্টি। যে কি একটা ভয়ঙ্কর অভিসন্ধি এর মধ্যে লুকোনো রয়েছে। নইলে সব তাতেই এত লুকোচুরি কেন? লোকটা কে, কি রকম প্রকৃতি, কিছুই জানি না, তার চেহারাও দেখিনি, অথচ সে আমাকে রাত দুপুরে একটা নির্জন রাস্তা দিয়ে একলা যেতে বলেছে। ভয়ঙ্কর সন্দেহের কথা নয় কি? আপনিই বলুন তো?"— বলিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল।

আমি উত্তর দিবার পূর্বেই ব্যোমকেশ বলিল— "উনি কি মনে করেন সে প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। আপনি কোন্ বিষয়ে পরামর্শ চান, তাই বলুন।"

প্রফুল্ল রায় একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল— "সেই কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি। চিঠির লেখককে চিনি না অথচ তার ভাবগতিক দেখে সন্দেহ হয়, লোক ভালো নয়। এরকম অবস্থায় চিঠির উত্তর নিয়ে আমার যাওয়া উচিত হবে কি? আমি নিজে গত দশ বারো দিন ধরে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারিনি; অথচ যেতে হলে মাঝে আর একটি দিন বাকি। তাই কী করব ঠিক করতে না পেরে আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি।"

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল— "দেখুন, আজ আমি আপনাকে কোনও পরামর্শ দিতে পারলুম না। আপনি এই কাগজ দু'খানা রেখে যান, এখনও যথেষ্ট সময় আছে, কাল সকালে বিবেচনা করে আমি আপনাকে যথা কর্তব্য বলে দেব।'

প্রফুল্ল রায় বলিল— "কিন্তু কাল সকালে তো আমি আসতে পারব না, আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। আজ রাত্রে সুবিধে হবে না কি? মনে করুন, আটটা কি ন'টার সময় যদি আসি?"

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল— "না, আজ রাত্রে আমি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকব— আমাকেও এক জায়গায় যেতে হবে—" বলিয়া ফেলিয়াই সচকিতে প্রফুল্ল রায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল— "কিন্তু আপনার ব্যস্ত হবার কোনও কারণ নেই, কাল বিকেলে চারটে সাড়ে চারটের সময় এলেও যথেষ্ট সময় থাকবে।"

"বেশ, তাই আসব—" পকেট হইতে আবার ডিবা বাহির করিয়া দুটা পান মুখে পুরিয়া ডিবাটা আমাদের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল— "পান খান কি? খান।— আমরা এক একটা বদ্ অভ্যাস কিছুতেই ছাড়তে পারি না; ভাত না খেলেও চলে, কিন্তু পানের অভাবে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। আচ্ছা— আজ উঠি তাহলে, নমস্কার।"

আমরা প্রতিনমস্কার করিলাম। দ্বার পর্যন্ত গিয়া রায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল— "পুলিশে এ বিষয়ে খবর দিলে কেমন হয়? আমার তো মনে হয়, পুলিশ যদি তদন্ত করে লোকটার নামধাম বিবরণ বের করতে পারে।"

ব্যোমকেশ হঠাৎ মহা খাপ্পা হইয়া বলিল— "পুলিশের সাহায্য যদি নিতে চান, তাহলে আমার কাছে কোনও সাহায্য প্রত্যাশা করবেন না। আমি আজ পর্যন্ত পুলিসের সঙ্গে কাজ করিনি, করবও না।— এই নিয়ে যান আপনার টাকা। "বলিয়া টেবিলের উপর নোটখানা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

"না না, আমি আপনার মতামত জানতে চেয়েছিলাম মাত্র। তা আপনার যখন মত নেই, আচ্ছা, আসি তাহলে— " বলিতে বলিতে প্রফুল্ল রায় দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

প্রফুল্ল রায় চলিয়া গেলে ব্যোমকেশও নোটখানা তুলিয়া লইয়া নিজের লাইব্রেরি ঘরে ঢুকিল, তারপর সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সে মাঝে মাঝে অকারণে খিটখিটে হইয়া উঠে বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ একাকী থাকিবার পর সেভাব আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়, তাহা আমি জানিতাম। তাই মনটা বহু প্রশ্ন কণ্টকিত হইয়া থাকিলেও অপঠিত সংবাদপত্রখানা তুলিয়া তাহাতে মনঃসংযোগের চেষ্টা করিলাম।

কয়েক মিনিট পরে শুনিতে পাইলাম, ব্যোমকেশ ঘরে কথা কহিতেছে। বুঝিলাম, কাহাকেও টেলিফোন করিতেছে। দু একটা ইংরেজি শব্দ কানে আসিল; কিন্তু কাহাকে টেলিফোন করিতেছে, ধরিতে পারিলাম না। প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া কথাবার্তা চলিল, তারপর দরজা খুলিয়া ব্যোমকেশ বাহির হইয়া আসিল। চাহিয়া দেখিলাম, তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম— "কাকে ফোন করলে?"

সে-কথার উত্তর না দিয়া ব্যোমকেশ বলিল— "কাল এস্‌প্ল্যানেড থেকে ফেরবার সময় একজন তোমার পিছু নিয়েছিল জানো?"

আমি চকিত হইয়া বলিলাম— 'না। নিয়েছিল না কি?"

ব্যোমকেশ বলিল— "নিয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকটার কী অসীম দুঃসাহস, আমি শুধু তাই ভাবছি।" বলিয়া নিজের মনেই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

আমাকে অনুসরণ করার মধ্যে এত বড়ো দুঃসাহসিকতা কী আছে, তা বুঝিলাম না; কিন্তু ব্যোমকেশের কথা মাঝে মাঝে এমন দুরুহ হেঁয়ালির মতো হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহার অর্থবোধের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। অথচ এ বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করাও বৃথা, সময় উপস্থিত না হইলে সে কিছুই বলিবে না। তাই আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া স্নানাদির জন্য উঠিয়া পড়িলাম।

দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যাবেলাটা ব্যোমকেশ নিষ্কর্মার মতো বসিয়াই কাটাইয়া দিল। প্রফুল্ল রায় সম্বন্ধে দু একটা প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু সে শুনিতেই পাইল না, চেয়ারে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল; শেষে চমকিয়া উঠিয়া বলিল— "প্রফুল্ল রায়? ও, আজ সকালে যিনি এসেছিলেন? না, তাঁর সম্বন্ধে এখনও কিছু ভেবে দেখিনি।"

রাত্রিকালে আহারাদির পর নীরবে বসিয়া ধূমপান চলিতেছিল; ঘড়িতে ঠং করিয়া সাড়ে দশটা বাজিতেই ব্যোমকেশ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল— "উঠ বীরজায়া বাঁধ কুন্তল— এবার সাজসজ্জার আয়োজন করা যাক, নইলে অভিসারিকাদের সঙ্কেতস্থলে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম— "সে আবার কি?"

ব্যোমকেশ বলিল— "বাঃ 'পথের কাঁটার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে, মনে নেই?"

আমি আশঙ্কায় উঠিয়া দাঁড়ায়া বলিলাম— "মাফ কর। এই রাত্রে একলা আমি সেখানে যেতে পারব না। যেতে হয়, তুমি যাও।"

"আমি তো যাবই, তোমারও যাওয়া চাই।"

"কিন্তু না গেলেই কি নয়? 'পথের কাঁটা'র সম্বন্ধে এত মিথ্যে কৌতূহল কেন? তার চেয়ে যদি গ্রামাফোন পিনের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে, তাহলে যে ঢের কাজ হত।"

"হয়তো হত। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কৌতূহল চরিতার্থ করলেই বা মন্দ কি? গ্রামোফোন পিন তো আর পালাচ্ছে না। তা ছাড়া প্রফুল্ল রায় পরামর্শ নিতে আসবে, তাকে পরামর্শ দেবার মতো কিছু খবর তো চাই।"

"কিন্তু দু-জনে গেলে তো হবে না। চিঠিতে যে মাত্র একজনকে যেতে বলেছে।"

"তার ব্যবস্থা আমি করেছি। এখন ওঘরে চল, সময় ক্রমেই সংক্ষেপ হয়ে আসছে।"

লাইব্রেরিতে লইয়া গিয়া ব্যোমকেশ ক্ষিপ্রহস্তে আমার মুখসজ্জা করিয়া দিল। দেয়ালে লম্বিত দীর্ঘ আয়নাটায় উঁকি মারিয়া দেখিলাম, সেই গোঁফ এবং ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ইন্দ্রজাল প্রভাবে ফিরিয়া পাইয়াছি, কোথাও এতটুকু তফাৎ নাই। আমাকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যোমকেশ নিজের বেশভূষা আরম্ভ করিল; মুখের কোনও পরিবর্তন করিল না, দেরাজ হইতে কালো রঙের সাহেবি পোশাক বাহির করিয়া পরিধান করিল, পায়ে কালো রবার-সোল জুতা পরিল। তারপর আমাকে আয়নার সম্মুখে পাঁচ ছয় হাত দূরে দাঁড় করাইয়া নিজে আমার পিছনে দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল— "আয়নায় আমাকে দেখতে পাচ্ছ?"

"না।"

"বেশ। এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাও—এবার দেখতে পেলে?"

"না।"

"ব্যাস্—কাম ফতে। এখন শুধু একটি পোশাক পরতে বাকি আছে।"

"আবার কী?"

ঘরে ঢুকিয়াই লক্ষ করিয়াছিলাম, ব্যোমকেশের টেবিলের উপর দুটি চীনামাটির প্লেট রাখা আছে— হোটেলে যেরূপ আকৃতির প্লেটে মটন্ চপ খাইতে দেয়, সেইরূপ। সেই প্লেট একখানা ব্যোমকেশ আমার বুকের উপর উপুড় করিয়া চাপিয়া ধরিয়া চওড়া ন্যাকড়ার ফালি দিয়া শক্তভাবে বাঁধিয়া দিল। বলিল— "সাবধান, খসে না যায়। ওর ওপর কোট পরলেই আর কিছু দেখা যাবে না।"

আমি ঘোর বিস্ময়ে বলিলাম— "এ সব কী হচ্ছে?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল— "কঞ্চুকী না পরলে চলবে কেন। ভয় নেই, আমিও পরছি।"

দ্বিতীয় প্লেটখানা ব্যোমকেশ নিজের ওয়েস্টকোটের ভিতরে পরিয়া বোতাম লাগাইয়া দিল, বাঁধিবার প্রয়োজন হইল না।

এইরূপে বিচিত্র প্রসাধন শেষ করিয়া রাত্রি এগারটা কুড়ি মিনিটের সময় আমরা বাহির হইলাম। দেরাজ হইতে কয়েকটা জিনিস পকেটে পুরিতে পুরিতে ব্যোমকেশ বলিল— "চিঠি নিয়েছ? কি সর্বনাশ, নাও নাও, শীগ্গির একখানা সাদা খামের মধ্যে পুরে নাও—"

শিয়ালদহের মোড়ের উপর একটা খালি ট্যাক্সি পাইয়া তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। পথ জন-বিরল, দোকান-পাট প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের ট্যাক্সি নির্দেশমতো হু হু রিয়া চৌরঙ্গির দিকে ছুটিয়া চলিল।

কালীঘাট ও খিদিরপুরের ট্রাম-লাইন যেখানে বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই স্থানে ট্যাক্সি হইতে নামিলাম। ট্যাক্সি-চালক ভাড়া লইয়া হর্ন বাজাইয়া চলিয়া গেল। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, প্রশস্ত রাজপথের উপর কোথাও একটি লোক নাই, চতুর্দিকে অসংখ্য উজ্জ্বল দীপ যেন এই প্রাণহীন নিস্তব্ধতাকে ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছে। ঘড়িতে তখনও বারোটা বাজিতে দশ মিনিট বাকি।

কী করিতে হইবে, গাড়িতে বসিয়া পরামর্শ করিয়া লইয়াছিলাম। সুতরাং কথা বলিবার প্রয়োজন হইল না। আইম আগে আগে চলিলাম, ব্যোমকেশ ছায়ার মতো আমার পশ্চাতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার কালো পরিচ্ছদ ও শব্দহীন জুতা-আমার কাছেও যেন তাহাকে কায়াহীন করিয়া তুলিল। আমার পায়ের সঙ্গে পা মিলাইয়া সে আমার ঠিকছয় ইঞ্চি পশ্চাতে চলিয়াছে, তবু মনে হইল, যেন আমি একাকী। রাস্তার আলো অতি বিস্তৃত পথকে আলোকিত করিয়াছে বটে, কিন্তু সে আলো খুব স্পষ্ট ও তীব্র নহে। পথের দুই পাশে প্রসাদ থাকিলে আলো প্রতিফলিত হইয়া উজ্জ্বলতর হয়, এখানে তাহা হইতেছে না। দুই দিকের শূন্যতা যেন আলোর অর্ধেক তেজ গ্রাস কয়িা লইতেছে।

এই অবস্থায় সম্মুখ হইতে আসিয়া কাহারও সাধ্য নাই যে বুঝিতে পারে, আমি একা নহি, আমার পশ্চাতে আর একটি অন্ধকার মূর্তি নিঃশব্দে চলিয়াছে।

পাশের ট্রাম-লাইনে ট্রামের যাতায়াত বহু পূর্বে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এ দিকে রেসকোর্সের সাদা রেলিং একটানা ভাবে চলিয়াছে। আমি রাস্তার মাঝখান ধরিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। দূরে পশ্চাতে একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া মধ্যরাত্রি ঘোষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে শহরের অন্য ঘড়িগুলোও বাজিতে আরম্ভ করিল, মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা নানা প্রকার সুমিষ্ট শব্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

ঘড়ির শব্দ মিলইয়া যাইবার পর কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল— "এইবার চিঠিখানা হাতে নাও।"

ব্যোমকেশ যে পিছনে আছে, তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। চমকিয়া পকেট হইতে খামখানা বাহির করিয়া হাতে লইলাম।

আরও ছয় সাত মিনিট চলিলাম। খিদিরপুর পুল পৌঁছিতে তখনও প্রায় অর্ধেক পথ বাকি আছে, এমন সময় সম্মুখে বহু দূরে একটা ক্ষীণ আলোকবিন্দু দেখিয়া সচকিত হইয়া উঠিলাম। কানের কাছে শব্দ হইল— "আসছে—তৈরি থাকো।"

আলোকবিন্দু উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। মিনিট খানেকের মধ্যে দেখা গেল, পিচঢালা কালো রাস্তার উপর কৃষ্ণতর একটা বস্তু দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই বাইসিক্ল-আরোহীর মূর্তি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমি দাঁড়াইয়া পড়িয়া খামসমেত হাতখানা পাশের দিকে বাড়াইয়া দিলাম। সম্মুখে বাইসিক্লের গতিও মন্থর হইল।

রুদ্ধ-নিশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বাইসিক্ল পঁচিশ গজের মধ্যে আসিল; তখন দেখিতে পাইলাম, কালো স্যুটপরিহিত আরাহী সম্মুখে ঝুঁকিয়া মোটর-গগ্‌লের ভিতর দিয়ে আমাকে নিস্পলক দৃষ্টিতে দেখিতেছে।

মধ্যম-গতিতে বাইসিক্ল যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিল। আমাদের মধ্যে যখন আর দশ গজ মাত্র ব্যবধান, তখন কড়াং কড়াং করিয়া বাইসিক্লের ঘন্টি বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বুকে দারুণ ধাক্কা খাইয়া আমি প্রায় উল্টাইয়া পড়িয়া গেলাম। আমার বুকে বাঁধা প্লেটটা শত খণ্ডে ভাঙিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিলাম।

তারপর নিমেষের মধ্যে একটা কাণ্ড হইয়া গেল। আমি টলিয়া পড়িতেই ব্যোমকেশ বিদ্যুদ্বেগে সম্মুখদিকে লাফাইয়া পড়িল। বাইসিক্ল-আরোহী আমার পশ্চাতে আর একটা লোকের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, তবু সে পাশ কাটাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ব্যোমকেশ তাহাকে এক ঠেলায় বাইসিক্ল সমেত ফেলিয়া দিয়া বাঘের মতো তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল।

আমি মাটি হইতে উঠিয়া ব্যোমকেশে সাহায্যার্থে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সে প্রতিপক্ষের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে এবং দুই বজ্রমুষ্টিতে তাহার দুই কব্জি ধরিয়া আছে। বাইসিক্লখানা একধারে পড়িয়া আছে।

আমি পৌঁছিতেই ব্যোমকেশ বলিল— "অজিত, আমার পকেট থেকে সিল্কের দড়ি বার করে এর হাত দুটো বাঁধো—খুব জোরে।"

লিকলিকে সরু রেশমের দড়ি ব্যোমকেশের পকেট হইতে বাহির করিয়া ভূপতিত লোকটার হাত দুটো শক্ত করিয়া বাঁধিলাম। ব্যোমকেশ বলিল— "ব্যাস্ হয়েছে। অজিত, ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারছ না? ইনি আমাদের সকালবেলার বন্ধু প্রফুল্ল রায়। আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় যদি চাও, ইনিই গ্রামোফোন পিন রহস্যের মেঘনাদ!" বলিয়া তাহার চোখের গগ্‌ল্ খুলিয়া লইল।

অতঃপর আমার মনের অবস্থা কীরূপ হইল, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু সেই অবস্থাতে থাকিয়াও প্রফুল্ল রায় হিংস্র দন্তপংক্তি বাহির করিয়া হাসিল, বলিল— "ব্যোমকেশবাবু, এবার আমার বুকের উপর থেকে নেমে বসতে পারেন, আমি পালাব না।"

ব্যোমকেশ বলিল— "অজিত, এর পকেটগুলো ভালো করে দেখে নাও তো অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে কি না।"

এক পকেট হইতে অপেরা গ্লাস ও অন্য পকেট হইতে পানের ডিবা বাহির হইল, আর কিছুই নাই। ডিবা খুলিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে তখনও গোটা চারেক পান রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ বুকের উপর হইতে নামিলে প্রফুল্ল রায় উঠিয়া বসিল, ব্যোমকেশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল— "ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। কারণ আমি আপনার বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করেছিলাম। কিন্তু আপনি করেননি। শত্রুর শক্তিকে তুচ্ছ করতে নেই; এ শিক্ষা একটু দেরিতে পেলাম, কাজে লাগাবার পুরসত হবে না।" বলিয়া ক্লিষ্টভাবে হাসিল।

ব্যোমকেশ নিজের বুক-পকেট হইতে একটা পুলিশ হুইসেল বাহির করিয়া তাহাতে ফুঁ দিল, তারপর আমাকে বলিল— "অজিত, বাইসিক্লখানা তুলে সরিয়ে রাখো। কিন্তু সাবধান, ওর ঘন্টিতে হাত দিও না, বড়ো ভয়ানক জিনিস!"

প্রফুল্ল রায় হাসিল— "সবই জানেন দেখছি, আপনি অসাধারণ লোক। আপনাকেই ভয় ছিল, তাও তো আজ এই ফাঁদ পেতেছিলাম। ভেবেছিলাম, আপনি একলা আসবেন, নিভৃতে সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু আপনি সব দিক দিয়েই দাগা দিলেন। ভাল অভিনয় করতে পারি বলে আমার অহঙ্কার ছিল; কিন্তু আপনি আরও উচ্চশ্রেণীর আর্টিস্ট। আপনি আমার ছদ্মবেশ খুলে আমার মনটাকে উলঙ্গ করে আজ সকালবেলা দেখে নিয়েছিলেন আর আমি শুধু আপনার মুখোশটাই দেখেছিলাম!— যাক্, গলাটা বেজায় শুকিয়ে গেছে। একটু জল পাব কি।"

ব্যোমকেশ বলিল— "জল এখানে নেই, থানায় গিয়ে পাবেন।" প্রফুল্ল রায় ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল— "তাও তো বটে, জল এখানে পাওয়া যায় কোথা!" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পানের ডিবাটার দিকে একটা সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল— "একটা পান পেতে পারি না কি? অবশ্য আসামীকে পান খাওয়াবার রীতি নেই সে আমি জানি, কিন্তু পেলে তৃষ্ণাটা নিবারণ হত।"

ব্যোমকেশ আমাকে ইঙ্গিত করিল, আমি ডিবা হইতে দু'টা পান তাহার মুখে পুরিয়া দিলাম। পান চিবাইতে চিবাইতে প্রফুল্ল রায় বলিল— "ধন্যবাদ; বাকী দুটো আপনারা ইচ্ছা করলে খেতে পারেন।"

ব্যোমকেশ উৎকর্ণভাবে পুলিশের আগমন শব্দ শুনিতেছিল, অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়িল। দুরে মোটর-বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ প্রফুল্ল রায় বলিল— "পুলিশ তো এসে পড়ল। আমাকে তাহলে ছাড়বেন না?"

ব্যোমকেশ বলিল— "ছাড়ব কী রকম?"

প্রফুল্ল রায় ঘোলাটে রকম হাসিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল— "পুলিশে দেবেনই?"

"দেব বই কি!"

"ব্যোমকেশবাবু বুদ্ধিমান লোকেরও ভুল হয়। আপনি আমাকে পুলিশে দিতে পারবেন না—" বলিয়া রাস্তার উপর ঢলিয়া পড়িল।

একটা মোটর-বাইক সশব্দে আসিয়া পাশে থামিল, একজন ইউনিফর্ম-পরা সাহেব তাহার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বলিল— "What's up? dead?"

প্রফুল্ল রায় নিষ্প্রভ চক্ষু খুলিয়া বলিল— "এ যে খোদ কর্তা দেখছি! টু লেট সাহেব, আমায় ধরতে পারলে না। ব্যোমকেশবাবু, পানটা খেলে ভালো করতেন, একসঙ্গে যাওয়া যেত। আপনার মতো লোককে ফেলে যেতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে!" হাসিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া প্রফুল্ল রায় চক্ষু মুদিত। তাহার মুখখানা হঠাৎ শক্ত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে এক লরি পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কমিশনার সাহেব নিজে হাতকড়ি লইয়া অগ্রসর হইতেই ব্যোমকেশ প্রফুল্ল রায়ের মাথার কাছ হইতে উড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল— 'হাতকড়ার দরকার নেই। আসামি পালিয়েছে।"

আমি আর ব্যোমকেশ আমাদের চিরাভ্যস্ত বসিবার ঘরটিতে মুখোমুখি ঘোরে বসিয়াছিলাম। খোলা জানালা দিয়ে সকালবেলার আলো ও বাতাস ঘরে ঢুকিতেছিল। ব্যোমকেশ একটি বাইসিক্লের বেল্ হাতে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল। টেবিলের উপর একখানা খাম খোলা অবস্থায় পড়িয়াছিল।

ব্যোমকেশ ঘন্টির মাথাটা খুলিয়া ভিতরের যন্ত্রপাতি সপ্রশংসা নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল— "কি অদ্ভুত লোকটার মাথা। এ রকম একটা যন্ত্র তৈরিকরা যায়, এ কল্পনাও বোধ করি আজ পর্যন্ত কারুর মাথায় আসেনি। এই যে পাকানো স্প্রিং দেখছ, এটি হচ্ছে এই বন্দুকের বারুদ,— কি নিদারুণ শক্তি এই স্প্রিং-এর! কী ভয়ঙ্কর অথচ কী সহজ। এই ছোট্ট ফুটোটি হচ্ছে এর নল, —যে পথ দিয়ে গুলি বেরোয়। আর এই ঘোড়া টিপলে দু-কাজ একসঙ্গে হয়, ঘন্টিও বাজে, গুলিও বেরিয়ে যায়। ঘন্টির শব্দে স্প্রিং-এর আওয়াজ চাপা পড়ে। মনে আছে— সেদিন কথা হয়েছিল— শব্দে শব্দ ঢাকে গন্ধ ঢাকে কিসে? এই লোকটা যে কত বড়ো বুদ্ধিমান, সেইদিন তার ইঙ্গিত পেয়েছিলুম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "আচ্ছা, পথের কাঁটা আর গ্রামাফোন পিন যে একই লোক, এ তুমি বুঝলে কিকরে?"

ব্যোমকেশ বলিল— "প্রথমটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু ক্রমশ যেন নিজের অজ্ঞাতসারে ও দুটো মিলে এক হয়ে গেল। দেখ, পথের কাঁটা কি বলছে? সে খুব পরিষ্কার করেই বলছে যে, যদি তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে কোনও প্রতিবন্ধক থাকে তো সে তা দূর করে দেবে— অবশ্য কাঞ্চন বিনিময়ে। পারিশ্রমিকের কথাটা স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও, এটা যে তার অনাহারী পরিহিতৈষা নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। তারপর এ দিকে দেখ, যাঁরা গ্রামাফোন পিনের ঘায়ে মরেছেন, তাঁরা সকলেই কারুর না কারুর সুখের পথে কাঁটা হয়ে বেঁচেছিলেন। আমি মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজনের ওপর কোনও ইঙ্গিত করতে চাই না, কারণ যে-কথা প্রমাণ করা যাবে না, সে কথা বলে কোনও লাভ

নেই। কিন্তু এটাও লক্ষ না করে থকা যায় না, মৃত ব্যক্তিরা সকলেই অপুত্রক ছিলেন, তাঁদের উত্তরাধিকারী কোনও ক্ষেত্রে ভাগ্নে, কোনও ক্ষেত্রে ভাইপো, কোনও ক্ষেত্রে বা জামাই। আশুবাবু এবং তাঁর রক্ষিতার উপাখ্যান থেকে এই ভাইপো-ভাগ্নে-জামাইদের মনোভাব কতক বোঝা যায় না কি?

"তবেই দেখা যাচ্ছে, পথের কাঁটা আর গ্রামাফোন পিন বাইরে পৃথক হলেও বেশ স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে জোড় লেগে যাচ্ছে—ভাঙা পাথর বাটির দুটো অংশ যেমন সহজ জোড় লেগে যায়। আর একটা জিনিস প্রথম থেকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল— একটার নামের সঙ্গে অন্যটার কাজের সাদৃশ্য। এদিকে 'পথের কাঁটা' নাম দিয়ে বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে আর ওদিকে পথের ওপর কাঁটার মতই একটা পদার্থ দিয়ে মানুষকে খুন করা হচ্ছে। মিলটা সহজেই চোখে পড়ে না কি?"

আমি বলিলাম— "হয়তো পড়ে, কিন্তু আমার পড়েনি।"

ব্যোমকেশ অধীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল— 'এ সব তো খুব সহজ অনুমানের বিষয়। আশুবাবুর কেস হাতে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এগুলো আমারকাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। আসল সমস্যা দাঁড়িয়েছিল— লোকটা কে? এইখানেই প্রফুল্ল রায়ের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রফুল্ল রায়কে যারা টাকা দিয়েছে খুন করবার জন্যে, তারাও জানতে পারেনি, লোকটা কে এবং কি করে সে খুন করে। আত্মগোপন করবার অসাধারণ ক্ষমতাই ছিল তার প্রধান বর্ম। আমি তাকে কস্মিকালেও ধরতে পারতুম কি না জানি না, যদি না সে আমার মন বোঝবার জন্যে সেদিন নিজে এসে হাজির হত।

"কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। তুমি যেদিন পথের কাঁটার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়িয়েছিলে, সেদিন তোমার ভাবভঙ্গি দেখে তার সন্দেহ হয়। তবু সে তোমকে চিঠি গছিয়ে দিয়ে গেল, তারপর অলক্ষে তোমায় অনুসরণ করল। তুমি যখন এই বাড়িতে এসে উঠলে তখন তার আর সন্দেহ রইল না যে, তুমি আমারই দূত। আশুবাবুর কেস আমার হাতে এসেছে, তা সে জানত, কাজেই তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, আমি অনেক কথাই জানতে পেরেছি। অন্য লোক হলে কি করত বলা যায় না— হয়তো এ কাজ ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যেত; কিন্তু প্রফুল্ল রায়ের অসীম দুঃসাহস— সে আমার মন বুঝতে এল। অর্থাৎ আমি কতটা জানি এবং পথের কাঁটা সম্বন্ধে কি করতে চাই, তাই জানে এল। এতে তার বিপদের কোনো আশঙ্কা ছিল না, কারণ প্রফুল্ল রায়ই যে পথর কাঁটা এবং গ্রামাফোন-পিন, তা জানা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং জানলেও তা প্রমাণ করতে পারতুম না। —শুধু একটি ভুল প্রফুল্ল রায় করেছিল।"

"কি ভুল?"

"সেদিন সকালে আমি যে তারই পথ চেয়ে বসেছিলুম, এটা সে বুঝতে পারেনি। সে যে খোঁজ-খবর নিতে আসবেই, এ আমি জানতুম।"

"তুমি জানতে। তবে আসবামাত্র তাকে গ্রেপ্তার করলে না কেন?"

"কথাটা নেহাৎ ইয়ের মতো বললে, অজিত। তখন তাকে গ্রেপ্তার করলে মানহানির মোকদ্দমায় খেসারৎ দেওয়া ছাড়া আর কোনও লাভ হত না। সে যে খুনী আগামি, তার প্রমাণ কিছু ছিল কি? তাকে ধরার একমাত্র উপায় ছিল— যাকে বলে *in the act*, রক্তাক্ত হস্তে। আর সেই চেষ্টাই আমি করেছিলুম। বুকে প্লেট বেঁধে দু-জনে যে গিয়েছিলুম, সে কি মিছিমিছি?

"যা হোক, প্রফুল্ল রায় আমার সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলে যে, আমি অনেক কথাই জানি— শুধু বুঝতে পারলে না

যে তাকেও চিনতে পেরেছি। সে মনে মনে ঠিক করলে যে, আমার বেঁচে থাকা আর নিরাপদ নয়। তাই সে আমাকে একরকম নিমন্ত্রণ করে গেল— যেন রাত্রে রেসকোর্সের পাশের পথ দিয়ে যাই। সে জানত, একবার তোমাকে পাঠিয়ে ঠকেছি, এবার আমি নিজে যাব। কিন্তু একটা বিষয়ে তার খটকা লাগল, আমি যদি পুলিশ সঙ্গে নিয়ে যাই! তাই সে পুলিশের প্রসঙ্গ তুললে। কিন্তু পুলিশের নামে আমি এমনি চটে উঠলুম যে, প্রফুল্ল রায় খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল; আমাকে মনে মনে খরচের খাতায় লিখে রাখলে।

"বেচারা ওই একটা ভুল করে সব মাটি করে ফেললে। শেষকালে তার অনুতাপও হয়েছিল। আমার বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করা যে তার উচিত হয়নি, এ কথা সেদিন সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিল।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল— "তোমার মনে আছে, প্রথম যেদিন আশুবাবু আসেন, সেদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বুকে ধাক্কা লাগবার সময় কোনও শব্দ শুনেছিলেন কি না? তিনি বলেছিলেন, বাইসিক্লের ঘণ্টির আওয়াজ শুনেছিলেন। তখন সেটা গ্রাহ্য করিনি। আমার হাওড়া ব্রিজের ঐখানটাই জোড়া লাগছিল না। তারপর 'পথের কাঁটা'র চিঠি যখন পড়লুম এক নিমেষে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলুম— চিঠিতে একটি কথা পেয়েছি। সে কথাটি কিজানো— বাইসিক্ল।

"বাইসিক্লের কথা কেন যে ততক্ষন পর্যন্ত মাথায় ঢোকেনি, এটাই আশ্চর্য। বাস্তবিক, এখন ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে, বাইসিক্ল ছাড়া আর কিছুই হতে পারত না। এমন সহজে অনাড়ম্বরভাবে খুন করবার আর দ্বিতীয় উপায় নেই। তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, সামনে একটা বাইসিক্ল পড়ল। বাইসিক্ল-আরোহী তোমাকে সরে যাবার জন্যে ঘণ্টি দিয়েই পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তুমিও মাটিতে পড়ে পটলোৎপাদন করলে। বাইসিক্ল-আরোহীকে কেউ সন্দেহ করতে পারে না। কারণ, সে দু-হাত হ্যান্ডেল ধরে আছে— অস্ত্র ছুঁড়বে কি করে? তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

"একবার পুলিস ভারি বুদ্ধি খেলিয়েছিল, তোমার মনে থাকতে পারে। গ্রামোফোন পিনের শেষ শিকার কেদার নন্দী লালবাজারের মোড়ের উপর মরেছিলেন। তিনি পড়বামাত্র পুলিশ সমস্ত ট্রাফিক বন্ধ করে দিয়ে প্রত্যেক লোকের কাপড়-চোপড় পর্যন্ত অনুসন্ধান করে দেখছিল। কিন্তু কিছুই পেলে না। আমার বিশ্বাস, প্রফুল্ল রায়ও সেখানে ছিল এবং তাকেও যথারীতি সার্চ করা হয়েছিল। প্রফুল্ল রায় তখন মনে মনে খুব হেসেছিল নিশ্চয়। কারণ, তার বাইসিক্ল বেল্-এর মাথা খুলে দেখবার কথা কোনও পুলিস-দারোগার মাথায় আসেনি।" বলিয়া ব্যোমকেশ সস্নেহে বেলটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

টেবিলের উপর হইতে সরকারি লম্বা খামখানা হাওয়ায় উড়িয়া আমার পায়ের কাছে পড়িল। সেখানা তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "পুলিস কমিশনার সাহেব কি লিখেছেন?"

ব্যোমকেশ বলিল— "অনেক কথা। গোড়াতেই আমাকে পুলিশ এবং সরকার বাহাদুরের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিয়েছেন; তারপর প্রফুল্ল রায় আত্মহত্যা করাতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন; যদিও এতে তাঁর খুশি হওয়াই উচিত ছিল— কারণ, গভর্নমেন্টের অনেক খরচ এবং মেহনত বেঁচে গেল। যা হোক, সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার যে আমি শীঘ্রই পাব, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, পুলিশ সাহেব জানিয়েছেন যে, দরখাস্ত করবামাত্র আমার আর্জি মঞ্জুর হবে, তার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। প্রফুল্ল রায়ের লাশ কেউ শনাক্ত করতে পারেনি, জুয়েল ইন্সিওরেন্স কোম্পানির লোকেরা লাশ দেখে বলেছে যে, এ তাদের প্রফুল্ল রায় নয়, তাদের প্রফুল্ল রায় উপস্থিত কর্ম উপলক্ষ্যে যশোহরে আছেন। সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, প্রফুল্ল রায় নামটা ছদ্মনাম। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, আমার কাছে ও চিরকাল প্রফুল্ল রায়ই থাকবে। চিঠির উপসংহারে পুলিশ সাহেব একটা নিদারুণ কথা লিখেছেন— এই ঘণ্টিটা ফেরৎ দিতে হবে। এটা না কি এখন গভর্নমেন্টের সম্পত্তি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম— "ওটার ওপর তোমার ভারি মায়া পড়ে গেছে— না? কিছুতেই ছাড়তে পারছ না?"

ব্যোমকেশও হাসিয়া ফেলিল— "সত্যি, দু'হাজার টাকা পুরস্কারের বদলে সরকার বাহাদুর যদি আমাকে এই ঘন্টিটা বকশিস করেন, আমি মোটেই দুঃখিত হই না। যা হোক, প্রফুল্ল রায়ের একটা স্মৃতিচিহ্ন তবু আমার কাছে রইল।"

"কী?"

"ভুলে গেলে? সেই দশ টাকার নোটখানা। সেটাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবো ভেবেছি। তার দাম এখন আমার কাছে একশো' টাকারও বেশি।" বলিয়া ব্যোমকেশ ঘন্টিটা সযত্নে দেরাজের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিল।

সে ফিরিয়া আসিলে আমি তাহাকে একটা প্রশ্ন করিলাম— "আচ্ছা ব্যোমকেশ, সত্যি বল, পানের মধ্যে বিষ আছে তুমি জানতে?"

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল— "জানা এবং না জানার মাঝখানে একটা অনিশ্চিত স্থান আছে, সেটা সম্ভাবনার রাজ্য।" কিছুক্ষণ পরে আবার বলিয়া উঠিল— "তুমি কি মনে কর প্রফুল্ল রায় যদি সামান্য খুনীর মতো ফাঁসি যেত তাহলে ভালো হত? আমার তা মনে হয় না। বরং এমনিভাবে যাওয়াই তার ঠিক হয়েছে, সে যে কতবড়ো আর্টিস্ট ছিল, ধরা পড়েও হাত পা বাঁধা অবস্থায় সে তা দেখিয়ে দিয়ে গেছে।"

স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি কোথা দিয়া যে কোথায় গিয়া পৌঁছাতে পারে তাহা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

"চিঠি হ্যায়।"

ডাক-পিয়ন একখানা রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়া গেল। ব্যোমকেশ খাম খুলিয়া ভিতর হইতে কেবল একখানা রঙিন কাগজের টুকরো বাহির করিল, তাহার উপর একবার চোখ বুলাইয়া সহাস্যে আমার দিকে বাড়াইয়া দিল।

দেখিলাম, শ্রী আশুতোষ মিত্রের দস্তখৎ-সম্বলিত একখানি হাজার টাকার চেক।

১৩.২ গোয়েন্দাসাহিত্যে শরদিন্দুর অবস্থান

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ভারতে গোয়েন্দাকাহিনির প্রচলন। প্রথমে ইংরেজি থেকে বাংলা ও পরে বাংলা থেকে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে সেই গোয়েন্দাকাহিনির পথ চলা। এখানে বলে রাখা ভাল, বিদেশি গোয়েন্দাকাহিনিগুলি যখন অনূদিত হতে শুরু করে, তখন স্থান ও চরিত্র-নামের পাশাপাশি পোশাক-পরিচ্ছদও বদলে দিয়ে তাদের ভারতীয় পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা হত। এককথায় বলতে গেলে, গোয়েন্দাকাহিনি অনেকটা 'তৈরি সাহিত্য' বা 'Readymade literature' হিসেবেই ইউরোপ থেকে এদেশে আসে। তাই G.W.M. Reynolds-এর 'Mysteries of London' ও 'Mysteries of the Court of London' এতই খ্যাতি পায় যে, ভারতে মোট চারটি ভাষায় তা অনূদিত হয়েছিল। গোয়েন্দাকাহিনির এই প্রচলন বহু প্রকাশনা সংস্থার জন্ম দেয়। মনে রাখতে হবে, ১৮৫১ সালে বাংলায় ততদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে স্বদেশীয় সাহিত্য সমাজ বা Vernacular Literature Society। জনপ্রিয় ইংরেজি বইগুলির পাঠযোগ্য বঙ্গানুবাদের প্রকাশই ছিল তার মূল লক্ষ্য। ১৮৮৩-তে রেনল্ডসের ওই দুটি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের কারণেই প্রকাশিত হয় 'প্রবাহিণী' পত্রিকা। সেখানে উল্লেখই করে দেওয়া হয় যে, বইগুলির অন্তর্গত বিভিন্ন চরিত্রের নাম ও সেইসঙ্গে তাদের চরিত্রও 'ভারতীয়' করে তোলা হবে।

গোয়েন্দাকাহিনি ও ক্রাইমকাহিনি—এই দুই কিন্তু এক নয়। গোয়েন্দাকাহিনি মাত্রেই একধরনের ক্রাইমকাহিনি বটে; কিন্তু ক্রাইমকাহিনি এক ও অদ্বিতীয় অর্থে যে গোয়েন্দাকাহিনিকেই নির্দেশ করে, এমন নয়। কেন নয়? কারণ, ক্রাইমকাহিনি নামক বিষয়ের আওতায় প্রধানত চার প্রকার গল্প-উপন্যাসের সন্ধান মেলে। প্রথম জাতের কাহিনি অবশ্যই গোয়েন্দাকাহিনি বা ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাস—যেখানে মূল চরিত্র কোনও পেশাদার বা অপেশাদার কিংবা সখের গোয়েন্দা, যিনি কখনও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে, কখনও কারও অনুরোধে বা কারও দ্বারা নিযুক্ত হয়ে কোনও রহস্য বা অপরাধের কিনারা করেন। পুলিশকাহিনি হল দ্বিতীয় জাতের ক্রাইমকাহিনি। এগুলি মূলত গোয়েন্দাকাহিনি হলেও তদন্তকারী চরিত্রটি কোনও পুলিসকর্মী—সাধারণত গোয়েন্দা বিভাগের কোনও কর্মচারী। বাংলা গোয়েন্দাকাহিনির আদিযুগে প্রকাশিত বরকউল্লার 'বাঁকাউল্লার দপ্তর', প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর' কিংবা গিরিশচন্দ্র বসুর 'সেকালের দারোগার কাহিনি' এই গোত্রভুক্ত। ক্রাইমকাহিনির প্রকারভেদে তৃতীয় যে ধারাটি আসে, তা হল 'স্পাই' বা গুপ্তচর বিষয়ক গল্প-উপন্যাস। এই ধরনের গল্পে রহস্য-সমাধান সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর বদলে থাকে গল্পের নায়ক, স্বদেশী গুপ্তচরের বিদেশি চক্রান্ত ভেঙে দেওয়ার চমকপ্রদ কাহিনি। বাংলায় চাণক্য সেন ছদ্মনামে ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এই ধরনের কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছেন। ক্রাইমকাহিনির শেষ ধারাটি হল থ্রিলার বা রোমাঞ্চকর কাহিনি। রহস্যভেদের বিষয়টি এই ধরনের কাহিনির প্রধান উপজীব্য নয়। কোনও অভিযান বা অ্যাডভেঞ্চারই সেখানে মুখ্য। ঋজু বোস বা ঋজুদাকে কেন্দ্র করে বুদ্ধদেব গুহ-র লেখা কিশোরপাঠ্য কাহিনিগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'পাতায় পাতায় শিহরণ, ছত্রে ছত্রে রোমহর্ষ' সংবলিত গল্প-উপন্যাসও এর আওতায় পড়ে। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হরিদাসের গুপ্তকথা' দেশি-বিলিতি নানা কেচ্ছা ও অপরাধের সংমিশ্রণে একসময় বটতলার বইবাজারকে সরগরম করে রেখেছিল। এর অনুকরণেই কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'হরিদাসীর গুপ্তকথা'। আর, কিশোরদের জন্য লেখা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির মুখ্য চরিত্র কাকাবাবু ওরফে রাজা রায়চৌধুরীকে কে না জানেন। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার গল্পেও লালমোহন গাঙ্গুলি 'সাহারায় শিহরণ'-এর মতো জনপ্রিয় রোমহর্ষক কাহিনি লিখতেন।

ক্রাইমকাহিনির প্রথম ও দ্বিতীয় ধারাটির সংযোগে বাংলায় অন্য এক ধরনের কাহিনির জন্ম হয়েছিল। কীরকম? প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় 'দারোগার দপ্তর'-এর অনুসরণে শরচ্চন্দ্র দেব (সরকার) প্রকাশ করেন 'গোয়েন্দাকাহিনি' পুস্তকমালা। এই মাসিক পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল ছিল চার বছর—১৮৯৪ থেকে ১৮৮৯ পর্যন্ত। পত্রিকাটির সব সংখ্যাই প্রকাশিত হত 'শ্রী শরচ্চন্দ্র সরকার সঙ্কলিত' বলে। তবে লেখক ছিলেন অনেকে। স্বয়ং শরচ্চন্দ্র তো ছিলেনই। পাশাপাশি ছিলেন পাঁচকড়ি দে, ধীরেন্দ্রনাথ পাল, মণীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ। এই 'দারোগার দপ্তর' ও 'গোয়েন্দাকাহিনী' নাম দুটির সমন্বয়ে একটি সিরিজের জন্ম হয়—নাম ছিল 'গোয়েন্দার দপ্তর'। সেই পত্রিকায় পাঁচকড়ি দে-র 'জুমেলিয়া' উপন্যাসের তিন-চার ফার্মা বেরোয়। এরপর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে ১৮৯৯ সালের এপ্রিল-মে মাসে সম্পূর্ণ বইটি 'মায়াবিনী' নামে প্রকাশিত হয়। 'মায়াবিনী'তেই প্রথম দেখা দেন পাঁচকড়ি দে-সৃষ্ট ডিটেকটিভ দেবেন্দ্রবিজয়।

বাংলা ক্রাইমকাহিনির অন্তর্ভুক্ত প্রথম ধারায় অর্থাৎ গোয়েন্দাকাহিনির ধারায় আছে পাঁচকড়ি দে-র মতো অম্বিকাচরণ গুপ্তর ডিটেকটিভ পত্রিকা 'গোয়েন্দা গল্প' (১৩১৫), দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'রহস্যলহরী সিরিজ', উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'নন্দন-কানন-সিরিজি', ডিটেকটিভ প্রতুল লাহিড়িকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লেখকের গোয়েন্দাকাহিনি-সমন্বিত মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সাপ্তাহিকী 'রোমাঞ্চ' পত্রিকা, বিশ শতকের চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি বিখ্যাত অর্থ-পুস্তক প্রকাশক আশুতোষ দেব অ্যান্ড সন্স-এর নাম পরিবর্তনে-গড়ে-ওঠা দেব সাহিত্য কুটির প্রকাশিত 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'প্রহেলিকা' সিরিজের গোয়েন্দাকাহিনি, প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর মহিলা গোয়েন্দা কৃষ্ণা, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের জয়ন্ত-মানিক

জুটির কাহিনি, নীহাররঞ্জন গুপ্তর কিরীটি রায় বা সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা।

বাংলা সাহিত্যে বেশিরভাগ গোয়েন্দা চরিত্রেরই আবির্ভাব ঘটেছে ১৯৩০-এর দশক থেকে '৮০-র দশকের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত একাধিক ক্রাইম পত্রিকার হাত ধরে। এই পত্রিকাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল 'মাসিক রোমাঞ্চ', 'মাসিক গোয়েন্দা', 'মাসিক রহস্য পত্রিকা' ইত্যাদি। তাছাড়াও ছিল 'তদন্ত', 'কুয়াশা', 'ক্রাইম', 'অপরাধ', 'শেষ সংকেত', 'মাসিক ক্রিমিনাল', 'রহস্যমালা', 'তদন্তরহস্য', 'রহস্য সন্ধানী' প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী বা স্বল্পস্থায়ী পত্রিকা। আশির দশকের শেষ ও বিশেষত নব্বইয়ের দশক থেকে দূরদর্শনের কারণে পত্রিকাগুলি তাদের পাঠক হারিয়ে ফেলে। ফলে এই জাতীয় পত্রিকার প্রকাশনা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে জায়গা করে নেয় বিবিধ 'soap-serials'। বাকি যা পড়ে থাকে, সেগুলো অত্যাধিক যৌনতা বিষয়ক পত্রিকা ছাড়া আর কিছু নয়।

বাংলা গোয়েন্দাসাহিত্যের এই ধারায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যোমকেশ বক্সীকে কেন্দ্র করে তাঁর কাহিনি সংখ্যা মোট সাড়ে বত্রিশ। শেষেরটি ('বিশুপাল বধ') অসম্পূর্ণ। এই কাহিনিগুলির মধ্যে দিয়ে ব্যোমকেশ, শরদিন্দুর লেখা বিশেষ গল্প-নিরপেক্ষ একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। সে যেন পাঠকের মনে 'সত্য' থেকে 'অধিকত্তর সত্য' হয়ে, একজন জ্যান্ত মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রাক্-ব্যোমকেশ গোয়েন্দা সাহিত্যের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখব, সেখানে এই জ্যান্ত হয়ে ওঠার ব্যাপারটাই নেই। সেইসব গোয়েন্দারা সকলেই ঔপনিবেশিক বাংলায় বিদেশি গোয়েন্দা চরিত্রের প্রক্ষেপ (adaptation)। তাই পাঁচকড়ি দে-র দেবেন্দ্রবিজয় বা দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রবার্ট ব্লেকের জীবন আমাদের মনে কোনো কৌতূহল জাগায় না। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্রচোর' গল্পে অজিত যখন খুনির নাম জানতে চেয়ে ব্যোমকেশকে জিগ্যেস করে, 'হত্যাকারী কে?' তখন ব্যোমকেশের উত্তর ছিল 'পাঁচকড়ি দে'। এই উত্তর পাঁচকড়ি দে-র 'হত্যাকারী কে?' বইকেই শুধু ব্যঙ্গ করে তাই নয়, এর মধ্যে প্রাক্-ব্যোমকেশ গোয়েন্দা চরিত্রের পাশাপাশি ব্যোমকেশ-পূর্ব গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রতি একটা তাচ্ছিল্যও আমাদের নজর এড়ায় না। ব্যোমকেশের এই পাঠ বা reading থেকে বোঝা যায়, সে নিজে কতখানি দেশজ চরিত্র। তাই ব্যোমকেশের জীবন আজ একটা পরম কৌতূহলের বিষয়। সাহিত্যের পাতা বা টেক্সট্ থেকে বেরিয়ে সে পাঠকের হৃদয়ে গড়ে উঠেছে। তাই বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে ব্যোমকেশের জুড়ি মেলা ভার।

১৩.৩ 'পথের কাঁটা', নাকি গ্রামোফোন পিন হত্যারহস্য?

ব্যোমকেশকেন্দ্রিক বেশিরভাগ কাহিনি-ই লিপিবদ্ধ করেছে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে 'রুম নম্বর দুই' থেকে সেই দায়িত্ব নিয়েছেন সর্বজ্ঞ কথক। কাহিনিগুলো খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে, গল্পগুলো আসলে ব্যোমকেশের জীবনের এক-একটা কেস। মূল ঘটনা ঘটার অনেক পরে সেগুলি লেখা হয়েছে। কিন্তু ব্যোমকেশের জীবনে তো সেগুলো গল্প হিসেবে আসেনি—এসেছে কেস হিসেবে। এইখানে জানিয়ে রাখা ভালো, গল্পসংখ্যা তেত্রিশ হলেও কেসের সংখ্যা মোট একচল্লিশ। কারণ অজিতের লেখা অনেক গল্পে ব্যোমকেশের এমন কিছু কেসের শুধু উল্লেখ পাওয়া যায়—যে-কেসগুলো পরবর্তীকালে অজিত, বা সর্বজ্ঞ কথকের লিখনে আর রূপ পায়নি। যেমন, ব্যোমকেশের সত্যান্বেষী-জীবনের একেবারে গোড়ায় আমীর খাঁ-র কেস কিংবা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ডাকে ১৯৪৭-এর জানুয়ারি থেকে জুলাই—এই সাত মাস ধরে দিল্লিতে ব্যোমকেশকে ব্যস্ত-রাখা কোনো-এক গোপন কেস—সেই সমস্ত ধরেই কেসসংখ্যা মোট একচল্লিশ। তাই, কেসের দিক থেকে বিচার করলে, অজিত-লিখিত 'পথের কাঁটা' কাহিনিকে আসলে ব্যোমকেশের জীবনে গ্রামোফোন পিন হত্যার রহস্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

১৩.৪ ‘পথের কাঁটা’র লিখনকাল, পত্রিকাপ্রকাশ এবং গ্রামোফোন পিন হত্যার রহস্যের ঘটনাকাল

শোভন বসুর ‘ব্যোমকেশের কথা’ থেকে জানা যায়, শরদিন্দু তাঁর ব্যক্তিগত ডায়ারিতে ‘পথের কাঁটা’র রচনা-সমাপ্তিকাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন ৭ আষাঢ়, ১৩৩৯। এই কাহিনি ‘সচিত্র মাসিক বসুমতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল মাঘ, ১৩৩৯ সালে। রচনাকাল অনুসারে ব্যোমকেশ-সিরিজের প্রথম কাহিনি ‘পথের কাঁটা’। তারপর ‘সীমন্ত-হীরা’ (৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯)। শরদিন্দুর নিজের কথায়, ‘এই দুটি গল্প লেখার পর ব্যোমকেশকে নিয়ে একটি সিরিজ লেখার কথা মনে হয়। তখন ‘সত্যান্বেষী’ গল্পে (২৪ মাঘ ১৩৩৯) ব্যোমকেশ চরিত্রটিকে এসট্যাবলিস করি। পাঠকদের সুবিধার জন্য অবশ্য ‘সত্যান্বেষী’কেই ব্যোমকেশের প্রথম গল্প বলে ধরা হয়।’

গ্রামোফোন পিন হত্যারহস্যের সময়কাল কত? প্রফুল্ল রায় অজিতকে যে-চিঠি দিয়েছিল, তাতে লেখা ছিল ‘রবিবার ১০ই মার্চ’ রাত বারোটায় সাইকেল আরোহীর সঙ্গে মোলাকাতের কথা। আর, প্রফুল্ল রায় নিজে এসে ব্যোমকেশকে যে-চিঠি দেখায়, সেখানে উল্লেখ ছিল ‘সোমবার ১১ই মার্চ’-এর কথা। এখন, ‘পথের কাঁটা’ লেখা শেষ হচ্ছে ৭ আষাঢ়, ১৩৩৯। মানে ইংরিজি সালের হিসেবে ১৯৩২। আর, ‘সত্যান্বেষী’ বা অশ্বিনী মার্ডার কেসের ঘটনাকাল ১৯২৫-এর এপ্রিল। কারণ, ‘সত্যান্বেষী’র গোড়াতেই অজিত লিখেছে, ‘সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল সন তেরশ’ একত্রিশ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো শেষ করিয়া সবেমাত্র বাহির হইয়াছি।’ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বলতে তখন বোঝানো হত ব্যাচেলর ডিগ্রি। শ্রী বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘স্মৃতিকথা’ (প্রথম খণ্ড, বিদ্যাসাগর বুক স্টল, ১৩৫৬, পৃ. ৪৬৯—৪৭১)-য় নিজের ভাই বিনয় প্রসঙ্গে লিখছেন, ‘১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বি.এ পরীক্ষা দিবার জন্য বিনয় প্রস্তুত হইতেছিল, এবং ৩রা জানুয়ারি তারিখে তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া হয়। কয়েক দিবসব্যাপী পরীক্ষার পর তাহার পরীক্ষা শেষ হইল।’

এখন, মার্চে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ হয়, আর ১৩৩১-এ অজিতের সঙ্গে দেখা হয় ব্যোমকেশের, তাহলে ইংরেজি হিসেবে ব্যোমকেশ-অজিতের দেখা হচ্ছে ১৯২৫-এ। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, ১৯২৫-এর এপ্রিলের গোড়ায়। কারণ, ১৫ এপ্রিল হলেই বাংলা সনটি ১৩৩২ হয়ে যাবে। কাজেই গ্রামোফোন পিন মার্ডার কেসের সময়কাল ১৯২৫ থেকে ১৯৩২-এর মধ্যবর্তী কোনো সময়ে—যে-বছর ১০ ও ১১ মার্চ যথাক্রমে রবি ও সোমবার ছিল। "Whitaker's Almanack 2006" (By Whitaker Joseph, Chapter—'Time Measurement and Calenders' A & C Black Ltd, London, 2005, P.1298-1299) বলছে, ১৯২৯-এর ইংরিজি বর্ষপঞ্জিতে ১০ ও ১১ মার্চ যথাক্রমে রবি ও সোমবার ছিল। তাই অনুমান, গ্রামোফেন পিন মার্ডার কেসের সময়কাল ১৯২৯।

১৩.৫ কাহিনির বিশ্লেষণী পাঠ

‘সত্যান্বেষী’ বা অশ্বিনী হত্যারহস্যের পর চীনেপাড়ার মেসবাড়ি থেকে হ্যারিসন রোডের তেতলায় নিজের বাড়িতে পাকাপাকিভাবে অজিতকে নিয়ে আসে ব্যোমকেশ। শুরু হয় ব্যোমকেশ-অজিতের একত্রযাপন।

একসঙ্গে থাকতে থাকতে অজিতের সূত্রে ব্যোমকেশের স্বভাবের খুঁটিনাটি আস্তে আস্তে ধরা পড়ে আমাদের কাছে। যেমন, বাইরে থেকে তাকে দেখে বা তার কথা শুনে একবারও মনে হয় না যে, তার মধ্যে অসামান্য কিছু আছে।

কিন্তু তাকে খোঁচা দিয়ে, প্রতিবাদ করে একটু উত্তেজিত করে দিতে পারলেই ভেতরের মানুষটি কচ্ছপের মত বাইরে বেরিয়ে আসে। তখন তার সংকোচ ও সংযমের পর্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ে ছুরির মত শানিত ঝক্‌ঝকে বুদ্ধি। আর, তখন তার কথাবার্তা সত্যিই শোনার মত। তবে, নেহাত তাকে বাধ্য না করলে 'স্বভাবত স্বল্পভাষী' ব্যোমকেশের ওই বিশেষ স্বভাবের প্রকাশ ঘটত না।

অজিত আসার পর ব্যোমকেশের নিত্য রুটিন হয়ে দাঁড়ায় সকালের চা-জলখাবার শেষে ভাগাভাগিতে কাগজ পড়া। যথারীতি ব্যোমকেশ ঘুরে বেড়াতে থাকে বিজ্ঞাপনের অন্দরমহলে। বাইরের মোটাদাগের খবরে তার বিশেষ উৎসাহ নেই। তাই, ১৯২৭-২৮-২৯ জুড়ে মাঞ্চুরিয়াসহ চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন অত্যন্ত ভয়াবহ, মাঞ্চুরিয়াকে কেন্দ্র করে চীন ও জাপানের মধ্যে আসন্ন সংগ্রামের বাতাবরণ, তখন ব্যোমকেশের কটাক্ষ, '...মাঞ্চুরিয়ায় কার আঙুল কেটে গিয়ে রক্তপাত হয়েছে... এই পড়। দরকারি খবর যদি পেতে চাও তো বিজ্ঞাপন পড়তে হবে। রয়টারের টেলিগ্রামে ওসব পাওয়া যায় না।'

হঠাৎ কেন রয়টারের প্রসঙ্গ তোলে ব্যোমকেশ? কারণ, ১৯২৭—'২৮-'২৯ জুড়ে মাঞ্চুরিয়াসহ চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। মাঞ্চুরিয়ায় তখন দস্যুদলের আড্ডা। ডাকাত সর্দার চাংসোলিন সেখানকার সর্বময় কর্তা। মাঞ্চুরিয়া চীনেরই অংশ। কিন্তু জাপান চীন গভর্নমেন্টকে চরমপত্র দিয়ে জানায় যে, মাঞ্চুরিয়ায় যদি ন্যাশনালিস্ট চীন চাংসোলিনের দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তাহলে জাপান সশস্ত্র হয়ে তাদের বাধা দেবে। ''বোস্টনের 'গ্লোবপত্র' বলিয়াছেন—'মাঞ্চুরিয়া লইয়া শেষে কি জাপানে ও চীনে সংঘর্ষ বাধিবে? আজ ৩ মাস হইতে উভয়ের মধ্যে এই মাঞ্চুরিয়ার সম্পর্কে অত্যন্ত মন কসাকসি চলিতেছে।'' ('স্বাধীন চীন', 'সচিত্র মাসিক বসুমতী', শ্রাবণ ১৩৩৫, পৃ. ৬৭৬)। আর, 'চীনের জাতীয় দলের জয়যাত্রা' শিরোনামে 'সচিত্র মাসিক বসুমতী'র (কার্তিক ১৩৩৪, পৃ. ১৬৪) মন্তব্য, '...যখন চীনের ঘরোয়া যুদ্ধ পাকিয়া উঠে এবং চাংসোলিনের দস্যুদল প্রবল হয়, তখন রয়টার চীনের খবরে ভারত ভরাইয়া ফেলেন। ইহা বিলাতী সাম্রাজ্যবাদীর প্রচারকার্য্যের একটি নমুনা।' হয়তো সেই কারণেই রয়টারের প্রসঙ্গ তোলে ব্যোমকেশ।

'দৈনিক কালকেতু'র বিজ্ঞাপনে-ডুবে-থাকা ব্যোমকেশ তিন মাস ধরে লক্ষ করে, প্রতি শুক্রবার কাগজে 'পথের কাঁটা' শিরোনামে তিন-লাইনের একটা বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে—যার মূল বক্তব্য, কেউ তার পথের কাঁটা দূর করতে চাইলে শনিবার সন্ধে সাড়ে পাঁচটায় হোয়াইটওয়ে লেডল-র দোকানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ল্যাম্পপোস্টে হাত রেখে দাঁড়ালেই কার্যসিদ্ধি হবে।

এই 'তিন মাস' কি কালের নিরিখে নির্দিষ্ট করা যায়? আগেই বলেছি, গ্রামোফোন পিন মার্ডার কেসের সময়কাল ১৯২৯। ১৯২৯-এর ১০ মার্চ গ্রামোফোন পিনের মেঘনাদ প্রফুল্ল ধরা পড়েন। ৯ মার্চ অজিত এস্‌প্ল্যানেডে চিঠি পায়। আর তার আগের দিন ৮ মার্চ শুক্রবার আশুবাবু আসেন ব্যোমকেশের কাছে। সেদিনই সকালে ব্যোমকেশ অজিতকে বলেছে, 'পথের কাঁটা'র বিজ্ঞাপনটা তিন মাস ধরে ফি শুক্রবার বার হচ্ছে, পুরনো কাগজ ঘাঁটলেই দেখতে পাবে।' ১৯২৯-এর ১০ মার্চ থেকে তিন মাস আগে, মানে, ডিসেম্বরের গোড়া, ১৯২৮। অর্থাৎ, ১৯২৮-এর ডিসেম্বর থেকে 'পথের কাঁটা'র বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত হতে থাকে।

'পথের কাঁটা' জিনিসটা কী, ব্যোমকেশ সেটা বুঝতে পারে না ঠিকই। তবে, কোনো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ-যে অকারণে গাঁটের কড়ি খরচ করে ফি-শুক্রবার কাগজে বিজ্ঞাপনটা দিচ্ছে না, স্বাভাবিক বুদ্ধিতে সেটুকু বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না ব্যোমকেশের। এইভাবে বিজ্ঞাপনটা ঘিরে একটা নেতিপ্রমাণ থেকেই সে ধীরে ধীরে তার অনুমানের ভিত গড়তে থাকে। বিজ্ঞাপনে দুটো জিনিসে ব্যোমকেশের চোখ আটকায়। এক, বিজ্ঞানপদাতার কোনো

নাম নেই। দুই, নেই কোনো বক্স-নম্বরও। আর, এই দুটো তথ্য থেকেই ব্যোমকেশের সত্যবীক্ষণে ধরা পড়ে, আর পাঁচজনের মতো এক্ষেত্রেও বিজ্ঞাপনদাতা সাধারণ মানুষের সঙ্গে একটা কারবার চালাতে চাইছে বটে। তবে তফাত একটাই। সে নিজের পরিচয় গোপন করছে। কিন্তু নিজে অদৃশ্য কারবার চালানো—সে কীকরে সম্ভব? ব্যোমকেশের মন তখন গেঁথে যায় বিজ্ঞাপন-নির্দেশিত স্থান-কালের সংগমে। শনিবার। সন্ধে সাড়ে পাঁচটা। হোয়াইটওয়ে লেডল-র দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ।

এত দোকান থাকতে কেন-ই বা হোয়াইটওয়ে লেডল? কলকাতা ইতিহাস ("৩০০ বছরের কলকাতা : পটভূমি ও ইতিকথা", ডঃ অতুল সুর, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, পৃ. ১৫৬) থেকে জানা যায়, তৎকালীন কলকাতায় বাজারের সমতুল যে-দু'-তিনখানা বিভাগীয় দোকান ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দোকান ছিল হোয়াইটওয়ে লেডল-এর দোকান। আয়তনে দোকানটা যেমন ছিল বড়, ওর পণ্যসম্ভারও তেমনি ছিল বিচিত্র। সেখানে যেকোনও জিনিস কিনতে পাওয়া যেত।' পুনশ্চ, 'The ground floor and the first floor were occupied by the department store itself' (www.flickr.com). 'The facade of the building, which was accorded heritage status by the Calcutta Municipal Corporation, was once scared and pitted, and coated with soot, with parasitical plants growing out of every nook and cranny. But the floors were still paved with marble and the windows were all stained glass.' (www.telegraphindia.com).

কয়েকবছর কলকাতায় থাকার সুবাদে এবং সর্বোপরি পেশাগত কারণে ব্যোমকেশ তখন কলকাতাকে প্রায় হাতের তালুর মতো চেনে। তাই, ওই নির্দিষ্ট স্থান-কালের পাশে 'পাত্র'কে বসিয়ে নিয়ে সমীকরণ সাজাতে তার একমুহূর্ত দেরি হয় না। কারণ, শনিবার সন্ধে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ওই জায়গায় কীরকম ভিড় হয়, তা বলাই বাহুল্য। একদিকে হোয়াইটওয়ে লেডল, অন্যদিকে হগ মার্কেট মানে, আজকের নিউ মার্কেট, চারদিকে ছড়িয়ে থাকা রক্সি-লাইট হাউস-মেট্রোর মতো সিনেমা হাউস। কাজেই, মানুষের ভিড়-ঠেলাঠেলি—এসব তো হবেই। 'পথের কাঁটা'র বিজ্ঞাপনদাতা যখন নিজের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত, তখন তাকে বিনয়ী মনে করা গেলেও সাধু বলা চলে না। আর অসাধু লোকই তো চাইবে ঘোলা জলে মাছ ধরতে। তাই কি স্থান-কাল-পাত্রের অমন সুনিপুণ নির্বাচন?

ওই প্রশ্নের প্রেক্ষাপটেই ব্যোমকেশ তখন মনে মনে সাজিয়ে নিচ্ছে সম্ভাব্য এক যুক্তিসংগত পরিস্থিতি। ধরা যাক পথের কাঁটা দূরীকরণ-অভিলাষী কেউ ঠিক দিনে ঠিক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। স্বাভাবিকভাবেই লোকের ঠেলা খেতে থাকল। কিন্তু দেখলে, কেউই তার পথের কাঁটা উদ্ধারের মহৌষধ নিয়ে হাজির হল না। ব্যাপারটা আগাগোড়া ভুয়ো মনে করে খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর সে চলে এল। তারপর হয়তো ফিরতি পথে হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখল, একখানা চিঠি। হয়তো ভিড়ের মধ্যে কেউ তার পকেটে ফেলে দিয়ে গেছে! ব্যাস। রহস্যের ষোলোকলা পূর্ণ। অবলীলায় নিজের কাজ হাসিল করে চলে গেল 'পথের কাঁটা'র সওদাগর।

কিন্তু ব্যোমকেশের সেই অনুমানকে 'প্রমাণ' বলে বিশ্বাস করতে চায় না অজিত। ব্যোমকেশের পাল্টা যুক্তি, 'আরে, অনুমানই তো আসল প্রমাণ। যাকে তোমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে থাকো, তাকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো অনুমান বৈ আর কিছুই থাকে না। আইনে যে circumstantial evidence বলে একটা প্রমাণ আছে, সেটা কি? অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয় অথচ তারই জোরে কত লোক যাবজ্জীবন পুলিপোলাও চলে যাচ্ছে।'

কেন ব্যোমকেশ 'অনুমান'-এর পক্ষে অমন জোরালো সওয়াল করে? কারণ ন্যায়শাস্ত্রে অনুমানও আসলে একধরনের প্রমাণ। অন্নংভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহঃ (সটীকঃ)'র 'প্রত্যক্ষ খণ্ড'য় লিখেছেন—'যথার্থানুভবশ্চতুর্বিধঃ—

প্রত্যক্ষানুমিতুপমিতিশাব্দভেদাৎ।/ তৎকরণমপি চতুর্বিধম্—প্রত্যক্ষানুমানোপমানশাব্দভেদাৎ।' (২৯।।) অর্থাৎ, যথার্থ অনুভব চার প্রকার। প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধ। এই চার প্রকার যথার্থ অনুভবকে প্রমাণ বলা হয়। এই প্রমাণ চাররকম—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দভেদ। মানে, অনুমানও আসলে এক ধরনের প্রমাণ। (তথ্যসূত্র—"শ্রীমদন্নংভট্টবিরচিতঃ তর্কসংগ্রহঃ সটীকঃ অধ্যাপনাসহিতঃ", অনুবাদ—গোস্বামী শ্রী নারায়ণচন্দ্র, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৯০, পৃ. ২২৭)। সেকারণেই, 'পথের কাঁটা', বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে ব্যোমকেশের অনুমান-যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সমকক্ষ হতে পারে, অজিত প্রথমে সেকথা না মানলেও শেষে ব্যোমকেশের ন্যায়ের প্যাঁচে পড়ে অগত্যা তা স্বীকার করে নেয়।

এইভাবে ব্যোমকেশ যখন মন ডুবিয়েছে 'পথের কাঁটা'য়, কলকাতার বুকে হঠাৎ শুরু হয়ে গেল গ্রামোফোন পিন মার্ডার কেস। গ্রামোফোন পিনের শিকার হলেন জয়হরি সান্যাল, কৈলাশচন্দ্র মৌলিক, ও কৃষ্ণদয়াল সাহা-সহ অজ্ঞাতপরিচয় আরো দু'জন। সময়ের হিসেবে তখন ১৯২৯-এর মধ্যে-জানুয়ারি। কেন? ৮ মার্চ শুক্রবার, গ্রামোফোন পিন মার্ডার কেস নিয়ে ব্যোমকেশের আগমন প্রসঙ্গে অজিত লিখছে, "...এইখানে বলিয়া রাখা ভালো যে, কিছুদিন হইতে এই কলিকাতা... শহরে... অদ্ভুত অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপার ঘটিতেছিল এবং ...'গ্রামোফোন পিন মিস্ট্রি' নাম দিয়া শহরের দেশি-বিলাতী সংবাদপত্রগুলি বিরাট হুলস্থুল বাধইয়া দিয়াছিল।" এই মার্ডার কেসের সূচনা ঘটে 'মাস দেড়েক পূর্বে' সুকীয়া স্ট্রিট-নিবাসী জয়হরি স্যান্যালকে দিয়ে। ৮ মার্চ, ১৯২৯ থেকে 'মাস দেড়েক পূর্বে মানে, মোটামুটিভাবে ১৯২৯-এর জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে।

ধারাবাহিক খুন আগেও যে কলকাতা দেখেনি, তা নয়। শহরের ধনী মহিলা, যাঁরা প্রভূত অলংকারের মালকিন, তাঁদের সেই গয়নাগাঁটি হাতানোর উদ্দেশ্যে ১৯১৭ থেকে ১৯১৯-এর মধ্যে তিনজন খুনি মিলে কলকাতার বুকেই মোট এগারো জন মহিলাকে খুন করে। 'The Statesman' পত্রিকা (12.05.1920, p. 17) জানাচ্ছে, 'The story which the prosecution wished to place before them was of the most horrible nature that they have every heard in the history of crime.' (তথ্যসূত্র—'Murder Conspiracy—Eleven woman victims')। কিন্তু বন্দুক বা ওইজাতীয় কোনো যন্ত্র দিয়ে গ্রামোফোন পিন ছুঁড়ে কীভাবে খুন করা সম্ভব, তা নিয়ে গোটা কলকাতা তখন আতঙ্কগ্রস্ত। আর অদ্ভুত ওই হত্যাকাণ্ড ব্যোমকেশের সমস্ত মানসিক শক্তিকে উদ্‌বেজিত করে তোলায় গ্রামোফোন পিন সংক্রান্ত সমস্ত খবর সেইসময় সে তার নোটবুকে তুলে রাখছে। এমনকি অজিতকে নিয়ে সে খুনের জায়গাগুলো দেখেও আসে।

খবরের কাগজে প্রকাশিত খুনের ঘটনা আর মৃত ব্যক্তিদের জীবনচরিত—এই দুয়ের মধ্যে কতকগুলো মিল খুঁজে পায় ব্যোমকেশ। যেমন, যাঁরা খুন হয়েছেন, তাঁরা সকলেই যৌবনের সীমা পেরিয়েছেন, মোটামুটি সকলেই ধনী এবং অপুত্রক। ঠিক রাস্তার মাঝখানেই সকলে খুন হয়েছেন। জয়হরি সান্যাল কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাতে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেছেন। রেড রোডের কাছে মোটর থামিয়ে কয়েক পা হাঁটতেই মারা গেছেন কৈলাশচন্দ্র মৌলিক। কৃষ্ণদয়াল সাহা ধর্মতলা ও ওয়েলিংটন স্ট্রিটের চৌমাথা পার হতে গিয়ে খুন হয়েছেন। আর সবচেয়ে অদ্ভুত, একদিকে 'পথের কাঁটা' নামে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে। অন্যদিকে ঠিক কাঁটার মতোই দেখতে গ্রামোফোন পিন দিয়ে খুন করা হচ্ছে। একটার নামের সঙ্গে অন্যটার কাজের আশ্চর্য মিল। এ কি নেহাত সমাপতন?

এইভাবে চলতে চলতে, গ্রামোফোন পিনের শিকার হতে হতে ভাগ্যক্রমে মৃত্যুর-মুখ-থেকে-বেঁচে-ফেরা আশুতোষ মিত্র মারফত ব্যোমকেশের কাছে কেসটা আসে ১৯২৯-এর ৮ মার্চ শুক্রবারের সকালে। তিনি নেবুতলার বাসিন্দা। গতরাতে জোড়াসাঁকোর এক মজলিশ থেকে ফিরছিলেন। আমহার্স্ট স্ট্রিট আর হ্যারিসন রোডের চৌমাথার ঘড়িতে

তখন ঠিক সওয়া ন'টা। গাড়ি-মোটরের ভিড় একটু ফাঁকা দেখে তিনি যেই ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমেছেন, অমনি হঠাৎ বুকে বিষম ধাক্কা। সঙ্গে সঙ্গে বুকে কাঁটা ফোঁটার মতো একটা ব্যথা অনুভব—যেন বুকপকেটের ঘড়ির ওপর কে প্রকাণ্ড ঘুষি মেরেছে। দারুণ ধাক্কায় উল্টে পড়ে যেতে যেতে তিনি কোনোরকমে সামলে নিয়ে ঘড়ি বের করতে গিয়ে দেখেন, ঘড়িটা বেরোচ্ছে না, কীসে যেন আটকে যাচ্ছে। সাবধানে পকেটের কাপড় সরিয়ে তখন ঘড়ি বের করে দেখেন, তার কাচ গুঁড়ো হয়ে গেছে। আর ঘড়ি ফুঁড়ে মুখ বের করে আছে একটা গ্রামোফোন পিন।

আশুবাবুকে জেরা করে ব্যোমকেশ জানতে পারে, বুকে ধাক্কা লাগার সময় তিনি যেন সাইকেল ঘন্টীর কিড়িং কিড়িং শব্দ শুনেছিলেন। তাছাড়া অবিবাহিত আশু মিত্রের উইলে সম্পত্তির ওয়ারিশ তাঁর একমাত্র ভাইপো নয়—অন্য কেউ এবং সেই ওয়ারিশের কথা আশুবাবু ও তাঁর উকিল ছাড়া আর কেউ জানে না। ব্যোমকেশ আশুবাবুকে পরামর্শ দেয়, পারতপক্ষে বাড়ি থেকে না বেরোতে; বেরোলেও খবরদার তিনি যেন রাস্তায় না নামেন—শুধু ফুটপাত দিয়েই যাতায়াত করেন। তারপর সে জোড়াসাঁকোর মজলিশে গিয়ে আশুবাবুর ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটা কথা জানতে পারে। যেমন, ওই মজলিশ আসলে আশুবাবুর রক্ষিতার। ব্যোমকেশ বাড়ি ফিরে অজিতকে বলেছে, সেই বাড়ির দরজায় 'কড়া পাহারা'। তবে কি ওই পাহারাদারদের ঘুষ দিয়ে হাত করেই বাড়ির ভেতরের কথা আদায় করে ব্যোমকেশ?

বাড়ি ফিরে ব্যোমকেশকে দেখি নিজের ল্যাবরেটরি ঘরের দরজা এঁটে আশুবাবুর বিকল হওয়া ঘড়ি পরীক্ষা করতে। পরীক্ষা করে ব্যোমকেশ বুঝতে পারে, পিনটা সাধারণ এডিসন্-মার্কা পিন। মানে এতই হালকা যে, সাত-আট গজের বেশি দূর থেকে তা ছুঁড়লে অমন অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ হবে না। কিন্তু কী সেই যন্ত্র—যা দিয়ে নিঃশব্দে গ্রামোফোন পিন ছুঁড়ে একটা মানুষের শরীর ফুটো করে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছানো যায়? জেরাপর্বে, ঘটনার সময় আশুবাবু-শ্রুত বাইসাইকেলের কিড়িং কিড়িং শব্দের ব্যঞ্জনা তখনো বোঝেনি ব্যোমকেশ। বুঝল তার পরের দিন।

পরের দিন শনিবার। 'পথের কাঁটা'র বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত অনুমান হাতে-কলমে যাচিয়ে নিতে ব্যোমকেশ অজিতকে মেক-আপ করিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠিয়ে দেয়। তারপর নিজেও আধবুড়ো ফিরিঙ্গি সেজে হোয়াইটওয়ে লেডল-এ ঢুকে মোজা পছন্দের অজুহাতে কাচের পাল্লা দিয়ে লক্ষ করতে থাকে চিঠির আশায় অধৈর্য হয়ে বারবার-পকেটে-হাত-দিতে-থাকা অজিতকে। কিন্তু মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় কাজ হাসিল করে চলে যায় 'পথের কাঁটা'র সওদাগর। অজিতের পকেটে অশ্লীল ছবির সঙ্গে ফেলে যায় একটা চিঠি।

কলকাতার রাস্তায় অবশ্য তখন অশ্লীল ছবির ব্যাবসা নতুন কিছু নয়। ১৯২৪ সালের সংবাদপত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে আমাদের চোখে পড়ে ১৯২৪-এর মে মাসে আপার চিৎপুর রোডে অশ্লীল ছবি বিক্রির দায়ে ধরা পড়েছেন একজন। বিচারে তাঁর পঞ্চাশ টাকা জরিমানাসহ এক সপ্তাহের কারাদণ্ড হয়। (তথ্যসূত্র—'Selling Obscence Pictures—Accused sentenced', 'Amrita Bazar Patrika', 03.05.1924, P.3)। আবার, ২৮ নভেম্বর ১৯২৮-এ 'Amrita Bazar Patrika'র তৃতীয় পৃষ্ঠায় আমরা দেখি 'Alleged sale of obscene pictures'।

কিন্তু এখানে অশ্লীল ছবির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ওই চিঠি। কারণ, চিঠির একটা শব্দেই গ্রামোফোন পিন রহস্যের সূচীতীক্ষ্ণ অন্ধকার ফুঁড়ে ফেলে ব্যোমকেশ। শব্দটা 'বাইসিক্ল'। চিঠিতে লেখা ছিল, 'আপনার পথের কাঁটা কে? তাহার নাম ও ঠিকানা কী? আপনি কি চান, পরিষ্কার করিয়া লিখুন।... লিখিত পত্র খামে ভরিয়া আগামী রবিবার১০ই মার্চ রাত্রি বারোটার সময় খিদিরপুর রেসকোর্সের পাশের রাস্তা দিয়া পশ্চিমদিকে যাইবেন। একটি লোক বাইসিক্ল চড়িয়া আপনার সম্মুখ দিক্ হইতে আসিবে, তাহার চোখে মোটর-গগ্‌ল দেখিলেই চিনিতে পারিবেন। তাহাকে দেখিবামাত্র

আপনার পত্র হাতে লইয়া পাশের দিকে হাত বাড়াইয়া থাকিবেন। বাইসিক্ল আরোহী আপনার হাত হইতে চিঠি লইয়া যাইবে।...'

আশুবাবু-শ্রুত বাইসাইকেলের কিড়িং কিড়িং শব্দের ব্যঞ্জনা মুহূর্তে বুঝে ফেলে ব্যোমকেশ। উচ্ছ্বসিত আনন্দে অজিতের পিঠ চাপড়ে সে বলে, 'হাওড়ার ব্রিজ কখনও খোলা অবস্থায় দেখেছ? আমার মনের অবস্থা হয়েছিল ঠিক সেইরকম, দুই দিক্ থেকে পথ এসেছে, কিন্তু মাঝখানটিতে একটুখানি ফাঁক, একটি পনটুন খোলা। আজ সেই ফাঁকটুকু জোড়া লেগে গেছে।'

কেন পনটুনের কথা তোলে ব্যোমকেশ? হাওড়া ব্রিজের ইতিহাস (তথ্যসূত্র—লেখা-রায় নিশীথরঞ্জন 'হাওড়া ব্রিজ', "রথীন মিত্রের শাশ্বত কলকাতা—দ্বিতীয় পর্ব", প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, জুন ১৯৮৮, পৃ. ৪৪) খেয়াল করলে দেখা যায়, ১৮৭৫-এ গঙ্গানদীর ওপর ভাসমান পন্টুন ব্রিজ বানানো হয়। কিন্তু জাহাজ চলাচলের জন্যে প্রায়ই সেটা খুলে দিতে হত, যাত্রীদের দেরি হয়ে যেত। ফলে, হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার সময় বেধে যেত তুমুল হই-হট্টগোল। তাই ১৯৪৩-এ সিঙ্গল স্প্যান ক্যানটিলিভার ব্রিজ তৈরি হল। ১৯২৯-এ ব্যোমকেশ যে হাওড়ার পনটুন ব্রিজের কথা বলে, সেটা শরদিন্দুর স্বকপোল কল্পনা নয়—ঐতিহাসিক সত্য।

যাই হোক, একদিকে রাস্তার মাঝখানে গ্রামোফোন পিন দিয়ে খুনের ঘটনা, অন্যদিকে ওই ঘণ্টীর আওয়াজ—এই দুই আপাত-পৃথক ঘটনার মধ্যে 'বাইসিক্ল' শব্দটা যেন হাওড়া ব্রিজের মাঝখানের পন্টুন হয়ে ব্যোমকেশের মনের ফাঁকা জায়গাটা জুড়ে দেয়। আর এইভাবে, অন্তর্লীন ওই যোগসূত্র আবিষ্কারে প্রায় তিনমাস ধরে নাকানি-চোবানি-খাওয়া গ্রামোফোন পিন মার্ডার কেসের মোক্ষম জায়গাটা ধরে ফেলে ব্যোমকেশ। বুঝতে পারে, সাইকেল ঘণ্টীর স্প্রিংয়ে বিশেষ কোনো কারসাজিতে আততায়ী গ্রামোফোন পিন ছুঁড়ে খুন করে। মানে, 'পথের কাঁটা'র বিজ্ঞাপনদাতা আর গ্রামোফোন পিনের মেঘনাদ আসলে একজনই।

পাশাপাশি ব্যোমকেশ তখন অন্য আশায় বুক বাধছে। ভাবছে, হোয়াইটওয়ে লেডল-র সামনে চিঠি পাওয়ার জন্যে বারবার পকেটে হাত দিয়ে অজিতের উশখুশুনি কি আর 'পথের কাঁটা'র সওদাগর লক্ষ করেনি? নিশ্চয়ই করেছে এবং সেই সন্দেহবশে হয়তো অজিতের পিছু ধাওয়া করে হ্যারিসন রোডের বাড়ি অবধি এসে স্থানীয় কারো কাছ থেকে জানতে পেরেছে, ওই বাড়ি-ই অশ্বিনী মার্ডার কেসের কাণ্ডারী ব্যোমকেশ বক্সীর আস্তানা এবং অজিত তার সঙ্গী। যে-মানুষ অত বুদ্ধি ধরে, সে কি সঙ্গে সঙ্গে এই হিসেবও কষেনি যে, আশুবাবুর কেস হাতে নিয়ে ব্যোমকেশ ইচ্ছে করে নিজে না গিয়ে 'পথের কাঁটা'র বিজ্ঞাপন যাচাই করতে পাঠিয়েছে অজিতকে? 'পথের কাঁটা' সম্পর্কে ব্যোমকেশ কী করতে চায়, সোজা কথায় তার মন বুঝতে সেই মানুষের পক্ষে তো তাহলে হ্যারিসন রোডের তেতলায় পা রাখাও অসম্ভব নয়! আশায় বুক বাধে ব্যোমকেশ।

তাই, রাত পোয়ানোর পরেই ১০ মার্চ রোববারের সকালে দরজায় কড়া নড়ে ওঠা মাত্র সচকিত ব্যোমকেশ মনে মনে অভিনয়ের মুখোশ পরে নেয়। ঘরে ঢোকেন ভদ্রবেশধারী এক সুশ্রী যুবক। অতিরিক্ত পান খাওয়ায় দাঁতগুলো পান-এর রসে রাঙা। পরিচয় দেন—প্রফুল্ল রায়। বীমা কোম্পানির এজেন্ট। তিনি, ১১ মার্চ রাত বারোটায় সাক্ষাতের নির্দেশসমন্বিত 'পথের কাঁটা'র একটি চিঠি পেয়ে ব্যোমকেশের কাছে 'প্রাইভেট পরামর্শ নিতে এসেছেন।

লোকটির দুঃসাহসে মনে মনে বিস্মিত হলেও সে যে তারই অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল, প্রফুল্লকে তা ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দেয় না ব্যোমকেশ। বরং মনের আনন্দ মনেই চেপে রেখে চূড়ান্ত পেশাদার ডিটেকটিভের মতো মুখ খোলার আগে অগ্রিম 'দর্শনী' চেয়ে বসে। তৎক্ষণাৎ দশ টাকার এক নোট এগিয়ে দেয় প্রফুল্ল। তারপর খুলে বলে তার চিঠি পাওয়ার কাহিনি। কিন্তু, যতবারই সে কাহিনি থেকে সরে যায়—কখনও 'বিখ্যাত ডিটেকটিভ' ব্যোমকেশ

বক্সীর গুণকীর্তন প্রসঙ্গে, কখনো-বা চিঠিপ্রাপ্তির রহস্যময়তা ঘিরে অজিতের মন পড়ায় চেষ্টায়; ততবারই ব্যোমকেশ বিরক্তির ভান করে। ক্রমশই 'অধীর' হয়ে প্রফুল্লকে যেন সে বুঝিয়ে দিতে চায় যে, প্রসঙ্গ-বহির্ভূত কথা শোনার সময় তার মতো পেশাদারের নেই।

মনে মনে আগেই প্রফুল্ল উদ্দেশ্যর আঁচ পেয়েছিল ব্যোমকেশ। তাই, 'পথের কাঁটা'র চিঠিপ্রাপ্তির পর প্রফুল্লর করণীয় নিয়ে চিন্তাভাবনার জন্যে ইচ্ছে করেই একদিন সময় চায় সে। পরেরদিন, মানে সোমবারের সকালে প্রফুল্লকে আসতে বলে। কিন্তু প্রফুল তার অক্ষমতা জানিয়ে অনুরোধ করে, রোববার রাতেই দেখা করতে। ব্যোমকেশ জানত, প্রফুল্ল ধরেই নিয়েছে যে, ব্যোমকেশ বক্সী একবার অজিতকে পাঠিয়ে ঠকে যাওয়ায়, পরেরবার নিশ্চয়ই ঝুঁকি না নিয়ে নিজেই সাক্ষাত করবে 'পথের কাঁটা'র সওদাগরের সঙ্গে, আর সেটাই হবে তাকে খুনের সেরা সুযোগ। তাই ব্যোমকেশ বলে, 'না, আজ রাতে আমি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকব—আমাকেও এক জায়গা যেতে হবে—' বলেই, সচকিতে তাকায় প্রফুল্লর দিকে।

এই পুরো আচরণ আসলে ব্যোমকেশের এক সযত্ন-নির্মিত ভান। ঠিক ওই রাতেই 'পথের কাঁটা'র বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে মোলাকাতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার গোপনীয়তাটুকু যেন-মুখ-ফস্কে সন্দেহভাজন প্রফুল্লকে বলে ফেলার ভান। প্রফুল্লর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পেরেও সে যেন কিছুই জানে না। তার এই ভানের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় পুলিশ প্রসঙ্গে এসে। প্রফুল্ল পুলিশে খবর দেওয়ার কথা বলায় ব্যোমকেশ ভীষণ রেগে যায়। প্রফুল্ল আসলে যাচাই করে নিচ্ছিল, রাতে ব্যোমকেশ একাই যাবে, না সঙ্গী হিসেবে কোনো পুলিশকে নেবে। কিন্তু প্রফুল্ল ডালে ডালে চললে ব্যোমকেশ পাতায় পাতায়। পুলিশের কথায় 'মহাখাপ্পা'র ভান না করলে প্রফুল্লকে ফাঁদে ফেলা যাবে কী করে?

প্রফুল্ল চলে যাওয়ার পর ব্যোমকেশ নিজের ঘুরে ঢুকে পুলিশ কমিশনারকে ফোন করে নির্দিষ্ট জায়গায় ঠিক সময়ে তৈরি থাকতে বলে। তারপর গ্রামোফোন পিনের মেঘনাদ মোকাবিলায় শেষবারের মত মনে মনে তৈরি হয় সে। সেইমত রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে আত্মরক্ষার জন্য বুকে প্লেট বেঁধে আপাদমস্তক কালো পোশাকে ঢেকে ঠিক বারোটায় খিদিপুর রেসকোর্সের রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে ব্যোমকেশরা। শুনশান রাস্তায় চিঠি-হাতে-হাঁটতে-থাকা অজিতের ঠিক ছ'ইঞ্চি পিছনে মিশকালো অন্ধকারে প্রায় নেই-মানুষ হয়ে যায় ব্যোমকেশ। লক্ষ করার মতো, ব্যোমকেশ অজিতকে আগে রেখে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে ঠিকই; তবে তার যাবতীয় নিরাপত্তা ঘাড়ে নিয়ে। তাই নিজে কোটের তলায় চীনেমাটির একটা প্লেট সাধারণভাবে ঢুকিয়ে নিলেও অজিতের বুকে হৃৎপিণ্ডের জায়গায় আরেকটা প্লেট উল্টো করে বসিয়ে ন্যাকড়ার চওড়া ফালি দিয়ে শক্ত করে সযত্নে বেঁধে দেয় ব্যোমকেশ।

একসময় আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। অন্ধকার রাস্তায় দুর থেকে একটা ক্ষীণ আলোকবিন্দু দেখে ব্যোমকেশ সচেতন হয়ে ওঠে। অজিতের কানে ফিসফিসিয়ে বলে, 'আসছে—তৈরি থাকো।'— আলোকবিন্দু ক্রমে উজ্জ্বল হতে হতে মিনিটখানেক পর চোখে পড়ে, পিচ-ঢালা কালো রাস্তার ওপরে আরো কালো কিছু একটা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। কয়েকমুহূর্ত পরেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাইসাইকেল আরোহীর মূর্তি। অজিত থমকে দাঁড়িয়ে খামসমেত হাতখানা পাশের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

ব্যবধান যখন পঁচিশ গজ, তখন কালো সুট ও মোটর-গগল পরিহিত সাইকেল আরোহীকে চিনতে আর বাকি থাকে না ব্যোমকেশ। সে রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে। আর, মাঝারি গতিতে সাইকেল আরোহী যেন অজিতকে লক্ষ্য করেই এগোতে থাকে। হঠাৎ দশ গজ দুরত্বে কড়াং কড়াং শব্দে বেজে উঠল সাইকেলের ঘণ্টী। ব্যোমকেশের অনুমান মতোই, বুকের প্লেটে পিন লাগার দারুণ ধাক্কায় হতচকিত অজিতের তখন প্রায় উল্টে পড়ার দশা। কিন্তু পেছন থেকে ব্যোমকেশ গ্রামোফোন পিনের মেঘনাদ ছদ্মবেশধারী প্রফুল্ল রায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে। পরে, অজিতের সাহায্যে তার হাতদুটো কষে বেঁধেও দেয়। আর, সাইকেল থেকে ঘণ্টীটা খুলে রাখে নিজের জিম্মায়।

বমাল পাকড়ে তবুও প্রফুল্লকে ধরে রাখা যায় না। জল তেষ্টা মেটানোর অছিলায় প্রফুল্ল তার-সঙ্গে-থাকা পানের ডিবে থেকে একটা পান দিতে অনুরোধ করে ব্যোমকেশকে। কিন্তু ব্যোমকেশ সেই ইচ্ছে পূরণের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ে প্রফুল্ল। পান-এ বিষ ছিল।

সেই সময় একটা মোটর-বাইক সশব্দে এসে থামে সেখানে। একজন ইউনিফর্ম-পরা পুলিশ তার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে বলেন, ''What's up? Dead?' প্রফুল্ল রায় নিষ্প্রভ চোখ খুলে বলে, 'এ যে খোদ কর্তা দেখছি! টু লেট সাহেব, আমায় ধরতে পারলে না।" কে এই 'খোদ কর্তা? কলকাতার পুলিশ কমিশনার। ঐতিহাসিক নথি (''Origin of the Kolkata Police'', P. Thankappan Nair, First published–2007, Punthi Pustak, p.XV) বলছে, ১৯২৯-এ কলকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন চার্লস টেগার্ট। সেই টেগার্টকেই হেলায় ফাঁকি দিয়ে মৃত্যুলোকে পাড়ি দেন প্রফুল্ল রায়।

কেসের শেষে অজিত ব্যোমকেশকে জিগ্যেস করেছে, 'আচ্ছা ব্যোমকেশ, সত্যি বল, পানের মধ্যে বিষ আছে, তুমি জানতে?' ব্যোমকেশ, 'একটু চুপ' করে থেকে উত্তর দিয়েছে, 'জানা এবং না জানার মাঝখানে একটা অনিশ্চিত স্থান আছে, সেটা সম্ভাবনার রাজ্য।' 'তুমি কি মনে কর প্রফুল্ল রায় যদি সামান্য খুনির মত ফাঁসি যেত তাহলে ভাল হত? আমার তা মনে হয় না। বরং এমনিভাবে যাওয়াই তার ঠিক হয়েছে, সে যে কতবড় আর্টিস্ট ছিল, ধরা পড়েও হাত পা বাঁধা অবস্থায় সে তা দেখিয়ে দিয়ে গেছে।'

আসলে সাইকেল-ঘণ্টীকে যে-লোক মৃত্যুবাণ বানিয়ে ফেলতে পারেন, ধরা পড়েও আইনি শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে অসামান্য অভিনয় দক্ষতায় প্রফুল্লচিত্তে পান চিবোতে চিবোতে আত্মহত্যার রাস্তায় হাঁটতে পারেন; সেই মানুষকে সাধারণ খুনি-আসামির মত ফাঁসিকাঠে জ্যান্ত ঝোলাতে বোমকেশের মন চায়নি। তাই খুনির শিল্পিত দক্ষতাকে যেন সেলাম জানাতেই, পান-এ বিষ থাকার সম্ভাবনা জেনেও বেনিফিট অফ দ্য ডাউটের পুরো সুবিধেসমেত প্রফুল্লকে শিল্পীর মতোই মরার অধিকার দেয় সে। আর এখানেই, আক্ষরিক অর্থেই, ব্যোমকেশ হয়ে ওঠে একজন সত্যান্বেষী। খুনি প্রফুল্লর প্রতি তার নৈতিক বিচারকে কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে রেখে এক প্রতিভাবান কারুশিল্পীর প্রাপ্য সম্মান তাকে দেয় ব্যোমকেশ। তাই, সরকারি সম্পত্তি হিসেবে পুলিশ কমিশনার ওই সাইকেল ঘণ্টী ফেরত চাইলে ব্যোমকেশের বুকে তা নিদারুণ হয়ে বাজে। পুরস্কারস্বরূপ সরকারের পূর্বঘোষিত দু'হাজার এবং আশুবাবুর ব্যক্তিগত এক হাজার—মোট তিন হাজার টাকা প্রাপ্তিসম্ভাবনার আনন্দও ফিকে হয়ে যায়। ব্যোমকেশের তখন শুধু একটাই সান্ত্বনা—অগ্রিম দর্শনী হিসেবে প্রফুল্ল রায়ের কাছ থেকে পাওয়া সেই দশ টাকার নোট। বলে, 'সেটাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখব ভেবেছি। তার দাম এখন আমার কাছে একশ' টাকারও বেশি।'

ভবিষ্যতে ব্যোমকেশ-মিউজিয়াম হলে ওই নোট-ই হয়তো একদিন সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর জীবনের এক ঐতিহাসিক দলিল হয়ে উঠবে।

১৩.৬ সাইকেল ঘণ্টীতে গ্রামোফোন পিনের কারসাজি—আদৌ কি সম্ভব?

ব্যোমকেশ সাইকেল-ঘণ্টীর মাথাটা খুলে ভেতরের যন্ত্রপাতি 'সপ্রশংস নেত্রে' 'নিরীক্ষণ' করতে করতে বলেছিল, 'কি অদ্ভুত লোকটার মাথা। এরকম একটা যন্ত্র তৈরি করা যায়, এ কল্পনাও বোধ করি আজ পর্যন্ত কারুর মাথায়

আসেনি। এই যে পাকানো স্প্রিং... এটি হচ্ছে এই বন্দুকের বারুদ—কি নিদারুণ শক্তি এই স্প্রিং-এর। কি ভয়ংকর অথচ কি সহজ। এই ছোট্ট ফুটোটি হচ্ছে এর নল, —যে পথ দিয়ে গুলি বেরোয়। আর এই ঘোড়া টিপলে দু'কাজ একসঙ্গে হয়, ঘন্টিও বাজে, গুলিও বেরিয়ে যায়। ঘন্টির শব্দে স্প্রি এর আওয়াজ চাপা পড়ে।'

কিন্তু মানুষের কল্পনাই তো পারে অসম্ভবকে সম্ভব করতে! তাই, '...if we use a bit of imagination, this sort of weapon is plausible... the bicycle-bell gun might have a probable velocity of 15-20 m/s whichi would be enough to inflict substantial harm to someone wearing light layers of clothing.' (তথ্যসূত্র—'Gramophone pin fired from a bicycle bell: is it a plausible weapon?', January 29, 2010 @13:38p.m>Airban; byomkesh.com/2010/01/29/pather kanta)

Gramophone-pin gun from *Pather Kanta* (পথের কাঁটা)

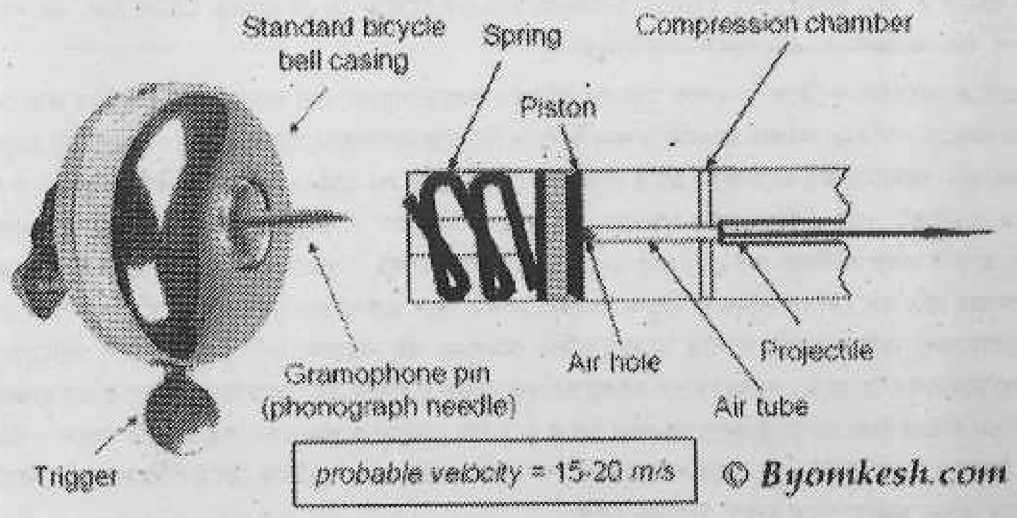

১৩.৭ প্রফুল্ল প্রদত্ত দশ টাকার নোট

প্রফুল্ল ব্যোমকেশকে দশ টাকার যে-নোটটা দেয়, কেমন দেখতে সেটা? ১৯২৩ এর পর নতুন দশ টাকার নোট ছাপা হয় ১৯২৫-এ। ১৯২৯-এ, ১৯২৩ এর নোটটির চালু থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ ধরে নিয়ে, ১৯২৫-এর নোটটিই এক্ষেত্রে প্রামাণ্য হিসেবে ধরা হল। নোটটি 'printed in England, paper-made, handmade; moulded, Released in October 125, GOVERNMENT OF INDIA in top and lower margin, Printed pf King George V in right window. Serial number on top right and lower left. 10 on

all four corners. 10 underprint in white with TEN RUPEES in Central Denomination Panel.' নোটটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য ১৬ সেমি ও প্রস্থ ১০.১ সেমি। (তথ্যসূত্র—Jhunjhunwalla Kishore &

Rajack Rezwan Chapter–'Printed Note of King George V–10 Rupees', "The Revised Standard Reference Guide to Indian paper Money", Pragati Offset Pvt Ltd, 2012, P. 159, উপরি-উক্ত গ্রন্থটির পাশাপাশি প্রকৃত মাপসহ নোটটির ছবি তুলে দেওয়ার জন্যে দি নিউ মিসম্যাটিক সোসাইটি অফ ক্যালকাটা সেক্রেটারি শ্রী রবিশংকর শর্মা বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ)

১৩.৮ অনুশীলনী

১. প্রাক্-ব্যোমকেশ গোয়েন্দাগল্পের তুলনায় শরদিন্দু ব্যোমকেশ-কাহিনির বৈশিষ্ট্য কোথায়?

২. 'পথের কাঁটা' এবং 'গ্রামোফান পিন হত্যারহস্য'—এই দুই নামকরণের কোনটিকে যুক্তিসংগত বলে মনে হয়?

৩. গল্প-লিখনকাল বা পত্রিকাপ্রকাশ-কাল নয়, কাহিনির অন্তর্নিহিত সূত্র থেকে কীভাবে গ্রামোফোন পিন হত্যারস্যের ঘটনাকাল নির্ধারণ সম্ভব?

৪. শরদিন্দুর 'পথের কাঁটা' একটি অসম্ভব অবাস্তব গল্প—মন্তব্যের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি দিন।

একক ১৪ □ ডোমের চিতা—রমেশচন্দ্র সেন

গঠন

১৪.১ মূলগল্প

১৪.২ জীবনকথা ও সাহিত্য পরিচয়

১৪.৩ গল্প-বিবরণ

১৪.৪ গঠন-বিশ্লেষণ

১৪.৫ নামকরণ

১৪.৬ অনুশীলনী

১৪.১ মূলগল্প

ধূ ধূ করে প্রকাণ্ড বিল। চারিদিকে জল আর জল। জলের বুকে কচুরিপানার গাদার মধ্যে মাঝে মাঝে রক্তশাপলা ও রক্তকমল। নানা রকম ঘাসের বুকে বিচিত্র রঙের ছোট ছোট ফুল ফুটিয়াছে। কোনোটা নীল, কোনোটা বেগুনী, কোনোটা বা ধবধবে সাদা। উপরে পাখির দল উড়িতেছে— আকাশের গভীর নীলিমার বুকে একটা সুর জাগাইয়া। সমুদ্রের মধ্যে লাইট-হাউসের মতো মাঝে মাঝে দুই একটা বাড়ি দেখা যায়।

এই জলরাশির মাঝখানটায় শুষ্ক প্রাণহীন মাদারের ভিটা যেন প্রকৃতির একটা অনিয়ম। ভিটার উপর পাতাহীন মৃতপ্রায় গাছগুলি বিকলাঙ্গ কুষ্ঠীর মতো দাঁড়াইয়া আছে। এখানে ওখানে ছড়ান রহিয়াছে কয়লা, অর্দ্ধদগ্ধ অস্থি ও মানুষের মাথার খুলি।

এই ভিটায় দুটি ডোম থাকে হারু ও বদন। দুজনেই প্রৌঢ়, স্বাস্থ্যবান, কালো মিশ্‌মিশে তাদের গায়ের রং। হারুর মাথায় ছিল একটা বাবরি। বদনের চুল কদমফুলের মতো চারদিকে সমানভাবে ছাঁটা।

মাদারের ভিটা এই অঞ্চলের শ্মশান। দুধারে দশমাইল দূর হইতেও মড়া পোড়াইতে সকলে এখানে আসে। তাই হারু ও বদন সবারই পরিচিত। কোথায় তাদের বাড়ি ঘর কোথা হইতে তারা আসিয়াছে কেহ জানে না; যমদূতের মতো আকাশ হইতে তারা এই শ্মশানের বুকে আবির্ভূত হইয়াছিল মড়ার-কাঠ জোগাইবার জন্যে। আজ বিশ বৎসর তাদের এই অধিকারে কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই। তারাও বিলের মধ্যে পোড়ো ভিটা হইতে গাছ কাটিয়া আনিয়া মৃতদের সংকারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে।

কাঠ বেচিয়া, মাছ ধরিয়া, মৃতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত চাল, ডাল, ফল-ফলারি সিদ্ধ করিয়া তারা উদরান্নের সংস্থান করে। প্রায়ই উনান ধরাইতে হয় না। চিতার উপর হাঁড়ি চড়াইয়া দেয় বা রুটি সেঁকিয়া লয়। তপ্ত অঙ্গার হাতে তুলিয়া কলিকায় তামাক সাজে।

মাদারের ভিটায় একটি কুঁড়ে বাঁধিয়া তারা থাকে। সমাজ সংসার সবই তাদের পরস্পরকে লইয়া। বাহিরের জগৎ এই ডোম দুটির কাছে অর্থহীন। জীবিত মানুষের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা মৃতদেহই যেন প্রাণবন্ত। তারাই তাদের জীবিকা। পরস্পরের সঙ্গেও তারা বড় একটা কথা বলে না, হাসে আরও কম। কোন্ মৃতদেহ কিরূপে পুড়িল, কোন্‌টার হাড় কতখানি শক্ত এই-

ই তাদের আলোচ্য বিষয়। মৃতদেহের অস্বাভাবিকতা মধ্যে মধ্যে তাদের হাসির উদ্রেক করে বটে কিন্তু সে হাসি হিংস্র জানোয়ারের ক্রুদ্ধ গর্জনের মতো বিকট। তাই এই অঞ্চলে তাদের নামে নানা বীভৎস গল্প চলিয়ে আসিতেছে।

হারু ও বদনের দুর্ভাগ্য-ক্রমে আজ দুদিন পর্যন্ত কোনও মড়া আসে নাই। হাঁড়িতেও চাল ছিল না। চাল কিনিতে যাইতে হইবে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। সমস্ত দিনটা মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। তারা চাল কিনিতে যায় নাই। শুক্‌না ছোলা চিবাইয়াই দিনটা কাটাইয়া দিয়াছে। সন্ধ্যার সময় বদন বলিল, যে কটা পয়সা আছে দু'সেরের বেশি চাল হবে না। তাতে একবেলা চলবে। তারপর? হারু বলিল, জুটে যাবে খ'ন।

বদন শূকরের মতো অব্যক্ত শব্দ করিয়া বলিল, ছাই, এ রাজ্যে দুদিনের মধ্যে এক বেটাও মরল না। মানুষগুলো দিন দিন যেন অমর হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গর্জিয়া উঠিল, কড়... কড়াৎ...কড়। হারু বলিল, "কাল সকালে যা হয় করব। আজ এখন শোয়া যাক্।"

ঘুম তাদের হইল না। কিন্তু বিধাতা প্রার্থনা শুনিলেন। মধ্য রাত্রে একজন যুবক আসিয়া ডাকিল, "হারু, বদন!" কোলে তার একটি মৃত শিশু। নিজের স্নেহ পুত্তলি পুত্রকে সে একাই পোড়াইতে আসিয়াছিল। লোকটি জাতিতে পদ্মরাজ। পাঁচ মাইলের মধ্যে আর পদ্মরাজ নাই। কাছে জেলে, কোচ, যুগী, ভুঁইমালী আছে বটে কিন্তু তারা পদ্মরাজের মড়া ছুঁইবে না। তাই সে একাই নৌকা বাহিয়া আসিয়াছিল পুত্রের প্রতি শেষ কর্তব্য সম্পাদন করিতে।

তার ডাক শুনিয়া বদন বলিল, এত রাত্তিরে মড়া পুড়তে বেশি দাম লাগবে। যুবকের কাছে একটি মাত্র টাকা ছিল। সে বলিল, বড় গরীব আমি। এই একটি টাকা আছে।

বদন বলিল, এক টাকায় আর মড়া পোড়ে না।

যুবকটি অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াও তাকে রাজী করাইতে পারিল না। বদন বলিল, একটা মড়া পোড়াবার মতো কাঠ আছে বটে। কিন্তু এক টাকায় তোমার সেই কাঠ বেচলে তারপর যদি কেউ আসে, তখন যে ভিটের গাছ কাটতে হবে।

নিরুপায়ের দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া যুবকটি বলিল, তবে ছেলেটাকে জলেই ফেলে দিতে হবে দেখছি। শকুন কাছিমে ঠুকরে খাবে। এমন অদৃষ্টই করেছিলাম বলিয়াই সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হারু বদনকে বলিল, দে ভাই, অমন করে কাঁদছে।

বদন তাকে কষিয়া ধমক দিল, বলিল, আরে না মরলে আমাদের কাছে কেউ আসে না। মড়ার দুখখু দেখে গললে চলবে কেন? হারু আরও দু'একবার বলিল। বদন কিছুতেই সম্মত হইল না। কিন্তু যখন দেখিল যে যুবকটি সত্যই শব লইয়া যাইতেছে তখন ভাবিল, লোকটিকে হাত ছাড়া করা উচিত নয়। একটা টাকায় যাহাই হোক অন্তত আরও কয়েক বেলার চালের সংস্থান হইবে। সে শেষটায় বলিল, আচ্ছা—কাঠ দিচ্ছি, দুদিন পরে দামটা দিয়ে যেও কিন্তু। আরও এক টাকা লাগবে।

যুবকটি বলিল,—দুদিনের মধ্যে পারব না। সাতদিন সময় দাও। ছেলের ঋণ আমি রাখব না।

বদন বলিল,—আচ্ছা, পাঁচদিনের মধ্যে দিয়ে যেও।

যুবকটি পুত্রের দেহ ছুঁইয়া বসিয়া রহিল। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে। চিতা যে জ্বলিবে না।

পরদিন সকালে, শিশুটির চিতা তখন নিবিয়া আসিতেছে। বদন হারুকে একটা টাকা ও কয়েক আনা পয়সা দিয়া বলিল,—"জলদি গিয়ে চাল নিয়ে আয়। চিতা নিবে যাওয়ার আগে ফিরবি। তা না হলে আবার জ্বালানি কাঠ লাগবে।" মৃতের পিতা ইহা শুনিয়া বদনের দিকে চাহিয়া রহিল।

চিতা নিবিয়া গেল, হারু আর ফিরিল না। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বদনের ক্ষুধা বাড়িতে লাগিল। সে হারুর উদ্দেশ্যে গালি পাড়িতে আরম্ভ করিল।

চারিদিকে অসীম জলরাশির মধ্যে বদন একা বসিয়া আছে। ডিঙিখানা হারু লইয়া গিয়াছিল। সে না ফিরিলে বদনের এক পা নড়িবার সামর্থ্য নাই। আগের দিনে সে উপবাসী ছিল। তার আগেও কদিন পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই। হারু না ফিরিলে আরও কতকাল যে না খাইয়া থাকিতে হইবে, একমাত্র বিধাতাই জানেন। সকাল হইতে বৃষ্টি পড়িতেছে। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ, দু একটা কাকের ক্ক ক্ক ভিন্ন আর কিছু শোনা যায় না। পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধিত হিংস্র পশুর মতো বদন মধ্যে মধ্যে নিষ্ফলা গর্জন করিতে থাকে।

দুপুরের পর বৃষ্টি একটু কমিলে সে একটা ন্যাড়া গাছের উপর উঠিয়া চারিদিকে চাহিল। একটি জেলে বিলের মধ্যে নৌকায় বসিয়া মাছ ধরিতেছে। আরও দূরে দেখা যায় কয়েকখানা বেদের নৌকা। বদন এদিক ওদিক চাহিয়া তাদের ডিঙিখানা দেখিতে পায় না। তখন সে গলা ছাড়িয়া ডাকে, হা—রু।

সেই স্বরে ভীত হইয়া পাশের গাছ হইতে একটি কাক উড়িয়া যায়, ছানাগুলি চীৎকার করিতে থাকে, চি—চি।

বৈকালের দিকে বদন খুব দুর্বল বোধ করিল। প্রত্যহ দু'সের ভাত খাওয়া তার অভ্যাস। দুদিন পেটে কিছু না পড়ায় সে একেবারেই ভাঙিয়া পড়িল। হারুর উপর তার রাগও কমিয়া গেল। ভয় হইল হারুর কিছু হইয়াছে। কিন্তু নিজে সে নিরুপায়, খোঁজ করিবার সাধ্যও তার নাই।

বৈকালে ভিটার পূর্বপ্রান্তে যাইয়া সে ডাকিল, হা—রু—উ। বাতাসের বুকে সে শব্দ মিশিয়া গেল। বদন তারপর গেল দক্ষিণ দিকে, সেখানে গিয়া কানে হাত দিয়া আরও উঁচু গলায় ডাকিল হা—রু—উ। এবার জবাব আসিল। দূর হইতে একটি শকুনি চীৎকার করিয়া উঠিল কর্—র্—র্—র্—। বদন তার উদ্দেশ্যে কুৎসিত গালি পাড়িল।

পরদিন প্রাতে একদল ভদ্রলোক আসিলেন একটি স্ত্রীলোকের শব লইয়া। বদনের তখন একখানাও কাঠ নাই। সে বলিল, তোমাদের নৌকাখানা একবার দাও তো কাঠ আনতে হবে।

সে তাঁদের কাছে হারুর কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহারা কোনো জবাব দিতে পারিলেন না।

ঘণ্টাখানেক পরে শবযাত্রীরা দেখিলেন, তাঁদের নৌকার সঙ্গে একটি ডিঙি বাঁধিয়া বদন ফিরিতেছে। কাঠ সে আনে নাই কিন্তু ফিরিয়াছে ডিঙির উপর একটি শব লইয়া।

বদন হারুর নীলবর্ণ ফুলা মৃতদেহটি ভিটার উপর তুলিল। একটি ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় পেলে?

বদন বলিল, পাতিয়ার বিলে। সাপে ওর হাত কামড়ে দিয়েছে। ডিঙির মধ্যে সের দশেক লাল মোটা চাল এবং কয়েকটা কইমাছ ছিল। কই মাছগুলি হারুর দেহের দুচার জায়গা খাইয়া ফেলিয়াছে, পাখিতে ঠোক্‌রাইয়া শবটিকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে।

বদন চাল ও মাছগুলি তুলিয়া কুড়াল লইয়া অগত্যা ভিটার একটি মরা গাছ কাটিয়া ফেলিল। কাটিতে বেশি সময় লাগিল না। ভদ্রলোকের প্রশ্নে সে হুঁ হাঁ করিয়া সংক্ষেপে জবাব দিল। স্ত্রীলোকটির শব সৎকার করিয়া ভদ্রলোকেরা চলিয়া গেলেন। যাবার সময় একজন বলিলেন, থানায় খবর দাও, বদন বলিল, কাকে চিলেই যথেষ্ট ঠুকরেছে। আর দরকার কি?

তারা চলিয়া গেলে বদন ভাল করিয়া একটা চিতা সাজাইল। তারপর যত্নের সহিত হারুর শবটি চিতার উপর তুলিয়া দিল। চিতার ধোঁয়া সাপের মতো কুণ্ডলী পাকাইয়া আকাশে উঠিতে লাগিল। বর্ণে তার একটা নীল আভা। দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া বদন মানুষ পোড়াইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এ ধোঁয়া জীবনে আর কখনও দেখে নাই। এই ধোঁয়ায় দৃষ্টি যেন ঝাপসা হইয়া আসে। সেদিন আকাশ ছিল পরিষ্কার, গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য আগুনের হল্কা ঢালিয়া দিতেছিল। হারুর চিতার ধোঁয়া সূর্যের জ্যোতিকে ম্লান করিল। তারপর চিতার বুক হইতে উঠিতে লাগিল লোলজিহ্ব অগ্নিশিখা। যেন কতগুলি লাল সাপের ফণা; ক্রুদ্ধ তার গর্জন, অফুরন্ত তার হিংসাবৃত্ত।

চিতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বদন আপনা আপনি বলিয়া উঠিল, দুর ছাই, কিছু ভাল লাগে না। আগুনটা আবার নিবে যাবে। এর উপরই চাল চড়িয়ে দি।

হারুর চিতায় বদনের চাল চড়িল। বদন একদৃষ্টে হাঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। হাঁড়ির ভিতর চালের সঙ্গেই গোটা দুই মাছ সিদ্ধ হইতেছিল। ফুটন্ত ভাতের টগবগানি, চিতার চড়্—চড়াৎ চড় শব্দ—তাছাড়া সবই নিস্তব্ধ।

উর্দ্ধে অনন্ত নীল আকাশ,—চারধারে সীমাহীন জলরাশি— তার মধ্যে বাতাসের তালে তালে ঘাসের পাগল নৃত্য, উচ্ছল জলের সাবলীল ভঙ্গী।

দূরে আকাশের বুকে বকের পাতি উড়িতেছে। বৈকালী সূর্য চিতার উপর ফাগের গোলা ঢালিয়া দিয়াছে। চিতার আগুন ও সূর্যের আলোয় মাদারের ভিটা একটা লাল আভা ধারণ করিল। চিতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বদনের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

১৪.২ জীবনকথা ও সাহিত্য পরিচয়

রমেশচন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ আগস্ট, জন্মস্থান কলকাতার চোরবাগান। যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বাংলাদেশের ফরিদপুরের মানুষ। তাঁর বাবার নাম ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, মায়ের নাম বরদাসুন্দরী। বাবা ছিলেন কলকাতার একজন নামকরা কবিরাজ।

পারিবারিক সংস্কৃতচর্চার ঐতিহ্য অনুসরণ করে প্রথমে রমেশচন্দ্র পণ্ডিত সীতানাথ সাংখ্যতীর্থের সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভ করেন। মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন বাবার মতো নামকরা কবিরাজ হওয়ার। কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনদের বক্রকটাক্ষে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার চাহিদা জন্মায়। টোলে পাঠরত অবস্থাতেই তিনি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রাইভেটে এন্ট্রান্স পাস করেন। এদিকে সংস্কৃত বোর্ডের তিনটি পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্থান সহ ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাস করেন। এম.এ. পড়া আরম্ভ করলেও হঠাৎ বাবার মৃত্যু তাঁর পড়াশুনায় ছেদ টেনে দেয়। পৈতৃক পেশা কবিরাজিকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন।

মাদ্রাজে নিখিল ভারত আয়ুর্বেদ সম্মেলনে (১৯১৮) সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ দিয়ে তিনি আকর্ষণ করেন বিদগ্ধজনের দৃষ্টি এবং সম্মানিত হন 'বিদ্যানিধি' উপাধিতে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা করেই তাঁকে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করতে হত। আবার চিকিৎসা ছিল তাঁর কাছে মানবসেবা, ফলে দারিদ্র ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী।

রমেশচন্দ্র ছাত্রাবস্থাতেই প্রতিষ্ঠা করেন সাহিত্য-সেবক সমিতি নামে সাহিত্য-সংঘের। ১৯১১-তে প্রতিষ্ঠিত হয় এই সংঘ। প্রারম্ভিক লগ্নে এর সদস্য ছিলেন রমেশচন্দ্র সেনের বাবার কাছে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়তে আসা ছাত্ররা। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর এই সমিতির কার্যধারা অক্ষুন্ন ছিল। বলা বাহুল্য এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন রমেশচন্দ্র। 'কল্লোল-কালিকলম' থেকে 'কৃত্তিবাস'—এই সময়কালের বহু খ্যাত-অখ্যাত লেখক এই সাহিত্য-সেবক সমিতি-র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। যোগদানকারীদের মধ্যে যেমন ছিলেন—শিবনাথ শাস্ত্রী, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, জলধর সেন কিংবা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিভূতি-তারাশঙ্কর-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়; তেমনই আবার ছিলেন—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এরকম এক সাহিত্য-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে রমেশচন্দ্র সেনের নাম সাহিত্যের ইতিহাসে

স্মরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

রমেশচন্দ্র সেন তাঁর রচিত দুটি স্যাটায়ার গল্প 'রাজার বানর' ও 'দরিদ্রের ক্ষুধা' পাঠ করেন ১৯১৮-তে, সাহিত্য-সেবক সমিতির অধিবেশনে। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বীরবল। গল্পপাঠের মধ্য দিয়েই ছোট গল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে তাঁর। ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প—'ঋণশোধ'; 'উৎস' পত্রিকায় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে রমেশচন্দ্র সেনের আবির্ভাব ঘটল 'কল্লোল'-'কালি-কলম'-এর অন্তিম পর্বে। জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যখন ঘোর সংকট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে কিন্তু রেখে গেছে যুদ্ধের স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের শোষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, রাজনৈতিক আন্দোলনও তখন আবর্ত সংকুল। সাহিত্যেও তখন পালাবদলের আয়োজন। একদিকে রবীন্দ্র-বলয় থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা, তেমনই অন্যদিকে 'কল্লোল'-এর বোহেমিয়ানিজম, বাস্তবকে প্রতিফলিত করার তাগিদ ঝোঁক, ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্ব-আশ্রয়ী দেহবাদ, রুশবিপ্লবের সংগ্রামীচেতনা—বাংলা সাহিত্যের পরিবর্তিত চেহারাটি স্পষ্ট করে তুলেছিল। রমেশচন্দ্র সেন স্ব-কালের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এ-কথা সত্য, কিন্তু কখনই কল্লোলীয় অতিবাস্তবতা প্রকাশের আগ্রহে ভাববাদের চোরামোহ প্রবিষ্ট হয়নি তাঁর সাহিত্যে। ব্যক্তির বা সমাজের পরিচয়টিকে তিনি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন বাস্তব অভিজ্ঞতার আশ্রয়েই। তাঁর সাহিত্য আবেগ-নির্ভর নয়, অভিজ্ঞতা-নির্ভর। শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ ছবি তাঁর গল্প উপন্যাসে পাওয়া যায়।

রমেশচন্দ্র সেনের সাহিত্যে আবির্ভাব 'কল্লোল'-'কালিকলম'-এর অন্তিম পর্বে ঘটলেও তিনি তাঁর সাহিত্য-জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন চল্লিশের উত্তালতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা—ঘটনাবহুল চল্লিশের দশকও স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত করেছে তাঁকে। তাঁর বিখ্যাত গল্প 'সাদা ঘোড়া'—এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতেই রচিত হয়েছে। মন্বন্তর নিয়ে লিখেছেন—'প্রেত', 'হারানী', 'ভাত' ইত্যাদি গল্প। চল্লিশের দশকের প্রগতিবাদী সাহিত্যচেতনা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর গল্প-রচনার বিষয়বস্তুতে। 'দৈনিক স্বাধীনতা'-য় প্রকাশিত 'ভবানী সিংহের দিশারী' গল্পটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ঔপন্যাসিক হিসাবেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন রমেশচন্দ্র সেন। 'শতাব্দী' (১৯৪৫), 'চক্রবাক' (১৯৪৫), 'কুরপালা' (১৯৪৬), 'কাজল' (১৯৪৯), 'সৌরীগ্রাম' (১৯৫৩), 'মালঙ্গীর কথা' (১৯৫৮)—প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। সামন্ততান্ত্রিক গ্রামজীবনের অর্থনৈতিক পরিবর্তন ('শতাব্দী'), গ্রামজীবনে প্রেমোপাখ্যান ('চক্রবাক'), গ্রামবাংলার নিম্নবিত্ত মানুষদের কথা ('কুরপালা') যেমন তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে তেমনই কোথাও তে-ভাগা আন্দোলন ('সৌরীগ্রাম'), কোথাও গণিকা-পল্লিও ('কাজল') তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১ জুন রমেশচন্দ্র সেনের মৃত্যু হয়।

কথাসাহিত্যিক হিসাবে তাঁর প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন আজও হয়নি, উপেক্ষিতই রয়ে গেছেন আমাদের কাছে।

আমাদের আলোচ্য 'ডোমের চিতা' গল্পটি 'মৃত ও অমৃত' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গল্পগ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশক পূরবী পাবলিশার্স, কলকাতা।

১৪.৩ গল্প-বিবরণ

জীবনের সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। অথচ বাংলা সাহিত্যে জীবনকে দেখার বহুধা-বিচিত্র আয়োজন থাকলেও জীবিকা-কেন্দ্রিক জীবনকে রূপ দেওয়ার বিপুলতর প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না। রমেশচন্দ্র সেনের 'ডোমের চিতা' গল্পটি সেদিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে স্বীকার করে নিতে হয়।

শব দাহ করার জন্য শ্মশানভূমিতে ডোম চিতা সাজায় এবং দাহ-কার্যের মধ্য দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করে। ডোমদের জীবন-সম্পর্কিত এই স্বল্প তথ্যই সাধারণ পাঠকের চেনা-জানার পরিধি। গল্পটির বিষয়বস্তু আমাদের এই সীমিত পরিধিকে সম্প্রসারিত করে।

মানুষ শ্মশানে মৃতদেহ নিয়ে আসে সৎকারের জন্য। আবাসস্থল থেকে দূরেই সাধারণত শ্মশানের অবস্থান। মানুষের বসতির জীবন-চাঞ্চল্য শ্মশানভূমিতে অনুপস্থিত। কিন্তু প্রাণ-স্পন্দন তো স্তব্ধ থাকতে পারে না— শ্মশানভূমিতে, জীবিকার প্রয়োজনে তাও হয়ে ওঠে মানুষের আবাসস্থল। গল্পের শুরুতেই লেখক শ্মশানভূমির যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন সেই শ্মশান যেমন মৃতদেহ সৎকারের স্থান, তেমন দু-জন শ্মশানজীবী ডোম— হারু ও বদনের আবাসস্থলও বটে। লেখক সে-কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য শ্মশানের স্বল্প বর্ণনা দিয়েই সংযোজন করেন— 'এই ভিটায় দুটি ডোম থাকে হারু ও বদন।'

চারিদিকে বিপুল জলরাশির মধ্যে জেগে ওঠা চরের মতোই একখণ্ড স্থলভূমি 'মাদারের ভিটা এই অঞ্চলের শ্মশান।' লেখক জানিয়েছেন—'এই জলরাশির মাঝখানটায় শুষ্ক প্রাণহীন মাদারের ভিটা যেন প্রকৃতির একটা অনিয়ম!' লক্ষণীয় এই স্থলভূমিকে বলেছেন লেখক 'প্রকৃতির একটা অনিয়ম'। আর এই ভিটাতেই বসবাস হারু ও বদনের। জলের বুক থেকে উঠে দাঁড়ানো ভিটে যেমন বহন করছে প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙঘনের অভিজ্ঞান, ঠিক সে-রকমই সভ্যসমাজের জীবন-যাপনের যে স্বাভাবিক রীতি-নীতি তার বিপরীত কোটিতে হারু-বদনের অবস্থান; প্রকৃতির এও যেন এক অনিয়ম।

হারু ও বদন সবার পরিচিত, কুড়ি বছর ধরে সৎকারের কাজে নিযুক্ত, কিন্তু কেউ জানে না তাদের আদি-নিবাসের কথা। সভ্যসমাজের জীবন-যাত্রার সঙ্গে সংযুক্ত করে না-দেখানোর প্রচেষ্টাতেই জানানো হয় না তাদের আদিনিবাস। লেখকের ভাষায়—'যমদূতের মতো আকাশ হইতে তারা এই শ্মশানের বুকে আবির্ভূত হইয়াছিল মড়ার কাঠ জোগাইবার জন্যে।'

হারু ও বদনের জীবন-যাপনের প্রকৃতিও আদিম। তারা শব সৎকারের জন্য আগত শ্মশানযাত্রীদের কাঠ বিক্রি করে, বিলের মাছ ধরে, আর মৃতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত চাল, ডাল, ফল-ফলারি সিদ্ধ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করে। সমাজের সঙ্গে তাদের কোনও সংযোগ নেই, এমনকি নিজেদের মধ্যেও তেমন ভাবের আদান-প্রদান নেই। 'কোন্ মৃতদেহ কিরূপে পুড়িল, কোন্‌টার হাড় কতখানি শক্ত এই-ই তাদের আলোচ্য বিষয়।'

—গল্পের প্রথমাংশে হারু ও বদনের জীবনকে স্বল্প কথায় লেখক এইভাবেই লিপিবদ্ধ করেছেন। হারু ও বদনের জীবনের পূর্ণ পরিচয় রূপদানের অবকাশ ছোটগল্পের পরিসরে নেই। গল্পটির প্রতিপাদ্য বিষয়ও স্বাভাবিকভাবেই তাদের পূর্ণতর পরিচয় উদ্‌ঘাটন নয়। অথচ যাদের জীবনকে তিনি রূপদান করছেন পূর্বেই আমরা জানিয়েছি যে তারা আমাদের চেনা-জগতের বাসিন্দা নয়। ফলে বিবরণের ঢঙে লেখককে গল্পের প্রথমাংশে উপস্থাপন করতে হয়েছে এদের স্বল্প জীবন-পরিচয়।

প্রকৃত অর্থে গল্পটি শুরু হয়েছে একটি বিশেষ দিনকে আশ্রয় করে। দু-দিন ধরে এসময় কোনো মৃতদেহ সৎকারের জন্য শ্মশানে কেউ নিয়ে আসেনি, সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টি, আর এদিকে হাঁড়িতে তাদের রান্না করার মতো চালও নেই। চাল কিনতে গেলে এক ক্রোশ দূর যেতে হয়, কিন্তু অবিরল বর্ষণে তারা চাল কিনতে যেতে পারে না। শুকনো ছোলা চিবিয়ে দিন কাটিয়ে দেয়। আর্থিক পরিস্থিতি বদনকে শঙ্কিত করে। যে-কটি পয়সা তাদের হাতে অবশিষ্ট রয়েছে তাতে একবেলার বেশি চাল কেনা যায় না। শেষ পর্যন্ত হারুর কথা অনুযায়ী বদন শুয়ে পড়ে এবং পরের দিন এ-বিষয়ে ভাবা যাবে বলে মনস্থির করে।

—উল্লিখিত গল্পাংশটিতে হারু ও বদন চরিত্রের মানসিকতার সুন্দর পরিচয় উপস্থাপন করেছেন। মানুষের জীবিকা পাল্টে দেয় তার জীবনদর্শন। মৃত্যু আমাদের কাছে বেদনাদায়ক, কিন্তু মৃতদেহ সৎকারের মধ্য দিয়ে যারা জীবিকা-নির্বাহ করে তাদের মৃত্যুর অর্থ অন্যরকম। লেখকও এই জন্য বলেন—'হারু ও বদনের দুর্ভাগ্য-ক্রমে আজ দু-দিন পর্যন্ত মড়া আসে নাই।' লক্ষণীয় মড়া না আসা তাদের জীবনে 'দুর্ভাগ্য' বলে চিহ্নিত হয়। বাস্তবিকই এর জন্য ছোলা চিবিয়ে দিন কাটাতে হয় তাদের, চাল কেনার অর্থাভাব শঙ্কিত করে। বদনের কথার মধ্যে শব না আসার কারণে ক্রোধও ধরা পড়ে'— ছাই, এ রাজ্যে দুদিনের মধ্যে এক বেটাও মরল না। মানুষগুলো দিন দিন যেন অমর হয়ে উঠেছে।' বদনের জীবন-নিরীক্ষণের ভিন্ন দৃষ্টিকোণ তৈরি করে দিয়েছে তার জীবিকা।

অবিরল বর্ষণের দিনই মধ্যরাতে শ্মশানে কোলে একটি মৃত শিশু নিয়ে হাজির হয়েছে এক যুবক। জাতিতে সে পদ্মরাজ। পাঁচ মাইলের মধ্যে আর কোনও পদ্মরাজের বসবাস নেই, আছে জেলে, কোচ, যুগি, ভুঁইমালি সম্প্রদায়ের মানুষ, কিন্তু তারা পদ্মরাজের মড়া স্পর্শ করবে না। এইজন্য মৃতপুত্রকে নিয়ে সৎকারের জন্য একাই শ্মশানে আসতে হয়েছে যুবকটিকে। অস্পৃশ্যতা নামের অন্ধ-সংস্কার কেবল জীবিত মানুষকে ঘিরে নয়, এমনকি মৃতের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযুক্ত হয়। সমাজের এই অন্ধকার দিক চিনিয়ে দেয় গল্পটি।

সদ্য সন্তানহারা যুবকটির তার শিশুপুত্রটিকে দাহ করার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ নেই। সম্বল তার মাত্র এক টাকা। এক টাকাতে দাহ করার প্রয়োজনীয় কাঠ দিতে সম্মত হয় না বদন। যুবকটি কাকুতি-মিনতি জানায়, দুঃখে কেঁদে ফেলে, তবুও সহজে রাজি হয় না সে। কিন্তু হারুর মনে যুবকটির কান্না নাড়া দেয়। বদনের আচরণে অর্থোপার্জনের জন্য যতখানি কঠোর মনোভাব লক্ষ করা যায়, ততখানি কঠোরতা হারুর নেই। একই পেশা, জীবন-যাপন একইরকম, অথচ মানসিকতার ফারাকটি কয়েকটি সংলাপেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হারু বদনকে কয়েকবার অনুরোধ জানালেও বদন তাতে সাড়া দেয় না। বরং ধমক দিয়ে ওঠে—'আরে না মরলে আমাদের কাছে কেউ আসে না। মড়ার দুখ্খু দেখে গললে চলবে কেন?' বদন শেষ পর্যন্ত রাজি হয় ওই একটি টাকাও হাতছাড়া হবার ভয়ে। অবশ্য দু-দিন পরে কাঠের মূল্যবাবদ আরও একটি টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে বদন পাঁচদিনের মধ্যে টাকা দিয়ে যেতে বলে। বাকি অর্থ আদায়ের জন্য বদনের প্রচেষ্টা যেমন লক্ষণীয় তেমনি যুবকটির বাকি দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান ও বেশি সময় প্রার্থনা একাধারে সততা ও অর্থনৈতিক অক্ষমতার পরিচয় বহন করে। লেখক ডোম সম্প্রদায়ের জীবিকা-কেন্দ্রিক জীবন-পরিচয় লিপিবদ্ধ করার ফাঁকে ফাঁকে সেই সূত্রেই সমাজজীবনের চেহারাটি চিনিয়ে দেন।

বদন হারুকে একটা টাকা ও কয়েক আনা পয়সা দিয়ে পরের দিন তাড়াতাড়ি চাল নিয়ে আসতে বলে। তাড়াতাড়ি আনতে বলার কারণ যাতে শিশুটির চিতার আগুনেই তা সেদ্ধ করে নিতে পারা যায়। চিতা নিবে যায়, দুপুর কাটে, তবুও হারু চাল নিয়ে ফিরে আসে না। ক্ষুধার্ত বদন ক্রোধে হারুর উদ্দেশ্যে গালি দেয়।

বিকেলে ক্ষুধায় কাতর বদন ক্লান্তি অনুভব করে, হারুর ওপর রাগ কমে যায়, বরং তার পরিবর্তে হারুর জন্য অজানা আশঙ্কায় মন বিচলিত হয়। ভিটার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে সে চিৎকার করে হারুর উদ্দেশ্যে ডাক ছাড়ে। কিন্তু হারুর কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

হারুর সন্ধানে বদন বেরুতে পারে না দ্বিতীয় ডিঙির অভাবে। পরের দিন একদল ভদ্রলোক নৌকা করে একজন স্ত্রীলোকের শব নিয়ে এলে তাদের নৌকাখানি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে হারুর সন্ধানে। ঘন্টাখানেক পরে হারুর মৃতদেহ সমেত ডিঙি নৌকার সঙ্গে বেঁধে ফিরে আসে। কেবল হারুর মৃতদেহ নয়, ডিঙিতে সেইসঙ্গে নিয়ে ফিরে সের দশেক মোটা চাল আর কয়েকটি কই মাছ। হারুর সর্প-দংশনে মৃত্যু হয়েছে। বদন হারুর বিষে নীল হয়ে যাওয়া শরীর দেখে বুঝতে পারে।

হারুর মৃতদেহ বহন করে এনেও বদনের কোনো চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ করা যায় না। ভদ্রলোকদের প্রশ্নে সংক্ষেপে হুঁ হাঁ জবাব দিয়ে গাছ কাটাতে মনোনিবেশ করে। তার এই প্রস্তরকঠিন মূর্তি দেখে মনে হয় যেন মানবিক সুকুমার বৃত্তিগুলি তার মধ্যে অনুপস্থিত। এমনকি হারু বদনের চিতা সাজিয়ে সেই আগুনে হাঁড়ি চড়িয়ে দিয়ে চাল ও মাছ সেদ্ধ করতেও উদ্যত হয়। কিন্তু এই বদনের ভেতরকার মানবিক সত্তা উন্মোচিত হয় গল্পের শেষ ছত্রে। গল্পকার লেখেন—'চিতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বদনের চোখ দিয়ে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।' 'কোন্ মৃতদেহ কিরূপে পুড়িল, কোন্টার হাড় কতখানি শক্ত'—এই-ই ছিল হারু-বদনের নিজেদের আলোচনার বিষয়। জীবিকাকেন্দ্রিক এই আলোচনা ছিল অবসর-যাপনের খোরাক। কিন্তু বদনের হারুর চিতা সাজানো জীবিকার প্রয়োজনে নয়, জ্বলন্ত চিতায় শায়িত আজ তারই নিকটজন। এইজন্যই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে তার। বদনের অশ্রুবর্ষণ পাঠকের হৃদয়কেও স্পর্শ করে।

১৪.৪ গঠন-বিশ্লেষণ

যে গল্পের উপজীব্য বিষয় ডোমদের জীবন, সে-গল্প বিষয়বস্তুর গুণেই স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। কিন্তু এ-কথা ঠিক এজাতীয় বিষয়বস্তু অবলম্বনে শিল্পোত্তীর্ণ গল্প রচনা করতে গেলে লেখকের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও শিল্প-দক্ষতার প্রয়োজন। মধ্যবিত্তসুলভ ভাবালুতা অনেকসময় এ-জাতীয় গল্পের কাহিনি-বর্ণনা বা চরিত্র-সৃজনে সংযুক্ত হয়ে বাস্তবতাবোধকে ক্ষুণ্ন করে। কাহিনি-বর্ণনা বা চরিত্র-সৃজনে কোনও ভাবালুতাকে লেখক প্রশ্রয় দেননি। তবে যতটুকু কাহিনি লেখক গল্পটিতে পরিবেশন করেছেন, অথবা স্বল্পকথায় চরিত্র দুটির পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তা গল্পটির অর্ধাংশ মাত্র। গল্পটিকে যে পটভূমিতে স্থাপন করেছেন সেই পটভূমিকে যে-ভাবে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে অন্বিত করেছেন তাতে গল্পটি পেয়েছে স্বতন্ত্র মর্যাদা।

গল্পের পটভূমি শ্মশান। লক্ষণীয় শ্মশানের পটভূমি আঁকতে গিয়ে কোনো অতিপ্রাকৃত আবহের সৃষ্টি বা শ্মশানের নিখুঁত বর্ণনা প্রদানের প্রতি লেখকের আগ্রহ নেই। লেখক শ্মশানযাত্রীর চোখে শ্মশানকে তুলে ধরেন না, কারণ গল্পটি কোনো শ্মশানযাত্রীর নয়, শ্মশানজীবীর। শ্মশানজীবীর কাছে শ্মশান কোনো ভয়াল-ভীষণ স্থান নয়, কেবল মৃত সৎকারের স্থান নয়, এটি তার জীবিকার স্থান, আবাসস্থলও বটে। এইজন্য হারু ও বদনের জীবিকার এবং জীবন-যাপনের পরিচয় দিতে গিয়ে পটভূমির পরিচয় দেন লেখক।

দ্বিতীয়ত, গল্পটিতে মৃত্যু ঘিরে মহৎ জীবন-দর্শনকেও কোথাও লিপিবদ্ধ করেন না লেখক। গল্পটি হারু ও বদনের। মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের জীবিকা। হারু ও বদনের জীবন-ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যু-সম্পর্কিত মহৎ জীবন-দর্শন সত্য বলে প্রতিপন্ন হতে পারে না। আবার শ্মশানযাত্রীদের মধ্যেও এ-ধরনের কোনও উপলব্ধি সংযোজন না-করে হারু-বদনের জীবন-ভাবনার পরিপূর্ণ অংশীদার করা হয় পাঠকদের।

গল্পটিতে বারে বারেই এসেছে প্রকৃতির বর্ণনা। প্রকৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়েই শ্মশানের পটভূমি নির্মাণ করা হয়েছে। গল্পটির শুরুই হয়েছে প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে—'ধূ ধূ করে প্রকাণ্ড বিল। চারিদিকে জল আর জল। জলের বুকে কচুরিপানার গাদার মধ্যে মাঝে মাঝে রক্তশাপলা ও রক্তকমল। নানা রকম ঘাসের বুকে বিচিত্র রঙের ছোট ছোট ফুল ফুটিয়াছে। কোনোটা নীল, কোনোটা বেগুনী, কোনোটা বা ধবধবে সাদা।'—এই জলরাশির মাঝখানে অবস্থান শুষ্ক প্রাণহীন মাদারের ভিটার যা এই অঞ্চলের শ্মশান। সৃষ্টিলগ্নে পৃথিবী ছিল জলপূর্ণ, তারপর আস্তে আস্তে জাগ্রত হয়েছে স্থলভূমি—ভূ-বৈজ্ঞানিক মহলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এই মত। বিভিন্ন দেশের মহাকাব্যে, লোককথায় যে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা পাওয়া যায় তাতেও বিপুল জলরাশির গর্ভ থেকেই মেদিনীর উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। হারু ও বদন আদিম-মানবের প্রতিনিধি—এ-কথা বলা যায় না। কিন্তু হারু-বদনের সভ্য-সমাজবিবিক্ত যে জীবন-যাপন তাতে মনে হয় যেন সময় এখানে থেমে আছে। তাদের পূর্ব নিবাসের পরিচয় না দিয়ে লেখক জানান—'যমদূতের মতো আকাশ হইতে তারা এই শ্মশানের বুকে আর্বিভূত হইয়াছিল মড়ার-কাঠ যোগাইবার জন্যে।' গল্পের প্রারম্ভিক লগ্নের স্থানিক পরিচয় যেন হারু-বদনের চরিত্রেরই পরিপূরক।

হারু-বদনের জীবিকার সঙ্গে সভ্য-সমাজের আছে ওতপ্রোত সংযোগ। কিন্তু তাদের জীবন-যাপনের পদ্ধতি আদিম। 'মাদারের ভিটায় একটি কুঁড়ে বাঁধিয়া তারা থাকে। সমাজ-সংসার সবই তাদের পরস্পরকে লইয়া। বাইরের জগৎ এই ডোম দুটির কাছে অর্থহীন।'—এহেন জীবন-যাপন কখনই বাস্তবোচিত হয়ে উঠত না, যদি না পটভূমিটির যথাযথ রূপায়ণ ঘটত।

মানব-সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে ও উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যেতে প্রতিনিয়ত মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। আদিমকাল থেকে আজও সেই ধারা অব্যাহত। কিন্তু আজ, এই উন্নত মানব-সমাজের সঙ্গে প্রকৃতির সংগ্রাম ভিন্ন ধরনের। হারু-বদনের জীবন-যাপনের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আদিমলগ্নের সংগ্রাম-কথা। পোড়ো ভিটার গাছ কেটে তারা মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করে; বিল থেকে মাছ ধরে আয়োজন করে উদর-পূর্তির। আদিম জনসমাজে ব্যক্তির সম্পত্তিতে অধিকার নেই, বরং নিজের শক্তি ও বুদ্ধির জোরে যতখানি প্রকৃতি থেকে অর্জন করতে পারে তাই নিজস্ব হয়ে যায়। হারু-বদনের জীবনও যেন অনুরূপ। এই জীবন বড় বেশি পাশবিক। লেখক এইজন্য তাদের হাসি, ক্রোধ বোঝাতে গিয়ে পশুর আচরণের সঙ্গে তুলনা টানেন। যেমন—

১। 'মৃতদেহের অস্বাভাবিকতা মধ্যে মধ্যে তাদের হাসির উদ্রেক করে বটে কিন্তু সে হাসি হিংস্র জানোয়ারের ক্রুদ্ধ গর্জনের মতো বিকট।'

২। 'বদন শূকরের মত অব্যক্ত শব্দ করিয়া বলিল....'

৩। 'বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ, দু-একটা কাকের ক্ব-ক ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধিত হিংস্র পশুর মতো বদন মধ্যে মধ্যে নিস্ফলা গর্জন করিতে থাকে।'

প্রকৃতিকে জয় করে যেমন তাদের বেঁচে থাকা, তেমনি প্রকৃতির শক্তির কাছে তারা কোথাও কোথাও অসহায়ও। অবিশ্রান্ত বর্ষণ হারু-বদনের স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত করে। তবে প্রকৃতির কাছে অসহায়রূপে ধরা পড়ে হারুর চাল কিনতে গিয়ে ফিরে না আসাতে। হারুর কথা ভেবে বদনের শঙ্কা হয় অথচ বিপুল জলরাশিকে অতিক্রম করে ডিঙির অভাবে আনতে পারে না তার সংবাদ। আবার হারুর মৃত্যু ঘটেছে সাপের কামড়ে। হারুর মৃত্যু প্রকৃতির কাছেই নতিস্বীকার।

হারু খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে ফিরে এল খাদ্য হয়ে। সের দশেক মোটা চাল আর কই মাছ সমেতই তার ফিরে আসা। কিন্তু এই মৃত হারু কই মাছেরই খাদ্য হয়ে উঠেছে, পাখিতেও তাকে ঠুকরে খেয়েছে। আবার এরপর বদন চাল বা কইমাছগুলি হারুর চিতার আগুনে চাপিয়ে দিয়ে উদরপূর্তির আয়োজন করেছে। ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের প্রচেষ্টাতে মানব আর মানবেতর প্রাণীর কোনো ভেদ নেই এখানে। বীভৎস ও অমোঘ সত্য এ-ভাবেই রূপ পায়।

কিন্তু হারু-বদনের জীবন-যাপনকে আমরা পাশবিক বললেও, তারা সভা-সমাজবিবিক্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে তো মানবগোষ্ঠীরই প্রতিনিধি। গল্পের শেষাংশে দীর্ঘ প্রকৃতি বর্ণনার শেষ ছত্রে বদনের নীরব অশ্রুবর্ষণ তারই পরিচয় বহন করে।—'উর্ধ্বে অনন্ত নীল আকাশ—চারধারে সীমাহীন জলরাশি—তার মধ্যে বাতাসের তালে তালে ঘাসের পাগল নৃত্য, উচ্ছল জলের সাবলীল ভঙ্গী।'

'দূরে আকাশের বুকে বকের পাতি উড়িতেছে। বৈকালী সূর্য চিতার উপর ফাগের গোলা ঢালিয়া দিয়াছে। চিতার আগুন ও সূর্যের আলোয় মাদারের ভিটা একটা লাল আভা ধারণ করিল। চিতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বদনের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।'—গল্পের শুরুতে প্রকৃতিবর্ণনা দিতে গিয়েও এসেছিল জল, আকাশ ও মাটির বর্ণনা। গল্পের শেষেও এল আকাশ, জল ও মাটির কথা। শেষাংশের এই জল ও আকাশের বর্ণনার সঙ্গে প্রারম্ভিক লগ্নের বর্ণনার কোনো তফাত নেই। মাটি বা স্থলভূমির বর্ণনার সূত্র ধরে গল্পের শুরুতে এসেছিল হারু ও বদন দুই শ্মশানজীবীর জীবন-কথা, আর গল্পের শেষেও আছে সেই দুজনই, কিন্তু তাদের একজন চিতায় শায়িত অন্যজন সৎকারে রত। জল ও আকাশের বর্ণনার পুনরাবৃত্তি বুঝিয়ে দেয় প্রকৃতির রূপের কোনো পরিবর্তন নেই, এমনকি মানব-জীবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে যেন তার কোনো সম্পর্ক-সূত্রও নেই। কিন্তু মাদারের ভিটার যে দুটি মানুষের কথা দিয়ে গল্পটি আরম্ভ হয় আর যেখানে শেষ হয় সেখানে জীবন-বোধের ফারাক ঘটে যায়। লেখক এর জন্য বহু বাক্য ব্যয় করেন না। হারুর চিতার দিকে চেয়ে বদনের গড়িয়ে পড়া চোখের জল নিহিত মানব-সত্তাকে উন্মোচিত করে। প্রকৃতিকে চরিত্র-নির্মাণের প্রয়োজনে পটভূমিরূপে ব্যবহার করে, আবার প্রকৃতি থেকে চরিত্রকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র জায়গায় প্রতিষ্ঠা দান করেন। গল্পের পটভূমি নির্মাণের দক্ষতাকে জানান দেন লেখক এইভাবেই।

গল্পটি প্রথম পুরুষে উপস্থাপিত হয়েছে। বর্ণনারীতি বিবরণাত্মক এবং বস্তুনিষ্ঠ। প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনারীতি যথোপযুক্ত বলা যায়। সাধারণ পাঠকের কাছে অচেনা অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন—লেখকের একথা বোঝাবার সচেতন আগ্রহ গল্পটির বর্ণনাভঙ্গিতে পরিলক্ষিত হয় না। লেখকের এই আত্ম-সংযম গল্পটির শিল্পগুণ বাড়িয়েছে।

ছোটগল্পে বিস্তৃত বর্ণনার সুযোগ থাকে কম। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে দ্রুত পরিণতির দিকে গল্পটি অগ্রসর হয়। এই গল্পটিতে সেই গুণ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। হারু-বদনের বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনের দুরবস্থা, মৃত শিশুপুত্রকে

নিয়ে যুবকের আগমন, হারুর চাল আনার জন্য অন্যত্র গমন, মৃত হারুকে নিয়ে বদনের ফিরে আসা, মৃত হারুর চিতা জ্বলে ওঠা—গল্পটিকে এরকম কয়েকটি দৃশ্যে ভাগ করে দেখা চলে। লক্ষ করার বিষয় কোনও দৃশ্য রচনাতেই লেখক অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় করেন না।

বর্ণনা-রীতির পরিচয় নেবার সূত্রেই গল্পটির ভাষাভঙ্গির কথা বলে নিতে হয়। গল্পটির বিবৃতি অংশে ব্যবহৃত হয়েছে সাধুভাষা, আর সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে চলিতভাষা। অন্যত্র বিবৃতি অংশে সাধুভাষায় তৎসম শব্দের বাহুল্য নেই; ক্রিয়াপদের ব্যবহারেই বোঝা যায় এটি সাধুভাষা। তৎসম শব্দের বাহুল্য না থাকলেও সাধুভাষার ব্যবহার এক ধরনের গাম্ভীর্য তৈরি করেছে। সংলাপ রচনাতে বিশেষ কোনো অঞ্চলের ভাষা প্রযুক্ত হয়নি। হয়তো লেখক সচেতনভাবেই প্রয়োগ করতে চাননি। কারণ গল্পের বিষয়বস্তুতে কোনো আঞ্চলিক ধর্মকে প্রকাশের অভিপ্রায় পরিলক্ষিত হয়।

গল্পটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত টান টান। গল্পটির গতি রক্ষা করেছে এর বাক্য সংযোজনের প্রকৃতি। বিবৃতি অংশে দীর্ঘ বাক্য প্রায় ক্ষেত্রেই পরিহার করেছেন লেখক। যেমন—'ঘুম তাদের হইল না। কিন্তু বিধাতা প্রার্থনা শুনিলেন। মধ্য রাত্রে একজন যুবক আসিয়া ডাকিল, 'হারু, বদন।' কোলে তাহার একটি মৃত শিশু।'

কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া—বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক-ক্রমকে পাল্টে দিয়ে বাক্য গঠনে অভিনবত্ব আনার চেষ্টা করা হয়নি। বিবরণাত্মক ভঙ্গির কারণেই তা করা হয়নি। তবে মাঝে মাঝে ক্রিয়াহীন বাক্য গঠন করে গতিসঞ্চার করা হয়েছে। যেমন— 'চারিদিকে জল আর জল', 'দুজনেই প্রৌঢ়, স্বাস্থ্যবান; কালো মিশ্‌মিশে তাদের গায়ের রং।'

গল্পটিতে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারের আধিক্য লক্ষ করি। বহু বিচিত্র ধরনের শব্দকে ধরতে চেয়েছেন লেখক। যেমন—'সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গর্জিয়া উঠিল, কড়....কড়াৎ...কড়', 'বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ, দু-একটা কাকের কা-কা ভিন্ন আর কিছু শোনা যায় না।', 'সেই স্বরে ভীত হইয়া পাশের গাছ হইতে একটি কাক উড়িয়া যায়, ছানাগুলি চীৎকার করিতে থাকে, চি-চি।', 'দূর হইতে একটি শকুনি চিৎকার করিয়া উঠিল কর্‌-র্‌-র্‌-র্‌—।', 'ফুটন্ত ভাতের টগবগানি; চিতার চড়্‌-চড়াৎ-চড় শব্দ—তাছাড়া সবাই নিস্তব্ধ।' গল্পটি শ্মশানভূমিতে বসবাসকারী দু-জন মানুষের গল্প। তাদের ভাবের আদান-প্রদান নেই বললেই চলে। এরকম নিস্তব্ধ পরিবেশে যে-কোনো ধ্বনিই স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। সেই অনুভবকেই বর্ণনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন লেখক।

গল্পটি মূলত তিনদিনের। প্রথম দিন মুষলধারে বৃষ্টি এবং কোনো মড়া না-আসা, দ্বিতীয় দিন মৃত পুত্রসহ যুবকের আগমন ও হারুর চাল আনতে যাওয়া, তৃতীয় দিন একজন স্ত্রীলোকের শব সৎকারে ভদ্রলোকদের আগমন, বদন কর্তৃক হারুর মৃতদেহ আনয়ন এবং মৃত হারুকে চিতায় চাপানো। প্রথম দিনের বর্ণনা অত্যন্ত অল্প, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে বর্ণনা তুলনায় বিস্তৃত। সময়-বিন্যাসের স্বাভাবিক ক্রমকে এখানে রক্ষা করা হয়েছে। কারণ গল্পটি প্রত্যক্ষ বর্ণনা-রীতি অবলম্বনেই রচিত।

১৪.৫ নামকরণ

গল্পটির নাম 'ডোমের চিতা'। গল্পটি পাঠের পূর্বে নামকরণ-পাঠ পাঠকমনে ধাক্কা দেয়, ভিন্নতর অভিজ্ঞতার জগতে পৌঁছানোর জন্য মনকে প্রস্তুতও করে। গল্পটিতে বর্ণিত হয়েছে ডোমেদের জীবিকানির্বাহের

কথা। ফলে তাদের জীবিকার প্রেক্ষিতে চিতার জন্য কাঠ বিক্রি ও শবদাহই হল ডোমের কাজ। গল্পের শেষে বদন হারুর চিতা সাজায়—একজন ডোম আরেকজন ডোমের দাহকার্য সম্পন্ন করে। এদিক দিয়ে বলা যায় গল্পটির নামকরণ গল্পটির বর্ণিত কাহিনিকেই ব্যক্ত করে।

তবে এই নামকরণের আরও ভিন্নতর ব্যঞ্জনা আছে বলেই আমাদের মনে হয়। হারু-বদনের অসংস্কৃত, আদিম জীবনের অন্তরালস্থিত মানব-সত্তাটি আলোকিত হয়েছে ডোমের চিতার আগুনে। যুবকটির শিশুপুত্র, ভদ্রলোকের স্ত্রী আর শবদাহকারী হারু প্রত্যেককেই চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হতে হয়। শবদাহকারী হারুর সঙ্গে এখানে তাদের কোনও তফাৎ নেই। আর যে বদনকে আমরা বলতে শুনি— 'আরে না মরলে আমাদের কাছে কেউ আসে না। মড়ার দুখ্খু দেখে গললে চলবে কেন?' সেই বদনের চোখেও হারুর চিতার দিকে চেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। এই চিতা-ই যেন হারু ও বদন দু-জনকেই মানবিক করে তুলেছে।

নামকরণ প্রসঙ্গেই আরও একটি বিষয় আমাদের উল্লেখ করতে হয়। গল্পটির শেষে হারুর জ্বলন্ত চিতার দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। গল্পটিতে এর আগে দুটি দাহ-কার্যের কথা আছে, কিন্তু জ্বলন্ত চিতার কোনও বর্ণনা নেই। অর্থাৎ ডোমের চিতা ছাড়া অন্য চিতার কথা গল্পটিতে বর্ণিত হয়নি। অথচ বর্ণনার যথেষ্ট অবকাশ গল্পটিতে ছিল।

গল্পটির পটভূমি-সম্পর্কিত আলোচনাতে আমরা জানিয়েছিলাম যে গল্পটি শ্মশানযাত্রীর নয়, শ্মশানজীবীর। শ্মশানজীবী হারু বদনের চিতাকে প্রত্যক্ষ করার মধ্যে কোনও অন্তর্নিহিত আবেগে কাজ করেনি। এইজন্য কোন্ মৃতদেহ কীভাবে পুড়ল, কোন্‌টির হাড় কতখানি শক্ত আলোচ্য বিষয়। কিন্তু বদন যখন হারুর চিতা প্রত্যক্ষ করে তখন সে দেখাতে মিশে যায় ভেতরকার আবেগ। গল্পকার লেখেন—'দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া বদন মানুষ পোড়াইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এত ধোঁয়া জীবনে আর কখনও দেখে নাই।' আসলে এইভাবে বদন ডোম চিতাকে দেখতেই চায়নি। কিন্তু হারুর চিতাকে সে প্রত্যক্ষ করে ডোম হিসাবে নয়, হারুর নিকটজন হিসাবে। গল্পেও একবার মাত্র হারুর জ্বলন্ত চিতার বর্ণনা দিয়ে বিষয়টিকে আরও মর্মস্পর্শী করে তোলা হয়েছে। গল্পটির 'ডোমের চিতা' নামকরণ-সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে এ-দিক্‌টি উপেক্ষা করা যায় না।

১৪.৬ অনুশীলনী

১। 'ডোমের চিতা' গল্পটি অবলম্বনে হারু-বদনের জীবন-জীবিকার পরিচয় দিন।

২। 'ডোমের চিতা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করুন।

৩। 'ডোমের চিতা' গল্পের পটভূমি-নির্মাণের দক্ষতার পরিচয় দিন।

৪। বদন ডোমের ভেতর লুকিয়ে থাকা মানুষটির পরিচয় দিন।

একক ১৫ ☐ কুষ্ঠরোগীর বউ—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গঠন

১৫.১ মূলগল্প

১৫.২ জীবনকথা ও সাহিত্য-পরিচয়

১৫.৩ গল্প-বিবরণ

১৫.৪ গঠন-বিশ্লেষণ

১৫.৫ অনুশীলনী

১৫.১ মূলগল্প

কোনো নৈসর্গিক কারণ থাকে কিনা ভগবান জানেন, মাঝে মাঝে মানুষের কথা আশ্চর্য রকম ফলিয়া যায়। সমবেত ইচ্ছাশক্তির মর্যাদা দিবার জন্য ভগবান বিনিদ্র রজনী যাপন করেন না, মানুষের মর্মাহত অভিশাপের অর্থ ও জ্বালাময় অক্ষমতা ঘোষণা করার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। তবু মাঝে মাঝে প্রতিফল ফলিয়া যায়, বিষাক্ত এবং ভীষণ।

একথা কে না জানে যে পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জন এবং এ কাজটা বড় স্কেলে করিতে পারার নাম বড়লোক হওয়া? পকেট হইতে চুপিচুপি হারাইয়া গিয়া যেটি পথের ধারে আবর্জনার তলে আত্মগোপন করিয়া থাকে সেটি ছাড়া নারীর মতো মালিকহীন টাকাও পৃথিবীতে নাই। কম এবং বেশী অর্থোপার্জনের উপায় তাই একেবারে নির্ধারিত হইয়া আছে, কপালের ঘাম আর মস্তিষ্কের শয়তানি। কারো ক্ষতি না করিয়া জগতে নিরীহ ও সাধারণ হইয়া বাঁচিতে চাও, কপালের পাঁচশো ফোঁটা ঘামের বিনিময়ে একটি মুদ্রা উপার্জন কর ঃ সকলে পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্বাদ করিবে। কিন্তু বড়লোক যদি হইতে চাও, মানুষকে ঠকাও, সকলের সর্বনাশ কর। তোমার জন্মগ্রহণের আগে পৃথিবীর সমস্ত টাকা মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দখল করিয়া আছে। ছলে বলে কৌশলে যে ভাবে পার তাহাদের সিন্দুক খালি করিয়া নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমাও। মানুষ পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অভিশাপ দিবে।

ধনী হওয়ার এ ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই।

সুতরাং বলিতে হয় যতীনের বাবা অনন্যোপায় হইয়াই অনেকগুলি মানুষের সর্বনাশ করিয়া কিছু টাকা করিয়াছিল। সকলের উপকার করিয়া টাকা করিবার উপায় থাকিলে এমন কাজ সে কখনো করিত না। তাই, জীবনের আনাচে কানাচে তাহার যে অভিশাপ ও ঈর্ষার বোঝা জমা হইয়াছিল সেজন্য তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা চলে না। তবু সংসারে চিরকাল পুণ্যের জয় এবং পাপের পরাজয় হইয়া থাকে এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন বাপের জমা করা টাকাগুলি হাতে পাইয়া ভালো করিয়া ভোগ করিতে পারার আগেই মাত্র আঠাশ বছর বয়সে যতীনের হাতে কুষ্ঠরোগের আবির্ভাব ঘটিল।

লোকে যাহা বলিয়াছিল অবিকল তাহাই। একেবারে কুষ্ঠব্যাধি।

মহাশ্বেতা একদিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ 'তোমার আঙুলে কি হয়েছে?'

'কি জানি। একটা ফুসকুড়ির মতো উঠেছিল।'

মহাশ্বেতা আঙুলটি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া বলিল ঃ 'ফুসকুড়ি নয়। চারদিকটা লাল হয়েছে।'

'আঙুলটা কেমন অসাড়-অসাড় লাগছে শ্বেতা।'

'একটু টিনচার আইডিন লাগিয়ে দেব? নয়তো বলো একটা চুমো খেয়ে দিচ্ছি, এক চুমোতে সেরে যাবে।'

আঙুলটা চুম্বন করিয়া মহাশ্বেতা হাসিল।

'পুরুষ মানুষের আঙুল তো নয়, উর্বশী মেনকার কাছ থেকে যেন ধার করেছো! বাবা, মানুষের আঙুলের রঙ পর্যন্ত এমন টুকটুকে হয়! রক্ত যেন ফেটে পড়ছে!'

আঙুলটি যে হাতে লাগানো স্বামীর সেই হাতটি মহাশ্বেতার নিজের গলায় জড়াইয়া ছিল। জীবনে যে কথা সে বহুবার বলিয়াছে আজ আর একবার সে কথাই বলিল।

এ তোমার ভারি অন্যায় তা জান? তুমি সুন্দর বলেই তো আমার ধাঁধা লাগে। তোমাকে ভালোবাসি, না তোমার চেহারাকে ভালোবাসি বুঝতে পারি না। শুধু কি তাই গো? হুঁ, তবে আর ভাবনা কি ছিল! দিনরাত কি রকম ভাবনায়-ভাবনায় থাকি তোমার হলে টের পেতে। ঈর্ষায় জ্বলে মরি যে।'

তারপর আরও কিছুকাল বোঝা গেল না। শুধু আঙুল নয়, যতীনের হাতে দু-তিন জায়গায় তামার পয়সার মতো গোলাকার কয়েকটি তামাটে দাগ যখন দেখা দিল, তখনো নয়। মহাশ্বেতার শুধু মনে হইল যতীনের শরীরটি বুঝি ভালো যাইতেছে না, গায়ের রঙটি তাহার রক্ত খারাপ হওয়ার জন্য কি রকম নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। একটি টনিক খাওয়া দরকার।

'দ্যাখো, তুমি একটা টনিক খাও।'

'টনিক খেয়ে কি হবে?'

'আহা খাও না। শরীরটা যদি একটু সারে।'

যতীন টনিক খাইল। কিন্তু টনিকে এ ব্যাধির কিছু হইবার নয়। ক্রমে আরও কয়েকটি আঙুলে তাহার ফুসকড়ি দেখা দিল। শরীরের চামড়া আরও কর্কশ, আরও মরা মরা দেখাইতে লাগিল। চোখের কোল এবং ঠোঁট কেমন একটি অস্বাস্থ্যকর মৃত মাংসের রূপ লইয়া অল্প-অল্প ফুটিয়া উঠিল। স্পর্শ অনুভব করিবার শক্তি তাহার ক্ষীণ হইয়া আসিল। চিমটি কাটিলে তাহার যেন আর তেমন ব্যথা বোধ হয় না। দিবারাত্রি একটি ভোঁতা অস্বাস্থ্যকর অনুভূতি তাহাকে বিষণ্ণ ও খিটখিটে করিয়া রাখিল। এবং সকলের আগে যে আঙুলের ছোট একটি ফুসকুড়িকে মহাশ্বেতা চুম্বন করিয়া টিনচার আইডিন লাগাইয়া দিয়াছিল সেই আঙুলেই তাহার পচন ধরিল প্রথম।

ষোলো টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন : 'আপনাকে বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি, আপনার কুষ্ঠ হয়েছে।'

বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন : 'টাইপটা খারাপ। একেবারে সেরে উঠতে সময় নেবে।'

'সেরে তা হলে যাবে ডাক্তারবাবু?'

'যাবে না? ভয় পান কেন? রোগ যখন হয়েছে সারতেও পারে নিশ্চয়।'

এমন করিয়া ডাক্তার কথাগুলি বলিলেন, আশ্বাস দিবার চেষ্টাটি তাঁহার এত বেশী সুস্পষ্ট হইয়া রহিল যে, কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না যতীনের এ মহাব্যাধি কখনো সারিবে না।

একশো টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন : 'যতটা সম্ভব লোকালাইজড় করে রাখা ছাড়া উপায় নেই। তার বেশী কিছু করা অসম্ভব। জানেন তো রোগটা ছোঁয়াচে, সাবধানে থাকবেন। আপনাকে তো বলাই বাহুল্য যে ছেলেমেয়ে...বোঝেন না?'

বোঝে না? যতীন বোঝে, মহাশ্বেতা বোঝে। কিন্তু ছ-মাস আগে যদি এই বোঝাটা যাইত।

মহাশ্বেতা যেন মরিয়া গিয়াছে। অন্যায় অসঙ্গত অপঘাতে যন্ত্রণা পাইয়া সদ্য-সদ্য মরিয়া গিয়াছে। বিমূঢ় আতঙ্কে বিহ্বলের মতো হইয়া সে বলিল : 'তোমার কুষ্ঠ হয়েছে? ও ভগবান, কুষ্ঠ!'

যতীন তখনো মরে নাই, মরিতেছিল। সাধারণ কথার সুর তাল লয় মান সমস্ত বাদ দিয়া সে বলিল : 'কী পাপে আমার

এমন হল শ্বেতা?'

'তোমার পাপ কেন হবে গো। আমার কপাল।'

নিজের বাড়িতে আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে যতীন হইয়া রহিল অস্পৃশ্য। গৃহের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইবার সাধ থাকিলেও বাধা অবশ্য কেহই তাহাকে দিতে পারিত না। কিন্তু সে গোপনতা খুঁজিয়া লইল। বাড়ির একটি অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া সেখানে নিজেকে সে নির্বাসিত ও বন্দী করিয়া রাখিল। মহাশ্বেতা ছাড়া আর কাহারো সেদিকে যাইবার হুকুম রহিল না। বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিয়া বাহির হইতে ফিরিয়া গেল, সামনাসামনি মৌখিক সহানুভূতি জানাইবার চেষ্টা করিয়া আত্মীয়স্বজন হইয়া গেল ব্যর্থ। যতীন নিজের পচনধরা দেহকে কারো চোখের সামনে বাহির করিতে রাজী হইল না। নিজের ঘরে সে রেডিও বসাইল, স্তূপাকার বই আনিয়া জমা করিল, ফোন বসাইয়া বাড়ির অন্য অংশ এবং বাহিরের জগতের সঙ্গে একটি অস্পষ্ট চাপা শব্দের সংযোগ স্থাপিত করিয়া লইল। জীবনযাপনের প্রথার আকস্মিক পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না।

পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বর্জন করিলেও মহাশ্বেতাকে সে কিন্তু ছাড়িতে পারিল না। নিকটতম আত্মীয়ের দৃষ্টিকে পর্যন্ত পরিহার করিয়া বাঁচিয়া থাকার মতো মনের জোর সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিল বলা যায় না, কিন্তু মহাশ্বেতার সম্বন্ধে সে শিশুর মতোই দুর্বলচিত্ত হইয়া রহিল। আপনার সংক্রামক ব্যাধিটিকে আপনার দেহের মধ্যেই সংহত করিয়া রাখিয়া মৃত্যু পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়া চিতার আগুনে ভস্ম করিয়া ফেলিবার যে অনমনীয় প্রতিজ্ঞা সে অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিয়া চলিল, মনে হইল মহাশ্বেতাকে সে বুঝি তাহার সেই আত্ম-প্রতিশ্রুতির অন্তর্গত করে নাই। আত্মীয়পর সকলের জন্য সাবধান হইতে গিয়া মহাশ্বেতার বিপদের কথাটি সে ভুলিয়া গিয়াছে। জীবনটা এতকাল ভাগাভাগি করিয়া আসিয়াছে বলিয়া দেহের এই কদর্য রোগের ভাগটিও মহাশ্বেতাকে যদি আজ গ্রহণ করিতে হয়, তাহার যেন কিছুই বলিবার নাই।

স্ত্রীকে সে সর্বদা কাছে ডাকে, সব সময় কাছে রাখিতে চেষ্টা করে। কাছে বসিয়া মহাশ্বেতা তাহার সঙ্গে কথা বলুক, তাহাকে বই পড়িয়া শোনাক। রেডিওতে ভালো একটি গান বাজিতেছে, পাশাপাশি বসিয়া গানটি না শুনিলে একা ভালো লাগে না। ফোনে সে কাহার সঙ্গে কথা বলিবে নম্বরটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া কানেকশন লইয়া রিসিভারটি মহাশ্বেতা তাহার হাতে তুলিয়া দিক! আর তা না হয়তো সে শুধু কাছে বসিয়া থাক, যতীন তাহাকে দেখিবে।

মহাশ্বেতা এসব করে। খানিকটা কল-বনিয়া-যাওয়া মানুষের মতো যতীনের নবজাগ্রত সমস্ত খেয়ালের কাছে সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যতীন যাহা বলে নির্বিকার চিত্তে সে তাহাই পালন করিয়া যায়। যতীনের ইচ্ছাকে কখনো সংশোধিত অথবা পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা করে না। তাহার নিরবচ্ছিন্ন স্বামীর কথা শুনিয়া চলিবার রকম দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না তাহার নিজেরও স্নানাহারের প্রয়োজন আছে, সুস্থ মানুষের সঙ্গলাভের প্রয়োজন আছে, কিছুক্ষণ আপন মনে একা থাকিবার প্রয়োজন আছে। যতীন খেয়াল করিয়া ছুটি দিলে সে খাইতে যায়, যতীন মনে করাইয়া দিলে বিকালে তাহার একটু বাগানে বেড়ানো হয়। তাহা না হইলে নিজের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া যতীনের পরিবর্তনশীল ইচ্ছাকে সে অক্লান্ত তৎপরতার সহিত তৃপ্ত করিয়া চলে।

অথচ যাচিয়া সে কিছুই করে না। যতীনের দরকারী সুখসুবিধাগুলির জন্য ধরাবাঁধা যেসব নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে সেগুলি যথারীতি পালিত হয় কিনা এ বিষয়ে সে নজর রাখে। কিন্তু যতীনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার জন্য, যতীনকে তাহার নিজের সৃষ্টি করিয়া লওয়া আনন্দের অতিরিক্ত সবকিছু দিবার জন্য, স্বকপোলকল্পিত কোন উপায় দিন ও রাত্রির চব্বিশটি ঘণ্টার মধ্যে মহাশ্বেতা একটিও আবিষ্কার করে না।

তাহাদের সহযোগ রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে।

তাহাদের জীবনের একটি সমবেত গতি ছিল। জীবনের পথে পাশাপাশি চলিবার কতকগুলি রীতি ছিল। সে গতি এখন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেসব রীতিও গিয়াছে বদলাইয়া। পুরনো ভালবাসা, পুরনো প্রীতি, পুরনো কৌতুক নতুন ছাঁচে ঢালিয়া

লইতে হইয়াছে। বিবাহের চার বছর পরে পরস্পরের সঙ্গে আবার তাহাদের একটি নবতর সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। পূর্বতন বোঝাপড়াগুলি আগাগোড়া বদলাইয়া ফেলিতে হইয়াছে।

প্রথমদিকে যে মূহ্যমান অবস্থাটি তাহাদের আসিয়াছিল সেটুকু কাটিয়া যাওয়ার আগে আপনা হইতে এমন কতকগুলি পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে— যাহা খেয়াল করিবার অবসরও তাহাদের থাকে নাই। চিকিৎসার বিপুল আয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া রোগীর ও সুস্থ মানুষের শয্যা পৃথক হইয়া গিয়াছে। কথা বলিবার সময় শুধু হাসিয়া কথা বলিবার প্রয়োজন সম্পূর্ণ বাতিল হইয়াছে। যাহার নাম দাম্পত্যলাভ এবং যাহা নয়টির মধ্যে প্রায় সবগুলি উপভোগ্য রসেই সমৃদ্ধ, দু'টি পৃথক শয্যার মাঝে চিড় খাইয়া তাহা নিঃশব্দে মরিয়া গিয়াছে। দিবারাত্রির মধ্যে একটি চুম্বনও আজ আর পৃথিবীর কোথাও অবশিষ্ট নাই। চোখে চোখে যে ভাষায় তাহারা কথা বলিত সে ভাষা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। সবটুকুও নয়। এখন চোখের দৃষ্টিতে একটি বিহ্বল শঙ্কিত প্রশ্ন তাহারা ফুটাইয়া তুলিতে পারে। চোখে চোখে চাহিয়া এখন তাহারা শুধু দেখিতে পায় একটি অবিশ্বাস্য অপ্রকাশিত বেদনা এই জিজ্ঞাসায় পরিণত হইয়া আছে ঃ একি হল?

মহাশ্বেতা দিনরাত বোধহয় এই কথাটিই ভাবে। তাহার ঠোঁট দুটি পরস্পরকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া অহরহ কঠিন হইয়া থাকে, ছোট ছোট নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এক-এক সময় সে শুধু বেশী বাতাসের প্রয়োজনে জোরে নিশ্বাস গ্রহণ করে। দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায়, অদৃষ্টকে অভিশাপ দিবার মতো শোনায়।

যতীন অনুযোগ করিয়া বলে ঃ 'দিনরাত তুমি অমন কর কেন!'

মহাশ্বেতা ঠোঁট নাড়িয়া উচ্চারণ করে ঃ 'কেমন করি? কিছু করি না তো?'

যতীন হঠাৎ কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলে ঃ 'এমনিতেই আমি মরে আছি, তারপর তুমিও যদি আমার মনে কষ্ট দাও'

যতীন ভুলিয়া যায়। ভুলিয়া গিয়া সে মহাশ্বেতার হাত চাপিয়া ধরে। প্রথম দিকে তাহার ঘায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা হইত, আজকাল আলো ও বাতাস লাগাইবার জন্য খুলিয়া রাখা হয়। ডাক্তার দিনে পাঁচ-ছয় বার ধুইয়া যতক্ষণ সম্ভব রোদে ঘাগুলি মেলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ব্যান্ডেজ শুধু রাত্রির জন্য।

মহাশ্বেতা তাহার তিনটি চামড়া-তোলা ফাটিয়া যাওয়া আঙুলের দিকে চাহিয়া থাকে। আঙুলগুলি তাহার হাতে লাগিয়া আছে বলিয়া বারেকের জন্যও সে শিহরিয়া ওঠে না। মনে হয় যতীন অনুরোধ করিলে তাহার হাতে কনুই-এর অল্প নীচে টাকার মতো চওড়া যে ক্ষতটি ছোট ছোট রক্তাভ গোটায় উর্বর হইয়া আছে, মহাশ্বেতা সেখানে চুম্বন করিতে পারে।

যতীন হাত সরাইয়া লয়। রাগ করিয়া বলে ঃ 'তুমি আমায় ঘেন্না করছ শ্বেতা?'

মহাশ্বেতা একথা অনুমোদন করিবার সুরে রাগিয়া বলে ঃ 'কখন আবার ঘেন্না করলাম?'

'তবে অমন করে তাকাও কেন?'

'কেমন করে তাকাই?'

এইরকম অবস্থায় এই ধরনের পাল্টা প্রশ্ন মানুষের সহ্য হয়? যতীন উঠিয়া বারান্দায় গিয়া বেলা বারোটার কড়া রোদে পাতিয়া রাখা ইজিচেয়ারটিতে কাত হইয়া এলাইয়া পড়ে। বৈশাখী সূর্যের এ অম্লান কিরণ ভালোমানুষের হয়তো পাঁচ মিনিটের বেশী সহ্য হয় না। কিন্তু যতীনের অনুভব শক্তি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সেই রোদে নিজেকে মেলিয়া রাখিয়া পড়িয়া থাকে। রোদ সরিয়া গেলে ইজিচেয়ারটিও সে সরাইয়া লইয়া যায়। ডাক্তারের কাছে সে সূর্যালোকের মধ্যে অদৃশ্য আলোর গুণের কথা শুনিয়াছে। সে আলোককে যতীন প্রাণপণে কাজে লাগায়। অপচয় করিতে পারে না।

খানিক পরে ডাকিয়া বলে ঃ 'এদিকে শোনো শ্বেতা!'

মহাশ্বেতা আসিলে বলে ঃ 'এইখানে বোসো।'

মহাশ্বেতা যতীনের কাছে ছায়ায় বসে। নিকটবর্তী রোদের ঝাঁজে তাহার ঘর্মাক্ত দেহ শুকাইয়া উঠিয়া জ্বালা করিতে থাকে।

কিন্তু সে উঠিয়া যায় না। জ্যোর্তিময়ী পতিব্রতার মতো স্বামীর কাছে বসিয়া ঝিমায়।

যতীন বলে ঃ 'আমার তেষ্টা পেয়েছে।'

মহাশ্বেতা তাহাকে জল আনিয়া দেয়।

যতীন বলে ঃ 'আমার আর-একটা বালিশ চাই।'

মহশ্বেতা তাহাকে আর একটি বালিশ আনিয়া দেয়।

যতীন বলে ঃ 'এনে দিলেই হল বুঝি? মাথার নীচে দিয়ে দাও।'

মহাশ্বেতা বালিশটি তাহার মাথার নীচে দিয়া দেয়।

যতীন রুক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলে ঃ 'কী ভাবছ শুনি?'

মহাশ্বেতা বলে ঃ 'কী ভাবব?'

বৈশাখী দুপুরটি গুমোটে জমিয়া ওঠে।

রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া মহাশ্বেতা দেখিতে পায় যতীন তাহার বিছানায় উঠিয়া আসিয়াছে। দেখিয়া মহাশ্বেতা চোখ বোজে। সারারাত্রি আর সে চোখ খোলে না।

এ জগতে সবই যখন ভঙ্গুর, মনুষ্যত্বের ভঙ্গুরতায় বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বভাবও ভাঙে গড়ে। আজ যে রাজা ছিল কাল সে ভিখারী হইলে যদি বা এটুকু বোঝা যায় যে লোকটি চিরকাল ভিখারী ছিল না, তাহার বেশী আর কিছুই বোঝা যায় না।

সংকীর্ণ কারাগারে নিজের বিষাক্ত চিন্তার সঙ্গে দিবারাত্রি আবদ্ধ থাকিয়া যতীন দিনের পর দিন অমানুষ হইয়া উঠিতে লাগিল। বীভৎস রোগটি তাহার না কমিয়া বাড়িয়াই চলিল, তাহার সুশ্রী রমণীয় চেহারা কুৎসিত হইয়া গেল। বাহিরের এই কদর্যতা তাহার ভিতরেও ছাপ মারিয়া দিল। তাহার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা একত্র থাকাও মুহ্যমানা মহাশ্বেতার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। মেজাজ যতীনের একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছে। মাথার রক্ত চলাচলের মধ্যে তাহার কি গোল বাঁধিয়াছে বলা যায় না, চোখ দু'টি মেজাজের সঙ্গে মানাইয়া দিবারাত্রি আরক্ত হইয়া আছে। গলার আওয়াজ তাহার চাপা ও কর্কশ হইয়া উঠিয়াছে, মাথার চুলগুলি অর্ধেকের বেশী উঠিয়া গিয়া পাতলা হইয়া আসিয়াছে। নাকেন্দর রঙটি তাহার তামাটে হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মুখের ও দেহের মাংস দেখিলে মনে হয় কতকালের বাসী হইয়া ভিতর হইতে পচন ধরিয়া গাঁজিয়া উঠিয়াছে। কোণঠাসা হিংস্র জন্তুর মতো উগ্র ভীতিকর ব্যবহারে মহাশ্বেতাকে সে সর্বদার জন্য সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে শুরু করিয়াছে।

মানুষের স্তরে আর যে তাহার স্থান নাই যতীন তাহা বুঝিতে পারে। মানুষের শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসা পাওয়ার আশা এ জীবনের মতো তাহার ঘুচিয়া গিয়াছে। সে কাছে আসিতে দেয় না বলিয়া কেহ তাহার খোঁজখবর নেয় না। এই আত্মপ্রবঞ্চনাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে রাজী নয়। মহাশ্বেতার নির্বাক ও নির্বিকার আত্মসমর্পণকে সে অসাধারণ ঘৃণার অস্বাভাবিক প্রকাশ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে। মানুষকে দিবার যতীনের আর কিছুই নাই। সে তাই মানুষের উপর রাগিয়াছে। সে তাই স্বার্থপর হইতে শিখিয়াছে। ব্যথা পাইয়াছে বলিয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে সে কুণ্ঠিত নয়।

নাগাল সে পায় শুধু মহাশ্বেতার। মহাশ্বেতাকেই তাহার ব্যাধি ও ব্যাধিগ্রস্ত মনের ভার বহন করিতে হয়।

সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার অবসন্ন শিথিল ভাবটিও অনেক কমিয়া গিয়াছে। মনে হয়, আত্মরক্ষার ঘুমন্ত প্রবৃত্তিগুলি আর তাহার ঘুমাইয়া নাই। এবার সে একটু বাঁচিবার চেষ্টা করিবে। চিরটাকাল সহমরণে যাইবে না।

যতীনকে সে বলে ঃ 'কোথাও যাবে?'

যতীন বলে ঃ 'না।'

'সমুদ্রের জল লাগালে হয়ত কমত।'

যতীন কুটিল সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলে : 'কমত? তোমার মাথা হত। ডাক্তার ওকথা বলে নি।'

মহাশ্বেতা রাগ করিয়া বলে : 'ডাক্তারের কথা শুনে তো সবই হচ্ছে।'

খানিক পরে সে আবার বলে : 'ঠাকুর দেবতার কাছে একবার হত্যে দিয়ে দেখলে হত। হয়তো প্রত্যাদেশটেশ কিছু পেতে।'

যতীন আরক্ত চোখে মহাশ্বেতার সুস্থ সবল দেহটির দিকে চাহিয়া থাকে।

'নিজের ছেলে খেয়ে ঠাকুর-দেবতায় অত ভক্তি কেন? প্রত্যাদেশ। তোমার মতো পাপিষ্ঠার স্বামীকে ঠাকুর প্রত্যাদেশ দেন না।'

ব্যাপারটি মাসখানেকের পুরনো। যতীন ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনিয়াছে। কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায় সে বিশ্বাস করে নাই। মহাশ্বেতাকে সন্দেহ করিয়াছে, সন্দেহটি মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে করিতে নিজের তাহাতে প্রত্যয় জন্মিয়াছে এবং উগ্র উত্তেজনায় একটি পুরা দিন পাগল হইয়া থাকিয়াছে।

মহাশ্বেতা কিছুই প্রকাশ করে না। জেরার জবাবে এমন সব কথা বলে যে যতীন বিশ্বাস করিতে পারে না। জোড়াতালি দিবার চেষ্টাটি তাহার ধরা পড়িয়া যায়। তাহা ছাড়া মহাশ্বেতা এমন ভাব দেখায় যেন এটি সম্পূর্ণভাবে তাহারই ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা। এমনও যদি হয় যে এ ব্যাপরে তাহার হাত ছিল, দৈবের চেয়ে সে-ই বেশি দায়ী, বলিবার অধিকার যতীনের নাই। সে তাহার জীবনের সম্পর্কহীন অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা তুলিয়া অনর্থক উদ্বিগ্ন হইতেছে। মহাশ্বেতার কপালে দুঃখ ছিল, সব দিক দিয়া বঞ্চিত হওয়ার বিধিলিপি ছিল, সে দুঃখ পাইয়াছে, বঞ্চিত হইয়াছে। যতীনের কী? সে কেন ব্যস্ত হয়।

তাহার স্বামী বলিয়া যতীন দেবতার প্রত্যাদেশও পাইবে না। একথাটি মহাশ্বেতার সহ্য হয় না। সে বলে, 'ছেলে-ছেলে করে তো মরছ। শুনে জেনেছ ছেলে?'

যতীনের চোখে প্রত্যাদেশকারীর দৃষ্টি ফুটিয়া ওঠে।

'ছেলে নয়? ওরা যে বলল ছেলে?'

'আমার চেয়ে ওরা বেশী জানে।'

যতীন তখন আর কিছু বলে না। চুপচাপ ভাবিতে থাকে। পরদিন দুপুরে যতীনের রোদটুকু হরণ করিয়া আকাশ ভরিয়া মেঘ জমিলে মহাশ্বেতাকে কাছে, খুব কাছে আহ্বান করে। বাহিরে ব্যাকুল বর্ষণ শুরু হইলে হঠাৎ সে বহুদিনের ভুলিয়া যাওয়া অভিমানের সুরে বলে : 'মেয়ের বুঝি দাম নেই?'

মহাশ্বেতা অবাক হইয়া বলে : 'তুমি এখনো সে কথা ভাবছ?'

যতীন বলে : 'কি করেছিলে? গলা টিপে তুমি তাকে মারতে পারনি শ্বেতা? না, তাও পেরেছিলে?'

মহাশ্বেতা বলে : 'আবোল-তাবোল কথা কত জবাব দেব? যা বোঝ না তাই নিয়ে কেবল বকবক করবে। বেঁচে থাকলে কত দুঃখ পেত ভেবে আমি মন ঠাণ্ডা করেছি। তুমি পার না—কী বৃষ্টিটাই নাবল। দেখি একটু।'

মহাশ্বেতা উঠিয়া গিয়া জানালায় দাঁড়ায়। বাহিরে অবিশ্রান্ত জল পড়ে আর যতীন অবিরত গাল দেয়। মহাশ্বেতা চোখ দিয়া বর্ষা দ্যাখে আর কান দিয়া স্বামীর কথা শোনে। যতীন যখন বলিতে থাকে যে একাজ যে মেয়েমানুষ করিতে পারে সে যে আর কোনো অন্যায় করিতে পারে না, একথা স্বয়ং ভগবান তাহাকে বলিলেও সে বিশ্বাস করিবে না.তখন মহাশ্বেতা একটু হাসে।

একদিন তাহাদের এই কথোপকথন হইয়াছিল।

'কী পাপে আমার এমন হল শ্বেতা?'

'তোমার পাপ কেন হবে? আমার কপাল।'

আজ কথা বলিবার ধারা উলটিয়া গিয়াছে। যতীন আজ প্রাণপণে চেঁচাইয়া বলে : 'তোমার পাপে আমার এমন দশা হয়েছে, ছেলে খেকো রাক্ষসী। তুমি মরতে পার নি? না, সাধ আহ্লাদ এখনো মেটেনি? এখনো বুঝি একজন খুব ভলোবাসছে?'

এই সন্দেহটিই এখন যতীনের আক্রমণ করার প্রধান অস্ত্রে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মহাশ্বেতার মুখ দেখিলে কাহারো একথা মনে হওয়া উচিত নয় যে সে সুখে আছে। যতীনের দেখিবার ভঙ্গি ভিন্ন। মহাশ্বেতার মুখের কালিমা তাহার রূপৈশ্বর্যের মতো লাগে, উহার চোখের ফাঁকা দৃষ্টি যে আজকাল শ্রান্তিতে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে সেটি তাহার মনে হয় পরিতৃপ্তি। উহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটি যতীনের কাছে হইয়া উঠিয়াছে সাজসজ্জা। তাহার দৃষ্টির আড়ালে উহার নেপথ্যে জীবনটির পরিসর বাড়াইয়া তোলা যতীনের কাছে গভীর সন্দেহের ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহাকে একা ফেলিয়া সমস্ত দুপুরটি সে কাটায় কোথায়? অন্য ঘরে বিশ্রাম করে? যতীন বিশ্বাস করে না। বিশ্রামের জন্য অন্য ঘরই যদি তাহার প্রয়োজন, যতীনের পাশের ঘরখানি কী দোষ করিয়াছে? নির্জন দুপুরে নীচের তলায় কোণার একটি ঘর ছাড়া উহার বিশ্রাম করা হয় না, বাহির হইতে যে ঘরে সকলের অগোচরে মানুষ আসা-যাওয়া করিতে পারে?

'অত বোকা নই আমি, বুঝলে?'

পাল্টা প্রশ্ন করিবার অভ্যাসটি মহাশ্বেতার এখনো একেবারে যায় নাই। সে বলে : 'তোমাকে বোকা কে বলেছে?'

যতীন গোঁ ধরিয়া বলে : 'ওসব চলবে না। আমার বাড়িতে বসে ওসব তোমার চলবে না, এই তোমাকে বলে দিলাম। এখনো মরিনি আমি।'

'কী সব বলছ।'

'বলছি তোমার মাথা আর মুণ্ডু। ওরে বাপরে, চান্দিক দিয়ে আমার একেবারে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল যে।'

যতীন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠে। মহাশ্বেতা ছবির মতো দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার বিকৃত ক্রন্দন চাহিয়া দ্যাখে। যতীনের আকুলতা যত তীব্র হইয়া ওঠে সে যেন ততই শান্ত হইয়া যায়। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে তাহার চোখে পলক পড়ে, ঘরের দেওয়ালে ঝাপসা ছবিগুলি মন্থরগতিতে তাহার চারদিক পাক খায়। বাহিরের শব্দগুলি তাহার কানে আসিয়া বাজিতে থাকে, সে একটু একটু করিয়া তাহা অনুভব করে। তাহার মনে হয়, কে যেন কোথায় কাঁদিতেছে।

পাগলামি মহাশ্বেতারও আসিয়াছে বৈকি। তাহা অপরিহার্য। সাধারণ অবস্থায় মানুষ যাহা করে না সেসব করার নাম পাগলামি। সাধারণ অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে যাহার জীবন, ওসব তাহাকে করিতে হয়। মস্তিষ্কের কতকগুলি অভিনব অভ্যাস জন্মিয়া যায়। বন্ধুকে কাহারো মনে হয় শত্রু, প্রিয়কে কাহারো মনে হয় অপ্রিয়, জীবনকে কাহারো মনে হয় সীমাত্তোলিত কৌতুক। দুঃখ দেখিলে কেহ কাঁদিয়াই মরিয়া যায়, কেহ উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবে বিকালে চা পান করা হয় নাই বলিয়া মাথাটি ঝিমঝিম করিতেছে, আকাশে কী আশ্চর্য একটি পাখি উড়িয়া গেল।

মহাশ্বেতা রাত্রে এ ঘরে থাকে না। পাশের ঘরে সে বিছানা পাতে।

যতীন প্রশ্ন করে, কেন? সে মুখে কিছু বলে না, ঘরে ঢুকিয়া খিল তুলিয়া দিয়া সমস্ত রাত্রি জবাবটি সুস্পষ্ট করিয়া রাখে। যতীন রুদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বলে : 'রিভলবারে গুলি ভরে রাখলাম। কাল সকলে ঘর থেকে বেরুলেই তোমাকে গুলি করব।'

বলে : 'এ অপমান সহ্য হয় না শ্বেতা। তুমি আমাকে এমন করে ঘেন্না করবে?'

এ ঘরে নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত যতীন জাগিয়া থাকে, ও ঘরে মহাশ্বেতা শূন্য বিছানায় নিষ্পন্দ অনুসন্ধানে জীবনের অবলম্বন খোঁজে। কত কথা ভাবিবার চেষ্টা করে কিন্তু ভাবিতে পারে না, কত কথা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারে না; সব গোলমাল হইয়া যায়। কুমারী জীবনের স্মৃতি একটি অচিন্তনীয় অনুভূতির মতো মস্তিষ্কের বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়,

বিবাহের পর যে চারটি বছর যতীন সুস্থ ছিল, সুরূপ ছিল, সে সময়ের কথাটি ভাবিতে আরম্ভ করা মাত্র মহাশ্বেতার চিন্তাশক্তি অসাড় হইয়া যায়। জীবনের সেই আদিম নিষ্পাপ উৎসব হইতে সে একেবারে উপস্থিত হয় যতীনের গলিত দেহ ও বিকৃত জীবনকে কেন্দ্র করা পচা ভ্যাপসানো জীবনে, সেখানে একটি নবজাত শিশু, একটি পরিপুষ্ট বিস্ময়, জন্মিয়া মরিয়া যায়। বারবার জন্মিয়া বারবার মরিয়া যায়।

যতীনের মনে যত আলো ছিল সব নিভিয়া গিয়াছে। গাঢ় অন্ধকারে তাহার মনে এককালীন হাস্যকর কত কুসংস্কারের যে জন্ম হইয়াছে, সংখ্যা হয় না। কয়েকদিন ভাবিয়াই প্রত্যাদেশে তাহার অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে। দেবতা একদিন যাহার কাছে ছিল অলস কল্পনা, ধর্ম ছিল বার্ধক্যের ক্ষতিপূরণ, জ্ঞান অনমনীয় মুক্তি, আজ সে আশা করিতে আরম্ভ করিয়াছে দেবতার যদি দয়া হয়, হয়তো আবার সুস্থ হইয়া ওঠার পথ দেবতাই তাহাকে বলিয়া দিবেন।

কিন্তু কোন্ দেবতা? তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, কামাখ্যা, কোথায় তাহার প্রত্যাদেশ আসিবে?

যতীন নিজে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। মহাশ্বেতাকে সে পরামর্শ করিতে ডাকে। 'কোথাও গিয়ে হত্যে দেওয়া ভালো শ্বেতা?'

মহাশ্বেতা সবচেয়ে দূরবর্তী একটি পীঠস্থানের নাম স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলে : 'কামাখ্যায় যাও।'

'আমি যাব?' যতীন স্তম্ভিত হইয়া যায়। 'এ অবস্থায় আমি কী করে যাব?'

মহাশ্বেতা বলে : 'কে যাবে তবে?'

'কেন তুমি যাবে। স্বামীর অসুখ হলে স্ত্রী গিয়েই হত্যে দেয়, প্রত্যাদেশ নিয়ে আসে।'

মহাশ্বেতা বলে : 'আমি? আমি গেলে প্রত্যাদেশ পাব না। ঠাকুর-দেবতায় আমার বিশ্বাস নেই।'

'বিশ্বাস নেই?' মন্তব্যটি যতীনের অবিশ্বাস্য মনে হয়।

'এক ফোঁটাও নয়। হত্যে দেবার কথা ভাবলে আমার হাসি আসে।'

যতীন রাগিয়া ওঠে।

'তা পাবে না? হাসি তো পাবেই। হাসি নিয়েই যে মেতে আছ। এদিকে স্বামী মরছে, ওদিকে আর একজনের সঙ্গে হাসির হর্‌রা চলছে। আমি কিছু বুঝি না ভেবেছ।'

মহাশ্বেতা বলে : 'কার সঙ্গে হাসির হর্‌রা চলছে?'

'তাই যদি জানব তুমি এখনো এ বাড়িতে আছ কী করে?' যতীন পচন ধরা নাক দিয়া সশব্দে নিশ্বাস গ্রহণ করে, গলিত আঙুলগুলি মহাশ্বেতার চোখের সামনে মেলিয়া আর্তনাদের মতো বলিতে থকে : 'ভেবো না, ভেবো না, তোমারও হবে। আমার চেয়ে আরও ভয়ানক হবে। এতো পাপ কারো সয় না।'

হিংস্র ক্রোধের বশে যতীন আঙুলের ক্ষতগুলি মহাশ্বেতার হাতে জোরে জোরে ঘষিয়া দেয়। আগুন দিয়া আগুন ধরানোর মতো সংক্রামক ব্যাধিটিকে সে যেন মহাশ্বেতার দেহে চালান করিয়া দিয়াছে এমনি একটি উগ্র আনন্দে অভিভূত হইয়া বলে : 'ধরল বলে, তোমাকে ধরল বলে। আমাকে ঘেন্না করার শাস্তি তোমার জুটল বলে। আর দেরি নেই।'

এই অভিশাপ দেওয়ার পর মহাশ্বেতা যতীনকে একরকম ত্যাগ করিল। সেবা সে প্রায় বন্ধ করিয়া আনিয়াছিল, এবার কাছে আসাও কমাইয়া দিল। সকালে একবার যদি কিছুক্ষণের জন্য আসিয়া যতীনকে সে দেখিয়া যায়, সারাদিন আর তাহার দেখা মেলে না। রাত্রে শোয়ার আগে একবার শুধু উঁকি দিয়া যায়। মুহূর্তের জন্য। পরিহাসের মতো।

যতীন ক্ষেপিয়া উঠিয়া মহাশ্বেতাকে শেষ পর্যন্ত বাড়ি হইতেই তাড়াইয়া দিত কিনা বলা যায় না, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে সে নিজেই প্রত্যাদেশ আনিতে কামাখ্যায় চলিয়া গেল। যতীনের পীড়াপীড়িতে, ক্রুদ্ধ আদেশ ও সকরুণ মিনতিতে, মহাশ্বেতা সঙ্গে যাইতে রাজী হইয়াছিল। কিন্তু যাত্রা করিবার সময় তাহাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। যতীনের এক পিসি

বলিলেন : মহাশ্বেতা কালীঘাটে গিয়াছে। যতীনের চাকরকে সঙ্গে করিয়া যতীনের মোটরে এই খানিক আগে মহাশ্বেতা কালীঘাটে চলিয়া গিয়াছে।

গোড়াপত্তন কালীঘাটেই হইয়াছিল। মহাশ্বেতা যে যতীনকে বলিয়াছিল ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করে না এ কথাটি তাহার সত্য নয়। সত্য হইলে যতীনের কামাখ্যা যাওয়ার দিন অত টাকা খরচ করিয়া সে পূজা দিত না, একধামা পয়সা ভিখারিদের বিতরণ করিত না।

এ কাজটি মহাশ্বেতা নিজেই করিয়াছিল। মন্দিরে ঢুকিবার পথে দু'দিক সারি দিয়া ভিখারি বসিয়া ছিল। চাকর আর মোটর-চালকের হাতে পয়সার ধামাটি তুলিয়া দিয়া আগে-আগে চলিতে চলিতে মহাশ্বেতা দুদিকে মুঠা মুঠা পয়সা বিলাইয়াছিল। সে হইয়াছিল এক মহাসমারোহের ব্যাপার। শুধু ভিখারি নয়, ভিক্ষা দেওয়া দেখিতে রাস্তায় লোক জমা হইয়াছিল অনেক।

ভিখারিদের মধ্যে কুষ্ঠরোগীও ছিল বৈকি। হাতে পায়ে কাহারো ছিল চট বাঁধা, কাহারো নাক গলিয়া গিয়া একটি গহ্বরে পরিণত হইয়াছিল, কাহারো সমস্ত মুখের ফাঁপানো মাংস বড় বড় গোটায় ভরিয়াছিল, কাহারো কব্জির কাছ হইতে দুটি হাত বহুকাল আগে খসিয়া গিয়া ঘা শুকাইয়া হইয়াছিল মসৃণ। ইহাদের পয়সা দিবার সময় মহাশ্বেতার একটি মুষ্টিতে কুলায় নাই। ইহাদের দিয়া একধামা পয়সায় কুলানো যায় নাই।

বাড়ি ফিরিয়া সেইদিন বিকালে মহাশ্বেতা কুষ্ঠাশ্রম খুলিয়াছে।

চাকর সেদিন পথ হইতে পাঁচজন ভিখারিকে ধরিয়া আনিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে দু'জন হাজার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের লোভেও এখানে থাকিতে রাজী হয় নাই। বাকি তিনজন সেই হইতে আরাম করিয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে। খায় দায় ঘুমায়, আর মহাশ্বেতাকে ক্ষণে ক্ষণে ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করায়, আর তাহাদের কাজ নাই! সাতদিনের মধ্যে মহাশ্বেতার আশ্রমবাসীদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে একুশ জন।

আত্মীয়-স্বজন সকলকে সে ভিন্ন বাড়িতে স্থানান্তরিত করিয়াছে। মাহিনা করা কয়েকজন চাকর দাসী-মেথর আর বাড়ি-ভরা কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে সে এখানে বাস করে একা। সকালে বিকালে এদের দেখিয়া যাওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

ডাক্তার বলিয়াছে ঃ 'এখানে আপনাকে কুষ্ঠাশ্রম খুলতে দেবে না।'

'কেন?'

'শহরের মাঝখানে এ ধরনের আশ্রম কি খুলতে দেয়?'

মহাশ্বেতা আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছে ঃ 'ওরা তো শহরের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি বাড়ির মধ্যে ভরে বিপদ আরো কমিয়েছি।'

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিয়াছে ঃ 'তবু দেবে না। তবে কি জানেন, এসব হল সৎ কাজ। সহজে কেউ বাধা দিতে চায় না। পাড়ার লোক নালিশ করবে ঃ সে নালিশের তদ্বির হবে, তারপর আপনার কাছে নোটিশ আসবে। তখনও দু'মাস আপনি চুপ করে থাকতে পারবেন। ফের আর একটা নোটিশ এলে তখন ধীরে-সুস্থে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবেন।'

ডাক্তারের এত কথার জবাবে মহাশ্বেতা বলিয়াছে ঃ 'কুষ্ঠ কি ভয়ানক রোগ ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তার তাহার বিপুল অভিজ্ঞতায় আবার অল্প একটু হাসিয়াছে ঃ 'এরকম কত সংসারে আছে! মানুষকে একেবারে নষ্ট করে দেয়, বংশের রক্তধারার সঙ্গে পুরুষানুক্রমে মিশে থাকে এমন রোগ একটা নয়, মিসেস দত্ত।'

বংশ। পুরুষানুক্রমে। কে জানে ডাক্তার কতখানি টের পাইয়াছিল? যতীন শুধু সন্দেহ করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, ভাবিয়াছিল তাহাকেই মহাশ্বেতা বঞ্চনা করিয়াছে। ডাক্তার জানিয়াও নির্বিকার হইয়া আছে। হয়ত মনে মনে ডাক্তার সমর্থন করে। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে একটু পার্থক্য থাকিবেই।

নার্স ঠিক হওয়ার আগেই যতীন ফিরিয়া আসিল। সে ঠিক প্রত্যাদেশ পায় নাই, কেমন একটি স্বপ্ন দেখিয়াছে যে কুণ্ড হইতে একটি লাল ফুল আনিয়া মাদুলি ধারণ করিয়াছে।

বাড়ির ব্যাপার দেখিয়া তাহার চমক লাগিয়া গেল।

'এসব কী করেছ শ্বেতা?'

মহাশ্বেতার মন অনেকটা শান্ত হইয়া আসায় বুদ্ধিটিও তাহার বেশ পরিষ্কার ছিল। সে বলিল : 'তোমার কল্যাণের জন্যেই করেছি। কালীঘাটে একজন সন্ন্যাসীর দেখা পেলাম, অমন তেজালো সন্ন্যাসী আমি জীবনে কখনো দেখি নি। চোখ যেন আগুনের মতো আলো দিচ্ছে। তিনি বললেন : 'কুষ্ঠাশ্রম কর, তোর স্বামী ভাল হয়ে যাবে।'

মাদুলি ধারণের প্রভাব তখনও যতীনের মনে প্রবল হইয়া আছে। সে অভিভূত হইয়া বলিল : 'সত্যি?'

'তোমার কাছে মিছে বলছি! তুমি সে সন্ন্যাসীকে দ্যাখো নি। দেখলে তোমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠত। আমাকে কথাগুলি বলে কোন্ দিকে যে চলে গেলেন কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

যতীন আপসোস করিয়া বলিল : 'একটা ওষুধ-টষুট যদি চেয়ে নিতে শ্বেতা?'

বাড়ির যে অংশ যতীনের ছিল সে আবার সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। মাদুলি আর সন্ন্যাসীর ভরসায় মেজাজটা সে অনেকখানি নরম করিয়াই রাখিল।

কিন্তু মহাশ্বেতা কাছে ভিড়ে না। কামাখ্যা যাইবার আগে যেমন ছিল তেমনি দূরে দূরে থাকে। কুষ্ঠাশ্রম লইয়া সে মাতিয়া উঠিয়াছে। একুশটি অধিবাসীর সংখ্যা পঁচিশে পৌঁছিলে তাহার যেন আনন্দের সীমা থাকে না। দিবারাত্রি সে পথে কুড়ানো এই বিকৃত গলিত মানুষগুলির সেবা করে। মায়ের মতো তাহার মমতা, মায়ের মতো তাহার সেবা। এই পঁচিশটি অসুস্থ পচা পাঁজর দিয়া যেন তাহার বুক তৈয়ারী হইয়াছে, তাহার হৃদয়ের সবটুকু উষ্ণতা উহারা পায়।

যতীন একদিন কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল : 'তুমি খালি ওদেরই সেবা কর শ্বেতা। আমার দিকে তাকিয়েও দ্যাখো না।'

মহাশ্বেতা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুই বলিতে পারিল না।

সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালবাসিত, ঘৃণা করিত পথের কুষ্ঠরোগীদের। স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠরোগাক্রান্তগুলিকে ভালবাসে।

ইহাতে জটিল মনোবিজ্ঞান নাই। সহজ বুদ্ধির অনায়াসবোধ্য কথা।

মহাশ্বেতা দেবী তো নয়? সে শুধু কুষ্ঠরোগীর বউ।

১৫.২ জীবনকথা ও সাহিত্য-পরিচয়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে, জন্মস্থান সাঁওতাল পরগণার দুমকা শহর, যদিও তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। মানিকের বাবার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মা নীরজাসুন্দরী। তাঁর পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি নির্বাচন করেন ডাকনাম— মানিক। বাবার বদলির চাকরি হওয়ার দরুণ মানিককে ছাত্রজীবনে বহু স্কুল পরিবর্তন করতে হয়। টাঙ্গাইল, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, মহিষাদল, কাঁথি, মেদিনীপুর, বিভিন্ন স্থানে তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন। মেদিনীপুর জেলাস্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর আগে চোদ্দো বছর বয়সে তাঁর মা মারা যান। মেদিনীপুর জেলাস্কুলের পড়া শেষ করে তিনি আই.এস.সি. পড়তে বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজে ভর্তি হন। আই.এস.সি., পাশ করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতে অনার্স নিয়ে পড়া আরম্ভ করেন। বি.এস-সি. পড়াকালীন বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় গল্প পাঠান এবং তা প্রকাশিত হয়। গল্পটির নাম— 'অতসীমামী' (১৯২৮)।

সাহিত্যচর্চার প্রতি আগ্রহ তাঁর শিক্ষাজীবনকে ব্যাহত করে। এই নিয়ে পরিবারের সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়। শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে সাহিত্যরচনাতেই তিনি পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সাহিত্যরচনাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করাতে তাঁর কোনোদিনই অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। আঠাশ-উনত্রিশ বৎসর বয়সেই এক অজানা অসুখে আক্রান্ত হন লেখক। মাঝে মাঝেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নিজেই নিজের ওষুধ নির্বাচন করে ওষুধ সেবন করতেন। শরীর-মনে বিপর্যস্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইসলামিয়া হাসপাতাল ও লুম্বিনী পার্কের মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা চলে ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত। ১৯৫৬-র ৩ ডিসেম্বর নীলরতন সরকার হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯২৮ থেকে ১৯৫৬—এই আঠাশ বছরের সাহিত্যজীবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঁয়ত্রিশটি উপন্যাস, একটি নাটক, ষোলোটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান' (উপন্যাস), 'শান্তিলতা' (উপন্যাসের খসড়া), 'মাঝির ছেলে' (কিশোর উপন্যাস—সম্প্রতি প্রকাশিত), 'লেখকের কথা' (প্রবন্ধ-গ্রন্থ) ইত্যাদি গ্রন্থ। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গল্প হল—'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'আত্মহত্যার অধিকার', 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী', 'হারানের নাতজামাই' ইত্যাদি।

আলোচ্য 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পটি তাঁর 'বৌ' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

১৫.৩ গল্প-বিবরণ

'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পটির মূল-কাহিনিটি আবর্তিত হয়েছে দাম্পত্য-সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। স্বামীর কুষ্ঠরোগ দেখা দিলে কীভাবে ক্রমশ পাল্টে যায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, তৈরি হয় মানসিক দূরত্ব তার-ই শিল্পরূপ দিতে চেয়েছেন গল্পটিতে। কিন্তু গল্পটির প্রারম্ভিক কয়েকটি অনুচ্ছেদ মূল বক্তব্যে যেন খানিকটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। ফলে কুষ্ঠরোগকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট দাম্পত্য-সম্পর্কের জট-জটিলতার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ না করে বিশিষ্ট মানিক-গবেষকও গল্পটিকে দেখতে চান অন্ধ-বিশ্বাসকে আরোপ করেই। গল্পটিতে বর্ণিত কাহিনির ধারাবাহিক পরিচয় নেবার আগে এইজন্যই আমরা প্রথমে উক্ত বিভ্রান্তি-নিরসনের প্রতি মনোযোগী হব। কেন না, তা না-হলে গল্পটির মূল বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে আমাদের মনে ভুল ধারণার জন্ম হতে পারে।

সরোজমোহন মিত্র তাঁর *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়; জীবনও সাহিত্য* গ্রন্থে 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—'মানুষের লোভ, লালসা এবং অর্থগৃধ্নুতা সমাজবিবর্তনে যে অসম অবস্থার সৃষ্টি করে তারই ফলে দেখা দেয় একদিকে পুঞ্জীভূত পাপ ও ব্যভিচার অন্যদিকে রিক্ত ও বঞ্চিতের আর্তনাদ। এদের নিষ্পাপ অভিশাপ অন্যদের পাপের ফলে পুরুষানুক্রমে বংশের রক্তধারার সঙ্গে মিশে দেখা দেয় দূরারোগ্য ব্যাধি।' (প্রকাশক—গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ ২৪ বৈশাখ ১৩৭৭, পৃষ্ঠা ১১৫)। সরোজমোহন মিত্রের মন্তব্যের সারাংসার করলে দাঁড়ায় যতীনের বাবার পাপ-কর্মেই যতীনের শরীরে কুষ্ঠরোগের জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ 'মরে পুত্র জনকের পাপে'। কিন্তু এরকম ভাবনাকে গ্রহণ করতে প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ায় বিজ্ঞান-নিষ্ঠ মানিকের সাহিত্য-সম্পর্কিত ভাবনা—"....সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে বর্তমান যুগে, কারণ তাতে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক চোরা মোহের স্বরূপ চিনে সেগুলি কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়।" (*উপন্যাসের ধারা, 'লেখকের কথা'*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭)।

মানিক যদি তাঁর নিজস্ব রচনাতে এ-জাতীয় ভাবনার স্বাক্ষর রাখতে চান তাহলে উক্ত ভাবনাকে কখনও

প্রকাশ করতে পারে না তাঁর গল্পে। ফলে 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পের প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদ পুনর্বার বিচারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটির শুরু করেছেন এইভাবে—'কোনো নৈসর্গিক কারণ থাকে কিনা ভগবান জানেন, মাঝে মাঝে মানুষের কথা আশ্চর্য রকম ফলিয়া যায়। সমবেত ইচ্ছাশক্তির মর্যাদা দিবার জন্য ভগবান বিনিদ্র রজনী যাপন করেন না, মানুষের মর্মাহত অভিশাপের অর্থ ও জ্বালাময় অক্ষমতা ঘোষণা করার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। তবু মাঝে মাঝে প্রতিফল ফলিয়া যায়, বিষাক্ত ও ভীষণ।' লক্ষণীয় এই তিনটি বাক্যের প্রথম ও তৃতীয় বাক্যের সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যের বক্তব্যের বৈপরীত্য বর্তমান। যদি প্রথম ও তৃতীয় বাক্য সত্য হয় তাহলে দ্বিতীয় বাক্যটি সত্য হতে পারে না, আবার এই কথাটি বিপরীত-সমেত সমান সত্য বলা যেতে পারে। তবে তৃতীয় বাক্যটির 'তবু' সহযোগে সংযুক্তি দেখে আপাতভাবে মনে হয় লেখকের মানসিক-সমর্থন অভিশাপ বা কথা ফলে যাওয়ার পক্ষেই। কিন্তু গল্পটি যে অন্ধবিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না তা আমরা বুঝতে পারি পরবর্তী অনুচ্ছেদে লেখকের অভিমত পাঠ করলেই। লেখক বলেছেন—'কম এবং বেশী অর্থোপার্জনের উপায় তাই একেবারে নির্ধারিত হইয়া আছে, কপালের ঘাম আর মস্তিষ্কের শয়তানি। কারো ক্ষতি না করিয়া জগতে নিরীহ ও সাধারণ হইয়া বাঁচিতে চাও, কপালের পাঁচশো ফোঁটা ঘামের বিনিময়ে একটি মুদ্রা উপার্জন কর: সকলে পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্বাদ করিবে। কিন্তু বড়লোক যদি হইতে চাও, মানুষকে ঠকাও, সকলের সর্বনাশ কর।'—অর্থ রোজগারের ও বড়োলোক হওয়ার যে তত্ত্বটি উপস্থাপন করেছেন সেখানে কোনো অনৈসর্গিক কারণ নেই। কালকেতুর মতো দেবীর দাক্ষিণ্যে ঘড়া ঘড়া মোহর গল্পনায়ক লাভ করেনি। বরং তার অর্থ-রোজগার পূর্বোক্ত তত্ত্ব-মাফিক। স্বভাবতই প্রশ্ন, অর্থরোজগারের প্রক্রিয়াটি যেখানে বাস্তবিক সেখানে অর্থরোজগার-জনিত প্রতিক্রিয়া কেন অলৌকিক হবে? আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এরকম অলৌকিক ভাবনাকে সংযুক্ত করতেই চাননি। তিনি লিখেছেন—'তবু সংসারে চিরকাল পুণ্যের জয় এবং পাপের পরাজয় হইয়া থাকে এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন বাপের জমা করা টাকাগুলি হাতে পাইয়া ভালো করিয়া ভোগ করিতে পারার আগেই মাত্র আঠাশ বছর বয়সে যতীনের হাতে কুষ্ঠরোগের আবির্ভাব ঘটিল।'—এখানে 'যেন' শব্দটি লক্ষণীয়। শব্দটি বুঝিয়ে দেয় 'পুণ্যের জয় এবং পাপের পরাজয়'—এই বিশ্বাস লেখক-সমর্থিত নয়।

মাত্র আঠাশ বছর বয়সে যতীনের হাতে দেখা গেল কুষ্ঠরোগের চিহ্ন। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের তাঁর অভাব নেই, বেশি টাকা রোজগারের কোনো আকাঙ্খা নেই, উৎকণ্ঠাও নেই, আবার দাম্পত্যজীবনেও নেই কোনো প্রশ্নচিহ্ন। বস্তুত তার জগৎ ও জীবনের গণ্ডি বড় ছোটো, দাম্পত্যজীবনের বাইরে কোনো ভিন্নতর জগতের সঙ্গে তার নিবিড় সংযোগ নেই, তবে মহাশ্বেতার মতো স্ত্রী-রত্ন লাভ করে সে দাম্পত্যজীবনে সুখী, তৃপ্ত। পরিপূর্ণ এই দাম্পত্যজীবনে সংকটের বীজ রোপিত হল তার আঙুলে কুষ্ঠরোগের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে।

যতীনের আঙুলের চিহ্ন যে কুষ্ঠরোগের, যতীন আর মহাশ্বেতা প্রথমে তা বুঝতে পারেনি। রোগটি চিহ্নিত করতে না পারা স্বাভাবিক, চিকিৎসা-শাস্ত্র তাদের অজানা। তবে বোধহয় কেবল এই কারণেই বুঝতে পারে না তা নয়। তাদের সম্পর্কের প্রেমজ-উত্তাপ যেন এই বুঝতে পারা থেকে তাদের নিরস্ত করে। টিনচার-আয়োডিনের বদলে এইজন্যই চুম্বনে রোগ সারাতে ব্যস্ত মহাশ্বেতা। এমনকি যতীনের আঙুলে অসাড়বোধও তাকে প্রথমে বিচলিত করে না, অস্বাভাবিক রক্তাভ আঙুলকে নিয়ে সেই পুরনো রসিকতা এবার একবার প্রয়োগ করে—'পুরুষ মানুষের আঙুল তো নয়, উর্বশী মেনকার কাছ থেকে যেন ধার করেছো।'

যতীনের হাতে দু-তিন জায়গায় তামার পয়সার মতো গোলাকার দাগ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহাশ্বেতা

তখনও বিচলিত হয়নি। বরং তার মনে হয়েছে যতীনের শরীর বোধহয় সামান্য দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং এর জন্য টনিক খাওয়া প্রয়োজন। প্রশ্ন, যতীনের আঙুলে গোলাকার দাগ দেখেও কেন বিচলিত হয় না মহাশ্বেতা? বোধহয় একে কেবল আর তাদের সম্পর্কের প্রেমজ-উত্তাপ বলা যায় না। আসলে কুষ্ঠরোগকে কেবল রোগ হিসেবে দেখবার মানসিকতা মহাশ্বেতার নেই, বরং কুষ্ঠরোগ পাপের প্রতিফল—এই বিশ্বাস প্রোথিত আছে বলেই কুষ্ঠরোগ যতীনকে স্পর্শ করতে পারে—এরকম ভাবনা মহাশ্বেতার মনে স্থান পায় না। এব্যাপারে যতীনের কুষ্ঠ হয়েছে জানার পর মহাশ্বেতার প্রতিক্রিয়াটি লক্ষ্য করা যেতে পারে—''মহাশ্বেতা যেন মরিয়া গিয়াছে। অন্যায় অসঙ্গত অপঘাতে যন্ত্রণা পাইয়া সদ্য, সদ্য মরিয়া গিয়াছে। বিমূঢ় আতঙ্কে বিহ্বলের মতো হইয়া সে বলিল : 'তোমার কুষ্ঠ হয়েছে? ও ভগবান, কুষ্ঠ'।'' মধুর দাম্পত্যজীবনে হঠাৎ নেমে আসা এই বিপর্যয়ে মহাশ্বেতার মনে আঘাত সৃষ্টি করে। তবে কুষ্ঠরোগ পাপের প্রতিফলন—মহাশ্বেতার মনে এই বিশ্বাস যতীনের প্রতি তার ভালোবাসাকে বিনষ্ট করতে পারে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পাপবোধ-জনিত সংকট-কথাকে গল্পটিতে উপস্থাপিত করতে চাননি।

'কী পাপে আমার এমন হল শ্বেতা?' যতীনের এই বিমূঢ় প্রশ্নের উত্তরে মহাশ্বেতা জানিয়েছে—'তোমার পাপ কেন হবে গো! আমার কপাল?' মহাশ্বেতার নিজেকে দোষারোপের মধ্যে আছে স্বামীর প্রতি প্রবল অনুরাগ।' অনুরাগের গভীরতা থেকেই স্বামীর শরীরে প্রকাশিত কুষ্ঠরোগের লক্ষণকেও স্বামীর পাপ বলে মেনে নিতে পারে না।

কুষ্ঠরোগাক্রান্ত যতীনের জীবন-যাপনের নিয়ম-নীতি যায় পালটে। আর সে ঘরের মধ্যে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় না, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ছিন্ন করে সমস্ত সংযোগ, বরণ করে নেয় নিজগৃহে স্বেচ্ছা-নির্বাসন। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য নিজের ঘরে রেডিও, ফোন স্থাপন করে; আর নিয়ে আসে নানা বই। যতীনের এই নির্বাসন বরণের কারণ হিসাবে লেখক জানিয়েছেন—'যতীন নিজের পচনধরা দেহকে কারো চোখের সামনে বাহির করিতে রাজী হইল না।'

কিন্তু এই স্বেচ্ছা-বন্দিদশাকে বরণ করে নেবার জোর পেল কোথায় যতীন? লেখক বলেন—'নিকটতম আত্মীয়ের দৃষ্টিকে পর্যন্ত পরিহার করিয়া বাঁচিয়া থাকার মতো মনের জোর সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিল বলা যায় না....।' আসলে তার আগের বাক্যেই এর উত্তর দিয়ে দিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—'পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বর্জন করিলেও মহাশ্বেতাকে সে কিন্তু ছাড়িতে পারিল না।' আমরা আগেই জানিয়েছি যতীনের জীবন ও জগতের গণ্ডি ছিল সীমাবদ্ধ, দাম্পত্যজীবনের বাইরে কোনো ভিন্নতর জগতের নিবিড় সংযোগ ছিল না। স্বেচ্ছা-নির্বাসিত কুষ্ঠারোগাক্রান্ত যতীনও মনের দিক থেকে একা নয়, মহাশ্বেতা তখনও তার এই জীবনের অংশীদার। এই মানসিক শক্তিই নিষ্ঠুরতম আত্মীয়ের দৃষ্টিকে পরিহার করে বাঁচবার ক্ষমতা দেয়।

যতীন নিজের সংক্রামক ব্যাধি থেকে অপরকে রক্ষা করতে চেয়েছে, অথচ নিজের স্ত্রীর ক্ষেত্রে সে-রূপ কোনো প্রচেষ্টা নেই, বরং তার পরিবর্তে মহাশ্বেতাকে কাছে পেতেই সে উদগ্রীব। কখনও তার মনে হয় মহাশ্বেতা কথা বলুক, কখনও মনে হয় বই পড়ুক, রেডিওর ভালো গান তার সঙ্গে বসে উপভোগ করুক, টেলিফোনে কানেকশন করে দিয়ে রিসিভারটি হাতে তুলে দিক, 'আর তা নাহয়তো সে শুধু কাছে বসিয়া থাক, যতীন তাহাকে দেখিবে।' নিজের সংক্রামক ব্যাধির কথা জেনেও স্ত্রীর প্রতি এই আচরণ ভালোবাসার প্রকাশ বলা যেতে পারে না, বরং একে বলা যায় ভালোবাসার অসুখ। যতীনের এই শারীরিক ব্যাধি স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসাকে বিনষ্ট করেছে তা নয়। তার মনকেও করেছে রোগাক্রান্ত।

যতীনের উপরোক্ত ভালোবাসার নামে অত্যাচার পাল্টে দেয় মহাশ্বেতার মনের গতি-প্রকৃতি। মহাশ্বেতার ক্রোধ, বিরক্তি, বীতরাগ তার কথায় ধরা পড়ে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে চলে মনের ভাঙাচোরা। বাহ্যিক রোষ প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিক্ষুব্ধ মনকে উন্মুক্ত না করে নীরবতার দ্বারা প্রতিবাদের নতুন ভাষা সে নির্মাণ করে। যতীনের ইচ্ছার সে দাসত্ব করে, প্রতিবাদ করে না, কিন্তু কখনই স্বেচ্ছায় দেহ ও মনে যতীনকে সাহচর্যদানে উৎসাহ প্রকাশ করে না। যতীনের প্রয়োজনীয় সুখ-সুবিধাগুলির জন্য সে নিয়ম-মাফিক কাজ-কর্ম করা কর্তব্য তা যথারীতি পালন করে, কিন্তু এর অতিরিক্ত কোনো উপায় যতীনের মানসিক প্রফুল্লতাদানের চিন্তা সে করে না। মহাশ্বেতা স্ত্রীর কর্তব্য পালন করে, কিন্তু সে-কর্তব্যে প্রেম অনুপস্থিত।

যতীনের ও মহাশ্বেতার জন্য একই ঘরে দুটি পৃথক শয্যা রচিত হয়। এই পৃথক শয্যা যেন তাদের দাম্পত্য-সম্পর্কের ফাটলেরই প্রত্যক্ষ পরিচায়ক হয়ে ওঠে। 'যাহার নাম দাম্পত্যলাভ এবং যাহা নয়টির মধ্যে প্রায় সবগুলি উপভোগ্য রসেই সমৃদ্ধ, দুটি পৃথক শয্যার মাঝে চিড় খাইয়া তাহা নিঃশব্দে মরিয়া গিয়াছে।' দাম্পত্য-সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ যতীনের কুষ্ঠরোগ, কিন্তু তা থেকে যেভাবে মানসিক টানাপোড়েন তাদের দু-জনকে পরস্পরের কাছ থেকে সরিয়ে দেয় তাতে একই গৃহে বসবাস করেও তারা হয়ে ওঠে ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা। পারস্পরিক বিশ্বাস, নির্ভরতা, সহমর্মিতাবোধ জীবন থেকে মিলিয়ে যায়। যতীনের কাছে যেমন তার রোগের যন্ত্রণার চেয়েও অসহনীয় হয়ে ওঠে মহাশ্বেতার আচরণ, আর যতীনকে সুস্থ করার উদ্যমের পরিবর্তে যেন মহাশ্বেতা নীরবতার মধ্য দিয়ে যতীনের আচরণের প্রতিবাদেই সদা-নিয়োজিত। দাম্পত্য-সংকটটিকে এভাবেই বাস্তবোচিত মাত্রা প্রদান করেছেন লেখক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথাও ভোলেননি দাম্পত্য-সংকট কেবল মনোজীবন আশ্রিত হতে পারে না। তাই কেবল মনোজীবনের পরিচয় দিতে পারে না সংকটটির পূর্ণায়ত রূপ। যতীন জানে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দৈহিক মিলন সঙ্গত নয়, অথচ সে তার প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে না।—'রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া মহাশ্বেতা দেখিতে পায় যতীন তাহার বিছানায় উঠিয়া আসিয়াছে। দেখিয়া মহাশ্বেতা চোখ বোজে। সারারাত্রি আসে সে চোখ খোলে না।' এই অংশটির সংযোজন যতীন চরিত্রটি পরিস্ফুট করার জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

একশো টাকার ভিজিটের ডাক্তার যখন পরীক্ষা করে জানান রোগটা কুষ্ঠ, মহাশ্বেতা তখন সন্তান-সম্ভবা। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পুরুষের ঔরসজাত সন্তান জন্মাতে পারে কুষ্ঠ রোগ নিয়েই। ডাক্তার তাই যখন বলেন—'আপনাকে তো বলাই বাহুল্য যে ছেলেমেয়ে—বোঝেন না?', তখন সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করে যতীন ও মহাশ্বেতা দু-জনেই। কিন্তু রোগাক্রান্ত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত যতীন হারিয়ে ফেলে বাস্তবতার প্রেক্ষণবিন্দু থেকে দেখবার ক্ষমতাটিই। সন্তান-সম্ভবা মহাশ্বেতার ভাবী সন্তানকে ঘিরে মনোলোক উদ্‌ঘাটিত হয়নি। লেখক বোধহয় সচেতনভাবেই পরিহার করেছেন এর বিশদ পরিচয় প্রদান, তাদের দাম্পত্য-সংকটে এটি অন্যতম সমস্যা, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়।

যতীনের মহাশ্বেতার প্রতি নিক্ষিপ্ত বিষমাখানো বাক্য-বাণে জানতে পারা যায় মারা গেছে সন্তানটি। যতীন মহাশ্বেতার উদ্দেশে বলে—'নিজের ছেলে খেয়ে ঠাকুর-দেবতায় অত ভক্তি কেন?' পরে মহাশ্বেতার ভাবনা-লোকের পরিচয় দিতে গিয়ে মানিক জানান ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্তানটির মৃত্যু হয়েছে। সন্তানটির মৃত্যু ঘটার জন্য যতীন মহাশ্বেতাকে অভিযুক্ত করেছে। মহাশ্বেতা পালটা আক্রমণ করেনি, যতীনের বাক্য-বাণে মূহ্যমান হয়ে পড়েনি, বরং বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত থেকেই উপলব্ধি করতে চেয়েছে সমগ্র বিষয়টি এবং যতীনকেও সে-ভাবে ভাবাতে চেষ্টা করেছে— 'বেঁচে থাকলে কত দুঃখ পেত ভেবে আমি মন ঠান্ডা করেছি। তুমি পার

না—কী বৃষ্টিটাই নাবল।' সন্তানের মৃত্যু যে-কোনও নারীর কাছে মর্মান্তিক, কিন্তু জীবিত অথচ রোগাক্রান্ত সন্তান মায়ের কাছে ততোধিক বিড়ম্বনার। মহাশ্বেতা চরিত্রটির এই দৃঢ়তা লক্ষণীয়।

যতীন স্বেচ্ছা-নির্বাসন বরণ করবার মনের জোর অর্জন করেছিল মহাশ্বেতার মতো স্ত্রী থাকার জন্য। কিন্তু বর্তমানে যতীনের সঙ্গে মহাশ্বেতার মনের মাঝখানে রয়েছে দুস্তর পারাবার; এর সেতুবন্ধন প্রায় অসম্ভব, কেবল সন্তানই নির্মাণ করতে পারত দু-জনের মাঝখানে এক সম্পর্কের সেতু। যতীন সংক্রামক ব্যাধি থেকে সকলকে বাঁচাতে তৎপর হলেও যেমন মহাশ্বেতার কথা ভাবেনি, ঠিক একইভাবে সন্তানের জন্মের ক্ষেত্রেও ভাবতে চায়নি বাস্তব সমস্যাটি। রোগাক্রান্ত যতীন বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক, সে নিজে বাঁচবারই নিত্যনতুন উপায় খুঁজেছে। তবে 'সন্তান-মৃত্যু' এই ঘটনাটিকে ছোটগল্পটির ক্ষেত্রে প্রতীকের ইঙ্গিত বহন করছে বলে আমাদের মনে হয়। লেখক বলেন—'জীবনের সেই আদিম নিষ্পাপ উৎসব হইতে সে একেবারে উপস্থিত হয় যতীনের গলিত দেহ ও বিকৃত জীবনকে কেন্দ্র করা পচা ভ্যাপসানো জীবনে, সেখানে একটি নবজাত শিশু, একটি পরিপুষ্ট বিস্ময়, জন্মিয়া মরিয়া যায়। বারবার জন্মিয়া বারবার মরিয়া যায়।' এই বর্ণনার শেষ বাক্যটি লক্ষণীয়। বার বার জন্ম আর বার বার মৃত্যু আসলে যতীন-মহাশ্বেতার সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের সম্ভাবনা, আর সেই সম্ভাবনার অপমৃত্যু। সন্তানের মৃত্যু যেন বাহ্যিক ঘটনা, তাদের সম্পর্কের প্রতীকায়িত রূপ।

যতীন মহাশ্বেতার চরিত্র সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করতে আরম্ভ করে। সন্দেহ করার প্রত্যক্ষ কারণ দুপুরবেলায় নীচের ঘরে মহাশ্বেতার বিশ্রাম গ্রহণ। মনের দিক দিয়ে যতীনের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল মহাশ্বেতা অনেক আগেই। কিন্তু ক্রমশ যতীনের সঙ্গকে এড়িয়ে গিয়ে তার 'দৃষ্টির আড়ালে উহার নেপথ্যে জীবনটির পরিসর বাড়াইয়া তোলা যতীনের কাছে গভীর সন্দেহের ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।' স্বাভাবিক দাম্পত্য-সম্পর্ক বিনষ্ট, মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত—ঠিক এরকম অবস্থাতে মহাশ্বেতার প্রতি সন্দেহ চরিত্রটির সর্ব-রিক্ত অবস্থারই পরিপোষক। 'যতীনের অমূলক সন্দেহে প্রতিবাদে মুখর হয় না মহাশ্বেতা, বরং তার সন্দেহজনিত বেদনার্ত রূপকেই যেন সে উপভোগ করে। 'যতীন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠে। মহাশ্বেতা ছবির মতো দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার বিকৃত ক্রন্দন চাহিয়া দ্যাখে। যতীনের আকুলতা যত তীব্র হইয়া ওঠে সে যেন ততই শান্ত হইয়া যায়।' যতীনের নিষ্ঠুরতা আর বেদনা দুটিই বড় বেশি উচ্চারিত, মহাশ্বেতার নিষ্ঠুরতা আর বেদনার উচ্চকিত প্রকাশ নেই, কিন্তু তার চরিত্রের নিহিত নিষ্ঠুরতা আর বেদনাকে পাঠকদের জানাতে লেখক বিস্মৃত হন না।

ডাক্তারের কাছে কুষ্ঠরোগের কথা জানতে পেরে যতীন প্রশ্ন করেছিল—'কী পাপে এমন হল শ্বেতা?' আবার পরবর্তী সময়ে দেহে-মনে অসুস্থ, মহাশ্বেতার প্রতি ক্রুদ্ধ যতীন বলেছিল—'তোমার পাপে এমন দশা হয়েছে, ছেলেখেকো রাক্ষসী।' প্রথমবার যতীনের এই প্রশ্নে প্রকৃত-অর্থে পাপ-চেতনার প্রকাশ আছে বলে মনে হয় না। অন্তত পাপবোধ তাড়িত কোনো মনের পরিচয় লেখক দেননি। দ্বিতীয়বার মহাশ্বেতাকে পাপিষ্ঠা হিসেবে আক্রমণ করাই লক্ষ্য, অন্তরে লালিত সংস্কার থেকে একথা উঠে আসেনি। সেই যতীনও কিন্তু ধর্মীয় সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত; প্রত্যাদেশে বিশ্বাস জন্মায় তার। এই যতীন মহাশ্বেতা কর্তৃক পরিত্যক্ত; এখন আর কেবল মহাশ্বেতার বিছানা আলাদা তা নয়, তার অবস্থানও আলাদা করে। ফলে—'দেবতা একদিন যাহার কাছে ছিল অলস কল্পনা, ধর্ম ছিল বার্ধক্যের ক্ষতিপূরণ, জ্ঞান অনমনীয় যুক্তি, আজ সে আশা করিতে আরম্ভ করিয়াছে দেবতার যদি দয়া হয়, হয়তো আবার সুস্থ হইয়া ওঠার পথ দেবতাই তাহাকে বলিয়া দিবেন।' বাঁচবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় মানুষ কীভাবে মানব-সংস্কারে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে যতীন-চরিত্রের মধ্য দিয়ে এখানে তা প্রকাশিত হয়।

একদিন মহাশ্বেতা যতীনের কাছে প্রত্যাদেশ পাবার জন্য হত্যে দেবার প্রস্তাব জানিয়েছিল। যতীন সে-প্রস্তাব

ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে নগ্ন আক্রমণ করেছিল তাকে—'প্রত্যাদেশ। তোমার মতো পাপিষ্ঠার স্বামীকে প্রত্যাদেশ দেন না।' সেই যতীনই এখন নিজেই মহাশ্বেতাকে হত্যে দিয়ে প্রত্যাদেশ আনার কথা বলে। মহাশ্বেতা একথা শুনে যতীনকে কামাখ্যায় যেতে বলে, কিন্তু নিজে যেতে সম্মত হয় না। মহাশ্বেতার উত্তরে যতীন ক্রুদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত হিংস্র ক্রোধের বশে নিজের আঙুলের ক্ষতগুলি মহাশ্বেতার হাতে জোর করে ঘষে দেয়। এই ঘটনা যেন তাদের ক্রম-অবনমিত সম্পর্কের শেষ সিঁড়িতে পা রাখা। এর পরেই মহাশ্বেতা যতীনকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে। যতীনের ঘরে যাতায়াত তার বন্ধ হয়ে যায়; কেবল সকালে একবার এবং রাত্রে শোয়ার আগে মুহূর্তের জন্য একবার সে উঁকি মারে। লেখকের কথায় রাত্রে এই আগমন 'পরিহাসের মতো'। এই আগমন যেন যতীনের দেহ-মনের নিঃসঙ্গতাবোধে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

যতীন শেষ পর্যন্ত নিজেই প্রত্যাদেশ আনার জন্য কামাখ্যায় যেতে উদ্যত হয়। মহাশ্বেতা যতীনের পীড়াপীড়ি, আদেশ ও মিনতিতে সঙ্গে যেতে রাজি হলেও যাত্রালগ্নে কালীঘাট চলে যায়। মহাশ্বেতা যতীনের প্রত্যাদেশ আনতে যাবার প্রস্তাবে জানিয়েছিল সে ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করে না। কিন্তু মহাশ্বেতার পুজো দেওয়ার জন্য কালীঘাটে গমন তার ঈশ্বর-বিশ্বাসকেই প্রমাণ করে। লেখকও বলেন—'মহাশ্বেতা যে যতীনকে বলিয়াছিল ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস করে না এ-কথাটি তাহার সত্য নয়। সত্য হইলে যতীনের কামাখ্যা যাওয়ার দিন অত টাকা খরচ করিয়া সে পূজা দিত না, একধামা পয়সা ভিখারীদের বিতরণ করিত না।' মহাশ্বেতা দেবতায় বিশ্বাসী—একথা সত্য, কিন্তু তার এই পূজার আয়োজন যতীনের মঙ্গলার্থে আপাতভাবে মনে হলেও কিন্তু এরকম অনুমান করার সঙ্গত কারণ নেই। মহাশ্বেতা তার পূজা-আয়োজনের মধ্যে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদকেই স্পষ্ট করেছে।

কালীঘাট থেকে পুজো দিয়ে সেই দিন বিকালেই বাড়িতে মহাশ্বেতা একটি কুষ্ঠাশ্রম খুলেছে। মাইনে করা চাকর-মেথর আর কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে বসবাস করতে আরম্ভ করে সে। যতীন ফিরে এলে তাকে কুষ্ঠাশ্রম খোলার কারণ হিসাবে শোনায় মিথ্যা কাহিনি। কালীঘাটের এক তেজালো সন্ন্যাসী নাকি জানিয়েছেন—'কুষ্ঠাশ্রম কর, তোর স্বামী ভাল হয়ে যাবে।' এরপর কুষ্ঠরোগীদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে, আর চরম উপেক্ষা করে স্বামীকে।

আমরা আগেই জানিয়েছি যতীনের ক্ষোভ, দুঃখ যতখানি সরাসরি প্রকাশ পেয়েছে মহাশ্বেতার মনোলোক সেভাবে লেখক উন্মুক্ত করেননি, চরিত্র-রচনার এও এক ধরনের শিল্প-কৌশল। আবার যতীনের অনুপস্থিতিতে মহাশ্বেতার কুষ্ঠাশ্রম খোলাকে কেন্দ্র করে তার সক্রিয়তা প্রত্যক্ষরূপ পেলেও কখনও লেখক সরাসরি তার এই কার্যধারার ব্যাখ্যা প্রদান করেন না। ব্যাখ্যা প্রদান করলেই বরং মহাশ্বেতার চরিত্রবৈশিষ্ট্য পারম্পর্য হারাতো। মহাশ্বেতার নীরবতা যেমন প্রতিবাদের ভাষা, তেমনি সক্রিয়তাও এক ধরনের প্রতিবাদের ভাষা, যা আপাতভাবে প্রত্যক্ষ গোচর হয় না।

মহাশ্বেতার কুষ্ঠাশ্রম খোলা যতীনকে পরিপূর্ণ উপেক্ষারই আয়োজন। কুষ্ঠাশ্রম খোলার মধ্য দিয়েই সে নির্মাণ করে তার স্বতন্ত্র জগৎ। কিন্তু কুষ্ঠাশ্রমই কেন? উপেক্ষা করার জন্য বা স্বতন্ত্র জগৎ নির্মাণের জন্য সে তো অবলম্বন করতে পারতো অন্য উপায়ও? কুষ্ঠাশ্রম খোলা এবং কুষ্ঠরোগীর সেবা-কার্যে তার ব্যস্ততার মধ্যে নিহিত আছে স্বামীর প্রতি তীব্র বিরাগ এবং প্রতিশোধ নেবার মানসিকতা।

মহাশ্বেতার সেবা-কার্যের পরিচয় দিতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'দিবারাত্রি সে পথে কুড়ানো এই বিকৃত গলিত মানুষগুলির সেবা করে। মায়ের মতো তাহার মমতা, মায়ের মতো তাহার সেবা। এই পঁচিশটি অসুস্থ পচা পাঁজর দিয়া যেন তাহার বুক তৈয়ারী হইয়াছে।' তাহার হৃদয়ের সবটুকু উষ্ণতা উহারা পায়।'—

এই মহাশ্বেতার কুষ্ঠরোগকে নিয়ে কোনো সংস্কার নেই, কুষ্ঠরোগীকে সে ঘৃণা করে না। মহাশ্বেতার এরূপ আচরণের কারণ কী? লেখকের উত্তর—'মহাশ্বেতা দেবী তো নয়? সে শুধু কুষ্ঠরোগীর বউ।' মহাশ্বেতা যেখানে কুষ্ঠরোগীদের সেবায় নিয়োজিত সেখানে সম্পর্ক কেবল সেবিকার সঙ্গে রোগীর কিন্তু কুষ্ঠরোগাক্রান্ত যতীন তো তার স্বামী। এই সম্পর্কের ভিত্তিভূমি দুটি হৃদয়ের পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান। মহাশ্বেতার মনে যতীনের কুষ্ঠরোগের কারণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, আসলে মহাশ্বেতা ঘৃণা করে স্বামী যতীনকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'জননী' উপন্যাসের শ্যামা সম্পর্কেও জানিয়েছিলেন শ্যামা দেবী নয়, মানবী। জননী শ্যামাকে সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি তাকে দেবী হিসাবে গড়ে তুলতে চাননি। আলোচ্য গল্পের মহাশ্বেতাও স্বামী যতীনের সমস্ত অত্যাচার মেনে সর্বংসহা দেবী হয়ে উঠতে চায়নি। কুষ্ঠাশ্রমের কুষ্ঠরোগীদের সে মায়ের মতো সেবা করতে পারে, কিন্তু যতীনের ক্ষেত্রে তা পারে না। এই সেবার মধ্যেও তো ভেতরে ভেতরে আছে যতীনের প্রতি মহাশ্বেতার প্রতিশোধের আয়োজন,—কারণ সে দেবী নয়, মানবী।

১৫.৪ গঠন-বিশ্লেষণ

গল্পটির নাম 'কুষ্ঠরোগীর বউ', কিন্তু যতীন-চরিত্র পরিস্ফুটনে যতখানি পরিসর ব্যয় করেছেন মহাশ্বেতা-চরিত্র ততখানি পরিসর জুড়ে বিরাজ করে না গল্পটিতে। যেহেতু গল্পটি কুষ্ঠরোগীকে ঘিরেই আবর্তিত তাই এ-থেকে ধারণা জন্মাতে পারে গল্পটির নামকরণ যথোপযুক্ত হয়নি।

কিন্তু আমাদের মনে হয় লেখক প্রদত্ত নামকরণটি অযথার্থ নয়। প্রথমত কুষ্ঠরোগীর বউ অর্থাৎ মহাশ্বেতার চরিত্রের ক্রমিক রূপান্তরটি যতীন-চরিত্রের ক্রমিক রূপান্তরের পরিচয় লিপিবদ্ধ না করে কখনও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যেত না। তাই স্বাভাবিকভাবেই লেখক যতীন-চরিত্রটির রূপান্তর পরিস্ফুটনে জোর দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত মহাশ্বেতা চরিত্রটির রূপান্তরকে প্রকাশের জন্য যতীনের থেকে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন লেখক। যতীন চরিত্রের রূপান্তর প্রতিক্রিয়াতেই লেখক ধরবার চেষ্টা করেছেন মহাশ্বেতার ক্রমিক রূপান্তর। এইজন্য যতীনের তুলনায় গল্পে কম পরিসর জুড়ে বিরাজ করছে মহাশ্বেতা। তৃতীয়ত, আমাদের মনে রাখতে হয় যতীন-চরিত্রটির দুঃখ, ক্রোধ, হিংসা—সবকিছুই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে, 'না-বলা বাণীর ঘন যামিনী' তার চরিত্রে অনুপস্থিত। আর মহাশ্বেতা নিজেকে কখনও সম্পূর্ণরূপে পাঠকের সামনে প্রকাশ করে না, যতীনের বারংবার আঘাতে মহাশ্বেতা ক্রমশ অচেনা হয়ে ওঠে। এই মহাশ্বেতার কোনো ভাবাতিরেক নেই, স্বামীর আচরণে তাকে চোখের জল ফেলতে দেখি না, সন্তান-মৃত্যুর আঘাতেও সে মুহ্যমান নয়। যতীন চরিত্রের জন্য লেখক ব্যয় করেন অধিকতর পরিসর, কিন্তু পরোক্ষে নির্মাণ করেন মহাশ্বেতা-চরিত্রটিকেই। চতুর্থত, গল্পটির শেষাংশও বুঝিয়ে দেয় গল্পটি আসলে কুষ্ঠরোগীর নয়, কুষ্ঠরোগীর বউয়ের। যতীন প্রত্যাদেশ পাবার আশাতে কামাখ্যা চলে যায়। সেই অবসরে মহাশ্বেতা বাড়িতে খুলে বসে কুষ্ঠাশ্রম। গল্পের রাশ ধরে এরপর মহাশ্বেতা। যতীন ফিরে এলেও গল্পের কাহিনি আবর্তিত হয় মহাশ্বেতাকে ঘিরেই। যেখানে গল্পটি শেষ হয় সেখানে যতীনের চরিত্রের পরিচয় প্রকাশিত হয় না, বরং উদ্‌ঘাটিত করে মহাশ্বেতা-চরিত্রের মনোলোক। অর্থাৎ পাঠকের অন্তিম উপলব্ধির সমগ্র অংশ জুড়ে বিরাজ করে মহাশ্বেতা—কুষ্ঠরোগীর বউ।

একটি ঘর, দুটি মন—এই ঘেরাটোপেই 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পটি লিখিত। সমাজ-অভিজ্ঞতাকে বিস্তৃত প্রেক্ষাপট প্রকাশের অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু একজন ভালো লেখক স্বল্প সুযোগেরও পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সেই প্রয়াস এখানে লক্ষ করা যায়। অসুস্থ যতীন ডাক্তার দেখাতে আরম্ভ করে। লক্ষণীয়

যতীনের মতো ধনীর ছেলে একজন ডাক্তারকে দেখিয়েই চরম সিদ্ধান্তে আসতে পারে না যে তার কুষ্ঠ হয়েছে। এইজন্য ষোলো টাকা, বত্রিশ টাকা এবং শেষ পর্যন্ত একশো টাকা ভিজিটের ডাক্তার দেখানো। প্রত্যেক ডাক্তারই রোগটি শনাক্ত করতে পারে, কিন্তু রোগীকে রোগ সম্পর্কে বলার ভঙ্গি ভিন্ন। রোগ সম্পর্কে জানানোর ভঙ্গিই যেন তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন ভিজিটের পরিচায়ক হয়ে ওঠে।—

ষোলো টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন ঃ 'আপনাকে বলতে সংকোচ করছি, আপনার কুষ্ঠ হয়েছে।'

বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন ঃ 'টাইপটা খারাপ। একেবারে সেরে উঠতে সময় নেবে।'

একশো টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন ঃ 'যতটা সম্ভব লোকালাইজড্ করে রাখা ছাড়া উপায় নেই। তার বেশী কিছু করা অসম্ভব। জানেন তো রোগটা ছোঁয়াচে, সাবধানে থাকবেন। আপনাকে তো বলাই বাহুল্য যে ছেলেমেয়ে .... বোঝেন না?''

—ষোলো টাকার ভিজিটের ডাক্তার সংকোচের সঙ্গে রোগটা জানান, কিন্তু কোনো চিকিৎসার কথা বলেন না। বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার সেরে উঠার মিথ্যা আশ্বাস দেন, আর একশো টাকা ভিজিটের ডাক্তার জানিয়ে দেন এ রোগ খানিকটা প্রতিরোধ করা যেতে পারে, কিন্তু সারার নয়, স্মরণ করিয়ে দেন এর সংক্রমণের দিকটিও। লক্ষণীয় একশো টাকার ভিজিটের ডাক্তারের মুখে ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ বেশি, তাঁর জ্ঞান-পরিধির বিস্তার শব্দপ্রয়োগেও ছাপ ফেলেছে।

মহাশ্বেতার কুষ্ঠাশ্রম খোলাকে কেন্দ্র করেও লেখকের বাস্তব-অভিজ্ঞতা আবার নতুনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মহাশ্বেতাকে ডাক্তার জানিয়েছেন যে শহরের মাঝখানে কুষ্ঠাশ্রম খোলার ক্ষেত্রে বাধা আসবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানিয়েছেন—'তবে কি জানেন, এসব হল সৎ কাজ। সহজে কেউ বাধা দিতে চায় না। পাড়ার লোক নালিশ করবে ঃ সে নালিশের তদ্বির হবে, তারপরে আপনার কাছে নোটিশ আসবে। তখনও দুমাস আপনি চুপ করে থাকতে পারবেন। ফের আর একটা নোটিশ এলে তখন ধীরে সুস্থে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবেন।' ডাক্তারের এই পরামর্শটি লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা-প্রসূত বলা যায়।

গল্পটির উপস্থাপন ভঙ্গি লক্ষ করলে দেখা যায় প্রথমে লেখক গল্পের প্রারম্ভিক লগ্নে জীবন-সম্পর্কিত এক সাধারণ উপলব্ধির বিবরণ-দান করেছেন এবং তারপর শুরু হয়েছে যতীন-মহাশ্বেতার কাহিনি। যতীন-মহাশ্বেতার কাহিনিটি যেন উপস্থাপিত হয় তিনটি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ের বিস্তার মহাশ্বেতার যতীনের আঙুল দেখে মহাশ্বেতার মনে জাগ্রত প্রশ্ন থেকে মহাশ্বেতার সংলাপ— 'তোমার পাপ কেন হবে গো। আমার কপাল?' এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু বলা যায়, যার বিস্তার যতীনের প্রত্যাদেশ আনার জন্য কামাখ্যা গমন পর্যন্ত। 'গোড়াপত্তন কালীঘাটেই হইয়াছিল।' —এই বাক্য থেকেই তৃতীয় পর্যায়ের আরম্ভ এবং বলা বাহুল্য গল্পটির শেষ পর্যন্ত এর বিস্তার। গল্পটির কাহিনি প্রথম ও তৃতীয় পর্যায় দ্বিতীয় পর্যায়ের তুলনায় সংক্ষেপে উপস্থাপিত হয়েছে। কুষ্ঠরোগকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর যে মানসিক টানাপোড়েন তাকেই বিশদরূপে ফুটিয়ে তুলতে চান লেখক। এইজন্যই গল্পের দ্বিতীয় পর্যায় তুলনায় বিস্তৃত।

প্রথম পর্যায়টি যতীন-মহাশ্বেতার মধুর দাম্পত্য-জীবনের স্মৃতি-পরিচয়বাহী। টিনচার আয়োডিনের বদলে চুম্বনে রোগ সারানোর প্রচেষ্টা থেকে স্বামী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত জেনে গভীর বেদনাবোধ তাদের জীবনের সমবেত গতিকেই প্রকাশ করেছে। আয়োজন সংক্ষিপ্ত কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্পর্কের ভাঙনটি মর্মন্তুদ পরিচয়-প্রদানে প্রয়োজনীয়।

তৃতীয় পর্যায়টির উপস্থাপন বিবরণাত্মক। কালীঘাট থেকে ফিরে এসে মহাশ্বেতার কুষ্ঠাশ্রম খোলা, রোগীদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা এবং স্বামীকে উপেক্ষা—এর বিবরণ উঠে এসেছে। লেখক এই পর্যায়ে যতীন

বা মহাশ্বেতা কারুরই মনের খবর তুলে আনার জন্য প্রত্যক্ষ বিবরণের বাইরে বিশ্লেষণকে সংযোজন করেননি। এমনকি মহাশ্বেতার কার্যকলাপকে বিশ্লেষণ না করার জন্য যেন কৈফিয়তও খাড়া করেন। ('ইহাতে জটিল মনোবিজ্ঞান নাই। সহজ বুদ্ধির অনায়াসবোধী কথা।') এবং গল্পের শেষ বাক্যে ইঙ্গিতে বক্তব্যকে প্রকাশ করেন। তৃতীয় পর্যায়টি দ্বিতীয় পর্যায়েরই প্রতিক্রিয়াজাত; এই পর্যায়ের উপস্থাপনভঙ্গি বিশ্লেষণাত্মক হলে ছোটগল্পের রহস্যময়তা এবং সমাপ্তি-লগ্নের অতৃপ্তি বোধজনিত শিল্প-কুশলতা ক্ষুণ্ণ হত।

দ্বিতীয় পর্যায়টির উপস্থাপনভঙ্গি আমরা আগেই জানিয়েছি বিশ্লেষণাত্মক; এই বিশ্লেষণ চরিত্র দুটির আচরণের এবং অন্তর্মনের। এ-ক্ষেত্রে যতীনের আচরণ ও মন যতখানি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট চেহারা নেয়, মহাশ্বেতা ততখানি স্পষ্টতা পায় না। বরং মহাশ্বেতার পরিচয় দিতে গিয়ে এক ধরনের ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেন। আমাদের মনে হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একই পটে আঁকতে চেয়েছেন দুজনের দুধরনের মনের ছবি। একজনের মনকে রঙে ও রেখায় যতখানি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন, অন্যজনের ক্ষেত্রে সচেতনভাবেই অস্পষ্টতা রেখে পাঠকের হৃদয়ে নতুনভাবে সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ রেখেছেন। বিষয়টিকে দৃষ্টান্ত সহযোগে বোঝানো যেতে পারে—

মহাশ্বেতাকে ঘিরে যতীনের অনুভব— 'মহাশ্বেতার মুখের কালিমা তাহার রূপৈশ্বর্যের মতো লাগে, উহার চোখের ফাঁকা দৃষ্টি যে আজকাল শ্রান্তিতে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে সেটি তাহার মনে হয় পরিতৃপ্তি। উহার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাটি যতীনের কাছে হইয়া উঠিয়াছে সাজসজ্জা।'

—মহাশ্বেতাকে ঘিরে যার এই অনুভব, সে সহজেই তার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে। অর্থাৎ চরিত্রের আচরণ, আর এর পিছনে তার মনোভাব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণভাবে প্রকাশ করেন।

যতীনকে ঘিরে মহাশ্বেতার অনুভব—'যতীন হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠে। মহাশ্বেতা ছবির মতো দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার বিকৃত ক্রন্দন চাহিয়া দ্যাখে। যতীনের আকুলতা যত তীব্র হইয়া উঠে সে যেন ততই শান্ত হইয়া যায়। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে তাহার চোখে পলক পড়ে, ঘরের দেওয়ালে ঝাপসা ছবিগুলি মন্থরগতিতে তাহার চারিদিক পাক খায়। বাহিরের শব্দগুলি তাহার কানে আসিয়া বাজিতে থাকে, সে একটু একটু করিয়া তাহা অনুভব করে। তাহার মনে হয় কে যেন কোথায় কাঁদিতেছে।'

যতীনের কান্না দেখে মহাশ্বেতা শান্ত হয়ে যায়—এই আচরণের কারণ কিন্তু সরাসরি লেখক তুলে ধরেন না। বোঝা যায় যতীনের কান্না তাকে আর স্পর্শ করে না, যতীনের জীবন থেকে সে সরে গেছে অনেক দূরে, এইজন্যই তার অনুভব 'কে যেন কোথায় কাঁদিতেছে।' দুটি চরিত্রের ক্ষেত্রে এইভাবেই বিশ্লেষণের পার্থক্য তৈরি করেছেন লেখক।

গল্পটির কথারীতির আলোচনাতে প্রথমেই লক্ষ করা যায়—বিবৃতি ও সংলাপের ভাষারীতির পার্থক্য। বিবৃতির ভাষা সাধু এবং সংলাপের ভাষা চলিত। বিবৃত অংশটিতে পরিবেশ বর্ণনার প্রাধান্য নেই, আবার যেহেতু চরিত্রগুলির কার্যধারার পরিচয় নেই, তাই সেই বর্ণনাও উঠে আসেনি, বেশিরভাগ অংশ জুড়ে আছে চরিত্র দুটির মনস্তত্ত্বের পরিচয়। কিন্তু এই পরিচয় উদ্‌ঘাটনে লেখক চরিত্রকে সরাসরি কোনো সুযোগ দেন না। প্রথম পুরুষের জবানি ব্যবহার করেও বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে অনেকসময় কোনো কোনো লেখক সুযোগ করে দেন চরিত্রের নিজস্ব দৃষ্টিকোণকে ব্যবহারের সুযোগ, এখানে গল্পটিতে কেবল প্রথম পুরুষের জবানি ব্যবহৃত হয় এমন নয়, গোটা গল্পটি উঠে আসে একান্তই লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকেই। বিবৃতির ভাষা আলোচনার ক্ষেত্রে বিবৃতির বিষয় এবং দৃষ্টিকোণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। গল্পটি যেহেতু মনস্তাত্ত্বিক, গল্পের বিবৃতির প্রথম পুরুষের জবানি-নির্ভরতাই হয়ে ওঠে বিশ্লেষণাত্মক। লেখক এখানে তৃতীয় পক্ষ হয়ে দুজনের মনের জট-জটিলতাকে উন্মোচনে

প্রয়াসী হয়েছেন। দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেওয়া যেতে পারে।—

"মহাশ্বেতার নির্বাক ও নির্বিকার আত্মসমর্পণকে সে অসাধারণ ঘৃণার অস্বাভাবিক প্রকাশ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে। মানুষকে দিবার যতীনের আর কিছুই নাই। সে তাই মানুষের উপর রাগিয়াছে। সে তাই স্বার্থপর হইতে শিখিয়াছে। ব্যথা পাইয়াছে বলিয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে সে কুণ্ঠিত নয়।"—এখানে যতীনের মহাশ্বেতার মনকে চিনতে পারা বা মানুষের প্রতি স্বার্থপর হয়ে ওঠা কারণসহ প্রকাশিত হয়েছে লেখকের জবানিতে। ফলে এই ভাষা যেন আবেগরহিত, এ-ভাষা যেন মুক্তির ভাষা।

যতীন ও মহাশ্বেতা—কোনো চরিত্রকেই স্মৃতি-তাড়িত করে আঁকেননি লেখক। দুজনের স্মৃতিলোক উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস থাকলে ভাষা অনেকখানি আবেগে স্পন্দিত হবার সুযোগ পেত। কারণ স্মৃতিলোক উদ্‌ঘাটনে চরিত্রগুলির নিজের দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হবার অবকাশ তৈরি হত। দ্বিতীয়ত তাদের দু-জনেরই মনের মণিকোঠায় ছিল প্রণয়রসে পরিপূর্ণ দাম্পত্যজীবনের মধুর স্মৃতি যা ভাষায় প্রকাশ করলে আবেগময়তা সংযুক্ত হত। কিন্তু গল্পটিতে কোমল ভাবালুতাকে বর্জনের সচেতন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। যেমন—'কুমারী জীবনের স্মৃতি একটি অচিন্তনীয় অনুভূতির মতো মস্তিষ্কের বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, বিবাহের পর যে চারটি বছর যতীন সুস্থ ছিল, সুরূপ ছিল, সে সময়ের কথাটি ভাবিতে আরম্ভ করা মাত্র মহাশ্বেতার চিন্তাশক্তি অসাড় হইয়া যায়।' কুমারী জীবনের স্মৃতিকে চিন্তায় রূপ দিতে পারে না মহাশ্বেতা, আর চার বছরের মধুর দাম্পত্যজীবনের কথা ভাবতে গিয়ে চিন্তাশক্তি অসাড় হয়ে যায়; দুটি ক্ষেত্রেই আবেগময়তাকে সযত্নে পরিহার করা হয়েছে। ফলে গল্পটির ভাষায় আবেগ আর নিরাবেগের বুনোট তৈরি হয় না, বরং প্রদর্শিত হয় নিরাবেগ ভাষার শিল্পকুশলতা।

উপন্যাস বা ছোটগল্পে লেখক চরিত্রের মুখে সংলাপ সংযোজনের আগে অনেকসময় সংলাপটির উচ্চারণকালে চরিত্রটির অঙ্গভঙ্গি, মনের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে থাকেন। একে বলা হয়—'সংলাপ-বর্ণনা' অংশ। আলোচ্য গল্পটিতে মূলত দুজনের সংলাপ আছে—যতীন ও মহাশ্বেতার। লক্ষ করার বিষয়, মহাশ্বেতার মুখে সংলাপ-সংযোজনের আগে প্রায় ক্ষেত্রেই কোনো 'সংলাপ-বর্ণনা' অংশ যুক্ত হয়নি, অন্যদিকে যতীন চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি সংলাপের ক্ষেত্রেই সংযোজিত হয় বর্ণনা-অংশ। যেমন— 'যতীন গোঁ ধরিয়া বলে, ...', 'যতীন অনুযোগ করিয়া বলে, ...', 'যতীন হঠাৎ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলে....'। মহাশ্বেতা চরিত্রটির অন্তর্ভাবনাকে সরাসরি প্রকাশ না করে রহস্যময়তা সৃষ্টি করার জন্যই লেখক তার সংলাপে বর্ণনা-অংশ সংযোজন করেননি।

গল্পটিতে কোনো দীর্ঘ-সংলাপ কোনও চরিত্রের মুখেই সংযোজিত হয়নি। কাটা-কাটা বাক্যে তৈরি হয়েছে সংলাপ। আবার যতীনের তুলনায় কম সংলাপ প্রযুক্ত হয়েছে মহাশ্বেতার মুখে। যতীনের কথার প্রত্যুত্তর দিয়েছে মহাশ্বেতা, কিন্তু নিজে উদ্‌যোগী হয়ে কোনো কথা বলতে চায়নি যতীনের সঙ্গে। মহাশ্বেতার মাপা সংলাপ দুজনের সম্পর্কের টানাপোড়েনটি স্পষ্ট করে তুলেছে।

১৫.৫ অনুশীলনী

১। দাম্পত্য-সম্পর্কের টানাপোড়েনটি পরিস্ফুট করুন।

২। মহাশ্বেতা চরিত্র-চিত্রণে লেখকের দক্ষতা বিশ্লেষণ করুন।

৩। 'মহাশ্বেতা দেবী তো নয়? সে কুষ্ঠরোগীর বউ।'
—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তিটি অবলম্বনের গল্পটির শেষাংশ ব্যাখ্যা করুন।

একক ১৬ ❑ সংকেত—সোমেন চন্দ

গঠন

১৬.১ মূলগল্প

১৬.২ সোমেন চন্দ : জীবন ও সাহিত্য এবং 'সংকেত' গল্পটি

১৬.৩ অনুশীলনী

১৬.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১৬.১ মূলগল্প

তখনও আকাশ ভালো করিয়া পরিষ্কার হয় নাই, নানারকমের পাখি। আগামী দিনের ঘোষণায় প্রাণপণে ডাকাডাকি করিতেছে, বনগ্রামের মরা নদীর কঠিন বুকেও ভয়ানক ঝড় তুলিয়া কাহাদের এক লঞ্চ তীরে আসিয়া ভিড়িল।

প্রথমে দেখিয়াছিল অন্ধ দশরথ। তাহার দুই ছেলে— এক ছেলে গিয়াছে বেহালে, আর এক ছেলে যার বয়স অল্প, হাতের বৈঠাটি একপাশে রাখিয়া সে তখন অন্ধ পিতার জন্য এক ছিলিম তামাক ভরিতেছিল, আর দশরথও তখন তাহার হাতের জালটি গুটাইয়া গলাটি একটু ভিজাইবার আশায় পশ্চিমের প্রায়ান্ধকার আকাশের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া ছেলের তামাকের প্রতীক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ কেমন একটা গুম্ গুম্ আওয়াজ তাহার কানে বাজিতে লাগিল, কিছুক্ষণ গভীর মনোযোগে কান পাতিয়া শুনিয়া সে ডাকিল, 'রাম?'

দশরথ-পুত্র রাম তখন তামাক ভরিতে ব্যস্ত, তাহার কিছুই ভালো লাগিতেছে না, রাগিয়া বলিল, 'ক্যান?'

দশরথ বলিল, 'কিছু হুনস্নি?'

রাম মুখ না তুলিয়াই বলিল, 'না'।

দশরথ আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'দ্যাখ তো চাইয়া, ইস্টিমার তো না?'

—'তা অইলে তুমি কিছু দেখতে পাও, না বাবা?'

রামচন্দ্রের বিশ্বাস, তাহার বাবা তেমন করিয়া না দেখিলেও কিছুটা নিশ্চয় দেখিতে পায়, কিন্তু দশরথ ইহা শুনিলে আর রাগ সামলাইতে পারে না। এবার হয়তো শুনিতে পায় নাই, তাই রক্ষা। কোনো উত্তর না পাইয়া আবার সে ডাকিল, 'রাম!'

—'কী।' কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাম একবার সেদিকে তাকাইল। দশরথের কথা মিথ্যা নয়, সত্যই একটা ছোটো জাহাজের মতো চোখে পড়ে, এখন আওয়াজ আরও স্পষ্ট—

দারুণ খুশি হইয়া সে বলিল, 'হ, বাবা।'

—'দ্যাখ্ আমার কথা হাছা কিনা।' দশরথ হাসিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক গল্প জুড়িয়া দিল। সে অনেকদিন আগেকার কথা, বেলতলির জমিদার বাড়ির বড়ো ছেলে সদ্য বিলাত হইতে ফিরিয়া সেই প্রথম যখন নিজ গ্রামে প্রবেশ করিলেন, তখন আসিবার পথে বিস্তর দুর্ভোগ ভুগিয়া এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে তার কিছুদিন পরেই দেখা গেল, মস্ত

এক স্টিমার ভীষণ হাঁকডাকের সঙ্গে আশপাশের গ্রামের সমস্ত লোককে আনিয়া হাজির করিয়াছে নদীর পারে। স্টিমার কোম্পানির নূতন লাইন খুলিয়াছে, তখনকার নদী কি আর এখন আছে! দশরথ সেই দৃশ্য দেখিয়াছে তাহার জীবনে। আজকাল কি আর সেরকম ঘটনা ঘটে। সেসব দিনের মানুষও আজ আর নাই, তাহাদের কীর্তিও নাই। এবং পরক্ষণেই এই অদ্ভুত খবরটি শ্রীরামচন্দ্রের মুখে সারা গ্রামে রটিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে লঞ্চের সিঁড়ি বাহিয়া যে লোকটি সদলবলে নামিয়া আসিল, তাহার গায়ে চমৎকার পাঞ্জাবি আর সিল্কের চাদর, পায়ে চকচকে পাম্প-শু, মুখে একটি সিগারেট আর মৃদু হাসি।

যাহারা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের কেহ দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, কেহ সেখানে থাকিয়াই বুকের ওপর দুই হাত রাখিয়া এমনভাবে চাহিল, তাহাদের মতো তাহারা চলিয়া যাইবে না, মারিয়া ফেলিবে না তো আর। ইহারা নবীন। যাহারা প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধ তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া হাসিল। ইহাদের স্পর্ধা তো কম নয়। ব্যাপার যাই হোক না কেন সবটাতেই একটা বাহাদুরি দেখানো চাই। বাবু, সেলাম। ইয়াসিন একটা সেলাম দিয়া বলিল, আজ জীবনের শেষ ঘণ্টাগুলি ঢং ঢং করিয়া বাজিতেছে, এতকাল যে সেলামের জোরেই সে সকলের প্রিয় হইয়া আসিয়াছে, আজও তাহার অন্যথা হইবে না।

বাবু সেলাম গ্রহণ করিলেন এবং মৃদু মৃদু হাসিলেন।

খবরে যদিও জানা গেল লোকটি কোনো এক কাপড়ের কলের ম্যানেজার— অর্থাৎ একেবারে বড়ো-কর্তা, মিলের জন্য এখানে লোক সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে, তবু তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত রহিল না।

শীতের সকাল। রহমানের বাড়ি পার হইয়া দূরে কাহাকে যেন দেখিয়া বলরাম পাশে সরিয়া দাঁড়াইল, লোকটা একটু কাছে আসিলে পর হাসিয়া বলিল, ''কাকা না গো?' ইয়াসিন বলিল, 'হু'।

—'কী যে আইছে, দূরের থনে তোমারে চিনতেই পারি নাই। ন্যাশে— খবর শুনছোনি? তোমরা যতই কও, আমার কিন্তু মনডা খালি কয়, এখবর মিছা।'

—'দূরো। তোমার তো হগলটাতেই খালি সন্দ!' ইয়াসিন পরম নিঃসন্দেহে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল— এমনভাবে চাহিল যেন ইহার পরে আর দ্বিতীয় কথা নাই। সে সকলের আগে নিজের কানে যাহা শোনে, তাহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিবে, এমন হতভাগ্য এ অঞ্চলে কেহ নাই। ধীরে ধীরে সে বলিল, বাবুটি যে কোনো মিলেরই বড়োবাবু, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং তিনি যে লোক সংগ্রহ করিতে আসিয়াছেন, একথাও মিথ্যা নহে— বলরাম তাহার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে। তাহার ছোটো বেলায়ও যে এমনি আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। সে তখন ছোটো, হঠাৎ এমনি একদিন কোথা হইতে এক বাবু আসিয়া সারাটা গাঁ তোলপাড় করিয়া তুলিল!—

ইতিমধ্যে আকবর আলি আসিয়া তাহার কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল তাহার হাতে একটি আমের কচি ডাল, সেটা দাঁত দিয়া চিবাইতে চিবাইতে সে মাথা নাড়িতে লাগিল। ফিক করিয়া কিছু থুথু ফেলিয়া বলিল, 'লড়াইয়ের খবর রাখনি ইয়াসিন মিঞা? হেইর লেইগা ফাঁকি দিয়া লোক লিবার আইছে, জান?'

আরও দুই-একজন আসিয়া জুটিয়াছিল। এমন একটি কথা শুনিয়া তাহারা সকলে বিস্ময়ে আর ভয়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু সকলে আকবরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে দেখিয়া ইয়াসিন রাগিয়া উঠিল, হঠাৎ নিজের বুড়া আঙুলটি তাহার চোখের সামনে ধরিয়া বলিল, 'তুমি এইটা জান? আকবর আলি গম্ভীরভাবে বলিল, 'তোমার কুন ডর নাই, হ্যারা বুড়া মানুষ গো নিব না।'

ঝগড়া ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। আরও বাড়িত। কিন্তু কে একজন বলিল, 'বাচ্চা মৌলবি।'

সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইল, ঝগড়া কিছুক্ষণের জন্য থামিল— এই আশায় যে বাচ্চা মৌলবিই ইহার মীমাংসা

করিতে পারিবে।

বাচ্চা মৌলবি বলিয়া তাহাকে সবাই ডাকে, তার একমাত্র কারণ এই যে তাহার বয়স অত্যন্ত অল্প এবং এই বয়সেই সে মৌলবি হইয়াছে। সে পাশের গ্রামেই থাকে এবং মাঝে মাঝে কোনো পত্রিকা হাতে করিয়া আসিয়া বেলা দুইটা-আড়াইটা অবধি এ অঞ্চলের সকলকে যুদ্ধের খবর শুনাইয়া যায়। শহরের খবর তাহার কাছে অবিদিত নাই, মাসের মধ্যে পনেরো দিনই তো সে সেখানে কাটায়। এ কথা সবাই জানে, নবাবের সঙ্গে বসিয়া সে খানা খাইয়াছে এবং নবাব সাহেব তাহার হাতে চুমু খাইয়াছেন।

বাচ্চা মৌলবির পরনে পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি, গোঁফ এখনও ভালো করিয়া উঠে নাই, হাতে একটা ঘড়ি। কিন্তু ঘড়িটা কখন চলিতে শুরু করে, আর কখন থামে এ খবর কেউ রাখে না। ঘড়িটা একবার চোখের সামনে ধরিয়া এই শীতের সকালেও পত্রিকা দিয়া বাতাস খাইতে খাইতে মৌলবি শুদ্ধ ভাষায় বলিল, 'ওনারে আমি চিনি।' এই বলিয়া ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে তাহার এক সুদীর্ঘ পরিচয়ের ইতিহাস বিবৃত করিয়া অবশেষে বলিল, 'তাইন লোক নিতে আইছে ঠিকই। রহমান, তোমার ঘরে তো তাঁত আছে, তোমারে নিব আগে।'

রহমান এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, মৌলবির কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল। নতুন বিবাহ করিয়াছে সে, তেলে আর জলে চুলগুলি চমৎকার পরিপাটি, চোখে সুরমা, পরনের জামা আর লুঙ্গি রঙিন।

বেলা হইয়া যাইতেছিল। মৌলবির সময় নাই, একবার সূর্যের দিকে এবং আর একবার ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'দশটা বাইজা গেছে, আমি যাই, কাজ আছে, আমার একটু চৌধুরি বাড়ি যাইতে অইব।'

আকবর আলি তবু কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু মৌলবিকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহার পাশে গিয়া ফিক করিয়া থুথু ফেলিয়া বলিল, 'মৌলবি।'

মৌলবি পাশে তাকাইল।

আকবর আলি বলিল, 'আমার একটা কথা রাখবা তুমি?'

'কও?'

—'আমার ভাই-এর লেইগা একটু কইয়া দিবা তুমি—'

মৌলবি পরিষ্কার ভাষায় বলিল, 'দিব, দিব।' বলিয়া তর তর করিয়া চলিয়া গেল।

শত আনন্দ হইলেও হাসিয়া কখনও আনন্দ প্রকাশ করে না ইয়াসিন। সকলের দিকে একবার তাকাইয়া সে বলিল, 'অহনও বিশ্বাস অয় না?'

বলরাম আগে সন্দেহ প্রকাশ করিলেও ইতিমধ্যে আবার বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছে। ইয়াসিনের কাছে ঘেঁষিয়া বলিল, 'কাকাগো, তোমার কাছেই আইছিলাম, একটা আলাপ করুম।' মণ্ডল-পুত্র কীসের পরামর্শ চাহিতে আসিয়াছে কে জানে। ইয়াসিন হাসিল।

বিকালের রৌদ্রে চারিদিক ঝলমল করিতেছে। গাছের ছায়ার নীচে একটা চেয়ারে বসিয়া ম্যানেজারবাবু মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের গাঁ-টি বেশ ভালো লেগেছে। তোমরাই দেশের গৌরব। যেমিন হবার আগে সারা ভারতের কাপড় জোগাতে তোমরাই। এমনকী বিদেশেও ছড়িয়ে দিতে, অথচ আজ শুকিয়া মরছ।

তোমাদের কদর ক-জনা বোঝে?' নদীর দিকে আঙুল দেখাইয়া তিনি বলিলেন 'সেখানেও এমনি নদীর হাওয়া, নদীর একেবারে পার ঘেঁষেই চমৎকার ব্যারাক সেখানে, তোমরা থাকবে। হাতের কাছে হাসপাতাল, খেলার মাঠ, সিনেমা, যখন যা খুশি।—' ম্যানেজারবাবু মৃদু হাসিলেন।

রহমান নাম লিখাইয়া ফেলিল। আজই রাত বারোটার সময় লঞ্চে উঠিতে হইবে।

বাড়ি ফিরিলে তাহার বুড়া বাপ হুঁকাটি ছেলের হাতে দিয়া বলিল, 'তাড়াতাড়ি খাওন-দাওন সাইরা শুইয়া পড়ো, বারোটা বাজলে পর আমি ডাইকা দিমুনে, যাও শুইয়া পড়ো গিয়া।'

রহমান পিতৃআজ্ঞা যথারীতি পালন করিল।

তাড়াতাড়ি খাইয়া-দাইয়া শুইতে আর দেরি করিল না।

কিন্তু রাত বারোটা বাজিতে আর কতক্ষণ লাগে? বুড়া রহমানের ঘরের দরজার কাছে গিয়া ডাকিল, 'বাপ, সময় আইয়া গেছে, অ্যালা ওঠো।'

কোনো উত্তর আসিল না, বা কেউ বাহির হইয়া আসিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা করিয়া বুড়া মনে মনে হাসিল, নিজের মৃত স্ত্রীর কথা মনে পড়িল।

অথচ এদিকে বারোটা বাজিয়া যাইতেছে। বুড়া আবার ডাকিল, 'রহমান ওঠো ইস্টিমার ছাইড়া দিতে আর কতক্ষণ।' এই বলিয়া নিজের ঘরের দাওয়ায় আসিয়া আবার তামাক সাজিতে বসিল। কিছুক্ষণ এমনি কাটিবার পরও রহমানকে আসিতে না দেখিয়া হুঁকা হাতে বুড়া আবার বাড়ির ভিতরে গিয়া দেখিল, দাওয়ার খুঁটি চাপিয়া ধরিয়া অন্ধকারে নিঃশব্দে রহমান বসিয়া আছে।

হুঁকাটি তাহার হাতে দিয়া বুড়া বলিল, 'তাড়াতাড়ি তৈয়ার অইয়া লও, বাপ আর দেরি কইরো না।'

রহমান তেমনি খুঁটি ধরিয়া বসিয়া রহিল।

এক হাতে একটি বহু পুরানো লন্টন, আর এক হাতে একটি প্রকাণ্ড চকচকে লাঠি লইয়া পথ দেখাইয়া চলিল বুড়া। রাস্তায় সাপ বা মানুষের ভয় থাক বা নাই থাক, এ দুটিকে ছাড়া সে কখনও পথ চলিতে পারে না। ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে সে বলিল, 'হেইখান গিয়া চিঠি দিয়ো, তা না অইলে চিন্তায় থাকুম।'

রহমান আস্তে বলিল, 'আইচ্ছা।'

গোলাম আলির বাড়ি পার হইলেই একটা মস্ত বকুল গাছের নীচ দিয়া হাঁটিতে হয়। সেখানে বকুল ফুলের গন্ধে চারিদিক ভরিয়া থাকে। সেই গাছের নীচ দিয়া চলিতে চলিতে রহমানের শরীর অবশ হইয়া আসিল, ঘুমে ভরা চোখ বুজিয়া আসিল, সে অনুভব করিল এখনও যেন সে কারও ফুলের মতো বুকে মুখ রাখিয়া গভীর নিশ্বাস ফেলিতেছে।

ঠক ঠক করিয়া এখানে-সেখানে লাঠি ফেলিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বুড়া আবার ডাকিল, 'বাপ।'

—'কও?' কিন্তু কিছুক্ষণ কান পাতিয়া থাকিয়াও রহমান আর কোনো কথাই শুনিতে পাইল না। বোধ হয় যা বলিতে হইবে সব ভুলিয়া গিয়াছে বুড়া।

একটু পরেই লঞ্চের আলো দেখা গেল। আশে-পাশে অনেক লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সকলেই উচ্চস্বরে গল্প করিতেছে। কেহ সিঁড়ি বাহিয়া লঞ্চে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। সব মিলিয়া একটা মস্ত হল্লা।

একটু নির্জনতায় ছেলেকে টানিয়া বুড়া আবার বলিল, 'বাপ?'

—'কও?'

—'একটা কথা কমু। এত বুড়া হইয়া গেলাম, তুমি আমারে ছাইড়া কোনো কালে কোনো খানে যাও নাই, কিন্তু আইজ ছাইড়া গেলা, আমার মনডারে কী দিয়া বান্ধুম, তুমিই কও?' বুড়া অনেক কষ্টে তাহার সবগুলি কথা এতক্ষণে বলিয়া ফেলিল

এবং ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। এমন দৃশ্যের সঙ্গে রহমানের এই প্রথম পরিচয়, সে কী যে করিবে ভাবিয়া পাইল না।

নদীর উপরের ঠাণ্ডা বাতাসে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো কাঁপিতেছে! চারিদিকে জলের গন্ধ। আকাশে অজস্র তারা। পাশেই আগামী কোনো সুখের সৌরভে বিহ্বল লোকজনের হল্লা। বুড়ার শীর্ণ হাতের লাঠিখানাও ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে রহমান উপরে উঠিয়া দেখিল, সেই বাচ্চা মৌলবি সারা লঞ্চময় চরকিবাজির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। লোকটা এমনি পাতলা ছোটো-খাটো মানুষ, যেন হাওয়ার সঙ্গে উড়িয়া চলে, এক মিনিটে হাজার মাইল অতিক্রম করে।

রহমানকে দেখিয়া সে ঘড়ি দেখিয়া এদিক-সেদিক তাহার চঞ্চল দৃষ্টি বুলাইয়া তর তর করিয়া বলিল, 'এতক্ষণে আইছ! টাইম অইয়া গেছে।'

মৌলবি টাইম ধরিয়া চলে। আবার ঘড়ি দেখিয়া সে সামনের দিকে অগ্রসর হইল।

রেলিং ধরিয়া রহমান একা দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েকহাত নীচেই তাহাদের গ্রামের নদী, আজ ছাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া অত্যন্ত আপনার বলিয়া মনে হয়। নদীর জলে লঞ্চের আলো পড়িয়া চিকমিক করিতেছে, লঞ্চের ভিতরের মানুষগুলির আবছা ছায়াও সেখানে দেখা যায়, অন্ধকারের বুকে কেবল আরও কতকগুলি গভীর অন্ধকারের মতো মনে হয়। আর তাহাদের আত্মীয়-স্বজনরা— তাহারাও লণ্ঠনহাতে বিদায়ের প্রার্থনায় কাতর।

রহমানের চোখের পাতা বুজিয়া আসিল। সে দেখিল, নদীর জলে কে এক নারীমূর্তি, নাকের-চোখের জলে এক হইয়া তাহাকে ডাকিতেছে। তাহার নাকের ডগায় ঘাম, ঘর্মাক্ত সমস্ত শরীরটিকে রহমান ঝুঁকিয়া দেখিল। তাহার গায়ে এখনও সেই মেয়েটির ঘামের গন্ধ। আরও নিবিড় হইয়া সে সেই গন্ধ শুঁকিতে লাগিল।

ঘুমে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিল।

কোনোরকমে একটা জায়গা করিয়া ছোটো পুঁটুলিখানা মাথার নীচে রাখিয়া সে শুইয়া পড়িল। একটু পরেই সে স্বপ্ন দেখিল আকাশে ঝড়ের পূর্বাভাস, এখন ভয়ানক বাতাস ছাড়িয়াছে, দীর্ঘ সুপারি আর নারিকেল গাছের মাথায় ভীষণ মাতামাতিতে নদীর জলে দুরন্ত ঢেউ, বড়ো বড়ো ধানগাছের শিষগুলি যন্ত্রণায় কাঁপিতেছে, আকাশে পাখির কলরব, রহমান যেন শুনিতে পাইল, তাহাদের গোয়ালঘরের গোরুগুলি 'মা' 'মা' করিয়া কাতরস্বরে ডাকিতেছে। মনে হয় এমন করিয়া যেন তাহারা আর কোনোদিনও ডাকে নাই। তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া গিয়া সে দেখিল, তাহার গোরু নয় তো, তাহার বউ, আর গোয়ালঘরটা আসলে গোয়ালঘর নয় তো, তাহার শোবার ঘর। বউ তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, গলা জড়াইয়া ধরিল, বুকের মাঝখানে তাহার হাতটি রাখিয়া বলিল, 'এই দ্যাখো, এহান কেমুন ব্যথা। তোমারে ছাইড়া আমি থাকতে পারুম না বন্ধু, মইরা যামু!' একটু পরে রহমান টের পাইল, তাহার দুইটি পা আরও দুইটি পায়ের সঙ্গে সুতার মতো হইয়া গিয়াছে।

—'রহমান? ও রহমান?'

রহমান ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল, ভালো করিয়া চাহিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'কে? আজু?'

মৌলবি তাহার বউর নাম জানিত, হাসিয়া বলিল, 'না, আমি তোমার বউ না, আমি মৌলবি।'

রহমান চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, 'ও।'

কিন্তু মৌলবি কাজের লোক, তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'ভোর অইয়া আইছে, আর কত ঘুমাইবা?'

রহমান বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, সেখানে অনেক অন্ধকারের সারি এখনও ঠেলাঠেলি করিয়া মরিতেছে।

ম্যানেজারবাবুর কামরায় আলো দেখা যায়।

মৌলবি গল্প করিতে লাগিল, তাহার অভিজ্ঞতার ইতিহাস বলিয়া যাইতে লাগিল, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, রহমান কেবল হাঁ করিয়া শুনিল।

মৌলবি অনেক গল্প করিল।

কিন্তু ভোর আর হয় না, তাহারা উঠিয়া এধার-ওধার অনেক ঘুরিল। দুই-একজনকে জাগাইয়া গল্প করিল। ঘন্টাটা দুই চলিয়া গেল। তবু ভোর আর হয় না, বাহিরে তেমনি অন্ধকার, গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতায় কেবল জলের শব্দ।

মৌলবির ঘড়ির কাঁটা কখন চলিতে শুরু করে, আর কখন গিয়া থামে, সে তথ্য রহমান আজও জানিতে পারিল না, কেবল হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

আবার সে একা-একা কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল, লঞ্চের এটা-ওটা উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া কতক্ষণ দেখিল, শেষে হাত-পা গুটাইয়া বউর কথা ভাবিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে ভোর হইল। এখন মস্তবড়ো নদী, ওপারের সীমানা কুয়াশায় ভরা, সূর্যের আলোয় জলের উপর কেহ কতকগুলি চকচকে নূতন টাকা ছড়াইয়া রাখিয়াছে মনে হয়। নদীর দুই পাশে মাঝে-মাঝে ইঁটের খোলা, পাটের গুদাম।

দূরে মিলের চিমনি দেখা গেল। কিন্তু ধোঁয়ার চিহ্ন নাই। কোথা হইতে আসিয়া আবার মৌলবি দেখা দিল। কোনো নূতন খবর সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে নিশ্চয়। বলিল, 'আমরা আইসা পড়ছি।'

সকলের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। তাহারা তাহাদের কর্মস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে। সকলে সামনের দিকে ছুটিয়া আসিল। ওই যে কী একটা গম্বুজের মতো, ওটাই কী তাদের মিল? মৌলবি তাদের বুঝাইয়া দিতে লাগিল। সে সবই জানে। সকলে বিস্ময়ে আর আনন্দে এমন একটা জিনিসের প্রতি চাহিয়া রহিল।

পৌঁছিতে বেশি দেরি হইল না। ধীরে ধীরে লঞ্চের গতি মন্থর হইয়া আসিল, এখন পারে ভিড়িবে। ম্যানেজারবাবু আসিয়া দেখা দিলেন। কেমন একটা সফলতার আনন্দে তাঁহার সারামুখ উজ্জ্বল। সকলে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। দুই হাত ছাড়িলে যদি চলে সেখানে পাঁচ সাত সরিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু তখনও লঞ্চটা পারে একেবারে ভিড়ে নাই, ধীরে ধীরে যেন একটা ভীষণ কলরব, সহস্র কণ্ঠের মিলিত চিৎকার-ধ্বনি সকলের কানে আসিয়া বাজিল। সকলে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, মিল দেখার আনন্দে একেবারে ভাঙিয়া না পড়িয়া রহমান আগেই কিছুটা লক্ষ করিয়াছিল, এখন সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া শব্দটা আরও লক্ষ করিতে চেষ্টা করিল। মৌলবির মুখে বিস্ময়ের চিহ্নমাত্র নাই, সে নিতান্তই নির্বিকারভাবে ম্যানেজারবাবুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ব্যাপারটা সকলের আগে বুঝিবার আশায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ম্যানেজারবাবুর মুখ হঠাৎ ম্লান হইয়া গিয়াছে, মুখের সেই মৃদুমন্দ হাসি আর নাই। লঞ্চ-চালকদের কী একটা নির্দেশ দিতে তিনি তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই যা দেখা গেল, তা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার সন্দেহ নাই। নদীর পারেই প্রকাণ্ড চর, ধু-ধু করে বালু! তার পরে মিলের সীমানা। সেই ভীষণ গোলমাল আরও ভীষণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড চরটা মুহূর্তে হাজার হাজার লোকে ভরিয়া গেল; সেই লোকগুলি প্রাণপণে দৌড়িয়া আসিতেছে, প্রাণ যায় কী বাঁচে। ব্যাপার দেখিয়া রহমানের চোখে বিস্ময়ের অন্ত নাই— যেন একটা প্রকাণ্ড নদীর মুখ হঠাৎ খুলিয়া গিয়াছে, তাহার সমস্ত জল বিপুল বেগে সারাটা পৃথিবী ভাসাইয়া লইল। রহমানের বুক কাঁপিতে লাগিল, নিশ্বাস দ্রুত হইয়া আসিয়াছে।

লোকগুলির কতক হুড়মুড় করিয়া জলে নামিয়া পড়িল, লঞ্চটাকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিল। আর বেশির ভাগই দাঁড়াইয়া রহিল পারে। কিন্তু সকলের মধ্যে একটা ভয়ানক চঞ্চলতা, কেহ হাত নাড়িয়া কিছু বলিতেছে, কেহ কেবলই চিৎকার

হইবে না।

মুখের রঙ বেশ ফর্সা কিন্তু রোদে লাল ঘর্মাক্ত— মাথায় বড়ো বড়ো চুল, অবিন্যস্ত, শার্টের বুকের বোতাম খোলা, ফর্সা বুক আর গলা বেশ চোখে পড়ে। ছেলেটি চমৎকার মিষ্টি গলায় বলিল, 'আপনার বাড়ি কোথায় ভাই?'

রহমান বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ছেলেটি আবার বলিল, 'বলুন না, আপনার বাড়ি কোথায়?' রহমান এবার বলিল, 'বনগাঁ।'

—'বনগাঁ? বাঃ, চমৎকার নামটি তো। আচ্ছা, সেটা এখান থেকে কতদূর হবে?'

রহমান হিসাব করিয়া বলিল কতদূর হইবে।

ছেলেটি বলিল, 'এখানে এই এলেন, না? এখানে কেন এসেছেন? এমনি বেড়াতে, না?'

তাহার এই অনুসন্ধিৎসায় রহমান প্রথমে একটু বিরক্তি বোধ করিল, কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আর মিষ্টি কথা শুনিয়া তাহা ভুলিয়া গেল। বলিল, 'এহান কাজ করতে আইছি।'

—'ও!' ছেলেটি চারিদিকে চাহিয়া একটু পরে বলিল,— 'কিন্তু কাজ যারা এখন করছে তাদের উপায় হবে কী? ব্যাপার কী হয়েছে জানেন? এদের কোনো দোষ নেই তবু এদের তাড়িয়ে দিয়ে আপনাদের সে জায়গায় বসানো হবে। যার আর কোনো উপায় নেই এমন একজনের ভাত মারতে আপনার ইচ্ছে হয়?'

রহমান কিছু বলিল না।

—'বলুন না, ইচ্ছে হয় কিনা?'

রহমান তবু কিছু বলিল না। ছেলেটি বলিল, 'মনে করবেন না, আপনিও চিরকালই ওদের সুনজরে থাকতে পারবেন, আপনাকেও এমনি একদিন তাড়িয়ে দেবে।—' এই বলিয়া একটু হাসিয়া ছেলেটি চলিয়া গেল।

রহমানের ইচ্ছা হইল তাহাকে একটি বিড়ি খাওয়াইয়া দেয়, কিন্তু ছেলেটি তখন চলিয়া গিয়াছে।

রৌদ্রের তেজ ক্রমেই বাড়িতেছে। বালুর চর চিক চিক করে। নদীর হাওয়া রৌদ্রের মতোই তীব্র।

রহমান এদিক-সেদিক ঘুরিয়া একবার উপরের দিকে গেল, দেখিল গেটের কাছে কয়েকটি লোক হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে অর্থাৎ কাহাকেও যাইতে দিবে না, এই মতলব। একটু দূরে তাহাদের গ্রামের কয়েকজন হাত গুটাইয়া জটলা করিতেছে। রহমান তাহাদের সঙ্গে জুটিল। সেই জটলায় বাদশা মিঞাই প্রধান বক্তা। তাহাকে দেখিয়া সে এক পলক হাসিয়া বলিল, 'রহমানরে, হ্যারা তো যাইতেই দিত না, মনডা কয়।'

রহমান হাসিল। একটু পরে কী মনে করিয়া হঠাৎ বলিল, 'আইচ্ছা, বাদশা মিঞা—'

—'কও?'

—'হ্যারা জোর কইরা গেলে কী করত?'

বাদশা মিঞা সমস্যায় পড়িল। সে এমন ব্যাপারে কথা আরও শুনিয়াছে বটে কিন্তু ইহার পরের ঘটনা আর জানে না। আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'কী করত আবার। ধইরা, মাইর দিত।'

বাদশা মিঞা আকূলে কূল পাইয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, 'হু, মইর দিত। ঠিক, ঠিক, ঠিক।'

সুতরাং স্থির হইল, ওখানে জোর করিয়া ঢুকিলে উহারা খুব কষিয়া মার দিবে।

কিছু পরে মৌলবি আসিয়া বলিল, সামনের আর একটা গেটে তাহাদের যাইতে হইবে। সেখানে সকলেই আছে, শুধু

করিতেছে, সকলের মুখে-চোখে— কার্যকলাপে এমন একটা ভাব যেন এখনই পারিলে লঞ্চটাকে ডুবাইয়া দেয়। আর কী গোলমাল! আকাশকেও ফাটাইয়া চৌচির করিয়া দিবে মনে হয়। অমন দৃপ্ত রাগান্বিত পদক্ষেপে তাহাদের পায়ের নীচের ভূমিখণ্ড মুহূর্তে ধসিয়া যাইবে যেন, তাহাদের চিৎকার-ধ্বনিতে নদীর জলও উত্তাল হইয়া উঠিল।

কিন্তু রহমান লক্ষ করিয়া দেখিল, একেবারে সামনে একটা লোকের মধ্যে পেছনের সকলের শক্তি যেন একত্রিত হইয়াছে। লোকটার বয়স অল্প, চেহারায় এই হাজার হাজার লোকের মধ্যেও একটা পার্থক্য ধরা পড়ে। সে হাত নাড়িয়া ভয়ানক চিৎকার করিয়া কী যেন বলিতেছিল, প্রথম কিছুক্ষণ কিছুই শোনা যায় নাই, কিন্তু শেষে গোলমাল আপনিই কমিয়া আসিল। রহমান আশ্চর্য হইয়া শুনিল, লোকটা দৃপ্তস্বরে বলিতেছে: 'বন্ধুগণ, আমাদের দেখে আশ্চর্য হবেন না। আমরা এই মিলেরই শ্রমিক, আপনারা যেখানে কাজ করতে এসেছেন আমরা সেখানেই প্রথম কাজ করতে আসি। আমরা জানি আপনাদের শুধু চাকরির কথা বলেই আনা হয়েছে, আসল কথা বলা হয়নি। এই চাকরির ভেতর কী রহস্য তা আপনাদের কাছে গোপন করা হয়েছে। বন্ধুগণ, আমাদের কথা আপনারা একটিবার শুনুন, আমাদের বিশ্বাস করুন। যারা আপনাদের চাকরি দেবে বলে নিয়ে এসেছে তাদের আপনারা চেনেন না, কিন্তু আমরা চিনি। আমরা তাদের কাছে শুধু আমাদের অভাব অভিযোগের কথা জানাতে গিয়েছিলাম, আমাদের সামান্য কয়েকটা মাত্র দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম কিন্তু তারা গ্রাহ্যই করেনি। তারা আমাদের মুখের ওপর লাথি মেরেছে। কিন্তু আমরা কেন তা সহ্য করব? আমরা স্ট্রাইক করেছি, মিলের কাজ বন্ধ। আমরা তার প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমাদের এই শক্তিকে পিষে ফেলবার জন্যে, আমাদের মুখের ভাত কেড়ে নেওয়ার জন্যে তারা মিথ্যে কথা বলে আপনাদের এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আপনারা তাদের বিশ্বাস করবেন না। ভাই সব! আপনাদের চোখে পৃথিবী যেমন, আমাদের কাছেই তাই, আপনাদের যতখানি শোষণ দুঃখদুর্দশার কষ্ট সহ্য করে চলতে হয়, আমাদেরও তাই। আমাদের ঘর নেই, বাড়ি নেই, আজ এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে কাল কোথাও দাঁড়াবার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই— আমার চাষি ভাইরা, দোহাই আপনাদের, ভাই হয়ে ভাই-এর মুখের ভাত এমন করে কেড়ে নেবেন না। একথা মনে রাখবেন, আজ যারা আমাদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কাল তারা আপনাদেরও সেই লাথি থেকে রেহাই দেবে না। বন্ধুগণ, আমরা আপনাদের ভাই, ভাই-এর কথা একটিবার মন দিয়ে শুনুন, ভাই-এর কথা বিশ্বাস করুন— আপনারা এ কাজে যোগ দেবেন না, দোহাই আপনাদের, যে লোক আজ আপনাদের ভাই-এর মুখের ভাত কেড়ে নিচ্ছে, তার উল্লাসকে আর বাড়াবেন না।—'

রহমান স্তব্ধ হইয়া গেল, তাহার মনের ভিতর সব গোলমাল হইয়া গেল, সে আর কিছুই ভাবিতে পারে না।

ম্যানেজারবাবুর মুখে সেই হাসি আর নাই। রাগে অগ্নিমূর্তি হইয়া তিনি বলিলেন, 'সিঁড়ি ফ্যালো, সিঁড়ি ফ্যালো।'

মৌলবি হাসিমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, হাসিয়া হাসিয়া সকলকে বুঝাইল, ও কিছু নয়, একটা চাকরি খালি হইলে পঞ্চাশটা লোক আসিয়া যেমন দাঁড়ায়, ইহারাও তেমনি, পঞ্চাশটা চাকরি খালি হইয়াছে তো পঞ্চাশ হাজার লোক আসিয়া হাজির হইয়াছে। জোর করিয়াই লদিজেব আর কী। যেন মগের মুল্লুক। যেন মামার বাড়ির আবদার।— প্রিয়নাথ, শ্রীপতি, বাদশা মিঞা, চাঁদ মিঞা এবং আরও অনেকে মৌলবির কথায় সায় দিল, চরের উপর বিপুল জনতার দিকে আঙুল দেখাইয়া বোকার মতো তাহারা হাসিতে লাগিল।

ওদিকে সিঁড়ি পড়িয়াছে। একজন-দুইজন করিয়া সকলে নামিতেছে। সকলের শেষে নামিল রহমান। নামিয়াই সে আশেপাশে চাহিয়া দেখিল, তাহাদের গ্রামের কেহ তাহার পাশে নাই, সকলে জনতার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। সে একা একা ঘুরিতে লাগিল, একবার গেল উপরের দিকে। এখন জনতা আর সেইরকম জমাট বাঁধিয়া নাই, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

একজন তাহার জামা ধরিয়া টানিল— বলিল, 'শুনুন?'

রহমান দেখিল তাহাকে যে জামা ধরিয়া টানিতেছে সে নিতান্ত অল্প বয়সের একটি ছেলে। বয়স ষোলো-সতেরোর বেশি

তাহারাই কেন এখানে দাঁড়াইয়া আছে?

সকলে তাড়াতাড়ি মৌলবিকে অনুসরণ করিল। সেই গেটের কাছে গিয়া দেখিল সেখানেও কয়েকটি লোক তেমনি হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বাদশা মিঞার মেজাজটা খারাপ হইয়া গেল।

—যেখানে যাই সেখানেই ইহারা জোঁকের মতো লাগিয়া থাকে কেন।

মৌলবি তুড়ি মারিয়া বলিল, 'ভাই, তোমরা হগলে আসো।'

এই বিপদের সময় ভাগ্যিস মৌলবির মতো মানুষ সঙ্গে ছিল। তা না হইলে কী যে উপায় হইত কে জানে। সকলে দল বাঁধিয়া সামনের দিকে গেল কিন্তু ততক্ষণে সেই লোকগুলি সারা গেট জুড়িয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

এ আবার কোন্ কায়দা? বাদশা মিঞা আশ্চর্য হইল। মার দিবে না তো। ব্যাপার দেখিয়া রহমান দূরে সরিয়া আসিল, তাহার সঙ্গে আরও কয়েকজন আসিল। মৌলবি আর শেষ পর্যন্ত যাইতে পারিল না।

এইভাবে আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। সূর্য এখন মাথার উপর উঠিয়াছে। চারিদিকে তেমনি গোলমাল। এই সমস্যার কখন যে শেষ হইবে, রহমান ভাবিয়া কূল পায় না।

এদিক-ওদিক দৌড়াইয়া, এ-গেট ও-গেট করিয়া তাহার ক্ষুধা পাইয়া গিয়াছিল। একটা ছোটো পুঁটুলিতে বউ কিছু মুড়ি চিড়া আর গুড় বাঁধিয়া দিয়াছিল। রহমান আর একজনকে লইয়া একটু নির্জনে গিয়া পুঁটুলি খুলিয়া বসিল। খাওয়া শেষ হইলে নদীতে গিয়া হাত ধুইয়া আসিল। এখন একটা বিড়ি না খাইলে চলে না। কিছু দূরে একটা দোকানে গিয়া এক পয়সার বিড়ি সে কিনিল। কিন্তু একটা মুখে দিতেই আর একজন সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। এক মুহূর্তে এক পয়সার বিড়ি শেষ হইয়া গেল। রহমান নূতন বিবাহ করিয়াছে, সে এমনি দিয়া-থুইয়া খাইবে না তো কে খাইবে!

হাজার হাজার লোকের এমন বিপুল সমাবেশ, মুহূর্তের পর মুহূর্ত এমন বিস্ময়কর ঘটনাবলির সঙ্গে সাক্ষাৎ, একটা গাছের নীচে দাঁড়াইয়া বিড়ি খাইতে খাইতে রহমান যতই ভাবিতে লাগিল ততই আশ্চর্য হইতে লাগিল।

ক্রমে বিকাল হইতে লাগিল। রৌদ্রে, অনাহারে, দৌড়াদৌড়িতে চিন্তায় প্রত্যেকেই যেন এখন এক একটি ভূতের মতো দেখিতে। এমন সময় আবার মৌলবির ডাক আসিল। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া জানাইয়া গেল যে তাহাদের এখন ঢুকিতে হইবে। আর দেরি করিলে চলিবে না, অনেক সময় পার হইয়া গিয়াছে।

সকলে দৌড়াইয়া আর একটা গেটের কাছে গিয়া জড়ো হইল। গোলমাল আরও বাড়িয়া গেল। আকাশ বিদীর্ণ করিয়া নানারকম ধ্বনি উঠিল। কান ফাটাইয়া ফেলিবে আর কী। রহমান সকলের পিছনে ছিল, একেবারে সামনের দৃশ্য দেখিতে পায় নাই। পরে টের পাইল। তাহার সামনের লোকগুলি অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সে এখন একা পাশে চাহিয়া দেখিল, আরে সেই ছেলেটি, কী একটা উত্তেজনায় লাল তাহার মুখ, চুলগুলি এলোমেলো, প্রাণপণে সে চিৎকার করিতেছে। রহমান বুঝিতে পারিল না সেই ভাষার অর্থ। সামনের দিকে চাহিয়া দেখিল, আশ্চর্য, এবার গেট জুড়িয়া শুইয়া কয়েকটি লোক। আর তাহাদের পা দিয়া মাড়াইয়া ভিতরে চলিয়া গেল মৌলবি, আর তাহার পেছনে আরও কয়েকজন। রহমান নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিল না, লোকগুলির দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল সে।

এমন হল্লা সে জীবনেও শোনে নাই। কান ফাটিয়া গেলেও কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। দেখিল, এখান হইতে সেখানে লোক ছুটাছুটি করিতেছে, কেহ ঘুষি দেখাইতেছে, কেহ দৌড়াইতেছে, হঠাৎ একটা লোক উঁচু ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে শুরু করিল। রহমান আশ্চর্য হইয়া দেখিল, সে লোকটি আর কেহ নয়, তাহাদের লঞ্চ পারে ভিড়িবার সময় যে লোকটি প্রথম জলের কাছে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিয়াছিল সে-ই। তাহার তখনকার কথাগুলি রহমান এখনও ভুলে নাই তাড়াতাড়ি সে

আরও কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার সঙ্গে বিক্ষিপ্ত জনতা আরও ঘন হইয়া আসিল। লোকটি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে লাগিল ঃ

'বন্ধুগণ, আমার চাষি-ভাইরা...।'

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। এখন প্রায় সারাটা আকাশ লাল। নীচে ধ্বংসের উৎসব দেখিয়া রক্তবর্ণ আকাশ যেন রক্তনেত্রে তাহার প্রদীপ্ত চাহিয়া বিত্তর অশুভ কামনা করিতেছে। মানুষের পায়ের চাপে মাটির পৃথিবী বিদীর্ণ হইতে আর বাকি নাই। এখানকার এই কলরবের আগুনের মতো যদি কোনো শিখা থাকিত তবে সারাটা পৃথিবী নিশ্চয় পুড়াইয়া ফেলিত। বক্তা মাটিতে লাথি মারিয়া, বলিষ্ঠ ডানহাতে শূন্যে ঘুষি দেখাইয়া দৃপ্ত-স্বরে বলিল, 'বন্ধুগণ, আমার চাষি ভাইরা...।'

কিন্তু এমন সময় হঠাৎ গুলির ভীষণ আওয়াজ, আশেপাশের সব লোক পাগলের মতো ছুটাছুটি করিতেছে, কারুর কোনো দিকে কোনো খেয়াল নাই, কে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল, কে পায়ের তলায় পিষিয়া গেল, কারুর কোনো দিকে লক্ষ নাই, সকলেই যার যার প্রাণ হাতের মুঠায় লইয়া দৌড়াইতেছে। এক মুহূর্তে সারাটি মাঠ সশস্ত্র সৈন্যে ভরিয়া গেল।

রহমান প্রথমে লক্ষ করে নাই, যখন খেয়াল হইল তখন তাহার মাথা ঘুরিতেছে, হাত-পা কাঁপিতেছে, কানের ভিতর ভীষণ ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল। সে কোনো রকমে দৌড় দিল, দৌড়াইতে দৌড়াইতে শুনিতে পাইল— পেছনে কত লোকের তীব্র আর্তনাদ, কত লোকের কাতর গোঙানি। মুখ ফিরাইলে দেখিতে পাইত, কেহ রক্তাক্ত দেহে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে, কেহ পড়িতে পড়িতে হাঁটিতেছে; আবার হঠাৎ বসিয়া পড়িল। শীতের দিনের গৈরিক ধূলি রক্তবর্ণ হইয়া গেল।

অনেকদূর গিয়া আর দৌড়াইতে না পারিয়া রহমান তবে থামিল, একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে সে বসিয়া পড়িল। হাত-পা তাহার এখনও ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে, বুকের ভিতর কালবৈশাখির ঝড়। পেছনে যাহা ফেলিয়া আসিয়াছে, রহমান সেদিকে আবার চাহিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না, চক্ষু তাহার বুজিয়া আসিল। সেখানকার কথা স্মরণ করিয়া চোখে তাহার জল ভরিয়া আসিল। রহমান নির্জীবের মতো পড়িয়া রহিল।

যখন উঠিল তখন অনেক রাত। কোথাও টুঁ শব্দটি নাই। রহমান ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, শরীরের সবগুলি গ্রন্থি তাহার বেদনায় টনটন করিতেছে। তবু কোনো রকমে সে হাঁটিতে হাঁটিতে অনেক পরে নদীর পারে আসিয়া দাঁড়াইল, চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে এখানে, নদীতে নৌকা আর জাহাজের শব্দও শোনা যায়। রহমানের মনে পড়িল সেই লোকটির কথা ঃ বন্ধুগণ, একথা আপনারা মনে রাখবেন, আজ আমাদের যারা শুধু লাথি মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কাল তারাই আপনাকেও লাথি থেকে রেহাই দেবে না।

নদীর জলের দিকে চাহিয়া রহমানের চোখ আবার ছলছল করিয়া উঠিল।

১৬.২ সোমেন চন্দ : জীবন ও সাহিত্য এবং 'সংকেত' গল্পটি

সোমেন চন্দের জীবন ও সাহিত্যের পরিক্রমা দুই মহা-বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিস্টশক্তিতাড়িত পটভূমিতে ১৯২০ সালের ২৪মে প্রতিভাবান কথাশিল্পী সোমেন চন্দ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা শহরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নরেন্দ্রকুমার চন্দের প্রথম সন্তান তিনি। মাতা হিরণবালা দেবী। শৈশবে অর্থাৎ মাত্র চার বছর বয়সে সোমেন মাকে হারান। পরবর্তী সময়ে তাঁর বাবা নরেন্দ্রকুমার টঙ্গির নিকটবর্তী ধউর গ্রামের ডাক্তার শরৎচন্দ্র বিশ্বাসের কন্যা সরযূ বিশ্বাসকে বিবাহ করেন। সোমেন সৎমাকে প্রকৃত মা বলে জানতেন। তাঁকে খুব বেশিদিন বাঁচতে দেওয়া হয়নি। ২১ বছর ন মাস ১৫ দিন বয়সে, ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ফ্যাসিস্ট দানবদের হিংস্র আক্রমণে চলন্ত প্রগতি মিছিলেই তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। সংক্ষিপ্ত এই জীবন-পরিধির

মধ্যেও তিনি একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রগতি আন্দোলনের সক্রিয় ও উদ্দীপক কর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনই চৈতন্য-জাগরণী সাহিত্য স্রষ্টা রূপেও নিজের শক্তি ও মেধাকে ক্ষুরধার করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাঁর জীবনবোধের সময়-পরিক্রমাকে মোটামুটিভাবে তিনটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৮-এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রথম পর্ব, ১৯৩৮ সালের শেষের দিক থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব এবং ১৯৪১-এর মধ্যভাগ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৪২), তৃতীয় পর্ব। সময় বিভাজনের মধ্য দিয়ে সোমেন চন্দকে বোঝা ও ধরা সহজ হবে। ডাক্তারি পড়া শুরুর অব্যবহিত পর থেকে সোমেন গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রুশ শ্রমিকদের সংগঠিত সংগ্রামের তেজস্বী রূপ। এবং তিনি উজ্জীবিত হয়ে উঠেন বিপ্লবীয় মানসিকতায়। তাঁর এই সক্রিয় মানসিকতা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। তিনি ১৭ বছর বয়সে সাহিত্য সৃষ্টির মননশীল চর্চায় রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাম্যবাদের অনুভূতি অনুশীলনে প্রতিক্রিয়াশীল ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত বিদ্রোহের প্রয়োজনীয়তা তিনি গভীর ভাবে অনুভব করেছিলেন। সোমেন চন্দের আন্দোলনের সার্থকতা ছিল শ্রমিক স্বার্থে সর্বহারার স্বার্থে। তাঁর সাহিত্যে গভীর ভাবে সমাজবোধ ও সাহিত্যবোধের অনুশীলন ধরা পড়েছে। ১৯৩৭ সালে তাঁর প্রথম গল্প 'শিশু তপন' *দেশ* (১৫ মে, ৪র্থ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি বাংলা ছোটগল্প সাহিত্য ইতিহাসে স্বমহিমায় নিজস্ব শিল্প চৈতন্যের স্বর্ণ প্রাঙ্গণ সম্পূর্ণই বিকশিত করেছেন। এক একটা গল্প যেন জীবনের মধ্যে প্রবেশ করবার এবং জীবনকে দেখবার সুগভীর দৃষ্টি। তাই লেখক হিসেবে বস্তুবাদী সোমেন চন্দেরও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সর্বাঙ্গসুন্দর শ্রেণিহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু লক্ষণীয় সোমেন চন্দের কোনো রচনাতেই লেখকের উদ্দেশ্য বা বক্তব্য শিল্প ও কলারীতির সুষম বিন্যাসকে ছাপিয়ে যায়নি। বরং শিল্প ও বাস্তবের আশ্চর্য ঘণীভূত রসায়নে তিনি যেন বাস্তবরূপকারী এক বিবেকী শিল্পস্রষ্টা।

তাঁর 'সংকেত' গল্পটি 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের অন্তর্গত। সোমেন চন্দ্রের হত্যার (৮ মার্চ, ১৯৪২) অব্যবহিত পরেই তাঁর বন্ধু অমৃতকুমার দত্ত বন্ধুকৃত্যে সোমেনের প্রথম 'গল্পগ্রন্থ'টি প্রকাশ করেন। প্রথম প্রকাশ কাল ডিসেম্বর ১৯৪২ সাল। গ্রন্থে অন্যান্য গল্প 'রাত্রিশেষ', 'স্বপ্ন', 'একটিরাত', 'দাঙ্গা', 'ইঁদুর'। মোট ছয়টি গল্প ছিল এই গ্রন্থে। তাঁর গল্পের আলোচনায় নানা সময়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ধরার চেষ্টা হয়েছে, কখনো সমাজনীতি কখনো রাজনীতিতে। সাহিত্যে শ্রেণি সংগ্রামের কথা থাকবে না, বা বলবে না, একথা মানা যায় না। এবং যে সব কথা বললে সাহিত্য মূলত গল্প, উপন্যাস রাজনীতির দোষে দুষ্ট হয়ে যাবে, তা স্বীকার করা যায় না। সাহিত্য প্রত্যেক দেশের ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সমাজ, সভ্যতার নানা দিক আংশিক অথবা বিস্তৃত ছবি পাঠকের স্মরণে তুলে ধরেছে। সে জন্য চিরায়ত সাহিত্য পাঠকদের নিজেদের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করে বটে; এমনকি তাদের চোখের আড়ালে রয়ে গেছে এমন অনেক অ-জানা বিষয় চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে যা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তা হলে বলা যায় সাহিত্যে ইতিহাস, দর্শন, অর্থশাস্ত্র, বিজ্ঞান, তথা সমাজবিদ্যার সবদিক নিহিত থাকে। যখন সমাজবিদ্যা সমাজের দর্পণ হয়ে উঠছে সাহিত্যে, তখন সাহিত্য রাজনীতির বাইরে 'অ-সাহিত্য' বলে আলাদা করা ঠিক হবে না। প্রচলিত ধ্যান-ধারণা অনুসারে এ পর্যন্ত আমাদের অভিজ্ঞতা যে, রাজনীতির সামান্যতম ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতিকে খাটো করে তুলে ধরা হয়। রাজনীতির স্পর্শ আছে বলে সমাজের জাত-পাত অচ্যুত ভাবনার মতো শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে একপাশে ঠেলে রাখা হয়।

(২)

আমদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের গল্পে উপন্যাসে যে মানুষগুলো ওঠে আসে তাদের নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অভিজাত শ্রেণি এবং তাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষজন প্রাধান্য পেয়েছে। তবে ব্যতিক্রম যেমন, 'শাস্তি', 'মহেশ' ইত্যাদিতে সাধারণেরা প্রধান ভূমিকায় এসেছে। এর বাইরে 'গোরা' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গোরাকে একবার কৃষকদের মধ্যে পাঠিয়ে কৃষকদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, কিন্তু তা খুব বিস্তারিত ভাবে নয়।

বড় কথা হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব মুক্ত হওয়ার জন্য নয়, সচেতন ভাবে এবং তাঁর সৃষ্টির গুণগুলোকে স্বীকার করে নির্দিষ্ট হওয়ার ছক ভাঙতে হয়তো প্রথমত 'কল্লোল' পত্রিকাকে অবলম্বন করে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—কবিদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, নজরুল ইসলাম, দীনেশ দাস সর্ব-পরি নজরুল ইসলাম বঞ্চিত লাঞ্ছিতদের নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টিতে ঝড় তুলেছিলেন। এ সময়ে শৈলজানন্দের 'কয়লা কুটির দেশ', অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'বেদে', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' বহু আলোচিত হয়েছিল। মনে হয় নির্দিষ্ট ছকের বাইরে যাওয়ার ফলে আজও উপেক্ষিত অর্থাৎ বাঙালি পাঠক এখনো সামন্তসুলভ ভাবনার গন্ডী অতিক্রম করতে পারেনি। এই জন্যেই বাঙালি সমালোচকেরা বঞ্চিত লাঞ্ছিত কিংবা শ্রেণি সংগ্রামের আঁচ সামান্যতম উপলব্ধি করলেই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিও উদাসীনতায় ঢেকে রাখেন।

তবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারিণি মাঝি', 'ডাইনি', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই', 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী', সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক', 'পরশুরামের কুঠার', 'ফসিল', নরেন্দ্র মিত্রের 'চোর', 'রস', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাঁওতাল পরগণা', 'টোপ', সমরেশ বসুর 'শহীদের মা', প্রভৃতি গল্পগুলো দিব্যি পাঠকদের মন জয় করে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে গল্প বলার ধরণ ও প্রসাদগুণ তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত নয় বলে রাজনীতি ব্যাপারটা চোখের বালির মতো চোখে পীড়া দেয় না। আরো একটু বলতে পারি মহাশ্বেতা দেবী'র 'হাজার চুরাশির মা', স্তন্যদায়িনী, 'দ্রোপদী', 'শোকমিছিল', অসীম রায়ের 'শ্রেণীশত্রু', 'পদযাত্রা', মিহির আচার্যের 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ', 'কালের জল্লাদ', কার্তিক লাহিড়ীর 'শোধ', 'আক্রান্ত', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা', 'উৎসর্গ', 'হাওয়া না হাওয়া' প্রভৃতি গল্পে রাজনীতি ঘুরে ফিরে মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যবিত্তীয় মানসিকতা তুলে ধরেছে। দেবেশ রায়ের 'নিরস্ত্রীকরণ কেন' গল্পটি এই গোত্রের কিন্তু গল্প বলার ধরণ, গদ্যের শৈলী, সাহিত্যের গুণরক্ষা করে শ্রেণি-ভিত্তিতে চরিত্র বিন্যাস চোখে পড়ার মতো, তা সত্বেও এ গল্পগুলো কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন পাঠক ছাড়া অন্য পাঠকদের মধ্যে সেইভাবে প্রভাবিত করেছে কিনা তা বলা। তা হলে জাতপাতের মতো পাঠকদের মধ্যে কমিউনিস্ট, অ-কমিউনিস্ট ভাগাভাগি অর্থাৎ উপরোক্ত গল্পগুলোতে শ্রেণি রাজনীতি সাহিত্যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত করে লেখা হয়েছে।

এখানে বলা যায় আজকের - গল্প, উপন্যাস কাদের নিয়ে লেখা হবে এবং পাঠককুলকে আকৃষ্ট করতে নতুন নতুন ভৌগোলিক পরিবেশে নতুন নতুন ভূ-খণ্ড ও মানুষ খোঁজা এ সময়ের লেখকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ খোঁজার চেষ্টা। যেন তারা পাঠকদের নতুন কিছু সৃষ্টির উপহার দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত।

(৩)

আমরা এই প্রসঙ্গ থেকে সোমেন চন্দে যাব। আমাদের আলোচ্য গল্পকার সোমেন চন্দ ও তাঁর 'সংকেত' গল্প। এই গল্পের উপরিতলে রয়েছে দরিদ্র শ্রমজীবনের সংকট, আর তলদেশের সর্বত্র রয়েছে রূপক-সংকেতের চমকপ্রদ

ব্যবহার। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রহমান বনগাঁর সদ্য বিবাহিত এক যুবক। বৃদ্ধ বাবা এবং বউকে নিয়েই তার জীবন এবং সংসার। সে গ্রামে কখনো কৃষিকর্ম করে এবং কখনো সাধারণ দিনমজুরের কাজ করে যৎসামান্য যে আয় হয়, তাতে সাংসারিক অভাব ঘোচে না। সদ্য বিবাহিত যুবকের আনন্দ দারিদ্র্যের স্রোতে ভেসে যায়। রহমান এবং গ্রামের সকলে চায় তাদের অভাব কিছুটা লাঘব করে পারিবারিক অবস্থা একটু ভালো করতে। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব তা তাদের জানা নেই। ঠিক এ-রকম এক টালমাটাল সময়ে লঞ্চে করে বনগাঁয়ে এসে উপস্থিত হয় সুযোগ সন্ধানী শহরের এক বাবু। লোকটির গায়ে চমৎকার পাঞ্জাবি আর সিল্কের চাদর, পায়ে পাম্প-সু। তার মুখে সিগারেট আর মৃদু হাসি। লোকটি কোনো এক কাপড়ের মিলের ম্যানেজার। তিনি বড়ো-কর্তা এবং মিলের জন্য লোক সংগ্রহ করতে এসেছেন গ্রামে। সঙ্গে বাচ্চা মৌলবি, সে ফোড়ে। এ সংবাদ গ্রামে দ্রুত রটে গেল। গ্রামের দরিদ্র অভাবগ্রস্ত ইয়াসিন, আকবর আলি, বলরাম, আবালবৃদ্ধবর্ণিতা সকলেই এসে ভিড় জমাল সদ্য আগত মিল-ম্যানেজারের পাশে। গ্রামের মাটি কামড়ে পড়ে থাকা অসহায় মানুষগুলো শহরের কাপড়কলের শ্রমিক হয়ে বাঁচার কথা ভাবল। গ্রামের এক দঙ্গল মানুষ এই সামান্য প্রত্যাশা নিয়ে দালাল মৌলবির তত্ত্বাবধানে শেষ পর্যন্ত লঞ্চে করে অজানা শহরের অচেনা ভবিষ্যতের দিকে একসঙ্গে পাড়ি দেয়। এই দলের মধ্যে রহমানও ছিল। অন্যদের মতো তারও দুচোখ ভরা স্বপ্ন, আর বুকভর্তি আশা নিয়ে পাড়ি দিল। কিন্তু শহরে পৌঁছিয়ে কারখানার গেটে তারা ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের আসল স্বরূপটা দেখতে পেল। মালিকপক্ষ আসলে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের প্রাপ্য দাবিগুলো নস্যাৎ করে দিয়ে এবং কারখানা থেকে তাদের ছাটাই করে দিয়ে নতুন করে শোষণ করবার জন্যই গ্রাম থেকে রহমানদের নিয়ে এসেছে। এক শ্রেণির বঞ্চিত লাঞ্ছিত অভুক্ত শ্রমিকদেরই বিকল্প শ্রমশক্তিরূপেই মালিকপক্ষ মুখ্যত রহমানদের ব্যবহার করতে চায়। সোমেন চন্দ সমগ্র গল্পে এভাবেই কারখানার গেটে যুযুধান দুই শ্রমিক শ্রেণিকে মুখোমুখি দাঁড় করে দিয়ে শোষণকারী মালিকপক্ষের অর্থনৈতিক শোষণের ভয়াবহ শয়তানিকে তুলে ধরেছেন। কৃষক শ্রমিকে রূপান্তর এবং চাষি ও শ্রমিকের ঐক্য নিয়ে মতাদর্শের দিক নির্দেশ এবং শ্রমশক্তির জয়, সংগঠিত সংগ্রামকে সংঘবদ্ধ রূপ দেওয়ার চেষ্টা লক্ষণীয়।

(৪)

সোমেন চন্দ ছিলেন একজন কমিউনিস্ট কর্মী এবং তিনি শ্রমিক শ্রেণিকে সংগঠিত করার জন্য চটকল, কাপড়ের মিল, এবং রেল শ্রমিকদের মধ্যে দিন রাত কাজ করেছেন একনিষ্ঠ মার্কসবাদী কর্মী হিসাবে। এবং তিনি ১৯৪১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। একই বছরে অর্থাৎ ১৯৪১-এর মাঝামাঝি সময়ে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন পরিচালনা, বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, গোপন সভা-সমিতি, শ্রমিকদের রাজনৈতিক পাঠ দেওয়া ইত্যাদি গঠনমূলক কাজের সুবাদে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা ও সাফল্য অর্জন করেন। তিনি গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সাধারণ মানুষের, শ্রমিকদের দারিদ্র্য পীড়িত দৈনন্দিন অসহায় জীবনযাত্রা। তাঁর জীবনবোধে ধরা পড়েছিল শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা নিপীড়িত বিভিন্ন বর্গের অসহায় মানুষের প্রস্তরীভূত বেদনা। ফলে তিনি অল্প বয়সে প্রাতষ্ঠানিক শিক্ষাছাড়া প্রতিষ্ঠানের বাইরের বিপুল সৃষ্টি সাহিত্য তিনি গভীর ভাবে পড়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে প্রচুর মার্কসবাদী সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর এত অল্প বয়সে জীবনবোধ, জীবন-শিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষার গভীরতা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। তাঁর সাহিত্যিক জীবনে এ পর্যন্ত তাঁর ২৮টি গল্প পাওয়া গেছে।

এবং অন্যান্য রচনার মধ্যে একটি উপন্যাস, দুটি নাটক ও তিনটি কবিতা পাওয়া গেছে। তাঁর গল্প নিয়ে পবিত্র সরকার ভাগাভাগি করার পথে হেঁটেছেন। যেমন তিনি গল্পগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। "প্রতিবেশ কেন্দ্রিক গল্পেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল তথাকথিত 'রাজনৈতিক' গল্প। গল্পকে এভাবে 'রাজনৈতিক অরাজনৈতিক-এ স্পষ্টভাবে ভাগ করা সম্ভব নয়, কিন্তু যদি গল্পের রচনা ও উপসংহারের নির্মাণে লেখকের কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য ফুটে ওঠে, তাহলে তাকে রাজনৈতিক' গল্পের সহজ অভিধা দেওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। 'সংকেত' গল্পটি একটি কাপড় মিলের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে শ্রেণি সংগ্রামের স্পষ্ট ছবি তোলা হয়েছে। এই ছবি আঁকতে গিয়ে লেখক স্পষ্টতই সাহিত্য ও অ-সাহিত্যের দোলাচলে পড়ে গিয়েছিলেন। কেবলমাত্র ধর্মঘট বা ধর্মঘটকালীন সংগ্রামকে মুখ্য বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে তাঁকে সাহিত্যের রূপটিতে তুলে ধরার চেষ্টা করতে হয়েছে। তবে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গুণ ক্ষুণ্ণ হয়নি। যেমন তিনি এক একটি সংকেত দিয়ে গল্পের এক একটি পর্বে ঢুকেছেন। তাঁর প্রথম ইঙ্গিত 'বনগ্রামের মরা নদীর কঠিন বুকেও ভয়ানক ঝড় তুলিয়া কাহাদের এক লঞ্চ তীরে আসিয়া ভিড়িল।' এবং মজার ব্যাপার হল 'প্রথমে দেখিয়াছিল অন্ধ দশরথ।' এই দশরথের পরিচয় হল সে একজন জেলে। এ দশরথের মাধ্যমে সংকেত দিচ্ছেন যে বেলতলির জমিদার বাড়িতে প্রথম একজন বিলাত ফেরত ছেলে। এ ছেলেটি গ্রাম্য পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্যে স্টিমার কোম্পানির নতুন লাইন খুলেছিলেন। এ হল তাঁর দ্বিতীয় প্রবেশ।

তৃতীয় বারে তিনি প্রবেশ করছেন এখন যে স্টিমার বনগ্রামের মরা নদীতে ভিড়েছে এবং সেই লঞ্চের সিঁড়ি বাহিয়া যে লোকটি সদলবলে নামিয়া আসিল, তাহার গায়ে চমৎকার পাঞ্জাবি আর সিল্কের চাদর, পায়ে চকচকে পাম্প-শু, মুখে একটি সিগারেট আর মৃদু হাসি।' ইনি হলেন বন্ধ কাপড় কলের ম্যানেজার। ফুটে ওঠে শরৎচন্দ্রের 'নতুনদা'র ছবি। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে দুজন লেখকের চরিত্র বিষয় আবর্তিত হয়েছে। শহরের বাবু অর্থাৎ ম্যানেজারকে ঘিরে গ্রামের মানুষের ভিড়, সেই ভিড়ে ইয়াসিন, রামচন্দ্র, আকবর আলি বাচ্চা মৌলবি এবং প্রধান চরিত্র রহমান আছে।

(৫)

সোমেন চন্দ অল্প বয়সে সাহিত্য সৃষ্টির ভাষা শৈলী সম্বন্ধে এবং গল্পে আনা মানুষগুলিকে সঠিক পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করে প্রত্যেক মুহূর্তের খুঁটিনাটির বর্ণনা দিয়েছেন নিখুঁত ভাবে। যেমন দশরথের এক ছেলে ". . . হাতের বৈঠাটি একপাশে রাখিয়া সে তখন অন্ধ পিতার জন্য এক ছিলিম তামাক ভরিতেছিল, আর দশরথও তখন তাহার হাতের জালটি গুটাইয়া গলাটি একটু ভিজাইবার আশায় পশ্চিমের প্রায়ান্ধকার আকাশের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া ছেলের তামাকের প্রতীক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ কেমন একটা গুম্ গুম্ আওয়াজ তাহার কানে বাজিতে লাগিল, কিছুক্ষণ গভীর মনোযোগে কান পাতিয়া শুনিয়া সে ডাকিল, 'রাম?' " এরূপ বর্ণনার মধ্যে সাহিত্যগুণের ঝলক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে সময় বাষ্পচালিত যন্ত্র সারা পৃথিবীময় উপনিবেশ বিস্তারে ইউরোপীয়দের সাহায্য করেছিল। যন্ত্র যুগ তথা পরাধীনতার যুগের সূচনার দিকে লেখক এ ভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন। "সে অনেকদিন আগেকার কথা, বেলতলীর জমিদার বাড়ির বড়ো ছেলে সদ্য বিলাত হইতে ফিরিয়া সেই প্রথম যখন নিজ গ্রামে প্রবেশ করলেন, তখন আসিবার পথে বিস্তর দুর্ভোগ ভুগিয়া এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে তার কিছুদিন পরেই দেখা গেল, মস্ত এক স্টীমার ভীষণ হাঁকডাকের সঙ্গে আশপাশের গ্রামের সমস্ত লোককে আনিয়া হাজির করিয়াছে নদীর পারে। স্টীমার কোম্পানির নূতন লাইন খুলিয়াছে, তখনকার নদী কী আর এখন আছে।"

অবশ্যই যে সময় সোমেন চন্দ এ গল্প লিখছেন, আমাদের ভারতবর্ষও ব্রিটিশদের চাবুক খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। দশরথ সে দৃশ্য দেখেছে তার জীবনে। এ সময় ভারতের তুলো ব্রিটেনে নিয়ে গিয়ে যন্ত্রচালিত তাঁতে উৎপন্ন বস্ত্র ব্রিটিশ কোম্পানি ভারতে ব্যবসা, আর ভারতের তাঁতিরা তাদের নিজস্ব তাঁত থেকে উচ্ছেদ হয়, পথের ভিখারি হয়, সারা ভারতের তাঁতিরা বেকার হয়ে যায়। স্বদেশি জাগরণের উন্মেষ ঘটার পর ভারতীয়দের উদ্দীপনায় কিছু কিছু সুতাকল যেমন বঙ্গলক্ষী কটন মিল, অন্নপূর্ণা কটন মিল, আর এ গল্পে উল্লেখিত ঢাকেশ্বরী কটন মিল দেশীয় তাঁতিদের দূরদর্শার কথা মাথায় রেখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য হল ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ম্যানেজারবাবু বনগ্রামের মরা নদীর কঠিন বুকে এক লঞ্চে চড়ে নতুন শোষক রূপে হাজির হলেন, আর সঙ্গে গ্রামীন বেকারদের একটি ভীড় জমে গেল। 'যাহারা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের কেহ দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, কেহ সেখানে থাকিয়াই বুকের ওপর দুই হাত রাখিয়া এমনভাবে চাহিল, তাহাদের মতো তাহারা চলিয়া যাইবে না, মারিবে ফেলিবে না তো আর। ইহারা নবীন। যাহারা প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধ তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া হাসিল। ইহাদের স্পর্ধা তো কম নয়। ব্যাপার যাই হোক না কেন সবটাতেই একটা বাহাদুরি দেখানো চাই। বাবু, সেলাম। ইয়াসিন একটা সেলাম দিয়া বলিল, আজ জীবনের শেষ ঘন্টাগুলি ঢং ঢং করিয়া বাজিতেছে, এতকাল যে সেলামের জোরেই সে সকলের প্রিয় হইয়া আসিয়াছে, আজ তাহার অন্যথা হইবে না।' এই বর্ণনায় সর্বহারার বিনীত চেহারা এমন নিবিড় এবং নিখুঁত বর্ণনায় সর্বহারা মানুষগুলিকে সোমেন স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন। আর এখানে বেন্থাসের হাটের কথা লেখকের মনে আসতেই পারে, যে হেতু তিনি মার্কসবাদে দীক্ষিত। এই হাটে সবাই স্বাধীন - যে শ্রম বিক্রয় করে, যে শ্রম কেনে সকলে স্বাধীন - উভয়ই দরাদরি করার পর চুক্তিবদ্ধ হয় এবং কারখানায় শ্রমিক কাজে যোগ দেয়। আর মালিক লাভ ওঠায়। অবশেষে শ্রমিক বুঝতে পারে তার পিঠের চামড়া ছাড়া বিক্রি করার কিছু নাই, আর মালিক দিনের পর দিন তার পুঁজি বাড়িয়ে চলেছে। এ ক্ষেত্রে বনগ্রামের মরা নদীর পাড়ে বেন্থাসের হাট বসে গেল 'অর্থাৎ একেবারে হড়োকর্তা মিলের জন্য এখানে লোক সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে।' অতীতে আফ্রিকা থেকে ফড়ে লাগিয়ে এভাবে দাস সংগ্রহ করা হত। আর আজ মজুরি দাস সংগ্রহ হচ্ছে অতি আধুনিক যুগে। এবং এই গল্পে ফড়ের কাজটি বাচ্চা মৌলবী যথাযথ পালন করেছে। এবং তাকে মুরব্বি মেনে আকবর আলি প্রস্তাবটায় রেখে দিল - 'আমার ভাই-এর লেইগা একটু কইয়া দিবা তুমি -'

বেন্থাসের হাটে মজুর মালিকের চুক্তি সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই মানুষে মানুষে নিবিড় সম্পর্কের এমন বিন্যাসগুলি উজ্জ্বল করে তুলেছেন লেখক। লঞ্চ ছেড়ে চলে যাবে বলে মজুরেরা ভীড় করেছে নদীর পাড়ে। রহমানের বুড়ো বাবা একটু আড়ালে ডেকে ছেলেকে বলল - " 'একটা কথা কমু। এত বুড়া হইয়া গেলাম, তুমি আমারে ছাইড়া কোনো কালে কোনো খানে যাও নাই, কিন্তু আইজ ছাইড়া গেলা, আমার মনডারে কী দিয়া বান্ধুম, তুমিই কও?' বুড়া অনেক কষ্টে তাহার সবগুলি কথা এতক্ষণে বলিয়া ফেলিল এবং ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। এমন দৃশ্যের সঙ্গে রহমানের এই প্রথম পরিচয় সে কী যে করিবে ভাবিয়া পাইল না।" এছাড়াও 'রহমানের চোখের পাতা বুজিয়া আসিল। সে দেখিল, নদীর জলে কে এক নারীমূর্তি, নাকের-চোখের জলে এক হইয়া তাহাকে ডাকিতেছে। তাহার নাকের ডগায় ঘাম, ঘর্মাক্ত সমস্ত শরীরটিকে রহমান ঝুঁকিয়া দেখিল। তাহার গায়ে এখনও সেই মেয়েটির ঘামের গন্ধ। আরও নিবিড় হইয়া সে সেই গন্ধ শুঁকিতে লাগিল।' মজুর হলেও মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতি মালা শুকিয়ে যায় না গল্পে তারি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ক্রমে ক্রমে "দূরে মিলের চিমনি দেখা গেল। কিন্তু ধোঁয়ার চিহ্ন নাই। কোথা হইতে আসিয়া আবার মৌলবী দেখা দিল। কোনো নূতন খবর সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে নিশ্চয়। বলিল, 'আমরা আইসা পড়ছি।' " গল্পকারের লিখন শৈলীর খামতি নেই, যেটা পরের চতুর্থ অনুচ্ছেদটিতে চোখে না

পড়ে যায় না, তার কারণ অবশ্যই শ্রেণি-সংগ্রামকে নগ্ন রূপে তুলে ধরতে এছাড়া লেখকের অন্য কোনো উপায় ছিল না।

(৪)

'রোজ রোজই সেই এক - সেই ভোর না হতেই কারখানার বাঁশীটার কাঁপা কাঁপা বিশ্রী চিৎকার . . . কুলি-বস্তির ধোঁয়াটে তেল চিটে আকাশটা আঁতকে ওঠে। ও তো ডাক নয় যেন সমন। পেশীগুলো চাঙা হয়ে ওঠার আগেই গুমোট ঝাপসা অন্ধকারে ঘুম ভেঙে যায়। ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠে খুপরিগুলো থেকে অন্ধকার মুখে মানুষগুলো বেরিয়ে আসে ভয়-খাওয়া আরশোলার মতো। কন্‌কনে ঠান্ডা; শেষ রাতের আঁধার তখনও লেগে থাকে ভোরের গায়ে।' (মাক্সিম গোর্কি; *মা*, অনুবাদ : পুষ্পময়ী বসু, প্রগতি প্রকাশন মস্কো, তৃতীয় সংস্করণ।) কারখানা শ্রমিকদের জীবন বৈচিত্র্যের এই ছবি ঢাকেশ্বরী কটন মিলে ধর্মঘট চলাকালীন ছবির সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তবে উভয়ের ভৌগোলিক অবস্থান সময়ের অভিঘাতে আলাদা এবং রীতিশিল্প বৈচিত্র্যের পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। 'কিন্তু তখনও লঞ্চটা পারে একেবারে ভিড়ে নাই, ধীরে ধীরে যেন একটা ভীষণ কলরব, সহস্র কণ্ঠের মিলিত চিৎকার-ধ্বনি সকলের কানে আসিয়া বাজিল। সকলে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, মিল দেখার আনন্দে একেবারে ভাঙিয়া না পড়িয়া রহমান আগেই কিছুটা লক্ষ করিয়াছিল, এখন সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া শব্দটা আরও লক্ষ করিতে চেষ্টা করিল। . . . . নদীর পারেই প্রকাণ্ড চর, ধু-ধু করে বালু। তার পরে মিলের সীমানা। সেই ভীষণ গোলমাল আরও ভীষণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড চরটা মুহূর্তে হাজার হাজার লোকে ভরিয়া গেল; সেই লোকগুলি প্রাণপণে দৌড়িয়া আসিতেছে, প্রাণ যায় কী বাঁচে।' লেখক এই ভাবে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে ঢেকেছেন সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং চেষ্টা করেছেন সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ ভাষাশৈলী নির্মাণে নতুন শিল্পরূপ।

'সংকেত' গল্পের তৃতীয় অনুচ্ছেদ পর্যন্ত তরুণ পরিণত গল্পকার সোমেন চন্দ-এর কলম অনায়াস ছন্দে গ্রামীণ মানুষ ও প্রকৃতির সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেছে। এমনকি বেলতলীর জমিদার বাড়ির বড়ো ছেলে গ্রামে ফিরবার পথে নানা অসুবিধার মধ্যে পড়ে এবং বিরক্ত হয়। বিলাতের জীবন থেকে স্বভূমির কঠিন বাস্তবের মুখে পড়ে তার মধ্যে বিরক্তি জাগে, তবে সমস্যা সমাধানের পথ সন্ধান পাওয়া যায় না তার থেকে। তবে তিনি মস্ত এক স্টিমার নিয়ে আসেন। তাতে সাধারণ মানুষের কোনো উপকারে আসে না ঐ যন্ত্রযান। তাঁর সাদা মাঠা বক্তব্যের মধ্যে ইঙ্গিত হল ভারতের অজ গ্রামেও ঢুকে পড়েছে আধুনিক সভ্যতার প্রতীক স্টিমার। জমিদার বাড়ির বড়ো ছেলেও শিল্প বিপ্লবের পিঠস্থান ইংলন্ড ফেরৎ অর্থাৎ প্রকৃতির ঐশ্বর্যে গরবিণি গ্রামকে আধুনিক রূপেই সে চায়, সাহেবিয়ানায় গ্রাম্যতা সে অগ্রাহ্য করে বলেই বা তার গমনাগমনের পথটিও গ্রাম ও শহরের যোগসূত্র যন্ত্র যুগের অনিবার্য প্রসারই বটে। এ প্রসঙ্গে মনে আসে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারই ইউরোপীয়দের অভিযান গোটা পৃথিবীময়। কালক্রমে তা হয়ে উঠল উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধবিগ্রহ। একা গ্রেট বৃটেনের উপনিবেশে সূর্য অস্ত যেত না।

তাছাড়া পল্লি জীবনের খুঁটিনাটি চিত্ররূপের কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। অর্থনৈতিক সঙ্কটে দীর্ণ গ্রামের মানুষের ছবি ফুটে ওঠে এবং সহজে চেনা যায়, এরই মধ্যে প্রকৃতিলোভন জীবন শৈলী স্পষ্ট, সাহিত্য রসের তিল পরিমাণও খামতি নাই। গল্পের চতুর্থ অনুচ্ছেদে মজুর শ্রেণির প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করা ও সাহিত্যগুণে গুণান্বিত বর্ণনার মুখোমুখি এক সঙ্কট লেখকের ভাবনায় কাজ করেছে - তার সতর্ক বীক্ষণে তা ধরা পড়ে।

লেখকের মেধা জুড়ে সাহিত্যের নৈর্বক্তিক ছকটি স্বাভাবিক ঐতিহ্যের নিয়মে থাকে শ্রেণিদ্বন্দ্ব বা শ্রেণি

সমন্বয়ের কথাটি গল্প উপন্যাসে বলতে গেলেই তথাকথিত খটকা ঘুণপোকার মতো কুরকুর করে। এ ক্ষেত্রে সাহিত্যের পরিচিত রূপটি নিপুণ তুলির টানেই মজুর মালিক বা শোষিত শোষকের দ্বন্দ্বে ও ঐক্যের জীবনযুদ্ধ ছবি হয়ে উঠতে বাধ্য ছিল। লেখকের অভিজ্ঞতার কোনো খামতি ছিল না বলেই চতুর্থ অনুচ্ছেদটি লেখকের বর্ণনায় এভাবেই ফোটে - 'নদীর পারেই প্রকান্ড চর, ধু-ধু করে বালু! তার পরে মিলের সীমানা। সেই ভীষণ গোলমাল আরও ভীষণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকান্ড চরটা মুহূর্তে হাজার হাজার লোকে ভরিয়া গেল; সেই লোকগুলি প্রাণপণে দৌড়িয়া আসিতেছে, প্রাণ যায় কি বাঁচে। ব্যাপার দেখিয়া রহমানের চোখে বিস্ময়ের অন্ত নাই - যেন একটা প্রকাণ্ড নদীর মুখ হঠাৎ খুলিয়া গিয়াছে, তাহার সমস্ত জল বিপুল বেগে সারাটা পৃথিবী ভাসাইয়া লইল। রহমানের বুক কাঁপিতে লাগিল . . . ।' যেন মনে হয় অন্ধকার গহ্বরের নানা মুখ থেকে পেশীশক্ত মানুষগুলো আরশোলার মতো ছুটে চলেছে শোষকের যন্ত্র-সভ্যতার আদিম প্রবৃত্তির অন্ধকারে।

(৫)

গল্পের চতুর্থ অনুচ্ছেদের ছয় নম্বর প্যারাটিতে গল্পের মূল বিষয়টি প্রতিষ্ঠার সময় দক্ষ শিল্পীর ভূমিকা পালনের মধ্যে দ্বিধা জড়িত ছিল হয়তো। অবশেষে একেবারে সামনে একটা লোকের মধ্যে পেছনের সকলের শক্তি যেন একত্রিত হইয়াছে। ধর্মঘটি মজুরদের নেতার ছবিটি এভাবে তুলে ধরেই লেখক তার দায়বদ্ধতা সংক্ষিপ্ত ভাষণের উল্লেখেই স্পষ্ট করেছেন, সাহিত্যের শ্রী কিছুটা হয়তো চাপা পড়েছে। দুনিয়ার মজুর এক হও, চাষি মজুরের ঐক্য সাধনের লক্ষে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বুঝিয়ে বলার ইচ্ছাটি প্রবল হলেও তিনি দেখিয়েছেন তা ধনবৈষম্যের চাপে কেবলমাত্র কলকারখানার বহার মজুরদেরই জীবন যন্ত্রণা ফিকে হয়। গ্রামগঞ্জেও তার প্রভাব অব্যাহত থাকে বলেই নিয়ত বুভুক্ষা তাড়িত মানুষ শুধুমাত্র তার গতরখানি নিয়ে অর্থাৎ কর্মক্ষম শরীরটির ক্রেতার খোঁজে ব্যস্ত রাখে। ফলে গ্রাম থেকে শহরে পাড়ি দেয় অনিশ্চিত বাঁচার তাগিদে। তবে সাধারণ এই সমস্যা খানিকটা মেটে কাজ করার সুযোগ পেলে। গল্পকার স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন এক সময় ধর্মঘটি মজুররা শ্রম বিক্রি করার চুক্তিতে মালিকের কারখানার গেটে হাজির হয়, যেন কোনো এক বিচক্ষণ ভাগ্যবিধাতার নির্দেশে সর্বসাধারণের মঙ্গল ও স্বার্থের জন্য প্রত্যেকের সুবিধা মালিক একত্র কাজ করে।' এখন ছিটেফোঁটা দাবি আদায় করবেই ধর্মঘট - আর এর ফলে মালিকের উপর চাপ তৈরি হয়; দাবিগুলির খানিকটা মানতে বাধ্য করা যায়। সোমেন চন্দ গল্পে বিশের সংকেত যে ব্যক্তি অর্থের মালিক সে এখন পুঁজিপতি হিসাবে সবার সামনে এসে পড়ে এবং শ্রমশক্তির মালিক তার মজুর হিসাবে তাকে প্রতি মুহূর্ত স্মরণ করছে। ফলে একজন বিলাস বহুল হাসি হাসছে এবং কারবার ফাঁদতে ব্যস্ত হয়ে উঠছে। আর অপরজন ভীত ও সংকুচিত, সে যেন বাজারে নিজের চামড়া বিক্রয় করছে এবং তাই ঐ চামড়ার উপর প্রহার ছাড়াই স্বাধীন ভবিষ্যৎ জীবনে আর কিছুই আশা করতে পারে না তারা। ফলে স্বাধীন অর্থনীতি ও শ্রমশক্তির মালিক যতই দরাদরি করে চুক্তিবদ্ধ হোক পুঁজির সাধারণ নিয়ম মতেই অর্থনৈতিক ভারসাম্যে আসতে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে টানাপোড়েন অনিবার্য। শ্রেণিগত ঐক্যের আহ্বানই শ্রমিকদের শক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উপায় না হলেও ঐক্যের মূল প্রোথিত আর্থিক পীড়নের তীব্রতা, শ্রমিকেরা কিভাবে করেছে ও সেই অনুভব ধর্মঘট বা অপর যে কোনো ধরনের সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু রচনা করে। ফলে ক্ষোভের কেন্দ্রটি উৎখাত করতে মালিক পক্ষের নির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়: 'আমরা এই মিলেরই শ্রমিক, আপনারা যেখানে কাজ করতে এসেছেন আমরা সেখানেই প্রথম কাজ করতে আসি। আমরা জানি আপনাদের শুধু চাকরির কথা বলেই আনা হয়েছে, আসল

কথা বলা হয়নি। এই চাকরির ভিতর কী রহস্য তা আপনাদের কাছে গোপন করা হয়েছে। বন্ধুগণ, আমাদের কথা আপনারা একটিবার শুনুন, আমাদের বিশ্বাস করুন। যারা আপনাদের চাকরি দেবে বলে নিয়ে এসেছে তাদের আপনারা চেনেন না, কিন্তু আমরা চিনি। . . . একথা মনে রাখবেন, আজ যারা আমাদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কাল তারা আপনাদেরও সেই লাথি থেকে রেহাই দেবে না।'

'সংকেত' গল্পে মালিক ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপেক্ষা করতে পারছে তার কারণ গ্রামগঞ্জে উদ্বৃত্ত কর্মক্ষম জনসমষ্টি। সেক্ষেত্র থেকেই কাজের প্রলোভন দেখিয়ে লঞ্চে চড়িয়ে মানুষ এনেছে, নতুন মজুর। রহমান মজুরদের প্রতীক হিসাবে নায়কের ভূমিকায় আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে মজুরদের প্রতীক মাত্র। রাজনীতির বক্তব্য লেখক বলেছেন, শিল্প সাহিত্যের রীতিকে লঙ্ঘন করে নয়, তবে স্পষ্টভাবেই। এখানে লেখকের পরিণত চিন্তের উন্মেষ ঘটেছে।

'সংকেত' গল্পে রাজনৈতিক পটভূমি কাপড়ের কল শ্রমিকদের ধর্মঘট ও বিপন্নতা। নেতার ভাষণে হাহাকার রটে যায়, দুর্বল চরিত্রে রহমান কেবল চোখের জল ফেলতে পারে, এবং এখানেই ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণির অতি দুর্বল দিক নগ্ন হয়ে পড়ে। '. . . আমাদের ঘর নেই, বাড়ি নেই, আজ এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে কাল কোথাও দাঁড়াবার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই - আমার চাষী ভাইরা, দোহাই আপনাদের, ভাই হয়ে ভাই-এর মুখের ভাত এমন করে কেড়ে নেবেন না। . . . ' এই দুর্বল মিনতি ভরা কণ্ঠে আপ্লুত অথচ গ্রাম থেকে মানুষগুলো কাজ পাওয়ার উচ্ছাস নিয়ে নদীতীরে কারখানার নিকটে উপস্থিত তাদের জীবনযন্ত্রণাও উপলব্ধি করতেই হয়। মালিকপক্ষ এই সূক্ষ্ম দুর্বল দিকটা সহজে বোঝে, তা হাজার আবেদন নিবেদনে উঠে যাবে না, রাষ্ট্রের সহযোগিতায় পুলিশের লাঠিগুলির ফাঁক গলে গ্রামের মানুষ এ-গেট ও-গেট করে অবশেষে কারখানায় ঢুকেই পড়ে। নিশ্চিত ভাবেই কারখানার ধর্মঘটকারী মজুরদের অবস্থা শোচনীয়, একটা অশান্ত প্রচলিত হৈ-হল্লার মধ্যে সব ভ্রান্তি মিশে যায়। . . . 'হঠাৎ গুলির ভীষণ আওয়াজ, আশেপাশের সব লোক পাগলের মতো ছুটাছুটি করিতেছে, কারুর কোন দিকে কোন খেয়াল নাই, কে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল, কে পায়ের তলায় পিষিয়া গেল, কারুর কোনো দিকে লক্ষ নাই, সকলেই যার যার প্রাণ হাতের মুঠায় লইয়া দৌড়াইতেছে। এক মুহূর্তে সারাটি মাঠ সশস্ত্র সৈন্যে ভরিয়া গেল।'

তবে, একটা ভিড়ের সামনে আবেদন নিবেদন যে শুধুমাত্র মর্মকথা, কোনো স্ফুলিঙ্গ বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে উড়ে না রহমান '. . . দৌড়াইতে দৌড়াইতে শুনিতে পাইল - পেছনে কত লোকের তীব্র আর্তনাদ, কত লোকের কাতর গোঙানি। মুখ ফিরাইলে দেখিতে পাইত, কেহ রক্তাক্ত দেহে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে, কেহ পড়িতে পড়িতে হাঁটিতেছে; আবার হঠাৎ বসিয়া পড়িল। শীতের দিনের গৈরিক ধূলি রক্তবর্ণ হইয়া গেল।'

অর্থনৈতিক সংগ্রাম রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিবর্তিত না হলে যুদ্ধে জয় সুনিশ্চিত কখনোই হয় না, অবশ্য অর্থনৈতিক লড়াইতে রাজনীতি ততটুকুই থাকে যেটুকু না হলে ন্যূনতম দাবি অর্জনের সক্ষমতা মালিকপক্ষ ধরে ফেলে। লেখকের সততা যে তিনি বুঝি নিতে পেরেছেন যে এযুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য। 'বন্ধুগণ, একথা আপনারা মনে রাখবেন, আজ আমাদের শুধু লাথি মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কাল তারা আপনাদেও লাথি থেকে রেহাই দেবে না।' 'সংকেত' গল্পটি লেখক সততার সঙ্গে এভাবে শেষ করলেও, একজন সতর্ক পাঠক নায়ক-নায়িকার বিরহ মিলনের রোমাঞ্চে মগ্ন হওয়ার সময় তো পাচ্ছে না। তার চোখের সামনে দুটো দল স্পষ্ট। প্রথম দল ধর্মঘটী মজুর, তারা জানে মালিকপক্ষ বাইরে থেকে নিয়ে নিয়োগ করবে, কারখানা পুনরায় সচল করবে। ধর্মঘটিরা জানে তাদের উচ্ছেদ অনিবার্য, তা সত্ত্বেও বাইরের মজুরদের প্রতিহত করার অহিংস আন্দোলনের পরিকল্পনায় ভ্রান্ত। বাইরের লোকেরা চূড়ান্তভাবেই অসংগঠিত। তাদের নেতা স্বয়ং মালিক ও একজন ফড়ে বাচ্চা মৌলবি। একটা

ভিড়, রোজগারের ভাবনায় তারা উজ্জীবিত। সামান্য বল প্রয়োগেই ভিড়টা ছত্রভঙ্গ হত। তা হল না, সে সময়ের চল বন্দুকের গুলির সামনে জামা খুলে ছাতি টানটান করে দাঁড়ানো, তাই হল এ-গল্পের ট্র্যাজেডি। অবশ্যই এক নতুন সমাজে-সম্ভব্য প্রতিটি পুরানো সমাজ-ধাত্রী হল বলপ্রয়োগ। এই বল হল নিজেই এক অর্থনৈতিক ক্ষমতা তার পরিণাম একদল মজুরের অন্ধকার - অন্য দলের অন্ধকার আসার অপেক্ষায়। অবশ্যই ভারতে তখন নতুন সমাজ-সম্ভব্য অর্থাৎ অভিজাত সামন্তেরা বুর্জোয়া হতে চাইছিল। আর সে জন্যে তাদের দরকার ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা। আজও এ ধারা বা জয়যাত্রা অপ্রতিহত। এবং বিশ্বপুঁজির উত্তাপও স্বমহিমায় চলছে।

সাহিত্যের শিল্পরূপটি 'হারানের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়), 'নিরস্ত্রিকরণ কেন' (দেবেশ রায়), 'উৎসর্গ', 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' (দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), 'হাজার চুরাশির মা', 'দ্রোপদী' (মহাশ্বেতা দেবী), লিখন শৈলীতে যেমন স্পষ্ট, সংকেত গল্পে তা হল না।' নদীর জলের দিকে চাহিয়া রহমানের চোখ আবার ছলছল্ করিয়া উঠিল।' লেখকের দ্বিধাই মূল কারণ, পরিণাম যেমনটি ঘটেছে সে ভাবেই গল্পটির বর্ণনা রীতি। সোমেন চন্দ আধুনিক ধনতন্ত্রের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা আসলে যে এক ভয়াবহ চোরাবালি এবং তার ওপর দাঁড়াবার ভূমিপ্রত্যাশী শ্রমিকশ্রেণি আসলে যে আমাদেরই ডুবন্ত জীবন - এই চরম সত্যটি সোমেন এই গল্পে অনবদ্যভাবেই প্রকাশ করেছেন।

১। 'সংকেত' গল্পটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিচার করা প্রয়োজন। 'সংকেত'-এ সোমেনের সাহিত্যিক শক্তির কতখানি প্রকাশ হইয়াছে তাহাই একমাত্র বিচার্য নহে। কিন্তু সেদিক দিয়া বলিতে গেলেবা গ্রামের অধিবাসী ও তাহাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের পরিচয় ও তাহার সাহিত্যিক প্রকাশ 'সংকেত'-এ আছে। কিন্তু সংকেতের অপর যে দিকটা যে আমাদের দেশের সর্বহারা মজুর ও কিষাণদের জাগরণের সংকেত-ধ্বনির প্রকাশ . . . কোন মিলের শ্রমিকেরা ধর্মঘট করিয়াছে। মিলের মালিক তাহাদের ধর্মঘট শক্তিহীন করিয়া দিবার জন্য দূর গ্রাম হইতে লেভি দেখাইয়া কৃষকদের লইয়া আসিয়াছে। নূতন সংগৃহীত শ্রমিকগণ মিলের মধ্যে ঢুকিতে যাইতে কলের ধর্মঘটি মজুরগণের নেতা তাহাদের বুঝাইয়া বলিতেছে যেন তাহারা মিলে না ঢোকে - যেন তাহারা তাহাদেরই ভাইদের মুখের ভাত কাড়িয়া না লয় - দুঃখ দুর্দশা তাহাদের উভয়েরই সমান - উভয়ের উপরই শোষণ সমান ভাবে চলিয়াছে . . . মিলের ম্যানেজার হতভম্ব হইয়াছে . . . কী করিতে সে কী করিল? শ্রমিকের শক্তি সে আরো জোরালো করিয়া দিল . . . সোমেনের 'সংকেত' কৃষক মজুরের একতাবদ্ধতার যে সংকেত, আমরা আমাদের দেশে পাইতেছি তাহারই প্রকাশ। (সরদার ফজলুল করিম; *'সংকেত' আগুনের অক্ষর* : সোমেন চন্দ, সম্পাদক : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও পবিত্র সরকার, আগস্ট ১৯৯২, পৃঃ ৬০-৬১)

২। 'সংকেত' গল্পটিতে একরাশ লোকের দেখা মেলে। ভারি মজার মানুষ। এটি একটি উঁচু দরের গণ-গল্প হতে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ হল একটি ব্যক্তি বিশেষের হৃদয় দৌর্বল্যে। নায়ক না হলে গল্প হয় না এই কুসংস্কার বোধহয় সোমেনের ছিল। পরে সে সংস্কার শিথিল হয়ে এসেছে। (অন্নদাশঙ্কর রায়; *সোমেন চন্দ*, ঐ পৃঃ ১৮)

৩। মিলমালিক পুরনো শ্রমিকদের তাড়িয়ে নতুন শ্রমিক বহাল করার উদ্দেশ্যে গ্রাম অঞ্চল থেকে লঞ্চ বোঝাই করে মানুষ ধরে নিয়ে এসেছে। আগেকার শ্রমিকেরা অহিংস প্রতিরোধ করেছে, বক্তৃতা দিয়ে নবাগতদের বোঝাতে চেষ্টা করেছে।... মালিকপক্ষ সহজেই সৈন্য পুলিশ পেয়ে নিহত আহতদের বুকের উপর দিয়ে জোর করে নতুন

শ্রমিকদের মিলে ঢুকিয়েছে। গল্পের দুটি অংশ। একটিতে কিভাবে গ্রামের দারিদ্র্যক্লিষ্ট সরল মানুষকে লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে আনা হল এবং কিভাবে কার্যসিদ্ধি করা হল। দুটি ঘটনায় লেখকের সহানুভূতি ও সারল্য আকর্ষণের বিষয় হয়েছে। ঐ ঘটনাদুটির কেন্দ্র রাখা হয়েছে নববিবাহিত একটি গ্রাম্য যুবক রহমানকে। মালিক-নিযুক্ত মৌলভির কথায় তার বাপ যেভাবে তাকে পাঠাল এবং মিলের সামনে সে যা যা দেখলে এবং বিস্ময়ে ভয়ে যা মানসিক অভিজ্ঞতা ঘটল তার নিপুণ পরিচয় লেখক গল্পটির সাহিত্যিক সৌন্দর্যে রক্ষা করেছেন। তিনি কোথাও ভাবে উদ্বেল হননি। ব্যাপারটিকে ছবির মতো ফুটিয়ে তুলেছেন, যা গল্পকার হিসাবে তাঁর দক্ষতার পরিচয় সুনিশ্চিত করেছে। (ক্ষুদিরাম দাস; *গল্পকার সোমেন*; ঐ পৃঃ ৪৬)

৪। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চল্লিশের এবং পঞ্চাশের দশকে প্রগতির ধারাকে যে গুণগত পার্থক্যে উন্নীত করেছেন, তার সূচনা হয়েছিল সোমেন চন্দের লেখায়।

ব্যাপক গণজীবনের গতিধারা সম্বন্ধে জ্ঞান এবং মানবমানবীর সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে বিদ্যুতানুযন্ত্রের মতো ধরতে পারার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন সোমেন চন্দ, কারণ তাঁর পা ছিল মাটিতে। গ্রাম বাংলার মানুষকে তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন। ঢাকা শহরে পড়াশোনা করলেও ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে আসতেন গ্রামে। সেখানে দেখেছিলেন গ্রামের সমস্ত স্তরের মানুষকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। . . . ১৯৪০ সালে ঢাকা শহরে রেল শ্রমিকদের সংগঠনের কাজে নেমে গভীরভাবে বুঝতে চেয়েছিলেন কলকারখানার শ্রমিকদের অন্তর্জীবনকে। শ্রমিকদের মধ্যে তিনি সম্ভবত তাঁর চেনা গ্রামীণ মানুষের দেখাও পেয়েছিলেন যা তখন কৃষি থেকে শিল্পে এসে ঢালাই হতে শুরু হয়েছে প্রধানত সংগঠনের ছাঁচে। 'সংকেত' গল্পটিতে রয়েছে এর পরিচয়। (রণেশ দাসগুপ্ত; *সোমেন চন্দের পরিচিতি ও পটভূমি*, ঐ, পৃঃ ৭৩)

৫। . . . মানুষের চিরন্তন রূপটিকে এঁকে তোলার সেই লক্ষ্য বদলে গিয়ে নতুন সমাজবোধ প্রকাশ পেল সোমেনের গল্পে 'সংকেত' তার একটি। 'সংকেত' নামটি সার্থক ইঙ্গিতবহ। ধনী-শ্রমিকের সংগ্রাম দিয়ে যে নতুন যুগ আসছে, তার সংকেত সোমেন দিয়েছেন এই গল্পে। মানুষের শাশ্বত হৃদয়চিত্র দেখানো এর প্রধান লক্ষ্য নয়, যে-মানুষ ভালোবাসে, স্বপ্ন দেখে ক্ষুধাপীড়িত হয়ে সে কলকারখানায় কাজ করতে যায়। কৃষি-জীবনের মধ্যে যন্ত্রজীবনের ক্রমপ্রবেশ নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে তুলেছে তাই নিয়ে এই গল্প। কলকারখানা কাজ করবার জন্য গ্রামের মানুষ চলে আসছে, তাদের পুরনো জীবন ভাঙছে। নতুন জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কলকারখানার মালিকের দ্বারা। নতুন সমাজচেতনায় নতুন রাজনীতির জন্ম, নতুন সাহিত্যেরও জন্ম। 'সংকেত' গল্পের মধ্যে রহমানের কারখানায় কাজ করতে যাওয়ার আগে তার নববিবাহিতা বধূর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার ঘটনাটি মূল কাহিনির পটভূমিরূপে স্থাপিত হওয়ায় ট্র্যাজেডি আরও প্রখর হয়েছে। এ গল্পের শেষ হয়েছে সমাধানহীন শূন্যতা দিয়ে, তাতেই এ গল্পের আর্ট। (ভবতোষ দত্ত, *গল্পকার সোমেন চন্দ*, ঐ, পৃঃ ১০৬)

৬। শস্যময় গ্রাম্যনদী রূপান্তরিত হয়ে যায় চকচকে টাকায় - কৃষির শ্রমিকে রূপান্তরের সাজেশন। তীরে লঞ্চ ভেড়ার মুহূর্তে সহস্র কণ্ঠের মিলিত "চিৎকারধ্বনি সকলের কানে আসিয়া বাজিল।" নিস্তরঙ্গ গ্রামের মানুষগুলো যুক্ত হয়ে পড়ে ঐ ধ্বনির কোলাহলে। নদীকে উপমেয় করে আঁকা হয় ধ্বনিময়তা - "সেই ভীষণ গোলমাল আরও ভীষণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড চরটা মুহূর্তে হাজার হাজার লোকে ভরিয়া গেল। . . . বদলে - যাওয়া নদীর এই দৃশ্যকেও বলা যায় প্রকৃতির মানবায়িত শিল্প। তাদের সমবেত চিৎকারে নদীর জল যেন উদ্বেলিত, নদীর রূপক ব্যবহারের কোনোরকম কাব্যময়তা নেই, মানবিক শ্রমচাঞ্চল্যে নদীজলের উত্তরণ ঘটে গেল।

সোমেন চন্দ এ গল্পে লিখেছেন শ্রমশক্তির জয় দেখাতে, তাদের বাঁচামরার সংগ্রামকে সংঘবদ্ধ রূপ দিতে।

. . . সমবেত শ্রমিকের মধ্যে একজন নেতাকে দেখা গেল যে এই ঐক্যের কথা বলে। কাপড়ের মিলের শ্রমিকেরা অধিকার আদায়ের দাবিতে সংগ্রামরত, তাদের বরখাস্ত করে মিলমালিক ও তার তাবেদাররা গ্রাম থেকে কৃষিদের ধরে এনে স্থলাভিষিক্ত করতে চায় - এই বাস্তবতা এখানে স্পষ্ট করা হয়। (বেগম আকতার কামাল; 'সংকেত' : *শ্রমসত্তার অশ্রুবিন্দু, সোমেন চন্দের গল্প ও গল্পপাঠ* : অমিনুর রহমান সুলতান (সংকলন ও সম্পাদনা) : পৃঃ ৪৩)

৭। গল্পের আখ্যান-অভিনবত্ব কিছু নাই, নতুনত্বও তেমন কিছু নেই - কারণ শ্রমিকজীবনের এ-হেন অবস্থানগত সংকটের মৌলিক কিছু নয়। সোমেন এই সাধারণ পরিচিত শ্রমজীবনের দুর্গতিকেই রূপক-সংকেতের প্রয়োগগুণে একেবারে অনবদ্য শিল্পরূপ দিয়েছেন। এই গল্পে গৃহীত রূপক-সংকেতগুলোই বিষয়ের মূল প্রাণশক্তি হয়ে নতুন এক দৃশ্যরূপ সৃষ্টির সহায়ক হয়ে উঠেছে বলেই আমাদের নজর আটকে যায় বিভিন্ন রূপকে, বিভিন্ন সংকেতে। যেমন :

লঞ্চ - বাণিজ্যিক শোষণের প্রতীক
গরু - ব্যবহৃত সাধারণ মানুষজনের প্রতীকী রূপ
ঝড় - জীবিকাবদলের ইঙ্গিত-দ্যোতক
ধান - কাঙ্ক্ষিত জীবনরূপের সংকেত
চর - মরুভূমি সদৃশ জীবনের সংকেত
রক্তবর্ণ আকাশ - বৈপ্লবিক রাঙা দিগন্তের সংকেত
(বীরেন্দ্র মৃধা : *সোমেন চন্দ ও প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন*, আশাদীপ, ২০১৪, পৃঃ ১৮৮)

১৬.৩ অনুশীলনী

১. 'সংকেত' গল্পের নামকরণ কতখানি সার্থক হয়েছে আলোচনা করো।

২. 'সংকেত' গল্পের গঠন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩. 'সংকেত' গল্পটিতে রাজনৈতিক ধর্মী গল্প বলে গণ্য করা যায় কি? - আলোচনা করো।

৪. 'সংকেত' গল্পটির উপসংহার কতখানি উপযোগী আলোচনা করো।

৫. 'সংকেত' গল্পে রহমান কি কেন্দ্রিয় চরিত্র। - আলোচনা করো।

৬. 'সংকেত' গল্পে রূপক-সংকেতের সাহায্যে গল্পের বিষয়কে বিশেষ শিল্পরূপে উত্তীর্ণ করেছেন - ব্যাখ্যা করো।

৭. 'সংকেত' গল্পে শ্রমজীবনের সংকট নতুন রূপে তুলে ধরেছেন গল্পকার - আলোচনা করো।

৮. 'সংকেত' গল্পের কাহিনি রচনায় গল্পকার অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন - আলোচনা করো।

৯. 'সংকেত' গল্পে পরিস্থিতি সৃষ্টিতে এবং ভাষার রহস্যময়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে গল্পকারের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

১০. 'সংকেত' গল্পে পুরাতন শোষণের কাহিনিকে কি ভাবে গল্পকার নতুন যুগের ছায়াচ্ছন্ন প্রেক্ষিতে নতুন রূপে উপস্থাপন করেছেন - তা আলোচনা করো।

১১. 'সংকেত' গল্পে বাচ্চা মৌলবি চরিত্রের স্বরূপ পুরাতন ও আধুনিক সময় ব্যবধানে কতটা বাস্তব এবং রূপান্তর ঘটেছে - আলোচনা করো।

১২. 'সংকেত' গল্পটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে আগ্রাসী ধনতন্ত্র যুগের চেতনা ও আদর্শ - আলোচনা করো।

১৩. 'সংকেত' গল্পে গল্পকার সাধারণ পরিচিত শ্রমজীবনের দুর্গতিকে রূপক-সংকেতের প্রয়োগগুণে অনবদ্য শিল্পরূপ দিয়েছেন। - আলোচনা করো।

১৪. 'সংকেত' গল্পে রহমানের চরিত্রটি আলোচনা করে দেখাও চরিত্রটি কতটা সময়োপযোগী হয়ে উঠেছে - আলোচনা করো।

১৫. বাংলা ছোটগল্পে সোমেন চন্দ উদ্দেশ্য বা বক্তব্য শিল্প ও কলারীতি সুষম বিন্যাসকে ছাপিয়ে যায়নি - 'সংকেত' তার একটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করো।

১৬. 'সংকেত' গল্পে নদী, লঞ্চ এবং রক্তবর্ণ আকাশ একটি সংকেত ধর্মী পটভূমি গড়ে তুলেছে - আলোচনা করো।

১৭. 'নদীর জলের দিকে চাহিয়া রহমানের চোখ আবার ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল।' - গল্পের অন্তিমের বক্তব্য লেখকের দ্বিধাই মূল কারণ কি আলোচনা করো।

১৬.৩ ছোটোগল্প

১. দশরথ বলিল, 'কিছু শুনস্নি?' - দশরথ কে? কি শোনার কথা বলছে।

২. 'অদ্ভুত খবরটি শ্রীরামচন্দ্রের মুখে সারা গ্রামে রটিয়া গেল' - খবরটি কি ছিল।

৩. 'লোকটি সদলবলে নামিয়া আসিল' - কে নেমে আসিল এবং কেন?

৪. 'আজ জীবনের শেষ ঘন্টাগুলি ঢং ঢং করিয়া বাজিতেছে' - কোন প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে। উক্তিটি কে বলেছে।

৫. 'একেবারে বড়ো কর্তা' - কে বড়-কর্তা? তাঁর উদ্দেশ্য কি?

৬. 'বাচ্চা মৌলবি বলিয়া তাহাকে সবাই ডাকে' - কে বাচ্চা মৌলবি? তার কাজ কি?

৭. আকবর আলী, ইয়াসিন চরিত্র দুটির প্রসঙ্গ নির্দেশ করো।

৮. একটু নির্জনতায় ছেলেকে টানিয়া বুড়া আবার বলিল, 'বাপ'। - প্রসঙ্গে নির্দেশ করো।

৯. 'জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা' - কার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং কোন প্রসঙ্গে একথা কাকে বলেছে।

১০. 'লোকগুলি প্রাণপণে দৌড়িয়া আসিতেছে, প্রাণ যায় কী বাঁচে।' - প্রসঙ্গ উল্লেখ করে - আলোচনা করো।

১১. 'আপনাদের চোখে পৃথিবী যেমন, আমাদের কাছেও তাই' - কে কাকে কোন অবস্থায় একথা বলেছেন।

১২. 'আপনাকেও এমনি একদিন তাড়িয়ে দেবে' - কে কাকে কোন অবস্থায় একথা বলেছেন।

১৩. 'সংকেত' গল্পে বাচ্চা মৌলবি সম্বন্ধে আলোচনা করো।

১৪. 'বন্ধুগণ আমরা চাষী-ভাইরা' -প্রসঙ্গ উল্লেখ করো।

১৬.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১. বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদিত) : *সোমেন চন্দ-রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৯২।

২. পবিত্র সরকার (সম্পাদিত) : *সোমেন চন্দ গল্পসংগ্রহ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৭।

৩. পুষ্পময়ী বসু (অনু:) : *মাক্সিম গোর্কি; মা'* প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

৪. ভূদেব চৌধুরী : *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ২০০৩।

৫. কার্ল মার্কস : পুঁজি, প্রগতি প্রকাশন মস্কো, ১৯৮৮।

৬. বীরেন্দ্র মৃধা : *প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন*, আশাদীপ, ২০১৪।

৭. আমিনুর রহমান সুলতান : *সোমেন চন্দের গল্প ও গল্পপাঠ*, (সংকলন ও সম্পাদনা) ২০১৩।

৮. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : *আগুনের অক্ষর*, সোমেন চন্দ, ১৯৯৯।

একক ১৭ ❑ চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ—সুবোধ ঘোষ

গঠন

১৭.১ মূলগল্প

১৭.২ জীবনকথা ও সাহিত্যপরিচয়

১৭.৩ গঠন-বিশ্লেষণ

১৭.৪ অনুশীলনী

১৭.১ মূলগল্প

আমাদের ক্লাসটা ছিল একটা নৃতত্ত্বের ল্যাবরেটরির মতো। এমন বিচিত্র মানবতার নমুনা আর কোন্ স্কুলের কোন্ ক্লাসে আছে জানি না। তিনজন রাজার ছেলে ছিল আমাদের ক্লাসে। একজন জংলী রাজার ছেলে, কুচকুচে কালো চেহারা। আর দুজন ছিল সত্যিকারের ক্ষত্রিয়াত্মজ, সুগৌর গায়ের রঙ, পাগড়িতে সাঁচ্চা মোতির ঝালর ঝুলত। তা ছাড়া ছিল—সিরিল টিগ্‌গা, ইম্যানুয়েল খালখো, জন বেস্‌রা, রিচার্ড টুডু আর স্টিফান হোরো এবং আরো অনেক। এত ওরাওঁ আর মুণ্ডা সন্তানের সমাবেশের মাঝখানে তবু আমরা ক'জন ইন্টারক্লাস পরিবারের বাঙালি ও বিহারি ছেলে শুধু বুদ্ধির জোরে সব কর্মের মোড়লির গৌরব অধিকার করে বসেছিলাম। রাজার ছেলেগুলিকে আমরা বলতাম সোনা ব্যাঙ, আর মুণ্ডা ও ওরাওঁদের বলতাম কোলা ব্যাঙ। ওদের কাউকে আমরা কোন দিন গ্রাহ্যের মধ্যে আনতাম না। রাজার ছেলেগুলি অবশ্য আমাদের সঙ্গে কথা বলত না। অপর পক্ষে টিগ্‌গা, খাল্‌খো, বেস্‌রা ও টুডু আমাদের সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারলে ধন্য হয়ে যেত। টিফিনের সময় একটা আনি নিয়ে টুডুকে দিতাম। বলতাম—টুডু, চট করে এক দৌড়ে এক আনার ঝালবাদাম নিয়ে এস তো। গঙ্গা সাহুর দোকান থেকে আনবে।

স্কুল থেকে গঙ্গা সাহুর দোকান এক মাইল হবে। কৃতার্থভাবে আনিটা হাতে তুলে নিয়ে টুডু সেই প্রচণ্ড রোদে ঝলসানো মাঠের উপর দিয়ে পোড়া হরিনের মতো উদ্দাম বেগে দৌড়ে চলে যেত গঙ্গা সাহুর দোকানে। ফিরে এসে ঝাল বাদামের ঠোঙাটা আমাদের হাতে সঁপে দিয়ে নিজে দূরে সরে যেত। আমরা বলতাম—কী আশ্চর্য টুডু, এতটা পথ দৌড়ে এলে, তবু তুমি একটুও হাঁপাচ্ছ না।

আমাদের এই ফাঁকা কথার কারসাজিকে আন্তরিক মনে করে টুডু দূরে দাঁড়িয়ে গর্বভরে হাসত। আমরা চোখ টিপে লক্ষ করতাম টুডু কেমন জোর করে তার পরিশ্রান্ত শ্বাসবায়ুটাকে ঢোক গিলে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। তাকে ঝালবাদামের একটু শেয়ার দিতে আমরা বোধহয় ইচ্ছা করেই মাঝে মাঝে ভুলে যেতাম। দিতে গেলেও টুডু নিত না।

আমরা দেখতাম, একটু দূরে দাঁড়িয়ে সুতীব্র একটা দৃষ্টি দিয়ে স্টিফান হোরো আমাদের হাবভাব লক্ষ করছে। আমরা ঘাবড়ে যেতাম। স্টিফান যেন তীর মেরে আমাদের বুকের ভিতরের ধূর্ত রসিকতায় তৈরি ফুসফুসটাকে খোঁচা দিয়ে দেখছে। সব বুঝে ফেলতে পারছে স্টিফান। কিন্তু সবার মধ্যে একমাত্র স্টিফানই পারে, আর কেউ নয়।

টুডু, খাল্‌খো, টিগ্‌গা আর বেস্‌রা, সকলেই কতকটা এই রকমেরই বাধ্য বোকা বিশ্বাসী আর নিরীহ ছিল। আমরা মনে মনে হাসতাম—হায় রে, জঙ্গলের যত কোল, যত সব কোলা ব্যাঙ।

ওদের মধ্যে ঐ একটিমাত্র কালো কেউটে ছিল, স্টিফান হোরো। বড় উদ্ধত ছিল স্টিফানের স্বভাবটা। স্বীকার করতে

লজ্জা নেই, হোরোর কাছে আমাদের আভিজাত্য চুপে চুপে হার মেনে নিত। ওর সঙ্গে সদ্ভাব রাখার জন্য মাঝে মাঝে যেচে ওর সঙ্গে কথাও বলতে হয়েছে। আরও লজ্জার বিষয়, হোরো এক-এক সময় আমাদের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। ঐ মাথাঠাসা মোটা মোটা চুলের ঘুঙুর, চেপটা নাক, আবলুস-কালো চেহারা, তবু এত অহংকার।

স্টিফানের উপর আর একটু ভয় এবং প্রথম শ্রদ্ধা হলো আর একটা ঘটনায়। সেদিন খেলার মাঠে দেখলাম, স্টিফান হোরো হকিস্টিক আনেনি। হোরো তবু খেলতে চায়। কিন্তু নিজের নিজের স্টিক নিয়ে খেলতে হবে, এই ছিল আমাদের নিয়ম। হোরো বার বার আমাদের অনুরোধ করল— কিছুক্ষণের জন্য কেউ আমাকে একটা স্টিক ধার দাও, একহাত খেলেই আবার দিয়ে দেব।

কেউ কারও স্টিক পরের হাতে দিতে রাজি ছিল না। হোরো বলল—আমি বিনা স্টিকেই খেলব।

গোঁয়ার হোরো একটি ঘণ্টা আমাদের উদ্দাম হকিস্টিকের বাড়ি আর আছাড়ের সঙ্গে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে পা দিয়ে খেলে গেল। হোরোর দুটো নিরেট সীসু কাঠের মতো পায়ের উপর বেপরোয়া হকিস্টিক চালাবার সময় এক-একবার সন্দেহে আমাদেরই হাত কেঁপে উঠেছে, স্টিকটাই ভেঙে না যায়।

স্টিফান হোরো ক্রমেই আমাদের ভাবিয়ে তুলছিল। শুধু ভয় আর শ্রদ্ধা নয়, আর একটা কারণে আমরা হোরোকে এইবার ঈর্ষা করতে আরম্ভ করলাম। লেখাপড়ার ব্যাপারে হোরো আমাদের মনের শান্তি নষ্ট করতে চলেছে। ইংরেজি কবিতার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যায় সে আমাদের ইন্দুকেও পরাজিত করে ছাব্বিশ নম্বর বেশি পেল। ঘটনাটা জাতীয় অপমানের মতো আমাদের গায়ে বিঁধল। বিহারি ছাত্রদের জাতীয়তা কতটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল জানি না, কিন্তু হোরোর সম্পর্কে একটা নিন্দার ষড়যন্ত্রে তারাও আমাদের সঙ্গে ইউনাইটেড ফ্রন্ট করল। আমরা বেশ জোর গলায় রটিয়ে দিলাম—এ স্কুলে অখৃস্টানদের উপর বড় অবিচার চলেছে। মাস্টারেরা সবাই খৃস্টান। সুতরাং খৃস্টান বেশি নম্বর পাবে তাতে আর আশ্চর্য কী? কিন্তু কী ভয়ানক অন্যায়।

আমাদের অভিযোগকে মনে প্রাণে সত্য বলে বুঝলেন এবং বিশ্বাস করলেন শুধু একমাত্র অখৃস্টান শিক্ষক, সংস্কৃতের টিচার বৈজনাথ শর্মা, অর্থাৎ পণ্ডিতজী।

পণ্ডিতজী আমাদের সান্ত্বনা দিলেন—কি আর করবে বাবা। পাদরীদের স্কুলে এই রকমই অন্যায় কাণ্ড হয়ে থাকে। যাক্ ইউনিভার্সিটি তো আছে। সেইখানে ধরা পড়ে যাবে কার কতখানি যোগ্যতা।

প্রমোশনের পর নতুন বছরে স্টিফান হোরো ভয়ানক এক গোঁয়ার্তুমি করে বসল, পা দিয়ে হকি খেলার চেয়েও ভয়ানক। স্টিফান হোরো তার অ্যাডিশনাল ইংরেজি ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃত নিল। খৃস্টান টিচারেরা সবাই হোরোকে ধমকালেন, হেডমাস্টার ফাদার লিন্ডন ক্ষুণ্ণ হলেন, আর পণ্ডিতজী অদ্ভুতভাবে হাসতে লাগলেন। তবু অনার্য হোরোর সংস্কৃত পড়ার প্রতিজ্ঞা তিলমাত্র বিচলিত হলো না।

পণ্ডিতজী আমাদের আড়ালে ডেকে নিয়ে একটা অস্বস্তির হাসি হেসে বললেন—স্টিফান হোরো সংস্কৃত নিয়েছে। আর কি? এইবার দেবভাষার কপালে কি আছে কে জানে।

পণ্ডিতজী হাসতে লাগলেন। আমাদের কেমন সন্দেহ হলো, পণ্ডিতজীকে যেন খুশি খুশি দেখাচ্ছে। যাক্।

শীঘ্রই আমাদের যত ধারণা সংশয় আক্রোশ ও আশঙ্কা পর পর কতগুলি ঘটনায় আরও জটিল হয়ে উঠতে লাগল।

নিউ টেস্টামেন্ট থেকে ডেভিডের কয়েকটা গাথা আগাগোড়া নির্ভুল আবৃত্তি করে ফার্স্টপ্রাইজ পেল স্টিফান হোরো। সেকেন্ড, থার্ড ও ফোর্থ প্রাইজের অগৌরবে মুখ শুকনো করে আমরা বসে রইলাম। ফাদার লিন্ডন উচ্ছ্বসিত আনন্দে হোরোর প্রশংসা করে ঘোষণা করলেন—তুমি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা মাত্র আমি তোমাকে নিশ্চয় দারোগা করে দিতে পারব হোরো, আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।

তা করতে পারেন ফাদার লিন্ডন। পুলিশের আই.জি. সাহেবের কাছে এটুকু সুপারিশ করার ক্ষমতা তাঁর আছে। কিন্তু ঐটুকুই যদি হোরোর জীবনের পরমার্থ হয়, হোক, তার জন্য আমরা মোটেই হিংসা করি না। দারোগা হবার জন্য কষ্ট করে নিউ টেস্টামেন্ট মুখস্থ করার দরকার নেই আমাদের।

তার পরের দিনই বাইবেল ক্লাসে হোরোকে একেবারে ভিন্ন রূপে দেখতে পেলাম আমরা। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে আমরা শুধু খাবি খেতে লাগলাম।

বাইবেল ক্লাসের একেবারে পিছনের বেঞ্চিতে বসেছিল হোরো। পড়াতে পড়াতে ফাদার লিন্ডন বার বার হর্ষ-পুলকিত নেত্রে হোরোকে প্রশ্ন করছিলেন—স্টিফান, তুমিই উত্তর দাও। তুমিই সবচেয়ে ভাল উত্তর দিতে পারবে।

—জানি না স্যার। স্টিফানের রুক্ষ গলার স্বরে চমকে উঠে আমরা সবাই তার দিকে তাকালাম। দেখলাম, স্টিফান হোরোর আরও রুক্ষ ও বিরক্ত মুখটা ডেস্কের উপর ঝুঁকে রয়েছে। ফাদার লিন্ডনের দিকে যেন তাকাতে চায় না হোরো।

ফাদার লিন্ডনের সোনালী দাড়ির উপর লালচে মুখে ক্ষণে ক্ষণে গাঢ় রক্তচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ছিল। চোখের দৃষ্টিটা তীব্র হয়ে উঠছিল। স্টিফানের দিকে তাকিয়ে রুষ্ট স্বরে বললেন—স্টিফান, আজ কি তোমার ব্রেনটাকে দরজার বাইরে রেখে ক্লাসে এসেছ তুমি? উত্তর দিতে পারছ না কেন?

—জানি না স্যার। আবার স্টিফান হোরোর সেই স্পষ্ট অবিচল ও অকুতোভয় উত্তর শুনে আমাদের বুকে দুরু দুরু শুরু হয়ে গেল। আকস্মিকভাবে অসময়ে ক্লাস বন্ধ করে ফাদার লিন্ডন চলে গেলেন।

কিন্তু স্টিফান হোরোর মনে এত রাগ কেন? এত অভিমান কেন? নিউ টেস্টামেন্ট মুখস্থ করে করে মাথা কিনেছে? কি হতে চায় হোরো? হাউস অব লর্ডস্-এর সদস্য?

এর পর বিপদে পড়লেন পণ্ডিতজী। পণ্ডিতজীর মতি-গতিও ক'দিন থেকে কেমন একটু বিসদৃশ ঠেকছে। আমাদের এড়িয়ে যেতে পারলেই পণ্ডিতজী একটু সুস্থ বোধ করেন। ফার্স্ট টার্মিনাল পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। এই তো যত নম্বর প্রমোশন আর পজিশন নিয়ে একটা দুশ্চিন্তিত গবেষণা ও কৌতূহলের সময়। পণ্ডিতজীর উদার হাতের নম্বর অনেক সময় আমাদের টোটালকে পরিস্ফীত করে কৃপণ খৃস্টান শিক্ষকদের ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। আজও আমরা তাই জানতে চাই, পণ্ডিতজী কার জন্য কতদূর করলেন। ইন্দুকে যদি একবার বুক ঠুকে পঁচাশি দিয়ে দেন পণ্ডিতজী, তবে টোটালে তার ফার্স্ট হওয়া সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না। সব খৃস্টানী ষড়যন্ত্র জব্দ হয়ে যায়।

পণ্ডিতজীর বাড়িতে গিয়েছি, লাইব্রেরী-ঘরে একা একা পেয়েছি, পথে পথরোধ করেছি, কিন্তু পণ্ডিতজী কিরকম গোলমেলে কথা বলে আমাদের সব কৌতূহল যেন চাপা দিতে চান। আমাদের সন্দেহ আরও প্রখর হয়ে ওঠে।

আমৃতা আমৃতা করে দুবার মাথা চুলকিয়ে পণ্ডিতজী শেষে সত্য সংবাদটা একদিন ব্যক্ত করে দিলেন।— সংস্কৃতে স্টিফান হোরো সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে, একশোর মধ্যে পঁচাত্তর।

আর ইন্দু? আমাদের প্রশ্নে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পণ্ডিতজী অপরাধীর মতো বললেন—বত্রিশ।

মাত্র বত্রিশ। পণ্ডিতজীর মতো বিশ্বাসহন্তা পৃথিবীতে আর নেই। আমাদের ক্ষোভ অসংযত হয়ে উঠেছিল। পণ্ডিতজী মিনতি করে বললেন—স্টিফান হোরো এত ভাল সংস্কৃত লিখেছে, এ তো তোমাদেরই গৌরব, আর্যভাষার গৌরব। এতে তো তোমাদের খুশি হবার কথা। এটা হোরোর জয় নয়, এটা হলো সংস্কৃতভাষার জয়।

চুলোয় যাক্ সংস্কৃতভাষার জয়। ইন্দু ফার্স্ট হতে পারবে না, এটা যে বাঙালির কত বড় অপমান, সেটা পণ্ডিতজী বুঝলেন না। কিন্তু আমরা রহস্যটা ঠিক বুঝে ফেললাম। পণ্ডিতজী হলেন বিহারি, বাঙালি দুঃখ বুঝবার মতো হৃদয় নেই এই বৈজনাথ শর্মার।

কিন্তু বাতাসের নিশ্চয় সেই পরম গুণ আছে, যার জন্য শত অন্যায়ের অবরোধের মধ্যেও ধর্মের কল নেড়ে ওঠে।

লাইব্রেরি-ঘরে যেদিন বোর্ড-নিবদ্ধ মার্ক-শীটের কাছে আমরা গিয়ে চোখ তুলে দাঁড়ালাম, সেদিন আমরা বিশ্বাস করলাম, সত্যের জয় আছে, মিথ্যার পরাজয় আছে।

ইন্দু ফার্স্ট হয়েছে। স্টিফান হোরোর পজিশন অনেক নীচে। ইংলিশে, ইতিহাসে, ভূগোলে, অঙ্কে, সব বিষয়ে অতি নগণ্য নম্বর পেয়েছে স্টিফান হোরো, একমাত্র সংস্কৃত ছাড়া। ভেবে অবাক হলাম আমরা, খৃস্টান টিচারেরা হোরের উপর হঠাৎ এত নির্দয় হয়ে উঠলেন কেন?

আরও কিছুদিন পরে স্টিফান হোরো আমাদের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য হয়ে গেল। শুধু আমাদের কাছে নয়, খালখো, বেস্‌রা, টিগ্‌গা ও আর সবাই বলাবলি করে, কি যেন হয়েছে হোরোর।

বড়দিনের উৎসবে আমরা পিকনিক করতে গিয়েছিলাম শিলোয়ারার জঙ্গলে। রান্নার কাঠের জন্য মহা উৎসাহে একটা মরা কেঁদগাছ ভাঙছিলাম আমরা। হঠাৎ দেখলাম, স্রোতের ধার দিয়ে একা একা হোরো চলেছে। হাতে একটি গুলতি। আমরা চেঁচিয়ে ডাকলাম হোরোকে। এ রকম অভাবিতভাবে হোরো যখন এসেই পড়েছে, তখন সেও আমাদের সঙ্গে। এই বনভোজনের আনন্দের একটু শেয়ার নিক্ না কেন। পোলাও হবে, মাংস, দই আছে, বৈকুণ্ঠ ময়রার সন্দেশও আছে— এসব খেলে খুশিই হবে হোরো। একেবারে আনকোরা মুণ্ডা, জীবনে এসব খায়নি তো কখনো।

হোরো এগিয়ে এল। আমাদের কাছে এসেই একটা শালগাছের শাখার দিকে চোখের দৃষ্টি নিবিষ্ট করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপরেই শিকার লক্ষ করে গুলতি তুলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে একটা হৃষ্টপুষ্ট কাঠবিড়ালী আহত হয়ে ধপ করে মাটির উপর পড়ল। একটা লাফ দিয়ে আহত কাঠবিড়ালীটাকে লুফে নিয়ে পকেটের ভিতর রাখল স্টিফান।

আমরা আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—ওটা কি হবে স্টিফান?

—খাব। নিঃসঙ্কোচে কথাটা বলে ফেলল হোরো। মনের ঘেন্না মনের ভিতর চেপে রেখে তবু আমরা হোরোকে নিমন্ত্রণ করলাম।—ওসব ছুঁড়ে ফেলে দাও স্টিফান। পাগল কোথাকার। এস, আমাদের পিকনিকে তুমিও পোলাও খাবে আমাদের সঙ্গে।

—না। হোরোর কালো মুখের ভিতর থেকে ঝক্‌ঝকে দুপাটি সাদা দাঁতের হাসি আপত্তি জানাল। চলে গেল স্টিফান।

এ রকম জংলী হয়ে যাচ্ছে কেন স্টিফান? রিচার্ড টুডু একদিন কানে কানে আমাদের বলল— সত্যিই কি যেন হয়েছে হোরোর। বোধহয় শিগগির পাগল হয়ে যাবে। ফাদার লিভন আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন, হোরোর সঙ্গে যেন কেউ না মেশে।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—কেন টুডু?

—একজন বুড়ো সোখার সঙ্গে আজকাল বড় ভাব হয়েছে স্টিফানের। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রতি মঙ্গলবার হাটে গিয়ে সোখার সঙ্গে দেখা করে হোরো।

—তাতে কি এমন অপরাধ হয়েছে হোরোর?

টুডু ভুরু কুঁচকে বলল— অপরাধ নয়? নিশ্চয়ই অপরাধ। এতে বাইবেলের অপমান করেছে হোরো। চার্চে যায় না, কারও কথা শোনো না, তিনদিন হোস্টেলে ছিল না হোরো। ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

—হোস্টেলে ছিল না? কোথায় ছিল?

টুডু গলার স্বর আরও নামিয়ে চুপে চুপে বলল।—বুরুতে গিয়েছিল। সেখানে নেচে গেয়ে এসেছে। পেট ভরে ইলি খেয়ে নেশা করেছে। তাছাড়া...।

টুডু হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল—একটা কথা বলছি, কাউকে বলো না যেন। জানতে পারলে হোরো আমায় মেরে ফেলবে।

টুডুকে অভয় দিলাম—না, কেউ জানতে পারবে না, তুমি বল।

—একটি মেয়ের সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়েছে। মেয়েটার নাম চির্‌কি, মোরাঙ্গি পাহাড়ের মুরমুদের মেয়ে।

টুডুর কথাগুলি মুগ্ধ হয়ে যেন গিলছিলাম আমরা। আমাদেরই সহপাঠী দীনদরিদ্র মুণ্ডা হোরো, কতই বা বয়স। তবু সেই হোরো আজ এক মুহূর্তে আমাদের বাইবেল ক্লাস, সংস্কৃতের নম্বর আর হকি খেলার সব আনন্দ ও উত্তেজনাকে মূল্যহীন করে দিয়ে এক রোমাঞ্চময় অনুরাগের স্কুলে গিয়ে সবার অগোচরে নাম লিখিয়ে এসেছে। সেই মেয়েটি, চির্‌কি মুরমু তার নাম, তাকে যেন আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি। শাল ফুলের মালা গলায় দিয়ে, খোঁপায় একটা বনজবা গুঁজে, স্রোতের ভাষার মতো কলকল হাসির জাদু দিয়ে হোরোর কালো হৃদয়ের সব দুরন্তপনাকে বন্দী করে নিয়ে কোন্ উপত্যকার একটি নিভৃতে চলে গিয়েছে। সেখান থেকে ফিরে আসবার সাধ্য নেই হোরোর। কোন্ সাধেই বা আসবে?

টুডু তখনো সেই রকম পাকা পাকা কথা বলে চলেছিল।—মুরমুরা বোঙা পুজো করে, ওদের সঙ্গে হোরোর মেলামেশা করা কি উচিত? বড় ভুল করেছে হোরো।

স্টিফান হোরোকে হোস্টেল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, এটা শুধু একটা গুজব হয়েই রইল। কার্যত দেখলাম, হোরোকে তাড়ানো হলো না। ইচ্ছা মতো ক্লাসে আসে হোরো। নিজের ইচ্ছা মতোই অনুপস্থিত হয়। ফাদার লিভনের অনুগত খৃস্টান ছাত্রেরা হোরোকে এড়িয়ে যায়। হোরো যেন এক ঘরের মধ্যেই একঘরে হয়ে আছে। হোস্টেলেই থাকে হোরো, অথচ তার সম্পর্কে যেন সব শাসন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

কয়েকদিন পরে আমরা আরও অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, ফাদার লিভন টেনিস খেলছেন হেরোর সঙ্গে। আশ্চর্য! টুডু বেসরা ও টিগ্‌গা, এরা হোরোর চেয়ে কম কালো আর বেশি বিশ্বাসী খৃস্টান। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওরা শুধু ফাদার লিভনের টেনিস খেলার সময় বল কুড়িয়ে দেবার মর্যাদা পেয়েছে। তার বেশি নয়। আর স্টিফান একেবারে... সত্যি আশ্চর্য। হোস্টেলের বাগানে বিকালবেলা জল দেবার ভার ছিল হোরোর উপর। এই কর্তব্যটুকুর বিনিময়ে হোরো হোস্টেলে ফ্রি খেতে পেত আর থাকত। আমরা দেখলাম, হোরো আর বাগানে যায় না, জলও তোলে না। উদ্যান-সেবার ভার টিগ্‌গার উপর চাপানো হয়েছে। বেচারী টিগ্‌গা! সকালবেলার রান্নার কাঠ কাটে, তার উপর আবার বিকালবেলা জল তোলা।

টুডু এসে আর-একদিন আর-একটা খবর দিল— আজকাল আর হাটে যাবার সুযোগ পায় না স্টিফান, প্রতি মঙ্গলবারে সারা দুপুর ফাদার লিভনের ঘরে বসে পিলগ্রিমস্ প্রগেস পড়ে। পড়া শেষ হলে নাকি চা-বিস্কুট খায় হোরো। ফাদার লিভন খাওয়ান।

আমাদের উৎসাহ ঔৎসুক্য আলোচনা আর গবেষণার সীমা ছিল না। অলক্ষ্যে কতবড় একটা ঘটনার দ্বন্দ্ব জমে উঠেছে, তার কিছু কিছু আভাস আমরা আমাদের অনুভব দিয়ে ধরতে পারছিলাম। এক দিকে কেমব্রিজের এম-এ, বিখ্যাত শিক্ষিত সুসভ্য ও শ্রদ্ধেয় ফাদার লিভন। অপর দিকে কোন্ এক জংলী ডিহির বুড়ো সোখা, দীনতম নগণ্য অর্ধেনগ্ন ও বর্বরবেশি এক জাদুমন্ত্রা। যেন দুই যুগে লড়াই— বিংশ শতক বনাম প্রাক্ ইতিহাস। বুড়ো সোখা বোধহয় সে লাঞ্ছনা ভুলতে পারে না, ছেলেধরা পাদরীরা তাদের ডিহির ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, খৃস্টান করে দিয়েছে হোরোকে। তারই প্রতিশোধ নেবে বুড়ো সোখা। এই সুসভ্য ডাইনদের দুর্গ থেকে আবার জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

ফাদার লিভনও তাই বোধহয় বেশি সতর্ক হয়েছেন। স্টিফান হোরো যদি আবার জংলী হয়ে যায়, সে পরাজয় আর অপমান বেশি করে তাঁর বুকে বাজবে। সহ্য করা কঠিন হবে। ফাদার লিভন জানেন, প্রতি মঙ্গলবারের হাটে বুড়ো সোখা আসে। একটা আরণ্য আত্মা যেন প্রতিশোধ নেবার জন্য আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুযোগ খুঁজছে। তাই চা-বিস্কুট ও টেনিস, সুসভ্যতার এক-একটি প্রসাদ খাইয়ে হোরোকে যেন পোষ মানিয়ে রাখতে চাইছিলেন ফাদার লিভন।

আমরা বলতাম—চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ। দেখা যাক্, কে জেতে আর কে হারে।

গুড ফ্রাইডের ছুটিতে হোস্টেলের জংলী ছেলেরা সবাই নিজের নিজের জঙ্গলের দেশে যাবার ছুটি পেল। টুডু টিগ্‌গা বেস্‌রা খালখো—সবাই চলে গেল। এদের পক্ষে যাবার কোন বাধা ছিল না। কাঁধের লাঠিতে এক-একটা পোঁটলা ঝুলিয়ে

জঙ্গলের মধ্যে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল পথ একটানা হেঁটে ওরা চলে যাবে নিজের নিজের ডিহিতে। কোন পাথেয় দরকার হয় না। গাড়ি চড়ে যাওয়ার মতো পয়সা খরচ করার সামর্থ্যও নেই ওদের।

কিন্তু হোরোকে ছুটি দিতে গিয়ে রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়লেন ফাদার লিভন। হোরো যেদিন গেল, সার্ভিস বাসটা এসে দাঁড়াল হোস্টেলের দরজার কাছে। আমরা দেখলাম, ফাদার লিভন মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করছেন, বাসের টিকিট কিনে দিচ্ছেন হোরোকে।

আমাদের মধ্যে বাজি ধরা হলো, হোরো আর ফিরে আসবে কিনা। ইন্দু বলল—নিশ্চয় আসবে। ফাদার লিভন ওর জংলীপনা ঘুচিয়ে দিয়েছেন ভাল করে। দুবেলা চা-বিস্কুট মারছে আজকাল। তার স্বাদ কি ভুলতে পারবে হোরো।

আমি বললাম— আর ফিরে আসবে না হোরো। এখানে না হয় চা-বিস্কুট আছে, কিন্তু ওদিকে যে...।

ইন্দু—ওদিকে কি?

বললাম—চিরকি মুরমুর কথা ভুলে গেলে?

ইন্দু একটু নিরাশ হয়ে পড়ল—তাই তো।

ছুটি একটু নিরাশ হয়ে পড়ল— তাই তো।

ছুটি ফুরিয়ে যাবার পর আবার হোস্টেলের জীবন চঞ্চল হয়ে উঠল। সবাই ফিরে এল, টুডু টিগ্‌গা বেস্‌রা আর খালখো। স্টিফান হোরোও ফিরে এল। ইন্দুর জিত হলো। আমরা নিরাশ হয়ে পড়লাম। রাগ হলো হোরোর উপর। হোরোটা সত্যিই একটা গবেট ও বেরসিক।

কিন্তু টুডুর কাছে গল্প শুনে আমাদের এই আক্ষেপ এক মুহূর্তে মুছে গেল। আমরা শুনলাম বুড়ো সোখার কথা, চিরকি মুরমুর কথা। হোরোদের জঙ্গলের ছবিটা মুহূর্তের মধ্যে যেন দূরের এক ফোটা-পলাশের রঙীন ছবির মতো আমাদের কল্পনার সীমার কিনারায় দুলতে শুরু করে দিল। ইন্দু বলল— চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে বুড়ো সোখার জয় অবধারিত।

হোরোর পাশে ডিহির ছেলে টুডু। খৃস্টান টুডুরা অখৃস্টানদের সঙ্গে মেশে না। টুডু তবু যেন গোয়েন্দার মতো অখৃস্টান মুরমুদের ডিহিতে গিয়ে হোরোর সব কীর্তি দেখে এসেছে। তবে টুডু প্রাণ থাকতে ফাদার লিভনের কানে ওসব কীর্তির কথা কখনো তুলবে না। হোরোর উপর প্রচণ্ড একটা শ্রদ্ধা ও মমতা আছে টুডুর। হোরোর কাছে গিয়ে কিছু বলতে পারে না বলেই আমাদের কাছে বলে। বলে বলে যেন স্তব্ধ শ্রদ্ধার বেদনা খানিকটা হালকা করে নেয় টুডু।

টুডু দেখেছে, একদিন তীর দিয়ে একটা হরিণ মেরেছিল হোরো। স্রোতের ধারে হোরো দাঁড়িয়েছিল ধনুক হাতে। চিরকি মুরমু তার পা ধুইয়ে দিচ্ছিল।

টুডু দেখেছে, চিরকি তাদের গাঁয়ের ঘুমঘর থেকে জ্যোৎস্নারাতে চুপে চুপে পালিয়ে এসেছে। হোরো আড়াল থেকে বের হয়ে এসে চিরকিকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছে।

টুডু দেখেছে, হোরো খৃস্টান হয়েও আখড়াতে গিয়ে মাদল বাজিয়েছে। চিরকিও নাচে নাকি সেখানে। বুড়ো সোখা ভালবাসে হোরোকে। কেউ তাই হোরোকে ঘৃণা করে না।

টুডু বলল— জংলীদের সঙ্গে মিশে দুদিন সেন্ডেরা করেছে হোরো। টাঙি হাতে উৎসবে পাগলের মতো নেচেছে। শিমুল গাছে আগুন ধরিয়েছে, দাউদাউ করে আগুন জ্বলেছে। সবার আগে এক লাফ দিয়ে এক কোপে সেই জ্বলন্ত গাছ কেটেছে হোরো।

টুডু তার গলার স্বর খুব অস্পষ্ট করে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল—আমি দেখেছি, তারপর গায়ের ফোস্কাতে ঠাণ্ডা বাতাস লাগাবার জন্য যখন আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হোরো, তখন চিরকি মুরমু আস্তে আস্তে এসে হোরোকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে।

বোর্ডিং-এর পাশে ছোট মাঠের ঘাসের উপর সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে আমরা টুডুর মুখ থেকে এই অদ্ভুত অথচ বর্ণে-বর্ণে সত্য এক রূপকথা শুনছিলাম। হঠাৎ হোস্টেলের বারান্দা থেকে একটা বাঁশির স্বর ভেসে এল। তখনি সেই স্বরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে, তালে তালে মাথা দুলিয়ে, টুডু গুন্ গুন্ করে গাইতে লাগল।—

রাতা মাতা বিরকো তালা

রে নালোহোম নিরজা

রাগা ইংগা...

উৎফুল্ল টুডুর হাবভাব আর উৎসাহ দেখে মনে হলো, এখনি সে নাচতে শুরু করে দেবে।

—কে বাজাচ্ছে বাঁশি? কে?

আমাদের ব্যস্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে টুডু গান থামিয়ে বলল—ঐ সেই গান। হোরো বাঁশিতে সেই গানের সুরটা বাজাচ্ছে।—কোন্ গান?

—চিরকি মুরমুর গান।

—গানটার মানে কি টুডু?

টুডু উত্তর দিল—গানটার অর্থ, শোন আমার জোয়ান বন্ধু, পালিয়ে যেও না, এই ঘন জঙ্গলে আমায় একা ফেলে চলে যেও না।

একটা আনন্দের রোমাঞ্চময় সঞ্চার আমাদের মনের উপর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। বললাম— এ যে আমাদের মতো গান, টুডু!

ইন্দু চাপা সুরে আবৃত্তি করল— শুন শুন হে পরাণ পিয়া...!

কিছুক্ষণ আবিষ্টের মতো নিঝুম হয়ে বসেছিলাম আমরা। বোধহয় আমরা মনে মনে চিরকি মুরমুর নামে বনের লতার মতো না-দেখা একটি মেয়েকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম—না, তোমার বন্ধু পালিয়ে যাবে না। আমরা প্রার্থনা করছি, হোরো তোমার কাছে ফিরে যাবে।

কিন্তু হঠাৎ ফাদার লিন্ডনের গর্জন শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম। হোস্টেলের বারান্দায় অন্ধকারে যেন একটা ধস্তাধস্তি চলেছে। টুডু দৌড়ে গিয়ে ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখে ফিরে এল। সন্ত্রস্তের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল— ফাদার লিন্ডন হোরোর বাঁশি ভেঙে দিয়েছেন।

আমাদের সবার মনে ধক্ করে কতগুলি প্রতিহিংসার শিখা জ্বলে উঠল। রাগের মাথায় বললাম— দাড়িওয়ালাকে ঘা কতক জমিয়ে দিতে পারল না হোরো?

টুডু বিমর্ষভাবে বলল—আমারও কেমন ভয় হচ্ছে। হোরো বড় গোঁয়ার। ফাদারকে এর ফল টের পাইয়ে দেবে হোরো।

কিন্তু এত বড় দুঃসহ ব্যাপারের পরেও স্টিফান হোরোর গোঁয়ার্তুমির কোন প্রমাণ পেলাম না। বরং দেখলাম, গোঁ ধরেছেন ফাদার লিন্ডন।

ফাদার লিন্ডনের অভিযান আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। প্রতি সপ্তাহে একবার সফরে বের হন। কখনো ভোজপুরী লেঠেল সঙ্গে যায়, কখনো বা আট-দশটা কনস্টেবল। থানাতে একটা চিঠি দিলেই কনস্টেবল চলে আসে। যেন একটা যোদ্ধার দল নিয়ে দু'দিনের জন্য জঙ্গল এলাকায় অদৃশ্য হয়ে যান ফাদার লিন্ডন। সত্যিই কি কোন ধর্মযুদ্ধ বাধিয়েছেন ফাদার লিন্ডন? আমরা শুধু মনমরা হয়ে ভাবতাম, ফাদার লিন্ডনের এই রহস্যময় আনাগোনা কবে বন্ধ হবে? কবে শান্ত হবে তাঁর লালচে মুখের উত্তেজনা?

টুডুর কাছে খবর শুনে ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বুঝলাম—মোরাঙ্গি পাহাড়ের মুরমুদের ডিহিতেই ফাদার লিন্ডনের অভিযান শুরু হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে এরই মধ্যে একটি মাটির গির্জা তৈরি করে ফেলেছেন ফাদার লিন্ডন। অরণ্যের বুকের ভিতর ঢুকে তিনি যেন হাজার হাজার বছরের বৃদ্ধ যত বোঙাদের শিলাময় বেদী কাঁপিয়ে দিয়ে এসেছেন।

খুব বেশি দিন পার হয়নি, শুনলাম, মোরাঙ্গি পাহাড়ে একটা হাঙ্গামা হয়ে গিয়েছে। মাটির গির্জাটা ভেঙে ধুলো করে দিয়েছে।

কে করেছে?

যে করেছে, তাকে আমরা স্বচক্ষেই দেখলাম। বুড়ো সোখা। সেসন জজের আদালতের ভিড়ের মধ্যে-মাথা গুঁজে আমরাও রায় শুনলাম—বুড়ো সোখার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

স্টিফান হোরোকে দেখতাম, বোর্ডিং-এর বাগানে একটা বুড়ো বটের ঝুরিতে দোলনা বেঁধে সময়-অসময় শুধু দোল খায়। দুলে দুলে যেন এক দুঃসহ গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে নিচ্ছে স্টিফান হোরো।

কদিন পরেই নন্-কো-অপারেশনের ঝড় বইতে শুরু করল সারা দেশে। আমরা স্কুল ছাড়ব। রক্তমাখা জালিয়াঁওয়ালা বাগের জ্বালা আমাদের অশান্ত করে তুলল।

আমরা বাঙালি আর বিহারি ছেলেরা স্কুল ছাড়লাম। রাজার ছেলেরা কেউ ছাড়ল না। খ্রিস্টান ছেলেরাও নয়, টুডু টিগ্‌গা বেস্‌রা খাল্‌খো কেউ নয়। আমরা পিকেটিং করে ওদের বাধা দিতে লাগলাম।

আমাদের খুব ভরসা ছিল, হোরো আমাদের দলে আসবে। ফাদার লিন্ডন ওকে যে অপমান করেছেন, তার পর জীবনে সে আর কোন পাদরী বা শাদা চামড়াকে সহ্য করতে পারবে কি না সন্দেহ।

আমরা স্কুলের ফটকে পিকেটিং করছিলাম। দেখলাম হোরো আসছে।

স্বতন্ত্র ভারত কি জয়। জয়ধ্বনি করে আর হাত তুলে আমরা হোরোকে থামতে অনুরোধ করলাম,—এস হোরো, আমাদের সঙ্গে দাঁড়াও, ঐ পাপের বাসাতে আর আমরা ঢুকব না।

হোরো এগিয়ে এসে ইন্দুকে একটা ধাক্কা দিল, পরেশের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল। বনশূয়রের মতো গোঁ গোঁ করে পথ করে নিয়ে ক্লাসে গিয়ে ঢুকল হোরো।

সেই দিন হোরোকে আমরা ভাল করে চিনলাম। পাদরীদের ক্রীতদাস, মনুষ্যত্বহীন, মর্যাদাশূন্য, মূর্খ জংলী হোরো। ভারতবর্ষকে চিনল না, একটু শ্রদ্ধাও করল না। চিনল শুধু ওর জঙ্গলটাকে। কিন্তু তোর জঙ্গলটা যে ভারতবর্ষের মধ্যেই রে! ভারতবর্ষের বাইরেতো নয়।

আট বছর পরের কথা। আমি লেপো থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা। সকালবেলায় ক'জন বিরসাইট মুণ্ডা এসেছে হাজিরা দিতে। জেল থেকে আজই ওরা খালাস পেয়েছে। এখানে হাজিরা দিয়ে তারপর নিজের নিজের ডিহিতে ওরা চলে যাবে।

আইনের চক্ষে বিরসাইটরা অত্যন্ত সন্দেহভাজন মানুষ। প্রতি বছর হাঙ্গামা বাধায়। পুলিশকে ব্যতিব্যস্ত করে। জঙ্গল আইন মানে না, মহাজনদের পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়, চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে চায় না। বাজারে বসলে তোলা দেবে না। জম ক্রোক করতে গেলে আদালতের পেয়াদাকে টাঙি নিয়ে কাটতে আসে। দু'বছর আগে একবার স্বরাজ ঘোষণা করেছিল বিরসাইট মুণ্ডারা। পাদরীকে মেরেছে, অনেকগুলি পুল ভেঙেছে। ওরমানঝির জঙ্গলে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল ওদের সঙ্গে পুলিশের।

সব শেষে হাজিরা লেখাতে যে উঠে এল, তার নাম রুন্দু হোরো।

ডায়েরির উপর থেকে চোখ তুলে লোকটার মুখের দিকে তাকালাম। তার মাথার চুলের জংলী খোঁপাটা রুক্ষ জটায় চূড়ার

মতো হয়ে গিয়েছে। গলায় ভেলাফলের একটা মালা, আদুড় গা, কোমরে ছোট্ট একটা কাপড় জড়ানো। হাতে একটা কাঁসার বালা। এই প্রাগৈতিহাসিক সজ্জার মধ্যে শুধু একজোড়া সুশানিত আধুনিক চোখ...।

বিস্ময় চাপতে গিয়ে তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললাম—স্টিফান হোরো!

লোকটা মিষ্টি হেসে বলল—না ঘোষ, আমি হলাম রুনু হোরো।

—তুমিও একজন বিরসাইট?

—আমি বির্‌সা ভগবানের শিষ্য।

—বির্‌সা ভগবান? সে কে?

—সে আমাদের গান্ধী ছিল ঘোষ। আমি তাঁকে চোখে দেখিনি, আমার বাবার মুখে তাঁর কথা শুনেছি। ইংরাজের জেলখানার অন্ধকারে একজন কয়েদীর মতো মরে গিয়েছে আমাদের বির্‌সা ভগবান। তাঁর চেহারা দেখতে কেমন ছিল, জান?

—কেমন?

—যীশুখৃস্টের মতন।

একটু চুপ করে থেকে হোরো বলল—আমাদের জঙ্গলে বাইরে থেকে অনেক পাপ এসে ঢুকেছে। তাই বির্‌সা ভগবান আমাদের সাবধান করে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর অনুরোধ কি ভুলতে পারি?

আমি ডাকলাম—স্টিফান হোরো!

হোরো প্রতিবাদ করল—বল, রুনু হোরো।

চুপ করে গেলাম। হোরো নিজের থেকেই খুশি হয়ে নানা খবর জিজ্ঞাসা করল—ইন্দু কোথায়? পরেশ কি করছে?

চারদিকে একবার সাবধানে তাকিয়ে নিয়ে হোরোকে প্রশ্ন করলাম—এত রোগা হয়ে গেলে কেন হোরো?

হোরো—আমার টি-বি হয়েছে।...আচ্ছা, এবার যাই আমি।

একটা কথা জানবার জন্য মনটা ছটফট করছিল। তবু সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। শেষে সাহস করে বলেই ফেললাম।

—একটা খবর জানতে বড় ইচ্ছা করছে, হোরো।

হোরো—বল।

জিজ্ঞাসা করলাম—চির্‌কি মুরমু কোথায়?

হোরো একটু হেসে নিয়ে শান্তভাবে উত্তর দিল—জান না বুঝি? ফাদার লিন্ডনের মিশনে চলে গিয়েছে চির্‌কি। খৃস্টান হয়েছে চির্‌কি। এখন হাজারিবাগের কনভেন্টে থাকে।

স্টিফানের চোখের দৃষ্টিটা চিকচিক করে উঠল, তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মতোই, কিন্তু জলে ভেজা। আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হলো না, স্টিফানও নিঃশব্দে চলে গেল।

কাউকে মুখ ফুটে বলতে লজ্জা করবে, একটা ভুলের স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য কাঁটার মতো মনের মধ্যে বিঁধছিল। হয়তো আমরাই একেবারে নিরপেক্ষ থেকে চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে স্টিফানকে হারিয়ে দিয়েছি। আর স্টিফানও সেই পরাজয়ের দুঃখে বনবাসে চলে গেল।

১৭.২ জীবনকথা ও সাহিত্য-পরিচয়

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বিহারের হাজারিবাগে সুবোধ ঘোষের জন্ম। পড়াশুনা করেছেন হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজে। তবে কলেজের পড়া সম্পূর্ণ করতে পারেননি, তার আগেই তাঁকে নেমে পড়তে হয় জীবিকার সন্ধানে। বহু বিচিত্র পেশা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সার্কাসের দলে কাজ, বাস কন্ডাকটার, টিকাদানের কাজ, কেক-পাউরুটির ব্যবসা, অভ্রখনিতে ওভারসিয়ারের কাজ—এরকম বিচিত্র পেশার নানান অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ জীবন তিনি যাপন করেছিলেন।

তাঁর কলকাতায় আগমন তিরিশের দশকে। গৌরাঙ্গ প্রেসের প্রুফরিডার হিসাবে তিনি কলকাতায় চাকরি-জীবন শুরু করেন। তারপর হঠাৎ একদিন সাহিত্যিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে চমকে দেন পাঠকদের। প্রথম প্রকাশিত গল্প 'অযান্ত্রিক', দ্বিতীয় প্রকাশিত গল্প 'ফসিল', এই দুটি মাত্র গল্পেই বোঝা যায় বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটেছে এক বিশিষ্ট লেখকের।

মধ্যবিত্ত মানুষজনের আপাত সততার আড়ালে লুকিয়ে থাকা ভণ্ডামি, ইতরতা, প্রতারণাকে উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন সুবোধ ঘোষ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাংলা সাহিত্যে মধ্যবিত্ত আত্মপ্রতারণাটি চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। তবে তা প্রকাশ করেছিলেন মূলত চরিত্রের মনোজীবনকে আশ্রয় করে। কিন্তু সুবোধ ঘোষ তাঁর গল্পে এক বিস্তৃত অভিজ্ঞতা বা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তাঁর ভাবনাকে প্রকাশ করলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প—'সুন্দরম্', 'গোত্রান্তর', 'পরশুরামের কুঠার', 'বারবধূ', 'জতুগৃহ', ঠগিনী' প্রভৃতি।

১৭.৩ গঠন-বিশ্লেষণ

গল্পটির উপস্থাপন-কৌশলে বিশেষত্ব আছে। হোরোর জীবন-কাহিনিকে কেন্দ্র করেই গল্পটি লিখিত কিন্তু সরাসরি তার জীবন-কাহিনি রূপ পায় না। গল্পটির কথক হোরোর একজন সহপাঠী। এই সহপাঠীটি এক বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে—তা-হল মধ্যবিত্ত শ্রেণির। 'আমি'-র বদলে 'আমরা'র ভাষ্যে গল্পটি লিখিত হয়েছে। গল্পে উপস্থাপিত কাহিনিটির যদি পর্যায়ক্রমিক বিভাজন রেখা টানি তাহলে গল্পের প্রথম অংশটিকে বলা যায়—আমরা ও তারা। তারা এখানে আদিবাসী ছাত্র-সকল। তবে এখানে হোরো অনুপস্থিত। হোরো গল্পটিতে হাজির হয় অন্যান্য আদিবাসী ছাত্রের থেকে তার ব্যতিক্রমী স্বভাব নিয়ে। এরপর গল্পটি শুরু হয় একান্তই হোরোকে কেন্দ্র করে। পড়াশুনাতে হোরোর ক্রমিক উত্থান প্রত্যক্ষ বর্ণনাতে উঠে আসে। কিন্তু ক্রমশ তার সহপাঠীদের কাছে সে হয়ে ওঠে অচেনা। তার এই অচেনা রূপটি ধরা পড়ে পরোক্ষে, টুডু কর্তৃক পরিবেশিত ভাষ্যে। স্কুল-চৌহদ্দির মধ্যে উপস্থিত হোরোর কার্যকলাপ আর মোরাঙ্গি পাহাড়ে হোরোর জীবন-যাপন সম্পর্কে আনীত টুডুর তথ্য—দুইয়ে মিলে হোরোর জীবন-কাহিনির বুনোটি তৈরি হয় এই পর্বে। গল্পের শেষ পর্যায় আরও আটবছর পরের একদিনের কথা। কয়েকটি সংলাপ দিয়েই গড়ে উঠেছে এই পর্বের কাহিনি। হোরোর বর্তমান জীবন এবং অতীত জীবন সম্পর্কিত কয়েকটি তথ্য পাঠকদের জানানো হয়েছে এই পর্বে।

কথক গল্পটিতে অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনাকে নতুন করে বর্ণনা করেছেন। হোরোর জীবন-কাহিনিকে কেন্দ্র করে একটি পাঠ তৈরি করতে চেয়েছেন লেখক। মধ্যবিত্ত মানস-প্রবণতাজাত দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রস্তুত করেছেন

এই পাঠ। হোরোকে তাদের 'কালো কেউটে' মনে হওয়া কিম্বা 'পাদরীদের ক্রীতদাস' ভাবা এই মানস-প্রবণতাকে প্রকাশ করে। এও লক্ষণীয় এগুলি ছিল তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। কথকের অন্তিম উপলব্ধিতে কোনো সংকীর্ণতা নেই, আছে একধরনের অপরাধবোধের দহন-জ্বালা। বোঝা যায় অন্তিম এই উপলব্ধির তাড়নাই কথককে প্ররোচিত করেছে হোরোর জীবন-কথাকে নতুন করে পড়ে নিতে। কথকের জবানিতে লেখক যখন এই পাঠ নির্মাণ করেন তখন যেমন মধ্যবিত্ত মানসপ্রবণতা-জাত দৃষ্টিকোণের সংকীর্ণতাকে রূপ দেন, তেমনই তার জীবন-কাহিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন কিছু ইঙ্গিত রেখে যান যাতে পৌঁছোতে পারেন অন্তিম উপলব্ধিতে।

পড়াশুনাতে হোরোর ক্রমিক উত্থানকে কেন্দ্র করে গল্পটিতে প্রথমে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় কথক আর সঙ্গীদের সঙ্গী হোরোর। হোরোর কোনো প্রতিক্রিয়া ধরা পড়ে না, কথক আর তার সহযোগীদের প্রতিক্রিয়াই এখানে ধরা পড়ে। এই অংশটিতে স্কুলের খেলার মাঠ, ক্লাসরুম, শিক্ষকের আচরণ—সমস্ত কিছুকে নিয়ে গল্পে যে গতিময়তা সৃষ্টি হয় তা স্কুলের সীমানাতেই আবর্তিত হয়, গল্পটির এই অংশটিতে নেই অলক্ষ্য কোনো পটভূমি। কিন্তু স্টিফান হোরো যখন থেকে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে তখনও গল্পের স্থানিক পটভূমি হিসাবে স্কুলটিকেই প্রত্যক্ষ করে বটে, তবে পরোক্ষে টুডুর বর্ণনা-সূত্রে মোরাঙ্গি পাহাড় স্কুল-চৌহদ্দির মধ্যেই এসে ঢুকে পড়ে। শুধু তাই নয়, ফাদার লিন্ডনের সঙ্গে বুড়ো সোখার যে লড়াই তাতেও মোরাঙ্গি পাহাড় এক অলক্ষ্য পটভূমি নির্মাণ করে গল্পটিতে। গল্পটির শেষাংশ রচিত হয়েছে লেপো থানার পটভূমিতে। স্টিফান হোরো এখন বিরসাইট মুন্ডা—রুনু হোরো। স্টিফান হোরোর জীবনের এই পরিবর্তনটি ধরবার উপযুক্ত পটভূমি হয়েছে থানাটি। এখানেই হোরো জানিয়েছে চিরকি মুরমুর খ্রিস্টান হয়ে লিন্ডনের মিশনে চলে যায়। মোরাঙ্গি পাহাড়ের চিরকি মুরমু মিশনে চলে গেলেও হোরোর জীবন থেকে মোরাঙ্গি পাহাড় মিলিয়ে যায় না। গল্পের কথক দারোগা, হোরো বিরসাইট মুন্ডা, আর তাদের দেখা হয়েছে থানাতে; সঠিক পটভূমি নির্বাচন করে লেখা এখানে গল্পটির কাহিনি-কথনকে আকস্মিকতাদোষ থেকে মুক্ত করেছে।

১৭.৪ অনুশীলনী

১। 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' অবলম্বনে লেখকের বক্তব্য পরিস্ফুট করুন।

২। 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পটির নামকরণটির সার্থকতা আলোচনা করুন।

একক ১৮ ☐ রেকর্ড—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গঠন

১৮.১ মূলগল্প

১৮.২ জীবনকথা ও সাহিত্য-পরিচয়

১৮.৩ গল্প-বিবরণ

১৮.৪ সংকেত-ব্যাখ্যা

১৮.৫ চরিত্র-চিত্রণ

১৮.৬ শিল্পরীতি

১৮.৭ অনুশীলনী

১৮.১ মূলগল্প

বৌবাজার স্ট্রীট আর শেয়ালদার মোড়ের কয়েকটি ছোট ছোট গলি দিয়ে, কিংবা স্কট লেনের পাশ কাটিয়ে একটি বিচিত্র বাজারে ঢোকা যায়। ইংরেজিতে তার ভদ্র নাম 'সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট'—চলতি বাংলায় 'চোরা বাজার'। এক সময় বোধ হয় চোরাই জিনিসের বিক্রি-বাটা চলত এখানে—আজ সে পাট না থাকলেও অখ্যাতিটা আঁকড়ে বসেই আছে।

বৈঠকখানা মার্কেটের গাছপালার দোকানগুলি পার হলে এই বাজারের সীমান্ত; এ অংশে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। নতুন পুরানো প্রচুর সস্তার জুতো, শোলা হ্যাট, ইলেকট্রিক হিটার, তাপ্পি মারা স্টোভ, আর লাল হয়ে যাওয়া দশ বারো আনা সেরের চিংড়ি মাছ। এই অংশে দাঁড়ালেই নাকে আসবে স্পিরিট আর বার্নিশের গন্ধ—তারপর আপনি একেবারে ফার্নিচারের জগতে গিয়ে পৌঁছোবেন।

নতুন পুরানো ফার্নিচারে দোকানগুলো ঠাসা। ন্যাজারাস কোম্পানির আদি বার্মা টীক রং ফিরিয়ে অপেক্ষা করে আছে আবার চকচকে নতুন জিনিস এক নম্বর সি-পি ভেবে কিনে এনে ছ-মাস পরে আবিষ্কার করবেন, কাঠটা বিশুদ্ধ জারুল। সস্তায় হয়তো খাঁটি মেহগিনির জিনিস পাবেন আবার প্রচুর পয়সা দিয়ে আলমারিটা এনে দেখলেন, ফাটা কাঠের ওপর বেমালুম বার্ণিশ লাগিয়ে আপনার মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছে।

অর্থাৎ রাস্তার লটারী। এক আনা দিয়ে কাঁটা ঘোরালেন পেলেন তিনটি ছোট ছোট বিস্কুট; কিংবা কপালের জোর থাকল তো চন্দন সাবানই জুটে গেল একখানা!

তবু আমাদের মতো মধ্যবিত্তদের এখানে লটারীর টিকিটই কিনতে হয়। বৌবাজার কিংবা রিপন স্ট্রীটের দিকে পা বাড়াতে আমাদের সাহসে কুলোয় না।

আমি গিয়েছিলুম ছোট একটা বুককেসের সন্ধানে। মনের মত কিছু পেলুম না। ফিরে আসছি, এমন সময় একটা দোকানের দিকে নজর পড়ল। ফার্নিচারের দোকান নয়। 'বাবু কলকাতা'র শেষ অভিজ্ঞান কতগুলি গৃহসজ্জা, চীনে মাটির বড় 'পট', গিল্টকরা ফ্রেমে বিলিতি ছবি, দু-একটা শ্বেত পাথর কিংবা ইমিটেশন স্টোনের ছোট বড় মূর্তি, ব্রোঞ্জের নর্তকী, পুরানো ফ্যাশানের আরো নানা 'টুকিটাকি' একটা চোঙাওলা গ্রামোফোনে হিন্দী গানের রেকর্ড বাজছিল, সেইটে কানে

যেতে আমি দাঁড়িয়ে গেলুম। হিন্দী গানের আকর্ষণে নয়। দেখলুম, স্তূপাকার পুরানো রেকর্ড। 'যেখানে দেখিবে ছাই'—এই মহাজন বাক্যে এখানে আমি লাভবান হয়েছি আগে। অর্থাৎ পুরানো রেকর্ডের ভেতর থেকে পেয়েছি অপ্রাপ্য রবীন্দ্র কণ্ঠ, পেয়েছি রাধিকা গোস্বামীর গান, দিলীপকুমারের 'মুঠো মুঠো রাঙা জবা' তাদের কোনো-কোনোটি কোনমতে শ্রাব্য, আবার দু-একটা প্রায় নতুনের মতো। দাম আশাতীত সস্তা, বলাই বাহুল্য। বললুম রেকর্ড দেখাও তো।

একজন বের করে দিলে। অধিকাংশই সস্তা, সিনেমার গান—কিংবা বাজার চলতি 'পপুলার ডিসক'— পুজোর অ্যাম্প্লিফায়ারে বাজাতে বাজাতে যারা অকাল জরা লাভ করেছে। তবু এদের মধ্যেই একখানা রেকর্ড আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অচেনা লেবেল, অচেনা ভাষা। ওপরের লেখাগুলোও রোমান হরফ বলে মনে হল না। দেখলুম বেশি পুরানোও নয়।

হিন্দী রেকর্ডটা থেমে গিয়েছিল। বললুম, এটা বাজাও তো। চোঙাওলা গ্রামাফোন থেকে প্রথমে একরাশ অদ্ভুত বাজনা ছড়িয়ে পড়ল। এ ধরনের বাজনা এর আগে কখনো শুনিনি। একটা ড্রাম বাজছে— গীটারও আছে বোধ হয়, কিন্তু আরো কী কী যে আছে আমার বোধগম্য হল না। নানা ঢঙের বিদেশী ছবি দেখেছি—রেকর্ড শুনেছি অনেক, কিন্তু এ জিনিস কখনো কানে আসেনি এর আগে।

তারপর গান। নারীপুরুষের চার পাঁচটি কণ্ঠ আছে মনে হল। যেমন অদ্ভুত বাজনা—তেমনি অদ্ভুত সুর। কেন জানি না—কোথায় রক্তের মধ্যে দোলা লেগে গেল। জানি এ সুর একেবারে অচেনা, তবু মনে হতে লাগল এ যেন আমি কবে কোথায় শুনেছিলুম। উলটো পিঠেও একই জিনিস—একটা গানকেই গাওয়া হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় পেলে এ রেকর্ড?

জবাব এল, চৌরঙ্গী অঞ্চলে ওদের যে এজেন্ট আছে সে এনে দিয়েছে।

—এ কোন ভাষা?

বিহারী মুসলমান দোকানদার হেসে বলল, ক্যা মালুম?

বারোয়ানা পয়সা দিয়ে রেকর্ডখানা আমি সংগ্রহ করে নিয়ে এলুম। দর করলে হয়তো আরো সস্তায় হত, কিন্তু কেমন যেন মনে হল দরাদরি করে খেলো করবার মতো গান এ নয়।

বাড়ী ফিরে মেসিনে দিয়েছি, আমার স্ত্রী করুণা উঠে এলো পড়ার টেবিল থেকে। নতুন অধ্যাপনায় ঢুকেছে—কলেজের ছাত্রীদের চাইতে পড়ার তাগিদ তার নিজেরাই বেশি। ভুরু কুঁচকে বললে, এ আবার কী?

বললুম, 'দেখতেই পাচ্ছ, রেকর্ড বাজাচ্ছি।'

—কী বিটকেল বাজনারে বাপুহু এ কাদের গান?

—জানি না।

—জানো না তো আনলে কেন?

—চুপ করো একটু, শুনতে দাও।

মিনিট খানিক ধৈর্য ধরে রইল করুণা। তারপর মুখের উপর টেনে আনল রাজ্যের বিরক্তি।

—পাগল করে দিলে যেন্থ কোত্থেকে রাজ্যের ছাইপাঁশ জোটাও তুমিই জানো। পড়তে দেবার মতলব না থাকে তো বলো, সোজা ছাতে গিয়ে উঠি।

—লক্ষ্মীটি—আর একটুখানি। তিন মিনিটে তোমার জ্ঞানার্জনে কাঁটা পড়বে না।

গান থামলে করুণার দিকে তাকালুম। দেখি হাতে একটা লালনীল পেন্সিল নিয়ে এসেছিল, তার গোড়াটা চিবোচ্ছে আনমনার মতো।

—খুব খারাপ লাগল করুণা?

করুণা একটু চুপ করে রইল। বললে, না—খারাপ লাগল না। কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল। পড়াটা নষ্ট করে দিলে আমার।

—কেন?

—ভারী আশ্চর্য লাগল সুরটা। মনে হল কবে যেন কোথায় শুনেছি।

বললুম, ঠিক তাই। আমারও অমনি মনে হয়েছিল।

করুণা আস্তে আস্তে নিজের টেবিলে গিয়ে বসল। মেশিনটা তুলে রেখে দেখি ও পড়ছে না, একটা ব্লটিং প্যাডের ওপর নীল পেন্সিলের আঁচড় টানছে।

আমিও কতগুলো খাতা টেনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের সংখ্যা বাড়াতে বসে গেলুম। কিন্তু একটা খাতাতেও মন দিতে পারছি না। দুকান ভরে ওই বিচিত্র বাজনা আর গানের সুর বেজে চলেছে। কোথায় শুনেছি—কবে শুনেছি। কিন্তু কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।

করুণা যেন আমারই ভাবনার সূত্র টেনে বললো, এ কী কাণ্ড করলে বলো তো?

—কী হল আবার?

—ওই রেকর্ডটা ভারী অস্বস্তি লাগছে। যেন খুব চেনা—যেন—করুণা গুন্ গুন্ করে দু-তিনটে সুর ভাঁজল, তারপর বিরক্ত হয়ে বললে, নাঃ—কিছুতেই মনে করতে পারছি না। আচ্ছা, পাগলামি ধরিয়ে দিলে যা হোক। দিলে পড়াটা শেষ করে।

মোট কথা, ওই রেকর্ডখানা আমাদের দু-জনের সন্ধ্যাকেই আচ্ছন্ন করে রাখল। এ একটা বিরক্তিকর মানসিক অবস্থা। খুব চেনা মানুষের নাম মনে করতে না পারলে, চাবির গোছা এইমাত্র কোথাও রেখে তারপর আর খুঁজে না পেলে যেমন একটা ছটফটানি জেগে ওঠে ঠিক সেই রকম।

রাতে খেতে বসে করুণা বললে, মনে পড়েছে।

আমি চোখ তুলে তাকালুম।

—ছেলেবেলায় তখন আসামে ছিলুম, তখন খাসিয়াদের নাচের সং। যেন ওই রকম গান—

—খাসিয়াদের গান?

করুণা একটু বিভ্রান্ত হল যেন। তারপর মাথা নেড়ে বললে, না—না ঠিক খাসিয়াদের নাচও নয়। ঠিক কী যেন—কী যেন—একটু চুপ করে থেকে বললে, বর্ষার ব্রহ্মপুত্রের ডাক শুনেছ কখনো? পাহাড় ভেঙে নেমে আসে, বড় বড় গাছগুলিকে স্রোতের টানে কুটোর মতো ভাসিয়ে নেয়, দূরের পাহাড়ে বুনো হাতি গর্জে গর্জে ওঠে, তখন নাগাদের ঢাকের আওয়াজ—

বলতে বলতে হতাশভাবে চুপ করে গেল করুণা : কী জানি।

কিন্তু ওই ঢাকের কথায় আর একটা স্মৃতি জেগে উঠল আমার মনে। মানভুমা দুধারে কুসুম গাছের সারি আর ঘন বাঁশের বন—তারই ভেতর দিয়ে নির্জন পথ বেয়ে চলেছি। অন্ধকার হয়ে এসেছে— ঝালদার পাহাড় দূরে ভুতুড়ে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে। পাশের একটা দীঘিতে পানডুবকীর কলধ্বনি, ঝিঁঝির ডাক।

হঠাৎ পান-ডুবকী আর ঝিঁঝির ডাক ছাপিয়ে গুরু গুরু করে উঠল নাগরার আওয়াজ। এদিক থেকে ওদিক, এ দিগন্ত থেকে ও দিগন্ত। কী একটা পরব ওদের—গ্রামে শুরু হল ছৌ নাচের পালা।

সেই অস্পষ্ট অন্ধকার—কালো হয়ে আসা কুসুমগাছ আর বাঁশবন, ঝালদার পাহাড়ের ভুতুড়ে ছবি আর ওই নাগরার আওয়াজে হৃৎপিণ্ড আমার চমকে চমকে উঠেছিল। মনে পড়েছিল, পুলিশের বুলেটের সং। লড়বার আগের দিন রাত্রে বিয়াল্লিশের আগস্টে, বালুরঘাটের অন্ধকার সাঁওতালি গ্রামগুলো থেকে অমনি ভাবেই নাগরা-টিকারা রোল আমি শুনেছিলুম।

বর্বার ব্রহ্মপুত্র, নাগাদের ঢাক, নাগরা-টিকারার আওয়াজ, ছৌ-নাচের বাজনা—এদের সং। কোথায় এই রেকর্ডটার মিল আছে? মিলছে না—অথচ কোথায় যেন মিলছে। কিছুতেই মনে আনতে পারছি না —অথচ ঠিক মনে আছেহ্ব কী যে খারাপ লাগতে লাগলহ্ব

একটা অচেনা অজানা পুরানো রেকর্ড কিনে আচ্ছা জ্বালা হল তোহ্ব

এর মধ্যে একদিন করুণার এক সহপাঠিনী এসে হাজির।

শহরের ওপরতলার বাসিন্দা—নিতান্তই একদা করুণার সং। গভীর সখীত্ব ছিল বলে আমাদের এই হরিজন পাড়ায় পা দিয়েছেন। মহিলাটি বিদুষী গুণবতী। ওয়েষ্টার্ণ মিউজিক শেখবার জন্যে ইউরোপে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে গানের ওপর ডক্টরেট নিয়ে ফিরে এসেছেন। বরমাল্য দিয়েছেন এক মারাঠী এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে।

করুণা দারুণ খুশি হয়ে বললে, আইভি এসেছিস, খুব ভালো হয়েছে। আমাদের এই পাজল্‌টার একটার সলিউশন খুঁজে দে।

রেকর্ডখানা দেখে কপাল কোঁচকালেন আইভি।

—কোনো শ্লাভ ভাষা মনে হচ্ছে। বাজা তো।

বাজানো হল। আইভও বিশেষ কিছু বুঝতে পারলেন না। শঁপ্যা ভাগনার-বাখ-বীটোফেনের সং। পরিচয় আছে—তার ওপরে ছোট-খাট একটা বক্তৃতা অকারণেই শোনালেন আমাদের। কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না।

শেষে ব্যাগ খুলে একটা টফি খেলেন। তার সেলোফোনের মোড়কটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললেন, কোনো কমিউনিটি সং বলে মনে হচ্ছে।

করুণা বললে, সে তো বোঝাই যায়। অনেকে মিলেই গাইছে যখন।

টফির মোড়কটাকে একটা আংটির মতো জড়ালেন আইভি। বললেন নাউ আই রিমেম্বারড। সুইৎসারল্যাণ্ডের ম্যারেজ ফেষ্টিভ্যালে এমনি গান আমি যেন শুনেছিলাম।

ম্যারেজ ফেষ্টিভ্যালহ্ব করুণা আমার দিকে তাকালো একবার। চোখে চোখে মিলল। উত্তরটা কারোই মনঃপূত হয়নি।

করুণা বলতে যাচ্ছিল ঃ ঠিক বিয়ের সুরের মতো মনে হচ্ছে কি? তা ছাড়া সুইস্‌রা তো শ্লাভ্‌ বলে—

আইভি আর সময় দিলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ চলি ভাই। নিউএম্পায়ারে একটা শো আছে তার রিহার্সাল করতে হবে। তা ছাড়া অনেকক্ষণ এসেছি—ন্যান্সি ইজ্‌ ফিলিং ভেরি লোন্‌লি। এ পুওর লিট্‌ল থিং শী ইজ্‌।

ন্যান্সি তাঁর দুহিতা নয়—কুকুর।

ওঁর মোটরটা চলে যেতে করুণা বললে, চালিয়াৎহ্ব

আমি হাসলুম—জবাব দিলুম না। করুণা গজগজ করতে লাগল ঃ ইউরোপে গাছের তলায় ডক্টরেটের ডিপ্লোমা বিক্রী হয় শুনেছি। পাঁচ শিলিং কি সাত ফ্রাঙ্ক দিলে—

করুণা ডক্টরেট নয়, অতএব এ স্বাভাবিক ঈর্ষা। আসল কথা, শ্রীযুক্ত আইভিও আমাদের নিরাশ করলেন। আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রয়ে গেলুম।

সেদিন মাঝ রাতে আমার ঘুম ভাঙল।

জল খেতে উঠেছি—কানে এল বাঘের ডাক। রাত দেড়টার ঘুমন্ত কলকাতার উপর দিয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে একটা গভীর ধ্বনি বয়ে যেতে লাগল। আর্ত অথচ ভয়ঙ্কর, ক্লান্ত অথচ ক্রুদ্ধ। মুখের কাছে জলের গ্লাসটা তুলে আমি নামিয়ে ফেললুম।

বাঘ ডাকছে।

আমাদের বাড়ী থেকে একটা সরলরেখা টানলে দুটো বড় রাস্তার ওপারে সোজা মার্কাস স্কোয়ার। একটা সার্কাসের দল দিন কয়েক হল তাঁবু ফেলেছে সেখানে। সেখানে থেকেই আসছে বাঘের ডাক।

কলকাতার এই অনিদ্র আলো-জ্বলা রাত্রে বাঘটা হয়তো সুন্দরবনের স্বপ্ন দেখছে। তাই চমকে জেগে উঠেছে ও-ভাবে।

কিন্তু কেন জানি না—আমার ওই বিদেশী রেকর্ডটাকে মনে পড়ল। মিল আছে—ওর সঙ্গেও মিল আছে। অথচ কিছুতেই ধরতে পারছি না—কিছুতেই না।

জানালার কাছে এসে দাঁড়ালুম। সামনের কয়েকটা পাম গাছ—তাদের মাথার ওপরে রাত্রির তারা—কয়েক টুকরো মেঘ, সব যেন বাঘের ডাকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বারবার।

শেষ পর্যন্ত সমাধান করলেন এক ভূ-পর্যটক।

রেকর্ডটা শুনে চমকে উঠলেন। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পেলেন?

—চোরা বাজারে।

—আশ্চর্য।

—কেন?

—এ কলকাতায় এল কী করে তাই ভাবছি। এ রেকর্ড গোপনে তৈরী হয়েছিল—গোপনে বিক্রি আর বিলি হয়েছিল সামান্য সংখ্যায়। কিন্তু এদের প্রত্যেকটি শিল্পীই নাৎসীদের রাইফেলের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে।

মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকালো আমার। জ্বলজ্বল করে উঠল করুণার চোখ।

—খুলে বলুন।

—ইউরোপের একটা ছোট দেশের নাম করলেন পর্যটক। নাৎসী অধিকারের সময় এই রেকর্ডটি ছিল সেখানকার মুক্তিযোদ্ধাদের গান। হিটলারের গোয়েন্দারা দাবি করেছিল, এই প্রত্যেকটি কপি, এর অরিজিনাল—এর প্রত্যেকটি শিল্পীকে তারা লিকুইডেট করেছে। অথচ এই রেকর্ড পাওয়া গেল কলকাতার বাজারে।

পর্যটক থামলেন।

রাস্তা দিয়ে গর্জিত একটি ছাত্র-শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। আমরা তিনজনেই কান পেতে শুনলুম কিছুক্ষণ। কয়েক মিনিটের স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল ঘরে।

পর্যটক আবার বললেন, একটা অত্যন্ত দামী জিনিস পেয়েছেন আপনি। জানি না, যুদ্ধের পর ওরা এই রেকর্ডটাকে আবার চালু করতে পেরেছে কিনা। যদি না পেরে থাকে—

ছাত্র-শোভাযাত্রার দূর-ধ্বনিটা হঠাৎ বন্যার মতো প্রবল বেগে ভেঙে পড়ল। দুম দুম করে আওয়াজ উঠল কয়েকটা। তারপর পথ দিয়ে চিৎকার করতে করতে কে বলে গেল : লাঠি চলছে—টিয়ার গ্যাস ছুড়ছে—

আবার স্তব্ধতা নামল ঘরে।

দূরে শুনছি প্রাণের বন্যা ক্রোধের ঝোড়ো গর্জন। না—এখন আর সুরটাকে চিনতে বাকী নেই। ব্রহ্মপুত্রের বর্ষা মাদল, নাগা পাহাড়ের ঢাক, ছৌ-নাচের নাগরা—বালুরঘাটের রাত্রি কাঁপানো টিকারার আওয়াজ—মার্কাস স্কোয়ার থেকে বাঘের ডাক, আর—আজকের এই ঘা খাওয়া মিছিল, সব একসঙ্গে মিলে ওই সুরটাকে সৃষ্টি করেছে। দেশে দেশে, কালে কালে এ সুর এক। জানতুম, আমরাও এ সুরকে জানতুম। ঘুমন্ত রক্তের মধ্যে তলিয়ে ছিল বলেই এতদিন চিনতে পারিনি।

করুণা আমার দিকে তাকালো। দু-চোখে অসহ্য ঘৃণা জ্বলছে ওর। আস্তে আস্তে বললে, এ রেকর্ডকে কেউ ভেঙে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। কেউ পারবে না।

বানান অপরিবর্তিত

১৮.২ জীবনকথা ও সাহিত্য-পরিচয়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে, আসল নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশ করেন। কবিতা, গান, নাটক—সবরকম রচনাতেই তাঁর উৎসাহ ছিল কিশোর বয়সে। জন্মস্থান ফরিদপুরে বসেই তিনি প্রথম গল্প লেখেন, গল্পের নাম 'নিশীথের মায়া'। গল্পটি প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায়, ক্রমে ক্রমে তিনি হয়ে ওঠেন কথাসাহিত্যিক।

কথাসাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন চল্লিশের দশকে। চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দুর্দশা, মূল্যবোধের বিনষ্টি তাঁর গল্প-উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে। 'নক্রচরিত', 'বীতংস', 'দুঃশাসন', 'পুষ্করা'— প্রভৃতি গল্পে সেই পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।

তারাশঙ্করের মতোই সমাজপরিবেশ চিত্রণের প্রতি ঝোঁক ছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। তবে তাঁর জীবন জিজ্ঞাসা, জীবন-অভিজ্ঞতা রূপায়ণের শিল্প-দক্ষতা তাঁকে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক করে তুলেছে।

বহুবিচিত্র মানুষ ও বহুবিচিত্র পটভূমি পরিলক্ষিত হয় তাঁর গল্পে। আসামের চা-বাগান, শুক্লা চতুর্দশী রাতে অভিশাপগ্রস্ত গ্রাম, সাঁওতাল পরগণার বনজঙ্গল,—এরকম পটভূমি যেমন তাঁর গল্পে আছে তেমনি আছে সুন্দরলালের মতো আড়কাঠি ('বীতংস'), নিশিকান্তর মতো আড়তদার ('নক্রচরিত'), বঙ্গনারীর বস্ত্রহরণকারী দুঃশাসন দেবীদাস ('দুঃশাসন')—এরকম মানুষজনেরা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন মার্কসীয় চেতনায় বিশ্বাসী। অবশ্য তিনি দীক্ষিত মার্কসবাদী ছিলেন না। তবে তাঁর গল্প-উপন্যাস যেভাবে শ্রেণিবদ্ধ স্পষ্ট চেহারা নিয়েছে তা এজাতীয় রাজনৈতিক বিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করে। 'প্রগতি লেখক সংঘ'-র সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

আলোচ্য 'রেকর্ড' গল্পটি 'শুভক্ষণ' গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। গল্পগ্রন্থটির প্রকাশকাল ১ জুলাই ১৯৬০, প্রকাশক—সুরভি প্রকাশনী, কলকাতা।

১৮.৩ গল্প-বিবরণ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রেকর্ড' গল্পটির আয়োজনে ফুটে ওঠে মধ্যবিত্ত পরিবারজীবনের চেনা আদল, অথচ

পারিবারিক জীবনের, টানাপোড়েনের কাহিনি পরিবেশিত হয় না গল্পটিতে। 'ছোট ছোট দুঃখ-কথা' নয়, বৃহৎ দুঃখ-কথা থেকে উৎসারিত ছোট প্রাণের মহৎ উপলব্ধিকে এখানে ধরবার চেষ্টা আছে। কিন্তু এই বৃহৎ দুঃখ-কথা সরাসরি বর্ণিত হয় না গল্পটিতে, একটি পুরনো রেকর্ডের অচেনা সুর পৌঁছে দেয় এই মহৎ উপলব্ধিতে।

গল্পটি পরিবেশিত হয়েছে উত্তমপুরুষের জবানিতে। গল্পের কথক একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ফলে কথকের ফাঁকে পাঠকের মনে উঁকি মারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখ। যদিও গল্পটির আত্মজৈবনিক উপাদান অনুসন্ধানের বা আত্মজীবনীমূলক কিনা—এ জাতীয় কোনও জিজ্ঞাসা জাগ্রত হবার অবকাশ সৃষ্টি হয় না। এই গল্পের কথক-চরিত্রের এবং করুণা-চরিত্রের অন্তিম অনুভব যে-কোনো শিক্ষিত সমাজ-সচেতন ব্যক্তির অনুভব।

গল্পের কথক বাজারে গিয়েছিলেন একটি বুক কেস কেনার জন্য। কিন্তু বুক-কেস কেনা হয় না। পুরনো রেকর্ডের দোকানে দুর্লভ রেকর্ড সংগ্রহের আগ্রহে দাঁড়িয়ে পড়েন। এবং সেখানে একটি 'অচেনা লেবেল, অচেনা ভাষা'র রেকর্ড দেখে আকর্ষণ বোধ করাতে দোকানদারকে রেকর্ডটি বাজাতে অনুরোধ করেন। রেকর্ডটি বাজালে চোঙওলা-গ্রামাফোন থেকে প্রথমে একরকম অদ্ভুত বাজনা ছড়িয়ে পড়ে, তারপর শোনা যায় চার-পাঁচটি নারী-পুরুষ কণ্ঠের অদ্ভুত সুরে পরিবেশিত সম্মিলিত গান। এ-সুর কথকের অচেনা, অথচ তাঁর মনে হয় এই সুর কোথাও যেন তিনি শুনেছিলেন। বারো আনা পয়সা দিয়ে রেকর্ডটি কিনে তিনি বাড়ি ফেরেন।

বাড়িতে রেকর্ডটি চালালে অধ্যাপকের স্ত্রী করুণা, যিনি নিজেও একটি কলেজের অধ্যাপিকা, প্রথমে বিরক্তি প্রকাশ করেন। কলেজের ছাত্রীদের পড়ানোর জন্য পাঠ-প্রস্তুতে ব্যাঘাত ঘটাতেই তাঁর এই বিরক্তি। কিন্তু গানটি শোনার পর তাঁর মনও আনমনা হয়ে যায়। তিনিও মনে করেন—'ভারী আশ্চর্য লাগল সুরটা। মনে হল কবে যেন কোথায় শুনেছি।' অধ্যাপিকা আর পড়াতে মনোনিবেশ করতে পারেন না, অধ্যাপক নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা দেখাতে মন দিতে পারেন না, কেবল মনে হয় 'কোথায় শুনেছি—কবে শুনেছি। কিন্তু কিছুতে[illegible] ধরা যাচ্ছে না।'

সারা সন্ধ্যা তাঁদের মন আচ্ছন্ন করে রাখে ওই রেকর্ডের অচেনা সুর। রাত[illegible] খাবার টেবিলে কর[illegible] জানান যে তিনি এ-গানের সুর চিনতে পেরেছেন। ছে[illegible]বেলায় আসামে বসবাসকালে খা[illegible] এরকম গান তিনি শুনেছিলেন বলে তাঁর মনে হয়। অ[illegible]কের 'খাসিয়াদের গান?'— এই পা[illegible]নাচের স[illegible] খা[illegible] বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং মত পরিবর্তন করেন। [illegible]র ব্রহ্মপুত্রের পাহাড় ভেঙে নেমে আসা [illegible] গর্জ[illegible]নো হাতির ডাক, নাগাদের ঢাকের আওয়াজ—এরই মিলিত-মিশ্রিত সুর মনে হয়। অবশ্য এই মধ্যে [illegible]চয়তা নেই, তাই করুণা বলতে বলতে থেমে যান, হতাশভাবে বলেন—'কী জানি।'

ব[illegible] স্মৃতিলোক অন্বেষণ এবং সেই সূত্রে নাগাদের ঢাকের আওয়াজের কথা আলোড়িত করে অ[illegible] স্মৃতি[illegible] তাঁর মনে পড়ে যায় মানভূমের ঝালদা অঞ্চলে দূর থেকে শোনা নাগরার আওয়াজ উপল[illegible]ুর পালায় বাজানো হচ্ছিল এই নাগরা। আবার নাগরার আওয়াজ শোনার সময় ম[illegible] মনে [illegible]লিশের আগস্ট আন্দোলন শুরু হবার আগের দিন রাত্রিবেলায় বালুরঘাটে শোন[illegible] গ্রামে [illegible]র রোল। অধ্যাপকের মন এই সকল সুরের সঙ্গে রেকর্ডের সুরকে মেলাতে সম্পূর্ণ[illegible]রে অস্থিরতায় ভোগেন।

স্বামী[illegible] হওয়া এই অস্থিরতা নিরসনের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয় করুণার একক[illegible] আইডিয়[illegible]ট ওয়েস্টার্ন মিউজিকে ডক্টরেট অর্জন করেছেন ফলে করুণা ভাবে[illegible]

সহজেই সমস্যাটির সমাধান করতে পারবেন। কিন্তু আইভি ব্যর্থ হন। তিনি জানান—'সুইৎসারল্যাণ্ডের ম্যারেজ ফেস্টিভ্যালে এমনি গান আমি যেন শুনেছিলুম।' আইভির 'যেন'-যুক্ত উত্তর করুণার মনঃপূত হয় না। তিনি এই গানকে বিয়ের গান হিসাবে ভাবতে পারেন না।

এরপর একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে গল্পের কথক অধ্যাপক শোনেন বাঘের ডাক। এই ডাক 'আর্ত অথচ ভয়ঙ্কর, ক্লান্ত অথচ ক্রুদ্ধ'। কলকাতায় হঠাৎ বাঘের গর্জন শোনার কারণ সার্কাস-দলের তাঁবু ফেলা। বাঘের গর্জনও কথককে মনে পড়িয়ে দিয়েছে বিদেশি রেকর্ডটিকে ('কেন জানি না—আমার ওই বিদেশী রেকর্ডটাকে মনে পড়ল।')।

বিদেশি রেকর্ডটির সংগীতের মর্মোদ্ধার করেন ভূ-পর্যটক। রেকর্ডটি শুনে তিনি প্রথমে চমকে ওঠেন। ভেবে পান না কীভাবে এই রেকর্ডটি অধ্যাপকের হস্তগত হল। তিনি অধ্যাপককে জানান যে নাৎসি-বাহিনীর অত্যাচারের সময় এই রেকর্ডটি তৈরি হয়েছিল ইউরোপের একটি দেশের মুক্তিযোদ্ধার গান হিসাবে। এই রেকর্ড যেমন অত্যন্ত গোপনে তৈরি করা হয়েছিল, তেমনই গোপনে বিলিও হয়েছিল। পরিবেশিত এই সংগীতের প্রত্যেক শিল্পীই প্রাণ হারিয়েছেন নাৎসি-বাহিনীর রাইফেলের গুলিতে। হিটলার-এর গোয়েন্দারা দাবি করেছিল যে রেকর্ডটির প্রতিটি কপিই তারা নষ্ট করে ফেলেছে। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই রেকর্ডটিই এসে পৌঁছেছে কলকাতায়।

অধ্যাপক এবং তাঁর অধ্যাপিকা স্ত্রী পর্যটকের রেকর্ডটি সম্পর্কে পরিবেশিত বিবরণ মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করেছেন। পর্যটকের বিবরণদানের মাঝখানেই শোনা গেছে রাস্তার ছাত্র শোভাযাত্রার গর্জন। পথচারীর ভেসে আসা টুকরো সংলাপে জানা গেছে লাঠি চালনা ও টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ার কথা।

পর্যটকের বিদেশি রেকর্ডটিতে পরিবেশিত সংগীত সম্পর্কে তথ্য প্রদান এবং সেইসঙ্গে ছাত্র শোভাযাত্রা— গল্পের কথক (অধ্যাপক)-কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়। বিদেশি রেকর্ডটির সংগীতের সুরটি অচেনা মনে না হওয়ার কারণ তিনি আবিষ্কার করে ফেলেন। লেখক চরিত্রটির জবানিতে জানিয়েছেন—'না—এখন আর সুরটাকে চিনতে বাকী নেই। ব্রহ্মপুত্রের বর্ষামাদল, নাগা পাহাড়ের ঢাক, ছৌ-নাচের নাগরা—বালুরঘাটের রাত্রি কাঁপানো টিকারার আওয়াজ—মার্কাস স্কোয়ার থেকে বাঘের ডাক, আর—আর আজকের এই ঘা-খাওয়া মিছিল, সব একসঙ্গে মিলে ওই সুরটাকে সৃষ্টি করেছে। দেশে দেশে, কালে কালে এ সুর এক।' অধ্যাপকের স্ত্রী করুণার সংলাপে গল্প শেষ হয়। করুণার অনুভব—'এ রেকর্ডকে কেউ ভেঙে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। কেউ পারবে না।'

১৮.৪ সংকেত ব্যাখ্যা

শিল্পের লক্ষ্য সর্বজনীন হয়ে ওঠা, সে অতিক্রম করতে চায় দেশ-কালের সীমিত গণ্ডি। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা অনেক; যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার ভাষা-মাধ্যম। কিন্তু ছবি ও গান—এমন দুটি শিল্প-কর্ম যেখানে নেই মাধ্যমের প্রতিবন্ধকতা। ছবির নির্দিষ্ট কোনও ভাষা নেই, যে কোনো দেশের চিত্রবোদ্ধা ছবি দেখে বুঝে নিতে পারেন চিত্রকরের শিল্প-অভিপ্রায়। গানে কথা থাকে বটে, কিন্তু গানের সুর ভাষা-নির্ভর নয়; প্রকৃত সংগীত রসিকের মনে সুরের দোলা দিতে পারে, ভাষা সেখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। গল্পটির কথক এবং তাঁর স্ত্রী জানতেন না রেকর্ডটিতে পরিবেশিত গানের ভাষা, সুরটিও ছিল তাঁদের অচেনা। অথচ এই সুর তাঁদের রক্তে দোলা দিয়ে যায়, বারেবারেই মনে হয়, এই সুর তাঁদের বড় চেনা। মুক্তিযোদ্ধার গানের সুরকে তাঁরা কখনও মনে করেন বর্ষা-মাদল, কখনও নাগা পাহাড়ের ঢাক, কখনও বাঘের গর্জন এবং

শেষ পর্যন্ত কথক পৌঁছান এই উপলব্ধিতে—'দেশে দেশে, কালে কালে এ সুর এক।' সুরের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক যে দেশ-কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায় এ সত্য এখানে প্রতিষ্ঠা পায়।

কিন্তু সুরের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক দেশ-কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে—এরকম কোনও তত্ত্বকে প্রতিপাদনই গল্পটির লক্ষ্য নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের গান, হিটলার-এর নাৎসিবাহিনীরকথা, সংগীতশিল্পীদের রাইফেলের গুলিতে প্রাণদান—রেকর্ডটির এই নেপথ্যকাহিনি ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের মুখোমুখি করে দেয় পাঠকদের। গল্পটিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গিয়ে দেখা যায় এটি কেবল কোনো তত্ত্ব-পরিচয়বাহী গল্প নয়। অত্যাচারী হিটলার-এর প্রাণঘাতী রূপটি দেশ ছাড়িয়ে সময় পেরিয়ে কলকাতার এক অধ্যাপক-অধ্যাপিকার বসার ঘরে স্পষ্ট চেহারা নিয়ে নেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পাওয়া গানের শিল্পীদের করুণ পরিণতি স্পর্শ করে পাঠকের হৃদয়কেও। এই বাস্তব জীবন-চেতনাকে আশ্রয় করে আছে বলেই গল্পটি হয়ে উঠেছে বৃহৎ দুঃখ-কথার মহৎ শিল্পরূপ। দেশে দেশে এবং কালে কালে গানের মধ্যে ধরা থাকে জীবনেরই বিচিত্র পরিচয়, তাই মনে হয় বড় চেনা এই সুর। কিন্তু যে সুরটিকে আশ্রয় করে অধ্যাপকের মন অস্থির হয়ে ওঠে সুরটিকে চেনার জন্য এবং জীবনের নানা অভিজ্ঞতা-উপলব্ধিকে ওই সুরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে সচেষ্ট হন সেই সুরটি গল্পটিকে তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর রক্তমাংসের সজীবতা প্রদান করে।

অধ্যাপকের দোকানে রেকর্ডটি শুনেই মনে হয়েছিল বড় চেনা, তাঁর স্ত্রী শুনে একই মন্তব্য করেন এবং তিনিই প্রথম সুরটিকে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হন। তাঁর প্রথমে মনে হয় আসামে খাসিয়াদের সঙ্গে পরিবেশিত গান এটি। নৃত্যের সঙ্গে যে গান পরিবেশিত হয় তা সাধারণ আনন্দ-সংগীত। কারণ আনন্দের আবেগই মানুষ প্রকাশ করে নৃত্য-চঞ্চলতায়। রেকর্ডটির সমবেত সংগীতের সুরের সঙ্গে খাসিয়াদের নৃত্যের তালে তালে পরিবেশিত সমবেত সংগীতের সুরের সামঞ্জস্য খুঁজে পান করুণা।

কিন্তু তিনি স্থির থাকেন না এই বক্তব্যেই। এরপর তিনি সুরটিকে তুলনা করেন বর্ষার ব্রহ্মপুত্রের গর্জনের সঙ্গে, যখন সে স্রোতের টানে পাহাড় ভেঙে নেমে আসে, বড় বড় গাছগুলিকেও কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। প্রকৃতি যখন বিধ্বংসী চেহারাতে হাজির, যখন সে রেয়াত করে না কোনো বাঁধাকে, তার সেই অমিত শক্তির গর্জনের সঙ্গেই বলেছেন পাহাড়ের বুনো হাতির গর্জন, নাগাদের ঢাকের আওয়াজের কথা, কিন্তু তবুও পারেননি কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে। করুণা প্রকৃতি জগৎ (ব্রহ্মপুত্র), প্রাণিজগৎ (বুনো হাতি) আর মানবজগৎ (নাগাদের ঢাকের আওয়াজ) সর্বত্রই যেন ওই একই সুর শুনতে পান, কিন্তু সঠিক অর্থে চিহ্নিত করতে পারেন না। মেলাতে চাওয়া, আর মেলাতে না-পারা—পুনঃপুনঃ এই আয়োজন সংকটটির উচ্চতা বাড়িয়ে তোলে।

অধ্যাপকের স্মৃতিপটেও নাগাদের ঢাকের আওয়াজের অনুষঙ্গে উদ্ভাসিত হয়েছে নাগরার আওয়াজের সুর। মানভূমের ঝালদা অঞ্চলে গ্রামীণ-উৎসবে ছৌ-নাচের পালাতে বাজানো নাগরার আওয়াজের সঙ্গে রেকর্ডের সুরের মিল আছে বলে মনে হয়েছে অধ্যাপকের। উৎসবের ছৌ-নাচ পালার প্রারম্ভিক নাগরার আওয়াজ আনন্দ ধ্বনিকেই প্রকাশ করে। লক্ষণীয় এও হল সমবেত বা যৌথজীবন থেকে উৎসারিত আনন্দধ্বনি। তবে কেবল আনন্দের সুর নয়, নাগরার অনুষঙ্গে মনে পড়া বালুরঘাটে রাত্রির অন্ধকারে সাঁওতালি গ্রামগুলি থেকে ভেসে আসা নাগরা-টিকারার রোল যেন মনে হয় আসন্ন যুদ্ধের দামামা। কারণ উনিশশো বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে পুলিশের বুলেটের সঙ্গে লড়বার আগের দিন রাত্রিবেলায় তিনি শুনেছিলেন এই নাগরা-টিকারার আওয়াজ। রের্কডের সুরের মধ্যে কথক যেন এখানে আবিষ্কার করেন নিহিত প্রতিবাদী সুর।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে গল্পের কথক কলকাতায় শুনতে পেয়েছেন বাঘের ডাক। এই ডাক 'আর্ত অথচ ভয়ঙ্কর, ক্লান্ত অথচ ক্রুদ্ধ।' সার্কাসের খাঁচায় আবদ্ধ বাঘটির গর্জনে প্রকাশিত হয় তার ক্ষোভ ও নিরুপায়তা। কথক বাঘের গর্জনের সঙ্গেও রেকর্ডের সুরের মিল খুঁজে পান। বাঘের গর্জনের মধ্যে আছে প্রতিবাদ, সে নিজের অসহায় অবস্থায় ক্ষুব্ধ, মুক্তিযোদ্ধাদের গানের সুরের সঙ্গে এইজন্যই সাযুজ্য খুঁজে পান কথক। এখানে সরাসরি বাঘের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধার গানের সুরের সঙ্গে এইজন্যই সাযুজ্য খুঁজে পান কথক। এখানে সরাসরি বাঘের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের বা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পরিবেশিত গানের শিল্পীদের তুলনা টানা হয়নি, তা সম্ভবও ছিল না, কারণ তখনও রেকর্ডে পরিবেশিত সংগীতটির বাণী ও সুর কথকের কাছে অজ্ঞাত, কিন্তু পাঠশেষে পাঠক-প্রতিক্রিয়ায় মনে হয় মুক্তিযোদ্ধাদের বা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পরিবেশিত গানের শিল্পীদের সঙ্গে খাঁচায় আবদ্ধ বাঘের পরোক্ষ তুলনার আয়োজন করেছেন লেখক।

ভূ-পর্যটকের কাছে গল্পের কথক এবং তাঁর স্ত্রী জানতে পারলেন যে রেকর্ডের পরিবেশিত গান আসলে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গাওয়া হয়েছিল। ঠিক এই সময় অর্থাৎ ভূপর্যটকের মুখে বক্তব্যটি শ্রবণ-কালেই বর্ণিত হয়েছে রাস্তায় চলে যাওয়া গর্জিত এক ছাত্র শোভাযাত্রার কথা। এই শোভাযাত্রায় ছাত্রদের সমবেত প্রতিবাদধ্বনির মধ্যে কথক সেই রেকর্ডের সুরটিই অনুভব করেন। শুধু তাই নয়, তিনি বুঝতে পারেন প্রকৃতিজগতে, প্রাণিজগতে, বিশ্ব মানব-সভ্যতার ইতিহাসে প্রতিবাদের ধ্বনি একইরকম। এইজন্যই রেকর্ডের সুরটি তাঁর মনে হয়েছিল এত চেনা। সুর তো জীবন-নিরপেক্ষ সৃজন নয়, সুর জীবন-চেতনারই বিশেষ প্রকাশ। জীবন ও শিল্প যেন একই বিন্দুতে মিলিত হয় এখানে।

গল্পটি অবশ্য শেষ হয়ে যায় না কথকের উপলব্ধিতেই। তাঁর স্ত্রী করুণার উপলব্ধিতেই গল্প শেষ হয়— 'এ রেকর্ডকে কেউ ভেঙে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। কেউ পারবে না।' হিটলার-এর গোয়েন্দারা দাবি জানালেও সমস্ত রেকর্ড বিনষ্ট করতে পারেনি বলেই কলকাতার এক অধ্যাপকের হস্তগত হয় রেকর্ডটি। কিন্তু কেউ পারে না বা পারবে না এই রেকর্ড নিশ্চিহ্ন করতে করুণার এরকম দাবির কারণ কী? প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কখনও যে সম্পূর্ণরূপে রোধ করা যায় না—এই বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে কথাটির মধ্য দিয়ে। ইউরোপের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গাওয়া গানের রেকর্ড তাই শেষ পর্যন্ত কলকাতার এক বাসগৃহে পৌঁছে যায়। শুধু তাই নয়, রাজপথের ছাত্রদের স্পর্ধিত শোভাযাত্রায় মুখরিত প্রতিবাদধ্বনির মধ্যে তো বেঁচে থাকে সেই রেকর্ডের সুরই। ফলে এমনকি আক্ষরিক অর্থে রেকর্ডটি বিনষ্ট করলেও তাকে প্রকৃত অর্থে বিনষ্ট করা যায় না। দেশ ছাড়িয়ে, সময়কাল অতিক্রম করে মানুষের অন্তর্গত রক্তের মধ্যে মিশে যায় রেকর্ডের প্রতিবাদী সুর।

১৮.৫ চরিত্র-চিত্রণ

গল্পটির চরিত্র-আলোচনার জন্য প্রথমেই নির্বাচন করতে হয় অধ্যাপক-চরিত্রটি। গল্পের কথক অধ্যাপক-চরিত্রের ভাবনা থেকেই মূলত উন্মোচিত হয়েছে গল্পটিতে এবং চরিত্রটি অর্জন করেছে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা। অধ্যাপক চোরাবাজারে পা রেখেছিলেন বুককেসের সন্ধানে। অবশ্য বুক কেস কেনা হয় না, কিনে ফেলেন একখানি রেকর্ড। আমরা কথা-প্রসঙ্গে জেনে যাই পুরনো রেকর্ডের দোকানেও তাঁর নিত্য যাতায়াত। এর পিছনে হিন্দিগানের আকর্ষণ নেই, আছে অপ্রাপ্য রবীন্দ্রকণ্ঠ, রাধিকা গোস্বামীর গান, দিলীপকুমারের 'মুঠো মুঠো রাঙা জবা'—ইত্যাদি রেকর্ড-লাভ। প্রথমে বুককেস কেনার উদ্দেশ্যে চোরাবাজারে ঢোকা, তাঁর রেকর্ড সংগ্রহের শখের কথা জানা এবং বিদেশি রেকর্ডটি সংগ্রহ—প্রতিটি পদক্ষেপ চরিত্রটির রুচি এবং স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়।

বউবাজার বা রিপন স্ট্রিটে না গিয়ে চোরাবাজারে অধ্যাপকের বুককেস সন্ধান তাঁর মধ্যবিত্ত স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করে। তবে এই কথক অধ্যাপক ছাপোষা বাঙালি নন, সেইজন্য বুককেস না পেলেও রেকর্ড কিনে তাঁর বাড়ি ফেরা। রুচিশীল মনের পরিচয় এখানে ধরা পড়ে।

অধ্যাপকের কর্ম-জীবনের পরিচয় গল্পটিতে নেই, সে-প্রয়োজনও এখানে ছিল না। তবে সামান্য আঁচড়ে বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেও তাঁর কর্মজীবনের অসামান্য পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কথকের জবানিতে লেখক জানিয়েছেন— 'আমি ও কতগুলো খাতা টেনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের সংখ্যা বাড়াতে বসে গেলুম।' কেবল অধ্যাপকের পরীক্ষার খাতা দেখার কাজটি তুলে ধরা নয়, সেইসঙ্গে পরীক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি সামান্য কটাক্ষও এখানে প্রকাশ পায়।

অধ্যাপকের মনকে আলোড়িত করেছে রেকর্ডটির অচেনা সুরের সংগীত। সংগীত সম্পর্কে আগ্রহ না থাকলে অচেনা সুর তেমন আলোড়িত করতে পারে না কোনো ব্যক্তিকে। এই কথক অধ্যাপক ভারতীয় সংগীত অনুরাগী (রবীন্দ্রকণ্ঠ, রাধিকা গোস্বামীর গান, দিলীপকুমারের রেকর্ড সংগ্রহ নমুনা), সেই সঙ্গে বিদেশি সংগীতের প্রতিও আছে তাঁর অনুরাগ ('নানা ঢঙের বিদেশি ছবি দেখেছি—রেকর্ড শুনেছি অনেক')। আর তাই রেকর্ডের অচেনা সুর তাঁর মনে দোলা দেয়।

রেকর্ডের অচেনা সুরটি চিনবার প্রয়াসে কথক প্রাত্যহিক জগৎ ও জীবন থেকে দূরে এবং স্মৃতিলোকে অন্বেষণ চালিয়েছেন। ছৌ-নাচের নাগারা এবং সাঁওতালি গ্রামের নাগারা-টিকারার আওয়াজের সঙ্গে তিনি এর মিল খুঁজে পেয়েছেন। আবার কলকাতায় মধ্যরাতে বাঘের গর্জনে তাঁর মনে পড়ে যায় রেকর্ডটির কথা। লক্ষণীয় এখানে অতীতের শোনা কোনো সুরের সঙ্গে কথক মিল খোঁজেন না, কিন্তু রাত্রিকালে কলকাতায় বাঘের গর্জন প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, এখনও অচেনা সুরটি প্রতিদিনকার চেনা জগতের হয়ে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত কলকাতার রাজপথে ছাত্রদের স্পর্ধিত শোভাযাত্রায় আকাশ-বাতাস মুখরিত প্রতিবাদ-ধ্বনির মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেন অচেনা সুরটি। এখানে সুরটি বর্তমান কালকে এবং প্রাত্যহিক জীবনকে স্পর্শ করে। একটি অচেনা সুরকে চিনবার প্রয়াসের ক্রমটি এইভাবে সজ্জিত করার ফলে চরিত্রটির চিন্তনের প্রক্রিয়াটি স্পষ্ট হয়েছে, চরিত্রটি অর্জন করে বিশ্বাসযোগ্যতা। 'দেশে দেশে, কালে কালে এ-সুর এক'।—চরিত্রটির এই উপলব্ধি তখন আর আরোপিত মনে হয় না, মনে হয় স্বাভাবিক।

করুণা—কথকের স্ত্রী, পেশায় একজন অধ্যাপিকা। স্বামীর মতোই তিনিও যে রুচিশীলা তা তাঁর সামান্য পরিচয়ে বোঝা যায়। রেকর্ডরে গানটি শুনে তাঁরও যেমন মনে হয় চেনা, তেমনি মনে জন্ম নেয় অস্থিরতা। এইজন্যই পড়াতে তিনি মনোনিবেশ করতে পারেন না। গল্পটি কথকের ভাবনাকে আশ্রয় করে রচিত, তাই এই চরিত্রটি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবার অবকাশ এখানে নেই, তবুও এই চরিত্রটিও যে সারা গল্প জুড়ে অলক্ষ্যে অচেনা সুরটিকে ঘিরে অস্থিরতা অনুভব করেছে তা বোঝা যায় গল্পের সমাপ্তি অংশ পড়লেই। আবার মনে রাখতে হয় গল্পটিতে রেকর্ডে অচেনা সুরটি প্রথম চিহ্নিত করতে চেয়েছেন করুণাই, পরোক্ষে কথকের স্মৃতিলোকও উসকে দিয়েছেন তিনি। বাড়িতে তাঁর এককালের সহাপঠিনী আইভির হঠাৎ আগমনে করুণার মনে হয়েছে সমস্যাটির সমাধান হতে পারে। আইভি এই গানকে ম্যারেজ ফেস্টিভ্যালের গান বলতে চাইলে তিনি মেনে নিতে পারেন না। মৃদু প্রতিবাদও জানান বন্ধুকে। আইভি চলে যাওয়ার পর তাঁর বিদেশি ডিগ্রি নিয়ে কটাক্ষও করেন। কথক রসিকতাচ্ছলে বলেন বটে—'করুণা ডক্টরেট নয়, অতএব এ স্বাভাবিক ঈর্ষা। কিন্তু আমাদের মনে হয় করুণার এই কটাক্ষ উঠে এসেছে আইভি মারফতও সুরটি চিনতে না-পারার অস্থিরতা থেকেই।

গল্পটির শেষ বাক্য উচ্চারিত হয়েছে করুণার জবানিতে— এ রেকর্ডকে কেউ ভেঙে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনিঙ্গ কেউ পারবে না।' এই অন্তিম-সংলাপটির চরিত্রটির যেমন স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের তেমনি গল্পে চরিত্রটির প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। লেখক কথক-চরিত্রের উপলব্ধিতেই গল্পটি শেষ করতে পারতেন। কিন্তু লেখক কথক-চরিত্রের মধ্য দিয়েই লেখকের বলবার কাজটি সমাপ্ত হয়নি। গল্পে এইজন্যই করুণার উপরিউক্ত জবানি সংযোজনের প্রয়োজন পড়ে।

গল্পটি প্রত্যক্ষত কথক-চরিত্রের ভাবনাশ্রয়ী বটে, কিন্তু অলক্ষ্যে কি চলছিল না করুণা-চরিত্রেরও ভাবনার বয়ন-কর্ম? রেকর্ডের অচেনা সুরটি প্রথম যেদিন চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন আর ভূ-পর্যটক যেদিন জানালেন এই রেকর্ডটিতে পরিবেশিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে নিবেদিত গান—এই মধ্যবর্তী সময়কালে নিশ্চিতভাবে আলোড়িত করেছে করুণাকেও। এইজন্যই ভূ-পর্যটকের কথা শুনে যেমন কথকের মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকায় ('মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকালো আমার।') তেমনি 'জ্বল জ্বল করে উঠল করুণার চোখ।' আবার গল্পে উচ্চারিত অন্তিম-সংলাপের আগে করুণার মুখের ভাবটিও স্মরণযোগ্য—'দু'চোখে অসহ্য ঘৃণা জ্বলছে ওর।' 'দেশে দেশে, কালে কালে এ-সুর এক।'—অধ্যাপকের এই সিদ্ধান্ত তাঁর চরিত্রের ভাবনা-ক্রমের পক্ষে যথোপযুক্ত। ঠিক এরপরেই আর তিনি উচ্চারণ করতে পারেন না করুণার জবানিতে বলা কথাগুলো। কিন্তু করুণার মন যেভাবে রেকর্ডটির সুরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, যার ফলে তাঁর দু-চোখ যেমন ঘৃণাতে জ্বলে ওঠে তেমনই তাঁর সংলাপের মধ্যে প্রকাশিত হয় প্রতিবাদীসত্তার আবেগ। গল্পের কথক-চরিত্রের সঙ্গে করুণা-চরিত্রের মাত্রা-পার্থক্য লেখক তৈরি করেন এইভাবেই।

আইভি এবং ভূ-পর্যটক—এই দুটি চরিত্র গল্পটির অপ্রধান চরিত্র, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় নয়। দুটি চরিত্রই এসেছে রেকর্ড-রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনেই। আইভি ব্যর্থ হয়েছেন, আর ভূ-পর্যটকের দ্বারাই উধ্‌ঘাটিত হয়েছে রেকর্ডের সুর। আইভির ব্যর্থতা আর ভূ-পর্যটকের সাফল্য সমান গুরুত্বপূর্ণ গল্পটিতে। আইভি ওয়েস্টার্ন মিউজিকে ইউরোপে অর্জন করেছেন ডক্টরেট ডিগ্রি। কিন্তু তিনি চিনতে পারেন না রেকর্ড পরিবেশিত সুরটি। তাঁর না-চেনাটি অস্বাভাবিক নয়, কারণ যে রেকর্ড আসলে ইউরোপের একটি দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের গান এবং গোপনে তৈরি হয়ে গোপনে বিক্রি আর বিলি হয়ে যায়, ওয়েস্টার্ন মিউজিকে ডক্টরেট করলেই তা জানা যাবে এমন বলা যায় না। কিন্তু চরিত্রটির পাশ্চাত্য সংগীত-সম্পর্কিত ধারণা কত অস্বচ্ছ তা প্রমাণিত হয় তখন তিনি বলেন—'নাউ আই রিমেম্বার। সুহৃৎসারল্যাণ্ডের ম্যারেজ ফেস্টিভ্যালে এমনি গান আমি যেন শুনেছিলুম।' গল্পের কথক বা করুণার মতো গানটি শুনে আইভির মন আন্দোলিত হয় না। অর্থাৎ মিউজিকে ডক্টরেট তিনি, কিন্তু এই সুর তাঁর প্রাণকে স্পর্শ করে না। আইভি ব্যস্ততার অজুহাতে এই পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি চান। তাই নিউ এম্পায়ারে শো-এর রিহার্সাল, আর পোষা কুকুর ন্যান্সির একাকিত্বের দোহাই দিয়ে তিনি উঠে পড়েন। শ্রীযুক্তা আইভি চরিত্র-চিত্রণে লেখক লঘু পরিহাস করেছেন এবং সেই সঙ্গে বুঝিয়েছেন পুথিগত বিদ্যার অন্তঃসারশূন্যতা।

ভূ-পর্যটক চরিত্রটির স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। রেকর্ড-রহস্য উদ্‌ঘাটনেই গল্পে চরিত্রটি সংযোজিত হয়েছে। এমনকি প্রয়োজন নেই ভেবেই চরিত্রটির কোনো নাম দেননি। কেবল একটি কথা বলা যায়, আইভি সংগীতে ডক্টরেট হয়েও যে সুর চিনতে পারেননি, একজন ভূ-পর্যটক তা চিনতে পারেন তাঁর অভিজ্ঞতার কারণেই। পুথিগত বিদ্যার চেয়ে অভিজ্ঞতা-অর্জিত শিক্ষা যে অনেক ক্ষেত্রেই বেশি কার্যকর তা প্রমাণিত হয় এভাবেই।

১৮.৬ শিল্পরীতি

'রেকর্ড' গল্পটির শিল্পরীতির আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে গল্পটি আত্মকথনমূলক-রীতিতে রচিত। আত্মকথন-রীতি যেমন একটি গল্প উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও যথোপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে তেমনই কোনো কোনো ক্ষেত্রে সূচিত করে সীমাবদ্ধতা। 'রেকর্ড' গল্পটির এ-জাতীয় উপস্থাপন যথোপযুক্ত বলা যায়। কারণ এই গল্পটিতে কাহিনির প্রাধান্য নেই, আছে উপলব্ধির প্রাধান্য; সেই উপলব্ধি মূলত আবর্তিত হয়েছে একটি চরিত্রকে ঘিরে। ফলে সেই চরিত্রটির জবানিতে গল্প বিবৃত হওয়ায় পাঠকের কাছে আরও বেশি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

তবে ভাবনা বা উপলব্ধি প্রাধান্য পেলেও বহিরঙ্গ বাস্তব জগতের কথা একেবারে উপেক্ষিত হয়নি। উপলব্ধিকে ভাষারূপ দেবার সমান্তরালে প্রাত্যহিক বাস্তব জগতের ধারাবাহিক বর্ণনা উঠে এসেছে গল্পটিতে। আবার কথক চরিত্রের অচেনা সুরটি সম্পর্কে যে একেকটি উপলব্ধি তৈরি হয়েছে তা কোনো-না-কোনো অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে। ফলে উপলব্ধির তরঙ্গটি সৃষ্টি হওয়ার আগে অভিজ্ঞতার বর্ণনা-প্রবাহ পরিলক্ষিত হয় গল্পটিতে। এ-ছাড়াও রেকর্ডের অচেনা সুরের রহস্য-উদ্‌ঘাটনে আগমন ঘটে আইভি এবং ভূপর্যটকের। এই দুটি চরিত্রের আগমনে গল্পটির বর্ণনা প্রাধান্য পায়। গোটা গল্পটিতে লেখক যেন অভিজ্ঞতাযুক্ত বহিরঙ্গ বাস্তব ও উপলব্ধিময় অতলান্ত বাস্তবের বুনোট তৈরি করেছেন গল্পটিতে। এর পর্যায়ক্রমিক পরিচয় তুলে ধরা যেতে পারে।

গল্পটির শুরুতে আছে সেকেণ্ড হ্যান্ড মার্কেট বা চোরাবাজারের সঠিক বর্ণনা। এখনও কথক শোনেননি রেকর্ডের সুরটি। ফলে কোনও একমুখী ভাবনা-তরঙ্গ গল্পটিতে জায়গা করে নেয়নি। রেকর্ডটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম তৈরি হয় ভাবনা-আবর্ত। ঘরে ফিরে রেকর্ডটি চালানো পর্যন্ত গল্পটিতে আবার বহির্বাস্তবের বর্ণনা সংযোজিত হয়, কিন্তু চালানোর পর কথক—'মোটকথা, ওই রেকর্ডখানা আমাদের দু-জনের সন্ধ্যাকেই আচ্ছন্ন করে রাখল।' এরপর সারা গল্প জুড়েই আছে রেকর্ডটিকে ঘিরে আচ্ছন্নতা। বর্ষার ব্রহ্মপুত্র, নাগাদের ঢাক, ছৌ-নাচের বাজনা— পরোক্ষে এবং মধ্যরাতে বাঘের গর্জন, ছাত্রদের স্পর্ধিত শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষে মাঝে মাঝে তৈরি করে কথাবৃত্ত।

গল্পটির শেষ হওয়ার আগে ভূ-পর্যটক পরিবেশন করেছেন রেকর্ডটির সুর-সম্পর্কিত অজানা কাহিনি। খানিকটা সংলাপে, খানিকটা বিবৃতির মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে কাহিনিটি। স্বল্প কথায় উঠে এলেও রেকর্ডটির নেপথ্য-ইতিহাস উত্তমপুরুষে রচিত গল্পটি সীমাবদ্ধ ভাবনালোককে সম্প্রসারিত করে সংযুক্ত করে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটের সঙ্গে।

উত্তমপুরুষের জাবানিতে রচিত হওয়ার জন্য সর্বজ্ঞ-লেখকের দৃষ্টিকোণ গল্পটিতে প্রযুক্ত হয়নি। গল্পটির প্রায় সর্বত্র কথক 'Specified I' কিন্তু কোথাও কোথাও কথক 'Genaralised I' হয়ে দৃষ্টিকোণের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে চাওয়া হয়েছে। যেমন—আইভি প্রসঙ্গ। এখানে কথক বর্ণনাকারী মাত্র অর্থাৎ 'Genaralised I' প্রত্যক্ষত তাঁর ভূমিকা নেই। আবার গল্পটির শুরুতেই আছে সেকেণ্ড হ্যান্ড মার্কেটের বর্ণনা। এই অংশটি একান্তই কথকের দৃষ্টিকোণে উঠে আসেনি। 'আমি গিয়েছিলুম ছোট একটা বুক-কেসের সন্ধানে'—এই বাক্যটি সংযোজনের আগে পর্যন্ত গল্পটি সর্বজ্ঞ-লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকেই বর্ণিত হয়।

গল্পটির মূল কাহিনি অংশ সীমিত সময়-পরিধি ঘিরে আবর্তিত। অবশ্য সময়-পরিধির বিস্তার কতখানি তা

নিশ্চিত-নির্দেশ করা যায় না। এক সন্ধ্যায় রেকর্ডটি নিয়ে আসেন অধ্যাপক, একদিন কিছুক্ষণের জন্য আগমন ঘটে আইভির, আর একদিন আসেন ভূ-পর্যটক। কিন্তু এর মধ্যবর্তী সময়কালে ঠিক কতদিন অতিক্রান্ত হয় জানা যায় না। তবে এই স্বল্প সময়-পরিধির সীমারেখার মধ্যেই সুকৌশলে গল্পটিতে বিস্তৃত সময়কালকে পুরে দেন।

করুণা রেকর্ডের সুরটি চেনার প্রচেষ্টায় তাঁর শৈশবকালকে স্মরণ করেন, খাসিয়াদের নাচ, ব্রহ্মপুত্রের স্রোত, নাগাদের ঢাকের আওয়াজ—ইত্যাদির অনুষঙ্গে গল্পটি স্পর্শ করে ভিন্ন সময়কাল। অধ্যাপক ঝালদা অঞ্চলে শোনা ছৌ-নাচের নাগরার আওয়াজ এবং বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে বালুরঘাটের নাগরা-টিকারার আওয়াজের কথা স্মরণ করে গল্পটির সময়কালের বিস্তার ঘটান। সময়-বিন্যাসের পরিচয় উদ্‌ঘাটনে এক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল—ভূ-পর্যটকের রেকর্ডটির ইতিহাস-কথন। ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সঙ্গে এর ফলে গল্পটির প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়। শুধু তাই নয়, একদিকে অতীতের মুক্তিযোদ্ধাদের কথা, অন্যদিকে বর্তমানে কলকাতার রাজপথে ছাত্রদের শোভাযাত্রা যেন সময়ের নিরন্তর প্রবহমানতাকে প্রকাশ করে।

গল্পটি নর-নারীর সম্পর্কের টানাপোড়েনজাত আবেগ-অনুভবকে প্রকাশ করেনি, অথচ গল্পটি চরিত্রের চিন্তা উপলব্ধির শিল্পরূপ। গল্পটির ভাষা এইজন্য আবেগমিশ্রিত নয়। মনস্তাত্ত্বিক জট-জটিলতা প্রকাশ বিশ্লেষণধর্মীও নয়, অথচ চরিত্রের অন্তরোপলব্ধির বাণীবাহক। এই উপলব্ধি ধরতে চাওয়া হয়েছে গল্পের একটি চরিত্রকে আশ্রয় করেই। সেইজন্য একদিক থেকে দেখতে গেলে গল্পটির বিবৃতি-অংশ কথকেরই বাচন। কথকের রুচি, শিক্ষা, পরিহাস-প্রবণতা, বলবার ভঙ্গি গল্পের বিবৃতি-অংশের ভাষাতে তাই ঢুকে পড়ে। যেমন—'একটা চোঙাওলা গ্রামাফোনে হিন্দী গানের রেকর্ড বাজছিল, সেইটে কানে যেতে আমি দাঁড়িয়ে গেলুম।'—এই বাক্য দিয়ে একটি অনুচ্ছেদ শেষ করেই পরবর্তী অনুচ্ছে শুরু হয়—'হিন্দী গানের আকর্ষণে নয়।' উল্লিখিত অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটি পাঠকের মনে কথক সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি করে, পরবর্তী অনুচ্ছেদের শুরুতেই তা ভেঙে দেন। এটি কথক-চরিত্রের বাক্যপ্রয়োগের বিশেষ রীতি বলা যায়।

ছোটগল্পে কোনো বিষয়কে বিস্তৃত আকারে বলবার সুযোগও থাকে না। এইজন্য রেকর্ডটি ঘিরে কথক এবং করুণার মনে তৈরি হওয়া আলোড়ন অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করেন—'মোট কথা, ওই রেকর্ডখানা আমাদের দু-জনের সন্ধ্যাকেই আচ্ছন্ন করে রাখল।' 'মোট কথা' শব্দ অবর্ণিত অংশটিরই পরিপূরক হয়ে ওঠে।

আইভির প্রসঙ্গটি বর্ণনার সময় পরিহাসময়তা ভাষার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন— 'শহরের ওপরতলার বাসিন্দা—নিতান্তই একদা করুণার সঙ্গে গভীর সখিত্ব ছিল বলে আমাদের এই হরিজনপাড়ায় পা দিয়েছেন।' এ-ছাড়াও আইভির সংলাপান্তে সংযোজিত কথকের মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। আইভি করুণাকে জানিয়েছেন— 'তা ছাড়া অনেকক্ষণ এসেছি—ন্যান্সি ইজ্ ফিলিং ভেরি লোন্‌লি। এ পুওর লিটল থিং শী ইজ্। এরপরেই কথকের সংযোজন—'ন্যান্সি তাঁর দুহিতা নয়—কুকুর।' সংলাপ প্রয়োগেও লেখকের কৃতিত্ব ধরা পড়ে। করুণা ও কথকের কথোপকথন যখন রেকর্ডের অচেনা সুর-কেন্দ্রিক নয়, তখন তাদের দাম্পত্য-আলাপে ধরা পড়ে সম্পর্কের অম্ল-মধুরতা।

আইভির সংলাপে লেখক অন্য চরিত্রের তুলনায় বেশি ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। বিদেশে বসবাস এবং শিক্ষার সঙ্গে ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ যেন স্বাভাবিক নিয়ম মেনেই। তবে এর মধ্যে সামান্য কটাক্ষও আছে। 'ওপরতলার বাসিন্দা' আইভি কেবল ইংরেজি বলতেই পারেন, অথচ জ্ঞানের ভাঁড়ারটি শূন্য।

গল্পটির নাম 'রেকর্ড'। কথক ও করুণার ভাবনালোক, আইভির প্রসঙ্গ কিংবা ভূ-পর্যটকের কথা—একান্তই

রেকর্ড-কেন্দ্রিক। রেকর্ডের বৃত্তাকার আবর্তনে যেমন গ্রামাফোনে গান পরিবেশিত হয়, সেইরকম সারা গল্পটিও যেন রেকর্ডের অচেনা সুরটি ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। অবশ্য গল্পের শেষে—'এ রেকর্ডকে কেউ ভেঙে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। কেউ পারবে না।'—করুণার উচ্চারিত এই সংলাপ 'রেকর্ড' শব্দটির ভিন্ন অর্থের দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে।

'রেকর্ড' শব্দের বাংলা ভাষায় অর্থ হল নথি। কথক অধ্যাপকের বাজার থেকে সংগৃহীত রেকর্ডটি কেবল তো গান নয়, একটি ঐতিহাসিক নথি। ইতিহাসকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে চাইলেও মোছা যায় না, প্রকৃত সত্যকে কেউ কখনও চিরকালের জন্য বিনষ্ট করতে পারে না। এই গানের সুর হল প্রতিবাদের সুর। করুণা যখন বলেন এ রেকর্ডকে কেউ ভেঙে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি বা পারবে না, তখন তা কেবল সংগৃহীত নির্দিষ্ট রেকর্ডটিকে বোঝায় না, প্রতিবাদের বাণী বা সুরকেও বোঝায়। ভূ-পর্যটকের মুখে রেকর্ডটির ইতিহাস বর্ণিত হওয়ার সময় শোনা গিয়েছিল ছাত্র-শোভাযাত্রার ধ্বনি। ওই ধ্বনি প্রতিবাদের। করুণার উচ্চারিত অন্তিম-সংলাপ তৈরি করেছে ভূ-পর্যটকের কথা আর ছাত্র-শোভাযাত্রার ধ্বনির মধ্যে যোগসূত্র। হয়তো নশ্বর একখানি রেকর্ড বিনষ্ট হয়েও যেতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে নিহিত প্রতিবাদের কণ্ঠ রোধ করা যায় না। মুক্তিযোদ্ধাদের গান আর ছাত্র-শোভাযাত্রার ধ্বনি পাঠকের মনে একত্রে অনুরণিত হয়ে প্রতিবাদী সুরের অবিনশ্বরতাকেই প্রমাণ করে।

১৮.৭ অনুশীলনী

১। 'এ রেকর্ডকে কেউ ভেঙে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। কেউ পারবে না।'—করুণার এই উক্তির আলোকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

২। 'রেকর্ড' নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করুন।

একক ১৯ ❑ শহীদের মা—সমরেশ বসু

গঠন

১৯.১ মূলগল্প

১৯.২ জীবনকথা ও সাহিত্যপরিচয়

১৯.৩ গঠন-বিশ্লেষণ

১৯.৪ নামকরণ

১৯.৫ অনুশীলনী

১৯.১ মূলগল্প

শরীরের মধ্যে যেন কেঁপে উঠল। বিমলা চোখ বুঝলেন। তাঁর যেন স্পষ্ট মনে হলো, পেটের মধ্যে কী একটা নড়ে উঠল। চোখ বুজে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে পেটের মধ্যে নড়ে ওঠাটা অনুভব করতে চাইলেন। সামনের উনোনে তরকারি চাপানো, চড়বড় করে শব্দ হচ্ছে। জল নেই, এখুনি কড়ায় লেগে পুড়ে যাবে, বিমলা তথাপি নড়তে পারলেন না। সমস্ত অনুভূতি দিয়ে নিজের গর্ভে যেন কান পেতে রইলেন, আর তাঁর বুকের মধ্যে যেন নিঃশব্দে বাজতে লাগলো, 'বাদল! বাদল রয়েছিস?' পরমুহূর্তেই তাঁর শরীরটা আর একবার কেঁপে উঠল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগলো। চোখ খুলে উনোন থেকে কড়াটা নামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চোখের দৃষ্টিতে একটা ব্যাকুল অস্থিরতা। বাইরের দিকে কান পেতে কিছু যেন শুনতে চাইলেন। তারপরে দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তরকারিটা ওভাবে ফেলে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে। উনোনের কাছে নামানো কড়াটার দিকে একবার তাকালেন। কিন্তু বিমলা স্থির থাকতে পারলেন না। নষ্ট হয় হোক। কাঁচা থাকুক, ছাই হয়ে যাক। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রান্নাঘরের বাইরে এলেন।

আকাশে ঘন মেঘ। পুবে বাতাস বইছে। উঠোনের এক ধারে টগর গাছটা বাতাসের ঝাপটায় নুয়ে পড়ছে। এক বছরে শিউলি গাছটাও মাটিতে নুয়ে পড়তে চাইছে। বাড়িটা নিঝুম। কাঠের ফ্রেম, টিনের দেওয়াল, মাথায় টিনের চাল। মনে হয় বাড়িতে কেউ নেই। তথাপি বিমলা যেন পা টিপে টিপে উঠোনে নেমে এলেন। পাশের বাড়িতে কণার মা যেন কাকে কী বলছে। বিমলা ফণিমনসার বেড়া ডিঙিয়ে সেদিকে একবার দেখলেন। কণাদের বাড়িটা দেখা যায়। লোকজন দেখা যায় না। তিনি চোখ ফিরিয়ে আবার ঘরের দরজা খোলা বাড়িটার দিকে তাকালেন। কারোর কোনো সাড়াশব্দ নেই। বাতাসে তাঁর মাথার চুল কপালে পড়ছে। দূর থেকে দেখলে কাঁচা চুল বলে মনে হয়। কিন্তু পাক ধরেছে। চওড়া সিঁথেয় বাসি সিঁদুরের দাগ। হাতে শাঁখা নোয়া আর বিবর্ণ কয়েক গাছা সোনার চুড়ি। সেমিজের ওপরে খয়েরি পাড়ের সাদা শাড়ি। ময়লা হয়েছে, হলুদের দাগ লেগেছে। প্রৌঢ় বয়সেও শরীর বেশ শক্ত। মুখের রেখাতেই বয়সটা যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। দেখলে মনে হয়, অল্প বয়সে সুশ্রী আর সল ছিলেন। এখন তাঁর চওড়া শরীর যেন শক্ত আর কঠিন।

বিমলা কয়েক মুহূর্ত উঠোনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে সামনের দিকে না গিয়ে রান্নাঘরের পিছনে গেলেন। ফণিমনসার বেড়া ঘেঁষে বাড়ির পিছন দিয়ে এগিয়ে চললেন। ঘরগুলোর পিছন দিকের সব জানালাই বন্ধ। ঘর যেখানে শেষ, কোণে একটা জবাফুলের গাছ। বিমলা দাঁড়ালেন। সামনে রাস্তা, উত্তর দক্ষিণে লম্বা। কলোনির রাস্তা, পাকা না, ধেঁস ছাইয়ের রাস্তা। বিমলা উত্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। উত্তর দিকে রাস্তা যেখানে পশ্চিমে মোড় নিয়েছে সেই দিকে তাকালেন। যেখানে মোড়ের এক পাশে কয়েকটা ইঁট এক জায়গায় এখনো জড়ো হয়ে পড়ে আছে, সেইখানটা দেখলেন। ওখানে শহীদ বেদী

হয়েছিল। কয়েক মাসের মধ্যে ভাঙতে ভাঙতে গোটা কয়েক ইঁটে এসে ঠেকেছে। কেউ তুলে নিয়ে গেলেই আর কোনো চিহ্ন থাকবে না। কারা বেদীটা ভাঙলো, ইঁটগুলো কোথায় গেল, কেউ জানে না। বিমলা দেখেছেন, প্রথম প্রথম পাড়ার একটা কুকুর বেদীটার গা ঘেঁষে শুয়ে থাকত। এখন থাকে না। গোটা কয়েক ইঁট ছাড়া এখন আর কিছু নেই।

বিমলা আপন মনে মাথা নাড়লেন। তাঁর ঠোঁট নড়লো। না, বাদল ওখানে নেই। বাদলকে শ্মশানেই দাহ করা হয়েছিল। মাস তিনেক আগে, বেদীটা যখন তৈরি হলো, তখন ওরা বিমলাকে ডাকতে এসেছিল। বাদলের মা বিমলা, শহীদের মা। তাই ওরা ডাকতে এসেছিল, বাদলের বন্ধুরা, পার্টির ছেলেরা। শুধু বিমলাকেই ওরা ডাকতে এসেছিল। এ বাড়িতে আর কাউকে না। বাদলের বাবাকে না, বাদলের দুই দাদাকেও না। বাদলের বাবা হরপ্রসাদ অন্য পার্টির লোক। দুই দাদা কৃপাল আর দয়াল, দুজনেই দুটো আলাদা আলাদা পার্টির মেম্বার। চারজন চার পার্টির লোক। বাদলের দলের ছেলেরা কেবল বিমলাকেই ডাকতে এসেছিল। শহীদের মাকে।

বিমলা গিয়েছিলেন। ওইখানে, ওই একটু দূরে, পশ্চিমের মোড়ে, রাস্তার ধারে, এখন যেখানে কয়েকটা ইঁট জড়ো হয়ে পড়ে আছে। শহীদ বেদীর শেষ চিহ্ন। কেন গিয়েছিলেন বিমলা জানেন না। বাদলের পার্টির ছেলেরা এসে বলেছিল, 'মাসীমা আপনি একবার চলুন।' বিমলা গিয়েছিলেন যেন ঘোর লাগা আচ্ছন্নের মতো। তার দুদিন আগে, আঠারো বছরের বালকে ওইখানেই কারা পিটিয়ে মেরেছিল। বিমলার চোখের সামনে এখনো স্পষ্ট। ক্ষতবিক্ষত বাদল। মুখে মাথায় শরীরের নানান জায়গায় রক্ত জমাট। নিথর বাদলকে এ বাড়ির উঠোনে ওরা নিয়ে এসেছিল। বাদল সব থেকে ছোট ছেলে। বিমলার শেষ সন্তান-না। তারপরেও দুটি হয়েছিল, বাঁচেনি। বাদলের পরে আর কেউ ছিল না।

নিহত বাদলকে দেখে বিমলা একবার চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন। উঠোনে পড়ে বাদলকে একবার জড়িয়ে ধরেছিলেন। আপন মনেই কেঁদে উঠে বলেছিলেন, 'কে তোকে এমন করে মারল। ওরে বাদল।' উঠোন জুড়ে মানুষের মেলা। কিছুক্ষণ পরে চালিতে করে ফুল ছড়িয়ে মালা জড়িয়ে ওরা বাদলকে নিয়ে গিয়েছিল। হরিবল্ ধ্বনি দেয়নি। স্লোগান দিয়েছিল। 'কমরেড বাদল, জিন্দাবাদ। খুন কা বদলা খুন।'... কিন্তু বিমলা আর ভালো করে কাঁদতে পারেননি। ডাক ছেড়ে কান্না যাকে বলে, তেমন করে কাঁদতে পারেননি। সময়ে অসময়ে, কাজে অকাজে, হঠাৎ চোখে জল এসে পড়েছে। জল মুছেছেন।

দু দিন পরে ওই বেদীটা তৈরি হয়েছিল। বাদল যেদিন খুন হয়, সেদিন কলোনির স্কুলের মাঠে একটা সভা হচ্ছিল। অন্য কোনো দলের সভা, বাদলের না। সেখান থেকেই কী একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠেছিল। সঠিক কথা কেউ কিছুই বলতে পারেনি। সন্ধের ঘোরে বাদলকে নাকি কারা তাড়া করেছিল। বাদল বাড়ির দিকে দৌড়েছিল। কিন্তু মোড় পেরিয়ে আসতে পারেনি। কেউ বলে, বাদল একলা ফিরছিল। ওর খুনীরা আগে থেকেই মোড়ে অপেক্ষা করছিল। আরো অনেক রকম কথা। কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা, বিমলা বুঝতে পারেন না। বাদলের চিৎকারে লোকজন ছুটে গিয়েছিল। যখন গিয়েছিল, তখন সব শেষ। রক্তাক্ত নিহত বাদল ছাড়া, সন্ধের ঘোরে সেখানে আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায়নি। পুলিশ এসেছিল। বাদলের পার্টির লোকেরা নাকি কার নাম বলেছিল। তাদের কাউকেই কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিস কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। হত্যাকারী বলে যাদের নাম করা হয়েছিল, তাদের মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তারা এখন সকলেই জামিনে খালাস পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেস চলছে। কেস চলছে অথচ যেন ব্যাপারটা কিছুই না।

বাদল খুন হবার দু দিন পরে শহীদ বেদী তৈরি হয়েছিল। এই দু দিনের মধ্যেও ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়েছে। একটা দোকানঘর পুড়ে ছাই হয়েছিল। কেন, তা বিমলা জানেন না। বিমলা কেন শহীদ বেদীর কাছে গিয়েছিলেন তাও জানেন না। গিয়ে একবার দাঁড়িয়েছিলেন। পনের ষোলটা ইঁট ধাপে ধাপে সাজিয়ে চুনসুরকি দিয়ে গাঁথা হয়েছিল। চুন দিয়ে লেপে সাদা বেদীর গায়ে বাদলের নাম লেখা হয়েছিল। বিমলাকে ঘিরে বাদলের পার্টির ছেলেরা সেই একই স্লোগান দিয়েছিল, 'কমরেড বাদল জিন্দাবাদ। খুন কা বদলা খুন'... ইত্যাদি। কে একটি ছেলে যেন বাদলের নাম করে কী সব বক্তৃতা করেছিল। সব কথা বিমলার কানে যায়নি। তিনি আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। আবার আচ্ছন্নের মতোই বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধতে বসেছিলেন। বাড়িতে আর কেউ নেই। হরপ্রসাদ, কৃপাল, দয়াল খাবে, রান্না না করলে চলবে কেন।

যেমন আচ্ছন্নের মতো গিয়েছিলেন, তেমনিভাবেই এসে রান্নার কাজে লেগেছিলেন। কিন্তু কারোর সঙ্গে কথা বলেন না। কৃপা দয়ালের সঙ্গে না, হরপ্রসাদ নিজে এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। যেন খানিকটা আপন মনেই বলেছিলেন, 'কত দিন বলেছি, ওই দলটার সঙ্গে মিশিস না। কথা শুনলে তো।'

বিমলা কোনো জবাব দেননি। হরপ্রসাদ তবু দাঁড়িয়েছিলেন। একটু থেমে, একটা নিশ্বাস ফেলে আবার বলেছিলেন, 'এখনকার এ সব পার্টি, খুন খারাপি ছাড়া কিছু জানে না। কিন্তু যার গেল, কেউ দেখতে আসবে না। বাদলকে তো আর ফিরে পাব না।'

হরপ্রসাদ চুপ করেছিলেন। বিমলা কোনো জবাব দেননি। উনোনের দিকে ঝুঁকে বসেছিলেন। হরপ্রসাদ যেন একটা নিশ্বাস ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, 'যাই হোক, মনকে শক্ত কর। এ ছাড়া আর কী করবার আছে। আমার দেরি হয়ে গেছে, অফিসে চলে যাচ্ছি। খাবার একদম ইচ্ছে নেই।'

হরপ্রসাদ চলে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া আর কোনো কথা হয়নি। তবে এই তিন মাসে মাঝেমধ্যেই ওই কথাটা বলেছেন, 'মনকে শক্ত কর। বাদলকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না।'

বিমলা সে কথার কোনো জবাব দেননি। সংসারের কথা বলেছেন। দৈনন্দিন জীবনে কী দরকার, কী আনতে নিতে হবে, এই সব কথা। কিন্তু বাদলের বিষয়ে কোনো কথা বলেননি। কৃপাল দয়াল কোনো কথাই বিমলাকে বলেনি। কৃপাল চাকরি করে। দয়াল বেকার। ওরা ভিন্ন ভিন্ন দলের লোক। বাড়িতে ওরা নিজেদের মধ্যে কম কথা বলে। গামছা-তেল-সাবান, চান করার কথা বলে, সিনেমা থিয়েটারের কথাও বলে। দলের কথা একেবারে না। খিদে পেলে বিমলার কাছে শুধু খেতে চায়। দোকান বাজার করে দেয়। কী আনতে হবে না হবে, জিজ্ঞেস করে। বাদলের বিষয়ে কোনো কথা হয় না। যেন ওদের ভাই মরেনি। অন্য পার্টির একটা ছেলে মরেছে। হয়তো নিজেদের পার্টির লোকের সঙ্গে কথা হয়। বাড়িতে কোনো কথাই নেই।

বিমলা জবাগাছের গা ঘেঁষে ভাঙা বেদীর দিকে দেখছেন। বাদল ওখানে নেই। বাদলকে শ্মশানে দাহ করা হয়েছিল। কিন্তু বাদল আজ বিমলার সারা শরীরে জেগে রয়েছে। আজ উনিশে শ্রাবণ। আজ সেই দিন। এখন এগারোটা বাজে। আঠারো বছর আগে এই দিনে, এ সময়ে বাদল পৃথিবীর মুখ দেখবার জন্য বিমলার পেটে অশান্ত হয়ে উঠছে।

বাড়িতে তখন কেউ নেই। বিমলা একলা। পূর্ণ গর্ভ, যে কোনো সময়েই বাদল ভূমিষ্ঠ হতে পারে। এ সময়েই ব্যথা উঠেছিল। ডাক্তার কবিরাজের দরকার ছিল না। বিমলা নিঃশঙ্ক। তিনি সবই বুঝতে পারছিলেন। অভিজ্ঞতা তাঁর শরীরের প্রতিটি অনুভূতির মধ্যে। ব্যথা উঠতেই বুঝতে পেরেছিলেন, সেটা নিষ্ফল ব্যথা না। সময় আসন্ন। আঠারো বছর আগে এই দিনে, এই সময়ে উপরঝাপ্তি বৃষ্টি পড়ছিল। একেবারে একলা থাকা উচিত না। বিমলা কোনোরকমে পাশের বাড়িতে কণার মায়ের কাছে গিয়েছিলেন। ব্যথায় রুদ্ধ চুপিচুপি স্বরে বলেছিলেন, 'দিদি, আর সময় নেই।'

কণার মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি সব কাজ ফেলে বিমলার সঙ্গে চলে এসেছিল। কণা তখন ছ'সাত বছরের মেয়ে। তাকে পাঠিয়েছিলেন মেঘুর মা বিধবা বুড়িকে ডাকতে। আজকালকার মতো ঢাকঢোল পিটিয়ে বিমলাদের প্রসব হতো না। মেঘুর মা-ই খালাস করাত। মেঘুর মা বুড়ি এসেছিল। বিমলাকে দেখেছিল। বলেছিল, হ্যাঁ, আসল ব্যথা। আর বেশি দেরি নেই।

কণার মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর খালি করে দিয়েছিল। সেই ঘরেই বাদল হয়েছিল। তখন এ বাড়ির চেহারা অন্যরকম ছিল। টিনের দেওয়াল ছিল না। পাকা মেঝে ছিল না। ছেঁচা বেড়ার দেওয়াল। মাথায় তখনো টিনের চাল, কাঁচা মাটির মেঝে। বিমলা রান্নাঘরে মাদুরের ওপর শুয়ে বসে ব্যথার তীব্রতা সহ্য করছিলেন। কণার মা কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তারও যেন ব্যথা উঠেছিল। বিমলা নিশ্বাস বন্ধ করে ব্যথা খাচ্ছিলেন। দাঁতে দাঁত চেপে স্থির থাকবার চেষ্টা করছিলেন। তার মধ্যেও ভেবেছিলেন, কী আসছে। ছেলে না মেয়ে। হরপ্রসাদের সাধ ছিল মেয়ে হয় যেন। হরপ্রসাদের সাধ, বিমলারও সাধ। দুই ছেলের পরে একটি মেয়ে। কিন্তু তার শেষ গোঙানির সঙ্গে, যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সে ছেলে। মেঘুর মায়ের হাত, বিমলার পেটে চেপেছিল। তখনো ফুল পড়েনি, আর একটি ব্যথার অপেক্ষা। তার মধ্যেই, বিমলা লহমায় দেখে নিয়েছিলেন। রক্তে

আর লালায় মাখানো একটি ছেলে। তখনো গলায় কান্না ফোটেনি। ছোটখাটো এক-আধটা গোঙানি মাত্র। ফুল পড়ার পরে প্রথম গম্ভীরস্বরে কেঁদে উঠেছিল, ওঁয়া ওঁয়া।

মেঘুর মা নাড়ি কাটতে কাটতে বলেছিল, কত বড়। যেন পেট থেকেই এক বছরের ছেলে বেরুলো। দেখে মনে হচ্ছে, মাতৃমুখী।

মাতৃমুখী। বিমলা তাকিয়ে দেখেছিলেন। বুঝতে পারেননি। মেঘুর মায়ের কোলের দিকে তাকিয়েছিলেন আর হঠাৎ-ই নিজের কোলটা বড় ফাঁকা মনে হয়েছিল। মেয়ে না হোক, নাড়ি ছেঁড়া ধন। কোলে নিতে ইচ্ছা করেছিল। সে কথা বলতে পারেননি। মনে মনে বলেছিলেন, মাতৃমুখী ছেলে সুখী হয়।

বাইরে তখনো মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। কণার মা বিমলাকে সাব্যস্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। দুধ গরম করে খেতে দিয়েছিল। মেঘুর মা নতুন শিশুকে গরম জল দিয়ে ধুয়ে মুছিয়ে, কাঁথায় মুড়ে বিমলার কোলে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল, 'বুঝেছি রে বাপু। জলের তোড়ে এলি, বাপের যেন এরকম তোড়ে টাকা আসে। কী বাদুলে ছেলে বাবা, জগৎ ডোবানো বিষ্টি মাথায় করে এলো।'

জগৎ-সংসার ভাসানো বৃষ্টিই বটে। উঠোনটা জলে থৈথৈ করছিল। তখন রান্নাঘরের অবস্থাই বা কী। এখন তো অনেক পাকাপোক্ত ব্যবস্থা। তখন মাথার ওপরে ক্যানেস্তারার গোঁজামিলের চাল। ঘরের এখানে সেখানে টপটপ করে জল পড়ে। বিমলা একটা কোণ বেছে নিয়ে ছেলেকে বুকের কাছে ঢেকে শুয়েছিলেন। কণার মা চলে গিয়েছিল। তার তো সংসারের কাজ। মেঘুর মা ছিল। তার ওটাই কাজ। নবজাতককে বুকের কাছে নিয়েও কৃপাল দয়ালের কথা বিমলার মনে পড়েছিল। ওরা তখন স্কুলে গিয়েছিল। বিমলার দুশ্চিন্তা, যা দুরন্ত তাঁর ছেলেরা। বৃষ্টি মাথায় করে, স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়েছে কিনা কে জানে। বৃষ্টিতে ভেজার ইচ্ছে হলে, মাস্টারমশাইরা কি আর ধরে রাখতে পারবে। হরপ্রসাদের কথা মনে পড়েছিল। অফিসে যাবার ইচ্ছা ছিল না। বিমলা-ই জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হরপ্রসাদ বাড়িতে থেকে কী করবে। খানিকটা ছটফট করা ছাড়া করার কিছুই নেই। তার চেয়ে অফিসের কাজে থাকলে ভালো থাকবে। এদিককার ব্যবস্থা যা করবার বিমলাই করে রেখেছিল। কণার মাকে খবর দেওয়া। মেঘুর মাকে ডেকে নিয়ে আসা। এমন কিছু হাতিঘোড়া ব্যাপার তো নয়। পোয়াতী মেয়েমানুষ ছেলে বিয়োবে, তার জন্য পাড়া দূরের কথা, বাড়ি মাথায় করার কিছুই নেই। ভালোভাবেই সব হয়ে গিয়েছিল। কাকপক্ষীতেও টের পায়নি। ঝমঝম বৃষ্টির শব্দে, আশেপাশে কেউ নতুন ছেলের কান্নাও শুনতে পায়নি।

বিমলা নবজাতককে স্তন চেনাবার চেষ্টায় মুখের কাছে ছুঁইয়ে দিচ্ছিলেন। প্রথমটা একটু ধরিয়ে দিতে হয়। শিশুর মুখের দিকে চেয়ে ভেবেছিলেন, এটি আবার কেমন হবে কে জানে। সকলের বেলাতেই এই কথাটি মনে হয়েছে। কৃপাল দয়ালের বেলাতেও। সব মায়ের কি এমনি মনে হয়? কে জানে। কৃপাল দয়ালের পরে আরও দুটি হয়েছিল। তারা বেঁচে নেই। এটি কী করবে, কে জানে। ভাবতে ভাবতে, বুকের কাছে আরও চেপে ধরেছিলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। মেঘুর মা বলেছে, মাতৃমুখী। বলেছে, খুব দুষ্টু হবে এই ছেলে। মাতৃমুখী ছেলে কেবল সুখী হয় না, দুষ্টুও হয়। কী দুষ্টুমি করবে? বিমলাকে জ্বালাতন করবে?

বিমলা মনে মনে হেসেছিলেন। কোন্ ছেলেটা না জ্বালিয়েছে। কৃপাল দয়াল যে রকম দুরন্ত, এও সেইরকম হবে। একই গাছের ফল তো। তা হোক, ছেলেপিলে তো দুরন্ত হবেই। তার জন্য বকুনি খাবে, মার খাবে, আবার ভুলেও যাবে। কৃপাল দয়াল যে-রকম করে। ওদের দৌরাত্ম্যে এক এক সময় অস্থির হয়ে পড়েন। তখন না মেরে উপায় থাকে না। এও দুষ্টুমি করলে মার খাবে।

নবজাতক কেঁদে উঠেছিল। বিমলা মনে মনে হেসেছিলেন, বলেছিলেন, 'এখন তো মারছি না, কাঁদছিস কেন? বড় হ, তখন দেখব।'

বলতে বলতে বুকের কাছে তুলে, স্তন গুঁজে দিয়েছিলেন। সদ্যোজাত শিশু তা নিতে পারেনি। তখন দুধেতে পলতে ভিজিয়ে মুখে দিয়েছিলেন। চুষে চুষে খেয়েছিল। বিমলা কোনো কথাই ভোলেননি। এই তো যেন সেদিনের কথা। প্রত্যেকটা

কথাই স্পষ্ট মনে আছে। কৃপাল দয়ালের কথাও মনে আছে। ওরা জন্মেছিল পদ্মার ওপারে, নিজেদের ভিটেয়। বাদল এই বাড়িতে জন্মেছিল।

বৃষ্টি একটু ধরতেই, কাক ভেজা হয়ে, কৃপাল আর দয়াল বাড়ি এসেছিল। আঁতুড় মানতে চায়নি, আগেই ভাইকে দেখতে এসেছিল। দয়াল তো বায়না ধরেছিল, সে ভাইকে কোলে নেবে। মেঘুর মা ধমক দিয়েছিল, বিমলা সস্নেহে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে নিরস্ত করেছিলেন। বলেছিলেন, 'কাল চান করবার আগে ভাইকে কোলে নিস।'

সন্ধেবেলা হরপ্রসাদ বাড়িতে এসে আগেই আঁতুড়ের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। গলা খাঁকারি দিয়েছিলেন। দরজাটা বন্ধ ছিল। বিমলা বুঝতে পেরে মেঘুর মাকে বলেছিলেন, 'কৃপার বাবা এসেছে, দরজাটা খুলে দাও।'

মেঘুর মা দরজা খুলে দিয়েছিল। হরপ্রসাদ বিমলাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কেমন আছ?'

বিমলা সে কথার কোনো জবাব দেননি। হারিকেনের আলোর সামনে ছেলেকে তুলে ধরেছিলেন। হরপ্রসাদ গম্ভীরভাবে শব্দ করেছিলেন, 'হুম্!' তারপর হঠাৎ হেসে বলেছিলেন, 'রূপবান ছেলে হয়েছে মনে হচ্ছে। এ ব্যাটা বাপের মতো হয়নি।'

বিমলা ওসব কথা ভোলেন না। সব কথা মনে থাকে, আছেও। হরপ্রসাদ কেন ও কথা বলেছিলেন, তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। একবার হরপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। বাপের খুশি মুখ দেখলে বোঝা যায়। হরপ্রসাদ খুশিই হয়েছিলেন। বিমলা একটু গর্ব বোধ করেছিলেন। ভেবেছিলেন, এই মুখ দেখে হরপ্রসাদ এখন আর মেয়ের কথা মনে রাখেনি।

মেঘুর মা বলেছিল, 'রূপবান তো হবেই, মাতৃমুখী যে।'

তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। হরপ্রসাদ রান্নাঘরের দরজায় ছাতা মাথায় দিয়েই দাঁড়িয়েছিলেন। নামটা তখনই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, 'ব্যাটা জবর বাদুলে, একেবারে বাদলা।'

ইতিমধ্যে বীণা এসে পড়েছিল। কলোনীরই বিধবা মেয়ে। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। বিমলার প্রসব হলে সে রান্না-বান্না করবে। বীণা বড় ঘরের বারান্দায় রান্না চাপিয়েছিল। হরপ্রসাদ কৃপাল আর দয়ালকে নিয়ে গল্পে মেতেছিলেন। সেদিন আর ওদের পড়তে বসতে বলা হয়নি। বিমলা সবই শুনতে পাচ্ছিলেন। এদিকে মেঘুর মা নানানখানা বকবক করছিল। বিমলা বুকে সন্তান নিয়ে কেমন একটা নিবিড় স্বস্তি বোধ করছিলেন।

আজ সেই দিন। আঠারো বছর আগের সেই দিন, এখন, বেলা এগারোটা। চুপ করে বসে, চোখ বুজলে, বিমলা চমকে চমকে উঠছেন। পেটের মধ্যে যেন কিছু নড়েচড়ে উঠছে। বাদল নাকি? বাদল! ঘরের কোণে জবাগাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন বিমলা। ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে তাকিয়ে চোখ বুজলেন। হ্যাঁ, আবার, আবার মনে হচ্ছে পেটের মধ্যে ভ্রূণ নড়ছে। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, বুকের কাছে হাত দুটো জড়ো করলেন। এ আবার কী, এরকম মনে হচ্ছে কেন? সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা তাঁর, অনেককাল গত হয়েছে। আজ কে এমন করে তাঁর গর্ভের মধ্যে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। বাদল কি তাঁর শরীরের মধ্যে মিশে আছে। তিনি মনে মনে ডাকলেন, 'বাদল, বাদল।'

'মা। ও মা।'

কৃপালের গলা। কৃপাল ডাকছে, বিমলা সাড়া দিলেন না, নড়লেন না। যেমন দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখ শক্ত হয়ে উঠল। সমস্ত শরীরটাই শক্ত হয়ে উঠল। দৃষ্টি, ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে। ছেলেদের ডাকে কোনোদিন সাড়া দিতে ভোলেন না। আজ বিমলার মুখে সাড়া নেই। আজ তিনি সাড়া দেবেন না।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আস্তে আস্তে তাঁর মনে পড়ল, কৃপাল দয়াল ভাইকে নিয়ে ছেলেবেলায় কেমন খেলা করতো। কৃপাল-দয়াল পিঠোপিঠি ছিল। বাদলের বয়স কম ছিল। মাঝখানে দুজন মারা গিয়েছিল। দয়ালের প্রায় সাত বছরের ছোট বাদল। বাদলকে ওরা কোলে করে বেড়িয়েছে। মায়ের কাজের সময় দেখাশোনা করেছে। ছোট ভাইটিকে দুজনেই ভালবাসতো। কাড়াকাড়ি করে খেলতো। ছোট ভাইকে কিছু না দিয়ে দুজনে মুখে তুলতো না। পিঠোপিঠি হলে তা হতো না। কৃপাল দয়ালের তো রোজ ঝগড়া মারামারি লেগেছিল। ওরা দুজনে ছিল সমানে। ওদের মারামারি থামাতে বিমলাকে লাঠি

তুলতে হতো। হরপ্রসাদও শাসন করতেন। কিন্তু বাদলকে নিয়ে দুজনেই তখন কৃপাল দয়াল জিজ্ঞেস করত, বাদল কাকে বেশি ভালবাসে। কার কাছে থাকতে চাইতো। লোভী শিশু, সে বুঝতে পারতো, কাউকেই সে হারাতে চায় না। দুই দাদারই মন যুগিয়ে কথা বলত। বিমলা আড়ালে মুখ টিপে হাসতেন, মনে মনে বলতেন, 'একফোঁটা ছেলের চালাকি দেখ।'

হরপ্রসাদও ছোট ছেলেটিকে ভালবাসতেন। কৃপাল দয়াল যত না আদর কাড়তে পেরেছে, কোলে চাপতে পেরেছে, বাদল সব কিছুই বেশি পেয়েছে। কিন্তু সে সবই ছেলেবেলার কথা। তখন সংসারে চেহারা ছিল অন্য রকম। হরপ্রসাদ চাকরি করতেন আর প্রকাশ্যেই রাজনীতি করতেন। অবসর সময়ে, নিজের দল নিয়ে মেতে থাকতেন। বিমলার তাতে কোনোদিন কিছু যায় আসেনি। পুরুষমানুষ কত কী নিয়ে থাকে। মেয়েদের সে সব ভাবতে গেলে চলে না। বিমলা বরং মনে মনে খুশিই ছিলেন। হরপ্রসাদ দশজনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সভা-সমিতি করছে। তবু নেশা ভাঙ করে বাজে আড্ডায় তো সময় নষ্ট করে না। টাকাও নষ্ট করে না। সবাই হরপ্রসাদ বলে ডেকে নিয়ে যায়। পাড়ার একজন গণ্যমান্য লোক বাইরে বাইরের মতো, সংসারে সংসারের মতো। স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে, গরীব মধ্যবিত্তের জমজমাট পরিবার।

আস্তে আস্তে কৃপাল দয়াল বড় হয়ে উঠতে লাগলো। ওদের পিছনে বাদল যত বড় হয়ে উঠতে লাগল সবাই যেন কেমন বদলে যেতে লাগলো। বাদল দাদাদের সঙ্গ আর পাচ্ছিল না। ওরা তখন বাইরের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। ওদের কোথায় কী দল, বন্ধু, সেসব নিয়েই ব্যস্ত। বাড়িতে ওদের দেখা পাওয়া ভার। বাদলও ওর জগৎ খুঁজে নিয়েছিল। ওরও বন্ধু ছিল, খেলাধূলা ছিল। বিমলা এসব দেখেছেন, বিশেষ করে কখনো কিছু ভাবেননি। বরং মনে হয়েছে, এরকমই হয়। সকলেরই হয়। বড় হচ্ছে তো সব। সকলেই যে যার আলাদা পথে ফিরছে।

কেবল হরপ্রসাদ বিরক্ত হচ্ছিলেন। কখনো রাগ, কখনো ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছিল। বিশেষ করে কৃপাল আর দয়ালের ওপরে। বিমলা হরপ্রসাদের কাছে শুনতেন, কৃপাল দয়াল কলেজে ঢুকে নাকি রাজনীতি করছে। ছাত্ররা সবাই করে। কৃপাল দয়ালের কী দোষ বিমলা ভেবে পেতেন না। একটা কথা বুঝতে পারতেন, হরপ্রসাদ যে রাজনীতি করে কৃপাল দয়াল তা করে না। বিমলা বলতেন, 'কলেজে ওরা কী করছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ?'

হরপ্রসাদ রেগে জবাব দিতেন, 'ওসব রাজনীতির নামে গুণ্ডামি। আমার পয়সায় কলেজে পড়ে ওসব চলবে না। তোমার ছেলেদের এ সব কথা জানিয়ে দিও।'

হরপ্রসাদের কথার ধরনে বিমলা মনে মনে রুষ্ট হতেন। আবার ভাবতেন, বাবা যে রকম বলে ছেলেদের সেরকম চলাই উচিত। তাহলে আর সংসারে কোনো গোলমাল থাকে না। কৃপাল দয়ালকে তিনি বলেছেন, 'কলেজে যাস্ পড়তে, সেখানে আবার ওসব কী। তোদের বাবা পছন্দ করে না।'

ওদের এক জবাব, 'ওসব তুমি বুঝবে না মা।'

একমাত্র বাদলকে নিয়ে তখন কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। হরপ্রসাদেরও কোনো অভিযোগ ছিল না। মায়ের সঙ্গেই বাদলের ভাব বেশি। সংসারের কাজে কর্মে, বাদলকেই পেতেন। বকে ধমকেই করাতে হতো, তবু করত। কিন্তু দিনে দিনে সংসারের চেহারাটা বদলে যাচ্ছিল।

কৃপালের সঙ্গেই প্রথম হরপ্রসাদের লাগলো। বাইরের বিবাদ ঘরে এসে ঢুকেছিল। কেবল তর্কাতর্কিতেই সব শেষ হতো না। হরপ্রসাদ ক্ষেপে উঠতেন। ক্ষেপে উঠে যা তা বলতেন। কৃপাল মাথা নোয়াতো না। সে হরপ্রসাদের দিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে থাকতো। বিমলা এসে কৃপালকে সরিয়ে দিতেন, 'সরে যা এখান থেকে। বাপের মুখে মুখে কথা বলতে লজ্জা করে না।'

বিমলা হরপ্রসাদের ওপর খুশি হতেন না। কৃপাল তো ওঁর ছেলে, বাইরের শত্রু না। কিন্তু শুনলে সেইরকমই মনে হতো। কেবল কৃপালের সঙ্গে না, দয়ালের সঙ্গেও হরপ্রসাদের একই ব্যাপার ঘটতো। বিমলা মনে করতেন, কৃপাল দয়াল একই দল করে।

বিমলার সে ভুল ভাঙতেও দেরি হয়নি, যখন দেখেছিলেন, দুজনের মধ্যে তর্ক ঝগড়া। নিতান্ত বাড়ির মধ্যে, আর বিমলা

সামনে থাকতেন বলে ওরা মারামারিটা করতে পারতো না। এত দলাদলি কিসের, বিমলা বুঝতে পারতেন না। সবাই মিলে একটা দল করলেই তো সব মিটে যায়। কিন্তু বাড়িতে তখন তিনটে দল। হরপ্রসাদ কৃপাল দয়াল। আর এক দলে বিমলা আর বাদল। তবে বাদল একেবারে নিরপেক্ষ ছিল না। ছোড়দা দয়ালের দিকে ওর টান বেশি। বলতো, 'ছোড়দা ঠিক বলে।'

বিমলা জিজ্ঞেস করতেন, 'কেন?'

বাদল বলতো, 'আমাদের স্কুলের সব ওপর ক্লাসের ছেলেরা ছোড়দাকে মানে— ছোড়দা গেটে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলে সব ছেলেরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসে।'

'তাই বুঝি ছোড়দার মতো হবি।'

সে বিষয়ে বাদল কিছু বলতো না। ওর জবাব ছিল, 'তা আমি কি করে জানবো।'

বিমলা বলতেন, 'তুই ওসবের মধ্যে যাসনি। দেখছিস্ না, বাড়িতে কী রকম অশান্তি।'

যত দিন যাচ্ছিল, অশান্তির চেহারাটা বদলে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ, কৃপাল, দয়াল কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলতো না। বিমলা রান্না-বান্না করেন, ওরা এসে খায়। রাত্রে শোয়। কৃপাল দয়াল রোজ রাত্রে বাড়িতেও থাকতো না। পড়াশোনা হচ্ছিল না। কৃপাল একটা চাকরি জোগাড় করে নিয়েছিল। দয়ালেরও সেই অবস্থা। পড়া হবে না। কিন্তু কেবল পার্টি করলে চলবে না। ওরও একটা চাকরি চাই।

ইতিমধ্যে বাদল বড় হয়ে উঠেছিল। ক্লাস টেনে পড়বার সময় ওর টাইফয়েড হয়েছিল। বিমলার ভিতরটা ভয়ে গুটিয়ে গিয়েছিল। নানা অশুভ চিন্তা তাঁর মাথায় এসেছিল। এতখানি বড় বয়সে কোনো সন্তান তাঁকে হারাতে হয়নি। এমন ভারী রোগও কারোর হয়নি। তখন দেখা গিয়েছিল, কৃপাল ডাক্তার ডেকে এনেছিল। দয়াল বসে বসে বাদলের মাথায় বরফ দিয়েছে। রক্ত বিষ্ঠা পরীক্ষা করাবার জন্য নিয়ে গিয়েছে। হরপ্রসাদ উদ্বিগ্ন মুখে, বাদলের বিছানার সামনে বসে থেকেছেন।

তখন তো বাদল কোনো পার্টি করে না। করলে কী চেহারা হতো, কে জানে।

বিমলার চোখের সামনে ভেসে উঠলো শ্মশানযাত্রার ছবি। এ বাড়ির উঠোন থেকেই, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত বাদলকে শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গিয়েছিল। মৃতদেহ ঘিরে ছিল বাদলের বন্ধুরাই, ওর পার্টির লোকেরা। কৃপাল দয়াল সেখানে এসে দাঁড়ায়নি। বোধহয় দাঁড়াতে পারেনি। হরপ্রসাদ একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে কেউ একটা কথা বলেনি। তিনিও বলেন নি। বাদলকে ওর বন্ধুরাই কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা নয়, ভাইয়েরা নয়, পার্টির ছেলেদের কাঁধে বাদলের মৃতদেহ শ্মশানে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। দাদারা বাড়িতে ছিল না।

টাইফয়েডের সময়, বাদল যদি পার্টি করতো, তাহলে কী হতো কে জানে। শ্মশানযাত্রার মতোই হয়তো, বাবা দাদারা দূরে সরে থাকতো। পার্টির কাছে বাবা ছেলে ভাই বলে কিছু নেই। পার্টির পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। একে কেমন পার্টি করা বলে, বিমলা বোঝেন না। বিমলা শুধু সংসারটা মাথায় করে রেখেছেন।

কিন্তু পার্টিই তা হলে সব। বিমলার চোখে যেন আগুনের আঁচ লাগে। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর দৃষ্টি ফিরে আসে শহীদ বেদী থেকে। তিনি বাড়ির দিকে ফিরে তাকান। ঘাড় ফিরিয়ে, পিছনে তাকিয়ে গোটা বাড়িটাকে যেন একবার দেখে নেবার চেষ্টা করেন।

'কোথায় গেলে অ্যাঁ? শুনছ।'

হরপ্রসাদের গলা। বিমলাকে ডাকছেন। বিমলা সাড়া দিলেন না। মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবার তাকালেন ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে। তাঁর মনে পড়ল, আজ যেন কিসের ছুটি। কৃপাল, হরপ্রসাদ কেউ-ই কাজে যায় নি। কিন্তু বিমলা সাড়া দেবেন না। আজ আর এ সময়ে তিনি সাড়া দিতে পারছেন না। তাঁর ভিতরে কী যেন ঘটছে। আঠারো বছর আগে, এই দিনে, এই সময়ে যা ঘটেছিল, তাঁর সারা শরীরে যেন সেই ভাব। ওই বেদীতে না, শ্মশানে না, বাদল যেন তাঁর ভিতরে রয়েছে। বাদল পৃথিবীতে আসতে চাইছে।

বাদল যখন টাইফয়েড থেকে সেরে উঠেছিল, তখন ছেলেটা বড় রুগ্ন হয়ে গিয়েছিল। মনে হতো, ওকে শিশুর মতো কোলে নেওয়া যায়। প্রায় একটা বছর পড়া নষ্ট হয়েছিল। তা হোক, তবু প্রাণে বেঁচেছিল, বিমলার সেটাই সান্ত্বনা। কৃপাল দয়ালের অসুখ হলেও সেইরকম হতো। হরপ্রসাদের অল্পস্বল্প অসুখ করলেও বিমলা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। লোকটা যাই করে বেড়াক, শরীরের দিক থেকে খুব শক্ত না। তাছাড়া, হরপ্রসাদই তো একমাত্র কাণ্ডারী। স্বামীকে তিনি কখনো কোনো কারণে অযত্ন করেননি।

বাদল রুগ্নতা কাটিয়ে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠেছিল। আগের মতো স্বাস্থ্য না, তার চেয়েও যেন সুন্দর হয়ে উঠেছিল। ও বরাবরই একটু কথা কম বলতো। বিমলার মতো। বিমলা কথা কম বলেন। বেশি বলবার অবকাশ এ সংসার তাকে দেয়নি। সারাটা সংসার তাঁর মাথায়। স্বামী পুত্রদের খাওয়া-দাওয়া দেখা-শোনা। বাসন মাজা আর ঘর পরিষ্কার করা ছাড়া, সবই তাঁর নিজের হাতে।

বাদল কথা কম বলতো। বিমলা মনে করতেন, বাদল, কৃপাল দয়ালের পথ ধরবে না। বাড়িতে তিনটে পার্টির লোক। কারোর সঙ্গে কারোর সদ্ভাব নেই, কথাবার্তা বন্ধ। বাদল সব দেখেছে শুনেছে। দেখে শুনে ও আর ও-পথে যাবে না।

বিমলা ভুল ভেবেছিলেন। কলেজে ঢোকবার আগেই বিমলার কানে এলো, বাদল আর একটা পার্টিতে ঢুকেছে। বিমলা বলেছিলেন, 'তুইও ওসব পার্টি করতে যাচ্ছিস।'

বাদলের কথা কম। সে মায়ের কথার জবাব দেয়নি। কিন্তু হরপ্রসাদ ছাড়েননি। কৃপাল দয়ালের সঙ্গে যে রকম ঝগড়া করেছেন, তেমনি করেই বাদলকে বকেছেন, ধমকেছেন। বলেছেন, 'তুই গিয়ে একটা খুনী পার্টির সঙ্গে জুটেছিস।'

বিমলা অবাক হয়ে শুনেছিলেন, বাদল ওর বাবাকে বলছে, 'আমাদের পার্টি খুনী পার্টি না।'

হরপ্রসাদ চিৎকার করে বলেছেন, 'আলবৎ খুনী পার্টি। কতগুলো গুণ্ডা বদমাইস লোচ্চা ছাড়া ও-পার্টিতে কোনো ছেলে নেই। তুই আমাকে শেখাতে আসিস না।'

বাদল বলেছিল, 'আমি কাউকেই কিছু শেখাতে যাচ্ছি না।'

বিমলার মনে হয়েছিল, বাদলকে তিনি যেন চিনতে পারছেন না। ও শান্ত আর গম্ভীরভাবে ওর বাবার কথার জবাব দিচ্ছিল। কৃপাল দয়ালের মতো গলা চড়িয়ে, উত্তেজিত হয়ে কথা বলেনি। বিমলা অবাক হয়ে ভেবেছিলেন, বাদল কবে থেকে ওরকম কথা বলতে শিখলো। ও যেন কত বড় হয়ে গিয়েছে, কত কী বোঝে। অবাক হওয়ার সঙ্গে, একটু একটু রাগও হয়েছিল। বাদল যদি ছেলেমানুষের মতো চিৎকার চেঁচামেচি করতো, তা হলেই যেন বিমলা খুশি হতেন। অথচ, আবার, বাদল ওরকম করে কথা বলেছিল বলে, একটা কেমন গর্ববোধ করেছিলেন।

কিন্তু হরপ্রসাদ দুরকম কথা জানতেন না। ঠিক যেমনভাবে কৃপাল দয়ালকে বলেছিলেন, তেমনিভাবেই বাদলকে বলেছিলেন, 'ওসব কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। এ বাড়িতে থাকতে হলে, তোকে ওই পার্টি ছাড়তে হবে।'

হরপ্রসাদের এ ধরনের কথা, বিমলার কখনো ভালো লাগে না। মানুষটা কথায় কথায় বাড়িতে থাকার খোঁটা দেয় কেন। বাদল ওর বাবার সে কথার কোনো জবাব দেয়নি। সামনে থেকে সরে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ নিজের মনেই গজগজ করেছিলেন, 'যারা দেশ গড়তে জানে না, কেবল ধ্বংস করতে চায়, তাদের আমি আমার বাড়িতে চাই না। তারা যে যার নিজের রাস্তা দেখে নিক গিয়ে...।' এমনি অনেক কথা বলেছিলেন। বিমলাও হরপ্রসাদের সামনে থেকে সরে গিয়েছিলেন। লোকটা কেবল বকতে ধমকাতেই জানে। কখনো দেখা গেল না, মাথা ঠাণ্ডা করে ছেলেদের কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। যেমন কৃপাল দয়ালের সঙ্গে করেছে, বাদলের সঙ্গেও সেইরকম করে কথা বলেছিল।

বিমলার বুকভরা অশান্তি আর উদ্বেগ। শেষপর্যন্ত বাদলের ওপরেই তাঁর রাগ হয়েছিল। সংসারে এত কিছু থাকতে পার্টি ছাড়া, আর কি কিছু করার নেই। বাদলটাও শেষপর্যন্ত সেই একই পথে চলে গেল। তিনি বাদলকে বলেছিলেন, 'তুই লেখাপড়া করবি, খাবিদাবি খেলা করবি। তুই কেন আবার পার্টি করতে গেলি?'

বাদল শান্তভাবেই বলেছিল, 'আমি তো কারোর কোনো ক্ষতি করছি না।'

বিমলা রেগে বলেছিলেন, 'ওসব ক্ষতি-টতি জানি না। একটা সংসারের মধ্যে, তোরা সব এক একটা পার্টি নিয়ে থাকবি, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করবি, এসব আর আমি সহ্য করতে পারছি না। তুই ওসব পার্টি-টার্টি ছাড়।'

বাদল গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'আমি বাড়িতে কারোর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করতে চাই না। পার্টি আমি ছাড়তে পারবো না।'

বিমলা বলেছিলেন, 'তা ছাড়বি কেন। তাহলে যে আমার একটু সুখ হয়। বুঝেছি আমি না মরলে তোরা বাপ ভাইয়েরা কেউ পার্টি ছাড়বি না। এ আমি কোথায় আছি। এটা কি একটা সংসার। কতগুলো পার্টি ছাড়া এ বাড়িতে কিছু নেই।' বিমলার গলা বন্ধ হয়ে এসেছিল। চোখে জল এসে পড়েছিল। আবার বলেছিলেন, 'এবার আমাকেও একটা পার্টিতে গিয়ে ঢুকতে হবে।'

মায়ের কথা শুনে বাদল বোধহয় একটু বিচলিত হয়েছিল। বলেছিল, 'তুমি এরকম করছ কেন। বলেছি তো, আমি বাবা দাদাদের কারোর সঙ্গে লড়তে যাচ্ছি না।'

কিন্তু বাদলের সে-কথা টেঁকেনি। কখনো কৃপাল, কখনো দয়াল, কখনো বা হরপ্রসাদের সঙ্গে, তর্কাতর্কি বিবাদ লেগেই ছিল। বাইরের অশান্তি বাড়িতে দানা বেঁধে উঠেছিল। বাইরের যত গোলমাল, বাড়িতে এসে তার বোঝাপড়া চলছিল। সকলেই আলাদা আলাদা করে, বাদলের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিল'। বিমলা সেই সব কথা থেকেই বুঝতে পারতেন, বাদল রীতিমতো পার্টির কাজ করছে। লেখাপড়া ওর মাথায় ছিল না।

প্রথম কৃপালই একদিন বিমলাকে বলেছিল, 'বাদলা খুব বেড়ে উঠেছে। ওকে সাবধান করে দিও। কোনদিন একটা কি ঘটে যাবে, তখন আর কিছু করার থাকবে না।'

বিমলা বলেছিলেন, 'আমাকে বলতে এসেছিস কেন। নিজের ভাইকে নিজেরা বোঝাতে পারিস না।'

'ও বোঝাবার বাইরে চলে গেছে।'

বিমলা তিক্ত করেই জবাব দিয়েছিলেন, 'আর তোরা বুঝি ভেতরে আছিস। তুই নিজে পার্টি ছাড়তে পারিস না?'

কৃপাল বলেছিল, 'আমার যা বলবার বলে দিলাম। বাদলা আগুন নিয়ে খেলা করছে। রোজ মাস্তানি আর মারামারি করে বেড়াচ্ছে।'

সকলেরই সকলের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ। বিমলার সামনে এসে কৃপালই যে কেবল বাদলের বিরুদ্ধে শাসিয়েছে, তা না। দয়ালও একইভাবে শাসিয়েছে। বিমলার সব থেকে অবাক লেগেছিল, হরপ্রসাদও যখন একরকমভাবেই শাসিয়েছে। বলেছে, 'তোমার ছোট ছেলেকে বলে দিও, এখনো সময় আছে। ও যেন সাবধান হয়ে যায়। ওর বড় পাখনা গজিয়েছে। ও পাখনা পুড়ে যাবে।'

বিমলার বুকের মধ্যে সেদিন একবার কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু হরপ্রসাদের ওপর রাগও হয়েছিল। বলেছিলেন, 'নিজের ছেলেকে নিজে বোঝাতে পার না। তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও। তুমি পার্টি ছাড়তে পার না? তারপরে ছেলেকে বলতে পার না? সবাই এসে আমার কাছে বলছ?'

হরপ্রসাদ বলেছিলেন, 'তুমি ওসব বুঝবে না। আমার পার্টি ছাড়ার কিছু নেই। আমি ওদের মতো গুণ্ডা পার্টি করছি না। কিন্তু বাদলা যেভাবে বাড়িয়ে তুলেছে, ও একটা কিছু না ঘটিয়ে ছাড়বে না।'

বিমলা তিক্ত রাগে বলেছিলেন, 'আমাকে ওসব কথা বলে লাভ নেই। আমি তোমাদের সংসারে একটা দাসী বাঁদি আছি। তোমাদের খেদমত খাটছি। আর তোমরা লড়াই করছ। এবার আমাকে তোমরা রেহাই দাও।'

বিমলা হরপ্রসাদের কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন। শুনেছিলেন, তারপরেও হরপ্রসাদ আপনমনে বকবক করছিলেন,

'বাদলার মরণ ধরেছে। পার্টির নেতাদের উস্‌কানিতে, ও নিজেকে কী একটা ভাবতে আরম্ভ করেছে।'

বিমলার বুকের মধ্যে আবার কেঁপে উঠেছিল। বাবা হয়ে হরপ্রসাদ কেমন করে বলেছিল, ছেলেটার মরণ ধরেছে। কেবল বাদলের বেলায় না। হরপ্রসাদ সকলের বেলাতেই ও কথা বলেছেন। কৃপাল দয়ালের কথাতেও বলেছেন, ওদের মরণ ধরেছে। হরপ্রসাদ কি ছেলেপুলেদের বাবা নয়? পিতৃত্বের থেকেও পার্টি কি বড়? ওদের কি ভ্রাতৃত্ব বলতে কিছু নেই? পার্টি কি তার ওপরে? এই সংসারের মাঝখানে বসে, এ কথাটা কোনোদিন তিনি বুঝতে পারেননি। কেবল ভেবেছেন, তাঁর ঘরে কেন এত অশান্তি। বাপছেলেরা মিলে, একটা সুখের সংসার কি ওরা গড়তে পারতো না। তার বদলে ওরা এক একজন, এক একজনের বিরুদ্ধে কেবল মরণ ধরাটাই দেখতে পেয়েছে।

বিমলা বাদলকে বলেছিলেন, 'তোর বাবা দাদারা সবাই তোর নামে নালিশ করছে। তুই কি একটা বিপদ-আপদ না ঘটিয়ে ছাড়বি না?'

বাদল বলেছে, 'বিপদ-আপদ আবার কী। ওরা চায়, ওরা পার্টি করবে, আমি চুপচাপ বসে থাকব। তা আমি থাকব কেন? ওদের শাসানিকে আমি কাঁচকলা ভয় পাই। বেশি ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করতে এলে, আমরাও ছেড়ে কথা বলব না।'

বিমলা তবু ধমকে বলেছেন, 'তুই কেন ওদের সঙ্গে লাগতে যাস্‌?'

বাদল বলেছিল, 'আমি কেন লাগতে যাব। ওরাই আমাদের সঙ্গে লাগতে আসে।'

'কেন, তুই বাবা দাদাদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে পারিস না?'

'বাবা দাদারা বুঝি মিলে-মিশে আছে? পার্টির ব্যাপারে কারোর সঙ্গে কারোর মিল-মিশ হবে না।' একটু চুপ করে থেকে, আবার বলেছে, 'পার্টির সঙ্গে আমি বেইমানি করতে পারব না। তা বাবা আর দাদারা আমাকে যতই শাসাক। সবাই তো নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, আমার বেলাতেই খালি শাসানি। আমি কারোর পরোয়া করি না।'

বিমলা তারপরেও মোক্ষম কথাটি বলতে ছাড়েননি, 'বাপের অমতে এসব করছিস। এর পরে যদি তোর বাবা তোকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলে?'

বাদল অনায়াসে জবাব দিয়েছে, 'বের করে দেয়, চলে যাব। তা বলে বাবাকে, বাবার পার্টিকে সমর্থন করতে পারব না।'

বিমলা যেন শাঁখের করাতের তলায় পড়েছিলেন। কোনোদিকে তাঁর শান্তি ছিল না। স্বামী পুত্রদের কারোকে তিনি বোঝাতে পারেননি। সংসারের মধ্যে চারটে পার্টির লড়াই চলছিল। এক সঙ্গে বসে বাবা ছেলেদের খাওয়া উঠে গিয়েছিল। যদি বা কোনোদিন সবাইকে একসঙ্গে খেতে দিতেন, কেউ কারোর সঙ্গে একটি কথা বলতো না। কলের পুতুলের মতো সবাই নিঃশব্দে খেয়ে উঠে যেত।

'মা। মা কোথায় গেলে?'

এখন দয়াল ডাকছে। এর আগে কৃপাল ডেকেছে। হরপ্রসাদও ডাকাডাকি করেছে। বিমলা কোনো সাড়া দেন নি। এবারও সাড়া দিলেন না। ওদের সকলের ডাকে চিরদিন সাড়া দিয়ে এসেছেন। আজ তিনি ওদের ডাকে সাড়া দেবেন না। এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই মোড়ের অবহেলিত ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে তাকিয়ে থাকবেন। ওইখানেই বাদলকে খুন করে ফেলে রেখে গিয়েছিল। আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ। শনশন পুবে বাতাসের সঙ্গে এবার ইলশেগুঁড়ি ছাটের মতো বৃষ্টি নেমে এলো। জবাগাছটা ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে বিমলার গায়ে মুখে পড়তে লাগল। তিনি নড়লেন না। তিনি আর ওই রান্নাঘরটায় গিয়ে ঢুকতে পারছেন না। আঠারো বছর আগে, বাদলের ওই আঁতুড়ঘরে গিয়ে ঢুকলেই, তাঁর সমস্ত শরীরের মধ্যে কেমন করছে। বিমলা স্থির থাকতে পারছেন না। তাঁর পেটের মধ্যে যেন কেবলই কী নড়ে চড়ে উঠছে। বাদল নাকি? বাদল কি এখনো তাঁর গর্ভে!

বিমলা চোখ বুজে ঠোঁটে ঠোঁট টিপলেন। ব্যথা উঠছে নাকি তাঁর পেটে। তাঁর চোখের সামনে বাদলের সেই চেহারাটাই

আবার ভেসে উঠল। ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মৃত বাদল। সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে, সকলের শাসানির কথা তাঁর মনে পড়েছিল। এই তিন মাস ধরে, বারে বারে মনে মনে জিজ্ঞেস করেছেন, কারা মেরেছে বাদলকে। কৃপালের দল? দয়ালের দল, না হরপ্রসাদের দল? সবাই অস্বীকার করেছে, তাদের দল বাদলকে মারেনি। পুলিস যাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে, তারাও অস্বীকার করেছে, বাদলকে তারা মারেনি। অথচ সবাই শাসিয়েছে, সাবধান করে দিয়েছে। কৃপাল দয়াল হরপ্রসাদের পার্টি ছাড়াও, আরও পার্টি আছে। কিন্তু স্বীকার করেনি, বাদলকে কারা মেরেছে। বিমলাও জানেন না, কাদের হাতে বাদলের রক্ত লেগে আছে।

যতই অস্বীকার করুক, কোনো না কোনো পার্টির হাতেই বাদলের রক্ত লেগে আছে। সেটা কোন্ পার্টি? কৃপাল, দয়াল, হরপ্রসাদের কথাই আগে মনে আসে। ওরা সকলেই বলেছে, বাদলের মরণ ধরেছে। অথচ তারা বিমলার স্বামী পুত্র। বাদল কি হরপ্রসাদের ছেলে ছিল না? কৃপাল দয়ালের ভাই ছিল না? কেবল কি একটা পার্টির ছেলে। ওদের বিরুদ্ধ পার্টির ছেলে একটা? বাদল কি এই সংসারে একমাত্র বিমলারই ছেলে? তা-ই যদি হয়, তবে বিমলা আজ ওদের ডাকে সাড়া দেবেন না।

বিমলা শুনতে পাচ্ছেন, ওরা সবাই তাকে ডাকাডাকি করছে। কৃপাল ডাকছে, হরপ্রসাদও ডাকছেন। ওরা নিজেরা কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না। আলাদা আলাদা ডেকে চলেছে।

'মা, ও মা!'

'মা কোথায় গেলে?'

'কই গো শুনছো, কোথায় গেলে?'

বিমলা টের পাচ্ছেন, উঠোনে, ঘরে ঘরে, রান্নাঘরে, সবাই তাঁকে ডাকাডাকি করছে।

বৃষ্টির ছাটে ছুটোছুটি করছে। শুনতে পাচ্ছেন, দয়াল রান্নাঘরের কাছ থেকে কণার মাকে চিৎকার করে ডাকছে, 'মাসীমা, ও মাসীমা।'

কণার মায়ের জবাব শোনা গেল, 'কী বলছিস রে দয়াল।'

'মা কি আপনাদের বাড়িতে আছে?'

'না তো। সকাল থেকে একবারও আসেনি তো। কোথায় গেল তোর মা?'

'কী জানি, দেখতে পাচ্ছি না। রান্নাঘরের দরজা খোলা। কুকুর ঢুকে, কড়ার তরকারি খেয়ে গেছে। রান্নাবান্না কিছু হয় নি।'

কণার মায়ের উদ্বিগ্ন গলা শোনা গেল, 'সে কি রে। তোর মায়ের তো এরকম কখনো হয় না। দ্যাখ্ খুঁজে, কোথায় গেল। আমিও দেখছি।'

কোথাও যাননি বিমলা। বাড়িতেই আছেন। ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে দেখছেন। যারা বেদী তৈরি করেছিল, তারাই বা আজ কোথায়। একটা শহীদ বেদী করেছিল। তিন মাসের মধ্যেই সেটা ভেঙে পড়েছে। তাদেরই বা কী হারিয়েছে। তারা সেই যে শহীদ বেদীতে বিমলাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তারপরে আর আসেনি। তারা যেমন পার্টি করছিল, তেমনি করছে। এ বাড়ির বাবা ছেলেরাও করছে।

বিমলারই শুধু হারিয়েছে। দশ মাস বাদলকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। তাঁর নাড়ি ছিঁড়ে বাদল এই পৃথিবীতে এসেছিল। আঠারো বছর আগে, এতক্ষণে বাদল পৃথিবীতে এসেছে। এতক্ষণে মেঘুর মা বাদলকে ধুয়ে মুছে, তাঁর বুকের কাছে তুলে দিয়েছে। গম্ভীর স্বরে ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদছে। বিমলা তাকে স্তন চেনাবার চেষ্টা করছেন।

বিমলার গায়ের মধ্যে কেঁপে উঠল। বাদলকে তিনি যেন বুকের মধ্যে অনুভব করছেন। বাদল কোথাও নেই, শ্মশানে না, শহীদ বেদীতে না। তাঁর বুকেই আছে।

'বড়বৌ।'

হরপ্রসাদ ছাতা মাথায় দিয়ে এসে দাঁড়ালেন। বিমলার শরীর শক্ত হয়ে উঠল। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে রইলেন। হরপ্রসাদ তাঁর ভাইদের মধ্যে সকলের বড়। পূর্ববঙ্গে, একান্নবর্তী পরিবারে, বিমলাকে বড়বৌ বলেই ডাকা হতো। হরপ্রসাদ কখনো কখনো তাঁকে ওই নামে ডাকেন। বিমলা কোনো জবাব দিলেন না।

হরপ্রসাদ বললেন, 'আমরা তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?'

সে কথা হরপ্রসাদকে বলবার দরকার নেই। বিমলা জানেন, আজ বাদলের জন্মদিন, হরপ্রসাদের সে কথা মনে নেই। ছেলেদেরও কারোর মনে থাকে না। বিমলা ভুলতে পারেন না, কবে কোন্ ছেলেকে তিনি প্রসব করেছেন। মুখে কিছু বলেন না। কেবল তিন ছেলের জন্মদিনে, ওদের একটু পায়েস রান্না করে খাইয়ে দেন। এতকাল দিয়ে এসেছেন। গত বছরও এই দিনে, বাদলকে পায়েস রান্না করে খইয়েছিলেন। বাদলের জন্য আর তাঁকে পায়েস রান্না করতে হবে না।

হরপ্রসাদের গলায় অসহায় বিস্ময়, কারণ তিনি বিমলার কিছুই বুঝতে পারছেন না। বলেই চলেছেন, 'রান্নাবান্না কিছু করোনি। আধকাঁচা তরকারি কুকুরে খেয়ে গেছে। কী ব্যাপার তোমার?'

হরপ্রসাদ ব্যাপার কিছুই বুঝবেন না। বিমলা কিছুই বলতে চান না। তাঁর চোখের সামনে শিশু বাদল খেলা করে বেড়াচ্ছে। দুরন্ত দুষ্টু ছেলে ছুটে বেড়াচ্ছে। গায়ে হাতে পায়ে কাদা মাখা। তারপরে বাদল বড় হচ্ছে। কিশোর বাদল স্কুলে যাচ্ছে। মায়ের কাছে দুটো পয়সার জন্য হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। বাদল ছাড়া বিমলার কাছে এখন আর কিছু নেই। বাদল বাদল বাদল। সকলের কাছে ও ছিল একটা পার্টির ছেলে। সন্তান শুধু বিমলার।

হরপ্রসাদের গলার শব্দে কৃপাল দয়ালও এসে দাঁড়াল। ওরা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। ওরা কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না। নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করতে পারছে না। বিমলাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থ হয়ে গিয়েছে।

কৃপাল বলল, 'মা, তুমি এখানে কী করছ?

দয়াল জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

সবাই অবাক। সবাই বিমলাকে বুঝতে চাইছে। কিন্তু ওদের বোঝার কিছু নেই। এরা তাঁর স্বামী পুত্র। এদের ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। কিন্তু আজ তিনি ওদের সঙ্গে নেই। আজ ওরা সারাদিন পার্টি করতে চলে যাক। বিমলা আজ বাদলকে নিয়ে থাকবেন। বাদল এখন তাঁর বুকে।

হরপ্রসাদ বলল, 'ঘরে চল বড়বৌ। এখানে দাঁড়িয়ে ভিজো না।'

বিমলার দৃষ্টি মোড়ের ভাঙা বেদীর দিকে। স্পষ্ট করে বললেন, 'যাব না।'

তিন পার্টির লোক নিজেদের মধ্যে অবাক হয়ে চোখাচোখি করল। কৃপাল বলল, 'রান্না-বান্না করোনি, আমরা খাব কী?'

বিমলা নিচু পরিষ্কার গলায় বললেন, 'আজ আমি খেতে দিতে পারব না।'

তিনটে পার্টির লোক অবাক। বিমলা তাদের কাছে পার্টির থেকেও যেন জটিল হয়ে উঠেছে। দয়াল বলে উঠল, 'আমরা তবে কী করব এখন?'

বিমলা বললেন, 'তোরা আজ তোদের পার্টির কাজে যা। আমাকে ডাকিস না।'

অন্তহীন বিস্ময়ে তিনজনেই চুপ। বিমলা ওদের সামনে থেকে সরে গিয়ে ফণিমনসার বেড়া ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তিনজনেই দেখল। তিনজনের চোখেই অপরিচয়ের দৃষ্টি। যেন স্বামী চিনতে পারছে না স্ত্রীকে। ছেলেরা মাকে। অথচ কোনো কথা বলতেও যেন আর তাদের সাহস হচ্ছে না। এই প্রথম, তারা শুধু অবাক না, বিমলাকে যেন তাদের কেমন ভয় করছে।

তিনজনেই আরও একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল। বাতাসের ঝাপটায় আর বৃষ্টির ছাটে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তিনজনেই একটা অসহায় অস্বস্তি আর বিস্ময় নিয়ে একে একে চলে গেল।

বিমলা তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃষ্টির ছাটে ধুয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বুকের কাছে এখন কিছু ঠেলে উঠছে, গলার কাছে উঠে

আসছে। তাঁর চোখে এখন জল আসছে, বৃষ্টির জলে গাল ধুয়ে যাচ্ছে। তিনি বুকের কাছে হাত রেখে মনে মনে ডাকলেন, 'বাদল, বাদল, তুই আমার কাছেই রয়েছিস। আমার কাছে থাক।'

১৯.২ জীবনকথা ও সাহিত্য-পরিচয়

সমরেশ বসুর জন্ম ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর, জন্মস্থান ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার রাজনগর গ্রাম। বাবার নাম মোহিনীমোহন বসু, মা শৈবালিনী। সমরেশ বসুর পিতৃদত্ত নাম সুরথ। বড়ভাই মন্মথ ও মেজভাই প্রমথর সঙ্গে মিলিয়ে ওই নাম রাখা হয়েছিল। ঢাকার সুতানুরে একবালপুরে তাঁর শৈশবজীবন অতিবাহিত হয়। ঢাকার গ্র্যাজুয়েট স্কুলে তিনি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। এখানে পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার কারণে তাকে মোহিনীমোহন তাঁর বড়ো ছেলে মন্মথ কর্মস্থলে (নৈহাটি) পাঠিয়ে দেন। নৈহাটিতে বড়দার রেল-কোয়ার্টার্সে থেকে মহেন্দ্র উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। নৈহাটিতে এসে ছবি আঁকা, সংগীত-চর্চা, লেখালেখি আর বাল্য প্রেমে মেতে ওঠেন। পড়াশুনার ইতি ঘটে যায়।

মাত্র আঠারো বছর বয়সে সমরেশ পূর্ব কাঁঠালপাড়ার যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বড়ো মেয়ে তাঁর বন্ধু দেবশঙ্করের দিদি স্বামীপরিত্যক্তা গৌরী দেবীকে বিবাহ করেন। গৌরী দেবী বয়সে তার চেয়ে চার বছরের বড়ো ছিলেন। সমাজ এবং পরিবার কেউই এ-বিবাহ মেনে নিতে পারে না। নৈহাটি ত্যাগ করে চার মাইল দূরে আতপুরে জগদ্দলে বসবাস আরম্ভ করেন। বহু কষ্টে এই সময় তাঁকে সংসারজীবন অতিবাহিত করতে হয়। ডিম বিক্রি করে, ছবি এঁকে নানাভাবে অর্থ রোজগার করেন।

জগদ্দলেই তিনি সংস্পর্শে আসেন সত্যভূষণ দাশগুপ্ত বা সত্য মাস্টারের। ইনি ছিলেন বিখ্যাত শ্রমিক নেতা। সত্য মাস্টারের প্রভাবে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। তারপর লাভ করেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ।

১৯৪৩ থেকে ১৯৪৯—এই ছ-বছর সমরেশ ইছাপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির কাজ করেন। ফ্যাক্টরির প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট মার্কার হিসাবে তিনি যোগদান করেন এবং ড্রাফটস্‌ম্যান পদে উন্নীত হন। চাকরির পাশাপাশি পার্টির কাজে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। ব্যারাকপুরে চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে সংযোগ ছিল। ১৯৪৯-এ কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হবার পর সমরেশ বসু ওই বছরই ডিসেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হন। এবং প্রেসিডেন্সি জেলে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অন্তরীণ অবস্থায় নানা ধরনের পুলিশি অত্যাচার সহ্য করতে হয় তাঁকে। একবছর কারারুদ্ধ থাকার পর তিনি ছাড়া পান। এর আগেই পার্টির সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তাঁর। ফ্যাক্টরির চাকরি আর ফিরে পান না। অবশ্য এর আগেই সমরেশ মনস্থির করে ফেলেন যে তিনি লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবেন নিজের বেঁচে থাকাকে। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তিনি পরিপূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন লেখাতে এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ব্যাপৃত থাকেন রচনাকর্মেই।

তবে সাহিত্যিক হিসাবে সমরেশ বসুর আত্মপ্রকাশ কারামুক্ত হবার পর নয়। তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৪৬-এর শারদীয় 'পরিচয়' পত্রিকায়, গল্পের নাম আদাব'। রাইফেল ফ্যাক্টরিতে কাজ করার সময় লিখে ফেলেন একখানি উপন্যাসও, নাম 'নয়নপুরের মাটি'। এরপর কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায় লেখেন আরও একখানি উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ'। দ্বিতীয় উপন্যাসটি ১৯৫১-তে প্রথম প্রকাশিত হয়, যেটিকে সমরেশ বসুর প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস বলে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল—'বিটি রোডের ধারে', 'শ্রীমতী

কাফে', 'গঙ্গা', 'টানাপোড়েন', 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'শেকলছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'দেখি নাই ফিরে' প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য গল্প হল—'স্বীকারোক্তি', 'সানা বাউরীর কথকতা', 'রং', 'প্রসারিনী' প্রভৃতি।

১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ সমরেশ বসুর মৃত্যু হয়।

১৯.৩ গঠন-বিশ্লেষণ

রাজনৈতিক দলের অবক্ষয়কে লেখক শিল্পরূপ দিয়েছেন গল্পটিতে। কোনো না কোনো পার্টির হাতবদল রক্তের রঙে রঞ্জিত। অথচ, লেখক কখনও প্রত্যক্ষ নয়, এমনকি পরোক্ষেও কোনো দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিচয় প্রদান করেন না। অথচ পাঠকের কাছে এ-কথা লেখক বোঝাতে সক্ষম হন বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দল নয়, সব রাজনৈতিক দলই যেন এখানে দিক্‌ভ্রান্ত। সমস্ত রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ লেখক দেখতে চান সাদা চোখে, কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শে তো নয়ই, এমনকি সমাজজীবন-মথিত কোনও মানবিক আদর্শও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে না, একান্তই পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে রাজনৈতিক সংকটটিকে রূপ দিয়ে যেন বিবেকের কাছে প্রশ্ন তোলেন। বিমলা চরিত্রটিই এখানে বিবেকের কাজ করেছে। বিমলার পারিবারিক আবেষ্টনীতে নিজের স্বামী-সন্তানের মধ্য দিয়ে বিষয়টি অবলোকন যেন সমাজজীবনের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে যে ঘনিয়ে ওঠা সংকট তারই ক্ষুদ্র প্রতিরূপ।

বিমলা গোটা গল্প জুড়ে ভেবেছেন তাঁর মৃতপুত্র বাদলের কথা। বাদলের রাজনৈতিক আদর্শ কি সঠিক ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর দেন না লেখক। তবে এ-কথা বলা-যায় বাদলের অন্য চরিত্রগুলির তুলনায় মহত্ত্ব আরোপিত হয়নি। বিমলার স্মৃতি-মন্থনেও কোথাও একথা ধরা পড়েনি সেই ছিল বিমলার সবচেয়ে প্রিয়জন। বাদলের পরিবর্তে যদি কৃপাল বা দয়াল খুন হত কিংবা যদি হরপ্রসাদ মারা যেতেন রাজনৈতিক হত্যালীলায়, তাহলেও কি বিমলার হৃদয় একইরকম বেদনাহত হত না? গল্পটি উপস্থাপনে এই মাত্রাটি সংযোজিত হয়েছে। এখানে হরপ্রসাদ, কৃপাল দয়াল বা বাদলের রাজনৈতিক আদর্শ সঠিক কিনা তা বিচার-সাপেক্ষ, কিন্তু তাদের অবলম্বিত পথ সঠিক নয়। বিমলার ভাবনা-লোক আশ্রয়ে এ-কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন লেখক।

প্রারম্ভিক লগ্ন থেকে শেষ পর্যন্ত গল্পটি আবর্তিত হয়েছে বিমলাকে কেন্দ্র করে। তবে লেখক গল্পটিতে উত্তম পুরুষের জবানি ব্যবহার করেননি, করেছেন প্রথম পুরুষের জবানি। 'জাগরী' উপন্যাসে বিলু-নীলুর মা অন্তর্লোক উন্মোচন করেছিলেন স্বজবানিতেই। সেই উপন্যাসে অবশ্য অন্যান্য চরিত্রগুলিও নিজ জবানিতে বক্তব্য উপস্থাপন করে বহু কৌণিক দৃষ্টিকোণ সংযুক্ত করেছিলেন। 'শহীদের মা' উপন্যাস নয়, ছোটগল্প। আবার প্রতিটি লেখকই একই ধরনের রীতি প্রয়োগ করবেন এমন কোনও অনিবার্যতা নেই। এই গল্পটিতে লেখক উত্তম পুরুষের জবানি ব্যবহার না করলেও মূলত বিমলার দৃষ্টিকোণকেই কাজে লাগিয়েছেন, আবার প্রথম পুরুষের জবানি ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করে উত্তম পুরুষের জবানি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে গেছেন। দৃষ্টান্ত বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে—

বিমলার দৃষ্টিকোণে—১। 'টাইফয়েডের সময়, বাদল যদি পার্টি করতো, তাহলে কী হতো কে জানে। শ্মশানযাত্রার মতোই হয়তো, বাবা-দাদারা দূরে সরে থাকতো। পার্টির কাছে বাবা ছেলে ভাই বলে কিছু নেই।'

২। 'বিমলা কিছুই বলতে চান না। তাঁর চোখের সামনে শিশু বাদল খেলা করে বেড়াচ্ছে। দুরন্ত দুষ্টু ছেলে

ছুটে বেড়াচ্ছে। গায়ে হাতে পায়ে কাদা মাখা। তারপর বাদল বড় হচ্ছে। কিশোর বাদল স্কুলে যাচ্ছে। মায়ের কাছে দুটো পয়সার জন্য হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। বাদল ছাড়া বিমলার কাছে এখন আর কিছু নেই। বাদল বাদল বাদল।'

লেখকের দৃষ্টিকোণ (দৃষ্টান্ত)—১। 'আকাশে ঘন মেঘ। পূবে বাদাস বইছে। উঠোনের একধারে টগর গাছটা বাতাসের ঝাপটায় নুয়ে পড়েছে। এক বছরের শিউলি গাছটাও মাটিতে নুয়ে পড়তে চাইছে। বাড়িটা নিঝুম। কাঠের ফ্রেম, টিনের দেওয়াল, মাথায় টিনের চাল।'

২। 'ওখানে শহীদ বেদী হয়েছিল। কয়েক মাসের মধ্যে ভাঙতে ভাঙতে গোটা কয়েক ইঁটে এসে ঠেকেছে। কেউ তুলে নিয়ে গেলেই আর কোনো চিহ্ন থাকবে না।'

গল্পটি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বর্ণনা রীতিটিও বিশেষ দ্রষ্টব্য। বিমলার স্মৃতিলোক-আশ্রয়ে রচিত হলেও গল্পটিকে একান্তই তার স্বগত-কথন করে তুলতে চাননি লেখক। বিমলার ভাবনাকে অতীতের যে-সকল স্মৃতি ভিড় করে এসেছে সেগুলে প্রত্যক্ষ বর্ণনাতে রূপ পেয়েছে। যেমন—বাদলের ভূমিষ্ঠ হবার দিনটির কথা। বিমলার যন্ত্রণা- কাতরতা, একে একে প্রসবের আয়োজন, সন্তানের জন্মদান, হরপ্রসাদের সন্তানের মুখ দেখা—প্রত্যেকটি অংশের বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। অন্তর্ভাবনা-প্রধান না করে এইভাবে গল্পের কাহিনি-অংশকে সম্প্রসারিত করেন লেখক। প্রত্যক্ষ বর্ণনাতে উপস্থাপনের ফলে গল্পটি বিমলার তথা শহিদের মায়ের গল্প হয়েই থাকে না, বরং আরও বিস্তার লাভ করে।

বিমলার স্মৃতিলোকে উঠে আসা বিভিন্ন দৃশ্যকে বিক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত না করে সন্তানহারা মায়ের যন্ত্রণাটি পরিস্ফুট করার জন্য উপস্থাপনের নির্বাচন-সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। এতে গল্পের গতি ব্যাহত হয় না, বরং মনে হয় গল্পটি বিমলার ভাবনা-প্রবাহে চালিত। যেমন গল্পের শুরুতে বিমলার শরীর কেঁপে ওঠা, বাইরে বেরিয়ে আসা শহিদ বেদী অবলোকন এবং সেই শহিদ-বেদী দেখে বিমলার স্মৃতিলোক উন্মোচন—বহিরঙ্গে গল্পটি এইভাবে একটি ক্রম রক্ষা করে। আবার শহিদ-বেদী দেকে বিমলার একথা মনে পড়ে পার্টির ছেলেদের শহিদ-বেদী নির্মাণ করে তাঁকে নিয়ে যাবার কথা, তারপর বাদলের রক্তাক্ত দেহ, ঠিক এরপরেই আবার আসে বেদী তৈরির কথা। এখানে বিমলার স্মৃতিলোক-আশ্রয় করে ভেঙে দেন লেখক বহিরঙ্গের ক্রমকে। বিমলার যখন পার্টির ছেলেদের কাঁধে বাদলের শ্মশানযাত্রার কথা মনে পড়ে তখনই আবার মনে পড়ে বাদলের টাইফয়েডের সময় বাবা-ভাইদের সেবা ও উৎকণ্ঠার কথা। লেখক এখানে দুটি বিপরীত দৃশ্যকে সচেতনভাবেই পরপর সন্নিবেশিত করেন।

সময়-বিন্যাসের ক্ষেত্রেও লেখকের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রয়েছে। গল্পটিতে বর্ণিত আপাত সময়কালের পরিধি মাত্র কয়েক ঘণ্টা বলা যায়। উনিশে শ্রাবণ বাদলের জন্মদিনে রান্না করতে করতে বিমলা মনে চঞ্চলতা অনুবব করেন এবং কাজ ফেলে তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে পুত্রের স্মৃতিতে আনমন হয়ে যান। তারপর গোটা গল্পটি জুড়ে চলে বাদলের স্মৃতিমন্থন। আপার সময়-কালের পরিধি মাত্র কয়েক ঘণ্টা হলেও প্রকৃত-কালের বিস্তার অনেক বেশি। বাদলের জন্ম, বেড়ে ওঠা, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, খুন হওয়া, পার্টির ছেলেদর কাঁধে শ্মশানযাত্রা, শহিদ বেদী স্থাপন—সমস্ত কিছুই রূপ পায় গল্পটিতে।

গল্পটির ভাযারীতির পরিচয় নিতে গিয়ে প্রথমে চোখে পড়ে এর বিবৃতি-ভাষা সরল, আড়ম্বরহীন। লেখক সংক্ষিপ্ত বাক্যে প্রায় সমগ্র গল্পটি রচনা করতে চেয়েছেন যে কোনো অংশ থেকেই এর উদাহরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে—'হরপ্রসাদের গলা। বিমলাকে ডাকছেন। বিমলা সাড়া দিলেন না। মুখ ফিরিয়ে নিলেন।'

প্রত্যক্ষ বর্ণনাতে গল্পটি উঠে আসেনি। অন্তত প্রত্যক্ষ বর্ণনার ক্ষেত্রেও বিমলার ভাবনা-আবর্তেই তাকে রূপদান

করতে হয়েছে। ফলে পালটে গেছে এর ভাষা—'বিমলা আপন মনে মাথা নাড়লেন। তাঁর ঠোঁট নড়লো। না, বাদল ওখানে নেই। বাদলকে শ্মশানেই দাহ করা হয়েছিল। মাস তিনেক আগে, বেদীটা যখন তৈরি হলো, তখন ওরা বিমলাকে ডাকতে এসেছিল। বাদলে মা বিমলা, শহীদের মা। তাই ওরা ডাকতে এসেছিল, বাদলের বন্ধুরা, পার্টির ছেলেরা। শুধু বিমলাকে ডাকতে এসেছিল। ....বাদলের দলের ছেলেরা কেবল বিমলাকেই ডাকতে এসেছিল। শহীদের মাকে।' লক্ষণীয় বিমলাকে শহিদ বেদী তৈরির পর পার্টির ছেলেদের ডাকতে আসা—এই তথ্যটি বিমলার ভাবনা-আশ্রয়ে রূপ পায় বলেই বহুভাবে কথাটি বারবার ফিরে ফিরে আসে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবৃতির মধ্যেই লেখক বিমলার নিজস্ব ভাষণকে সংযুক্ত করে দেন। ফলে ভাষা সেখানে অন্য চেহারা নেয়। যেমন—'পার্টির কাছে বাবা ছেলে ভাই বলে কিছু নেই। পার্টির পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। একে কেমন পার্টি করা বলে, বিমলা বোঝেন না।' কিংবা 'যতই অস্বীকার করুক, কোনো না কোনো পার্টির হাতেই বাদলের রক্ত লেগে আছে। সেটা কোন্ পার্টি? কৃপাল, দয়াল, হরপ্রাদের কথা আগে মনে আসে। ওরা সকলেই বলেছে, বাদলের মরণ ধরেছে। অথচ তারা বিমলার স্বামী-পুত্র। বাদল কি হরপ্রসাদের ছেলে ছিল না? কৃপাল দয়ালের ভাই ছিল না? কেবল কি পার্টির ছেলে? ওদের বিরুদ্ধ পার্টির ছেলে? বাদল কি এই সংসারে একমাত্র বিমলারই ছেলে?

১৯.৪ নামকরণ

সব শেষে বলা যায় নামকরণ প্রসঙ্গ। সমগ্র গল্পটির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বিমলা চরিত্রটি। ফলে গল্পের

'নামকরণও বিমলা-কেন্দ্রিক হবে এটি স্বাভাবিক। তবে গল্পের নাম বিমলা নয়, 'শহীদের মা'। কারণ বিমলার ভাবনা আবর্তিত হয়েছে বাদলের মৃত্যুকে আশ্রয় করেই। আমরা প্রথমেই জানিয়েছি বিমলা-চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানুষের সুপ্ত বিবেকবোধকেই নাড়া দিতে চেয়েছেন লেখক। রাজনৈতিক অবক্ষয়কে ঘিরে এই মানবিক বার্তাটি আর অন্য কোনো চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করলে এতখানি মর্মভেদী হয়ে উঠত না, আবার সন্তানের মৃত্যুকে আশ্রয় করে প্রকাশ না করলে তার বেদনাবোধ এতখানি স্পর্শ করত না। অবশ্য গল্পটিতে নামকরণে সামান্য হলেও ব্যঙ্গের ছোঁয়া আছে। বাদল মারা গেছে রাজনৈতিক পার্টির দ্বন্দ্বে। যারা বাদলকে হত্যা করে তারা যেমন নীতিভ্রষ্ট, তেমনি বাদলের মৃত্যুও তো বৃহত্তর আদর্শের কারণে আত্মবলিদান বলে আমরা চিহ্নিত করতে পারি না। বাদলের পরিবর্তে কৃপাল বা দয়াল খুন হলে তাদের নিজের দলের কাছে শহিদ বলেই চিহ্নিত হত। অথচ 'শহিদ' শব্দটি যে ব্যঞ্জনা আমাদের মনে সৃষ্টি করে তা স্পর্শ করে না এই মৃত্যু। স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরগতিপ্রাপ্ত সন্তানের মৃত্যুতে বেদনাবোধের সঙ্গে যেখানে মায়ের মনে একধরনের গর্ববোধ মিশে থাকে তা এখানে তৈরি হওয়ার অবকাশ নেই। ফলে বিমলা শহিদের মা ঠিকই, কিন্তু এই মা সন্তানের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজনীতির নামে হত্যা-কান্ড সম্পর্কে এক জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। নামকরণ এখানে যেন সমগ্র গল্পটির অভিপ্রায়িক ব্যঞ্জনাকেই তুলে ধরে।

১৯.৫ অনুশীলনী

১। 'শহীদের মা' গল্পে রাজনৈতিক অবক্ষয়ের স্বরূপ নির্ণয় করুন।

২। 'শহীদের মা' গল্পে লেখকের চরিত্র-চিত্রণ ক্ষমতার পরিচয় দিন।

একক ২০ ❑ জাতুধান—মহাশ্বেতা দেবী

গঠন

২০.১ মূলগল্প

২০.২ জীবনকথা ও সাহিত্য-পরিচয়

২০.৩ গল্প-বিবরণ

২০.৪ গঠন-বিশ্লেষণ

২০.৫ নামকরণ

২০.৬ সমাজপ্রেক্ষিত ও চরিত্র নির্মাণ

২০.৭ সারাংশ

২০.৮ অনুশীলনী

২০.৯ গ্রন্থপঞ্জি

২০.১ মূলগল্প

জাতুধান মানে যে রাক্ষস, তা সাজুয়া তিওর কোনোদিন জানতে পেত না। রাম সিংগির মাতৃশ্রাদ্ধে সে উপাধিটি অর্জন করে। ভাগীরথীর কূলাশ্রিত বেলেটি নামক সেমি-শহর ও সেমি-গ্রামের তিওর পাড়ার অশেষ সৌভাগ্য, রাম-জননী অঘ্রানের ধান গোলায় তুলে, নবান্নের উৎসব সেরে তবে মারা যান। শ্রাদ্ধ হল অসাগর ধানচালের দিনে। রাম সিংগি একদা জমিদার ছিল, তিওররা ছিল তার প্রজা। বর্তমানে রাম সিংগির জমিতে তারা বর্গাদার। ফলে উপসী কেননা উক্ত জমিটি চর-জমি। ভাগীরথী, চরটি এ-সনে ভাসান, ও-সনে ডোবান। তবু মাতৃশ্রাদ্ধে রাম সিংগি সকলকেই ডাকে। বাইন কেটে ভাত রাঁধা হয়। সায়েব বাড়ির বাথরুমের বড়ো বড়ো টব, নিলেমে কেনা, তাতে ডাল চালা হয়। তিওররা কাঠ আনে, কলাপাতা, উঠোন চাঁছে এবং ভরা শীতে; বর্ণোচ্ছেদের জাত বাঁচাতে বাইরে বসে থাকে। সেখানেই ওদের পাত পড়ে।

সাজুয়ার সামনে এসে রাম সিংগি অন্যদের বলে, 'এর কথাই ভাবছিলাম। মা ওকে বসে খাইয়ে গেছে। পাকা দু কিলো চালের ভাত জলপান খাবে, আবার বিকেলে আড়াই কিলো চালের ভাত।'

সাজুয়ার সামনে এসে রাম সিংগি অন্যদের বলে, 'এর কথাই ভাবছিলাম। মা ওকে বসে খাইয়ে গেছে। পাকা দু কিলো চালের ভাত জলপান খাবে, আবার বিকেলে আড়াই কিলো চালের ভাত।'

সাজুয়া কথা না বলে খেয়ে যাচ্ছিল। ওদের বেলা ভাত-ডাল-কুমড়োর ঘ্যাঁট ও মাছের টক। ভাতের পাহাড় উড়িয়ে দিচ্ছিল ও, কথা না কয়ে। ওর রাক্ষুসে খাওয়া লোকে দেখে, ও জানে। ও তাতে বিচলিত হয় না।

পুরুত দাওয়ায় বসে দেখছিলেন। তিনি বললেন, 'মিষ্টি মেঠাই তাহলে ওই ওড়াবে?' সাজুয়া মাথা বাঁকাল। রাম সিংগি বলল, 'না ঠাকুর মশাই। ভাত খাবে পাহাড় প্রমাণ, সাজুয়াকে জব্দ করতে হলে মিষ্টি দেন পাতে। আট-দশটা খেলেই মুখ মরে যাবে।' পরিবেশকরা সাজুয়াকে আবার ভাত দিল, ডাল। বলল, 'মাছ খাবি না?'

'খাব।'

'ডাল দিয়ে বেটা পাহাড় সাফ করছে।'

'তুমি দিবার, দিয়ে যাও না মশাই।'

'লয় লিয়ে যাস?'

'মশাই, যত খেলাম, তত খাব। লিয়ে যাব কাল। এঁটো বাসি লিব। আজ খাব।'

'হেই সাজুয়া, মরবি বাপু।'

'তা দেখ, মা জননী লিত্য মরবে?'

দেখতে দেখতে পুরুত বললেন, 'এ বেটা জাতুধান। মানে রাক্ষস।'

সাজুয়া খেয়ে এসে বামুনকে প্রণাম ঠুকল। বলল, 'কী বলছিলে হে ঠাকুর? খাওয়া দেখছিলে? খাওয়ার লেগে রাক্ষস মোরে বলে সবাই। উ পরিবারও বলে। লামে কী হয়? পেটে খেলে লামের লাথ সয়।'

সাজুয়ার বউটি ছোটো-খাটো, গোল-গোল গড়নের শ্রীময়ী মেয়ে। সে ফিক করে হাসল। পুরুত বললেন, 'রাক্ষস কি হে! তুমি বাবা জাতুধান। "রাক্ষস" নামে জাঁকজমক নাই।'

জাতুধান বললে বেশ মানাচ্ছে। 'তা ভালো।'

'তা বাবা, পেটটি করেছ বড়ো, পেটের অন্ন জুটাতে তো মুশকিল।'

'জুটে কই? জুটে না তো? যেদিন জুটবে, খুব খাব। না জুটলে পেটে কিল।'

সেই থেকে সাজুয়া জাতুধান। আর সবাই ভোজ পেয়েছে, ও একটা সম্মানি খেতাবও পেয়েছে। জাতুধান। নামটি ওর পছন্দ হয়েছে, উচ্চারণ করতে জিভেও এড়ে না। কাজ, মানে চাষ-কাজ যখন থাকে, তখনি ওর পেট ভরা মুশকিল। যে বছর চর নেই, চাষ নেই, সে বছর ও বেরিয়ে পড়ে। যতদিন পারে রাম সিংগির কাছে ধার নেয়। তারপর বউ ওর সে লুংগি, গেঞ্জি, গামছা কেচে দেয়। পোঁটলা বেঁধে ও রওনা দেয়।

বউ বলে, 'যেও না।'

সাজুয়া বউকে আদর করে। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলে, 'যেতে মন উঠে না। কিন্তুক, এই দশ দিন কিলো চালে তোর আর মায়ের অনেক দিন যাবে। আমি রইলে সব খেয়ে ফেলব। পেট মেরে খাও, ঘরে থাকো।'

সাজুয়া গভীর, অপ্রতিরোধ্য দুঃখে মাথা নাড়ে। বলে, 'তাই যদিক পারতম। ঘরে চাল আছে, ভাত খাব নাই, এ ভাবলে মোর মাথায় বাসুকি নড়ে। আমি রইতে তোদের আসান নাই। তাথে তুই কাজও করতে পারবি।'

'কোথা যাবে?'

'দেখি, মাতং যেথা লয়ে যায়।'

মাতং ওদের নেতা এবং বছর বছর মাতং ওদের নিয়ে রাঢ় দেশে চলে যায় ধান চষতে। সাজুয়ার বিশেষ ব্যবস্থা। পেট ভাতায় ধান চষে, কাটে, মজুরি ও ধান নেয়। শীতের মুখে নৌকোয় ধান চাপিয়ে এসে পড়ে।

নিজেই বোঝা বয়ে আনে। মাতং-এর ওপর ওর এবং ওদের অগাধ বিশ্বাস। অবিশ্বাস্য কম মজুরি ও পেট ভাতায় কন্ট্রাক্টরদের পথ মেরামতি, জোগালি কাজ, চাষের দেওয়ালি কাজ ইত্যাদির এক বিস্তীর্ণ গুডউইল-মার্কেট তৈরি করেছে ও। কোনো-না-কোনো ভাবে ও লোকগুলিকে বাঁচায়।

সাজুয়াকে মাতংও বলে, 'রাক্ষস বলতাম, জাতুধান হলি। তা ভালো। কিন্তুক আমি ক দিন? এই বুড়া মরলে তোদের হবে কী? কাজের সুতারশি ধরে নিবি, তা এমন খাওয়া খাস, যে দেখে মানুষ ডরায়।'

'সে বার? কাটোয়ায়?'

মাতং হু হু করে হাকে ও বলে, 'সেবার কী হল শোন্ সাজুয়ার মা। কাটোয়াতে চাষ করে আমরা চলে আসব। কুণ্ডুবাবু তো বাড়িতে সত্যনারাণ দিছে। তার কাকা শোঁসাচ্ছিল, তা বুড়া সিদিনই মোল্। অশুচ লেগে গেল। যত ভাত তরকারি ফেলা যাবে, ফল-সিন্নি। তা এই হতভাগা বলে, দাও দেখি, খেয়ে লই।

—খেল বটে! সেদিন খেল, জাড়ের কাল, পরদিন খেল, আমরাও খেলাম, কিন্তুক ও খেল আমাদের দশজনার সমান।'

সাজুয়ার মা ক্ষিপ্র হাতে বাঁশের চেঁচারি চিরতে থাকে ও বলে, 'ও পেটে, মোরা ক্যানিং টাউনে, পঞ্চাশের আকাল হল। তা আকালের যত মানুষের যত খিদা ওর পেটে।' মাতং বলল, ওই ভাতের খিদা'। কোথা যাব, খেতে এসে ধান পুজবে, তা পূজার ফল মিষ্টি-বাতসা ওর রুচে না।'

সাজুয়া বলল, 'ভাত হতে মিষ্টি কী, মোরে বল দেখি? উ শালোর বাত্‌সা—মুড়কিতে মখ মেরে ল্যায়। থুঃ!'

এই রকমই সাজুয়া। আমাদের জাতুধান। কালো, বিশাল দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল; কঠোর পরিশ্রমী বলে যা খায়, তা গায়ে লাগে।

বউ এখন হাসে ও মাতংকে বলে, 'রঙ্গ দেখ যদি। সেদিন ঘরে চাল নেই। আমি আনতে গেলাম। খুব ঝড়। মা বলে, ছাগল দুটা ঘরে উঠা। তা হোথা শুয়ে র'ল খোসলাগায়ে? বলে কি! বাতাস ছাগচল উড়াক, কান্দীতে নিক, ফরক্কায় নিক, আমি লড়ব না। অঙ্গ লাড়লে খিদা চেগাবে। তোর বউ আসুক, কতখানিক চাল আনে দেখি, তখন যদি বা বা—বাতাস থাকে, তাইলে তোর ছাগল, সবার ছাগল তাড়য়ো লয়ে ঘরে উঠাব।'

মাতং বলে, 'সেদিন তুমু শালো, মনিবের পাঁঠা ঘরে উঠালছ। ঝড়ের দিনে। মনিব জানে না, আঁ? তুমু?' 'আরে মোর ন্যাকা ভীম। সেদিনই তুমি, গোকুল, ফাগুলাল, মাঁস খেছ, দিঁই নাই?'

'যাঃ, খাছিস তো খাছিস।'

'খুড়া, সমসারে ত্যাত চাল, ত্যাত খাসি, ত্যাত সামিগগি। মনির বেটার পেটে নানা রোগ। খেতে পারে না। আমি পারি।

জুটে না। তাতেই জুটাতে হয়। মাঝ মধ্যে।'

এবার বর্ধমানে নিব।'

'খুব খাব। জিংলা সিজাব, বেগুন পুড়াব, লুন মরিচ মেরে দিব। আঃ। বর্ধমানে কত ধান রে। কানাল ছুটে যেমন নষ্ট মাগি, ধান হয় যেমন মাটির অঙ্গে মায়ের দয়া। খুব খাব!'

কথাবার্তা হয়ে যায়। সাজুয়া ঘর ছাড়ে। গভীর, গভীর পত্নী প্রেমে, জননীর প্রতি ভালোবাসায়। ও থাকলে, এই টানের দিনের সব চাল খেয়ে ফেলবে। ওরা বউ শাশুড়িতে, আজ আমানি, কাল পন্তি, পেট মেরে মেরে খাবে ক দিন ধরে। চলে যাবার কালে কোলের ছেলেটা, একমাত্র পুত্রসন্তান ওদের, গোঁদা নুনা শিশু জগন্নাথের জন্যে সাজুয়ার কষ্ট হয় এবং ভাবে, ফরক্কায় চারিদিকে কত রাস্তা। ব্যাবসা, বাণিজ্য, ওকে কেন পেটের ভাতের জন্য চলে যেতে হয়?

মা বলে, 'তার আনিস।'

বউ বলে, 'লাল নীল নাইলং সুতা।'

ও বলে, 'আনব।'

তার এবং বেত এবং নাইলন সুতোয় বেঁধে নানা রকম ডালা, ঝাঁপি, সাজি তৈরি করে এরা বাঁশ চিরে-চিরে। মহাজন নিয়ে যায়। এ ভাবেই চলে, চলতে থাকে, যতদিন না নতুন চণ্ডে বান আসে।

রঙের ধান, চন্তের ধান। আকাশে মেঘ ঘুরে-ঘুরে ফেরে। চেপে বৃষ্টি হয় না। যেন শরতের বৃষ্টি। আসে যায়, আসে যায়। সাজুয়ার মা বলে, 'যত জল সব শওরে? চাষী-বাসী দেশে জল নেই?'

'থাক না থাক, এবার অসাগর ধান, মা!'

ধান এবার হবেই হবে। গাছের গত্‌ কি, এই মোটা। পাতাগুলি ঘন সবুজ, তেজাল। চরাল, জমি, সরকারি সার, খুব জেঁকেছে চাষ।

সাজুয়া জগন্নাথকে কোলে নিয়ে লুফল। বলল, 'বউ। চল তোরে চর দেখাই।'

'তুমি দেখ।'

'চল।'

'মহাজনের দাদন্‌।'

ধান-কাটার সময় অবধি এদের পেট চলে মহাজনের দাদনে। সাজি-ডালা-কুলো তৈরি করে। সাজুয়া বলল, 'র, আমি চিরে দেই?'

'দিলে' খেতে চাইবে।'

'হ হ। বলতে দিব না কিছু। ধান-চাল বাড়ি লিয়ে আসছি।'

মা বলল, 'ত্যাত বুদ্ধি। তাতেই রাম সিংগি পাওনা কাটে তোর?'

'এবার একটা ডাবা আনব।'

'গোরু কোথা?'

'গোরু কেন? বড়ো হাঁড়িতে ভাত রান্‌বি, ফ্যানে ভাতে ডাবায় ঢালবি, আইম লুন-মরিচ ফেলব আর খাব। এক ডাবা।'

বউ বলল, 'তবে আর কি! খুব গজাবে, লেজ গজাবে, শিং বেরাবে।'

সাজুয়া রাগ করল না। ওদের সমাজে সাম্যবাদ। মা বুড়িও বসে খায় না, বউও বসে খায় না। ওরা সম্বচ্ছর খেটে খায়। সমানে-সমানে কথা ওদের মধ্যে চলে। মা ওদের হাসি শুনল, বলল, 'ঘরে বসে রঙ্গ। যা না, গিন্নি মা বাগাল চাঁছাবে?'

রাম সিংগির নারকোল গাছগুলির পাতা চেঁছে কাঠি বের করার কাজটি সাজুয়া নিজেই নিজেকে দিয়েছে। তখনি ও মনিব বাড়ি গেল। কপাল ওর খুবই প্রসন্ন। মনিব্যান বলল, 'বাইরে শুনে যাস।'

'কেন, মনিব্যান?'

'শোন্‌ গা।'

রাম সিংগি বলল, 'কাজ আছে, বুঝলি? নারকেল বাগানে চালা বাঁধ ক'টা।'

'কেন?'

'বেটা জাতুধান। খেতে জানে, ভাবতে জানে না। গোরু-মোষ রাখতে হবে না?'

রাম সিংগির গাই-মোষ অনেকগুলি। দুধের টাকা মনিব্যানের নিজের টাকা। বছর তিরিশ আগে, বাঁজা মনিব্যানের সম্মতি নিয়ে রাম সিংগি শালীকে বিয়ে করে। সম্মতি দিয়ে মনিব্যান ডাক ছেড়ে কাঁদতে বসেছিল। তখন রাম সিংগি এক আঁজলা টাকা দিয়ে বউকে বলে, 'মোষ কেন, মাদী মোষ। দুধ বেচ। এ তোমার স্ত্রীধন হল।'

সিংগির দ্বিতীয় পক্ষ পুত্র ধন বাড়িয়েছে বছর বছর। ছেলের মা। মনিব্যান বাড়িয়েছে স্ত্রীধন। দুধাল গাই মোষ নিয়ে তিনজন ভাগীরথীর পাড় ঘেঁষে থাকে। পর পর চালা ঘরে সমৃদ্ধ বাথান।

সাজুয়া রাম সিংগির কথা শুনে, কেন গোয়াল তুলতে হবে তা জিজ্ঞেস করল না। সে কথা মনেই এল না ওর। ও বলল, 'সে ধরেন যেয়ে গোরু-মোষ অ্যানেক। তা, টান চালা বেঁধে দিব। মাতংরে বলি? ওরা যা লিবে তা লিবে। আমার শুধু পেট খোরাক আর বিড়ির পয়সা।'

'পেট খোরাক?'

'দু বেলা।'

'অ্যাঁ?'

'হাঁ বাবু। তাতে ঘরে চাল বাঁচবে। মা বউ খেয়ে বাঁচবে।' রাম সিংগির কথাটা খুব পছন্দ হয়নি। তবে মনিব্যান বলে পাঠাল, 'সাজুয়া দু বেলা কেন, চার বেলা খাবে। কোনো কথা জানি না হয়। আমার গোরু-মোষ আমার সন্তান।'

ভরপেট ভাত খাবে, সেই আনন্দে সাজুয়া সব ভুলে গেল। মাতংকে ডাকতে গেল।

মাতং সব শুনে বলল, 'অ্যাঁ? বাথান উঠাবে? কে?'

'তা শুধাই নাই।'

বেটা জাতুধান লিচ্চয় বান ডাকবে।

'হাঃ, লদী দেখে বুঝ না?'

'বুঝ না? বেটা পেট চিনে। ভাত খাবে, তাতেই লাচ কত। শালা, এখন লদী দেখে বান বুঝা যায়? ফরক্কার জল ছাড়বে লিচ্চয়।'

'আঁ? জল ছেড়ে সব ভাসাবে?'

'আমি জানি।'

ওরা দুজন রাম সিংগির কাছে এল। রাম সিংগি কথাটাকে গুরুত্ব দিল না। বলল, 'যারা নাবালে আছে, তাদের ভয়। বাথান নাবালে। তাতেই সরাই। তোদের ঘর ডাঙায় লয়? তোদের ভয় কি?'

'যদি বান ডাকে?'

'বান ডাকলে শালারা আমার কাধে চাপ না? আমার চালের ছান্দ কর না?'

মাতং বলল, 'তোমার সরকার দেয়, তাতেই দাও। লইলে কি দিতে?'

'ওই করেই তো চলছে বাপু। তোরাও পেলি, আমিও দিলাম সরকারও দেখল। যা বাপ, চালা খুঁটি আন্ গা। নতুন খ্যাড় দিলাম।'

চালা কেটে, খুঁটি উপড়ে, নারকোল বাগানে নতুন বাথান বাঁধতে-বাঁধতে দু দিন গেল। মনিব্যান সতীনকে নিয়ে ভাত, কলাই ড্যাল, আমড়া পোস্তর টক রাঁধল। অনেক খাওয়া। কিন্তু সাজুয়ার মনে কোথায় খোঁচ ঢুকে গেল, মাতঙের।

কাজ সারা হলে মাতং বলল, 'বাস চেপে বহরমপুর যাব? সেথা সকল খবর পাব।'

'কে দিবে খবর? মাজিস্টর?'

'তাই যাও।'

'আগে মা বইত, খাল পাড় উঁচু রইত। ফরাক্কা হয়ে, হতে কানে-কানে জল। এত্টুক্ বাড়লে পাড় ভাসবে।'

'ডাঙায় ঘর।'

'শালা শুধা পেট চিনে। ঘর তো ডাঙায়, চর কি ডাঙায়?'

'না না, চর কখনো ডুবে? মা যখন ডুবায়, তখন ডুবায়। ভাসায় যখন, তখন ডুবায় না। এবার নিজে ভাসাল, ধান দিল, ডুবাবে?'

'জানি না।'

'পাড়ে যেয়ে হামু টেনে দেখলাম, পিঁপড়া তো ঠাঁই ছেড়ে যায় নী?'

'রাম সিংগি নিশ্চয় কিছু জানে।'

'চল চরে যাই!'

'দেখে লই দু-চারদিন।'

দু-চার দিন সময় দিল না ভাগীরথী। বৃষ্টি নেই, মেঘ নেই, শুক্ল-পক্ষের নির্মল আকাশ, পাড় ছেড়ে নদী নিঃশব্দে ডোমপাড়ায় ঢুকল।

ডোমদের চেঁচামেচি শুনে প্রথমে সাজুয়ারা ভাবে, ওদের শুওর পালিয়েছে। শুওর ওদের মাঝে মাঝেই পালায়। তখন হই হই পড়ে যায়।

তারপর ওরা বুঝল, এ অন্য কোনো বিপর্যয়। আলো এবং লাঠি নিয়ে ওরা বেরুল। কিছুদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। জল সর্বত্র জল। বাবলা বনের ফাঁক দিয়ে জল। একটা কুকুর ছুটছে।

মাতং চেঁচাল, 'হা পতিত! সদন হে! উঠে এস তোমরা!'

'আলো ধর হে এ-এ-এ!'

'ধরলাম!'

সাজুয়া বলল, 'এখনো হাঁটু পরিমাণ। লেমে উদের টেনে আনি। ইঃ! এ যে বেপজ্জয় জল হে। ত্যাত জল?'

ওদের টেনে টেনে পাড়ে তুলতে সকাল হল। নির্মেঘ আকাশ। নির্মম সূর্য। ভাগীরথী ফুলে ফুলে উঠছে, জল দুপাড়ে ছড়াচ্ছে।

রাম সিংগির বাগানে ওরা চলে এল। রামের ছেলে বহরমপুরের বন্যা-কন্ট্রোল আপিস থেকে খবর আনল। জল না ছাড়লে ফরক্কা বাঁধ ভেঙে যেত। পদ্মা চ্যানেলে জল বহানো সম্ভব নয়। বড়ো বড়ো বিপর্যয় প্রতিরোধ করতে গিয়ে এই বন্যা। রামের ছেলে মহোল্লাসে বলল, 'মেলেটারি লেমেছে। হাইওয়ের উপর নৌকা চলছে, নৌকো বোঝাই মানুষ আনছে। ক্যাম্প হবে, চাল-আটা-ওষুধ-কাপড়, খুব বেবস্থা।'

'হেথাকার কী ব্যবস্থা?'

'আমাদেরই করতে হবে।'

'তুই আবার যা। গম আন্। ভেঙে সিজ্জো থাক। তত শ মানুষকে চাল দেওয়া যায়?'

মনিব্যান রাম সিংগিকে ভেতরে ডাকল। ছেলেপিলে হয়নি, বাঁজা মানুষ, পঞ্চাশে পৌঁছেও শক্ত শরীর। মনিব্যান বলল, 'চাল দাও, লিখে দিও। কাটিব।'

'তা ত লিখবই। চাল দেব?'

'দাও। বেপজ্জয় দুগ্গাতি মা!'

'দেখি!'

বিকেলের মধ্যে ডোমপাড়া রইল না। জলের চাদর বিছিয়ে গেল সর্বত্র। বাবলা গাছের মাথা জেগে থাকল। রাম সিংগি সাজুয়াদের বলল, বাইরে চালা বাঁধ। এবার বাবুদের টনক নড়বে। আসবে সব। জল যদি বেলেটির খালে ঢুকে, আবাদ ভাসবে। শালারা বছর বছর দেখে যায় আর 'হবে হবে' বলে। সাজাখালির বাঁধটা সারালে জল ঢুকত? সাজুয়ারা বলল, 'ওরা করুক।'

'তোরা?'

'মোরা চলে যাব।'

'কেন?'

'মোদের জান সেথা।'

'চর! চর আছে?'

মাতং অভিজ্ঞ লোক। সে বলল, 'না থাকবে বা কেন?'

'চর ডুবলে সাজাখালি ডুবে। সাজাখালিতে পুলিশের ঘাট-চৌকি। ডুবলে জানতাম না? তুমি খবর পেতে না?'

রাম সিংগিও খুব চিন্তিত। বলল, 'অসাগর ধান রে! গেলে আমারও গেল। তোরা যাবি বলছিস, তা বোট মারা পড়বে না তো?'

মাতং গভীর হতাশায় বলল, 'বাবু! বাথান সরালে সদর হতে খবর পেয়ে। একবার বললে না, তাতে ডোম পাড়া ডুবল।'

'বুঝি নাই রে বাপ!'

'বুঝি নাই রে বাপ!'

'বোট মারা পড়বে বলে মনে লেয় না। জল যেমন হেলা-দোলা নাই। নিচ হতে ঠেলে কে উচা করে। কোন দেশ বাঁচাতে মোদের ভাসায়?'

প্রশ্নটি বেলেটির মাতং তিওর করে, উত্তরটির সঙ্গে বহু দপ্তর, ব্যক্তি, একাধিক রাজ্য ও রাষ্ট্র জড়িত। রাম সিংগিও সব জানে না। নানা কথা মনে হয় ওর। সদরের খবর, জল ছাড়া হবে। রাম সিংগি জানত, বাথান সরাল। সরকার খবর ঘোষণা করে মানুষজনকে ডাঙা জায়গায় আসতে বলতে পারত, বলেনি। সরকারের কাছে "বন্যাগ্রস্ত" ঘোষিত না হওয়া অবধি বেলেটি কোনো অস্তিত্ব নয়। রাম সিংগি তা বলতে পারে না। সেই বেলাটি। দুর্গত ডোমরা সামনে বসে আছে। সরকার যদি ত্রাণে সাহায্য না দেয়, তাহলে সে গেল। এরাই খেপবে, এবং যে সাজুয়া জাতুধান, আহার বিনা কিছুই বোঝে না, সেই সকলকে নিয়ে বলবে, 'গোলার চাবি দেন।' এ রকম তিক্ত অভিজ্ঞতা অতীতে রাম সিংগির দুবার হয়েছে। তিক্ত। "গোলার চাবি দেন" যদি বলে অত্যন্ত চেনা মানুষ, তাহলে সম্পর্কে ফাটল ধরে। কিন্তু তারপরেই সাজুয়া প্রত্যহের মতো অতীব নর্মাল ব্যবহার করেছে। বলেছে, 'বাগান সাফ করলে বাগাল নিব। ঘরে শলা নাই।' নানা মিশ্রিত চিন্তা ধাক্কা দেয় রাম সিংগির মনে এবং সে বোঝে, চরের সতেজ, সুপুষ্ট ধানগুলির জন্য সে উদ্বিগ্ন। বলে, 'নৌকায় যা। চিড়াগুড় লয়ে যা। জলের গতিক কে জানে? যদি আজ না ফিরা হয়?'

ভাগীরথী উঁচু হচ্ছে। জলে কচুরিপানা, ঘরের চাল ও খুঁটি, মরা গোরু। সাজুয়া বলে, কুনো গেরাম খেয়ে আসতেছে বুঝি? ইঃ। লতুন খ্যাড় গো চালে, লতুন খুঁটি। কার সাধের ঘর গো!'

মাতং জল দেখে। বলে, 'ই লতুন বান। জল ছাড়ে। দেশ ভাসায়।'

সাজুয়া বলে, 'হুই পদ্মা, হেই ভাগীরথী। মাঝে এত্টুনি ফারাক, তিরতির করে। যদি উ ফারাক ভাসে, তবে?'

'বাব-ঠাকুরের কাছে যাবি শালা। ফারাক ভাসলে, পদ্মা-ভাগীরথী হাত মিলালে জেলা থাকবে? শালা জানে পেটে খেতে, আর ফাল কথা বলতে।'

সাজুয়া চুপ করে যায়। গেরুয়া জলরাশির ওপর দিয়ে কালো নৌকাটি যায়। ভাগীরথীকে দেখে মাতং বা সাজুয়া বা গগন বা ঈশানের এখন "মা" মনে হয় না। ফরাক্কার জল পাবার পর এক এক নতুন ভাগীরথী।

নদীর চেহারা নেই তার, চেনা চেহারা। নদীর পুরনো চেহারায় গ্রীষ্মে চড়া পড়ত, তিন-চার ধারে জল বইত, তাতে ডুব জল— সাঁতার জল থাকত। পাড়ে ধরে নামলে জল। বর্ষায় টাবু—টুবু। এক সময়ে বর্ষায় বড়ো নৌকো চলত, কলকাতা থেকে স্টিমার আসত। এখানকার ভাগীরথীর চেহারা কানালের মতো। সম্বচ্ছর জল। দু পাড় ছুঁয়ে। জল ভালো, খুব ভালো, শুধু এ জলের নদীর চেহারা বা স্বভাব নেই। আকাশে জল নেই, নদীতে বান, কে কবে শুনেছে?

দূর থেকে চর চোখে পড়ে। গেরুয়া জলের বুকে এক খণ্ড পান্না ভাসছে, সাজুয়া বলে, 'জয় মা। গঙ্গা পুজায় ডালি দেব।'

চরটি অক্ষুণ্ন আছে দেখে ওর আর মাতংদের চোখ দিয়ে অপ্রতিরোধ্য আবেগে জল ভরে আসে। মাতং এক আঁজলা জল নিজের ও অন্যদের মাথায় ছেটায়। বলে, 'দোষ নিয়ো না মা। কটু কথা বললাম কত!' বলে 'পূজায় সবে ডালি দিব।'

চরটি কাছে আসে ক্রমশ। ধান বোনার সময়ে রাতে থাকতে হত বলে মাচাঙে চালা। ধান পাকলে পাহারা দিতে পাখির হাত থেকে—চালাটি কাজে লাগবে। ওরা মাচাঙের নীচে যায় ও দাঁড় দিয়ে পেটায়। সাপ নেই। মাতং বলে, 'জলের টানে সাপ অন্যত্তর যেছে।'

ওরা মাচাঙের নীচে বসে। চিড়ে ও গুড় খায়। তারপর সাজুয়া মাচাঙে ওঠে। চেয়ে দেখে। মাতং বলে, 'কী দেখিস?'

'জল'।

'কতদূর দেখা যায়?'

'সাজাখালি।'

'তবে ভয় নাই।'

'কত ঘরের চাল, পানা কত রে!'

'খেতে খেতে আসছে।'

'উনিও জাতুধান হল?'

'হয়। লদী রাক্ষসী হয়।'

নেমে এসে ওরা খেতের আগাছা খানিক উপড়োয়। তারপর সাজুয়া বলে, 'আমি থাকি। খেয়েছি, এখন কষ্ট লাই আর। তোমরা খেয়ে, সকলরে লয়ে এস। ঘাস না উঠালে ধান যাবে।'

'নৌকা আছে তত? চর ফেলাল, হেঁটে আসব, তা ফরক্কা হতে সকলে বিস্মরণ।'

'মেয়ে ছেলা লয়?'

ওরা সাজুয়াকে রেখে চলে আসে। বিড়ি চেয়ে নেয় সাজুয়া। হেঁকে বলে, ''ফিরা নৌকায় চলে এস হে। এই বানে মদনরা নৌকা নিবে না।'

'আসব।'

ওরা চলে আসতেই সাজুয়া মাচাঙে শুয়ে পড়ে। খুব নিশ্চিন্ত লাগে ওর। বান হোক গ্রাম ভাসুক, চর তো ডোবেনি? ঘুমিয়ে পড়ে ও।

ওদের যেতে বেলা গড়ায়। ফলে বিকেলে ওদের না দেখে ওর তেমন উদ্বিগ্ন লাগে না। আজ পারেনি। কাল আসবে। ধান ওদেরও। এখন আগাছা ও ঘাস না কুঁদরালে ওদেরও ক্ষতি। সাজুয়া কল্পনাপ্রবণ নয়। ফলে আদিগন্ত ভাগীরথীর বুকে একা ও চরের মাচাঙে বসে আছে, এ উপলব্ধিতে ওর মনে কোনো ভয়ের অনুভূতি জাগে না, দৃশ্যটির অমানুষি ও আদিম সৌন্দর্য ওকে স্পর্শ করে না। বিড়ি টেনে ও সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়ে। শুক্ল পক্ষে চাঁদ ওঠে। আকাশে ছেঁড়া মেঘ। মৃদু জ্যোৎস্নায় ভাগীরথী আকাশ পানে ঠেলে উঠতে থাকেন সোজা।

সাজুয়া ঘুমের মধ্যে ধাক্কা খায়। প্রথমে মৃদু তারপর জোর ধাক্কা। না, গায়ে ধাক্কা নয়, মাচাঙ নাড়ছে। ওরা এল নাকি? উঠে বসে ও, এখন চোখ কচলে চেয়ে দেখে চন্দ্রালোকিত ভাগীরথী ওর চারিদিকে। বিমূঢ় আতঙ্কবিহ্বল সাজুয়া আবার চেয়ে দেখে। ধান নেই, চর নেই, জল ওর মাচাঙের খুঁটিতে ধাক্কা মারছে। চালে উঠবে? চাল তো তেমন পোক্ত করে বাঁধা হয়নি? মাচাঙের খাঁচাটি আঁকড়ে ধরে ও চোখ বোজে। বউ নয়, মা নয়, ছেলে নয়, নিজের জন্যে ভীষণ কষ্ট হয় ওর। কিছুই পাওয়া হল না জীবনে। সব সাধ অপূর্ণ রেখে চলে যেতে হল। জলে পড়ে তবে সাজুয়া বুঝতে পারল, ভাগীরথীর বুকের নীচের ভীষণ তোলপাড়। গুম গুম শব্দ হচ্ছে অতলে। ওপর পানে চাইল ও। নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত চন্দ্রমা। মাচাঙের খাঁচা জড়িয়ে

সাজুয়া চাইতে থাকল। একটা গাছ ভেসে আসবে না? একটা শক্ত পোক্ত চালাঘর? তারপর ওর আতঙ্ক বিহ্বল চোখের সামনে একটা জলের দেওয়াল ছুটে এল। আসতে আসতে, জ্যোৎস্নার আলোর লোনা জল যেন দাঁত বের করে হাসল।

চর ভেসে গেছে, এ কথা জানা যায় ভোরে। সাজ খালিতে ত্রাণ বোট যেতে থাকে যখন। পুলিশের ঘাট-চৌকিতে জল ঢুকে পড়ার কারণে বেলেটি এখন ত্রাণকেন্দ্র হয়। রাম সিংগিকে অশেষ ব্যথা দিয়ে সরকার, উদ্ধার ত্রাণ কাজের জন্য আলাদা-শিবির ফেলে। জওয়ানরা উদ্ধার ত্রাণ-দান চালাতে থাকে। রাম সিংগি চর ডুবতে পয়লা ব্যথা পায়। দ্বিতীয় ব্যথা পায় রিলিফের গম-চিড়ে-গুড়-কাপড় ইত্যাদির হেফাজতি না-পেয়ে। তারপর ভয় খায়, বি.ডি.ও. যখন খিচিয়ে বলেন, 'নিজের গাই-বলদ সরালেন খবর পেয়ে। খবরটা দিতে পারেননি? সে খবরও দিতে সরকার দেবে? সরকার মানে সরকারি আমলা শুধু? আমি জানলে নিশ্চয় জানাতাম। বান-বন্যা বলে কথা। জেনে চেপে গেলেন?'

রাম সিংগি সকাতরে বলে, 'সে তো হয়েই গেছে। চেল্লাচেল্লি করিয়েন না সার। এ ডোমগুলো শুনলে ছিঁড়ে খাবে। তাতে আমাদের সাজুয়া চর বুনতে গিয়ে ভেসে গেছে। তিওররা কান্তে লেগেছে।'

'আপনার চর-জমি তো?'

'আজ্ঞা।'

রাম সিংগি আরো কাতর হয় ও বলে, 'মোটর বোট নিয়ে ঘুরতে ওকে জানি তোলে?' তার ওপর তো কারো রিষ নেই যে দেখলেও তুলবে না। এই জলের তোড়, সে কি আছে?

ঘুরতে থাকে জলে। এখন পরের পর গ্রাম ভাসছে। বেলেটি ব্লক ডিকলেআর্ড বন্যা প্লাবিত ব্লক ত্রাণ করে আনা হয় ওদের, তাদের মধ্যে মাতংরা, সাজুয়ার বউ ও মা বৃথাই খুঁজে খুঁজে ফেরে সাজুয়াকে। অবশেষে জানা যায়, নদীর মাইল তিনেক আগে, একটি গলিত শবদেহ দেখা গেছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। প্রসারিত ও স্ফীত হাতে লোহার বালা।

এখন আর সন্দেহ থাকে না কোনো। সাজুয়ার বউ দাপাদাপি করে কাঁদে। মা ঘন ঘন মূর্ছা যায়। মাতংরা মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। তারপর মাতং নিশ্বাস ফেলে বলে, 'সকলি জান। গেল যখন, সে যখন নাই, তখন রীতকরম কত্তে হবে। সাজুয়ার মা। মাতং রইতে তোমরা মরব না। এখন ওঠ।'

'কী কত্তে উঠব, অ দেওর।'

বউরে বলা যায় এমন কথা? উঠ, তার খ্যাড়ের ঠাকুর দাহ কত্তে হবে। ছরাদ আছে। আহা হা রে আমরা বলছি রাক্সস।। বামুন নাম দিল জাতুধান। আহা হা রে, দলমলা ছেলে, কুন রিষ জানে না গো। ডোমপাড়ায় জল, তাতে কাঁধে বয়ে বাছুর উঠাল ডাঙায়। এখন আমি মরব, বুড়াটা না জোয়ানটা গেল।'

'কেনে রেখে এল তারে, অ দেওর। সে তো গোঁয়ার হাবাটা ছিল। কেনে বা তার কথা শুনলে?'

'সাজুয়ার মা। সে দুক্ষে মোর বুক ফাটে। কে জানে বল, এমন হবে? উঠ উঠ, দাহ আছে, ছরাদ আছে, জ্ঞাতভোজন আছে, তার গেঁদাটার অমঙ্গল হবে ন্যাল্যে।' 'কোথা হতে হবে?'

মাতং ভীষণ ক্রোধে বলল, 'রাম সিংগি বাবু দিবে? জল আসবে জেনেছিল, কারেও বলে নাই? মোষর কথা ভাবল, মানুষের কথা ভাবে নাই।'

চার দিকে বন্যাতাড়িত মানুষ। বেলেটি এখন মানুষে থই থই। তিওররা খড়ের পুতুল দাহ করল। তারপর রাম সিংগির কাছে গেল। মাতং বলল, 'এই বান-বন্যা তোমারে ছুঁল না বাবু। সরকার সকল দিতেছে।'

'মোদের সাজুয়ার ল্যেগে তুমি দাও। লয় তো খারাপ হয়ে যাবে।'

রাম সিংগি তার গ্রামীণ ও অন্ধ মানসিকতায় মাতংয়ের ক্রোধকে যথার্থ মনে করে ও বলল, 'দিব। দিব না কেন? সরকার তাসাতেছে, তোরাও তাসাতিছ, বান তো আমি ডাকা করেছি, লেঃ, কী লিবি, লে। তোদের পিছনে বড়ো গিন্নি। তার দুধের টাকা সুদে খাটায়।'

মনিব্যান বলল, 'ই চাল তুমি লিখবা না। ওরা রুখলে ধান কাটতে পুলিস আসবে। আর হাংনামা কর না।'

'আর করি? মন্দ করলে বি.ডি.ও দেখে। ভালো করলে দেখবে? ভালোর দিন নাই। সে আমলে বাপ আকালে গোলা খুলে রায়সাহেব খেতাব পায়।'

'সাজুয়ার ছরাদে চাল দিবে, তাতে তুমি খেতাব পাবা না?'

'খেতাব এখন নাই। ই বেটারা সামনে "শালা" না বললে সেই জানবে বাপের ভাগ্য। বানে জগৎ ডুবায়, ছরাদ!'

চালের বস্তা এনে মাতংরা সাজুয়ার মাকে দিল। বলল, 'আর তিন দিন। তা বাদে আমরা তেল-তৈজস আনব। আমি রীতরকম করা দিব। লাও, লোহা রাখ। বউয়ের চুলে বেঁধে দিবে।'

চালের বস্তার গায়ে হাত বুলিয়ে, যেন ক্ষুধাকাতর, সদাই অন্নলোভী সাজুয়ার স্পর্শ পেয়ে মা ও বউ ঘুমোল। দুঃখের দিনেও ঘুম আসে ঘুম এল। মা বলল, 'মাতং দেওর ছিল বলে ত্যাত চাল? নইলে উ হারামি দিত?'

বউ বলল, 'ছরাদ হলে চলে যাব ধামনাই। তুমি ঘর দেখবা, আমি ভাজদের সঙ্গে মাঠে যাব। সেথা বিটিছেলা মাঠে খাটে।'

'তাই যাব। বান না হতে আকাল আসবে। বাবু আর কারে সাজুয়ার ভাগ দিবে লিয্যাস। মানুষ এখন পোক পতঃ অসাগর, মানুষ। বাবাঃ, ত্যাত মানুষ কোথায় ছিল? এত হ্যাচাক জ্বলতে দেখি নাই, ত্যাত মানুষ দেখি নাই।'

'চুরের দাংগায় তুই রাড় হলে, চর ভেসে আমি। আর রব না হেথা।'

'নে ঘুমা।'

দুজনে জড়াজড়ি করে ঘুমোল।

ঘুমের মধ্যে মা আগে শোনে, দরজার ওপারে কে বিপন্ন গলায় ডাকছে, 'দরজা খোলো।'

ধড়মড়িয়ে উঠল মা। কে ডাকে? সাজুয়া? মৃত্যুর পর তার প্রেত?

'কে?'

'আমি মাতং হে, দরজা খোলো।'

বউকে ডেকে তোলে মা, তারপর দরজা খোলে।

বউকে ডিবরি জ্বালে।

মাতং সঙ্গে সাজুয়া।

'ই কী দেওর?'

'মা আমি।'

'তুই।'

'আমি।'

'মরিস নাই?'

বউ ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে ও ডুকরে কেঁদে ওঠে। মাতং ধমক দিয়ে বলে, 'কেন্দো পরে। আগে ওরে চাল দাও, চিবায়ে জল খাক। মরে এসেছে।'

'মরে নাই তো। মরে নাই'। মা হেসে কেঁদে সাজুয়ার গায়ে হাত বোলায়। বলে, 'তুই।' 'তুই ভেসে এট্টা গাছ পাই। তাতে সাঁপ কি। লরে-লাগে ভেসে ভেসে সেই জিয়াগঞ্জ। সেথায় মড়া হয়ে পড়েছিলাম। উঠাল সেপাইরা। তা বাদে ধুম জ্বর। ইঞ্জিশান অষুদ, দে, চাল দে।'

বউ চাল ও জল দেয়। সাজুয়া খায়। জল খেয়ে বলে, 'হাঁটতে হাঁটতে—হাঁটতে হাঁটতে—মাতঙের ঘরে আগে ডাকতে বুড়া ভূত দেখল।'

মাতং গলা সাফ করে বলল, 'অনেক ছরাদ হয়ে ফেলছে রে! সে অনেক কথা।'

'ঘরে চাল এত?'

'শালা চাল দেখতেছে! শোন বেটা!'

মাতং ওকে সব কথা বলে। ভয়ে ভয়ে বলে। জলে ভেসের যাবার অভিজ্ঞতা, মরতে মরতে বেঁচে ওঠার অভিজ্ঞতা, সাজুয়ার মাথা না খারাপ হয়ে যায়। কম কথা নাকি? মা ও বউ, অপরাধীর মতো বসে থাকে। সাজুয়া ওদের পেটায় যদি? সব শুনে মেলে সাজুয়া বলে, 'দাড়াও, বুঝে লই। আমার খ্যাড়ের ঠাকুর দাহ করলা?'

'সি তোরে শুদ্ধ করে লিব।'

'ছরাদে জ্ঞাতভোজনের চাল আনলা?'

'কালই ফিরত দিব। লইলে বেটা বলবে, তোরা সাজস করে ই কাজ করছিস।' 'লাঃ।'

'কী বলিস?'

'চাল ফিরত দিব না।'

'তবে?'

সাজুয়া ওদের অবাক করে হাসে। দমকে দমকে হসে, বলে, 'উঃ আমি সেথা আছি। তোমরা খ্যাড়ের ঠাকুর পোড়ালা, ছরাদের চাল আনলা...'।

'তোর মারে বলাছি, মাতং রইতে তোমরা মরবা না। আমরা তোর সমাজ লই?' মাতংয়ের পায়ের ধুলো খায় সাজুয়া। বলে, 'তা জানি হে বুড়া।'

'তবে?'

'দেখ! সবে বলে জাতুধান, আমার বুদ্ধি লাই। বুদ্ধি আমার হলছে এট্টা। আমি যে এসছি, জীয়ন্তে ফিরাছি, তুমি ভিন্ন কেও জানে না?'

'তাতে?'

'বুঝলা না?' আবার হাসে সাজুয়া, মাতংয়ের গালে আঙুল দিয়ে চুমকুড়ি খায়। বলে, 'চালের বস্তা লয়ে এদের লয়ে আমি ধামনা চললাম। তুমি বলবা, ওরা কোথা গিছে, মা বউ, তা জান না! বলবা বুঝি ধামনাই গিছে। সেথা ছরাদ করবে।'

'রাম সিংগির কী বলব?'

'কিছু বলবা না। বান শুকালে আবার চলে আসব। বলব জাতুধান আমি, তাতেই ভাগীরথী ফিরায়ে দিল। বলল, এখনো অনেক দিন দান আছে তোর?'

'এ চাল?'

সাজুয়া হাসে। বলে, 'আমি তো রাক্কস, জাতুধান, আমার ছরাদে চাল আমি খাব না?'

'আরে এমন ছরাদ নাই! যার ছরাদ সে এ ভাত খায়, কেউ এমন ছরাদ দেখেছেয়'

'তাই কর গা! আমি কারেও কিছু বলব না কিন্তুক কাজটা কেমন হল বল্? শুদ্ধ হল না, দাহ হল, দেও দেবতার রিষে পড়বি।'

'পড়লে পড়ব। পেটে ভাত রলে বুড়া, সকল দেবতার রিষ বেরথা যায়। মা চল্, বউ, গোঁদাটা ওঠা। আঁধারে পলাতে হবে।'

নিজের শ্রাদ্ধের চালের বস্তা কাঁধে জাতুধান অন্ধকারে পালাতে থাকে। ধামনাই অনেক দূরে। পালাতে পালাতে মনে হয়, ও ভাগীরথীর চেয়েও শক্তিমান। এই বান-বন্যা থেকেও ফায়দা তুলে নিল।

২০.২ জীবনকথা ও সাহিত্য-পরিচয়

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের পৌষ সংক্রান্তির (ইংরেজি ১৪ জানুয়ারি, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ) দিন মামার বাড়ি ঢাকায় মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম। পাবনা জেলার নতুন ভারেঙ্গায় ছিল তাঁদের পৈতৃক নিবাস। বাবা মনীশ ঘটক (১৯২০-১৯৭৯) ছিলেন কল্লোল যুগের অন্যতম সাহিত্যিক। 'যুবনাশ্ব' নামেই তিনি খ্যাত। মা ধরিত্রী দেবী (১৯০৮-১৯৮৪)। বাবা ছিলেন ইনকাম ট্যাক্সের অফিসার, বদলির চাকরি— মহাশ্বেতার শিক্ষাজীবনে তাই বারবার স্থান-বদল ঘটেছে। ১৯৩০ সালে ঢাকা ইডেন মন্তেসরিতে শুরু হয় মহাশ্বেতা-র পড়াশুনা। ১৯৩৫-এ মেদিনীপুরের মিশন স্কুল। বাবার চাকরির বদলির কারণে মহাশ্বেতা তাঁর বাবার সঙ্গে চলে আসেন মেদিনীপুরে। থাকতেন মেদিনীপুরের বার্জ টাউনে। সাইকেল চড়া, সাঁতার সবই শিখলেন সেখানে। সেখানে পড়াশুনার অসুবিধার কারণে মনীশ ঘটক মহাশ্বেতাকে ভর্তি করে দেন শান্তিনিকেতনে। ১৯৩৫-৩৬ পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত তিনি পড়াশুনা করেন শান্তিনিকেতনে। *'নিজের কথা'* শীর্ষক স্মৃতিচারণায় মহাশ্বেতা দেবী সে সময়ের স্মৃতিচিত্র ও প্রবর্তনার কথা উপহার দিয়েছেন উত্তরকালের পাঠকদের জন্য : "শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের সকলের কথাই কিছু কিছু মনে আছে। সমস্ত শান্তিনিকেতন আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা সব সময় যেতাম না, মাঝে মাঝে যেতাম। উনি একবার উত্তরায়ণে ডেকে আমাদের বাংলা ক্লাস নিয়েছিলেন। আমার মনে হয় ১৯৩৬-৩৮ এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সৃজনমূলক কাজের মধ্যে একটা নতুন প্রথা এসেছিলো ...... ঐ পর্যায়ে শান্তিনিকেতন আমার মনে খুবই প্রভাব ফেলেছিল।"

(*নিজের কথা* : মহাশ্বেতা দেবী, গল্পসরণি ঃ মহাশ্বেতা দেবী সংখ্যা, ১৪১৮, পৃষ্ঠা-১৭)

১৯৩৯-৪১ অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ে। ১৯৪২ সালে মহাশ্বেতা ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪৪-এ আশুতোষ কলেজ (মহিলা বিভাগ) থেকে আই.এ। এই সময় বাবা আবার বদলি হয়ে গেলেন রংপুরে। মহাশ্বেতা ইংরেজি অনার্স নিয়ে ভর্তি হলেন বিশ্বভারতীতে। ১৯৪৬ সালে বি.এ. পাস করলেন। ১৯৬৩-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

বি.এ. পরীক্ষার ফল বেরোনোর পর ১৯৪৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি মহাশ্বেতা দেবীর বিবাহ হয় বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। তাদের একমাত্র সন্তান নবারুণ ভট্টাচার্য ছিলেন খ্যাতিমান সাহিত্যিক। বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে ১৯৬২ সালে। কিছুদিন পরে ১৯৬৫-তে অসিত গুপ্তের সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর বিবাহ হয়, সে বিয়েও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৭৬ সালে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

কলকাতার পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউশন-এর প্রাতঃবিভাগে শিক্ষকতার (১৯৪৮-৪৯) মধ্যে দিয়ে মহাশ্বেতার পেশাগত জীবনের সূচনা। কেন্দ্রীয় সরকারের ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত। ১৯৫৭-তে রমেশ মিত্র বালিকা বিদ্যালয়ে এক বছরের জন্য শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত কলকাতার বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে ইংরেজির অধ্যাপিকা হিসেবে কাজ করার পর স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ করেন।

বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ে মহাশ্বেতা যখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী, তখন খগেন সেন সম্পাদিত 'রংমশাল' (শিশু ও কিশোর পত্রিকা)-এ রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা নিয়ে একটা লেখা প্রকাশিত হয়। প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ঝাঁসির রানি' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। এই সময় থেকেই বই লিখে অর্থোপার্জন শুরু। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'কি বসন্তে কি শরতে'

প্রকাশিত হয় ১৯৪৯-এ। মহাশ্বেতা দেবীর বিপুল পরিমাণ সাহিত্য সৃষ্টির নির্বাচিত একটি তালিকা এখানে উল্লেখ করা হল।

উপন্যাস : 'ঝাঁসির রানি' (১৯৫৬), 'নটী' (১৯৫৭), 'মধুরে মধুর' (১৯৫৮), 'তিমির লগন' (১৯৫৯), 'অমৃত সঞ্চয়' (১৯৬২), 'তীর্থশেখের সন্ধ্যা' (১৯৬২), 'আঁধার মানিক' (১৯৬৬), 'বিপন্ন আয়না' (১৯৬৬), 'কবি বন্দ্যঘটির গাঞ্জির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৬), 'মধ্যরাতের গান' (১৯৬৭), 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪), 'দুস্তর' (১৯৭৫), 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭), 'স্বাহা' (১৯৭৭), 'সিধু কানুর ডাকে' (১৯৮১), 'অক্লান্ত কৌরব' (১৯৮২), 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর' (১৯৮২), 'পলাতক' (১৯৮৩), 'তিতুমীর' (১৯৮৬), 'সতী' (১৯৯০), 'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' (১৯৯০), 'হিরো একটি ব্লুপ্রিন্ট' (১৯৯৩), 'ব্যাধখণ্ড' (১৯৯৪), 'প্রস্থান পর্ব' (১৯৯৫), 'ঊনত্রিশ নং ধারার আসামী' (১৯৯৮), 'যে যুদ্ধ থামল না' (১৯৯৮)।

গল্পগ্রন্থ : 'সপ্তপর্ণী' (১৯৬০), 'অনবরতর অবিশ্বাস্য' (১৯৭২), 'অগ্নিগর্ভ, (১৯৮০), 'নৈঋতে মেঘ' (১৯৮০), 'বেহুলা' (১৯৮১), 'মায়ের মূর্তি (১৯৮২), 'স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৮২), 'পাঁকাল' (১৯৮৩), 'মূর্তি' (১৯৮৩) , 'দৌলতি' (১৯৮৩), 'গ্রাম বাংলা' (২য় খণ্ডে) (১৯৮৬), 'ইটের পরে ইট' (১৯৮৭), 'প্রথম পাঠ' (১৯৮৮), 'মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৮৮), 'স্নাতক' (১৯৮৯), 'শালগিরার ডাকে' (১৯৯০), 'তালাক ও অন্যান্য গল্প' (১৯৯২), 'সাম্প্রদায়িক গল্প' (১৯৯২), 'মুখ' (১৯৯৩), 'পালামৌ' (১৯৯৩), 'কৃষ্ণা দ্বাদশী' (১৯৯৪), 'মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প' (১৯৯৬)।

কিশোর সাহিত্য : 'এক কড়ির সাধ' (১৯৬৮), 'পথ চলি আনন্দে' (১৯৭৯), 'পাথরের সিংহ' (১৯৭৯), 'বীরসামুণ্ডা' (১৯৮১), 'রাজা' (১৯৮৩), 'বাঘা শিকারী' (১৯৮৬), 'নেই নগরের সেই রাজা' (১৯৮৮), 'এতোয়া মুণ্ডার যুদ্ধ' (১৯৯০), 'তুতুল' (১৯৯৪)।

এছাড়াও তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ, অনুবাদ গ্রন্থ, নাটক ও ইংরেজি বই আছে অসংখ্য। হিন্দি, তেলেগু, মারাঠি, পাঞ্জাবি, ওড়িয়া, অসমীয়া, গুজরাতী সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর কথাসাহিত্য। ইংরেজি, জাপানি, ফরাসি, স্প্যানিস সহ বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সামান্য কিছু। আরও কিছু আছে অনুবাদের অপেক্ষায়।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ত্রৈমাসিক 'বর্তিকা' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে তিনি যুক্ত। প্রান্তিক, আদিবাসী ও অন্যান্য সমাজতত্ত্ব বিধায় পত্রিকাটি দীর্ঘদিন ধরে সমাজ-সমীক্ষামূলক কাজ করে চলেছে।

বেশ কিছু জনকল্যাণকর, আদিবাসী ও অন্যান্য সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতৃরূপে, কখনো বা পরামর্শদাতৃরূপে সক্রিয়ভাবে তিনি যুক্ত। প্রসঙ্গত, সে তালিকাটাও বেশ দীর্ঘ। ১) পালামৌ জেলা বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা, ২) সর্বভারতীয় বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা, ৩) পশ্চিমবঙ্গ লোধশবর কল্যাণ সমিতি, ৪) পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজ কল্যাণ সমিতি (বিভিন্ন জেলায় পৃথক পৃথক ভাবে সংগঠন), ৫) পশ্চিমবঙ্গ সহিস জাতি কল্যাণ সমিতি, ৬) পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতি, ৭) মাঝগেড়িয়া আদিবাসী সাঁওতা সুমার বাইসি (বাঁকুড়া), ৮) সান্তাল সমাজ লাহান্তা বাইসি (মুর্শিদাবাদ), ৯) ভারতের কের আদিম জাতি (মধ্যমগ্রাম), ১০) পশ্চিমবঙ্গ হরিজন কল্যাণ সমিতি, ১১) দলিত মুক্তি সংগঠন, ১২) কিরিবুরু আদিবাসী মহিলা সমাজ (সিংভূম), ১৩) মুণ্ডা সমাজ সাঁওয়ার জামদা (ওড়িশা), ১৪) আদিবাসী হরিজন কল্যাণ সমিতি, ১৫) পশ্চিমবঙ্গ ঢেকারো কল্যাণ সমিতি, ১৬) সর্বভারতীয় ডিকেটিফায়েড এবং যাযাবর গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা সমিতি— এমন তর কুড়িটি জনকল্যাণমূলক সংঘের সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী সক্রিয়ভাবে যুক্ত। আসলে সমাজের প্রান্তিক এইসব সাধারণ মানুষের কাছে মহাশ্বেতা দেবী একমাত্র কমিটমেন্ট। এ নিয়ে যে প্রশ্ন ওঠেনি এমন নয়। পার্থ

চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতা দেবী জানিয়েছেন সেসব কথা :

"প্রশ্ন : কিন্তু এইসব সংগঠন করা তো লেখকের কাজ নয়। লেখকের কাজ তো শুধু লিখে যাওয়া।

মহাশ্বেতা : আমি তা মনে করি না। আমি ইচ্ছে করে সংগঠন করতে গিয়েছি বললে ভুল হবে। ওদের সঙ্গে কাজ করতে ভাল লেগেছে, জড়িয়ে পড়েছি। তাই গিয়েছি। আমার সংগঠন করা, সম্পাদনা করা, সাহিত্য-সাংবাদিকতা কোনটা থেকে কোনটা বিছিন্ন নয়। প্রত্যেকটা প্রত্যেকের অংশ। আমি জনসাধারণের মধ্যে যাচ্ছি বলেই তো তাদের কথা লিখতে পারছি।

প্রশ্ন : আপনার সর্বপ্রথম কমিটমেন্ট বা দায় কার কাছে?

মহাশ্বেতা : পিপ্‌লের কাছে।

প্রশ্ন : আপনার এমন কোনো কথা আছে কী, যাকে আপনার সমস্ত জীবনানুভূতির নির্যাসি বলে মনে করতে পারি?

মহাশ্বেতা : শেষ পর্যন্ত যেন আমি মানুষের কাজে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে পারি।

(*মহাশ্বেতা দেবী : নির্যাতিত মানবতার খোঁজে এক মানবী*; সাক্ষাৎকার - পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *কলেজ স্ট্রীট* পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৯)

লেখার ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবী ঘটনাকে বিশ্লেষণ করায়, বিচার করায়, সময়কে দলিলীকরণে বিশ্বাসী।

মহাশ্বেতা দেবী নিজে কখনো পুরস্কার প্রত্যাশী ছিলেন না। পুরস্কার-ই সারাজীবন মহাশ্বেতাকে খুঁজে ফিরেছে। নোবেল পুরস্কার ছাড়া প্রায় সমস্ত পুরস্কার, স্বীকৃতি মহাশ্বেতা পেয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল— চৈতন্য লাইব্রেরি পুরস্কার (১৯৫৮), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত লীলা পুরস্কার (১৯৭৮), শরৎ স্মৃতি পদক (১৯৭৮) , সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৭৯), নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য স্বর্ণ পদক (১৯৮১), ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' (১৯৮৬), জগত্তারিণী পদক (১৯৮৯), জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (১৯৯৬), ম্যাগসাইসাই পুরস্কার (১৯৯৭), সাম্মানিক ডক্টরেট-রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৮), দেশিকোত্তম-বিশ্বভারতী (১৯৯৯), ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মবিভূষণ' (২০০৬), ভারত নির্মাণ পুরস্কার (২০০৯)। দেশের বাইরে বিদেশেও তিনি বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন সেমিনারে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হয়েছেন। এখন দেশি বিদেশি যে কোনো প্রতিষ্ঠান মহাশ্বেতা দেবীকে পুরস্কৃত করে আসলে নিজেরাই সম্মানিত হন, শ্লাঘা অনুভব করেন।

একরোখা, আপোষহীন মহাশ্বেতাকে বার্ধক্য ঘিরে ধরেছে ক্রমশ। অশক্ত শরীর, একাকি জীবনে মহাশ্বেতা তবু তাঁর লেখার কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে কমিটেড। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কাঠামোতে যেখানেই অন্যায়, যেখানেই শোষণ সেখানেই মহাশ্বেতার প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদে কলম তাঁর একমাত্র আয়ুধ।

২০.৩ গল্প-বিবরণ

আমাদের আলোচ্য 'জাতুধান' গল্পটি নেওয়া হয়েছে মহাশ্বেতা দেবীর 'বেহুলা' গল্পগ্রন্থ থেকে। অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩ - অন্যধারা প্রকাশনী (৩, রাজা গোপেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৫) থেকে প্রকাশক গীতা দত্তের উদ্যোগে 'বেহুলা' প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদ - শৈবাল দত্ত। দাম - ১০ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪ ও ১৫১। 'জাতুধান' ছাড়াও ঐ গল্পগ্রন্থে সংকলিত ছিল— 'গুরু', 'অস্থি', 'জল' ও 'বেহুলা' নামের চারটি গল্প। 'জাতুধান' গল্পটির প্রথম প্রকাশের স্থান অজ্ঞাত। 'বর্তিকা' মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, জানু-মার্চ, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৫-তে গল্পটি পুনর্মুদ্রিত হয়। সেখানে গল্পটির প্রকাশকাল হিসেবে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ মুদ্রিত আছে। এই তথ্যটির উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে।

'জাতুধান' গল্পটি প্রকাশের কিছুদিন পর একটি ব্যক্তিগত গদ্যে মহাশ্বেতা দেবী লিখেছিলেন : ''স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ, বেঠবেগারি কোনোটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্যমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা।'' (১৯৭৮)

প্রান্তিক, নিরন্ন মানুষদের ভাতের স্বপ্ন বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে মহাশ্বেতা দেবীর গল্প উপন্যাসে। পেটে যাদের সারাক্ষণ ধিধি জ্বলে খিদে, তারা স্বপ্ন দেখে খাদ্যের। 'অরণ্যের অধিকার'-এ আমরা দেখেছিলাম ভারত মুণ্ডাদের জীবনে স্বপ্ন হয়ে থাকে। 'সাঁঝ সকালের মা', 'ভাত' গল্পের মতো 'জাতুধান' গল্পেও আমরা পড়বো ভাতের স্বপ্ন-কথা, খিদের আখ্যান।

সাজুয়া তিওর 'জাতুধান' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। বিশাল শরীর আর আসুরিক ক্ষুধার মানুষ সাজুয়া। দু-বেলা পেট ভরে খেতে না পাওয়ার জন্যই সে হয়ে উঠেছে লোভী। খাদ্যের প্রতি এই লোভ আসলে আর্থ-সামাজিক বঞ্চনাকেই প্রকাশ করে। বর্গাদার সাজুয়ার মধ্য দিয়ে মহাশ্বেতা দেবী নিরন্ন ভিক্ষুকে খিদের পৃথিবীর শ্রেণি মানুষদের সামনে নিয়ে এসেছেন। রাক্ষসের মতো তার বিপুল খিদে বলেই পুরোহিত মশাই তার নাম দিয়েছিলেন জাতুধান। অর্থাৎ রাক্ষস। তার যুক্তি ছিল '' 'রাক্ষস' নামে জাঁকজমক নেই। জাতুধান নামটা বেশ মানাচ্ছে।'' নামটি সাজুয়ারও পছন্দ হয়। ফারাক্কা ভাগীরথী কূলাশ্রিত বেলেটির চরজমি আর তার মাটি-মানুষদের নিয়ে এই গল্প।

বেলেটির একসময়ের জমিদার রাম সিংগি। তিওররা ছিল তার প্রজা। বর্তমানে রাম সিংগির জমিতে তিওররা বর্গাদার। ভাগীরথীর এই চরটি 'এ-সনে ভাসান, ও-সনে ডোবান'। যে বছর ধান হয় সে বছর কয়েক মাসের খাবার জোটে। যে বছর হয় না— সে বছর ঋণের পরে ঋণ। ধারের পর ধার। মাতং-এর সাথে সাজুয়ারা চলে যায় রাঢ়দেশে ধান চষতে। খিদে এখানে নিয়ন্ত্রণ করে শাসক ও শোষক উভয় শ্রেণিকেই। ফারাক্কা, নদী বাঁধের রাজনীতি আছে এ গল্পের কাঠামোর অন্তরালে।

রাম সিংগির প্রথম পক্ষের 'বাঁজা' স্ত্রী মনিব্যান মোষ কেনে, মাদি মোষ। দুধ বেচে— বাড়িয়ে চলে স্ত্রীধন। পরে শালিকে বিয়ে করেছিল রাম সিংগি। বছর-বছর তার দ্বিতীয় পক্ষ বাড়িয়ে চলে পুত্রধন। নাবালে ভাগীরথীর পাড় ঘেঁষে মনিব্যানের বাথান। তিনজন চাকর নিয়ে তার কারবার। বহরমপুর থেকে রাম সিংগি-র কাছে খবর আসে ফারাক্কার জল ছাড়া হবে। রাম সিংগি মাতং, সাজুয়াকে দিয়ে তার বাগানের উঁচু জায়গায় গরু-মোষের জন্য টানা চালা বেঁধে নেয়। পেট খোরাক আর বিড়ির পয়সার বিনিময়ে। শহরের নদী-অফিসের খবর পৌঁছায় না নাবাল বেলেটির প্রান্তিক মানুষের কাছে। রাতের অন্ধকারে চরের মানুষ ভেসে যায়। ভেসে যায় কুড়ে ঘর, তুচ্ছ যা কিছু সঞ্চয়। বেলেটির জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বন্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে সাজাখালি চরের মাচাঙ থেকে বন্যার জলে ভেসে যায় সাজুয়া। সে সংবাদ লোকমুখে এসে পৌঁছায় বেলেটিতে। সাজুয়ার মা, বউ, মাতং সেই মৃত্যু সংবাদের ভিত্তিতে সাজুয়ার কুশপুত্তলিকা দাহ করে শ্রাদ্ধের আয়োজন করে। সাজুয়ার শ্রাদ্ধে চালের জোগান দেয় রাম সিংগি। বানের জলে জিয়াগঞ্জে ভেসে যাওয়া সাজুয়া সেদিন গভীর রাতে ফিরে আসে। সাজুয়া ফিরে এলে গোষ্ঠী প্রধান মহাজনের চাল ফেরত দিতে বলে। খিদের মূর্ত প্রতীক সাজুয়া তখন সে চাল ফেরত দিতে চায় না। মাতং তাকে বোঝায় নিজের শ্রাদ্ধের চাল নিজে খেলে দেবতার রোষে পড়তে হবে। সাজুয়া যদিও তার সিদ্ধান্তে দৃঢ় : 'পেটে ভাত রলে বুড়া, সকল দেবতার রিষ বেরথা যায়।' নিজের শ্রাদ্ধের চালের বস্তা কাঁধে তুলে মা-বউ নিয়ে সেই রাতের অন্ধকারে সাজুয়া পালিয়ে যায়। খিদে জিরজিরে শরীরে এখন ভাগীরথীর চেয়েও শক্তিমান। প্রাগৈতিহাসিক এক আদিমতা। এবারকার বন্যা থেকে ফায়দা তুলে রাতের অন্ধকারে এগিয়ে যায় সাজুয়া।

বেঁচে থাকার প্রথম শর্ত অন্ন বা খাদ্য। ক্ষিধের পৃথিবীতে মানুষ ও বন্য প্রাণির মধ্যে বিশেষ তফাৎ নেই। ধনী-নির্ধনে কোনো তফাৎ নেই। মহাশ্বেতা দেবী এ গল্পের মধ্যে দিয়ে খিদের নন্দনকে বুঝতে চেয়েছেন আর পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন প্রকৃত 'জাতুধান'-এর রূপ।

২০.৪ গঠন-বিশ্লেষণ

একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থা ও অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে মহাশ্বেতা দেবীর চরিত্ররা যেভাবে শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, শ্রেণিদ্বন্দ্বে নেতৃত্ব দেয় তা আসলে লেখকের বামপন্থাকেই স্বীকৃতি দেয়, শিল্পিত করে তোলে। 'জাতুধান' বা 'জাতুধানে'র মতো গল্পের দিকে আমরা যদি দৃষ্টিপাত করি তাহলে সহজেই সে তাত্ত্বিক পরিসরটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধরা যাক 'দ্রৌপদী' গল্পটির কথা। দোপ্দি মেঝেন বয়স সাতাশ। স্বামী দুলন মাঝি নিহত। পুলিশ তার মাথার দাম ঘোষণা করেছে। তবু দোপ্দি বাকুলি, বাঁকড়াঝাড়, ঝাড়কনী, বীরভূম, বর্ধমানের সাঁওতাল-সাঁওতালনীদের নিয়ে বিশেষ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে। গোলদার-জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে তাদের জেহাদ। শ্রেণিশত্রুর বিনাশ-ই তাদের লক্ষ্য। মতাদর্শগত কারণের জন্যেই নকশাল আন্দোলনের মধ্যেই বিরোধ সংগঠিত হয়ে উঠেছিল। যদিও নকশাল আন্দোলনের মধ্যেই ছিল— নকশাল আন্দোলনের পতনের বীজ, তবু অ্যাপ্রিহেন্ডেড দ্রৌপদী মেঝেন যখন বলে "কাপড় কী হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু? ... হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কী করবি? লেঃ কাঁউটার কর্, লেঃ কাঁউটার কর— ? দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।" শ্রেণি সংগ্রামের চেতনায় দ্রৌপদী এবং তার সহযাত্রীরা যেভাবে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল, তাতে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা মানুষরা ভয় পেয়ে যায়।

খিদে, খিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রতিবাদী চেতনা মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে আসে হাত ধরাধরি করে। প্রাসঙ্গিকভাবে পাঠকের মনে পড়তে পারে তাঁর 'ভাত' বা 'সাঁঝ সকালের মা' গল্প দুটির কথা। 'ভাত' গল্পে উচ্ছব নাইয়া অশৌচ বাড়িতে ফেলে দিতে চাওয়া রান্না করা ভাত, খাবার নিয়ে পালিয়ে যায় "উচ্ছব দৌড়তে থাকে। প্রায় এক নিশ্বাসে সে স্টেশনে চলে যায়। বসে ও খাবল খাবল ভাত খায়। ভাতে হাত ঢুকিয়ে দিতে সে স্বর্গসুখ পায় ভাতের স্পর্শে। চন্নুনীর মা কখনো তাকে এমন সুখ দিতে পারেনি।" 'সাঁঝ সকালের মা' গল্পে সাধন তার মায়ের শ্রাদ্ধে দেওয়া পুরোহিতের পাওনা চাল কেড়ে নেয়। 'জাতুধান', 'ভাত', 'সাঁঝ সকালের মা' গল্পের শেষে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সামাজিক আচার আচরণ, সংস্কারের কথা এসেছে সত্য কিন্তু তাকে অতিক্রম করে বড়ো হয়ে উঠেছে ক্ষুৎ-কাতর মানুষগুলোর খিদের মুখ।

প্রসঙ্গত, আমাদের মনে পড়ে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্রদানী', গল্পের কথা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তো তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠতম খিদের আখ্যানকর্তা। ক্ষুধাগ্রস্থ মানুষের মন, মনস্তত্ত্ব ও শরীরী লড়াই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ অর্থে নিরীক্ষণ করেছিলেন। 'আত্মহত্যার অধিকার', 'চিন্তামণি', 'আজকাল পরশুর গল্প', 'সাড়ে সাতসের চাল'-এর পাঠক মাত্রই সেকথা জানেন। সাংস্কৃতিক চেতনা মানুষকে অন্যান্য প্রাণির থেকে পৃথক করেছে কিন্তু খিদের তাড়না তাকে পুনরায় ঠেলে দিয়েছে প্রাগৈতিহাসিক আদিমতার দিকে।

মহাশ্বেতার শিল্প দৃষ্টি ও 'জাতুধান' গল্পের শিল্পভাবনা যদিও উল্লিখিত গল্পকার ও গল্পের থেকে ভিন্নতর। তবু খিদে, খিদের তাড়না থেকে সাজুয়ার ভাতের প্রতি লোভ, মাতংদের প্রতিবাদী চেতনা এ গল্পে নতুন অভিমুখ তৈরি করে। খিদে থেকে খিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শ্রেণিসংগ্রামে রূপান্তরিত করার সাংগঠনিক প্রয়াস। আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে এভাবেই নির্যাতিত মানুষ, সর্বহারা মানুষ, নিম্নবর্গের মানুষ বারবার একত্রিত হয়েছে। দারিদ্র্য, অশিক্ষার মধ্যে দিয়ে বাঁচতে বাঁচতে শ্রমজীবী মানুষ, নিম্নবর্গের মানুষ এভাবেই একদিন শ্রেণিসচেতন হয়ে ওঠে। সেই শ্রেণিসচেতনতাই তাদেরকে প্রতিবাদী করে তোলে। ক্ষমতার কেন্দ্রটি তখন ভয়ে টলমল করে। ভোগে নিরাপত্তা হীনতায়। এ গল্পের ক্ষমতার কেন্দ্র ও পরিসরের দিকে নজর দিলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পের ভরকেন্দ্রে তাই থেকে যায় সাজুয়া। মানুষ। জীবন— ব্যাপ্ত জীবনাকাঙ্ক্ষা।

২০.৫ নামকরণ

সাজুয়া তিওর 'জাতুধান' উপাধিটি অর্জন করেছিল রাম সিংগি-র মাতৃশ্রাদ্ধে গিয়ে। তার মাতৃশ্রাদ্ধে বর্গাদার, ভাগচাষী সকলকেই রাম সিংগি ডেকেছিলেন। এমনতর সামাজিক কাজে সাধারণত বাইন কেটে ভাত রান্না হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য থাকে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা। তিওররা কাঠ আনে, কলাপাতা আনে, উঠোন চাঁছে। বর্ণোচ্ছেদের জাত বাঁচাতে ওদেরকে বাইরে বসে থাকতে হয়— সেখানেই ওদের পাত পড়ে।

শ্রাদ্ধের দিন সাজুয়ার সামনে এসে রাম সিংগি অন্যদের বলে, "এর কথাই ভাবছিলাম। মা ওকে বসে খাইয়ে গেছে। পাকা দু'কিলো চালের ভাত জলপান খাবে, আবার বিকেলে আড়াই কিলো চালের ভাত।" খাওয়ার সময় বিশেষ কথা বলে না সাজুয়া। ডাল আর কুমড়োর ঘ্যাট দিয়েই সে চুপচাপ উড়িয়ে দিচ্ছিল ভাতের পাহাড়। আজ সে খাবে। "যত খেলাম, তত খাব। লিয়ে যাব কাল। এঁটো বাসি লিব। আজ খাব।" ওর 'রাক্ষুসে' খাওয়া লোকে দেখে, সাজুয়া সেটা জানে কিন্তু তাতে সে বিচলিত হয় না। সেদিন পুরোহিত মশাইও দাওয়ায় বসে দেখছিলেন সাজুয়ার খাওয়া। দেখতে দেখতে বলেছিলেন 'এ বেটা জাতুধান'। সাজুয়া খেয়ে এসে বামুনকে প্রণাম ঠুকে বলে,

"কী বলছিলে হে ঠাকুর? খাওয়া দেখছিলে? খাওয়ার লেগে রাক্ষস মোরে বলে সবাই। উ পরিবারও বলে। লামে কী হয়? পেটে খেলে লামের লাথ সয়।"

সাজুয়ার বউটি ছোটো-খাটো গোল-গাল গড়নের শ্রীময়ী মেয়ে। সে ফিক করে হাসল।

পুরুত বললেন, 'রাক্ষস কি হে! তুমি বাবা জাতুধান। 'রাক্ষস' নামে জাঁকজমক নাই। জাতুধান বললে বেশ মানাচ্ছে।"

নামে কিছু আসে যায় না সাজুয়ার। সে জনে পেটে খেলে রামের লাথি সহ্য হয়। পেটের অন্ন জোটানো মুশকিল। পেটটি বড়ো। সবদিন ভাত জোটে না। সে জানে "যেদিন জুটবে খুব খাব। না জুটলে পেটে কিল।" মহাজনের বাড়িতে আর সবাই ভোজ পেয়েছে কিন্তু সাজুয়া পেয়েছে খেতাব। বেলেটিতে এ-সনে ভাসান, ও-সনে ডোবান। যে বছর চর নেই, সে বছর চাষ নেই। সে বছর পোটলা বেঁধে রাঢ়দেশে বেরিয়ে পড়া। বউ বলে "যেও না।" মন যেতে চায় না সাজুয়ার। কিন্তু ও নিজে বাড়িতে থাকলে ওই দশ কিলো চালে একদিনও যাবে না। ও না থাকলে মা-বউতে আজ আমানি, কাল পন্থি, পেট মেরে মেরে খেয়ে কিছুদিন কাটিয়ে দিতে পারবে। বউ আদর করে বলে "পেট মেরে খাও ঘরে থাক।" সাজুয়া গভীর অপ্রতিরোধ্য দুঃখে মাথা নাড়ে, "ঘরে চাল আছে, ভাত খাব নাই, এ ভাবলে মোর মাথায় বাসুকি নড়ে।" এভাবেই খিদে সমস্ত গল্প জুড়ে সাজুয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু গল্পের প্রকৃত জাতুধান কে? সাজুয়া? না কি রাম সিংগি? না কি ভাগীরথী? আখ্যানের পরতে পরতে এই সব প্রশ্নগুলো ঘাপটি মেরে বসে আছে।

শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এর প্রথম খণ্ডে জানিয়েছেন— জাতুধান - পুং [জাতু (কদাচিৎ) ধান (সন্নিধান) যাহার (অ.টী), তুলনীয় 'যাতুধান'] রাক্ষস। শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর 'বাংলা ভাষার অভিধান'-এর প্রথম খণ্ডে জানিয়েছেন— জাতুধান (সং) বি. রাক্ষস। এই আভিধানিক অর্থ ও রাঢ়ের আঞ্চলিক রূপ এর পাশাপাশি রাম সিংগি-সাজুয়া তিওরদের সমাজভাষার নিরিখে আমরা যদি 'জাতুধান'-কে বুঝতে চাই— তবে গল্পকে অনুসরণ করা জরুরি।

গল্পের মধ্যে স্পষ্ট দুটি শ্রেণি আছে। যার একদিকে জোতদার-মহাজন রাম সিংগি। অন্যদিকে সাজুয়া, সাজুয়ার বউ, মা, মাতং, মদন, ঈশান, গগনরা। জোতদারদের বিরুদ্ধে মাতংদের শ্রেণি সংগ্রামের একটা আখ্যান-বৃত্তান্ত আমরা

'জাতুধান'-এ পাই। বহরমপুর বন্যা-কন্ট্রোল অফিসের খবর অনুযায়ী রাম-সিংগি তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী মনিব্যান-এর দুধেল গাই মোষ সব নাবাল থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন উঁচু নারকেল বাগানে। বেলেটির মানুষদের সে খবর জানাননি। বন্যার ত্রাণ, রিলিফের গম-চিড়ে-গুড়-কাপড় আবার আসবে তার হেপাজতে। বন্যা পীড়িত মানুষদের ত্রাণ সবটাই খেয়ে নেয় জোতদার রাম সিংগির মহাজনী লোভ। পাঠকের মনে পড়তে পারে. মাতং-এর ভয়ঙ্কর সত্য উচ্চারণ, "রাম সিংগি বাবু দিবে? জল আসবে জেনেছিল, কারেও বলে নাই? মোষের কথা ভাবল, মানুষের কথা ভাবে নাই।" মাতং-দের দাবিতে শেষ পর্যন্ত যখন পরাজিত হয়ে রাম সিংগি সাজুয়ার শ্রাদ্ধে চাল দিতে রাজি হয়, তখন মনিব্যানকে আমরা বলতে শুনি, "সাজুয়ার ছরাদে চাল দিবে, তাতে তুমি খেতাব পাবা না?" মানুষের কথা ভাববার মধ্যেও রয়ে গেছে এমনতর খেতাবের আকাঙ্ক্ষা। উপনিবেশ নেই কিন্তু ঔপনিবেশিক খেতাবের জন্য লোভ আর মোহ রয়ে গেছে পরিবর্তিত এই কাল খণ্ডেও। রাম সিংগিদের মহাজনি ক্ষমতা আর লোভের কাছে পারে না সাজুয়া বা মাতংরা। তাদের সমস্ত সংগ্রাম ঢুকে যায় রাম সিংগিদের জোতদারী-সামন্ততান্ত্রিক খিদের অনন্ত বিবরে।

অন্যদিকে ভাগীরথী বেলেটিকে ডোবায় বাঁচায়। বেলেটির চরের মানুষরা নিয়তি হিসেবেই তা মেনে নিয়েছে। "বৃষ্টি নেই, মেঘ নেই, শুক্ল-পক্ষের নির্মল আকাশ, পাড় ছেড়ে নদী নিঃশব্দে ডোমপাড়ায় ঢুকল।" ফারাক্কার বাঁধ থেকে জল ছাড়ার ফলে ডোমপাড়া মুছে গিয়ে ধীরে ধীরে জলের চাদর বিছিয়ে গেল সর্বত্র। বেলেটি, সাজাখালির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। "হুই পদ্মা, হেই ভাগীরথী। মাঝে এতটুনি ফারাক, তিরতির করে।" গেরুয়া বানের জলে ভেসে যায় নতুন খড়ের চাল, নতুন খুঁটি— 'কার সাধের ঘর গো।' নদী ফিরে পেতে চায় তার আপন পথ। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আধুনিক নগর সভ্যতার বিকাশ, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রস্থাপন, উচ্চফলনশীল চাষের জন্য বিশ শতক জুড়ে নদী বাঁধের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। নগর সভ্যতার বিকাশের জন্য আসলে নষ্ট হয়ে যায় ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স। নগর সভ্যতার সর্বগ্রাসী খিদে খপ্ করে গিলে ফেলে একটা আস্ত নদী। নদী ছাড়া পেয়ে অনন্ত খিদে নিয়ে ছুটে যায় 'সেমি-শহর ও সেমি-গ্রাম' তিওর পাড়ার দিকে।

আসলে সমগ্র গল্প জুড়ে বিস্তৃত হয়ে আছে খিদের মুখব্যাদান। বিরাট একটা হাঁ। সাজুয়া গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঠিকই তবু নামকরণের ক্ষেত্রে এই বহুকৌণিক মাত্রা ও বিবিধ সর্পিল বিন্যাসে ইঙ্গিতগুলো সুকৌশলে গল্পকার সাজিয়ে রেখেছেন মনে হয়।

২০.৬ সমাজপ্রেক্ষিত ও চরিত্র নির্মাণ

Raymond Williams তাঁর *'Marxism and Literature'* গ্রন্থে মার্কসীয় ধারণা অনুযায়ী Ideology সম্পর্কে মূলত তিনি কথা বলেছেন ঃ

i. a system of beliefs characteristic of particular class or group.

ii. a system of illusory beliefs - false ideas or false consciousness - which can be contrusted with true or scientific knowledge.

iii. the general process of the production of meaning and ideas.

[*'Marxism and Literature'*, Raymond Williams, Oxford University Press, 1985. Page-55]

অনেক কিছু মিলিয়ে গড়ে ওঠে একটা সমাজের ভাবতত্ত্ব (Idealogy)। রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা, আইনের সংস্থান, নৈতিকতার বিধান, দার্শনিক মীমাংসা, ধর্মীয় আস্থা-অনাস্থার প্রকৃতি, সামাজিক ধারণা, প্রচলিত বিশ্বাস মতামত সবকিছুর

মিলিত গ্রন্থনা থেকে সমাজের ভাবতত্ত্ব গড়ে ওঠে। আমাদের আলোচ্য 'জাতুধান' গল্পের সমাজপ্রেক্ষিতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে একজন সমাজ সচেতন শিল্পীর বীক্ষণ। যিনি নিপুণভাবে বিশেষ অর্থে ভাগীরথীর কূলাশ্রিত বেলেটির সমাজজীবন ও তার ভাবতত্ত্বটিকে অনুসন্ধান করে চলেছেন। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ঐতিহাসিক তথ্য, উপাদান, সূত্র স্বভাবতই রক্ষিত হয় এবং রচিত হয় উচ্চবর্গের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে। সাবঅলটার্ন স্টাডিজ (১৯৮২) এর অন্যতম প্রবক্তা রণজিৎ গুহ লিখেছিলেন, ''ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাস রচনায় দীর্ঘদিন ধরে উপনিবেশিক উচ্চবর্গ আর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্গের আধিপত্য চলে আসছে।'' (*নিম্নবর্গের ইতিহাস* : রণজিৎ গুহ, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, সম্পাদনা : গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ) এই ইতিহাসে অধিকাংশ সময়েই নিম্নবর্গকে দেখা যায় একটি নিষ্ক্রিয়, ভীরু, একান্ত অনুগত জীব হিসেবে। অন্যে চালিত করলে তবেই সে চলে। একমাত্র প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিরোধ, বিশেষ করে বিদ্রোহের সময় শাসকগোষ্ঠী তাকে সক্রিয় প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে।

'জাতুধান' গল্পের ধাপগুলো সচেতনভাবে লক্ষ করলে দেখা যবে মহাশ্বেতা দেবী শাসক ও শোষিত, বুর্জোয়া-প্রলেতারিয়েত, উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের যে আখ্যান বাস্তবতাকে নির্মাণ করেছেন, নিম্নবর্গের চেতনার স্বাতন্ত্র্য ও পরাধীনতার দ্বৈত চরিত্রটি সেখানে উদঘাটিত হয়েছে। এই সমাজপ্রেক্ষিতে ও ভাবতত্ত্বের নিরিখে আমরা এখন চরিত্রগুলি পড়বো।

সাজুয়া তিওর

'জাতুধান' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সাজুয়া। বেলেটির রাম সিংগির জমিতে সে বর্গাদার। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। প্রসারিত স্ফীত হাতে লোহার বালা। বিশাল কালো শরীর। পেশির গড়নে প্রাগৈতিহাসিক আদিমতা। হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়েও সাজুয়া উপার্জন করতে পারে না, তার চাহিদা অনুযায়ী খাবার। বউ-মাকে নিয়ে তার সংসার। আধুনিক অর্থনীতি ক্যালোরি মেপে, এবং সেই পরিমাণ ক্যালোরির খাবার সংগ্রহ করতে যারা ব্যর্থ তাদেরকে দারিদ্র্য সীমার নিচে রেখেছে। এই দারিদ্র্য রেখা দিয়ে হয়তো সাজুয়াদের দারিদ্র কে মাপা যাবে না। সামাজিক বর্গ অনুযায়ীও তারা নিম্নবর্গের। প্রান্তিক তারা। দু'কিলো চালের ভাত জলপান হিসেবে চাই তার। দুপুরে আড়াই কিলো চালের ভাত। বিশাল শরীর আর আসুরিক ক্ষুধার মানুষ সাজুয়াকে আধিপত্যবাদী উচ্চবর্গীয় সমাজ 'জাতুধান' বা রাক্ষস হিসেবে চিহ্নিত করেছে। দু'বেলা পেট ভরে খেতে না পাওয়ার জন্য সাজুয়া হয়ে উঠেছে লোভী। খিদে আর লোভ তাকে তাড়িত করে। ক্ষমতাশীল উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে, শাসকের বিরুদ্ধে কৌশলী করে তোলে। বেঁচে থাকার, অভিযোজনের, যোগ্যতমের উদ্বর্তনের পথ নিজেই আবিষ্কার করে নেয় সাজুয়া। প্রতিরোধের এও এক নতুন পথ।

রাম সিংগি

রাম সিংগি ছিলেন বেলেটির এক সময়কার জমিদার। তিওররা ছিল তার প্রজা। স্বাধীনতা উত্তরকালে জোতদার রাম সিংগি-র বর্গাদার সাজুয়া, মাতংরা। জমিদারি নেই, তবু জমিদারি প্রতাপ রয়ে গেছে। খাজনা আদায় নেই, তবে মাসোহারা ও শোষণের নতুন পদ্ধতি হয়েছে আবিষ্কৃত। ভাগীরথীর এই চর জমি এক সনে ভাসান, ও-সনে ডোবান। লিখে নিয়ে তিওরদের চাল দেয়। পরে সুদে আসলে দ্বিগুণ ফেরত নেয়। প্রতি বছরই বেলেটি বন্যা কবলিত হলে সরকারী ত্রাণ আসে রাম সিংগির মারফত। বি.ডি.ও. থেকে রিলিফের গম, চিড়ে, গুড়, কাপড় চলে আসে রাম সিংগির হেফাজতে। ক্ষমতার নতুন কেন্দ্র তৈরি হয়। রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করে জোতদার রাম সিংগি। নিজের অর্থ লালসা মেটানোর জন্য চাই ভাগীরথীর ভয়ঙ্কর বান, চাই কিছু লাশ নীরব, নিথর। পুরোহিত, বি.ডি.ও, বন্যা-কন্ট্রোল অফিস, রাম সিংগি মিলে ক্ষমতার একটা বৃত্ত নির্মিত হয়। ক্ষমতাশীল এই উচ্চবর্গের আধিপত্যের বিরুদ্ধে মাতং, সাজুয়াদের সংগ্রাম চলতে থাকে ছেদহীন।

মাতং

মাতংকে এ গল্পে আমরা দেখি সর্বহারা শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে। চর না থাকলে, ধান চাষ না থাকলে তিওরদের নিয়ে সে পাড়ি দেয় রাঢ়দেশ। তিওররা তাদের গোষ্ঠীপ্রধানকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে। জোতদার, মহাজনি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সে শ্রেণি সংগ্রামকে সংগঠিত করে তোলে। সহযোদ্ধার আপদে বিপদে সাহায্যের সুনিশ্চিত প্রত্যাশা নিয়ে শোষিতের পাশে দাঁড়ায় মাতং। শোষিতের স্বরকে সম্মিলিত করে সে আসলে একটি শ্রেণিসংগ্রামকে নেতৃত্ব দেয়। "বাবু বাথান সরালে সদর হতে খবর পেয়ে। একবার বললে না, তাতে ডোমপাড়া ডুবল।" ক্ষমতাশীল উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে, জোতদারের বিরুদ্ধে এই স্পষ্ট উচ্চারণ গল্পের শ্রেণিদ্বন্দ্বের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত করে।

মনিব্যান

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সন্তানধারণে অক্ষম মনিব্যানকেও অর্থ-উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। মনিব্যান রাম সিংগির প্রথম স্ত্রী। বছর ত্রিশ আগে 'বাঁজা মনিব্যানের সম্মতি নিয়ে রাম সিংগি তার শালিকে বিয়ে করে। মনিব্যানকে এক আঁজলা টাকা দিয়ে বলেছিল, "মোষ কেন, মাদী মোষ। দুধ বেচ। এ তোমার স্ত্রীধন হল।" দ্বিতীয় পক্ষ বছর বছর বাড়িয়ে যায় পুত্রধন। আর মনিব্যান স্ত্রীধন। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর আলোচনার অন্যতম ক্ষেত্র হল— মহিলাদের সামাজিক অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনা। পুরুষশাষিত সমাজে নারীর অধীনতাও যেমন বিশ্লেষণের বিষয়, তেমনি অন্যান্য ক্ষমতার সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে নারীর অধীনতা এবং বিশেষ অর্থে নিম্নবর্গীয় নারীর (সাজুয়ার বউ, মা) অধীনতা বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। অধীনতার বৃত্তে দাঁড়িয়ে মনিব্যান আসলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও অধিকতর পুষ্ট করে তোলে।

২০.৭ সারাংশ

মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে প্রান্তিক মানুষ ও নিম্নবর্গের ইতিহাসকে আমরা বিশেষ ভাবে উঠে আসতে দেখি। 'জাতুধান' গল্পটি সেই ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।

একদিকে জোতদার, মহাজনি প্রথা। অন্যদিকে বর্গাদার, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। একদিকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, অন্যদিকে শোষিত সর্বহারা মাতং, সাজুয়া। শ্রেণিদ্বন্দ্বের এই ভেতরকার প্রবাহটি গল্পের মধ্যে ক্রিয়াশীল।

গল্পবলার বিশেষ একটি রীতি, মুন্সিয়ানা মহাশ্বেতার আখ্যান-ব্যক্তিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'জাতুধান' গল্পের স্টোরি-এ আছে সেই অননুকরণীয় রীতির প্রায়োগিক নৈপুণ্য।

চরিত্রচিত্রণে মহাশ্বেতা দেবীর অসাধারণ দক্ষতা এ গল্পের সর্বত্র প্রমাণিত।

'শিল্পের জন্য শিল্প'— মহাশ্বেতা দেবীর কমিটমেন্ট সাধারণ মানুষের কাছে। তিনি আপাত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করায়, বিচার করায়, সময়ের দলিলীকরণে বিশ্বাসী।

'জাতুধান' গল্পটি পাঠ করতে হবে সযত্নে। লক্ষ করতে হবে কীভাবে ধাপে ধাপে সাজুয়া তিওর-মাতংদের খিদে তাড়িত জীবন, সংগ্রামী জীবন গল্পের মধ্যে দিয়ে বিকাশ ও পরিণতি লাভ করে। গল্পপাঠের সূত্র ধরে শ্রেণিসংগ্রামের স্বরূপ ও নদীবাঁধের রাজনীতিকেও বুঝতে হবে সযত্নে।

সংলাপ রচনা ও আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে মহাশ্বেতা দেবী কৃতিত্বের দিকটি এগল্পে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিবেদনধর্মীতা গল্পের শেষে গিয়ে পাঠকচৈতন্যে এক আশ্চর্য ঝাঁকুনি তৈরি করে। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের সমাপ্তি

অংশটি, আরও স্পষ্ট করে বললে সমাপ্তি বাক্যটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের আশ্চর্য শিল্পসার্থকতা আমরা এখানে প্রত্যক্ষ করি।

২০.৮ অনুশীলনী

১. 'জাতুধান' গল্প বর্ণনায় গল্পকারের কৃতিত্ব আলোচনা করো।
২. 'জাতুধান' গল্প অবলম্বনে মহাশ্বেতা দেবীর নিম্নবর্গের ইতিহাস চিন্তা বিশ্লেষণ করো।
৩. 'জাতুধান' গল্পটির গঠনগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
৪. সংলাপ রচনা ও ভাষা প্রয়োগে 'জাতুধান' গল্পটির সার্থকতা নিরূপণ করো।
৫. 'জাতুধান' গল্পটির সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করো।
৬. 'জাতুধান' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।
৭. 'জাতুধান' গল্পের মধ্যে শ্রেণিদ্বন্দ্বে যে স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে— তা আলোচনা করো।
৮. 'জাতুধান' গল্পটি অবলম্বনে সাজুয়া তিওর চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।
৯. 'জাতুধান' গল্প অবলম্বনে মহাশ্বেতা দেবীর সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দাও।
১০. 'খিদে' এবং 'শোষণ' কীভাবে 'জাতুধান' গল্পের প্রতিবেশকে নির্মাণ করে, তা তোমার পাঠ অভিজ্ঞতার নিরিখে বিশ্লেষণ করো।

২০.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. মহাশ্বেতা দেবী — *এক জীবনেই*, প্রমা, জুলাই, ১৯৯৬
২. মহাশ্বেতা দেবী — *আমাদের শান্তিনিকেতন*, সৃষ্টি প্রকাশন, ২০০১
৩. নির্মল ঘোষ — *মহাশ্বেতা দেবী : অপরাজেয় প্রতিবাদী* মুখ, করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৮
৪. কণিকা বিশ্বাস — *ছায়াদর্পণে মহাশ্বেতা*, এবং মুশায়েরা, ২০১১
৫. সুমিতা চক্রবর্তী — *ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি*, ২০০৪
৬. কৃপাশংকর চৌবে — *মহারণ্যের মা*, প্রমা প্রকাশনী, ১৯৯৯

পত্র-পত্রিকা পঞ্জি

১. অমর দে (সম্পাদিত) — 'গল্পসরণি' পত্রিকা, মহাশ্বেতা দেবী সংখ্যা, ষোড়শ বর্ষ, ১৪১৮
২. তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত) — 'কোরক' মহাশ্বেতা দেবী সংখ্যা, বইমেলা, ২০০৩
৩. বিকাশ শীল (সম্পাদিত) — 'জনপদ প্রয়াস', মহাশ্বেতা দেবী সংখ্যা, জুলাই, ২০০৩
৪. সমীরণ মজুমদার (সম্পাদিত) — 'অমৃতলোক', মহাশ্বেতা দেবী ক্রোড়পত্র, অক্টোবর, ১৯৮৮
৫. সঞ্জীবকুমার বসু (সম্পাদিত) — 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ১-২, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৪০২
৬. অনিল আচার্য (সম্পাদিত) — 'অনুষ্টুপ', বর্ষ ১৫, শারদীয় ১৩৮৭

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধুলিসাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

— Subhas Chandra Bose

Price : ₹. 150.00

(NSOU-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-1, Salt Lake, Kolkata-700 064 &
Printed at Sailee Press Pvt. Ltd., 4A Manicktala Main Road, Kolkata 700 054